নবারুণ ভট্টাচার্য

উপন্যাস সমগ্র

UPANYAS SAMAGRA
A collection of Bengali Novels by NABARUN BHATTACHARYAY
Published by Sudhangshu Shekhar Dey, Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330, 2219 7920 Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 350.00

ISBN 978-81-295-1057-0

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬

ACCESSION NO. 36712
CLASS NO.
ADDITIONAL DISTRICT LIBRARY
SMPA

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

pathagar.net

৩৫০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপনা : দিলীপ দে। লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস্
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ADDITIONAL DISTRICT LIBRARY
ESTD-1991
SILIGURI

রাজীব চৌধুরীকে

pathagar.net

উপন্যাস সমগ্রের ভূমিকা

আমার আটটা ছোট-বড় উপন্যাস নিয়ে এই সংকলন। কেউ চাইলে এবার একটি সসীম মুদ্রিত পরিসরে আমার আখ্যান, তার ব্যর্থতা ও সফলতা, একাধিক ধাঁচের বাচনের মধ্যে আমার অস্থির সন্ধান, কোনো মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক যোগসূত্র আছে না নেই, জটিল ও ধ্বস নামার সময়ে দাঁড়িয়ে কোনো প্রয়োজনীয় পরীক্ষা আমি করতে পেরেছি কি না, আমার বিশ্ববীক্ষা, প্রাণমণ্ডলের সঙ্গে একটা সক্রিয় অঙ্গীকার—সবটাই যাচাই করে নিতে পারবেন। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, যে তাগিদ থেকে আমি লিখি তার সঙ্গে বাজারের সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে। ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক রদবদলের যে বিচিত্র ও ট্রাজিক সময়ের আমি সাক্ষী তার অনুরণন আমার আখ্যানে রয়েছে— কখনও আমি অংশীদার এবং সব সময়েই ভিক্টিম। তৃতীয় বিশ্বের একজন লেখক হিসেবে সেটাই আমার উপলব্ধি। বিচ্ছিন্নতার কষ্টকর একাকীত্ব থেকে কোনো একটা অন্বয়ে আমার যাওয়ার চেষ্টা আশা করি পাঠকের চোখ এড়াবে না। অমানবিকতা ও তৎসংশ্লিষ্ট আবশ্যিক যে বুজরুকির সার্কাসের মধ্যে আমরা রয়েছি তার সঙ্গে কোনোরকম আপোষ অসম্ভব। এটাই আমার ও আমার আটটি আখ্যান—এই ন'জনের সম্মিলিত ঘোষণা।

নবারুণ ভট্টাচার্য

সূচি

হারবার্ট
৯
ভোগী
৬৩
যুদ্ধ পরিস্থিতি
১০৭
খেলনা নগর
১৮৩
কাঙাল মালসাট
২২৯
লুব্ধক
৩৮১
অটো
৪১৭
মসোলিয়ম
৪৫৯

গ্রন্থ-পরিচিতি
৫০৫

pathagar.net

ভোগী

pathagar.net

নিশীথে, সমুদ্রতীরে এই কাহিনির অবতারণা। ঝোড়ো বাতাস ও সমুদ্র গর্জনের দুই ভীষণ শব্দ মিলে ভীতিপ্রদ এক ধ্বংসের আবহ তৈরি করেছে। তবে অনুমান হয় যে, এই শব্দ আরও ঝোড়ো, আরও ক্ষ্যাপা হয়ে উঠবে। অল্পস্থায়ী বিদ্যুতের ঝলকে, অন্ধকারে, চকিতে দৃশ্যমান হয় বালিয়াড়ি যা ঢাল দিয়ে সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে। অতএব শব্দময় অন্ধকারে এলোমেলো উড়তে থাকা বালুকণা ও বৃষ্টির ছাঁটের মধ্যে অপেক্ষা করতে হয় আরও কয়েক লহমা যতক্ষণে যুযুধান মেয়েদের মধ্যে আরও বেশি সময় ধরে ঝল্‌সে দেওয়ার খেলা না জমে ওঠে।

সেই ঝলক অনেকটা ওয়েল্ডিং করার' আলোর মতো। তাতে দেখা গেল ঢেউ-এর আঘাতে পাশ ফিরছে বা গড়াচ্ছে একটি কাটা মুণ্ডু। মুণ্ডুটির চোখদুটি আধখোলা, ঠোঁট একটু ফাঁক, অনেক চুল ও দাড়ি জলে ভিজে লেপটে রয়েছে। ভারি কাতানের কোপে মুণ্ডুটি যখন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তখন হয়তো নেশার বশে বধকর্তার চোখ বা হাতের আন্দাজ একটু বেসামাল হয়ে থাকবে। ফলে কোপটি একটু তেরচাভাবে পড়েছিল। দিবালোক হলে হয়তো নোনাজলে রক্ত ধুয়ে যাওয়ার পরে স্বরনালী বা অন্ননালী বিশদ দেখা যেত। কিন্তু এই অন্ধকারে সে আশা করা যায় না।

বালিয়াড়ির ওপরে, কিছুটা ভেতরে গেলে অন্য দৃশ্য। দেখা যায় প্রৌঢ় এক পেশীবহুল মানুষ মানুষপ্রমাণ এক গর্ত ভিজে বালি পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে ভরাট করছে। বোঝাই যায় যে, সে মুণ্ডুবিহীন ধড়টিকে বালি চাপা দিচ্ছে। এক এক সময় এত বেশি সময় ধরে অন্ধকার বিদ্যুদ্দীপ্ত থাকে যে, তা অপ্রাকৃতিক বলে মনে হয়। যাই হোক, যা বিস্মিত করে তা হল প্রৌঢ় এই গা-খালি বলিষ্ঠ মানুষটি এই ভয়াবহ ঘটনার অংশীদার হয়েও বড় বেশি নির্লিপ্ত। কে জানে, হয়তো নেশার ঝোঁক এই নির্লিপ্তির কারণ। গর্তে অনেকটা বালি ভরে গেছে। এবারে সে নিচু হয়ে আঁজলা বালি নিয়ে ঝুপ ঝুপ শব্দ করে ফেলে। তারপর পা দিয়ে দাবিয়ে দাবিয়ে ভিজে বালির উঁচুনিচু সমান করে। বৃষ্টি জোরে শুরু হয়।

কাটা মুণ্ডু কথা না বলুক, মৃত্যুর নিয়মে তার নিশ্চল জড়মণ্ডের মতো পড়ে থাকার কথা। বিশেষত মাথা কাটার এতক্ষণ পরে। কিন্তু উপ্‌চে উপ্‌চে এগিয়ে আসা কালো ঢেউ-এর থাবা তাকে নিয়ে খেলা করছিল। সাদা ফেনার নখ তাকে আঁচড়াচ্ছিল। বড় ঢেউ এসে ভাঙলে মুণ্ডুটি ওলটপালট করে পাড়ের দিকে এগোয়। কিছুক্ষণ হয়তো বালিতে নাক গুঁজে মুখ ফিরিয়ে থাকে। কিন্তু ফেরত যাওয়া জলের ধাক্কায় আবার সোজা হয়ে যায়। তখন আবার সেই আধখোলা চোখ, ফাঁক মুখ, তার মধ্যে দাঁতের অস্পষ্ট আভা দেখা যায়। কখনও জলের তোড়ে মুণ্ডুটি ঘুরে যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই আবার সমুদ্রের দিকে গড়াতে থাকে। বিদ্যুৎ চমকায়। ঘোর বর্ষণ মুণ্ডুর মুখ, চোখ অস্পষ্ট করে দেয়। ঢেউ-এর সঙ্গে ঢেউ-এর ধাক্কায় বিস্ফোরণের শব্দ হয়। আকাশে জল লাফিয়ে ওঠে। মহাপ্রলয় কালে লুপ্ত কোনও গ্রহের মতোই মুণ্ডুটি অজানা হয়ে যায়। বাজ পড়ে সমুদ্রের মধ্যে। বীভৎস এই তাণ্ডবের মধ্যে রুষ্ট, বিক্ষুব্ধ অন্ধকার আরও গাঢ়, আরও ঘোর, আরও প্রলয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল।

... ...

নিজের ঘরে মিথিল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল যে, সে অ্যামেরিকায় গেছে। চেয়ারের ওপরে কাদামাখা, হাঁটুর কাছে ছেঁড়া জিনস্‌, জ্যাকেট, নোংরা পাঞ্জাবি, ব্যাগের মধ্যে দলাপাকানো

আধভেজা গামছা, ড্যাম্প ধরে যাওয়া চার্মিনারের প্যাকেট, দেশলাই। কালই সে বারদোনের হাখণ্ড উৎসব থেকে ফিরেছে যেখানে সেই ঘটনাটা ঘটেছিল—এই উৎসবে একজন ভান করে যে মরে গেছে। সেই সাজানো মড়া নিয়ে ধর্মের থানে এলে মন্ত্র পড়া হয়—মরা তখন গাজন নাচের সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে ওঠে। তখন ঝাঁপ হচ্ছিল।

মিথিলের স্বপ্নটা ছিল এইরকম। মিথিল অ্যামেরিকায় গেছে। সেখানে দারুণ ফূর্তি মনে। যে শহরে গেছে সেটা খুব বড় নয়। স্টিফেন কিং-এর লেখায় যে ধরনের ছোটখাট শহরে ভ্যাম্পায়ার বেরোয় অনেকটা সেরকম ছিমছাম শহর। সেখানে যে বাড়িতে মিথিল উঠেছে তারা বাঙালি অথচ মিথিলের চেনা নয়। বাড়িতে এক বৃদ্ধ, এক বৃদ্ধা, একটি কমবয়সি মেয়ে এবং বেশ কয়েকটা বাচ্চা রয়েছে। শোবার ব্যবস্থা একটা টানা ঘরে। মিথিলের প্রথম চিন্তা হয় যে, ঐ মেয়েটা কি তার কাছে শোবে না বাচ্চাগুলো? মিথিল এরপর বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। হাতে একটা পলিথিনের ব্যাগ। মদ কিনবে। মিথিল কিন্তু জানে যে, তার স্টকে একটা ভদকার পাঁইট আছে। মদের দোকানের সামনে মাঝারি গোছের লাইন। লোকগুলোকে দেখতে ঠিক অ্যামেরিকানদের মতো দশাসই নয়। বরং অনেকটা ইস্ট-ইউরোপের মতো। এর মধ্যে কিন্তু একটা নিগ্রো ছেলেকে দেখা গেল। এই কিউ-এর সামনে, দোকানের মুখোমুখি একটা টেবিলে সাদা চাদরের ওপর জলের গেলাশ রাখা। সেখানেও দু-চারজন চিৎকার করে কি বলছে। মিথিল বুঝতে পারল যে, এখানে একটা এলকোহল-বিরোধী অভিযান চলছে যার মোদ্দা কথাটা হল মদ খেও না, বরং গেলাশ গেলাশ জল খাও। কিউ-এর লোকেদের সঙ্গে ওদের, ঐ মদ বিরোধীদের ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতি হয়। মিথিল কিন্তু তার ফলে চিন্তিত হয় না। তার দুশ্চিন্তা তখন অন্য। তার কাছে ডলার নেই। আসার সময় ভিসা, পাশপোর্ট এই সব নিয়ে এত ঝক্কি গেছে যে, টাকার কথাটা তার মনে হয় নি। একদিন, দুদিন না হয় যে বাড়িতে আছে তাদের কাছ থেকে ধারধোর করে চালাবে। কিন্তু সেটাই বা কদিন। আর চাইবার মধ্যে তো একটা লজ্জা আছে। দুশ্চিন্তার ভারটা বেড়ে গেল। রাস্তা একটাই। এক্ষুনি ফোন করে মাসিমণিকে বলতে হবে যে, মিথিল স্ট্র্যান্ডেড—স্টেটস্-এ। ফ্যাক্সে কি ডলার পাঠানো যায়? যাই হোক, ফোন করে মিথিল। ডায়ালটা একটা ফাটা ফাটা মেটে রঙের চাকতি যাতে কোনও সংখ্যা নেই। চাকতিটার যে যে জায়গায় নম্বরগুলো হতে পারে আন্দাজ করে ডায়াল করে মিথিল। এবং দুটো সংখ্যার পরে যখন '৩' আসে তখন মিথিল বুঝতে পারে যে, ঘড়ির ডায়ালে যেখানে '৯' থাকে সেখানে সে '৩'-এর জন্যে ডায়াল ঘুরিয়েছে। সব ভুল হচ্ছে। এর পরের চারটে ডিজিটও প্রায় উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। '১' টা ঠিক ছিল কিন্তু '৮' আর '৭'? ফোন বাজে। রিসিভার ওঠে। মাসিমণির গলা। আমি মিথিল, আমি অ্যামেরিকা থেকে বলছি, আমি চলে এসেছি কিন্তু—

—হ্যাঁ, এসে দেখি তোর জন্যে রাখা ডলার তুই সব ফেলে গেছিস।

—শোনো, দেরি করবে না। যত তাড়াতাড়ি পারো পাঠিয়ে দাও। মাসিমণি!

—বল্ মিথিল।

অথচ ঘরের মধ্যে সেই লোকটা এসে গেছে। তার গলা শুনতে পাচ্ছে মিথিল। লোকটা তো বলল, একদিন পরে আসবে। আর লোকটাকে মাসিমণি চেনে না। ডলার কী করে কলকাতা থেকে অ্যামেরিকা আসে? প্রসেসটা কী? টাকা পাল্টে ডলার হয়ে আসে, না প্রথম থেকেই ডলার থাকে। মিথিলের ঘুম ভেঙে গেল। মিথিল মনে করে কী ঘটেছিল গতরাতে। স্বপ্নটা একেবারেই ফাল্তু। গতকাল সঙ্গে সঙ্গে ফিরে সে বাড়ি আসে নি। দিব্যর বাড়ি গিয়েছিল। দিব্য তখন চিৎকার করে অনন্য রায়ের 'আলোর অপেরা' পড়ছিল। রোজ সন্ধেবেলা দিব্য একঘণ্টা কবিতা জোরে জোরে পড়ে। বলে এটা ওর ইভনিং প্রেয়ার। পাঠ-এর পর ওর কাছে হাফের হাফ রাম ছিল। সেটা খাওয়া

হল। তখন মিথিল বলল তার এক্সাইটিং ডিসকভারির কথা। কথাটা শুনে দিব্য বলল এরকম ঘটনা প্রিমিটিভ সোসাইটিতে হতে পারত। মিথিল তাকে বলল লোকটা কলকাতায় আসছে।

বেতের ছড়ি নিয়ে নাচ হয়ে গিয়েছিল। ঢাকের আওয়াজের তালে তালে সন্ন্যাসীদের পাণ্ডা বুকের ওপর থেকে বেতের ছড়ি সরিয়ে দিয়েছিল। তারপর শুরু হল সিঁদুর, ফুল দিয়ে বঁটি পুজো। এরপর বস্তার ওপরে সার দিয়ে বঁটিগুলো যখন রাখা হল মনে হল নৌকোর দল চলেছে। তারপর শুরু হল বাঁশের ভারার থেকে সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ। খুব জোর বাজনা বাজছে। ভিড়ে ভিড়াক্কার। তখনই অভিমান্য পণ্ডিত এসে মিথিলের কানে কানে বলেছিল—'আজ আপনাকে আশ্চর্য এক নোক দেকাব। একনই রওনা হতি হবে। তিন কোরোশ পথ।'

মিথিল অভিমান্যর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল ফাঁকায়।

—খুব ভাগ্য আপনার। অনেক পুণ্য করলি পরে ভোগী দেকা যায়।

—ভোগী! কী করে ভোগী?

—কী করেন না তাই ঠিক নেই। কদিনই বা থাকেন।

—মানে সাধু টাইপের? কদিন থেকে চলে যায়?

—এ বাবু তোমার আঁদাড়ের সাধু নয়। এ হল ভোগী। ভোগী যে সে হয় না। আবার যে কেউ হতি পারে। কে হবে সে এক গূঢ় রহস্য।

অভিমান্যর সঙ্গে চলতে থাকে মিথিল। অভিমান্য সিংহেশ্বরে থাকে। ওর কাছ থেকে মিথিল খাতায় লেখা 'বনবিবির পালা' নিয়ে পড়েছিল। সে দুবছর আগের কথা। অভিমান্য ওকে অনেক মেলায় ঘুরিয়েছে। এখন যেটা চলছে, মিথিল যেটাকে বলে এথ্‌নিক ফেজ, তাতে অভিমান্য ওর প্রধান গাইডদের অন্যতম।

—বেশ ঝাঁপটা দেখছিলাম।

—রাকো তো তোমার ঝাঁপ। ঝাঁপ দেকাচ্চে। কত ঝাঁপ বলে দেখলাম। এসব হল গে চ্যাংফচকেদের খেলা। বলচি বলি ভোগীর কাছে যাচ্ছি। ভোগী কে জান তো? সে করে কি তোমার কয়েকদিন মাত্তর থাকে। এর মধ্যে ভোগ করে। তারপর বলি হয়ে মরে যায়।

—মরে যায়? কেন?

—কেন আবার কি। চারদিকে এত অনাচার, অত্যাচার, ধম্মোলোপ, খুন-খারাপি, চোপরদিন চুরিচামারি—এই অনাছিষ্টি দূর করার জন্যেই ভোগী আসে, তারপর যা বললাম—আত্মঘাতী হয়।

—আত্মঘাতী মানে? সুইসাইড করে?

—অতশত বাপু জানি নে। তবে যতদূর শুনেছি ভোগীকে মুক্ত করে একজনা, তার নাম কখনও শুনি নি। হতি পারে ভগবান, হতি পারে বনবিবি। তবে ভোগীর মুক্তি যে সে বেপার নয়। সে এক মহাকাণ্ড।

সেই গ্রামে ঢোকার আগে, সাইকেলের টায়ার-টিউব সারাবার দোকান থেকে এক বোতল বাংলা মদ মিথিলকে দিয়ে কিনিয়েছিল অভিমান্য। ভোগীকে দেওয়ার জন্য। একটা বুড়োর সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলেছিল অভিমান্য। সে কিছুটা এগিয়ে এসে গাঁয়ের মধ্যেই একটেরে বাড়িটাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। বাড়ির বাইরে, বেড়া ঘেঁষে বিরাট একটা নিমগাছ। তার ডালে পাতায় সূর্যডুবের আলা মাখা। উঠোনেই বেশ কিছু লোক। বাচ্চা কোলে মা, কয়েকটা বুড়ি। দুটো সাইকেলও দাঁড়িয়ে।

মিমিকে মিথিল বলতে মিমি ঠোঁট উলটে বলেছিল রিডিকিউলাস। এবং বলেছিল এসব কিছু 'বিজার' ও 'এক্সোটিক' ভাট বকে মিথিল ওকে ইমপ্রেস করছে অথচ মিমির এতে কিছু যায় আসে না। মিমি যে খুব সুন্দর দেখতে তা নয়। সিরিয়াসও যে তাও বলা যায় না। এমনকি মিথিলকে তার

যে খুব একটা পছন্দ এমনও মনে হয় না। হলে অত্যন্ত নিকট হয়ে তিনদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসার পর মিথিল 'জুরাসিক পার্ক' নামে যে কবিতাটা মিমিকে উপহার দিয়েছিল সেটা জেরক্স করিয়ে মিমি মাসিমণিসহ প্রত্যেককে এক কপি করে দিয়ে বেড়াত না। ড্রাগ ছাড়ার পরে মিথিলের এটিই এক এবং অদ্বিতীয় রচনা। প্রেরণা মিমির সঙ্গে তিনদিন তিনরাত ও রকিদের ঘরে ভিডিও-তে দেখা স্পিলবার্গের 'জুরাসিক পার্ক'।

মিমির সনেট

মনে পড়ে মিমি মেমারিতে নেমে
খুঁজেছিলে তুমি সালামি এবং,
বার্বি পুতলী পোষাকবিহীন
ঘড়িতে নাইটি একটার ঢং।
মথরেণু মেখে করেছিলে গান,
আমার জবাব—কি লেসবিয়ান।

ঝিঁঝি পোকা আর উচ্চিংড়েরা
জানতো কপালে লেখা নেই ফেরা,
কোথায় তখন রাশিয়া বা চীন
নগ্ন বার্বি কুয়াশায় ঘেরা।
মনে আছে মিমি করেছিলে গান,
আমার জবাব—ছি লেসবিয়ান।

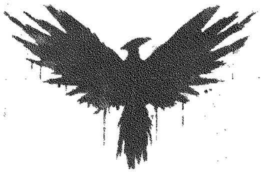

সঙ্গমরত টিরানোসোরাস,
কন্ডোম দিয়ে করে প্রাতরাশ।।

বাইরে আলো থাকলেও ঘরের মধ্যে অন্ধকার। একটা কুপির আলো। মাথা নিচু করে ঘরে ঢোকে মিথিল। এবং ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে ভোগীর চোখাচোখি। ভোগী আসনে বসে। চুল দাড়িতে ঝাঁকড়া মুখ, মাথা, বয়স হবে বোধহয়, মিথিলের মনে হল চল্লিশ মতো হবে। ভোগীর চোখে পলক পড়ে না। সামনে রাখা সরা, তার ওপরে কালচে হয়ে যাওয়া কাটা ফলের মধ্যে জ্বলন্ত রোগা ধূপকাঠি গোঁজা। বোঝাই যায় সে এসব ফলপাকুড় কিছুই খায় নি। পলক না পড়া চোখদুটো বেশ জ্বলজ্বলে। আর তার মুণ্ডুটা কুপির আলোয় দেয়ালে বড় নড়বড়ে ছায়া ফেলেছে। অভিমান্য নমস্কার করে বোতলটা রাখে। সরে আসে। বদ্ধ গরম। মিথিল ঘামছে। ধূপ, ফল, ঘাম এইসবের গন্ধের সঙ্গে পোড়া গাঁজা ও বিড়ির গন্ধ মিশে এক বিকট সমাহার। ভোগী প্রথমে অভিমান্যকে বলে,

—এই ড্যাকরা, বাবুটাকে আনলি, আনলি, ঐ ফকফকে মালটা সঙ্গে নে এলি কেন? বেরাণ্ডি আনতি পারলি নি?

—আজ্ঞে, খবর পেয়ে তো খরো খরো দৌড়ে বারদোন থেকে আসতিচি, ও মাল এ তল্লাটে পাবো কোথায়?

—ও! আমি ভাবলাম বুঝি কলাকাতা থে এলি! তারপর বাবু, ঝাঁপ তো দেখলেন, কেমন নাগল?

—ভাল।

—ভাল! ঐ তেড়ং বেড়ং ভাল। ধুস্। আপনারে একবার দেকিচি এর আগে।

—আমাকে? কোথায়?

—হয় স্বপনের ঘাটে নয় মাইবিবির হাটে। দেকিচি। দেকিচি। তারপর ঐ বিষের নেশা ছেড়ে ভাল করেচেন।

এই, আঁচির বন্ধন পাঁচির বন্ধন বন্ধন বাঘের পা
আর শালার বাঘ চলতে পারবে না।

নেশাভাঙের ভয় নেই। আর মায়ের বাড়া মাসি ঠিক আগলে রাখবে। এই শালা, খোল দিনি বোতল। ভোগী যকন তকন মাল ভোগ করি!

বোতলটা কষের দাঁত দিয়ে চেপে খোলে অভিমান্য। খুলতে গিয়ে ঠোঁট কাটে। গামছায় বোতলের মুখটা মুছে এগিয়ে দেয়। ভোগী গলায় ঢক ঢক করে ঢালে।

—নারে, মালটা ভাল। তারপর বাবু! ও আমার কলকাতার বাবু রে! তবে বাবু তোমার কপালে চাকরি নেই। আবার অভাবও নেই। মাসি আচে, মাসি পুষবে। ভোগীর কথা বাবু, মিলিয়ে নেবেন।

সরোজদা সিগারটা বিরাট ঢাউস অনিক্স পাথরের অ্যাশট্রেতে রাখলেন। এত ছোট একটা চুমুক দিলেন যে, গেলাশের হুইস্কি কমলো কিনা বোঝা গেল না।

—শেষ করেছো? দ্যাটস্ গুড।

উঠে গিয়ে মিথিলের গেলাসে হুইস্কি ঢাললেন। মিনি ফ্রিজ থেকে জলের বোতল বের করলেন। মেশালেন না। কাচের ওপরে রাখলেন।

—মদ্য সম্বন্ধে আমার সুসমাচারটি কি তোমাকে বলেছি?

—ঠিক মনে করতে পারছি না।

—বলি নি বোধহয়। ইয়ুথে, একটা বয়স অবধি আমার মতে মদ ব্রেনের বাগানে সারের কাজ করে, বুঝলে? তারপর গাছ যখন ইন ফুল ব্লুম কমাও, কমাও। এই এজে খাবে। খাবে আর ঢালবে।

—কিন্তু লোকটার সম্বন্ধে কিছু বলুন। ফ্রাঙ্কলি বলছি সরোজদা আমি কিন্তু একটা, সর্ট অফ ট্রান্সের মধ্যে আছি।

—কে নেই? খবর নিয়ে দ্যাখো ও তোমার গরবাচভ থেকে শুরু করে সবাই একটা ট্রান্সের মধ্যে রয়েছে। গরবাচভ। গরবাচভ। পলিটিক্স ইজ দা আর্ট অফ দা পসিবল...যাঃ যাঃ কি একখানা দিলাম... আর ঐ রাফিয়ানটা কি নাম যেন...

—কে সরোজদা, লেগচেভ?

—লেগচেভ নয়, লিগাচেভ। ও নয়। স্কাউন্ড্রেলটার নাম মনে আসছে না—ঐ ব্যাটাই তো পলিটিকাল অ্যালকেমি, তারপর লেনিন কখন গ্লাসনস্ত কথাটাকে কোথায়, কখন এইসব বলে একটা থিওরেটিকাল গ্যাঁজ তৈরি করেছিল। নামটা মনে আসছে না। এই একটা নাম যখন মনে আসে না ওনলি দেন আমার ঐ প্যান সেক্সুয়ালিস্ট ফ্রয়েডের কথা মনে পড়ে।

মিথিলের এই বিষয়ে আগ্রহ এতই কম যে, মুখে আগ্রহ দেখালেও না শোনার চেষ্টা করে।

—এইট্টি ফাইভের এন্ডে যখন মস্কো গেলুম, বুঝলে মিথিল, আই সেন্সড সামথিং। কোথায় একটা কী যেন নেই—ঐ যে, মোটা একটা ফেক স্টুপিড মাঝে মাঝে আসতো না, কোমারভ নামে, ওটাকে আমি বলেওছিলাম। কিন্তু ভিজে ফুটবলের মতো মাথা। বলে কী হবে?

—সরোজদা, আমার প্রব্লেমটা....

—ও বয়, আমি তোমার প্রব্লেমটাই ভাবছি। কিন্তু ভাবার চেষ্টা করছি একটা ব্রডার পারস্পেকটিভে, লাইক আ টপিকাল, আনরিপেন্টান্ট মার্কসিস্ট....দ্যাখো মিথিল, সেই কবে, কোন্ কালে ব্রিফল্ট, ফ্রেজার পড়েছি, একটু না উল্টোলে...তবে....‘রক্তোৎসব...রক্তোৎসব...’ সরোজদা

চোখ বন্ধ করেন। বন্ধ চোখেই হাত বাড়িয়ে নিজের গেলাশটা তোলেন, চোখ খোলেন, গেলাশটি ফাঁকা করেন, রাখেন, সিগারটি নিয়ে ধরান এবং বলেন,

—এখনই, অফ হ্যান্ড, মনে পড়ছে থার্টিনথ্ ও ফোর্টিনথ্ সেঞ্চুরির ফ্ল্যাজেলান্টদের যারা নিজেদের শরীর ক্ষতবিক্ষত করত। বলত বিশ্বের পাপ তারা নিজের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দেবে। ইলেভেনথ্ সেঞ্চুরিতে বেনেডিকটাইন মনাস্টারিগুলোতে রিফর্ম, হিলডে-ব্রান্ড আর দামিয়ানির মুভমেন্ট...এক সময় ইতালিতে যত প্লেগ ততই ঐ ফ্ল্যাজেলান্ট—এদের দলে স্রেফ পাণ্ডারা নয়, পাঁচ-ছ বছরের বাচ্চারাও থাকত...

সরোজদা চুপ করে থাকেন। ঘরের মধ্যে সিগারের ধোঁয়ার মাতোয়ারা গন্ধ। মিথিল চুপ। সরোজদা এবার ঘুমের মধ্যে কথা বলেন,

—ব্যাবিলনের একটা ফেস্টিভাল ছিল, সাচিয়া, এতে একটা চোর বা ক্রিমিনালকে রাজার পোষাক পরিয়ে তিনদিন রাজার মতো রাখা হতো, তারপর মেরে ফেলা হাতো। বারাব্বাস হয়তো তাই ছিল। তুমি, একবার, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে কনিবিয়ের-এর 'দা হিস্টোরিকাল ক্রাইস্ট'-টার খোঁজ নিও তো।

মিথিল অনেক রাতে বাড়ি ফিরে স্নান সেরে, খেয়ে, সবে শুয়েছে এমন সময় দরজায় টোকা মাসিমণির।

pathagar.net

—তোর ফোন।

মিথিল ফোনটা যখন তুলেছে তখন সে ঘুমোচ্ছে। সরোজদার গলা।

—মিথিল! ঐ স্কাউন্ড্রেলটার নাম মনে পড়ে গেল। আলেকজান্দার ইয়াকোভলেভ। কী, ঘুম থেকে তুললাম নাকি!

—না, না, এখনও খাই নি।

—আচ্ছা, দেন গুড নাইট। হ্যাভ এ গুড স্লিপ।

মিথিল রিসিভার নামিয়ে রেখে টলতে টলতে ঘরের দিকে যায়। মাসিমণি বলেন,—কে রে? এত রাতে তোকে ডাকছিল? মিথিল জড়ানো গলায় বলে,

—একটা ছাগল। স্টুপিড একটা। আর টাইম পেল না।

—ছি মিথিল, আমি শুনলাম বয়স্ক মানুষের গলা। তাঁকে ছাগল স্টুপিড তুমি কক্ষনো বলতে পারো না।

—পারি না আবার কি! বলা তো হয়েই গেছে।

—আঃ মিথিল!

—সরি মাসিমণি।

লোকজন হালকা হয়ে যাওয়ার পরে অভিমান্য আর এক বোতল মাল এনেছিল। সঙ্গে খোলসে মাছের ঝাল। ফুরফুরে হাওয়ায় উঠোনে বসে ভোগী মিথিলকে বলেছিল,

—আপনারা শিক্ষাত লোক। কত খবর জানেন। দেশ মানুষ সব রসাতলে গেল। এ চললি দেখে নেবেন ঐ বাবুও থাকবে না আর এ গরিব গুরবোও থাকবে না। সব বেবাক লোপাট হয়ে যাবে। আরে বাপের জন্মে শুনেচেন—লোক ভাল হবার জন্যে ডাকাতি ছেড়ে দেচে—তারে তেরাত্তির যেতে না যেতে শালা পুলিসদারোগা এসে খোঁচা মারতেচে—কিরে শালা! ধম্মপুত্তুর হলি নাকি! ওঠ, ওঠ ব্যাটা, কাজে বেরো। শুনেচেন কখনো? এই হলো ঘোর কলি। ঘরে ঘরে দেখ পোয়াতি মেয়ে ফলিডল খেয়ে মরতেচে, ধস্‌সন হচ্ছেন, আর ঐ গুয়োর ব্যাটা মদ্দগুলো মদ-গ্যাঁজা ছেড়ে এখন সব টেবলেট খাচ্ছে! এ কতদিন চলবে। অপঘাতে মরতেচে বলে অশরীলীর সংখ্যা কত বেড়ে

গেছে হদিশ করা যায় না—ও আমরা বুঝতি পারি—হল্লাভূত, যক, কন্ধকাটা, জলাবুড়ি, একনিড়ে, গুমো, পেঁচো, গলায় দড়ে—ওঃ সে যে কী কাণ্ড কী বলব আপনারে—আর এই যে নিমগাছটা দেখচেন—নজর করে দেখুন—জোর হাওয়া দিল তো অদ্ধেক গাচে পাতাডাল নড়ে, বাকি অদ্ধেক থির হিমাঙ্গ....'

—কেন?

—জিন বসে আচেন যে। জিন থাকলি অমনতরো হয়। আর ঐ শরীল তো শুধু নিমগাছে নয়, জাম, জামরুল, প্যায়রা ছেড়ে একন বাড়ি, ঘর, সহর, রেল, দেশ সব হাতড়ে বেড়াচ্ছে। বাবু বলবো না, নোক—এই নোক যে কি ধম্মঘাতক হয়েচে সে তো বাবু আপনি জানেন—ভাবতেচে সগ্‌গ মত্ত সব কাঁইপে দিচ্চি, ওদিকে নিজির পোঙায় ভগন্দর—তুই শালা করে কম্মে ফেঁদে বসলি সুপুরির কারবার ওদিকে তোর বৌ-বালবাচ্চা পাচার হয়ে গেল ডায়মন্ডহারবার—শেষমেশ তোর হলোটা কী? কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না—সব ঠিক করে দেব, একবার মুক্তি পাই। সব সেরে দেব। আপনার সঙ্গে বাবু একটা কতা ছিল। বিরেতে। ফাঁকায়। কাকপক্ষীও যেন না শোনে। একটা কতা ছিল।

অভিমান্য উঠে দাঁড়ায়। তার বেশ নেশা হয়েছে। ভোগী তাকে বলে, 'আবার তুমি উঠলে কেন। তুমি বসো। বসে বসে খাও। আমি সেই ফাঁকে বাবুর সঙ্গে গুপ্তকতাটা সেরে আসি।'

নেশার ঝোঁকে আকাশ তারায় তারায় সরগরম। মিথিলের অ্যাডিডাসের 'স্ট্যান স্মিথ' মডেলের টেনিসজুতো হোঁচট খায়। মিথিল সামলে নেয়। হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়া হাওয়া-পাতায় বাতাসের শব্দ মহানিম। তার তলায় দুজনে দাঁড়ায়।

—বাবু, কথাটা এই যে, একবার শিশুকালে বাপ মা-র হাত ধরে কলকাতা গিয়েছিলাম। সেবারে বাবু আমাদের সব জমি সমুদ্দুরের বানে নোনাফ্যানা হয়ে গিয়েছিল। কদিন ভিক্ষে করে হেই বাবু, দেই বাবু করে গেরামে ফিরে এলাম। কিছু স্মরণে নেই। তা আমার বাবু বড় শখ মিত্যু হওয়ার আগে একবার কলকাতা দেখব। দেকাবেন বাবু। দেখে নিয়ে আমি চলে যাব।

—কোথায় যাবে?

—সমুদ্দুরের পাড়ে। যেখানে আমার মুক্তি হবে।

ভট্‌ভটিতে মিথিল। উড়ছে তার আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের মতো চুল। সিগারেটের ফুল্‌কি উড়ে জিন্‌সের জ্যাকেটে লেগে নিভে যায়। ভট্‌ভটির খোলে কয়েকটা শুকনো শামুকের খোলা। দূরে ডাঙা। টুথব্রাসের রোঁয়ার মতো গাছখানা। ফেনামুখে ঘোলাজল দাগ টানে জলে। ভট্‌ভটির একটু দূরেই জলে ছোট ছোট ঢেউ। কুমির কামটের আড্ডা। ভোগী বলেছে শেয়ালদায় নেমে ঠিক চলে যাবে। মিথিল সিগারেট প্যাকেটের ভেতরের কাগজে ব্লক লেটারে ঠিকানা দিয়েছে। ট্যাক্সিভাড়াও।

বম্বের বেশ কয়েকটা কোম্পানিতে রাজের শেয়ার অ্যাপ্লিকেশনের অনেকগুলো টাকা আটকে ছিল। চিঠিচাপাটি চালিয়ে রিফান্ড মেলে না। তখন রাজ টাকা আনতে বম্বে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল মিথিলকে। ওরা ছিল ভাণ্ডুপে। রাজ-এর এক বন্ধুর বাড়িতে। মিথিল রাজকে বোঝে কিন্তু ওর অবাক হওয়াটা যায় না। চব্বিশ ঘন্টায় ওর মাথায় টাকা ঘুরছে। এই তো সেবার, ইউনিট ট্রাস্টের মাস্টারগেইন নিয়ে খুব হৈ চৈ যখন, রাজ এসে মাসিমণিকে বলে কয়ে, প্রায় জোর করে, কুড়ি কুড়ি চল্লিশ হাজারের মাস্টারগেইন করালো। মিথিলকে বলবে—কিরে মাস্টারগেইন সাড়ে আটের ওপরে উঠছে না বলে ঘাবড়াচ্চিস? সাত বছরের মামলা দেখবি তুই গোল্ডমাইন মেরে দিবি। মিথিল কিছুতেই বোঝাতে পারে না যে, ঐ চল্লিশ হাজার মায়ের ভোগে গেলেও মিথিলের কিছু যায় আসে

না। বলে লাভ নেই। কারণ রাজের পক্ষে এটা ভাবাই সম্ভব নয় যে, সারক্ষণ কেউ তার মতো টাকার ধান্দা করছে না। এই মিথিল, ক্লাসিক ফিনান্সে কিছু টাকা থাকলে রাখ্না। শেয়ার কেনো বস্, মার্কেট ইকনমি এখন ফ্লারিশ করবে, ও হরশদ ফ্যাক্টর একটা টেম্পরারি ব্যাপার, কয়েকটা ব্লু-চিপ, কয়েকটা দারুণ নতুন কোম্পানি, এক্সাইটিং ফিউচার—এখন বাকিটা হচ্ছে তোর বুদ্ধির দৌড়—ফ্লোট গ্লাস লড়ে যাও, মালটার ফিউচার সলিড, হোটেল, ইয়েস, টিক উড তৈরির ফরেস্ট, নো, কাল দেখবি সুন্দরলাল বহুগুণা ঢুকে পড়েছে, এসি রুফিং শিট, চলতে পারে। সিমেন্ট, চলো ঝাড় নেই, আর টাকা জিনিসটা জানবি লড়াবার জিনিস, লড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো, অ্যাঃ টেনশন, ও শালা জি-সেভেনেরও টেনশন আছে, মিথিল, আজ তোকে একটা নতুন জায়গায় নিয়ে যাবো—কার বাজার...ওফ্...একটা ভলভো, বুঝলি, গত মাসে কুট্টির হাতে এসেছিল—আমার পকেটে ইয়োইয়ো, তা না হলে একটু কাজ করিয়ে সিওর একটা ব্রয়লার পেয়ে যেতাম—চল্—দেখবি গাড়ি হাত বদল করছে...বৌ-এর মতো...সোয়াপ...তোকে বলছি চল্...নাউ লিসেন, আমার নাম রাজ কিন্তু আমার লাইফে কোনও মেরা নাম জোকার নেই, ববি, রিপিট, ববি, এই মিথিল সেই মেয়েটা কোথায় রে...

—কে?

—মিমি!

—ও মিমি। মিমি মিমির মতো আছে।

—তার মানে মিথিলের মতো নেই?

—কার বাজার! বাওয়াল ফাওয়াল হবে না তো? মানে বেশি রাত্তির। কাল, পরশু আমার ঘাড়ে অনেক কাজ।

pathagar.net

মাঝারি মাঠ ঘিরে চড়া আলো। গাড়ির ছাদগুলো সেই আলোয় চকচক করছে। লোকের ভিড়ও রয়েছে কিন্তু কম। ঘাড় মোটা মাড়োয়ারি, সঙ্গে ঘোমটা দেওয়া বউ, দুটো বাচ্চা—এদের রাজের বন্ধু বুলকু তার মারুতি জিপসিতে লাগানো আর. পি. এম. মিটারের ফাংশন বোঝাচ্ছিল। ওরা চলে যেতে বুলকুর সঙ্গে আলাপ হয় মিথিলের।

—আজই প্রথম এলেন?

—হ্যাঁ, এই রাজটা ধরে নিয়ে এল।

—একটু ভাল যাচ্ছে আজকে। বোধহয় গরম বলে।

বুলকু গত হিমালয়ান র‍্যালিতে নেভিগেটর হয়েছিল। মিথিলকে বলল পরে একদিন গল্প শোনাবে। দুবার কলকাতা-জামশেদপুর উইনিং টিমে ছিল। মাইন্ড ইট, র‍্যালি ইজ নট রেসিং—বুলকুর কথাটা মনে ধরে যায় মিথিলের। মাঠের পাশে একটা ছাউনি—বাঁশ, কাঠ আর তেরপল। ওখানে কাগজপত্র, ব্লু বুক এইসব নিয়ে কাজ চলছে। ভাল স্পট লোনের ব্যবস্থাও আছে। বেশ একটা বিদেশ-বিদেশ ভাব।

গাড়ির মালিকরা নিজের গাড়িকে পোষা বাঘের মতো হাত বুলিয়ে আদর করছিল। কনটেসা, ১১৮ এন. ই. ঝকঝকে নতুন অ্যাম্বাসাডর নোভা। ফিয়াটের সাউথ ইন্ডিয়ান মালিক এই পাঞ্জাবি ভদ্রলোককে বোঝাচ্ছিল গাড়িটা মাত্র আঠেরো হাজার কিলোমিটার চলেছে এবং কোথায়? বাঙ্গালোরে। সেখানে রোড কন্ডিশন দারুণ ভাল। তার তুলনায় কলকাতা! গাড্ডা আর হাম্প। বুলকুকে সুন্দর একটা মেয়ে জিজ্ঞেস করে—বুলকুদা, এখনও র‍্যালি করছেন। বুলকু একগাল হাসে। ঐ টুকটাক। নতুন, পুরনো মডেলের মারুতি। একটি ঘষা সাদা ব্যাকলাইট নিয়ে পেছনে গড়ায় এবং মিকি-মাউসের মতো গলায় ইংরিজি ঘোষণা শোনা যায় যে, সাবধান, গাড়িটি ব্যাক করছে। কার

স্টিরিওতে সুমনের গান—মন খারাপ করা বিকেল মানেই মেঘ করেছে...মিথিলের ভোগীর মুখটা মনে পড়ে যায়।

ছাউনির তলায় নড়বড়ে টেবিল। ভাড়া করা ফোল্ডিং চেয়ার। তাতে বসে গোরিলার মতো বিশাল চেহারার একটি মানুষ অনেক, অনেক একশ টাকার নোট গুনছিল। লোকটাকে দুপাশ থেকে দুজন ঘিরে আছে। একটা মোটা আধবুড়ো লোক। সে ডানদিকে। বাঁদিকে একটা বাঁটকুল। কুৎকুতে চোখ। চুল ছাঁটা। দেখলেই মনে হয় অ্যান্টি-সোশাল। মিথিলদের দলটা ঐ টেবিলের দিকে এগোয়। লোকটা কি একটা বলে যাচ্ছিল একটানা। কাছে যেতে লোকটা বুলকুকে দেখে হাসল এবং মিথিল দেখল সে সোনালি চশমার মধ্যে চোখ বন্ধ করে আছে অথচ একটানা বলে যাচ্ছে—খুব জোরে নয়—মিথিল আরও কাছে এলে বুঝতে পারল লোকটা চোখ বন্ধ করে থাকলেও তার হাতদুটো টাকা গুনে যাচ্ছে এবং যেটা সে বলে যাচ্ছে সেটা মিথিলেরও খুবই চেনা, যদিও ওরকম অনর্গল মুখস্থ নয়—এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যান্ড—হু ইজ দা থার্ড হু ওয়াকস অলওয়েজ বিসাইড ইউ?/হোয়েন আই কাউন্ট, দেয়ার আর ওনলি ইউ অ্যান্ড আই টুগেদার/বাট হোয়েন আই লুক অ্যাহেড...টাকা গোনা চলতে থাকে। মিথিল রাজের দিকে তাকায়। রাজ টাকা গোনা দেখছে। লোকটা সাদা সার্ট আর চকোলেট রঙের ট্রাউজার্স পরা। চেহারাটা বিরাট হলেও মুখটা শিশুর মতো। বেবিফেস। বুলকু মিথিলের হাত টেপে।

কলিং টাওয়ার্স
জেরুসালেম এথেন্স আলেকজান্দ্রিয়া
ভিয়েনা লন্ডন
আনরিয়্যাল

pathagar.net

টাকা গোনা শেষ হয়ে আসে। কবিতাও। ক্যাসিনোতে জেমস বন্ড যেভাবে নোটের তাড়া জিতে নেয় অনেকটা সেইরকম। লোকটি বান্ডিলটি রবারের গার্টার দিয়ে বেঁধে ফেলে। এবারে বোঝা গেল চেয়ারে ওর কোট ঝোলানো ছিল। তার ভেতরের পকেটে টাকাটা রেখে কোটটা পিঠের ওপরে ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

—বুলকু, আমি একটা নতুন শ্লোগান চালু করেছি। এই বছরটা ভ্যালিড থাকবে—ইয়ার অফ দা স্ক্যাম!

—বলো বস্, তোমার শ্লোগান যখন তখন তো শুনতেই হবে...

—জোরে জোরে বলতে হবে, বুকে হাত দিয়ে, হাম সব চোর হ্যায়!

লোকটার দুপাশে যে দুজন ছিল তারা বলে ওঠে হাসতে হাসতে—হাম সব চোর হ্যায়!

—আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। গৌতমদা। রাজকে তো চেনেন। এ হল রাজের বন্ধু মিথিল।

—মিথিল। ওয়েট ওয়েট। মিথিল—তুমি ডিবেট করতে না?

—একসময়।

—একসময়। তারপর দুঃসময় এসেছিল। সে খবরও জানি। যাইহোক, তোমরা যদি দু মিনিট অপেক্ষা করো তাহলে সন্ধেটা এই খচড়াগুলোর থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে একটু ভালভাবে কাটানো সম্ভব। ঐ যে লোকটা, পাঞ্জাবি পরা, হাত-পা নাড়ছে—ওকে একটা চড় মেরেই চলে আসব।

গৌতমদা এগিয়ে যায়। ওর সঙ্গের লোক দুটোও যায়। মিথিল বুলকুর দিকে তাকায়।

—সত্যি সত্যি মারবে নাকি?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—কে ভদ্রলোক?

—গৌতম দা! বস্ হচ্ছে গ্লোরিয়াসের পি. আর. ও.। ওঁর স্ত্রী হচ্ছেন রুবেনা রায়। ফিল্মমেকার।

রুবেনার নাম মিথিল কেন, সকলেই জানে। রাজ বলে, 'গ্লোরিয়াস, অসম্ভব ফাস্ট গ্রো করছে। এখন তো স্রেফ ফিনান্স নয়, রিয়্যাল এস্টেট, হোটেল, প্ল্যান্টেশন, তারপর ঐ সার্ভিস সেকটর, সর্ট অফ আ মিনি-মাল্‌টি-ন্যাশনাল।'

ওরা দেখল গৌতমদা লোকটাকে চড় মারল এবং সে কিছু বলল না। কী বলল লোকটাকে শোনা গেল না। ফিরে এল।

—মারতাম না। মারিও নি। একটু হিউমিলিয়েট করলাম। ব্যাটা এক নম্বরের জোচ্চোর। একটা টাইমে ডোনেশনের জন্যে কি জ্বালাতনই না করত। আসলে ওর একটা ডুবিয়াস ভোলান্টারি অর্গানাইজেশন আছে। আজকাল তো ওটাই ভাল ব্যবসা—নরসেবার নাম করে নরবলি চালিয়ে যাও আর ফরেন এড তো আছেই। যাইহোক, বালকেরা সরি। রাজু, একটু মোটা হয়েছিস মনে হচ্ছে।

—প্যান্ট ঢিলে হয়ে যাচ্ছে গৌতমদা আর তুমি মোটা দেখছ?

—ও তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন মিঃ বসাক। জিরো জিরো সেভেন ডিটেকটিভ এজেন্সির সিকিউরিটি অফিসার এবং এই পদার্থটি হচ্ছে ওদেরই প্রোভাইডেড বডিগার্ড কাম ড্রাইভার বসন্ত। আমার রক্ষণাবেক্ষণ, এই প্রেশাস অ্যানিমালটিকে জ্যান্ত রাখার দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। যাইহোক এবার তাহলে আমরা চলুক।

বুলকু বলে, কোথায়?

—ওহ, ডু নট আস্ক, 'হোয়াট ইজ ইট?' লেট আস গো অ্যান্ড মেক আওয়ার ভিজিট। শোনো, বীরগণ, বাইরে একটি স্টেশন ওয়াগন দণ্ডায়মান যা নিয়ে বীরাঙ্গনা রুবেনা শুটিং-এ যান সেটি-চড়ে আমরা নির্জন কোনও জায়গায় গিয়ে একটু কাব্যচর্চা বা গান করতে পারি এবং তৎসহ টিনবন্দি হাইনেকেন ভাল্লুক সেবন! এই প্রস্তাব।

থেকে, থেকে, নির্জন হাওয়ায়
শোনা যায় রণধ্বনি
হাম সব চোর হ্যায়!

রাজ গেল না। জয়পুর থেকে মার্বেল টাইল-এর এক সাপ্লায়ার এসেছে। তার সঙ্গে দেখা করবে।

—ঐ কর। টাকা, টাকা করেই গেলি।

—বাঃ গৌতমদা, গুনে গুনে অতগুলো টাকা এক্ষুনি যে পকেটে রাখলে!

—রাখলাম ঠিকই কিন্তু ভারত সরকারের জন্যে। রুবেনার দুষ্টু বাবা গুণবতী মেয়েকে একটি হাতি উপহার দিয়েছিলেন ইন দা শেপ অফ আ স্ট্যান্ডার্ড টু থাউজেন্ড। সেটাকে ঝেড়ে দিলাম। নাউ, নাউ ডোন্ট ইন্টারাপ্ট—এই টাকাটা দেখালে রুবেনা এন. এফ. ডি. সি-র লোন পাবে। বুঝেছো চাঁদু?

—রুবেনাদি তো এন. এফ. ডি. সি-র থেকে পুরো ফিনান্সই পেতে পারে। আফটার অল শি ইজ এ সেলিব্রেটি!

—দ্যাখ ভায়া, ওখানেও বিস্তর কলকাঠি, কোটারি, ক্লিক—যে কারণে এখন অবদি ও যা কাজ করেছে একটাও সরকারি টাকায় না। তবে থিংস মাইট চেঞ্জ....

বুলকু ওর মারুতি-জিপসি নিয়ে স্টেশন ওয়াগনের পেছনে চলল। মিথিল উঠেছিল গৌতমের গাড়িতে। ক্যাসেটে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজে। গীতা ঘটকের—এখনও গেলনা আঁধার...গৌতম বলে,

হোপলেস সিচুয়েশন। এই নিয়ে জানিস মিথিল রুবেনার সঙ্গে আমার ঝগড়া—আজকে এই অল পারভেডিং ঐ অ্যামেরিকান শুওয়ের বাচ্চাগুলোর পপ কালচারের মধ্যে কোনও ভাল কাজ কি সম্ভব? টোটাল রিকল, রোবোকপ, ডাই হার্ড, ম্যাডোনা, ঐ জঘন্য হেভি মেটাল ব্যান্ডগুলো—সব, সব ভায়োলেন্স, সেক্স—বদমাইসির চূড়ান্ত। আর থার্ড ওয়ার্ল্ড তাই গিলছে...রুবেনা বলবে এটা পাসিং ফেজ। আই কান্ট অ্যাকসেপ্ট দ্যাট। কর্পোরেটের চাকর হতে পারি বাট বাট আমার একটা সোল অ্যান্ড মাইন্ড আছে...লিখব, বুঝলি মিথিল—এই মিডিয়া কালচার নিয়ে লিখব...

মিথিলের গৌতমদাকে বেশ ভাল লেগে যায়। দারুণ ডায়নামিক। আলফাল কথা বলছেন না একটাও।

—আসলে কি জানিস! আর এক রাউন্ড গ্লোবাল লড়াই হবে। ক্যাপিটালের সঙ্গে হিউমানিটির লড়াই। মার্কসবাদ নামক শর্ট-লিভড্ রিলিজিয়নটি যা পারল না। ডু ইউ নো একসময়,—যখন এস. অফ. করতাম তখন ওঃ কত স্বপ্ন ছিল। ফাক্স্। হাম সব চোর হ্যায়। দুনিয়াটা কে চালাচ্ছে বল্‌তো? ক্লিন্টন, কোল, মেজর, নাকি ঐ জাপানি লিডারগুলো—ইমপসিবল নেম্‌স? ওরা? ঘেঁচু। দুনিয়াটা চালাচ্ছে—জি. এম., আই. বি. এম., পেপসিকো, জেনারেল ইলেকট্রিক, কাইজার, শেল, ফোক্‌সভাগেন, এক্সস্কন—এরকম কয়েকশো মাল্টিন্যাশনালস। ভাবতে পারিস ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট বলছে, 'কনসিউমার ডেমক্রেসি ইজ মোর ইমপরট্যান্ট দ্যান পলিটিকাল ডেমক্রেসি', আই. বি. এম-এর এক শালা ফতোয়া ঝাড়ছে দুনিয়ার সব পলিটিকাল স্ট্রাকচার পচে গেছে, এগুলো ব্যবসার রাস্তায় বাধা। দুনিয়ার মানুষ মেনে নেবে? ছিঃ ভাবা যায় না।

—কী করবে বলো!

—লড়বে। না পারলে মরে যাবে। ইন প্রোটেস্ট মরে যাওয়াও ইজ্জতের। বসন্ত, ফাঁকা জায়গায় সাইড করে লাগাও।

ইন প্রোটেস্ট মরে যাওয়াও ইজ্জতের। কথাটা বড় মনে ধরে মিথিলের।

ইস্টার্ন মেট্রপলিটান বাইপাসের ধারে দুটি গাড়ি। আকাশে কলকাতার চাঁদ। হাওয়ায় হাওয়ায় মাঝে মাঝে চামড়ার কারখানার গন্ধ আসে আবার হাওয়ায় হাওয়ায় চলে যায়। ভেড়ির জলে ছোট ঢেউ। বসাক-বসন্ত অনতিদূরে ঘাসে থেবড়ে বসে রাম খাচ্ছে ভিজে ছোলা দিয়ে। একথা সেকথা বেশি না হবার আগেই মিথিল বলে, 'আপনি এক্ষুনি বললেন না যে, ইন প্রোটেস্ট মরে যাওয়াও ইজ্জতের। তাহলে একটা সত্যি ঘটনা আপনাকে একটু বলি গৌতমদা। পুরো ঘটনাটা এখনও ঘটে নি। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই ঘটবে...'

ভোগীর কথা বলে মিথিল। ভোগী আসবে। কলকাতা দেখবে। তারপর...অভিমান্য যে একজন বধকর্তার কথা বলেছিল...মুক্তি...

ক্যানের পরে ক্যান বিয়ার শেষ হয় এবং সেগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দূরে ফেলা হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আংটা ধরে টেনে ছিঁড়ে নতুন টিন খোলা হয়। মার্লবোরো সিগারেটের প্যাকেট গৌতমদা খুলে সামনে রেখে দিয়েছে। বসাক এসে দুটো নিয়ে যায়।

—এই হারামী দুটোকে প্রোভাইড করেছে গ্লোরিয়াস। বুঝলি মিথিল। একটা রিটায়ার্ড পুলিশের মাল, অন্যটা খালাস পাওয়া লাইফার। মার্ডার করেছিল। গ্লোরিয়াস যখন রিয়াল এস্টেটে ঢুকলো, এখানে সেখানে মাশরুম প্রোমোটারদের সঙ্গে খটাখটি—তখন ব্যাটারা অনেক ব্রেনস্টর্মিং করে বের করল যে, আমাদের জন্যে সিকিউরিটির দরকার—জ্যোতি বোসদের মতো 'জেড' ক্যাটিগরি নয়, আমার মতো হরিদাসদের জন্যে ছোটহাতের 'এ'। অতএব বলরাম ও সুভদ্রা—মধ্যে আমি নুলো জাগারনট। ভালগার। অতলান্তিক ভালগারিটি। এর মধ্যে ইম্যাজিন—ভোগী...

বুলকু তখন অবিরাম বিয়ার পানের ফলে অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক তাড়নায় দূরে গেছে যদিও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে...আকাশে কলকাতার জাল চাঁদ মেঘ ঢাকা দিল বলে...গৌতমদা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

—ভোগী...তুই কী শোনালি মিথিল...ভোগী...ইন প্রোটেস্ট ...ইন প্রোটেস্ট...

মিথিল ইতস্তত বোধ করে। সে কি বলে ফেলে ভুল করেছে?

হ্যাঁচকা টানে আর একটা বিয়ারের ক্যান খোলেন গৌতমদা। ছিটকে, ভুসভুসিয়ে ফেনা বেরোয়। মার্লবোরো জ্বালেন।

—মিথিল! মিথিল! সেই বৃদ্ধ ইহুদি বুদ্ধিজীবীর নাম আমার মনে নেই যিনি জার্মান গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন, লিখে রাখো। লিখে রাখো। মিথিল, হতে পারে অশিক্ষিত, ইন আওয়ার সেন্স, হতে পারে উন্মাদ—কিন্তু এটা আমাদের ডিউটি যে ওকে ইমমরটালাইজ করতে হবে....তুই, আমি জানলে হবে না মিথিল...কনসিউমাররা জানুক, কর্পোরেট জানুক, মিথিল...তোর মনে হয় নি মিথিল...ঘটনাটা কেউ জানবে না এ তো ভাবা যায় না...আই মিন উইদাউট হার্টিং হিজ ভ্যালুজ...

—কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব গৌতমদা?

বুলকু কিছু না বুঝেই এসে বলে. 'কী সম্ভব নয়? শালা পাতি গাড়ি চার থাবড়ায় ফর্মূলা কার হয়ে যাচ্ছে...'

—চুপ কর্ বুলকু! নাউ লিসেন মিথিল...সবটাই চমৎকার ভাবে করা যায়। স্রেফ একটু বুকের পাটা দরকার।

গৌতমদা কোটের ভেতরের পকেট থেকে নোটের তাড়াটা বের করে বলেন, 'এত বড় একটা স্যাক্রিফাইস হবে আর আমি, শালা কর্পোরেটের গিনিপিগ গৌতম রায় ল্যাবার মতো বসে থাকব? এই টাকাটা একটা বেটার কাজে লাগুক। দরকার নেই রুবেনার ফিল্মের। কী হবে, আল্‌টিমেটলি, ঐ ছাতার মাথার ফিল্ম দিয়ে। কিছু এসে যাবে?'

—কী করবেন গৌতমদা?

—কী করব? এই টাকাটা রুবেনাকে দিয়ে বলব ইউনিক এই ইভেন্টের একটা ভিডিও ডকুমেন্ট তোলো, তুলে রেখে দাও ফর পস্টারিটি। পাপস্খালন করো। টাকা, ফিল্ম সব ভুলে নিজের বিবেকটাকে বাঁচাও। লোকটার, মানে ঐ লিভিং সেইন্টের ইন্টারভিউ নাও, ওর কথা শোনো...ওর সঙ্গে সঙ্গে যাও রাইট টু দা ব্লাডি অ্যান্ড গ্লোরিয়াস এন্ড...মিথিল...মিথিল...এই দ্যাখ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে...মনে পড়ছে ভিয়েতনামের মঙ্কদের সেলফ্ ইমোলেশন...নব্বই দশকে ওয়েস্টের মুখে এই ডকুমেন্ট হবে একটা দুর্ধর্ষ নক আউট ব্লো...এ তোমার তাও অফ ফিজিক্স নয়...এই হল ইস্ট...এই স্যাক্রিফাইস দেখে শেখো...

গৌতমদা আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। ফুঁপোতে ফুঁপোতেই জিজ্ঞেস করেন, 'ভোগী, কবে আসবে রে মিথিল?'

—আমার হিসেব মতো পরশু। তবে অন্যরকমও করতে পারে। বলেছিল যে, শহর দেখার বড় শখ।

—সে সব হয়ে যাবে। গোটা শহর আগাপাছতলা দেখিয়ে দেব। আসলে আমাদের রেডি থাকতে হবে। আর কীই বা আমাদের করার আছে বল্ নিখিল।

কলকাতার চাঁদটা তখন বাইপাসের আকাশে চাকতির সাইডগুলো ঘষে ঘষে ধারালো করে তুলছিল। হাওয়ায় নোংরাপচা গন্ধ। বসাক আর বসন্ত হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'জয় শ্রী থ্রি এক্স।'

এদিক থেকে গৌতমদাও চেঁচিয়ে উঠল,

—হাম সব চোর হ্যায়!

—জয় শ্রী থ্রি এক্স!

—হাম সব চোর হ্যায়!

গৌতমদা ও মিথিল ফোন নম্বর বিনিময় করে। গৌতমদার সেভেন ভিজিট। মিথিলদের এখনও হয় নি। ঘেমো হাতে দুজনে হাত মেলায়।

ভোগী ভাল খেলো না। আড়ট্যাংরার ঝাল দিয়ে অনেকটা ভাত সাপটেসুপটে খেলো। ঢক্ ঢক্ করে জল খেলো। কালো কালো সুন্দরপানা যে-বৌটি খাবার বেড়ে দিচ্ছিল তারই ঢেলে দেওয়া জলে মুখ ধুলো। কুলকুচির জলটা বেড়ার কোণে একটা জায়গায় ফেলল। তারপর পরনের ময়লা কাপড়ে হাত মুখ মুছে বলল, এবারে ও পুকুরে, উত্তরের পুকুরে নাইতে যাবে। উত্তরের পুকুর যার তাদের সঙ্গে এ বাড়ির দা-কুমড়ো সম্পর্ক। সেটা যদিও ভোগীর জানার কথা নয় তবু সে বলে, 'ঝোগড়া তো কি আচে? ভোগীর সঙ্গে কারো ঝোগড়া নি। চলো বলতিচি আবার তখন কথা কি!'

তিন-চারজন লণ্ঠন নিয়ে ভোগীর সঙ্গে সঙ্গে যায়। বড় বড় গাছের মধ্যে দিয়ে এঁকাবেঁকা পথ লণ্ঠনের দুলে ওঠা আলোয় উঁচু-নিচু লাগে। ভোগী হোঁচট খায়। একজন ধরতে যায়। ভোগী খ্যাক্ করে ওঠে, 'এই শালা, ধরবিনি তো! ভোগী ধরতেছে। হেলে ধরতি পারে না, কেলে ধরতি যায়। কেন হোঁচট খেলাম বল্ দিনি!'

ওরা চুপ করে থাকে।

—এইখানে এক শালী মেছোমাগী আর আঁতুড়ের মরা বাচ্চা...শালারা বড্ড অশৈল করতেছে...যত আঁদাড়ের ভূত...যাও যাও দিনি...অশৈল করতি নেই...যাও ...চলো। সরে গেচে।

উত্তরের পুকুর পাড়ে যেতে না যেতে রে রে করে মাছ-পাহারারা ছুটে আসে। 'কে? হেই খবরদার। কে?' ভোগী তখন কাপড় ছেড়ে ন্যাংটো হচ্ছিল। 'তোর বাবারে শালা!'

সঙ্গের লোকেরা মাছপাহারাদের ফিসফিস করে বলে। ওরা থতমত খেয়ে চুপ করে যায়। ভোগী জলে নামে। সাঁতরে চাঁদের ছায়া ভেঙে ভেঙে দূরে চলে যায়। কোথাও একটা মাছ লাফালো। ভোগী এত দূরে চলে যায় যে, দেখাই যায় না।

—বাপ রে!

হঠাৎ ডুব সাঁতারে এসে অন্ধকার জল থেকে মাথা বের করে। ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকায়। উঠে আসে।

—মিরগেলের বাচ্চাগুলো খালি কুট কুট করে কামড়াচ্ছে। কার সাধ্যি একটু থির হয়ে চান করে।

কাপড় পরে। তারপর ওদের বলে ফিরে যেতে কারণ ভোগী এবার চলে যাবে। যাবার সময় সেই কালো-কোলো সুন্দরী মেয়ের বরটিকে বলে যায় যেন দশ বছর বয়স অবদি বার বার ছেলের মাথার চুল ফেলে দেয়। ঘাড় মোটা হবে। রাতবিরেতে ভোগী বিদায় নেয়।

মিথিলকে স্টেশন ওয়াগন যখন বড় রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে গেল তখন সওয়া দশটা। এ রকম সময় মিথিল অনেক বার মিমির সঙ্গে দেখা করেছে। রাত এগারোটা অবধি থেকেছে। কখনও বাড়ির সামনে হেঁটে হেঁটে গল্পও করেছে। মিথিল এগোয়। মধ্যে দাঁড়িয়ে সিগারেট কেনে।

সেই রাতেই রুবেনার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা হয় গৌতমের। রুবেনা তখন ওর স্টাডিতে বসে নতুন ফিল্ম-এর স্ক্রিপ্ট করছিল। ওদের একমাত্র ছেলে বুবিন ত্রিবেণী একাডেমিতে পড়ে। গৌতমই রুবেনাকে স্টাডি থেকে টেনে বার করল। রুবেনা খুব কাজের মেয়ে। সেই রাত্তিরেই প্রথমে সে ভিভা ভিডিওর মালিক রূপেশকে ফোন করল—বিটাক্যান ভিডিও ক্যামেরা, সনি ভিডিও

pathagar.net

রেকর্ডার, বিটাক্যাম ক্যাসেট, মাইক্রোফোন, হেডফোন, মনিটর, পোর্টেবল জেনারেটর, মাল্টিটুয়েন্টি লাইট—এই সব কিছুর দুটো সেট যদি নেয় কী পড়বে জেনে নিল। কী রকম বুকিং আছে জেনে নিল। নিজে একটা ছোট্ট নিল আর একটা বড় হুইস্কি গৌতমকে দিল। এক ফাঁকে গৌতমের পিঠেও একবার কামড়ে দিল। তারপর এস. টি. ডি. করল বোম্বেতে—অনেকক্ষণ প্রমীলা মেহ্‌রার সঙ্গে কথা বলল। প্রমীলার সঙ্গে বি. বি. সি. চ্যানেল ফোরের খুব ভাল যোগাযোগ। তারপর আবার ফোন করল কলকাতায় সেই ছেলেটিকে যে বার্তোলুচ্চির সঙ্গে তাঁর শেষ ছবিতে কাজ করেছে। এরপর সি. ডি. প্লেয়ারে নরম ল্যাটিন বাজনা বাজিয়ে স্লিপিংসুট পরা গৌতম ও রুবেনা নাচতে থাকে। ঘরে তখন আলোও কম ছিল। ঢিমে তালে এই অবশ আনন্দময় নিরুদ্বিগ্ন নাচ বোধহয় তাদের খুব ভাল লেগে থাকবে। তা না হলে এঞ্জেল, সোর্ড টেল, গাপ্পি, গোল্ড ফিস—এরা সব একোয়ারিয়ামের একদিকের কাচের দেওয়ালে ভিড় করেছিল কেন?

মিথিলের কাছে সবটা শুনে মিমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। জল খেলো। মিথিলকে জিজ্ঞেস করল খাবে কিনা? মিথিল বলল, না, গৌতম রায়ের ইমপোর্টেড বিয়ারে সে টইটম্বুর। বরং একবার বাথরুমে যাবে। সেখান থেকে আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মিথিলকে অবাক করে দিয়ে মিমি ফেটে পড়ল।

—তুমি যে একটা কাওয়ার্ড, মাসির আল্লাদে গোল্লায় যাওয়া ক্যানারি বার্ড সেটা আমি কেন, সকলেই জানে। কিন্তু আমি জানতাম না যে তুমি, তুমি একটা, কি বলব, একটা পিম্প্।

—কী বলছ কী মিমি, কেন বলছ? হোয়াট হ্যাভ আই ডান?

—তুমি ভোগীকে বিক্রি করেছো...সেটা জানো না ভোগীকে তুমি ফোর্থ রেট ফিল্মমেকার রুবেনা রায়ের কাছে বেচে পয়সা নিয়ে....লজ্জা করে না তোমার...নিনকমপুপ!

—কোথায় পয়সা নিয়েছি দেখাও? কে পয়সা নিয়েছে?

—নাওনি, নেবে। সে তো একটা গ্রামের লোক—সে হয়তো মিসগাইডেড— যাই হোক না কেন তুমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলে? কী রাইট আছে তোমার? ভোগী কি তোমার প্রোডাক্ট যে, তুমি তাকে ইচ্ছেমতো বেচবে, বাঁদর নাচ নাচাবে!

—তুমি বুঝতে পারছ না মিমি—গৌতমদা ব্যাপারটা ফিল করেছে, এর মধ্যে কোনও বিজনেস বা মানি অ্যাঙ্গেল নেই।

—কচি খোকা! মাসি নাক টিপে দেয় আর দুধ বেরোয়। ন্যাকা! বদমাইশ! বিজনেস অ্যাঙ্গেল নেই। কোনও ইন্টারেস্ট ছাড়াই গৌতম রায় অফ গ্লোরিয়াস ফিনান্স অ্যান্ড ক্রেডিট ধেই ধেই করে নেচে উঠল?

—সত্যি মিমি, আমি কিছু বুঝতে পারি নি।

—দ্যাখো মিথিল, ইতররা যখন স্টুপিড সাজে তখন আরও অসহ্য লাগে।

—ননস্টপ আমাকে ইনসাল্ট করে ভাবছো খুব ভাল কাজ করলে? তুমি ভাবতে পারলে আমি ভোগীকে বেচে দিয়েছি?

—হ্যাঁ, খুব ভাবতে পারলাম। নাউ প্লিজ ক্লিয়ার আউট! আর কক্ষনো আসবে না, ফোনও করবে না!

মিমি কেঁদে ওঠে। মিমির বাবা, মা, কুকুর। স্তম্ভিত। মিমির মা বলেন,

—কী হলে তোর মিমি? কী হয়েছে বাবা?

—কী আবার হবে। আপনার মেয়ে বলতে চায় যে আমি, হ্যাঁ আমি হচ্ছি জুডাস ইসকারিয়ট। ফর থার্টি পিসেস অফ সিলভার...আমি চললাম। গুড নাইট মিমি।

মিমি চেঁচায়, 'হ্যাঁ, চলে যাও। আর কক্ষনো আসবে না।'

মিথিল গট গট করে বেরিয়ে যায়। রাস্তায় গিয়ে সে দেখেছিল যে সিগারেটের প্যাকেটটা সে মিমিদের বাড়ি ফেলে এসেছে। গুলি মারো! আর এক প্যাকেট সিগারেট কেনে। একটা বের করে জ্বালায়। টাকার ধান্দা করলে মিথিল উচ্চ মাধ্যমিক লেভেলে কয়েকটা টিউশনি নিয়ে চুপ করে থাকতো না। কর্পোরেটে ধান্দা করলে মিথিল অনেক আগেই ভিড়ে যেতে পারত। হয়তো ড্রাগ আমার বোঝার ক্ষমতাটা কমিয়ে দিয়েছে। এটা ভাবলে মিথিলের ভয় হয়। হাম সব চোর হ্যায়। আমি চোর নই। মিমি যাই বলুক। মিথিল বিড় বিড় করে বলেছিল, ভোগীর সঙ্গে আমিও শালা চলে যাবো। যা হয় হোক। ট্যাক্সি!

সেই রাতে পৌনে একটা আর একটায় দুবার ফোন বেজেছিল। বেজে বেজে থেমে গিয়েছিল। মিথিল শুনেও যায় নি। মাসিমণি ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন সে রাতে, তাই শুনতে পান নি। প্রথম ফোনটা গৌতমদার। পরেরটা মিমির।

সকালবেলা দরজায় ধাক্কা দিয়ে ভোগী উপস্থিত। বাড়ির কাজের লোক অনন্ত সবিশেষ বিরক্ত হয় দরজায় বেল না দিয়ে ধাক্কা দেওয়ার জন্যে। সে গিয়ে মাসিমণিকে ডেকে আনে। একমুখ দাড়ি, একমাথা চুল, নোংরা কাপড়-জামা, সঙ্গে একটা পুঁটুলি অথচ হাসি হাসি মুখ, 'আপনি তো মাসি। ঠিক চিনেচি। এই যে বাবুর নিজির হাতে লেখা নাম ঠিকানা!'

সত্যিই তো মিথিলেরই হাতের লেখা। মাসিমণি ভোগীকে বাইরের ঘরে নিয়ে যান। বসতে বলেন। ভোগী সোফার ওপরে বসতে যায়, তারপর কি মনে করে নীচে জড়োমতো হয়ে বসে। গুনগুনিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে পকেট থেকে দেশলাই বাক্স বের করে, তার মধ্যেই বিড়ি ছিল। এর মধ্যে কয়েকবার সে অনন্তর দিকে তাকিয়ে হেসেছে। অনন্তও একটু মজেছে। হঠাৎ তার মনে পড়ায় টেবিল থেকে অ্যাসট্রে এনে ভোগীর সামনে রাখে।

—এতে ছাই ফেলো। কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—এলটা আবার কে? যাওয়া হচ্চে। বুঝতি পেরেছেন? যাওয়া হচ্চে।

মিথিলকে মাসি ধাক্কা দিয়ে তোলেন, 'তোর কাছে একটা অদ্ভুত দেখতে লোক এসেছে। কাকে ঠিকানা দিয়েছিলিস?'

মিথিল লাফ দিয়ে ওঠে। 'এসেছে?'

তড়িঘড়ি ঘড়িটা পরে। দুদ্দাড় করে সিঁড়ি টপকে টপকে নামে। ঘরে ঢুকতেই ভোগী দাঁড়িয়ে ওঠে, একগাল হাসি। 'বাবু!'

মিথিল ভোগীকে জড়িয়ে ধরে।

—আর বাবুটাবু নয়। এবার নাম বলতে হবে। মিথিল।

—তা কী করে হয় বাবু!

—ঠিক আছে, মিথিল, মিথিলবাবু।

—মিতিলবাবু। ভাল হল। নামও করা হল। বাবুও বলা হল। তাহলে আপনি আমারে কী বলবেন?

—সেই তো। তোমার নামটাই তো জানা হয়নি।

—আমার নাম ভোগী। ঠিক নাম নয়। যেমন ধরুন বাঘ, মানুষ কুমীর—এইরকম বড় জাতের নামধারণ—ভোগী।

মিথিল মাসিমণিকে বলে, 'মাসিমণি। আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন একজন, কী বলব, সাধুসন্তের মতোই মানুষ, নাম হল ভোগী। এখন আমাদের কাছে কয়েকদিন থাকবেন।' মাসি নমস্কার করে। ভোগী প্রণাম করে।

—খুব ভাল মাসি বাবুর। মানে মিতিলবাবুর।

মিথিল বলে, 'জানো, আমাকে দেখেই উনি তোমার কথা বলেছিলেন। আর এই হল অনন্ত।'

—ওনার সঙ্গেতে আগেই পরিচয় হয়েচে।

মিথিল ভোগীকে নিয়ে ওপরে নিজের ঘরে যায়। ভোগীকে বসায়। বসিয়ে বলে, 'একটু, মানে তেমন কিছু নয়, ঝামেলা হয়ে গেছে, বুঝলে!'

—ঝামেলা মানে হুজজুৎ?

—হ্যাঁ, তোমার কথাটা বলে ফেলে...

—ছি, ছি, কী ভাবলেন তেনারা

—কী আবার ভাববে, তাদের মাথা ঘুরে গেছে!

—না গো মিতিলবাবু। ও মাথা ঘোরার মন্তর নয়। ও হল গে ঘুরঘুরি পোকার বাসা। ঘুরঘুরির গপ্পো জানো তো? মাটি খুঁড়তেছে, মাটি খুঁড়তেছে—কি না কেঁচো ধরবে। হঠাৎ শালা ঘুরঘুরির পাল বেইরে পড়ল...

ভোগী হা হা করে হাসে। মিথিলের ঘর দেখে।

—ভাল, কিন্তু আগোছালো। সংসার কল্লি ঠিক হয়ে যাবে।

—দূর, ওসব ঝুটঝামেলায় কে যাবে?

—তা বললি হয় নাকি। সংসার করা না করার সিদ্ধান্ত কি মিতিলবাবু ঠিক করবে?

ভোগীকে মিথিল স্নানে পাঠাল। শাওয়ার দেখাল। বালতিতেও জল ভরে দিল। তারপর নিজের একটা কাচা পাজামা, পাঞ্জাবি দিয়ে বলল স্নানের পরে পরতে। ভোগী কিছুতেই পরবে না।

—আরে বাবা, তোমার কাপড়চোপড় আমি সব রেখে দিচ্ছি। যাওয়ার সময় নিয়ে যাবে। এখন তো এটা পরো। আর দরকারও আছে। বললাম না একটু ঝামেলা হয়ে গেছে।

ভোগী বিড়িদেশলাই নিয়ে স্নানে ঢুকে যেতে মিথিল একটা সিগারেট ধরালো। ধরিয়ে, মাসিমণির ঘরে গিয়ে গৌতমদাকে ফোন করল। সিক্স ডিজিট থেকে সেভেন ডিজিটে নম্বর পেতে অনেক সময় বিস্তর ঝামেলা হয়। শেষ অবধি লাইন পায় মিথিল। বেজেই যায়। বেজেই যায়। ফোন তোলার শব্দ। গৌতমদার বাড়ির জানলায় কাক ডাকছে। শুনতে পায় মিথিল। ঘুম জড়ানো গলা। ইনিই কি রুবেনা?

—হ্যালো!

—এক্সকিউজ মি, একটু বেশি সকালেই ফোন করলাম। আমি একটু গৌতম রায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

—ও তো এখনও ঘুম থেকে ওঠে নি। আপনার নম্বরটা দিলে আমি ওকে রিং ব্যাক করতে বলব।

—শুনুন, ব্যাপারটার একটু আর্জেন্সি আছে। আমার নাম মিথিল, মিথিল চৌধুরি।

—ও! হ্যাঁ। আমি রুবেনা রায় বলছি। এক্ষুনি ডাকছি ওকে। কেমন?

—হ্যাঁ, প্লিজ!

আবার কাকের ডাক। গাড়ির হর্ন। সময় যায়। রিসিভার তোলার খচমচে শব্দ।

—হ্যালো, গৌতমদা। আমি মিথিল বলছি।

pathagar.net

—হ্যাঁ, বল্। এসেছে?

—সেইটাই গৌতমদা। আই অ্যাম রিয়্যালি সরি। আসলে ওরকম কিছু নেই। একটা কক্ অ্যান্ড বুল স্টোরি।

—হোয়াট! ইউ আর লাইং! মিথিল... একটানা চিৎকার করে গৌতম রায়...এদিকে যে দু সেট ভিডিও ইউনিটের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট হয়েছে...তোর এই কথাগুলো একটাও আমি বিশ্বাস করি না...নিশ্চয় তুই অন্য কারো সঙ্গে ডিল করেছিস...আমি শালা লোক চরিয়ে খাই...কোনও ডুবিয়াস ডিল করে লাভ হবে না...বসাক বসন্তকে দেখেছো, এবার চিনবে...ভোগী যদি আসে ওকে তুলে নিয়ে আসবো...গ্লোরিয়াসের লং—লং হ্যান্ড সম্বন্ধে কোনও ধারণা নেই...যেমন কুকুর তেমন মুগুর...গ্লোরিয়াসের ক্লাউট কাকে বলে এবার...ইট ইজ এ চ্যালেঞ্জ ইউ বাসটার্ড...

—গৌতমদা, আপনি বিশ্বাস করুন, ভোগী ফোগী সব আমার ব্রেন ওয়েভ...জাস্ট আ ফিগমেন্ট অফ ইম্যাজিনেশন।

সত্যি, মিথ্যে না বুঝলে গৌতম রায় হতো না। পেছনে শোনা যায় রুবেনার গলা—তুমি আমাকে একবার ফোনটা দেবে? ওকে, মিথিল...তুমি কারও সঙ্গে ডিল করে, আমার সঙ্গে এগ্রিমেন্ট ব্রেক করে পার পাবে না...নাউ, নাউ...বসাক ও বসন্ত...একজন রিটায়ার্ড অথরাইজড কিলার—একজন কনভিকটেড মার্ডারার ওদের কাজ হবে তোমাকে ট্যাকল করা—আরও আছে—মিথিল, লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোয়েশ্চেন ফর ইউ...

ক্রমাগত শাসানিতে মিথিল ঘাবড়ায় আবার রেগেও যায়।

—আপনি ফাল্তু বকবক করছেন গৌতমদা। ডোন্ট ট্রাই টু স্কেয়ার মি—সহজ ব্যাপারটা এই যে, ভোগী বলে কেউ নেই, কিছু নেই...

pathagar.net

স্নান করে, মিথিলের পোশাক পরে, ভিজে চুলদাড়ি বেয়ে জল পড়ছে, ভোগী এসে এক ফাঁকে মিথিলের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে হঠাৎ মিথিলকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে,

'বদর গাজি বাপ
কেউটে কুমির ভাল্লুক
যেন করতে পারি সাফ...কে বলচে—ভোগী আসে নি?'

গৌতমদা চেঁচায়...কে কথা বলল? কে? হতচকিত মিথিল ফোন নামিয়ে রাখে। ক্যাবলার মতো বলে, 'এখন কী হবে ভোগী?'

—কী আবার হবে? হুজ্জুৎ, এবারে জমবে মোচ্ছব। ঘাবড়াবার কী আচে?

—নেই?

—ধুস্।

মিথিল চটপট তৈরি হয়ে নেয়। মাসিমণি খাবার দেওয়ার সময় দেখে মিথিল মুখ দিয়ে অদ্ভুত জন্তুর আওয়াজ করে হাত মুঠো করে, পা আকাশে ছুঁড়ে ক্যারাটের টেকনিক দেখাচ্ছে আর ভোগী খুব হাসছে। মিথিল অনন্তকে দাঁড় করিয়ে তেড়ে যাচ্ছে আবার সরে আসছে এবং বলাই বাহুল্য যে, সে এই ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করছে না।

—ই...ই...আঃ বুঝলি, গাঙ্গুলিদা বলেছিল যে, মিথিলকে কিওকুশিন ব্ল্যাক বেল্ট কেউ আটকাতে পারবে না।

মাসিমণি বলেন, 'কী হচ্ছে কী মিথিল। বলা তো যায় না, যদি লেগে যায়!'

—লাগবে না। লাগবে না। অনন্ত, ধর তোর নাম বসাক বা বসন্ত...তখন কী হবে বল তো...এই দ্যাখ লিভারটা ফেটে গেল...

—আঃ মিথিল।

মিথিল ভোগীকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার আগে মাসিমণির কাছে থেকে বেশ কিছু টাকা নেয়।

—এই কদিন ক্যাশ ফ্লো-টা একটু জেনেরাস রাখতে হবে, বুঝেছো তো।

—তাহলে তো অনন্তকে ব্যাঙ্কে পাঠাতে হবে।

—পাঠাও।

—দুপুরে খাবি তো?

—এখন বলা সম্ভব নয়। খেতেও পারি, নাও খেতে পারি।

ওরা ট্যাক্সি নেয়। ভোগী এদিক ওদিক মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। বাস বা মিনিবাস গায়ের ওপর এসে পড়লে সিটের ভেতরে ঢুকে আসে।

—উরে শালা। যখন এলুম তখন সক্‌কোলে ঘুমোচ্ছিলেন। এইবারে সব দুদ্দাড় করে বেইরে পড়েচে। জোর মোচ্ছব, জোর মোচ্ছব!

স্টেট ট্রান্সপোর্টের ত্রিতলিকার পেছনে সব গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। মিথিলদের ট্যাক্সিও।

—হাতি দেঁইড়ে গেল তো পোঁদে পেঁদে সব দেঁইড়ে গেল! তাজ্জব বেপার!

ট্যাক্সি ড্রাইভার হেসে জিজ্ঞেস করে, 'বাবু নয়া হ্যায় কেয়া?'

মিথিল বলে, হাঁ। ট্যাক্সি ড্রাইভার নিজের মনেই বলে, কলকাত্তা ঘুমনে আয়া। তারপরই খিস্তি করে—কারণ একটা অটো বাঁদিক দিয়ে ওভারটেক করছিল। অটোর ড্রাইভারও উল্টে গালিগালাজ করে। ভোগী আনন্দ পায়, 'মোচ্ছব, মোচ্ছব!'

বড় রাস্তা থেকে ট্যাক্সি ছোট রাস্তায় ঢোকে। ঠিক বাড়ির সামনে নয়, একটু ছেড়ে দাঁড় করাতে বলে। ট্যাক্সি ছাড়ে না। গাড়িতে ভোগীকে বসতে বলে কিছুক্ষণ। বলে ভয়ের কিছু নেই। ড্রাইভারও হেসে বলে, 'ডরনেকা কুছ নেহি হ্যায় বাবুজী'।

—ভোগীর আবার ভয়। তুমি আমারে একটা সিগ্রেট দিয়ে যাও দিনি।

মিথিল কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে। করে বেল টেপে। দরজা খুলে দেয় মিমি, মুখে একগাল হাসি, 'আমি কাল রাত্তিরে ফোন করেছিলাম।'

—ভাল করেছিলে। এখন ভেতরে চলো। দরকারি কথা আছে।

মিথিল ঢুকতেই কুকুর দৌড়ে এসে লাফাতে থাকে। মিথিল তাকে কোলে তুলে নেয়। সাদা স্পিৎজ্। নাম পুঁটি।

—শোনো, বাইরে ট্যাক্সি ওয়েট করছে। তাতে ভোগী বসে আছে।

—আছে। এসেছে।

—চুপ করো। না লাফিয়ে এখন শোনো। সকালে আমি গৌতম রায়কে ফোন করেছিলাম। বললাম ঐ ভোগী ফোগী সব ঢপ, আমার ম্যানুফাকচার। কিছুতেই শুনবে না। খালি থ্রেট করছে। বলছে ওর দুটো বডিগার্ড আছে—বসাক আর বসন্ত—একটা কিলার।

—কী করবে তোমায়? মারবে?

—সেটার ভয় করছি না। ফোনের শেষটায় ভোগী হঠাৎ চেঁচিয়ে মেচিয়ে ভাণ্ডাফোঁড় করে দিল। দেখ, ঝামেলা ওরা করলে আই ক্যান ভেরি ওয়েল ফেস দ্যাট। কিন্তু ভোগীকে জড়িয়ে কিছু হোক আমি চাই না। সেকেন্ডলি গৌতম রায়ের ক্লাউট, তার ডাবল ও সেভেন সিকিউরিটি—এরপর ইনেভিটেবলি পুলিশটুলিশ জড়িয়ে একটা কেলো। ভোগীকে এর বাইরে রাখতেই হয়। একটা অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা...

—এখন থাকছে কোথায়?

—কোথায় আবার, আমার কাছে। আচ্ছা মিমি, তোমার সেই লিজেন্ডারি মামা কিছু করতে পারেন না?

—কী করবেন মামা?

—আরে বাবা, ওরা ইচ্ছে করলে সব পারে!

—অবশ্য আমি বললে...দাঁড়াও একটা ফোন করি। থাকলে হয় আবার! নাম্বারটা নিয়ে আসি।

দৌড় মিমি তার ডায়রি নিয়ে আসে।

—ফোর ফোরটা কী হয়েছে জানো?

—টু ফোর ফোর সম্ভবত।

—দাঁড়াও, দেখি।

মিমি ডায়াল করে।

—এনগেজড্। আমার মাফিয়া মামার লাইন এনগেজড্। মিথিল, আই লাভ ইউ।

—ননসেন্স। আবার করো।

মিমি আবার ডায়াল করে।

—ইমপসিবল!

—এবারও অনগেজড্?

—না, এবার বলছে প্লিজ চেক দা নাম্বার ইউ হ্যাভ ডায়ালড্।

pathagar.net

—চেক করো তাহলে।

পুঁটি এবার মিমির কোলে গিয়ে উঠেছে। মিমি তাকে চটকে আদর করে। ডায়াল করে।

—রিং করছে! রিং করছে! হ্যালো, হ্যালো, কি ঘিটিরঘিটির আওয়াজরে বাবা, হ্যালো, হ্যাঁ জোরেই বলিছ, মন্টু মামা আছে? দুর ছাই, বলুন না আমি মিমি...হ্যাঁ হ্যাঁ, মিমি বললেই হবে...(হাত দিয়ে মাউথপিস ঢেকে) গাধা কতগুলো ফোন ধরে...

মিথিল সিগারেট ধরায়। সিগারেটের ধোঁয়া নাকে লাগায় পুঁটি ফ্যাচ করে হাঁচে। মিথিল বলে, সরি!

—মামা...শোনো, আমি মিমি বলছি। হ্যাঁ, মিমি। তোমার সঙ্গে ভীষণ দরকার। আমি এক্ষুনি আসছি। খুব দরকার মামা। হ্যাঁ, মা, বাবা সবাই ভাল। এই কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাব। আর এই শোনো, এটা একেবারে পার্সোনাল...না না বাবা, বিয়েটিয়ে করি নি...ওসব না...আসছি...রাখছি।

—শোনো, চটপট, তুমি রেডি হয়ে বেরিয়ে এস। ট্যাক্সিটা একটু আগে দাঁড় করিয়েছি, আগে মানে বাড়ি ছেড়ে...

মিথিল ট্যাক্সিতে এসে দেখে ভোগী সিটের ওপরে বাবু হয়ে বসে ড্রাইভারের সঙ্গে জব্বর গল্প জুড়ে দিয়েছে।

—ভ্যানরিকশা যেমন ভাড়ায় চলে, এও তেমনি ভাড়া?

—হ্যাঁ, ঐ যে মিটার! ওতে ভাড়া উঠছে।

—দেকিচি। ভোগীর সব দেখা হয়ে গেছে।

মিমি এসে যায়। এসেই জানলা দিয়ে মাথা নিচু করে ভোগীকে দেখে। ভোগী, মিথিল, মিমি বসে। সকলেই হাসছে। যদিও আলাপ হয়নি। মিথিল বলে, 'চলিয়ে ড্রাইভার সাহাব। ট্যাংরা!'

ট্যাক্সি স্টার্ট দেয়।

—ভোগী, এ হচ্ছে মিমি, আমার বন্ধু।

—কী নাম বললে, মেমি?

—মেমি নয়, মিমি।

—থামো দিনি। মেম থেকে নাম তো। তাই মেমি। আমি ঠিকই বলেছি। তাই হল, মেমি।

ভোগী বেশ জোরেই বলে ওঠে, ও ড্রাইভার সাহেব, চলো, চলো, খরো খরো চলো, মেমির মামাবাড়ি দেখ্‌ব মন করতেছে...'

মিমি অবাক হয়ে যায়। মিথিলকে বলে, 'ওঁকে বলেছো আমরা কোথায় যাচ্ছি।'

—ভোগীকে কিছু বলতি হয় না মেমিদিদি। ভোগী সব আগেভাগে বুঝতে পারে।

এ রাস্তা, সে রাস্তা পেরিয়ে চৌরাস্তায় মোড়। ট্রাফিক সিগন্যাল। পুলিশ কীভাবে রাস্তা সামলাচ্ছে ভোগীকে মিথিল বুঝিয়ে দেয়।

—গেরামে পুলিশ তো চোর ধরে। একানে ধরে না।

মিমি বলে, 'চোরডাকাত ধরার পুলিশ আলাদা।'

মাদার ডেয়ারির বিশাল দুধের ট্যাঙ্কার দেখে অবাক হয়ে যায় ভোগী। তার থেকেও অবাক কাচের মড়ার গাড়ি দেখে। মড়ার গাড়িটাকে ওভারটেক করে ড্রাইভার।

—ভাল হল। বুঝলে মেমিদিদি, ভাল হল।

—কেন?

—বাঁদিকি মড়া গেলি শুভ হয়। বেশ মজা। কাচের ঘরে পুতুলের মতো পড়ে আচেন। দ্যাকো, দ্যাকো, আমাকে দ্যাকো। আমি কিন্তু কিচ্ছু দেকব না। সব দ্যাকা হয়ে গেচে। দিব্যি শুয়ে আচেন।

pathagar.net

মিথিল মিমিকে বলে, 'কী গো মেমিদিদি, কিছু মাথায় ঢুকলো?'

—একটু, একটু।

—ভাবছি তোমার মন্টুমামা আবার পাল্টি না খেয়ে যায়।

—কেন?

—খেলেই হল। হাজার হলেও রাঘববোয়ালদের ব্যাপার তো। ওদের মধ্যে কখন যে কী আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যায়।

মন্টু মিত্তিরের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দেয় মিথিলরা। এলাকাটা মোটের ওপর ঘিঞ্জি হলেও কিছু জায়গাওয়ালা বাড়িও রয়েছে। গেটে দারোয়ান মিমিকে দেখে সেলাম করে। মিমির সঙ্গে দুজনও সহজেই ছাড়া পায়। তা না হলে এ বাড়িতে ঢোকা এত সহজ নয়। বিশেষত মাস চারেক আগে বোমচার্জের সেই ঘটনার পরে। হাই পাওয়ার এক্সপ্লোসিভ ছিল বোমায়। বাইরের ঘরটার প্রায় কিছুই ছিল না। ঘরে তখন মন্টু মিত্তির ছিলেন না। কিন্তু পুলিশের খাতায় দুই দাগি আসামি, কানা সুধীর আর মুন্না মারা যায়।

মন্টু মিত্তির মোটা, ফরসা, কুচকুচে কলপ করা চুল। লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা। ঘরে বেশ কিছু লোক। মিমিকে দেখে উঠে দাঁড়ান। এগিয়ে আসেন। বুকে টেনে পিঠ চাপড়ে আদর করেন। মিথিল লক্ষ করে আনসারিং মেশিনটেশিন লাগানো বিরাট এক অন্য রকম টেলিফোন। দু তিন প্যাকেট ইন্ডিয়া কিং। চায়ের কাপ। মিমি বলে, 'মামা, আমরা পাশের ঘরে গেলে ভাল হয়।'

—আমরা কী করতে যাবো। ওরা বরং বাইরে যাক। এই তোরা বেরো তো। আরে বসো ভাই। বসো।

মিমি বলে, 'এই হল মামা মিথিল আর ইনি আমাদের বন্ধু। মিথিল এবার তুমি মামাকে গুছিয়ে বলে দাও সবটা।'

মিথিল বলতে থাকে। ভোগীর সম্বন্ধে সবটা যদিও বলতে পারে না। মোট কথা গৌতম রায়ের

ব্যাপারটা কী করে সামলানো যায়, 'মানে, দেখুন, আমিও মামাই বলছি, আমরা চাই যে, গৌতম রায় যেন রাগের বশে ঐ বসাক আর বসন্ত, ওদের দিয়ে কিছু করে না বসে। মানে কোনওভাবেই আমাদের এই বন্ধুর প্রোগ্রাম যেন আপসেট না করা হয়।'

—সে বুঝলুম। কিন্তু খট্‌কা একটা লাগছে। মিমি, কেসটা ক্লিয়ার নয়।

—সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে মামা। আগে ঐ গৌতম রায়।

—দাঁড়া, দাঁড়া, আমার যদি বুঝতে ভুল না হয় তাহলে তোদের এই বন্ধুর ওপরে ওদের নজর আছে, একটা ভিডিও মিডিও কী করতে চায়—কিন্তু কেন? ইনি কে? আমি অবশ্য এখনকার স্টারফার সব চিনি না।

—সে ব্যাপার নয়। ইনি দেখুন, ইনি হচ্ছেন

ভোগী বলে ওঠে, 'আজ্ঞে মামা, আমি হলাম গে ভোগী'

—ভোগী? যোগী টোগি হয় জানি, এই যেমন ঐ যে তোমার গিয়ে বাবা লোকনাথ, তারপর ঐ যে মড়া নিয়ে কী কেচ্ছারে বাবা...ভোগী তো কখনও শুনি নি। সেটা আবার কী?

মিথিল বেশ ফাঁপড়ে পড়েছে। তবু যতটা পারে ম্যানেজ করার চেষ্টা করে।

—ভোগী মানে, ইনিও এক ধরনের সাধু বুঝলেন!

—ও আই সি।

—মানে ওঁরও বেশ কিছু ক্ষমতাটমতা আছে, এমার কিছু সিক্রেট পাওয়ার মানে বিভূতি বলতে পারেন, এসব আছে এবং সেটার ভিডিও তুলো, সোজা কথা ওরা ব্যবসা করতে চায় এখন তাতে আমি না বলেছি বলে..

—দাঁড়াও, দাঁড়াও। এক এক করে, সিরিয়ালি, বুঝতে দাও। তুমি না বলার আগে হ্যাঁ বলছিলে?

—আজ্ঞে, প্রায় তাই।

—পরে না বললে কেন?

—আজ্ঞে আমার ভুল হয়েছিল।

ভুলটা ধরিয়ে দিল কে?

ভোগী বলে ওঠে, 'কে আবার? মেমিদিদি।'

—কিরে মিমি। এটা ঠিক?

অবাক মিমি মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—তা গৌতম রায়কে এখন ফোটতে হবে, এই তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হল না। আগেই হ্যাঁ ব'লো না। কথার খেলাপটা আমাদের দিকে। তার তো কোনও দোষ নেই?

—না।

—অতএব আমাদের যেটা করতে হবে সেটা রাজনীতির পরিভাষায় যাকে পজিশন অফ স্টেংগ্‌থ্ বলে, তার থেকে কথা বলতে হবে। বাংলা কথায় রং নিতে হবে, রোয়াব দেখাতে হবে, চমকাতে হবে। লোকটার নাম হচ্ছে গৌতম রায়, গ্লোরিয়াসের পি. আর. ও, বৌ-এর নাম রুবেনা, জিরো জিরো সেভেনের বসাক, এক্স-পোলিসম্যান এবং মুক্তিপ্রাপ্ত লাইফার বসন্ত—তা বাবাজীবন মিথিল, মালের টেলিফোন নম্বরটা দাও তো...

মিথিল দেয়। ডিজিটাল ডায়ালিং। একবারেই লাইন পেয়ে যান মন্টু মিত্তির...

—নমস্কার। গৌতম রায় আছেন নাকি? বাঃ বাঃ কী সৌভাগ্য আমার। আজ্ঞে, আমি ট্যাংরার

pathagar.net

থেকে বলছি।...হ্যাঁ...আজ্ঞে অধমের নাম মন্টু মিত্তির...ও বুঝতে পেরেছেন। কী সৌভাগ্য আমার...তা বড় দরকারে পড়ে ফোন করলাম যদিও জানি আপনি ব্যস্ত মানুষ...না, না, তা বলছেন কেন, আমার মতো হরিদাস পাল কত আছে, কত থাকবে, তবে হ্যাঁ, আমি আপনার স্ত্রীর ফিলিমের একজন অ্যাডমায়রার, 'অসতী'-র ভিডিও ক্যাসেট আছে, কী ছবি, কী সাহস...হ্যাঁ, তা যে দরকারে আপনাকে বিরক্ত করলাম সেটা হল, মিথিল নামে ঐ যে ছোঁড়াটা, হেঁ হেঁ...খুব রেগে আছেন দেখছি...আর বলবেন না, স্কাউন্ড্রেল বলে স্কাউন্ড্রেল, দুবেলা উদোম করে জুতোতে হয়, হাড়বজ্জাত...তা ঘটনাচক্রে মিথিল হল বলতে গেলে আমার বিশেষ স্নেহধন্য বুঝলেন, জানি অন্যায় করে, আপনাদের মতো লোককে খচাতে সাহস পায় কিন্তু আমার ব্যাপারটাও বুঝুন, বলতে গেলে প্রায় ঘরের ছেলেই, তাই আর কি আগলে আগলে রাখি, কী করব বলুন...হ্যাঁ, হ্যাঁ স্নেহ অতি বিষম বস্তু, সে কী আর করা যাবে, তবে আপনার কোম্পানি কাজটা বড় ভাল করেছে, খুব দূরদৃষ্টি আছে বলতে হবে...কোন্ কাজটার কথা বলছি বুঝতে পারলেন না, বলছি, বলছি...আপনাদের টি ডিভিশনের দুজন এক্সিকিউটিভকে কিডন্যাপ করার পর আপনাদের জন্যে সিকিউরিটি গার্ডের ব্যবস্থা করে...চিনি বই কি, কাউকে কাউকে চিনতে তো হয়ই যেমন ধরুন ঐ যে জিরো জিরো সেভেনের বসাক বলে একটা ভুঁড়ো খচ্চর আছে...অ্যাঁ, বলেন কি, ওটাকে আপনার সঙ্গে দিয়েছে...আরে ও ব্যাটা যখন পেঁড়োতে দারোগা ছিল, তখন পেঁড়ো-আঁটপুর রুটে প্রাইভেট ট্যাক্সি ভাড়া খাটাত, খুব লাথিয়েছিলাম একবার...হ্যাঁ, হ্যাঁ লাথিয়েছিলাম, সে কি হাউ হাউ করে কান্না, খালি পা জড়িয়ে ধরে, খালি পা জড়িয়ে ধরে, জিজ্ঞেস করবেন। ভোলার কথা তো নয়—আর ঐ কে বসন্তফসন্ত ওসব আমি চিনি না...এইবার তাহলে রাখি...হ্যাঁ, আর মিথিলকে আমি টিট করে দেব, দেখুন না কী করি...আচ্ছা এবার রাখি তাহলে...নমস্কার, ম্যাডামকেও বলবেন, বড় আলাপ করতে ইচ্ছে তবে ঐ ফুরসত নেই...আচ্ছ, আচ্ছা, না, না, মিথিলকে নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তাই আমি আর করব না,. আপনিই তো অভয় দিলেন স্বয়ং...আচ্ছা ভাই রাখি তাহলে...আচ্ছা, আচ্ছা...

মন্টুমামা হাসিমুখে রিসিভার রাখেন। বেল বাজান। যারা বেরিয়ে গিয়েছিল, তারা ঢুকতে থাকে।

মিথিলকে বলেন, 'যতটা পারি মোলায়েমের ওপর দিয়ে সারতে হল। কী করা যাবে বল? গুবলেট কেস তো, যে কেসের যেরকম সওয়াল।'

মিথিল কানে কানে মিমিকে জিজ্ঞেস করে, 'মামা বিয়ে করেন নি?'

—করেছিল। ডিভোর্স হয়ে গেছে।

মিমি এবার ইনিশিয়েটিভ নেয়।

—মামা, আর একটা কথা ছিল।

—দাঁড়া, হাঁ রাখ্, ওদের সামনে রাখ।

কোল্ড ড্রিংকস আর মিষ্টি। স্ট্র দিয়ে কীভাবে খেতে হয় ভোগীকে বোঝাতে হয় না। মিথিল বলে, 'কেমন খেতে।'

—ভাল। তবে ঝাঁজ দিচ্ছে।

মামা এবার বলে, 'এদের সঙ্গে দুমিনিট সেরে নি বরং তারপর শোনা যাবে। অত সহজে ছাড়ছি না।'

এসেছিল আসলে দুটো দল। তিন-চারজন ভেড়ির মালিকদের দলটা কয়েকদিন ধরেই আসছে। ভেড়িতে ডাকাতি খুব বেড়ে গেছে। পুলিশ কিছু করবে না, ওদিকে নতুন বন্দুকের লাইসেন্স নিয়েও বেগড়বাঁই করছে। মামা বললেন যতটা চেষ্টা তদ্বির করার তিনি করেছেন। ও. সি-র সঙ্গে কথাও হয়েছে। তবে সময় লাগবে। দ্বিতীয় দলের একজনকে সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করার সময় বাইরের

ছেলেরা ক্ষুর মেরে দিয়ে গেছে।

—তা তোরা এতজন কি ঘাস কাটছিলিস? যা হোক সেই ছোঁড়াটা কোথায়?

—কোন ছোঁড়াটা সার?

—ঐ যেটাকে ক্ষুর মেরেছে।

—আজ্ঞে সার, এন. আর. এস-এ।

—কোথাকার ছেলেরা এসেছিল।

—এন্টালির সার।

—এন্টালি তো আর এইটুকু জায়গা নয়। ক্লাবের নামটাম নিয়ে এলে দেখা যেতে পারে। তবে বেশি কিছু তো করার নেই। সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করাটাও খারাপ কাজ, ক্ষুর মারাটাও ভাল কাজ নয়।

মামা ছেলেটার বাড়ির জন্যে দু'শ টাকা দিয়ে দিতে বললেন। দুটো দলই চলে গেল।

—শুনলেও গা জ্বলে যায় আবার না দেখলেও চলে না। আমার হয়েছে ভাল জ্বালা। তারপর...

ভোগীর দিকে তাকান। তাকিয়ে থাকেন।

—কদিন থাকা হবে কলকাতায়?

—আজ্ঞে দুদিন।

—কেন? দুদিন কেন? দুদিনে কি কলকাতা দেখা যায়?

—তা কী করব বলুন। তার বেশি থাকার আর উপায় নেই।

মিমি বলে, 'আচ্ছা মামা, দু-তিন দিনের জন্যে আমাদের একটা গাড়ি দিতে পারবে?'

—গাড়ি না হয় একটা ভাঙাচোরা যোগাড় করা গেল। তেল, ড্রাইভার—এসব খরচ কে দেবে?

—কেন, তুমি দেবে।

মামা মিথিলকে বলেন, 'শুনেছো কথাটা! অবশ্য মিমি এটা চাইতেই পারে। গতবারের মিমির জন্মদিনটা তো হলই না।'

মিথিল বলে, 'শুনেছি। মিমির কাছে।'

—হেঁ, হট্টগোল, দু দুটো ডেথ, মধ্যে থেকে মিমির জন্মদিনটা ক্যানসেলড্ হয়ে গেল...

—তবে বাবু একটা কতা বলব, যদি কিছু মনে না করেন?

—না, না, মনে করার কী আছে। বলুন না!

—ভোগীর দশটা কতার মধ্যে একটা ফসকে গেল তো খুব জোর, নটা কতা ঠিক ফলে যাবে।

ভোগী উঠে গিয়ে একটা জায়গা দেখায়। সেখানে একটা সোফা রাখা ছিল। ভোগী সোফাটা ধরে টানে। সোফাটা সরে যেতে দেখা যায়—মোজেকের তিন চারটে টাইল ভাঙা, অনেকটা নেই। মামা উঠে দাঁড়িয়েছেন। ওরাও। গর্ত হয়ে গিয়েছিল। হোয়াইট সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করা। ভোগী সেখানে থেবড়ে বসে, জায়গাটায় হাত রেখে আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে থাকে সামনে পেছনে। যেটা কেউ দেখতে পায় নি সেটা হল মামার মাথার পেছনে যে-বিরাট কোয়ার্টজ দেওয়াল ঘড়িটা রয়েছে তার সেকেন্ডের কাঁটাটা পাঁচ সেকেন্ড বন্ধ ছিল। ভোগী মেঝের থেকে হাত তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটাটা আবার চলতে শুরু করে। ভোগী উঠে দাঁড়ায়। জায়গাটা জ্বলন্ত চোখে দেখে বীরদর্পে এসে একটা দেশলাই তুলে নেয়। একটা কাঠি জ্বালিয়ে ঐ জায়গাটায় রেখে দেয়। কাঠিটা জ্বলে শেষ হয়ে যায়। ভোগী সোফাটা টেনে আবার জায়গায় করে দেয়। ঘেমে গেছে। এসে বসে।

—আজ কী বার?

—বুধবার।

—তাহলি এই বুধবারে আমি আগুন জ্বালালাম—মামা, আপনি তো যুক্তিধর নোক, ভোগীর একটা কতা মেনে চলবেন?

—চলব। নিশ্চয়ই চলব।

—আপনার ফাঁড়া কিন্তু আচে। চার মাস গেচে তো। আগাম চার মাসে আপনি বৈকেলের পর কোতাও যাবেন না, মোট্টে ফাঁকায় যাওয়া নেই। চারমাস পরে অবাদ গতি। ত্যাকন আর কোনও ভয়ডর করতি হবে নি।

—তাহলে একটা কথা দিতে হবে ভাই। চারমাস পরে এই বাড়িতে দয়া করে আর একবার পায়ের ধুলো দিতেই হবে। কোনও না শুনব না।

—সে যদি বা হয় ত্যাকন আমার পায়ের ধুলো আপনি চিনতি পারবেন? ধুলো তো উড়ে উড়ে আসেন। কোন্‌টা কার পায়ের সে বোঝা এক দুষ্কর বেপার।

—বুঝলাম না ভাই।

—সব ভোগীর কতায় এই আপত্তি। কী করব বলুন, আর কতা যে জানা নি। তা মামা মেমি-দিদির আবদার আবার আমারও আবদার—গাড়ি চড়ব।

—ওমা, ছি ছি। গাড়ি। এ আর কি একটা কথা হল?

মামা বেল বাজান। একজন দৌড়ে ঢোকে।

—কোন্ গাড়ি কোথায়?

—আজ্ঞে রতন অ্যাম্বাসাডর নিয়ে...

—আঃ অ্যাম্বাসাডরের কথা কে জানতে চায়?

—মারুতি ভ্যান আর ট্রেকার আচে বাবু।

—না, না, ট্রেকার নয়। লরির মতো। ওটা একটা গাড়ি হল? বাহাদুর কোথায়?

—আচে বাবু।

—বাহাদুরকে ডাকো।

—হ্যাঁ বাবু।

লোকটি দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

—বাহাদুরই ভাল। সবরকম পারে। সঙ্গে চেম্বার রাখে। বড় ভাল ছেলে। গাড়িটা চালায়ও তুখোড়। তবে ওর ঐ একটা দোষ—ক্যাসেট না বাজলে ওর অ্যালার্টনেসটা কেমন যেন কমে যায়। বাহাদুর ঢোকে। বয়স বেশি নয়।

—বাহাদুর, তুমি মারুতি ভ্যানে এঁদের নিয়ে তিনদিন ঘোরাবে। যেখানে যাবে, যাবে। তেল কিনবে। যা বলে শুনবে। আর শোনো, এঁরা আমার—সব আপনা আদমি—এই মেমসাহেবকে চেন তো—আমার ভাগ্নী—এ হল, মেমসাহেব...

—ঠিক হ্যায় বাবু।

—আর ইনি সাধুবাবা। বহোৎ বড়িয়া সাধু। বাহাদুর ধুপ করে ভোগীকে প্রণাম করে।

—টাকা, ম্যানেজারের কাছে নিয়ে নাও। যা দরকার। আর শোনো, রাতে থাকতে বললে থাকবে। ছেড়ে দিলে আসবে। আমার লোকজন সব। কোনও অসুবিস্তা হবে না।

—ঠিক হ্যায় বাবু।

বাহাদুর বেরিয়ে যেতে ভোগী বলে, 'মামা, এর কিন্তু অপঘাতে মরণ।'

—সে কি!

—কিছু করা যায় না? ছেলেটা বড় ভাল।

pathagar.net

—দেকি!

হঠাৎ ফোন বাজে। মন্টুমামা ফোন তোলেন।

—ও হ্যাঁ বলুন ভাই। হ্যাঁ, আছে। দেব? নিন, কথা বলুন।

জটিল টেলিফোনে একটি বোতাম টিপে হেসে মিথিলকে বলেন,

—গৌতম রায়। প্যানিকে প্রচুর মাল খেয়ে ফেলেছে। কথা বলো।

মিথিল রিসিভার তোলে। সেই বোতামটি উঠে যায়।

—মিথিল? মি...থি...লা।

—কথা বলছি।

—আমি...গৌতমদা।

—বুঝেছি। বলো।

—বলব?

—বলো।

—মিঃ র‍্যালফ্ হ্জসন! শুনছেন!

—বলো।

—আমি এখন মাল খেয়ে আছি। সুভাষ মুখুয্যের কবিতার 'টুপভুজঙ্গ'।

—কিছু বলবে? আমাকে বেরোতে হবে।

—দাঁড়াও ভায়া। তিষ্ঠ ক্ষণকাল। শোনো মিথিল,

উইথ হিজ মিউজিক্যাল সাউন্ড
অ্যান্ড হিজ বাস্কারভিল হাউন্ড
হুইচ, জাস্ট আ ওয়ার্ড ফ্রম হিজ মাস্টার
উইল ফলো ইউ ফ্যাস্টার অ্যান্ড ফ্যাস্টার
অ্যান্ড টিয়ার ইউ লিম্ব ফ্রম লিম্ব...

(রুবেনার গর্জন—'তুমি এই সকালে কী শুরু করলে।')

ওয়েট, ওয়েট...মিথিল...যোগী অ্যান্ড দা কমিসার...ভোগী অ্যান্ড দা মাফিয়া...

মিথিল রিসিভার রেখে দেয়। মামা হেসে বলেন,

—এরকম হয়। তবে মিথিল, দোষ তোমার।

—মানছি।

—বললে হবে না মিথিল। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

—কীভাবে বলুন?

—বলব। পরে বরং বলব। আগে রিলেশনটা পাকাপাকি হোক। তখন দেখবে মামা কী বস্তু।

মারুতি ভ্যান বেরিয়ে যায়। মামা ঘরে ঢোকেন। সোফা ঠেলে সরাতে যাবেন এমন সময় আবার ফোন। মন্টুমামা ফোন তোলেন।

—আচ্ছা মন্টুমামা আছেন?

—কথা বলছেন। বল্, আমি বলছি।

—এই দাদা, তোর কাছে মিমি গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। চিন্তা করার কিছু নেই।

—সঙ্গে মিথিল নামে একটা ছেলে ছিল?

ফোনটা কেড়ে নেয়। রাশভারি পুরুষকণ্ঠ।

—মিথিল, মিমি একসঙ্গে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। একসঙ্গে এসেছিল। সুনীতদা, ভাল আছেন তো?

—হ্যাঁ, চুরিডাকাতি, মানে পলিটিক্স করি না, মাল্টিস্টোরিড বানাই না, খারাপ থাকার তো কোনও কারণ নেই।

—ওঃ সুনীতদা! যাইহোক বিকেলে হবে না, সকালে একদিন যাবো।

—হ্যাঁ। সকালই ভাল। বিকেলে তুমি তো আবার বৈকল্যপ্রাপ্ত হও। সকালই ভাল।

—রাখলাম।

—হ্যাঁ রাখো। তবে শোনো, মিমিকে একটু কম স্পয়েল করলে ভাল হয়।

—চেষ্টা করছি। রাখলাম।

—সাবধানে থেকো।

—আছি।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখেন মামা। রেখে এগিয়ে গিয়ে ঠেলে সোফাটা সরান। ভোগী যেখানে জ্বলন্ত দেশলাই ফেলে গিয়েছিল সেখানে বেশ কিছুটা ছাই যা একটা দেশলাই কাঠি পুড়ে হতে পারে না। কোথা থেকে এক ঝলক দমকা হাওয়া এসে ছাইটা ঘরময় উড়িয়ে দেয়। মামা দেখেন দরজা জানলা সব বন্ধ।

এসপ্ল্যানেডে মারুতিভ্যানে বাহাদুর বসে থাকে অনেকক্ষণ। ওরা ততক্ষণে পাতাল রেলে টালিগঞ্জ গিয়ে ফিরে আসে। টালিগঞ্জ যাবার গাড়িতে ভিড় ছিল না। কিন্তু আসার গাড়িতে কিছুটা দেরি হলেও অপিসের ভিড়ের একটা আন্দাজ পেয়ে যায় ভোগী। মিমি একবার দেখেছিল যে, ফিরে আসার সময় একটার পর একটা স্টেশন এলে ভোগী খুব একটা কিছু দেখছে না। বরং চোখ বন্ধ করে মিটিমিটি হাসছে। পরে বেরিয়ে এসে ভোগী প্রথমেই জিজ্ঞেস করে,

—কালীমন্দিরের তলা দিয়ে যখন রেল যায় তখন কি মন্দির কাঁপে?

—না মন্দির থেকে বেশ কিছু দূর দিয়ে লাইনটা গেছে। আর ঐ যে সুড়ঙ্গ দেখলে না, ও এমন শক্ত সিমেন্ট আর লোহা দিয়ে তৈরি যে, ওপরে শব্দও যায় না, কাঁপেও না।

—আমি ভাবি আর এক কতা। তলায় কেমন যেন রাত রাত ভাব। তার ওপরে দিন। আচ্ছা, কালীঘাটে তো মা গঙ্গা আছে। তার জল ঐ সুড়ঙ্গের মদ্যে যদি নেমে আসে।

—কী করে আসবে? সব রাস্তা বন্ধ।

—তা বললি হয়? পাতালে রেল আর কতদিন। জল সে তো কবে থেকে পাতালমুখী হয়ে আচেন। তবে হ্যাঁ, দ্যাকবার মতো জিনিস একখানা...হয়েছিল বলে শুনিচি। এবার দ্যাকা তো হল।

—ভাল লাগল?

—ভাল। খুব ভাল।

অ্যামেরিকান কনসুলেটের বাড়ি, টাটা সেন্টার, জীবনদীপ—সব পেরিয়ে থিয়েটার রোডের মোড়ে ডানদিকে যায়—গাড়ি। ভিক্টোরিয়া দেখে, দূর থেকে, ভোগী ভেবেছিল, হয়তো কোনও মন্দির। তারামন্ডলে কী হয় ওকে বুঝিয়ে দেয় মিথিল। এর থেকে ভোগী একটা স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তে আসে।

—বাবুরা দেকতিচি সবকিছু ডবল করে বানিয়েছে। ভগবান রাত বানিয়েচেন। আমিও শালা মাটির তলায় রাত বানাবো। ভগবান আকাশ তারা সব সিষ্টি করেচেন। আমিও শালা কম যাই কিসে। ঐ যে বললে না, তারামণ্ডলী—আমিও বানাবো। মিমির মজা লাগে কথাটায়।

—এখানে একটা জঙ্গলও বানানো আছে জানো তো। সেখানে বাঘ, সিংহ সব রয়েছে।

—জানি মেমিদিদি। তাকে বলে চিড়িয়াখানা। দেকে গেচে এমন নোকের মুখি শুনিচি।

—তোমাকে নিয়ে যাবো সেখানে।

—কী হবে ঐ বাঘ বাঁদর দেকে? ও আমি অনেক দেকিচি। চিড়িয়াখানা দেকে আমার আর কাজ নি।

এসপ্ল্যানেডে বেরোতেই গণ্ডগোল। বাহাদুর যেখানে গাড়ি পার্ক করেছিল তার কাছেই মাড়োয়ারি মহিলার হ্যান্ডব্যাগ ছেনতাই হয়েছে। জটলা, মহিলার কান্না, পুলিশ। মিথিলরা গাড়িতে ওঠে।

—কি বাহাদুর, ছেনতাই হয়ে গেল?

—হাঁ বাবু। ইধার তো হোতাই হায়।

—বুঝলে ভোগী, এখানে রাজ্যের লোকের ভিড় তো। অনেকে দোকান বাজারে এসেছে। তাই পকেটমার, ছেনতাইবাজ সব গিজগিজ করছে। তবে আমাদের ভাগ্য ভাল যে, লোকটা ধরা পড়ে নি।

—কেন?

—সবাই মিলে মেরেধরে রক্তারক্তি করত। অনেক সময় তো পিটিয়ে মেরেই ফেলে।

—গেরামের দিকে ডাকাত যদি ধরা পড়ে তো ঐরকম হয়। একবার, বুঝলে মেমিদিদি, একতারার কাছে সাত সাতটা ডাকাত ধরা পড়েছিল। তা ছটারে তো পিটিয়ে শেষ করে দেচে। তা সদ্দারটাকে যত মারে কিছুতেই মরে না। শেষে বলে, দ্যাখ্ আমার এই কাঁধের কাছে ওষুদ ঢোকানো আচে, মন্তর পড়া ওষুদ। ঐ ওষুদ যতক্ষণ থাকবে কেউ আমার জান নিতে পারবে না। তকন ওরা ঐ কাঁধের চামড়া কেটে ওষুদ বের করল। এই এট্টা ড্যালার মতো। তারপর কয়েক ঘা দিতিই কারবার হয়ে গেল।

নিউ মার্কেটের সামনে গাড়ি রাখা হয়।

—বুঝলে মেমিদিদি, ঐ ওষুধ যে দিয়েছিল সেই গুণিন আবার আমার চেনা।

—তুমি পার ঐ ওষুধ দিতে?

—না গো। ওদের ভেন্ন ঘর। ভেন্ন মন্তর। ধরো তোমার ওপর যদি কুদিষ্টি পড়ে ও যদি 'ফাকাশে ফণা আনকা গেতায়াকা ফাকছারুকাল ইয়াত্তমা হাদিদ' নিখে তাবিজ দেয়, ফুঁ দেয় অমনি সব ঠিক। আমি করতি গেলে অষ্টরম্ভা।

ওরা নিউ মার্কেটে ঢোকবার মুখে ভোগী হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে,

ডাইনে আল্লার তলওয়ার
বামেতে মহম্মদের ঢাল
পিছনেতে আদম শফি উল্লাহ্
সম্মুকেতে মরতজ্জা আলি
ইয়া আলি, ইয়া আলি, ইয়া আলি
জুল ফাক্কার, জুল ফাক্কার, জুল ফাক্কার।

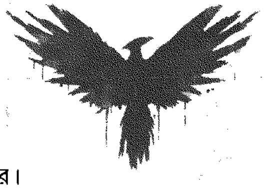

লোকজন চমকে ওঠে। বারমুডা প্যান্ট পরা বিদেশিদের একটা দল থমকে যায়।

—সেই গুণিনের শরীল বন্দ মন্তর! বড় ভাল নোক।

দোকানে দোকানে ছয়লাপ। বেশিই জামাকাপড়। যত দোকান, তত কাচ আয়না, সেই আয়নায় ভোগী নিজেকে দেখে হাসে, তত লোক।

—গেরামের দিক হলে ভেন্ন দেশ তো। তাই সেখানে নোক সব ন্যাংটোপোঁদে ঘুরতেছে। আর

একানে দেখ—একেবারে মেলা করে রেকেচে।

—এসব সায়েবদের আমলে তৈরি। ইংরেজরা যখন এই দেশের রাজা ছিল তারা ঐসব বানিয়েছিল। মেমসায়েবরা জামাকাপড় কিনত। ঢোকার পর দেখলে না সায়েবদের কামান।

—ঐ কামানে যুদ্ধ হতো?

—এক সময়ে তো হতোই। এখন আরও বড় বড় কামান ছোঁড়া হয়।

মিমি বলে, 'বফর্স!'

—আচ্চা মিতিলবাবু, এই যে জামাকাপড়ের বাজার কেনিং-এর মাচের বাজার সে রকম কামানের বাজার হয়? কলকাতায় নেই?

—কামানের বাজার আছে বলে তো শুনি নি। বন্দুকের দোকান আছে কয়েকটা।

—আমাদের ওদিকে কত ঘরে বন্দুক বানায়। ডাকাত গুণ্ডা সব কেনে। তারপর বোমা বানায়। হাট বসলে দেকবে মেমিদিদি দা বল্লম সব বিকোচ্চে। কেনো আর মারো, কেনো আর মারো!

মিমি একটা লং স্কার্ট আর ব্লাউজ পরেছিল। একটা দোকানের সামনে হ্যাঙার থেকে স্কার্ট ঝুলছিল।

ভোগী বলে, 'মেমিদিদি, এই দ্যাখো, তোমার পরণের পোশাক ঝুলতেছে। তুমি এই হাট থেকে কেন?'

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কিনি।

—আগে কিনত মেমসায়েব। একন কেনে মেমিদিদি। ভাল, ভাল।

—কী ভাল?

—কেনাকাটা। আমি শুধু ভাবি মানুষ কত সাজে সাজতি চায়। এই দেকলাম মশানপীর মা কালী তো ঐ দ্যাকো টঙ্গর বাশুলী মহাকাল, গোলকনাথ, রতি পতি, কামদেব, পঞ্চ বেতাল, ভুজঙ্গ জননী, পতরচণ্ডী, চামুণ্ডা, ভূতভবেশ্বরী, সব ঘোরাফেরা করতিচেন উঃ ডাইনে ধবলদেবী তো বাঁয়ে আসে কালভৈরবী, ওলাবিবি, মড়িবিবি, ঝেঁটুনেবিবি, আজগৈবিবি, বাহড়বিবি, আসাবিবি, তারপর তোমার গে মানিকপীর, যাঁতাল, মাকাল, বিবিমা, খুকিমা সব দরশন হয়ে গেল—এইবার ঘরে চলো মিতিলবাবু!

— শরীর খারাপ লাগছে?

—ভোগীর জানবে সব সময় অস্থির অস্থির ভাব। এই ভাব থাকবে, ভাবান্তর হলি পরে সেরে যাবে?

বাড়ি ফেরার রাস্তায় ওরা মিমিকে নামিয়ে দেয়। মিমির ওবেলা নিজের রিসার্চ গাইডের কাছে যেতে হবে। দরজার কাছে মিমি মিথিলকে বলে, 'ভোগীর শেষে যা হবে বলেছিলে সেটা কি সত্যি?'

—দ্যাখো অন্য লোকেও বলেছে, ও নিজেও তাই বলেছে।

—তুমি বিশ্বাস করো? একেবারে ভেতর থেকে?

—সত্যি কথা বলতে করি। মোরওভার এটাকে তো সুইসাইড বা ম্যানস্লটার—ঐ জাতীয় কিছু বলে মনে করা যায় না।

—আমার কিন্তু ভাবলেই কেমন লাগছে।

—আমারও লাগছে না ভেবেছো? কিন্তু কিছু করার নেই। ও কোনও সাধারণ লোক নয়।

—সেটা বুঝতে পেরেছি।

—তাই সাধারণ হিসেবটাও ওর বেলায় খাটবে না। ও একটার পর একটা স্টেশন পেরিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা একটা স্টেশন। একটা টেম্পরারি ব্রেক। এ ব্যাপারে আমাদের দিক থেকে

কোনও ইনটারভেনশন ঠিক হবে না। তোমার সাবজেক্টের ভাষায় ওর সভরেইনটি নষ্ট হবে।

—ওবেলা ফোন কোরো।

—করব।

বাড়িতে পৌঁছে মিথিল বাহাদুরকে ছেড়ে দেয়। বলে সন্ধেবেলায় সাতটা নাগাদ আসতে। বাড়ি ফিরতে মাসিমণি বলল যে, মন্টু মিত্র ফোন করেছিলেন। মিথিল যেন একবার ফোন করে। আবার নতুন কোনও ঝামেলা কিনা ভেবে মিথিল ফোন করে দেখল সেসব কিছুই না। মন্টুমামা জানতে চেয়েছিলেন কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা।

দুপুরের খাওয়ার পর ভোগী এক লম্বা ঘুম লাগাল। মিথিলও ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটু ছাড়া ছাড়া ঘুম। উল্টোপাল্টা স্বপ্ন। যে স্বপ্নে একটাও চেনা লোক, চেনা জায়গা কিছু থাকে না। ঘুম থেকে উঠে দেখে মাসিমণির সঙ্গে ভোগীর খুব গল্প জমেচে। কাল ওরা দুজনে সকালে উঠে কালীঘাটে যাবে।

—ভালই হল। গাড়ি করে যাবে আসবে।

—এসে থেকে কতরকম গাড়ি, টেসকি, পাতাল রেল চড়া হল। যেদিকে তাকাও না কেন নোক আর নোক—ঘরবাড়ি ছেড়ে সব যেন বেইরে পড়েচে।

মাসিমণি বলেন, 'লোক কি বলচ বাবা। আমার তো রাস্তায় পা দিতে ভয় করে। মাড়িয়ে দিয়ে না চলে যায়।'

—এখনই এরকম বলছ। ক্লাব অফ রোম-এর একটা রিপোর্ট পড়েছিলাম জানলে—তাতে বলেচে কলকাতায়, কোন্ একটা সালে, পাশ ফিরতে গেলেও ধাক্কা লাগবে।

—আমার যে আর দেখার ইচ্ছে নেই।

—তা বললি কি হয় মাসি, যার যা দ্যাকার তাকে তা দেখতেই হবে। এই যেমন আমি কলকাতা দেখতিচি।

চা খাওয়ার পরে মিথিল ভোগীকে নিয়ে ছাদে উঠল। ওকে ছাদ থেকে দেখাল ভোগীর চেনা ভিক্টোরিয়ার চুড়ো, গল্‌ফ্ গ্রীনের টিভি টাওয়ার। এত উঁচু উঁচু বাড়ি উঠেছে চারিদিকে যে, বার বার চোখ ধাক্কা খায়। সূর্য ডোবার মুখে মেঘে মেঘে লালচে সোনালি রং ধরেচে। ভোগী ওঠবার সময়ে তার পুঁটলিটা নিয়ে উঠেছিল।

উবু হয়ে বসে, তার মধ্যে ছেঁড়া গামছার খুঁট খুলে একটা শক্ত, ভারি কালো মতো গোল জিনিস বের করে। সেটা ফুটো করে একটা সুতো পরানো আছে। সুতোটা ধরে ঝোলায়। জিনিসটা কিছুক্ষণ থেমে থাকে। গোল হয়ে ঘুরে চক্কর কাটে। তারপর একদিকে জোরে জেরে দুলতে থাকে।

—কী দেখছ ওটা দিয়ে...

—দিক দেখচি, দিক...

—কীসের দিক?

—সমুদ্দুরের দিকে যেতি হবে যে আমাকে। তা সব দিকেই তো সমুদ্দুর। আমাকে যেতি হবে দকখিন পশ্চিমে। সেকানে আমার জন্যে হাপিত্যেশ করে বসে আচে যে...

—কে?

ভোগী হেসে ওঠে।

—কে আবার? মামা। ভাগনের পথ চেয়ে বসে আচে।

—কীভাবে যাবে তুমি।

—ও আমি দিক চিনে ঠিক চলে যাব। সকাল সকাল বেরতি হবে।

pathagar.net

—আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

—তোমার কি মাতার ব্যারাম নাকি। ভোগীর সঙ্গে যাচ্চে। কেউ বলে?

—আমরা যদি তোমাকে একটু এগিয়ে দিই তাহলেও কি অসুবিধা হবে?

—না, সে হয় না। সেখানে একলা যেতি হয়। তিনিও তো একলাই থাকবেন। তারপর কী মনে করে ভোগী মিথিলের মু.খর দিকে তাকায়,

—আমি যকন, যেকান থেকে ফিরে আসতে বলব আসবে?

—আসব।

—তা না হলি কিন্তু ঘোর অনাচার হয়ে যাবে। আদেশ অমান্য করলি আর রক্ষে নি।

ভোগী কিছুক্ষণ চুপ করে সূর্য ডুবে যাবার পর যে অল্প আলো সেদিকের আকাশে তাকিয়ে থাকে। হাওয়া আসে। ভোগীর চুল একটু একটু ওড়ে।

—মিতিলবাবু, এট্টা কতা বলি। মাছফুলফুল খেলা, ঘর সংসার, তরমুজ, লঙ্কা, পানিফল, তেকাটার রস—যত ভাববে তত মন কেমন করবে। বুক ফেটে বলতি ইচ্ছে করবে বন পোড়ে তো সবাই দ্যাকে, মন পোড়ে তো কেউ দ্যাকে না। ঐ পোড়ার মনকে বাদ দে দাও। দেকবে আর কেমন করা নেই।

বাহাদুর কার স্টিরিওতে গান বাজিয়েছে,

কুছ লেনা হ্যায় লেনা হ্যায়
কুছ দেনা হ্যায় দেনা হ্যায়...

pathagar.net

নতুন হাওড়া ব্রিজের মাঝখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেয় বাহাদুর। ভোগী, মিথিল নামে।

—কি বাগাতক কাণ্ড রে বাবা! উঃ সে কোতায় কোতায় আলোর ডুম দেচে।

—রাত বলে এতটা সুন্দর লাগছে।

—ওঃ মা গঙ্গারে বেড় দে ফেলেচে একেবারে। বাবুদির গড় করতি হয়।

মোটর বাইকে এক সার্জেন্ট এসে থামায়।

—আপনারা কাইন্ডলি এখানে গাড়ি দাঁড় করাবেন না।

মিথিল বলে, 'না, না, এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। আমি জানি যে দাঁড়ানো বারণ।'

সার্জেন্টটি অসম্ভব ভদ্র।

—আই অ্যাম সরি...বাট...

—না, না, চলো—আমরা উঠে পড়ি গাড়িতে। বাহাদুর চালাও ভাই।

কুছ লেনা হ্যায় লেনা হ্যায়
কুছ দেনা হ্যায় দেনা হ্যায়...

ওখান থেকে মিথিলের মাথায় এল কোথায় যাওয়া যায়। সুশান্তদের নাইট স্কুলে একবার যাবে। তার আগে রজতদার বাড়ি একটা কুইক ভিজিট।

রজতদার ড্রইংরুম সরগরম। মিথিল ও ভোগীকে বসান রজতদা। মিথিলকে কানে কানে বলেন, 'এর কথাই বলেছিলে?'

মিথিল মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে।

—বসুন ভাই, বসুন।

রজতদার সঙ্গে তখন আই. এস. আই-এর অর্থনীতির অধ্যাপক পুরুষোত্তম চ্যাটার্জির জোর তর্ক চলেছে। পুরুষোত্তম করেছেন কি রবিন ব্ল্যাকবার্ন সম্পাদিত 'আফটার দা ফল—দা ফেলিওর অফ কমিউনিজম অ্যান্ড দা ফিউচার অফ সোশালিজম' বইটি পড়েছেন এবং সবিশেষ প্রভাবিত

হয়েছেন। বিশেষত এরিক হবসবম, ফ্রেডরিক জেমসন এবং র‍্যালফ্ মিলিব্যান্ডের লেখাগুলো তাঁকে ভাবাচ্ছে। এর কোনও কিছুই রজতদাকে ইমপ্রেস করে নি।

—দ্যাখো পুরুষোত্তম, আমার সহজ কথাটা হল এই নিউ লেফট রিভিউ মার্কা অ্যানালিসসগুলো আমি মেনে নিতে পারি না—বলতে পারো যে, সেটা আমার লিমিটেশন—যাই হোক, আমার কথা হল তুমি যেটাকে বলছ ফেলিওর আমি সেটাকেই বলছি বিট্রেয়াল। ভুলচুক কটা হয়েছে? হ্যাঁ, এক এক সময় মনে হয়েছে গাইড টু অ্যাকশনের বদলে ডগমার দিকে পাল্লা ভারি। সো হোয়াট! কমরেড স্তালিন বা কমরেড মাও তো আর আর্মচেয়ার থিওরেটিশিয়ান ছিলেন না, তাঁদের এত বড় বড় কাজ করতে হয়েছিল—তাতে একটু আধটু গলদ থাকতেই পারে—

—কিন্তু সেটা ঠিক থাকলে এরকম হাম্পটি ডাম্পটি শো হতো না রজত দা।

—তাহলে চায়নাতে হল না কেন? ভিয়েতনাম, কোরিয়া, কিউবা কী করে লড়ে গেল। দ্যাখো, ফান্ডামেন্টাল টেনেট্স্ বলতে আমরা যা বুঝি—ওয়ার্কিং ক্লাসের ফিলসফিকাল আউটলুক, ডায়ালেকটিকাল অ্যান্ড হিসটরিকাল মেটেরিয়লিজম, মার্কসিস্টলেনিনিস্ট পলিটিকাল ইকনমি, ক্লাস স্ট্রাগল, যেটা মোটিভ ফোর্স, তারপর শ্রমজীবী মানুষের স্টেট, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি গড়ার প্রয়োজনীয়তা—ক্যাপিটালিজম থেকে সোসালিজম হয়ে কমিউনিজম—এর একটাও ইনভ্যালিড নয়—

—তার মানে সেই মডেল, সেইভাবে?

—হ্যাঁ, সেই মডেল, সেইভাবে। তিনচার বছরের সেটব্যাক দেখে সব নড়েচড়ে গেল অত দুর্বল কমিটমেন্ট আমার নয় পুরুষোত্তম...

মিথিল বলে, 'সরি রজতদা, আমরা তাহলে উঠি।'

—সেকি এই এলে, ওঁকে নিয়ে এলে, কথা হল না।

—আর একদিন হবে রজতদা। আরও কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে আমাদের।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমাদের অন্তত এগিয়ে দেবার ভদ্রতাটুকু করি। পুরুষোত্তম, আমি এক্ষুনি আসছি।

রজতদাকে মিথিল বলে, 'রজতদা, উনি পরশু চলে যাচ্ছেন।'

—ও তাই? আপনার কথা মিথিলের কাছে শুনে কী বলব ভাই, খুব অবাক লেগেছিল।

—আপনারা কত জ্ঞানীমানী লোক, আমারই সৌভাগ্য যে দেখা পেলুম।

—না, না, তা কেন? জেনে কী হল এটাই তো বোঝা যাচ্ছে না ভাই।

একটু বাগান বাগান। রাত পেয়ে ঝিঁঝিপোকা ডাকছে।

—আর আমরা যে বাবু কিছুই জানলাম না। সেটাতেই বা কী হল? জেনেও হল না। না জেনেও হল না। মধ্যে যত ধিপ্পি নাচন। যাই বাবু।

রজতদা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। গাড়ি চলে যায়। ড্রইংরুমে ফিরে আসেন। পুরুষোত্তম হেসে বলেন, 'নিশ্চয়ই কোনও অ্যাবস্কনডিং এক্সট্রিমিস্ট।' রজতদা চুপ করে থাকেন। উত্তর দেন না। পুরুষোত্তম বলেন, 'চেহারাটা অনেকটা সেই কিউবার রেভলিউশনারিদের মতো—ফিদেল, চে, ক্যামিলো, রাউল...।

গাড়িতে তখন বাহাদুরের ক্যাসেট বাজছে।

—তু তু তু তুতু তারা...দিল হামারা।

—ঘরে কত বই। আচ্চা মিতিলবাবু সব যে অত বই ওতে সব কতা নেকা আচে, তাই না?

—সব কথা মানে কী বলো?

pathagar.net

—এই আমি কেন ভোগী হলাম। কাঁকড়া কেন কাঁকড়া হল? তোমার সঙ্গে কেন দ্যাকা হল? এত যে দ্যাকা-সাক্কাৎ, এত মেলামেলি—সব নেকা আচে মিতিলবাবু?

—কিছু লেখা নেই ভোগী। কেউ কিছু জানে না।

—তবে কীসের জোরে সব কিছু হচ্চে?

—কে জানে?

—আমি জানি মিতিলবাবু।

—কীসের জোরে?

—আলোর জোরে। আলো থাকলি ভিজি মাটিতি, গাঙের ধারে দেকবেন গেঁড়ি-গুগলি-শামুক সবাই আসতেচেন...কোনও ওজর নি, কোনও আপত্তি নি, হেঁচড়ে হেঁচড়ে আসতিচেন...তারপর সমুদ্দুরের কাঁকড়ারা আসবেন, মাচ আসবেন।

—তারপর কী হবে ভোগী?

—পরশু আমি জানবো।

ও লাল দোপাট্টেওয়ালী তোরা নাম তো বাতা, তেরা নাম তো বাতা, তেরা নাম তো বাতা...

বাহাদুর ছোট হয়ে আসা বিড়ি ঠোঁট উল্টে মুখের ভেতরে নিয়ে গলি গলি বস্তির রাস্তা দিয়ে ভেতরে ঢোকে।

মিথিল গাড়ি থামাতে বলে। কয়েকটা পুলিশ। জটলা। থমথমে ভাব। ভোগীকে গাড়ি থেকে নামতে বারণ করে। মিথিলের বন্ধুদের একটা দল এখানে একটা নাইট স্কুল চালায়। কুচকুচে কালো, লম্বা চেহারায় সাদা গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরা একটা ছেলে এগিয়ে আসে।

—কাকে চাই দাদা! ও আপনি সুশান্তদার ফ্রেন্ড না?

—হ্যাঁ ওদের স্কুল আজ বসে নি।

—না। কাল লোকাল ছেলেদের সঙ্গে হেরোইন পার্টির জোর কওয়ালি হয়েচে...বোমচার্জ করেচে...তাই ইস্কুল বন্ধ।

—এখানে যারা ড্রাগের কারবার করত সেগুলো কোথায়?

—দুতিন ঘর ছিল। আমরা মেরে তুলে দিয়েছি। হারামিগুলোকে আর ঢুকতে দেব না।

—ভাল। ঠিক আছে ভাই। চলি।

—আসুন। সুশান্তদা এলে কিছু বলতে হবে?

—বললেই হবে যে, মিথিল এসেছিল।

—মিথিল?

—হ্যাঁ।

বাহাদুর প্রায় একটা বন্ধ দোকানের ঝাঁপে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি ঘোরায়। হেডলাইটের চড়া আলো চোখে পড়ায় পুলিশরা চোখ ঢাকে। তাদের হাতে বন্দুক।

বাড়ি ফিরে গাড়ি ছেড়ে দেয় মিথিল। খাওয়াদাওয়ার পর মিথিলের ঘরে ভোগী বিড়ি খেতে খেতে রেডিও শোনে। মিথিল মিমিকে ফোন করে।

—শোনো, কাল সকালে ও মাসিমণির সঙ্গে কালীঘাট যাবে। বিকেলে আমরা মিট করতে পারি।

—কাল আমি ফ্রি। কোনও প্রবলেম নেই। এমনিতে ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ, অ্যাপারেন্টলি কিছু বোঝার উপায় নেই। তবে মাঝে মধ্যে ফ্যাসিনেটিং সব কথা বলছে। আর জানো, অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছি। ওর সঙ্গে কিছুটা যাব।

—আমিও যাব।

pathagar.net

—সে তুমি বোলো বরং। তবে কন্ডিশনটা ও বলে দিয়েছে।

—কী?

—যখন যেখান থেকে বলবে ফিরে আসতে হবে। ঠিক আছে মিমি। ঘুম পেয়ে গেছে। রাখছি। কাল দেখা হবে।

—এক্ষুনি চলে এসো মিথিল। ভীষণ তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।

—ঘুমোও। আমারও ঘুম আসছে।

—মি...থি...ল...

মিথিল আস্তে করে ফোন নামিয়ে রাখে। ঘরে ফিরে দ্যাখে ভোগী অকাতরে ঘুমোচ্ছে। রেডিও বাজছে। মিথিল রেডিওটা বন্ধ করে দেয়।

পরের দিন সকালে দেরি হয় মিথিলের ঘুম ভাঙতে। উঠে দেখে ভোগী মাসিমণির সঙ্গে কালীঘাট চলে গেছে। অনন্ত বলল যে গাড়ি এসেছিল। চা খেয়ে কাগজটা নিয়ে বসেছে। ফোন এল। ফোন করেছে সুমিতেশ। ওরা গড়িয়াহাটের কাছে হায়ার সেকেন্ডারি থেকে গ্রাজুয়েশন লেভেল অবধি একটা কোচিং খুলেছে। ভাল ছেলে ছাড়া পড়াবে না। ওরা চায় যে মিথিল ইংরিজিটা পড়াক। সপ্তাহে দুদিন। মিথিল বলল করতে তার আপত্তি নেই তবুও ফাইনালি দুদিন পরে জানাবে। অনন্তকে বলল নীচের মেজনাইন ফ্লোরের ঘরটা যেন পরিষ্কার করে রাখে। ওখানে স্বচ্ছন্দে আগের মতো কয়েকজনকে পড়ানো যায়। ওদের ফিরতে দেরি হচ্ছে। নিজের ঘরটা গুছোতে থাকে মিথিল। খাটের তলা থেকে একগাদা ধুলো পড়া ম্যাগাজিন, সিগারেটের প্যাকেট, মাকড়সা, বিয়ারের বোতল, বুল ওয়ার্কার, ভাঙা গিটারের টুকরো (ড্রাগের ঝোঁকে আছড়ে ভাঙা), ড্রাগ বিষয়ক লিফলেট, খবরের কাগজ, আরও কত কি বেরোয়। মিথিল অনন্তকে বকে। যদিও এতে অনন্তর কোনও দোষ নেই কারণ এতদিন মিথিলেরই হুকুম ছিল যে ওর ঘরে হাত দেওয়া যাবে না। ধুলো মেখে, ঘেমে মিথিল অস্থির তখন এল মিমির ফোন। প্রব্লেম। মিমির মা, বাবা দুদিনের জন্য ব্যারাকপুর গেছেন সকালে। ওদের বাড়ির কাজের লোক নতুন। তাই পুঁটিকে দেখার জন্যে মিমিকে থাকতে হবে। মিমি ওদের বলল বিকেলে আসতে। কি ঝামেলা। ওদিকে ওরাও আসছে না।

ভোগীরা ফিরল বেশ বেলায়। কালীঘাটে আজ অসম্ভব ভিড় ছিল।

—দম আটকে যায় প্রায়। তার মধ্যে ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি। আমার আবার দুশ্চিন্তা। ভিড়ের মধ্যে ও হারিয়ে গেলে আবার আর এক কাণ্ড।

—বাচ্চা ছেলে নাকি যে হারিয়ে যাবে? কী, মা কালী দর্শন হল?

—ভাল মতো দরশন হয়ে গেল। তারপর তোমার গে নকুলেশ্বর ভৈরবের পুজোও দিলাম।

—সেটা আবার কোথায়?

—শোনো মাসির কতা। মায়ের মন্দির জানে, ভৈরব জানে না।

—গেছে নাকি কোনওদিন যে জানবে?

—কে বলেছে যাই নি?

—মা থাকলি জানবে ভৈরবরে থাকতি হবেই। ইনি আচেন, উনি নেই এমনটি জানবে হতিই পারে না।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে ভোগী আবার ঘুমিয়ে পড়ল। খুব ভাল করে খেয়েছিল ভোগী। খাওয়ার পরে দই, মিষ্টি—সব। খুব তৃপ্তি করে খেয়েছিল। মিথিল সিগারেট খায় চেয়ারে বসে। ভোগীর মুখটা দেখে। শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে।

সন্ধেবেলায় মিমির বাড়িতে স্যান্ডউইচ, চা, মিষ্টি খাওয়া হল। মিমির এক বন্ধু ওকে 'ড্রাগন

: ব্রুস লি স্টোরি'-র ভিডিও ক্যাসেট দিয়েছিল। সেটা দেখা হল। জেসন স্কট লি যখন জন চেং-কে বেধড়ক প্যাঁদাচ্ছে তখন ভোগীর আনন্দ দেখতে হয়। সে একেবারে রীতিমতো উল্লাস!

—করো, আরও অধম্ম করো, তারপর একন কেমন পেটন দিচ্চে...উঃ রে...উঃ রে...আরে শালার হয়ে গেচে...আবার মুখ দে কেমন গজ্জন করতেচে...ওরে বাবা পেছনের থে আর এট্টা আসতেচে, (লি আচমকা ঘুরে লোকটার বুকে প্রচণ্ড এক লাথি মারে) দেচে দেচে...হাঃ হাঃ হাঃ এক পদাঘাতে শালা খতম...মার্...মার্... ভোঁদাটা পালাচ্চে...হ্যাঁ, একন কেমন ম্যাং ম্যাং করতেচে দ্যাকো... কেনরে শালা... তখন মনে ছিল নি...এইরে, গলার ওপরে পা তুলে দিয়েচে গো...চোক ঠিকরে বেরোচ্ছে...মার...এট্টাকেও ছাড়বি নি...হা হা... মোচ্ছব...মোচ্ছব...

মিমির বাড়ি থেকে ফেরার আগে মিমি বলল, 'আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব। তুমি না বলতে পারবে না। কাল আমিও যাব।'

ভোগী চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'না গেলিই নয় মেমিদিদি!'

—না গেলেই নয়।

—তা ইনি যকন যাচ্চেন তকন উনিও চলুন। ভোগী হাসতে হাসতে গাড়িতে ওঠে।

—কুকুরির নাম পুঁটিমাছ! হে হে...পুঁটিমাছরা জানতি পারলে কী ভাববে কে জানে। আচ্চা মিতিলবাবু, আমার যে একন বেরান্ডি খাবার বাসনা ছিল তার কী হবে?

মিথিল একসেকেন্ড ভাবে। বৃহস্পতিবার। ড্রাই ডে।

—ঠিক আছে। বাহাদুর, ল্যান্সডাউন রোড চলো।

—মোটর ভেহিকেলস কি পাস্। মালুম হ্যায় বাবুজী।

—ঐ মোটরের কাছে বুঝি মদের দোকান!

—না, না, দোকান নয়। আজকে তোমার বৃহস্পতিবার তো। মদের দোকান বন্ধ থাকে। ওখানে একটা জায়গায় একটু বেশি দামে পাওয়া যায়।

রাস্তার আলোগুলো কোনও কারণে জ্বলছে না। যদিও লোডশেডিং নয়। ডাঁই করা ময়লার গাদাটা পেরিয়ে গাড়িটা দাঁড়ায়। মিথিল জানলার কাছে মুখ নিয়ে এদিক ওদিক তাকায়। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে আধবুড়ো লোকটা বেরিয়ে আসে।

—কি মাল নেবেন বাবু?

—কি আচে।

—সব আচে। রাম আছে, হুইস্কি আছে, ব্রান্ডি আচে।

—কি ব্রান্ডি?

—হানিবি হবে বাবু।

—একটা হাফ।

মিথিল একশো টাকার নোট এগিয়ে ধরে। লোকটা টাকাটা নিয়ে চলে যায়। ভোগীকে বলে, 'এ জায়গাটা ভাল। কয়েকটা আরও ঠেক আছে। সেখানে জালি মাল পাওয়া যায়।'

মিথিল সিগারেট ধরায়। আধবুড়ো লোকটা একটু লেংচে হাঁটে। বোতলটা দেয়। তারপর টাকা ফেরত দেয়। গাড়ি চলতে থাকে। ভোগী গাড়ি দাঁড় করায়। বোতলটা নেয়। প্যাঁচ কেটে মুখটা খোলে। মিথিলকে ইশারা করে খেতে বলে। মারুতিভ্যানের মধ্যে ধক করে গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ে।

—আমি ব্রান্ডি খাই না ভোগী। আমার ভাল লাগে না।

—ভাল লাগে না তো এক ফোঁটা খাও।

মিথিল প্রায় ঠোঁটে ঠেকিয়ে ফিরিয়ে দেয়। তাও সামান্য পড়েছে মুখে। ভোগী বোতলটা তুলে

ঢক ঢক করে ঢালে। নামায়।

—তোমার ঐ এট্টা সিগ্রেট দাও দিনি।

সিগারেট টানতে থাকে।

খাব না, খাব না ইচ্ছে
এক পালি চাল, একটা উচ্ছে

আবার ঢক ঢক করে খায়। মাথা ঝাঁকায়। আবার খেয়ে বোতলটা শেষ করে। বাইরে ফেলে দেয়। চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানে ভোগী। চোখ বন্ধ করেই বলে,

—এইবার ঘরে চলুন মিতিলবাবু। কাল সেই কাকভোরে বেরতি হবে।

—ভোগী, একটা ভুল হয়ে গেল যে।

—কী ভুল?

—মিমি যে যাবে বলল। ঠিক আছে ফোনে বলে দেব। ছটার আগে বেরোবার দরকার হবে?

—না, দেরি হয়ে যাবে। অন্ধকার থাকতি থাকতি শুরু করতে হবে।

—অন্ধকার থাকতে থাকতে হলে তো সাড়ে চারটে নাগাদ যাওয়াই ভাল।

বাড়িতে ফিরে বাহাদুরকে সেইমতো বলে দিল মিথিল। মিমিকেও ফোনে বলল রেডি থাকতে।

ভোগী বাড়িতে ঢুকেই বলল ও রাতে কিছু খাবে না।

—আমার একন খাওয়া বারণ। মিতিলবাবু তুমি খেয়ে নাও। মাসি, আপনারা আহার করুন। আমি ঘরে গে বসি।

মিথিল ওপরে উঠে দেখল ভোগী ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বারান্দায় বসে আছে।। আরও দেখল যে ভোগী মিথিলের জামা কাপড় ছেড়ে নিজের পোষাক পরেছে। পুঁটলিটা বেঁধে ঘরের কোণে রাখা। বাথরুমে মিথিলের জামাকাপড়। ভোগী যেগুলো পরেছিল। ভোগী একের পর এক বিড়ি খায়। একসময় উঠে এসে মিথিলকে বলে,

—তুমি ঘুইমে পড়। আমি ঠিক ডেকে দেব তোমাকে।

—তুমি শোবে না?

—সে ঘুম পেলে শোবোখন।

আলো নিবিয়ে শুয়ে থাকে মিথিল কিন্তু ঘুম আসে না। মেঘ ডাকল। বিদ্যুৎ চমকাল। সেই কয়েক ঝলকে ভোগীকে দেখতে পায় মিথিল। শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছে। কিছু একটা বিড়বিড় করছে কি? কোন্ সময় যে ঘুমিয়ে পড়ে মিথিল। বৃষ্টি শুরু হয়। ঝিরঝির করে।

ভোররাতে ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। মিথিলকে ধাক্কা দিয়ে ডাকে ভোগী।

—উঠে পড়ো মিতিলবাবু। গাড়ি এসে গেচে।

মিথিল ধড়মড় করে উঠে বাথরুমে গিয়ে চোখমুখ ধুয়ে আসে। জিন্স পরে। সার্টের ওপরে একটা উইন্ডচিটার গলায়। পায়ে অ্যাডিডাসের 'স্ট্যান স্মিথ' টেনিস শু। মিথিলকে দুর্দান্ত দেখায়। চটপট চুলটা আঁচড়ে নেয়।

—তুমি একটুও ঘুমোও নি।

—ঘুম এল নি।

মাসিমণি উঠে পড়েছিলেন! সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। অনন্ত ঘুমোচ্ছে। উনিই দরজা বন্ধ করবেন।

—আমি তাহলে এলাম মাসি।

—আবার এসো।

—মাসি, তুমি মিতিলবাবুকে কুলেখাড়া শাকের রস খেতে দিও। ওকে নিয়ে ভেব নি। পবিত্তির

পর নিবিত্তি। নিবিত্তির পর নির্বিকার। আমি খেয়াল রাকবখন।

শহরে শেষরাত আর নীলভোর। বাহাদুর ফাঁকা রাস্তায় হেডলাইট জ্বেলে বেশ জোরে চালায়। মিমিদের বাইরের ঘরে আলো জ্বলছিল। মিমি বেরিয়ে আসে। আলোটা জ্বলতে থাকে। কুকুরের ডাক শোনা যায়।

গাড়ি উড়ছে। বৃষ্টি পড়ছে একটু অন্যরকমের। এরকম বৃষ্টিতে ওয়াইপার চালানো যায় না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফোঁটা ফোঁটা জল কাচের ওপর জমলে একবার চালালেই কাজ চলে যায়। ভিজে ওয়েদার দেখে মিমি একটা সিন্থেটিক শাড়ি পরেছে যেটা সচরাচর ও পরে না। ঠাণ্ডা বাতাস আসে বলে আঁচলটা জড়িয়ে নেয়। মারুতি ভ্যান হাওড়া পেরিয়ে বম্বে রোড ধরে। বৃষ্টিটা জোরে হয়।

কোনও রহস্যময় কারণে বাহাদুর ক্যাসেট বাজায় নি। একবার একটা জোর ঝাঁকুনি খেতে হয় কারণ বৃষ্টির আবছায় বাহাদুর স্পিডব্রেকার দেখতে পায় নি। মিথিল ঢুলছে। যদিও চোখ বন্ধ করে আছে। জানলা দিয়ে হু হু বাতাস ঢুকছে। ভোগী একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে বাইরে। মিথিল আর মিমি দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। বালটিকুরি, আন্দুল, উলুবেড়িয়া—দুপাশে একদম ফাঁকা। ভোগী ফাঁকার মধ্যে তাকিয়ে থাকে। উড়ন্ত জলের কণা এসে ওর চুলদাড়িতে বসে। রূপনারায়ণ পেরিয়ে কোলাঘাটে গাড়ি ঢুকতে চা-র দোকান যেখানে পর পর সেখানে ভোগী গাড়ি দাঁড় করাতে বলে। বাহাদুর তার চেনা দোকানের দিকে গাড়ি নেয়। বৃষ্টি পড়ছে। উইক ডে। ভিড় নেই। কিন্তু স্থানীয় লোক। ওরা উল্টোদিকের বাস ধরবে। বাহাদুরের এই রাস্তা খুব চেনা। মণ্টুমামাকে নিয়ে অনেকবার আসতে হয়েছে। মিথিলের চটকা ভেঙে যায়।

boighar.net

—ও, কোলাঘাট এসে গেলাম।

মিথিল মিমিকে ধাক্কা দিয়ে তোলে। ওরা নামে। মিথিল মিমিকে বলে, 'কাল রাতে কিছু খায়নি। ঘুমোয়ও নি। মনে হয় ক্ষিদে পেয়েছে।'

ভোগী বলে, 'তোমরা চা টিফিন খেয়ে নাও। আমি এট্টু ফাঁকায় যাই।'

—তুমি খাবে না?

—না, আমার খাওয়া বারণ।

ভোগী একটু দূরে যেয়ে সুতোর সঙ্গে বাঁধা সেই জিনিসটা বের করে। দুলছে। বাঁদিকে দুলছে, এর আগে গোল হয়ে ঘুরছিল। ভোগী একবার আকাশের দিকে তাকায়। মেঘলা। ছাই ছাই।

—মিথিল, এখন মনে হচ্ছে আমার না এলেই ভাল হতো।

—কেন?

—কিরকম আনক্যানি লাগছে মিথিল।

—আমারও লাগছে। কিছু কিন্তু করার নেই।

—মিথিল, সত্যি ও মরে যাবে?

—ওঃ মিমি। আমি জানি না।

বাঁদিকে হলদিয়ার রাস্তা। বাহাদুর পর পর তিনটে অয়েল ট্যাঙ্কারকে ওভারটেক করে। অস্বাভাবিক লম্বা একটা ট্রাক পেছনে পড়ে থাকে যার শেষে একটা লাল আলো জ্বলছে। ভোগী একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে। প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পরে একটা বিরাট গোল চক্কর। ভোগী গাড়ি থামাতে বলে। গাড়ির মধ্যে বসেই সুতোটা ধরে ঝোলায়। কালো জিনিসটা প্রথমে নিশ্চল ছিল। তারপর একদিকে যেতে আসতে শুরু করে। ভোগী হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয়। কাঁথির রাস্তা। পুঁটলিটা কোলে নিয়ে ভোগী দুটো হাত বুকের কাছে জড়ো করে বসে আছে। তার চোখের পলক পড়ছে না। মিমি মিথিলের কাছে সরে আসে। মিমির চোখে জল। মিথিল মিমিকে শক্ত করে জড়িয়ে রাখে।

মাথায় চুমু খায়। বৃষ্টি আরও জোরে হয়। মেঘ ডাকে। ভোগী অপলক তাকিয়ে আছে। ভোগী সুর করে কী একটা বিড়বিড় করছে। মিথিল একটু ঝুঁকে শুনতে চেষ্টা করে। বুঝতে পারে না। অভিমান্য পণ্ডিতের মুখটা যেন দেখতে পায় মিথিল। তার কথাগুলো শুনতে পায় কি ভোগীর ঐ বিড়বিড় করার সুর ধরে, 'চারদিকে এত অনাচার, অত্যাচার, ধম্মোলোপ, খুন-খারাপি, চোপরদিন চুরিচামারি—এই অনাছিষ্টি দূর করার জন্যেই ভোগী আসে। তারপর যা বললাম...' প্যাচপেচে কাদা, নোংরা কাঁথির বাস্তায়। লোকজনও আছে। বাসনের দোকানের সামনে একটা সাইকেল রিকসার চাকা ড্রেনে পড়েছে। ছোটখাটো একটা জটলা। বাহাদুর হর্ন দিতে একটা ছেলে, মাতব্বর গোছের, ভিড় ঠেলে গাড়ি যাওয়ার রাস্তা করে দেয়। বড় বড় মাছ নিয়ে দুটো লোক। গরু। কুকুর। আওয়াজ। সিনেমার পোস্টার। রেডিওর দোকান। ক্যাসেট। ভোগীর চোখে পলক পড়ে না। সে কী দেখছে সেই জানে। মিমি মিথিলকে কানে কানে ফিসফিস করে বলে, 'কী হবে মিথিল?'

ভোগী হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে, বাহাদুরও চমকে যায়। তারপর আবার চুপ। মিথিল সিগারেট ধরায়। বাহাদুরকে বলে, 'এ রাস্তা তো দীঘার।'

—হ্যাঁ, বাবু।

ভোগী শুনতে পায় বলে মনে হয় না। হাওয়ার চরিত্র পাল্টাচ্ছে। কখনও মনে হতে পারে সমুদ্র এত কাছে যে, একটু গেলেই দেখা যাবে। কিন্তু তা হয় না। মাঠের পরে গাছের সারি শেষ হতে না হতে আবার মাঠ শুরু হয়ে যায়। মিথিল রাস্তার ধারে চোখ রেখে দেখে—দীঘা—সাত কিলোমিটার। কাঁটা যাট থেকে সত্তর কিলোমিটারের মধ্যে উঠছে নামছে। ভোগী হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, 'আস্তে, এবারে এট্টু ধরে ধরে চলো। এট্টা নিমগাছ পড়বে।'

—বাহাদুর, আভি কুছ স্লো চালাও।

গাড়ির গতি নেমে ১৫ থেকে ২০তে চলে আসে। বাহাদুর সেকেন্ড গিয়ারে চালায়। বৃষ্টিটা ধরেছে। ভোগী গাড়ি থামাতে বলে। নামে। কালো জিনিসটা দুলচে না। স্থির। আবার গাড়িতে ওঠে। এবারে স্পিড আরও কম। মাত্র দশ বা বারো। বাঁদিকের গাছগুলো লক্ষ করছে ভোগী। এবারে ও বাহাদুরের কাঁধে খিমচে ধরে। মুখে কিছু বলে না। বাহাদুর একটা মোড়ে গাড়ি সাইড করে লাগায়। ওরা যেখানে নামল সেখানে বাঁদিকে ক্যানালের ধার দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে। মোড়েই ডালপালা ছড়িয়ে নিমগাছ। ভোগী গাছটার দিকে তাকায়। কয়েকটা ভেজা কাক ডাকতে ডাকতে উড়ে যায়।

—এসে পড়েচি। ঐ তো নিমগাছ। নিমবিক্ষ।

কাকেরা সাড়া দিল।

সুতোটা বের করে। কালো গোলটা দুলতে দুলতে সিধে রাস্তা আর বাঁদিকের রাস্তার মধ্যে আড়াআড়ি ভাবে দুলতে থাকে। বাহাদুরও নেমে এসেছে।

ভোগী হঠাৎ মুখের কাছে হাত জোড় করে সেই দিকে তাকিয়ে চেঁচায়, 'আমি এসে পড়িচি, ভো...গী...জানান পে...য়ে...চো...?'

তার উত্তরে দমকা হাওয়ার ঝাপ্টা ছুটে-আসে। মিমি ফুঁপোতে শুরু করে। তার ঠোঁট কাঁপছে। ভোগী পুঁটলির মধ্যে থেকে হাতড়ে হাতড়ে ছোট্ট একটা কাগজের মোড়ক বের করে। সেটা বাহাদুরকে দেয়।

—অপঘাতে মরণ ছিল তোমার। এইটে মাদুলি করে পরবে। বেঁচে যাবে কিন্তু অঙ্গহানি আমি ঠেকাতে পারব নি।

বাহাদুর প্রণাম করতে যায়। ভোগী করতে দেয় না। এবার ওদের দিকে যায়,

—ওরে আমার মেমিদিদিরে...কেঁদেকেটে এক্কেবারে একসা করেচে...দ্যাকো দিনি...এ মেয়ের তো দেখতিচি বড্ড নরম সোভাব...তুমি মা কক্‌খোনো কারো ছেরাদ্দ খেও নি মা...পোয়াতি থাকলি বাপ মরলিউ নয়...

ও মেমি
ও আমার বাবু
আমার বড় জ্বর হয়েচে, তোমরা দুদে সাবু
আমার আবার জম্ম জম্ম বাই
এবার আমি যাই?
মিতিলবাবুরে...তোমাদের মনোমিল খুব পাকা
এবার তোমরা বে করে ফেল
আমি ঠিক দেখতি পাব
আমি দেকব...

মিথিল এগিয়ে গিয়ে ভোগীর হাত চেপে ধরে। ভোগী ছাড়িয়ে নেয়।

—তোমার সঙ্গে কিন্তু আড়ি থাকল, বন্ধু ভাব হলি পরে হবে বাদায় না লাটে? হয় মাইবিবির হাটে নয় স্বপনের ঘাটে।

ভোগী ঘুরে হাঁটতে থাকে। সামনে একটু উঁচু। তার ওপর উঠতে থাকে। মিমি জোরে কাঁদছে। মিথিল তাকে জড়িয়ে রাখে। বাহাদুরও চোখ মুছছে। ভোগী আর একবারও ফিরে তাকায় না। উঁচুর ওপরে ওঠে। নেমে যায়। তাকে আর দেখা যায় না। ওর চলে যাওয়ার দিক থেকে হা হা করে হাওয়া এসে আছড়ে পড়ে। ওদিকে আকাশে আবার কালো মেঘ সাজছে। সবাইকে জড়িয়ে রেখেছে হাওয়ার শব্দ, ঝড়... ওরা অনেকক্ষণ ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

...

ভোগী হাঁটতে থাকে। জোরে জোরে। কখনও কখনও পাথর বেরিয়ে আছে মাটি থেকে। নোনা বাতাসে ক্ষয়ে যাওয়া পাথর। মাটিই বেশি। কোনও মানুষের শব্দ নেই। মেঘলা আকাশ। কিছুটা দমবন্ধ করা গুমোট থাকছে আবার তারপরেই সাঁই সাঁই করে ভেজা বাতাস ঘাস আর কাঁটাঝোপের মাথা নুইয়ে দিয়ে ছুটে আসছে। একটা ছোট নালা। অগভীর। তাতে ঘোলা জল ছুটছে। ভোগী পেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময় পুঁটলিটা নালার জলে ফেলে দেয়। কিছুটা ঘোলা জল হাতে নিয়ে মাথায় দেয়। কাদা কম, মাটিতে বালির ভাগ বাড়ছে। আবার—একটু উঁচুনিচু। অনেকটা। অনেকটা জায়গা ধরে। উঁচুটার ওপরে যেয়ে বসে। হাঁপায়। ঝিমুনি আসছিল হয়তো কিন্তু বাতাসের একটা দল চারদিক তোলপাড় করে চলে গেল আর সেই বাতাসে ভর করে এসেছিল সমুদ্রের আওয়াজ। সমুদ্র কত দূরে। ভোগী উঠে হাঁটতে থাকে। আকাশে এরোপ্লেনের শব্দ। ভোগী আড়চোখে আকাশের দিকে তাকায়। মেঘের ওপর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে উড়োজাহাজ যাচ্ছে। দেখা না গেলেও আওয়াজ শোনা যায়।

বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে জল। পাশে ভাঙা হাঁড়ি, পোড়া কাঠ, গাছের ডাল মাটিতে পোঁতা, সেই ডালে নোংরা ছেঁড়া ন্যাকড়া বাঁধা। জলে ভেজা মাটিতে তিন আঙুলে পাখির পায়ের ছাপ। ছাপের গর্তে জল ভরে রয়েছে যেন আকাশে তাকানো চোখ। ভাঙা শামুক খোল। ভোগী বিড়বিড় করছে সুর করে। এত আস্তে যে, শোনা যায় না।

আবার শুকনো। দূরে গাছপালা দেখা যায়। জোর দমকা বাতাস আসে। ভোগীর মাথার ওপর দিয়ে কর্কশ ভারি চিৎকার করে একটা দাঁড়কাক উড়ে গিয়ে সামনে বসে। ভোগী থমকে দাঁড়িয়ে

যায়। দাঁড়কাক কালো চোখে ভোগীকে দেখে। ডাকে না কিন্তু ঠোঁট ফাঁক করে। ভোগী বিড়বিড় করতে করতে হঠাৎ থুথু ছেটায়। কাকটা উড়ে যায়। ভোগী চলতে থাকে। ভোগীর মাথার ওপর দিয়ে কাকটা পাক দিয়ে ওড়ে। চড়া রোদ থাকলে দেখা যেত কালো ছায়া। ভোগী দাঁড়িয়ে পড়ে। মাথা ঘুরে গিয়েছিল বোধহয় তা নাহলে হোঁচট খেয়ে সরাসরি আছড়ে পড়ত না। কপালটা ছড়ে গেছে। দাড়িতে বালিমাটি লেগে। কিছুক্ষণ পড়ে থাকে নিশ্চল হয়ে। দাঁড়কাকটা আড়ে আড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কাছে আসে। ঠোঁটটা ফাঁক। বেশ বড় ঠোঁট। পায়ের নখগুলো বেঁকানো। ভোগী একটা চিৎকার করে। কাকটা লাফ দিয়ে পেছিয়ে যায়। ভোগী উঠে দাঁড়ায়। কাকটা লাফ দিয়ে দিয়ে ওকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। একদলা কাঁকরমাটি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল ভোগী। সেটা ছুঁড়ে মারতে চোখে, ঠোঁটে, ডানায়, পালকে লাগে কাকটার। ঝটপট করে উঠে ওপরেই একটু তালগোল পাকিয়ে ওড়ে তাঁর মাটি থেকে কয়েক হাত মাত্র ওপর দিয়ে সোজা উড়ে দূরে যেতে থাকে। ভোগী মুখে অল্প হাসি নিয়ে ওকে পালাতে দেখে।

কয়েকটা ঝোপড়া ঝোপড়া ঘর। ভোগী প্রথমে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর গা থেকে জামাটা খুলে হাতে নিয়ে নেয়। এগোতে থাকে। জামাটা ঝোপড়ার সামনে ফেলে দেয়। দিয়ে চলতে থাকে। ভোগী কিছুটা দূরে চলে যাওয়ার পরে ওরা বেরিয়ে আসে। আঙুল নেই। নাক নেই। চোখ গলে গেছে। সমুদ্রের হাওয়ায়, সূর্যের আলোয় ওদের এখানে থাকার নিয়ম। তিনচার-জন ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে যে, ভোগী চলে যাচ্ছে। একজন আস্তে আস্তে গিয়ে জামাটা কুড়িয়ে নেয়। তারপর টুকরো করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে অন্যদের দেয়।

রোগা হাড়জিরজিরে একটা কুকুর ভোগীর সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপর সামনে সামনে চলতে থাকে। কুকুরটা চারপায়ে বেশ জোরে চলে বলে সেই সম্মোহনে ভোগীও জোরে জোরে পা চালায়। বেশ কিছুটা জায়গা ধরে—অনেক ঝিনুকের খোল। আঁষটে গন্ধ। ভোগী দাঁড়িয়ে যায়। সামনে, দূরে বা কাছে, কোথাও...কুকুরটা দাঁড়িয়ে শোঁকে। চলতে শুরু করে। ভোগীও চলতে শুরু করে। ভোগী বিড় বিড় করে। দাঁড়িয়ে পড়ে। বৃষ্টি শুরু হয়। ওপর দিয়ে একটা মেঘ চলে যাচ্ছিল। সে-ই বৃষ্টি দিয়ে গেল। ভোগী দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে, বৃষ্টিতে ভিজতে থাকে। কুকুরটাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজে। লোম ভিজে যাওয়ায় তার পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চোখদুটি বড়ই করুণ। ভোগীর পিঠ বেয়ে বেয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। ভোগী হাঁটতে শুরু করে। আবার পড়ে যায়। কুকুরটা কুঁই কুঁই শব্দ করে। ভোগীর মুখের কাছে মুখ আনে। থাবা দিয়ে মাটি আঁচড়ে খেলার ভঙ্গি করে, ডাকে। ভোগী উঠে দাঁড়ায়। হাঁটতে শুরু করে।

মাটিতে নুনের ফেনা। শাদা গ্যাঁজলা। ধারালো কাঁটা ঝোপ। এলোপাথাড়ি বাতাসে সমুদ্রের আওয়াজ। বেশ কাছে। কিছুটা দূরেই বালিয়াড়ি। কুকুরটা থমকে দাঁড়ায়। আর নড়ে না। ভোগী এগিয়ে যায়। কুকুরটা বসে আকাশে মুখ তুলে কাঁদে। ভোগী ফিরে তাকায় না। এগোয় সমুদ্রের আওয়াজ, আর তার সঙ্গে বাতাসের শব্দ, চোখ বন্ধ করে শুনলে এক এক সময় মনে হবে চিৎকার করে কাঁদছে কেউ, কখনও ইনিয়ে বিনিয়ে, মাঝে মধ্যে ঢেউ-এর দীর্ঘশ্বাস। বালিয়াড়ির ওপরে উঠতে থাকে ভোগী। ঠোঁট কাঁপছে। সাগরের হাওয়ায় সারা শরীরে ঠাণ্ডা কাঁপন। বালিয়াড়ির ওপরে উঠে সামনে তাকায়। কালচে মেঘে ঢাকা আকাশের তলায় দিগন্ত অবধি অবাধ সমুদ্র, রং গাঢ়, শাদা ফেনা থেকে থেকে।

বালিয়াড়ি ডাইনে বাঁয় দুদিকে চলে গেছে। ভোগী বাঁদিকে উঁচু নিচু দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এগোয়। শুকনো কাঁটাগুলি এড়িয়ে যায়। সামনে একটা উঁচু জায়গা। সেটা পেরোতেই দেখতে পায় লোকটাকে। এক মনে কি করছে।

লোকটা আধবুড়ো। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বলিষ্ঠ। একটা বড় পাথর। তার ওপরে ভিজে বালি ছড়িয়ে ঘষে ঘষে একটা ভারি কাতানে শান দিচ্ছিল। ভোগীর দিকে তাকায়। হাসে। কাতানটা জল দিয়ে ধোয়। আঙুল বুলিয়ে ধারটা দেখে পাশে রাখে।

—এলে?

—হ্যাঁ।

—ঐ হাঁড়িতে জল আছে। খাও।

ভোগী মাটির হাঁড়ি থেকে উপুড় করে জল খায়। খেয়ে হাঁড়িটা নামিয়ে রাখে। হাসে।

—এক্কেরে হাঁপ ধরে গেছে।

—হ্যাঁ, অনেকটা পথ তো।

—অনেকটা পথ।

লোকটা আবার পাথরের ওপর বালি দিয়ে, জল ছড়িয়ে কাতান ধার দিতে থাকে।

—এর আগের ভোগী কবে এসেছিলেন?

—সে অনেকদিন হয়ে গেল। শীতকালে। তা তুমি জানলে কী করে যে, তুমি ভোগী?

—বুঝতি পারলাম! ও ঠিক বোঝা যায়। এট্টু শুয়ে নিই।

—নাও। এখন অনেক বাকি।

ভোগী শুয়ে পড়ে। ঘোর আসে একটা। একদিকে সাগরের শব্দ। সেই সঙ্গে পাথরের ওপরে লোহা ঘষার আওয়াজ। কাত ফিরে হাতের ওপর মাথা দিয়ে শোয়। ঠিক ঐ লোকটাকে না, নিজেই ভুল বকার মতো বলে চলে,

—তো অন্দকার তকন বেশ হয়েচে। ভাবলাম যে যাই। জলে গেরণ দেখে আসি। গেরণ দেখতিচি, গেরণ দেখতিচি, তা ওমা, চেঙ মাচগুলো দেকি কাদার থে বেইরে এসে কি মাতন করতেচে... কোতায় রাতমণির জলছবি দেখব...তা সব ঘেঁটে দেচ্চে...তকন পষ্ট শুনতি পেলাম কানে...তুই ভোগী হ...শুনতিচিস...তুই ভোগী হ...কে যে বলল ঠাওর করতি পারলাম না...তারপর জ্বর হল...আটেকাটে দড় তো ঘোড়ার পিঠে চড়...ভোগী হয়েচি...তারপর সেই ভোগী

লোকটা বালিতে গলা অবধি পোঁতা একটা বোতল বের করে মদ খায়।

ভোগী অনেকক্ষণ ঘুমোয়। ঘুমের মধ্যে চিৎ হয়। হাসে। কথা বলে। লোকটা কাতান ধার দিয়ে চলে। বৃষ্টির ফোঁটা মুখে পড়তে ভোগীর ঘুম ভাঙল। দিন গড়িয়ে আকাশ আরও অন্ধকার হয়েছে। ঝোড়ো বাতাস দিচ্ছে। ভোগী আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ায়।

—সময় হয়েচে?

—তা প্রায় হয়ে এল।

—তাহলি তো সাজতি হয়।

—হ্যাঁ।

ভোগী বালিয়াড়ি পেরিয়ে সমুদ্রের দিকে যায়। ছোট ছোট ঢেউ ভাঙা জল পায়ে লাগে। একটু জল নিয়ে মাথায় ছিটোয়। কাপড়টা খুলে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। পরণে কিছুই নেই। হাঁটুজল ভেঙে ভেঙে এগোয়। তারপর মাঝারি ঢেউ পেরিয়ে গিয়ে ডুব দেয়। তিনবার। উঠে দাঁড়ায়। সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। উঠে আসে। চুলদাড়ি লেপটে রয়েছে। জোর হাওয়া। ভোগী ফিরে আসে।

—সরায় ভাত আছে।

—দাও।

ভোগী জল দেওয়া ভাত খায়। তৃপ্তি করে খায়। নুন নেই। শুধু মিঠে ভাত। খেতে খেতে দ্যাখে

যে, লোকটার কাতান ধার দেওয়া হয়ে গেছে। সে জল দিয়ে পাথরের ওপর থেকে বালি ধুয়ে দেয়। বৃষ্টি আসে জোরে। ভোগী মাটির হাঁড়ি থেকে জল খায়। আঁচায়। মাটির হাঁড়িটা রাখে। তাতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে। ভোগী হাসছে। হাসতে হাসতে পাথরটার দিকে এগোয়। লোকটা বোতলটা উপুড় করে খায়। খেয়ে বোতলটা ছুঁড়ে দূরে ফেলে কাতানটা তুলে নেয়। ঝড় আসে। অন্ধকার আরও ঘোর হয়। ভোগী বলে,

—আসি।

হাতদুটো পিছমোড়া করে পিঠে নিয়ে যায়। হাঁটুর ওপরে বসে। তারপর পাথরটার ওপরে বুক দেয়। হিঁচড়ে হিঁচড়ে এগোয়। মাথাটা উল্টো হয়ে পাথরের থেকে বেরিয়ে আসে। আর একটু এগোয়। গলাটাও বেরিয়ে আসে। গলার ওপরে নীচে ফাঁকা।

লোকটা কাতান সোজা করে ভোগীর গলার পেছনে আলতো করে ছোঁয়ায়। পুরো ভারটা দেয় না। তারপর সজোরের কাতানটা হ্যাঁচকা দিয়ে নিজের মাথার ওপরে তোলে। বিদ্যুৎ চমকায়। কাতান নেমে আসে।

কা...ট্

নিশীথে সমুদ্রতীরে যে-কাহিনির অবতারণা তা ভোগী উপাখ্যানেই শেষ হল না কেন? রাতের সমুদ্রের ঢেউ বার বার এসে সেই প্রশ্নটাই মুখে ফেনা তুলে জিজ্ঞেস করছে।

এরমধ্যে ভোগী গিয়ে সমুদ্রতীর থেকে ভোগীর মুণ্ডুটি নিয়ে এসেছে। এটা তার ট্রফি। সে বলেই দিয়েছে যদিও বাজারে জোর গুজব যে, সে অস্কার নমিনেশন পাবে, শ্রেষ্ঠ বিদেশি অভিনেতা হিসেবে, কিন্তু তার কাছে সিন্থেটিক পদার্থে নির্মিত অবিকল মুণ্ডুটি সেই পুরস্কারেরই সমতুল্য যা রবার্ট ডে নেরো বা অ্যালপ্যাচিনো পেয়ে থাকেন। মুণ্ডুটি তৈরি হয়েছিল মাদ্রাজের সুন্দরম স্টুডিওতে। এর আগেও ওরা কমল হাসান, জ্যাকি শ্রফ ও এঁরা বাদে অনেকে, যাঁরা ভিলেন করে খ্যাত যেমন অমরীশ পুরী ইত্যাদির মুণ্ডু বানিয়েছেন।

পরিচালকের ইন্টারভিউ-এর কিছুটা অংশ এবারে প্রয়োজনীয় সংযোজন।

—শেষটায় ডে ফর নাইট শুটিং করেছি। এগুলো স্ট্যান্ডার্ড টেকনিক। ফিল্ম কোড্যাক, ক্যামেরা অ্যারিফ্লেক্স-থার্টি ফাইভ, একটি বিশ ফুট ক্রেন ছিল, আর্টিফিশিয়াল লাইটের জন্যে জেনারেটর ছিল...এই স্টুপিড ডিটেলগুলো আপনাদের দিচ্ছি তার কারণ আপনারা স্টুপিড প্রশ্ন করছেন—আরও ডিটেল-এ যেয়ে আপনাদের বলতে পারি, ঐ যে শিরশ্ছেদের দৃশ্যটিতে লো অ্যাঙ্গল মিডিয়াম ক্লোজ শট নিয়েছি ফর্টি এম. এম. লেন্সে, ক্যামেরা জুম করেছে আর লংগিশ মিড শটগুলো নিয়েছি ফিফটি এম. এম. লেন্সে—নাউ, কোয়ায়েট, কোয়ায়েট—এই যা বললাম এর মধ্যেই একটা টুপি রয়েছে। সেটা কেউ পয়েন্ট আউট করবেন? আপনাদের ব্রেনগুলো এত ভাল জানলে অন্তত আজকে আমি বিয়ার অফার করতাম না।

—টুপিটা কোথায়?

—মাথায়। সমুদ্রের ধারে, একটা লোকেশনে, একটা বিশ ফুট ক্রেন নিয়ে যাওয়ার খরচটা কী প্রমাণ করে? প্রমাণ করে যে, নো কমপ্রোমাইজ। আমি এন. এফ. ডি. সি-র টাকা মারি নি।

—তার মানে আপনি বলতে চান অন্য যাঁরা করছেন তাঁরা টাকা মারছেন?

—নো কমেন্টস্।

—ছবির মধ্যেই তো আপনি এন. এফ. ডি. সি. সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলেছেন।

—নো কমেন্টস্। আ ফিল্ম ইজ আ ফিল্ম।

—থিমটা আপনি পেলেন কোথায়? এরকম কি হয়?

—এখানে হয় কিনা জানি না। তবে আমার এক বন্ধু, তিনিও ফিল্মমেকার, আপনারা অনেকেই নাম জানেন, তিনি বলেছিলেন আসামে নাকি এরকম হয়।

—সেখানেও কি ভোগী বলে?

—হ্যাঁ।

—ভোগীর মির‍্যাকলগুলো কী করে আপনি জাস্টিফাই করেন?

—দেখুন, ওগুলো ফেস ভ্যালুতে নিলে আমার হাসি পাবে। ওগুলোকে কবিতার চিত্রকল্প হিসেবে মেনে নিতে বাধা কোথায়? ভোগী কিন্তু তারকোভস্কির—'স্যাক্রিফাইস'-এর অট্টো নয়। আমার ছবিটার মূল থিম হল অল আউট কোরাপশন এবং তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে সোসাইটির চেষ্টা। ভোগী একজন কমন ম্যান। কমন ম্যানই প্রোটেস্ট করবে। করছে। তার জন্যে মরতে হবে।

—কিন্তু সেটা কি এসটাব্লিশড্ হয়েছে?

—যদি না হয় সেটা আমায় ফেলিওর। আসলে এর পরে আমি ভেবেছিলাম একটা ডকুমেন্টারি ন্যারেটিভে যাব। সেই মহেঞ্জোদড়োতে বাচ্চার খুলিতে চার পাঁচ ইঞ্চি লম্বা আঘাতের চিহ্ন থেকে আজ অবধি...বসনিয়া বলুন, লেবানন বলুন, ইরাক বলুন—এর বিরুদ্ধে ভোগী একটা পোয়েটিক ইমেজ অফ আ প্রোটেস্ট। তারপর ভাবলাম—এই দেশটাই যথেষ্ট—গলাপচা, চোর-জোচ্চোরের দেশ—এইটুকুই থাক। যে যা বোঝার বুঝবে। স্টোরি লাইনটাই এনাফ।

—আচ্ছা, ঐ ফিল্ম ডিরেকটর রুবেনা রায়—ওটা কি আপনার কন্টেমপোরারি কেউ?

—হাস্যকর প্রশ্ন করবেন না।

—আপনি কি মনে করেন যে, 'ভোগী' একটা কমিটেড ছবি?

—হ্যাঁ, মনে করি। না করলে ছবিটা আমি করতাম না। আর কোনও প্রশ্ন কেউ করবেন?

'ভোগী' ভারতীয় প্যানোরামায় নির্বাচিত হয়েছে। আশা করা যায়, ভেনিস বা কান্ চলচ্চিত্র উৎসবেও 'ভোগী' সমাদর লাভ করবে।

যুদ্ধ পরিস্থিতি

pathagar.net

১

রাতের আকাশ ঝলসাচ্ছিল যুদ্ধের আলোয়। সেই সঙ্গে ক্রমাগত শব্দ বিস্ফোরণের। এভাবেই ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। প্রাণ দেওয়ার ও নেওয়ার যুদ্ধ। যে জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে রণজয় সেই যুদ্ধের আলো-আওয়াজের দিকে তাকিয়েছিল তার শিকগুলো অনেক দিনের পুরনো। তলায়, কাঠের মধ্যে গেঁথে যাওয়ার জায়গায় মরচে ধরে ধরে সরু হয়ে গেছে। কাঠটাও রোদে জলে কখনো শুকিয়ে কখনো ফেঁপে ফেটে গেছে। শিকগুলো নড়ে। শিকের বাইরে জাল। চৌখুপি চৌখুপি। জালটাও নিচের দিকে ছেঁড়া। লাল ঘাঁটির বাইরে ২-১১-৯৪-এর সন্ধ্যায় যে যুদ্ধ চলছিল তার আলো কখনো কখনো রণজয়ের মুখটা ভাসিয়ে দৃশ্যমান করে তোলে। রণজয় বেশ লম্বা। পাঁচ এগারো। ছোট ছোট করে কাটা চুল। হলদেটে, কাঁচাপাকা, খাড়া খাড়া। গালে চার পাঁচ দিনের শাদাটে দাড়ি। রণজয় দেখল ফ্লেয়ার-এর আলোয় আকন্দর ঝোপ আর কাল কাসুন্দার বন ছাড়ালে যে জলা আছে সেটা চকচক করে ওঠে। এই আলোয় রাতকে দিন করে প্রতিপক্ষেকে চিনে নেয় সৈন্যরা। বাইরে যে সামান্য কয়েকজন অসমসাহসী কমরেড সরকারি সৈন্যদের সঙ্গে দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়ে যাচ্ছে। তাদের কেউ হয়তো ওই আলোয় ধরা পড়ে গেল। মেশিনগানের নিশানার মধ্যে ছুটে পালাতে গিয়ে জলের মধ্যে, কাদার মধ্যে লাফ দিয়ে নেমে যায়। মেশিনগানের বুলেটে শরীরটা বুক বরাবর সেলাই হয়ে যায়। হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে যায়। কিন্তু চিৎকার করে এগিয়ে গিয়ে কেউ গ্রেনেড চার্জ করায় মেশিনগানটা চুপ করে যায়। রণজয় বিড়বিড় করে বলে যায়। বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে করতেও চেষ্টা করে। 'ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলতে হলে প্রথমে চাই একটি স্থায়ী সৈন্যবাহিনী এবং চাই রাজনীতি সচেতন জনতা। এই দুটি শর্ত পালিত হলেই টেরেনের প্রশ্ন আসে। টেরেনের প্রশ্নের দুটি দিক আছে। একটা প্রাকৃতিক এবং অন্যটা নিজেদের হাতে তৈরি করা। সমতলভূমিতে ঘাঁটি এলাকা হতে পারে। তার প্রমাণ জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময় পিকিং শহরের উপকণ্ঠে সাতটি এরকম ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল।' নীলচে বা হলুদ আগুন ঝলক দেওয়ার পর এবার শব্দগুলো আসছে। হয়তো মর্টার যার গোলাটা নলের মুখ দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরেই কানে হাত চাপা দিতে হয়। রকেটের মতো কি আকাশ বেড় দিয়ে উড়ে গিয়ে ফাটল। মধ্যে, কবে যেন কেউ বলেছিল কি? স্নাইপাররা রাতেও দেখতে পায়। টেলিস্কোপিক নাইট ভিশন না কি যেন? কখনো বলেছিল কেউ? ঘাঁটি এলাকার এই বাড়িটা লাল ইটের আর কাঁটাতার লাগানো। বাইরের দেওয়ালটাও লাল ইটের কেন? বাড়িটা বিপ্লবীরা তৈরি করেনি। রণজয়রা দখল করেছিল। কবে? রণজয় মনে করতে পারে না। একটু আগেই তো ঘুমোচ্ছিলে না রণজয়? সেই বিকেলের আগে থেকে। খেতে যাওয়ার আগে ওষুধটা খেয়েছিলে বলে ঘুম এসেছিল? দূর বোকা। তুমি তো শুয়ে শুয়ে কোবা কখন ইস্কুল থেকে ফিরবে, ফিরে বলবে সোমবার ইস্কুলে যেতে ইচ্ছে করছে, না, তারপর বালতির ঢাকার স্টিয়ারিং নিয়ে বাস-বাস খেলবে, কোবার ফিরে আসার ইস্কুলভ্যানের ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা করছিলে না রণজয়? মেখলা গেটের কাছে গিয়ে কোবা ফেরার জন্যে অপেক্ষা

করে। অন্ধকারের মধ্যে দূরে, কাছে কোথাও রাইফেল থেকে ফায়ার করছে। আবার আকাশে ফ্লেয়ার উঠল। আস্তে আস্তে, দুলতে দুলতে আলোটা নামছে। ঘুম আসে কিন্তু ঠিক ঘুমের মতো নয়। তাই না রণজয়? প্রথমে দফায় দফায় চৌকো নীল, গাঢ় নীল রঙ বড় থেকে ছোট হয়ে যায়। সবাই ওই আলো ধরতে চায়। তারপর সেইসব মুখ আসে। কী ঠিক না? তেরচা চোখ। অসম্ভব চোয়াল। কারো কারো আবার এমন থ্যাঁৎলানো যে চেনা-অচেনার বাইরে। এরপরে, এরকম চলতে চলতে কখন যেন ভারি, ভিজে কেমন একটা কেউ-নেই কোথাও-নেই হয়ে যায়। স্টেনগানের শব্দ তোৎলাচ্ছে। তবে, রণজয়, তুমি শুনতে পেয়েছিলে না যে জুতো মোজা খুলে রেখে কোবা মেঝের ওপরে খালি পায়ে হাঁটছে? দরজা জানলাগুলো নীচে বোমা ফাটার শব্দে ঝনঝন করে কেঁপে ওঠে। কোবা হাত, পা ধুয়েছে। ভিজে মেঝের ওপরে ছোট্ট ছোট্ট পায়ের ছাপ ফেলে হাঁটছে। মেখলা সব সময় নজর রাখে কোবার ওপর। কোবা যদি জানলা বেয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে যায়? যদি হেড ইনজিউরি হয়? যদি কিছু মনে না পড়ে তার? তখন তুমি কী করবে রণজয়? বাই দা বাই, তোমাকে ওই নাইট ভিশন ডিভাইসের কথাটা কে বলেছিল? ওই নতুন ডাক্তারদের কেউ? ইন্টারোগেশনের সময় ঘুরেফিরে বারবার মূল প্রশ্নটা এলে যদি তুমি জবাব না দাও তাহলে কী হয় রণজয় তোমার তো জানা না থাকার কথা নয়।

অত মনে রাখতে পারে না রণজয়। সত্তর দশকের সফল ও ব্যর্থ লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে যে সামান্য কয়েকটা দুর্ভেদ্য ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল এবং পরেও যা থেকে যায় তার একটির প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে রণজয় সেই সন্ধ্যায় নিজেকে ধিক্কার দিল। নাইট ভিশন? অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার, তথ্য, ইতিহাস মনে রাখলে অবশ্যম্ভাবী পিছুটান ও বিভ্রান্তির শিকার হতে হয়। ঘাঁটি এলাকা, স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, রাজনীতি সচেতন জনতা এবং দুই দিক সহ টেরেনের প্রশ্ন এখন একমাত্র চিন্তার বিষয়। ভুল হয়ে গেছে রণজয়ের। ঘাঁটির দুর্ভেদ্যতার ওপরে অহেতুক আস্থা রেখে মনগড়া একটা স্বস্তিতে রাতদিন কেটে যেতে দেওয়ার ভুল। এরকম মারাত্মক, পার্টি বিরোধী, দেশদ্রোহিতার ভুল তুমি কী করে করতে পারলে রণজয়? তার মুখের ওপরে বিস্ফোরণের আলো চমকায়। কবে থেকে যেন চোখে কম দেখে বলে আলোগুলো কত বড় দেখায়। বাল্বের আলো, বৃষ্টির আলো, বিস্ফোরণের আলো, তারার আলো, মুরগির ঘরের ছাদের ঢেউ খেলানো টিনের ওপরে প্রতিফলিত সূর্যের আলো—প্রত্যেকটা আলোর ধার থেকে অবছা আলো দূরে যেতে চায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সব আলো যেখানে ফুরিয়ে যাওয়ার কথা সেখানেও চৌকো নীল, গাঢ় নীল আলো। সে আলো পেরোলে হাঁ মুখ, না মুখ। তা পেরিয়ে গেলেও অন্ধকার নেই। ফাঁকা সময়। তারও একটা অস্ফুট আলো আছে। বিপ্লবীরা যেহেতু বা নির্দিষ্টভাবে বস্তু-জগতের ব্যাখ্যা করার থেকে বিরত হয়ে তাকে পাল্টানোর কাজে লিপ্ত তাই তাদের ভুলচুক কখনোসখনো হতেই পারে। কিন্তু এ ধরনের ভুল কি অমার্জনীয় নয়? রণজয়, কৃপা করেই তোমার নামের আগে এখনো যদি কমরেড শব্দটা জোড়া যায় তাহলে জেনে রাখো যে তুমিও ট্রটস্কি, বুখারিন, লি শাও-চির দলে নাম লেখাতে চলেছ। তোমাকেও নেকড়ে ও কুত্তার দো-আঁশলা বলা হবে, বলা হবে কুকুরের গু বা ছারখার করিয়ে উইপোকা। একটা ঘাঁটির পতন ঘটার অর্থ হল শ্রেণী শত্রুদের আত্মবিশ্বাস শতগুণে বেড়ে যাওয়া। লাল ফৌজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে রণজয়? তুমি? নাইট ভিশন। ইন্টারোগেশন! তিমির দৃষ্টি! জেরা! হ্যাঁ, কী মনে করবেন তিনি? কমরেড স্তালিন? কমরেড স্তালিনের ছদ্মনাম এবং পরে পার্টির ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে যে নাম চালু ছিল তুমি না সেই নামে নিজের ছেলের নাম রেখেছিলে 'কোবা'! বাঃ 'বিশ্ববিপ্লবের নেতা চেয়ারম্যান মাও আজ নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাই জয় আমাদের

হবেই। দীর্ঘ দীর্ঘ দিন ধরে বেঁচে থাকুন চেয়ারম্যান মাও।' কী ভাববেন তিনি? এরপরেও কি তিনি রণজয়ের ওপরে এতটুকু ভরসা রাখতে পারবেন? পারবেন কমরেড চুতে, কমরেড লিন পিয়াও, কমরেড ও শ্রদ্ধেয় নেতা চারু মজুমদার? কোবা যখন বড় হয়ে শুনবে যে তার বাবা 'শত্রুর অস্ত্রাগার আমাদের অস্ত্রাগার' জেনেও কোনো ব্যবস্থা নেয়নি তখন সেই-বা কী বলবে? দূরে হলেও অস্ত্র একটা জায়গায় আছে। গর্তটা আছে। গর্তের মধ্যে পলিথিনের চাদর ও চট দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অস্ত্রগুলো, রাইফেল দুটো ছিলই, তলায় ইট বিছিয়ে নামনো হয়েছিল। ওপরে কাঠের তক্তা। মনে আছে কয়েকটা তক্তা থেকে এঁকাবেঁকা পেরেক বেরিয়ে। তক্তার ওপরে ইট। তার ওপরে মাটি। বাঁধাছাঁদা করার পর আস্ত্রের বান্ডিলটা মনে হয় চাদরে জড়ানো মরা মানুষ যাকে কবর দেওয়া হবে। ওই তো মাথার দিকটা সরু, হাঁটুটা ভাঙা। অস্ত্র নিয়ে এই অবরুদ্ধ ঘাঁটি এলাকায় ফিরে আসা সম্ভব কী? অবশ্যই সম্ভব। "আমাদের মনে রাখতে হবে কমরেড মাও সে-তুং-এর শিক্ষা, 'দমননীতির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ জনসাধারণের সংগ্রামী ঐক্যে ফাটল ধরায় এবং আত্মসমর্পনের পথে যায়'।" নাইট ভিশনে কোনো স্নাইপার বাইরের অজানা কোনো অবস্থান থেকে রণজয়কে দেখে থাকবে। তার ছোঁড়া বুলেটটা ছেঁড়া জাল পেরিয়ে শিক গলে ঘরের মধ্যে ঢুকে উড়তে শুরু করে। রণজয় অন্ধকারেই ডোরা ডোরা দাগ কাটা, বড় কলারওয়ালা, রক্তের ছিটে লাগা শার্টটা খুলে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দেয়। পায়জামাও খুলে ফেলে। ন্যাংটো হয়ে হাতড়ে হাতড়ে চকলেট রঙের টেরিকটনের প্যান্টটা পরে ফেলে। হাড়জিরজিরে বুক পিঠের ওপরে হাত কাটা গেঞ্জি গলায় সিন্থেটিক ইয়ার্ন মেশানো ব্যাগি স্পোর্টস শার্টটা পরে নেয়। সাহেবদের দেশে এগুলো সামারে পরে জগিং করে। বোমা ফাটে তলায়। তলায় গানও বাজাচ্ছে কেউ। হল্লাহাসি ভেসে আসে। সেবার ঘুলঘুলির গর্তের মধ্যে লুকিয়ে রাখা তিনফলা নিড়ানিটা বের করেছিল রণজয়। এবারে ওয়াড় খুলে ফেলে ফাটা জায়গাটা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে টাকাগুলো বার করে। প্যান্টের পকেটে নেয়। ঘরের মধ্যে বুলেট উড়ে বেড়াচ্ছে। সকালের হলদে হয়ে যাওয়া, ভাঁজে ভাঁজে ছেঁড়া খবরের কাগজটাকে আরো ছোট ভাঁজে বশ করে পকেটে ঢোকায়। সযত্নে রক্ষিত ডটপেনের রিলিফটা নেয়। জানলা দিয়ে বুলেটটা ঢুকেছিল রণজয়কে মারার জন্যে। বুলেট তখন ক্লান্ত হয়ে কালো সোনালী ডানা দুটো ছড়িয়ে বসে। জীবন্ত কিন্তু নিষ্পন্দ। রণজয় পা টিপে টিপে ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। বিস্ফোরণ ঘটছে, মেশিনগানও চলছে। তবে দূরে মেখলা আর কোবা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। তলায় নেমে রণজয় দেখল দুটো কোলাপসিবল গেটই আধখোলা। রিসেপশনের কালো কাঠের টেবিলের ওপরে দুটো চাবিভরা তালা আর একটা বড় টর্চ রাখা। কাছেই জোরে গান বাজছে। মদের গন্ধ হালকা শীতের হাওয়াহীনতায় থমকে থমকে ঘুরছে। ওপরে কেউ রোজকার মতোই চেঁচাল। রণজয় সুড়কির রাস্তা থেকে লাফ দিয়ে বাগানে, মরশুমি ফুলের গাছের মধ্যে চলে যায়। ঘাপটি মেরে থাকে। রণজয় পালঙের বেড়ের ওপর দিয়ে দৌড়োয়। ঝুপ ঝুপ শব্দ হয়। উঁচু পাঁচিল ঘেঁষে মুরগির ঘর। ঘরে আলো জ্বলছে। ইটের ফোকর করা। তাতে পা দিয়ে সাবধানে ওপরের টিনটা ধরে ঝুলে হাত দুয়েক ডানদিকে গিয়ে চওড়া দেওয়ালটা জাপটায় রণজয়। তারপর তিনসারি কাঁটাতারের তলা দিয়ে হিঁচড়ে বেরিয়ে আসে। পিঠের দিকে কাঁটাতার ঘষে কেটে যায়। হাতও কাটে রণজয়ের কারণ পাঁচিলের ওপরে ডুমো ডুমো কাচও বসানো ছিল। বাইরে, তলায় অগভীর খাদ। জলও নেই। রণজয় হাত আগলা করে কিন্তু নামতে পারে না। শার্টের কিছুটা কাঁটতার খিমচে ধরে রয়েছে। ছিঁড়ে, পড়তে কয়েক লহমা সময় লাগে। পরিখার তলায় পড়ে রণজয় মাথা ঘুরিয়ে ওপরে আকাশ দেখে। বাঁ পা-টা মচকে গেছে।

পা-টা দুহাতে চেপে ধরে রণজয়। কাত হয়ে শোয়। অসহ্য যন্ত্রণা। এমন যন্ত্রণা যে আর কখনো যেন হাঁটতেই পারবে না। খাদের তলায় ছায়া আর কখনো কখনো বাগানের জল আসে বলে ঠিক ঘাস নয়, বড় বড় পাতার কি একটা গাছ ভরে থাকে। এতে ছোট ছোট হলদে ফুলও হয়। তার ওপরে শুয়ে আকাশের দিকে তাকায় রণজয়। নানা পাওয়ারের কত বাল্ব জ্বলছে। কয়েকটা বাল্ব ঝুলময়লায় এতই ম্লান যে দেখাই যায় না। চোখে কম দেখে বলে আলোগুলো ধেবড়ে যাওয়া। তারাদের অনেক নাম আছে কিন্তু একটাও রণজয়ের মনে পড়ে না। অতটা ওপর থেকে পড়লেও চমশমাটা ঠিক ছিল। নাকি একটু বেঁকে গেছে আর নাকের ওপরে কেমন জ্বালা জ্বালা। রণজয় উঠতে থাকে। কনুই দিয়ে, হাঁটু দিয়ে ঠেলা মেরে মেরে নালির ওপরে উঠে আসে। উঠেই যুদ্ধের নিয়মে উল্টে গাড়িয়ে যায় রণজয়। কেউ গুলি করলে যাতে ফসকে যায়। একটা ফ্রন্ট। তুলকালাম যুদ্ধের ফ্রন্ট। ফ্রন্টে অসাবধানতার কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। রণজয় উপুড় হয়ে চারদিকটা দেখে নেয়। ঘাঁটির ভেতরে গান বাজছে জোরে। হুল্লোড়ের শব্দও আসছে। কোলাপসিবল গেটগুলো বন্ধ করছে কেউ। লোহার সঙ্গে লোহা ধাক্কা খাওয়ার শব্দ। যুদ্ধের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও লুকিয়ে স্নাইপার থাকলেও থাকতে পারে। থাকলেও কিছু করার নেই। কোবা আর মেখলা ঘুম থেকে উঠে তোমাকে না দেখে চিন্তা করবে না রণজয়? ওরা কিছু জানাবোঝার আগেই তুমি সেই জায়গাটায় গিয়ে লুকোনো অস্ত্রগুলো নিয়ে আসতে পারবে? গেট খুলে কেউ বাইরে এসে টর্চের আলো ফেলল। এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে দেখল। চড়া আলোটা রাস্তায়, নালিতে, রাস্তার ওপারে আকন্দ গাছের ওপরে পড়ল। গেট বন্ধ হল। তালা লাগল। রণজয় উঠে বসে। এই রাস্তাটা ডাইনে বাঁয়ে, কোনদিকে স্টেশনের কাছে গেছে? শেষবার ট্রেনে আসেনি রণজয়। গাড়িতে এসেছিল। স্টেশন থেকে কলকাতা। তার মধ্যে আবার যাদবপুর রেল স্টেশন। সে আর একটা স্টেশন। তার ওপারে, লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে কোথায় সেই জায়গাটা যেখানে চট-পলিথিনে জড়ানো মরা মানুষের মতো দেখতে অস্ত্রগুলো রাখা হয়েছিল? রণজয় কিছুটা রাস্তা হাত আর হাঁটুর ওপরে ভর দিয়ে এগোয়। রাস্তার ধারে খোয়া আর শুকনো চাপ বাঁধা ঘাস। এইভাবে চললে কতক্ষণ লাগবে কলকাতা পৌঁছতে? যতক্ষণই লাগুক, বিপ্লব কোনো ভোজসভা নয়। সূচিশিল্প বা প্রবন্ধ রচনা নয়। নেভস্কি প্রসপেক্তের মতো সিধা সড়ক নয়। এবং বিপ্লবের পথে শ্রেণী শত্রুরা ছাড়াও, মেকি বিপ্লবী ও দাদাল গুপ্তচরদের বাধা থাকবেই—সেই কাউটস্কি, বার্নস্টাইন থেকে শুরু করে মেনশেভিক, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিন, ট্রটস্কি, লি শাও চি-দের কথা ভুললে চলবে না। ভুললে চলবে না ডাঙ্গেচক্র, নয়া সংশোধনবাদী ও 'খোকনচক্রে'র কথা। এই যে পায়ের ব্যথা নিয়ে রণজয় ভাবছে তারও মধ্যে রয়েছে নিজের কথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অহেতুক বড় করে ভাবা। এরই নাম অহমিকা। 'চেয়ারম্যান মাও আমাদের শিখিয়েছেন যে, প্রত্যেকটি কমিউনিস্টকে সর্বদা অহমিকা ও দম্ভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। কারণ, অহমিকা ও দম্ভ সমস্ত কমিউনিস্ট গুণাবলিকে শেষ করে দেয়।' রণজয় দাঁড়িয়ে ওঠে, দু-পা এগোতে না এগোতে দুমড়ে পড়ে যায়, চুপ করে থাকে, পায়ের যন্ত্রণার প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকে ঘৃণার স্রোতে ধুয়ে দেয়, ওঠে, হাঁটতে থাকে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। চীনের লাল ফৌজ ছ-হাজার মাইল অতিক্রম করছে—আছে অসংখ্য পাহাড়, নদী, কখনো মরুর উন্মত্ত গরম, কখনো মেরুর উন্মাদ শীত। আছে দিনের পর দিন নিরন্তর বিমানহানা। বোমা, স্টেফিং, মৃত্যু। আর রণজয় কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে কলকাতার সেই জায়গাটায় গিয়ে অস্ত্রগুলো নিয়ে আসতে পারবে না?

'লং মার্চের অগ্নিপরীক্ষা লাল ফৌজ ভয় করে না
তোয়াক্কা করে না হাজারো পাহাড় ও নদীর।'

রণজয় এগোতে থাকে। বাঁদিকে ইটভাটাগুলো শেষ হবার পর রাস্তাটা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। ডানদিকটা একটু আলো আলো। রণজয় সেদিকেই এগোয়। কিছুটা ধুলোর রাস্তা, তারপর অন্ধকার। রাস্তার ধারে পিচের ড্রাম আর খোয়ার পাহাড়। অন্ধকার চোখ সওয়া হয়ে গেলেও দেখতে বেশ অসুবিধে হয়। বেশ বড় বড় কয়েকটা গাছ বাঁদিকে। সেগুলো পেরিয়ে ফাঁকা জায়গাটায় পড়তেই আকাশে কোথাও আলো হয়ে উঠেছিল। সেই আলোতে, সামনে, একটু হেলে দাঁড়িয়ে থাকা চকচকে মোটর সাইকেলটা দেখে রণজয় সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। একবারে নিরস্ত্র অবস্থায় রণজয়। দুটো হাত মুহূর্তে মুঠি পাকিয়ে যায়। লোকটা সহসা চামড়া সেলাই-এর মতো শব্দ করে রিভলভারটা বার করাতে রণজয়ও পায়ের ব্যথা ভুলে টান টান হয়ে যায়। এত ক্লোজ রেঞ্জে কোনো এনকাউন্টারে গুলি না লাগাটাই অস্বাভাবিক।

যুদ্ধের অভিজ্ঞতা যার আছে সে জানে যে শত্রু কিভাবে, কখন আক্রমণ শুরু করতে পারে সেটা আগেভাগে আঁচ করতে গেলে কি পরিমানে সতর্ক থাকতে হয়। সকালে, তরকারির বাগানে, সার সার পালং আর কপির বেডের পাশ দিয়ে ঝারি দিয়ে জল দেওয়ার সময়েই বিস্ফোরণের কয়েকটা শব্দ কানে এসেছিল। লাল বাড়িটার পেছন দিকটাতে মেয়েরা থাকে। বাড়িটা প্রায় চিরে দুভাগ করে রাখা। পেছন দিকটা দেখা যায় না। সেখান থেকে রোজ সকালে যে কান্নার শব্দটা আসে সেটা শুনছিল রণজয়। তখনো একটা দুটো শব্দ পেয়েছিল রণজয়। দুপুরে সবাই যখন লম্বা কাঠের টেবিলের পাশে বেঞ্চিতে সার দিয়ে খেতে বসে তখনও। মহীতোষ আসার পরে সচরাচর খাওয়া শুরু হয়। মহীতোষ সবসময় ধুতি, শার্ট পরে থাকেন কিন্তু খেতে আসেন ন্যাংটো হয়ে। স্নানের পরে পাট করে চুল আঁচড়ানো। মহীতোষের সিটটা বাঁধা। সেখানে কেউ কখনো বসে না। মহীতোষ কখনো অন্য রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন না। স্মিত হাসেন। রণজয়, কোবা ও মেখলা ছাড়া কারও সঙ্গেই কথা বলে না। কী বলবে? দু-একবার এদের ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করেছে রণজয়। কার সাধ্য এদের ক্লাস নেবে? মুরগির ঘরের ব্রয়লারগুলো যেমন অসভ্য এরাও তেমন। এরা রয়েছে একটা ঘাঁটি এলাকায়। কিন্তু সেটার গুরুত্ব কি এরা বোঝে? এক রমেশ একটু একটু বোঝে কিন্তু ওই যতক্ষণ শুনছে ততক্ষণই। তারপরেই আবার যে কে সেই। তবে হ্যাঁ, তৈরি হচ্ছে কোবা। চার বছরের কোবা কতকিছু যে শিখছে। খেলা করছে। ছড়া বলছে। রণজয়ের রোজকার খবরের কাগজ, সযত্নে রক্ষিত ডটপেনের রিলিফ—সব কখনো লুকিয়ে রাখছে। ছোট্ট ঘরে তিনজন থাকলে এরকম তো হবেই। তবে কোবাটা বড় ভীতু। শাদা ব্রয়লার মুরগিগুলোকে নিয়ে কোবার কী ভয়। ওদের খাবার বালতিতে করে নিয়ে এসে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঝটপট করে বেরিয়ে এসে পালঙের বেডের ওপরে লাফিয়ে পড়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেতে শুরু করে দেয়। আবার তাড়া দিলেই ঘরের মধ্যে। ওরা কামড়াতে জানে না। কিন্তু কোবা, ছোট্ট কোবা তবু ভয় পাবে। যদিও রণজয় ওকে বারবার হাতেনাতে দেখিয়েছে যে একটু কাছে গিয়ে মাটিতে পা ঠুকলেই ওরা কেমন পালায়। এই হোয়াইট গার্ডদের মধ্যে যে দুটো সবচেয়ে কেঁদো তাদের নাম দেনিকিন আর কোলচাক। ওই দুটো সবার আগে পালায়। ওদের পেছনে বাকিরা। কোবা বড় হলে 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' পড়বে। চাপায়েভের গল্প পড়বে। 'ধীরে বহে ডন' ও 'সাগরে মিলায় ডন' পড়বে। পড়বে ডাইসন কার্টার-এর 'সোভিয়েট বিজ্ঞান', লিও কিয়াচেলি-র 'নতুন দিনের আলো', ডিয়ানা লেভিন-এর 'সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা', দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ছোটদের

সোভিয়েট', তিন খণ্ডে অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মজুমদার ও অনিলকুমার সিংহের অনুবাদে ১৯৪২ সালের স্তালিন পুরস্কার পাওয়া 'পারীর পতন', লু সুন, লাও চাও, তিং লিঙ ও অন্যানয পাঁচজনের লেখা এগারোটি গল্প, নীহার দাশগুপ্তের অনুবাদে গোর্কির 'নবজাতক', ঘুমপাড়ানী নয় ঘুমতাড়ানী ছড়া—লিখেছেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মঙ্গলাচারণ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, পড়বে হতাশ আর ভগ্নোদ্যম সেই সব মানুষ পুতুলের যান্ত্রিক জীবনের অপরূপ কাহিনী 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। কোবাকে যেভাবে তৈরি করা নিয়ে ভেবেছে রণজয় তাতে সন্দেহ থাকে না যে কিছু একটা হবেই। যাইহোক মহীতোষ আসার পরে সবাই ভাত আসার জন্যে অপেক্ষা করছে। বাঁদিকে একজন টেবিলের কানায় জলভরা গেলাশ রেখেছিল। নীচে বোমা বা গ্রেনেড এসে পড়ায় জানলা ঝনঝন করল। গেলাশটা কারো ছোঁয়া বিনাই শব্দের ধাক্কায় নীচে পড়ে গেল। নগ্ন মহীতোষ উঠে দাঁড়ালেন। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার যে রমেশ, যাকে নিয়ে রণজয়ের কিছুটা আশাভরসা ছিল সে আচমকা 'ভাত, ভাত, ভাত, ভা...ত', চিৎকার শুরু করল। ভাত এল, ডালও এল। পাশের লোকটার নাম জানে না রণজয় তবে মুখ চেনা। তার থালায় ভাত, ডাল পড়তেই সে যেই খাবলে খেতে যাবে অমনি থালাটা ঘুরতে শুরু করল। রণজয়, প্যাস্টোরাল তোমার ভালো লাগেনি কিন্তু ফিফথ্ সিমফনির শুরুটা শুনে তুমি চোখ বন্ধ করেছিলে, মনে পড়ছে? লং প্লেইং রেকর্ড ঘুরছে। তার পর তো পালং শাকও দিল। নীচের বেড থেকে ছিঁড়েখুঁড়ে আনছে। থালাটায় টাল ছিল বলে ও যেই হড়হড়ে বিউলির ডাল, পাথরকুচি মেশানো ভাত আর পালং বা ওপারে যে রোজ সকালে রুটিন করে ককিয়ে কাঁদে তার চুল ভাজা দিয়ে সবটা মাখতে যাবে তখন থালাটা ঘুরতেই থাকে। ও করল কি বকবার আঙুলটা থালার কোণায় রেখে উদ্ভট গলায় গান গেয়ে উঠল, 'পথের ক্লান্তি ভুলে, স্নেহভরা কোলে তব, মা গো বলো কবে শীতল হব? কত দূর, আর কত দূর বলো মা', সকলে হেসে ওঠে। মহীতোষ ও রণজয় বাদে। ও হাতের তেলো দিয়ে থালাটা জোরে জোরে ঘোরায়। এবারও সকলে হাসে। টেবিলের উল্টোদিকে একজন বেঞ্চির ওপরে হ্যান্ডস্ট্যান্ড করার চেষ্টা করে ও সেই সঙ্গে ক্রমাগত 'ঢোল ডগর, ঢোল ডগর' বলে যেতে থাকে। থালাটা ঘুরতেই থাকে। ও আরও জোরে জোরে ঘোরায়। একবার থালাটা ঘুরতে ঘুরতে ওর জলের গেলাশে ধাক্কা খেয়ে সরে আসে। ওর দেখাদেখি ন্যাড়া ও অন্যরাও তাদের থালা ঘোরাতে চেষ্টা করে। ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। এর থালা ওর কাছে চলে যায়। চিচিঙ্গে বিরাট টেবিলটার একধার দিয়ে হামা দিয়ে উঠে আসে। মেঝের ওপরে থালা গেলাশ পড়ার শব্দ ঝনঝনিয়ে ওঠে। হুইসল বাজে। ডাল শাক মেখে উপুড় হয়ে পড়তে চিচিঙ্গের মাথায় কেউ হুড়হুড় করে জল ঢেলে দিল জগ থেকে। ন্যাড়া ওর পিঠের ওপরে লেবুর টুকরো আর কাঁচালঙ্কা পরপর সাজায়। উলঙ্গ ও নির্বাক মহীতোষ দাঁড়িয়েই আছেন। রাগে থরথর করে কাঁপছেন। রমেশ দৌড়ে গিয়ে বেসিনের তলায় যেখানে পাইপ ঢুকে যাওয়া ঝাঁঝরিটা আছে সেখানে শুয়ে পড়ে কিঁচ কিঁচ শব্দ করে ছুঁচোদের ডাকে। দারোয়ানরা চিচিঙ্গেকে টেনে নামাল। ডাল-ভাত শাকের এক দলা মুখে দিতে যাবে রণজয়, ধাক্কায় সব ছিটকে যায়। গার্ডদের হাত ছাড়িয়ে চিচিঙ্গে টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে লাফায়। টেবিলের তলায় তিন-চারজন। লাফাতে লাফাতে হাত তোলে, হাত ফ্যানের ব্লেডে লাগে। রক্ত ছেটকায়। রণজয়ের ডোরা ডোরা শার্টে লাগে। ফ্যানের ব্লেড বেঁকে যায়। রণজয় নিজের ঘরে ফিরে গেল। বোমা ফাটার শব্দ। খেতে যাওয়ার আগে ওষুধটা খেয়েছিল বলে ঘুম পেয়েছিল। ঠিক ঘুমের মতো নয়। শুয়ে শুয়ে রণজয় কোবার রিকশাভ্যানের ঘন্টার জন্যে অপেক্ষা করেছিল।

pathagar.net

মোটাসোটা কালোকোলো যুবকটি জিনস্ ও লেদার জ্যাকেট পরা, থুতনিতে ফিতে আটকানো ক্র্যাশ হেলমেট মাথায়। এবং সে রিভলভার বের করেনি। রাস্তার ধারে পেচ্ছাপ করার পর জিনস্-এর জিপ ফাসনার টানতে টানতে মোটর সাইকেলের দিকে এগোচ্ছিল। তখনই সে রণজয়কে দেখতে পায়। আকাশে কোথাও আলো ফাটল। কালো-কোলো মুখে বোকা বোকা হাসি। কথাটা সে-ই বলল,

—'পায়ে চোট আছে, না?'

রণজয় জবাব দিল না। হাত দুটো শক্ত মুঠো। তখন সতর্ক হওয়ার সময়। খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে অ্যাটাক করতে পারে। গড়নটা বেশ ভারির দিকেই।

—'আমি মাইরি হেব্বি ভয় খেয়ে গিয়েছিলুম। আনকা জায়গা, পেচ্ছাপ করচি আর দেখচি কে লেংড়ে লেংড়ে আসচে। একে তো মালঝাল খেয়ে আছি। ভাবলুম ছেনতাইপার্টি নাকি শালা কালীপুজোয় ভূতফুত বেরোল! ওফ্, যা ঘাবড়ে দিয়েছিলেন!'

লোকটা এখনো এমন কিছু করেনি যে অ্যাকশন করার দরকার। কিছু না থাকলে খালি হাতেই। পায়ের ব্যথাটা কিন্তু একেবারে নেই।

—'এদিকে একলাটি হাঁটচেন। যাবেন কোথায়?'

রণজয় প্রথম কথা বলল।

—'স্টেশন।'

—'তাহলে উঠে আসুন। বেশ একসঙ্গে যাওয়া যাবে। আমি তো স্টেশনের ওপর দিয়েই যাব। ফাঁসির মোড়ে না হয় ছেড়ে দেব আপনাকে। ওখান থেকে বাঁহাতে ঘুরলেই স্টেশন। আপনিও ঘাবড়ে গিয়েছিলেন আমাকে দেখে, বলুন, চমকাননি?'

—'না।'

—'উরি সাঁটি, হেব্বি সাহস তো আপনার। আমার দেখুন বুক একনো ঢিবঢিব করচে। কালীপুজো বলে কথা। দাঁড়ান, একটু দম নিয়ে নিই। অনেকটা রাস্তা যেতে হবে।' লোকটা আধখোলা লেদার জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে হাত ঢুকোয়। বের করে। রণজয় দেখল অন্ধকারেই ফস করে বের করে আনা চ্যাপটা শিশিটা চকচক করছে। ছিপি খুলে ডগডগ করে গলায় ঢালল।

—'আঃ প্রাণটা জুড়োল। দুচুমুক মারবেন নাকি?'

—'না। ওটা কি, মদ?'

—'হ্যাঁ, অ্যাডভেঞ্চার। পাওয়ার স্টেশনের বন্ধুদের কাছে গিয়েছিলুম। ওরা মাংসের চাপ খাওয়াল, হেওয়ার্ড হুইস্কি ফুইস্কি খাওয়াল। ওদের বুঝতে দিইনি যে অ্যাডভেঞ্চারটা লুকোনো রয়েচে। ও হুইস্কি ফুইস্কি আমার একদম ভালো লাগে না, মাল হল রাম। দাদার কী সিগ্রেট চলে?'

—'না।'

—'হেব্বি কন্টোল তো আপনার। মাল না, সিগ্রেট না, খুব ভালো। অনেকদিন বাঁচবেন।'

ও সিগারেট ধরাল লাইটার জ্বেলে। লাইটারের আলোতে ঘড়ি দেখল। ধোঁয়া ছেড়ে রণজয়কে বলল,

—'ধরবেন তো লাস্ট ট্রেন। ও ঢের দেরি আচে। সজ্জন লোক পেয়ে গেলুম। পুজোগণ্ডার দিন। সজ্জন লোকের দেখা পাওয়া হেব্বি পুণ্যের ব্যাপার।'

—'কী করে জানলেন?'

pathagar.net

বহুদিন আগে এই কথাটাই মেখলাকে বলেছিল রণজয়। ঘরোয়া কোনো আসরে কবিতা পড়েছিল মেখলা। কোথায়? রণজয়ের আবছায়া মনে আছে যে মেখলাকে সে সামনের টিমটিমে রাস্তার আলোয় প্রশ্ন করেছিল, হাত দুটো সামনে মেলে ধরে,

—'কী করে জানলেন? দেখে কী মনে হচ্ছে? খুব ভাগ্যের ব্যাপার?'

মেখলা পড়েছিল,

'স্বপ্নের হাত আমি দেখেছি
তাকে গড়ে তুলতে হলে ভেঙেচুরে ফেলতে হবে ঘুম
ভালোবাসার হাতও আমি দেখেছি।
না চাইলেও সে সকলকে আঁকড়ে থাকবে
বিপ্লবীদের হাত দেখা খুব ভাগ্যের ব্যাপার
একসঙ্গে তাদের পাওয়াই যায় না।
আর বোমা ফেটে তো অনেকের হাতই উড়ে গেছে।'

—'ও আমরা বুঝি। কে সজ্জন, কে হারামি মুখ দেকলে টকাটক্ বলে দেব। সারাদিন লোক মারিয়ে খাচ্চি। তারপর পাপ উগরোতে মাল খাচ্চি, রোজ খাচ্চি। ও, আজব মাল তো আপনি। নাম জানলেন না। নাম জানতেও চাইলেন না। আমার নাম প্রফুল্ল। আপনার?'

রণজয় টেক নেমটা মনে করে।

—'কি হবে নাম জেনে?'

—'কি হবে? হিজড়ে না হলে হয় ছেলে নয় মেয়ে হবে। একটু পেসাদি করে দিন না, নয়তো সবটা খেয়ে ফেলব, বউ ক্যাঁচম্যাঁচ করবে, হুলুস্থুলু লেগে গেলে বাবার ঘুম ভেঙে যাবে। কি হয় নাম বললে?'

নিজের বলা কথাগুলো ধাক্কাতেই লোকটা মোটরসাইকেল ধরে টাল সামলায়। উল্টোপাল্টা বকে, তরেত্তর্ তরেত্তর্, মালমাগনা ভিত্তর, তরেত্তর, মালমাগনা ভিত্তর্...

রণজয় বলে,

—'আমার নাম রণজয়।'

—'বাঃ হেব্বি নাম। জানেন বাবার সঙ্গে আমার খুব খারাখারি। বন্ধকীর ব্যবসা নিয়ে। আমার বাবার নাম বনবিহারী। ও বললে তল্লাটে কেউ চিনবে না। সবাই বলে বুনো বাঞ্চোৎ। বলুন, এতে ইজ্জত থাকে? সেই দুক্কেই তো মদগাঁজা খাই। নিন্ স্টার্টটা দিয়ে নিই, তারপর চাপবেন।'

মোটরবাইকে স্টার্ট দেয় প্রফুল্ল। গাড়ি গড়ায়। রণজয় উঠে বসে।

—'কি রকম বুঝচেন মালটাকে? মানে গাড়িটা!'

—'ভালো।'

—'রাজদূত। ওয়ান ডাউন টু আপ। তবে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে একটা চিংড়ির বিজনেস খুলচি। লেগে গেলে একটা ইয়ামাহা নেব। চারখানা গিয়ার। বাঘের বাচ্চা।'

ধুলো ওড়ে। ঠাণ্ডা বাতাস রণজয়ের মুখে দমকে দমকে ঝাপটা মারে।

—'গাড়িটা একটু ডাঁয়াবাঁয়া করবে। ঘাবড়াবেন না। মাল খেলে এরকম হবেই।'

রণজয় জবাব দেয় না।

—'আপনাকে মাইরি পেয়ে গেলুম বলে তাও দুটো কথা বলতে পারচি। আজ সকাল থেকে জানবেন কেমন কেমন লাগচে। ভাইপোগুলোর জন্যে বাজি কিনতে গেলুম—ওঃ কি যে ভিড়। এখানেই এই, তাহলে ভাবুন কলকাতায় কি কেলো। তা যে কথা বলেছিলাম—আটবছর ধরে

গাড়ি চালাচ্চি, লাগবি তো লাগ, আজকেই শালা একটা রগড়া লেগে গেল। আর সেও সিপিএম-এর জিপের সঙ্গে। তবে মা কালীর দয়ায় ঝুট-ক্যাচাল কিছু হয়নি।'

আবার বাঁ পাটায় লাগছে। পায়ের আঙুল বেঁকিয়ে চটিটা চিপে ধরে রণজয় পা-টা ঝুলিয়ে দেয়।

—'এই মাইরি, দু-একটা কথা বলুন। কলকাতায় যাচ্চেন, ওখানে ফ্যামিলি থাকে?'

—'না।'

—'এদিকে সার্ভিস করেন, না বিজনেস?'

—'স্টেশন আর কতদূর?'

প্রফুল্ল ঘাবড়ে যায়। ডান হাতে থ্রটল ঘুরিয়ে স্পিড বাড়ায়।

—'আমায় কিন্তু এদিকের ভাববেন না। আমিও কলকাতার ছেলে। গরানহাটায় মামাবাড়ি। এই স্টেশন একটু আগে। এদিকে সব সিপিএম, বুঝলেন? গাঁয়ে ভালো কাজ করচে। তবে আমাদের বাড়িতে সবাই কংগ্রেস। আমি মমতা, আপনি? তা বলে কিন্তু আমার মধ্যে অন্য পার্টি করে বলে, কি যেন বলে, ওসব নেই। বাবা তড়পালে কী হবে—নিজের চোখে দেখলুম তো—সব শালা সমান। আসলে কি জানেন, মমতা-ফমতা নয়, কোথাও আপনাকে খাতায় নাম লেখাতেই হবে। নিজের জোর বলে কিছু আছে আজ? ফাঁসির মোড় তো প্রায় এসে গেল। আপনি কিন্তু মুখ খুললেন না।'

রণজয়কে নামিয়ে দেওয়ার পর প্রফুল্ল যখন বাইক ফের স্টার্ট দিচ্ছে তখন রণজয় প্রফুল্লর দিকে এগিয়ে যায়।

—'তুমি করেই বলছি। তোমার কাছে রিভলভার আছে?'

—'অ্যাঃ!'

—'রিভলভার আছে?'

—'আজ্ঞে না। কেন?'

—'থাকলে নিয়ে নিতাম। আমি আর্মস অ্যান্ড অ্যামিউনিশন জোগাড় করতেই বেরিয়েছি।'

—'ও!'

—'আর একটা কথা, পুলিশে ইনফর্ম করার চেষ্টা করো না। করলে আমি জানতে পারব। তখন আমার কাছে আর্মস থাকবে।'

—'ওরে বাবা, পুলিশে বলতে যাব কেন? ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাব। বিশ্বাস করুন!'

—'যাও।'

বাইকটা জোরেই ছুটিয়ে দেয় প্রফুল্ল। কালীপুজোর রাতে একি খেলা মা তোমার। বাপের ভাগ্যি যে গলা টিপে ধরেনি। জানতুম। সকালেই সিপিএম-এর সঙ্গে রগড়া। রক্ষে করো মা। কোত্থেকে ওই ল্যাংড়া মাল আমার ঘাড়ে চাপালে মা। কি পাপ করেছি! নেশাফেশা সব পয়মাল।

বাইক থামিয়ে প্রফুল্ল আবার রাম-এর শিশি বের করে বাকি পুরোটা গলায় ঢালে। তারপর ফাঁকা শিশিটা ছুঁড়ে রাস্তার পাশে ফেলে দেয়।

রণজয় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে দেখল টিকিটঘরটা বন্ধ। ট্রেন আসার মিনিট দশেক আগে খুলল। রণজয় পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়েছিল। নোংরা নোংরা ছেঁড়াফাটা নোট আর বিস্তর কয়েন ফেরৎ পেল। স্টেশনে বড়জোর ছ-সাতজন লোক ছিল। তার মধ্যে সকলেই কমবেশি মাতাল। এত রাতে একটা গরিব মেয়েও তার ঘুমন্ত বাচ্চাকে নিয়ে পুঁটলি পাকিয়ে বসেছিল। ট্রেনটা ফাঁকা ছিল। কালীপুজোর রাতে, শেষ ট্রেনে, কে আর কলকাতায় যাবে? ট্রেনের জানলা দিয়ে

pathagar.net

বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকল রণজয়। লাইন পাল্টানোর শব্দ। পাশে বড় বড় গাছ এলে কেমন সাঁ সাঁ করে শব্দ হয়। সবসময়, এই অন্ধকারের মধ্যেও মনে হয় যে দূরে একটা নদীর মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। এই যে এত, এত অন্ধকার জায়গা, মাঠ, ঘুমন্ত গাছ, গ্রাম আর কত কত ঘুমন্ত মানুষ---এখানে কোনো যুদ্ধ নেই। অন্ধকারে কোথাও একটা আলো দূরে দেখা যায়। গাছে ঢাকা পড়ে। আর দেখা যায় না। উল্টোদিকে যে লোকটা র‍্যাপার জড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল সে উঠে একটা বিড়ি ধরাল। বিড়ির ধোঁয়ার গন্ধটা বেশ ভালো লাগল রণজয়ের। তাহলে এদিকে যুদ্ধ হচ্ছে না। ওখানে একটা লোকাল অপারেশন চলেছে। তাকে প্রতিহত করতে, কোণঠাসা করতে, চূর্ণ করতে দরকার অস্ত্রের। 'চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে চীনা গণমুক্তি ফৌজ ৩২০টি রাইফেল নিয়ে বিপ্লবী যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমরা না হয়, ৬০টি রাইফেল আর ২০০টি পাইপগান নিয়ে আমাদের প্রথম গণমুক্তি ফৌজ তৈরি করব।' পলিথিনের চাদর ও চট দিয়ে জড়ানো মরা মানুষের মতো দেখতে সেই বান্ডিলের মধ্যে ঠিক কী কী অস্ত্র আছে তুমি মনে করতে পার রণজয়? দুটো রাইফেল ছিল, না?

১৯১৭-র ৮ এপ্রিল রাশিয়াতে ফেরার জন্য রওনা দিয়েছিলেন কমরেড ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। স্টকহোম-এ অনেক ওজর আপত্তির পর কমরেড কার্ল রাদেককে এক জোড়া জুতো কেনার অনুমতি দিয়েছিলেন লেনিন। সঙ্গে আরো জামাকাপড় দিতে চেয়েছিলেন রাদেক। লেনিন বলেছিলেন, 'রাশিয়াতে আমি তো একটা দর্জির দোকান খুলতে যাচ্ছি না।' ১৬ এপ্রিল, রুশ ভূখণ্ডের বেলুসত্রভ-এ যখন লেনিন পৌঁছলেন তখন সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য ছিলেন কমরেড স্তালিন, কমরেড কামেনেভ এবং ভগিনি মারিয়া। পাঁচ বছর পরে কামেনেভের সঙ্গে প্রথম দেখা। লেনিন বললেন, 'প্রাভদায় ওসব তুমি লিখছটা কী? তোমার কিছু প্রবন্ধ আমরা পড়েছি আর চুটিয়ে গালাগালি করেছি।' সেইদিনই লেনিন পেত্রোগ্রাদের ফিনল্যান্ড স্টেশনে পৌঁছলেন। শুরু হল একের পর এক ভাষণ। এর মধ্যে একটি সাঁজোয়া গাড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে, হাতে এক গুচ্ছ গোলাপ। দু-ঘণ্টা ধরে বলেছিলেন লেনিন। হাজার হাজার কণ্ঠে মার্সাই ধ্বনিত হচ্ছিল। প্ল্যাটফর্ম, স্টেশনের বাড়ি—সব বলশেভিক পোস্টার ও ফেস্টুনে ঢাকা। উদ্বুদ্ধ, উদ্বেল জনতার ওপর একটা সার্চলাইটের আলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

৩.১১.৯৪-তে, শেষরাতে রণজয় শেয়ালদায় পৌঁছল। বাইরে তখনও চকোলেট বোমা ফাটার শব্দ। স্টেশনের চত্বরে ফাটছিল। কোনো টিকিট চেকার ছিল না। রোজকার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে হাঘরে মানুষ, নারী, শিশু, বৃদ্ধ—সবাই ঘুমিয়ে। তিন বছর আগে তিনফলার একটা নিড়ানি নিয়ে কলকাতায় এসেছিল রণজয়। সে কথা এবারে কলকাতায় পা রাখার সময় রণজয়ের মনে ছিল না। শেয়ালদা ফ্লাইওভারের একটা দোকান সারারাতই খোলা ছিল। চা আর বিস্কুট খেল রণজয়। ট্রেনে বিড়ির গন্ধটা বড় ভালো লেগেছিল। এক প্যাকেট বেঙ্গল বিড়ি আর দেশলাই কিনল রণজয়। দেশলাইকাঠির মাথায় মিশমিশে বারুদটা দেখে বড় ভালো লাগল রণজয়ের। কাঠিটা জ্বেলে আগুনটা দেখতে আরো ভালো লাগল। ফাটা পটকার কাগজ, তুবড়ির খোল, বমি, বোতল, প্যান্ডেলের আলো, গান সারা শহরে ছড়িয়ে। নিভে আসা কাঠিটা ছুঁড়ে দিল রণজয়।

২

২.১১.৯৪ রাত

কোবা মাকে বলেছিল তাড়াতাড়ি ফিরবে। গিয়েছিল কাছেই। সাইকেল নিয়ে। দীপাঞ্জনদের বাড়ি। রিভিউটা নিয়ে আলোচনা করতে। দীপাঞ্জনের সঙ্গে সবসময় কথা বলে নিয়ে তবে কলম ধরে কোবা। এখানকার রক ব্যান্ডগুলোর প্রোগ্রাম নিয়ে লেখার ব্যাপারে যে কজন নাম করেছে কোবা তার মধ্যে একজন। এবং কোবাই প্রথম যে, ফ্যানদের তুলোধোনা করতে ছাড়ে না। দীপাঞ্জন বলল,

—'কালীপুজো বলে বাবাকে ক্লায়েন্টরা অনেক কিছু পাঠিয়েছে। বিয়ার খাবি? ক্যানড্ অ্যামেরিকান একটা বিয়ার এসেছে, খেয়েছিস?'

—'না, তুই বরং কফি দিতে বল। তাহলে তুই মোটের ওপর এগ্রি করেছিস?'

—'ও ইয়েস। এটা একটা জঘন্য ব্যাপার। ছি ছি, এনথুসিয়াজম একটা ব্যাপার। কিন্তু এটা তো অসভ্যতা, শিয়ার হুলিগানিজম্।'

—'একটা লাইন শোন, এমনি ভেবেছি—ইট ইজ ট্র্যাজিক অ্যান্ড হিউমিলিয়েটিং। ইফ দা পিপল কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড 'হাই'—হোয়াই দা হেল্ ডু দে কাম ফর দা শো।'

—'আরো হার্ড হিটিং করতে পারিস। শালারা, নন্দন বাগচীকে আওয়াজ দিচ্ছিস? ড্রামার হিসেবে ওর কনট্রিবিউশন জানিস! শালা, কালকা যোগী...'

তাড়াতাড়ি ফিরেছিল কোবা। বাজি পটকা বোমা শুরু হয়ে গিয়েছিল। চর্কির ছেটকানো আলো ঘিরে বাচ্চাদের ভিড়। সাইকেলটা নিয়ে ফ্ল্যাট বাড়ির গ্যারেজে সোজা ঢুকে যায় কোবা। পার্ক করা মারুতি আর অন্য গাড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে। তারপর সাইকেলটা লক্ করে রেখে লিফটে চারতলায়। আজ কিন্তু কোবাকে আটকে দিল বাচ্চাদের দল। সেই সঙ্গে তাদের মায়েরাও। ওদের জন্যে চকোলেট বোমা ফাটিয়ে দিতে হবে।

—'এই এত বোমা ফাটাব এখন? ভীতুর ডিম। জ্বালতে পারিস না তো কিনতে গিয়েছিলি কেন? হাতে ফাটাব, দেখবি? তোরা কিন্তু করতে যাস না যেন।'

শুধু চকোলেট বোমা নয়। বোতলের মধ্যে বসিয়ে কি করে হাউই ওড়াতে হয় তাও কোবাকে দেখাতে হল।

—'এই গাপ্পি! বলেছি না মুখটা দূরে সরিয়ে রাখবি। হ্যাঁ, হাতটা স্ট্রেট রাখবি। নে, আরে সলতেয় আগুনটা দিবি তো। আন্টি, আপনি খেয়াল রাখবেন।'

বাড়িতে ঢোকবার সময় ওপরে দেখে নিয়েছে কোবা। চারতলায় তাদের বারান্দাটা অন্ধকার। কোবা গেলে তবে মেখলা মোমবাতি জ্বালাবে। তারপর দুজনে বাজি পোড়াবে। সামান্য কিছু আলোর বাজি। কোবা জানে যে মা-র সবচেয়ে পছন্দের বাজি হল রং দেশলাই। আর কোবার যে বাজিটা সবচেয়ে পছন্দ সেটা মেখলা সহ্য করতে পারে না। বলে ওর গা গুলোয়। কালো একটা বড়ি পুড়পুড় করে জ্বলছে, বিকট ধোঁয়া বেরোচ্ছে এবং কদাকার একটা কালো ছাই বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। সাপবাজি।

চারতলায় লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে দেখল সামনের আলোটা জ্বলছে না। ফলে ল্যান্ডিংটা অন্ধকার। ওপর থেকে কেউ ডাকায় লিফ্‌টটা উঠে যেতে অন্ধকার আরো বেড়ে গেল। মাঝে মাঝে উড়ন তুবড়ি বা রকেটের আলোয় জায়গাটা আলো হয়ে যাচ্ছে। চারপাশের বাড়িগুলোতে আলো জ্বলছে। কোবার কাছে চাবি থাকে। বাড়িতে ঢুকতেই পিংকি টলমল করে দৌড়ে এল।

বেরোবার আগে নিজের ফুটবল খেলার সময়ের ক্রেপ ব্যান্ডেজ পিংকির ঝোলা দুটো কানে জড়িয়ে, বেঁধে দিয়ে গিয়েছিল। পটকার শব্দে পিংকি ভীষণ আপসেট হয়। নিশ্চয়ই এতক্ষণ কোবার ঘরে বইয়ের র‍্যাক বা খাটের তলায় লুকিয়েছিল। পিংকিকে দেখে মনে হচ্ছে ওর যেন মাথায় একটা অপারেশন করা হয়েছে। নিচু হয়ে পিংকস্-কে কোলে তুলে নিতে নিতে কোবা দেখল পার্থকাকুর কোলাপুরি। কিন্তু তলায় তো ওর রংচটা ফিয়াটটা ছিল না। বাকিটা কোবার জানা। বাইরের ঘরে ঢুকলেই পার্থকাকু কী বলবে। মা চুপ করে বসে থাকবে। এবং বাবার বন্ধু ও ঘুষ খায় না বলে বিখ্যাত সরকারি আমলা পার্থ ঘোষ, আপাতত এসেনসিয়াল কমোডিটিতে আছে, নিজের পয়সায় বাংলা খায় বলে সপ্তাহে অন্তত তিনদিন একটা পাঁইট নিয়ে আসবে। মেখলা ঠাণ্ডা জল দেবে, খাবে, বলে যাবে যে কোনো বিষয় নিয়ে, অগাধ জ্ঞান, আজ হয়তো রিলকে, কালকে মেক্সিকোতে কত জাতের লঙ্কা হয়, নয়তো এক্সিস্টেনশিয়ালিজম, তার কত ভ্যারাইটি, সার্ত্রে কবে লিখেছিলেন ম্যান ইজ আ ইউজলেস প্যাশন থেকে ডয়েটশার, কংকুয়েস্ট, তার ওপরে ওর কোন বন্ধু ইস্ট জার্মানি যখন ছিল তখন ভারতবর্ষে নামকরা কে কে নাৎসি পে রোলে ছিল সব দেখে এসেছিল আরকাইভে এটসেট্রা এটসেট্রা...

ঘরে ঢুকতেই পার্থকাকু বাঁ হাতটা মুঠো করে তুলে কোবাকে বলল,

—'লাল সেলাম, কমরেড অ-নি-র্বা-ণ'। পিংকি কোলে ছটফট করছিল। কোবা জবাব দিল।

—'লাল সেলাম, নীচে তোমার গাড়ি দেখলাম না।'

—'দেখলি না কারণ এটা আমি আর্নেস্ট ম্যান্ডেলের থেকে শিখেছি।'

—'অ্যান্ড হু ইজ হি?'

—'ওঃ কোবা! রণজয় ওকে ঘেন্না করত। কারণ হি ওয়াজ, অ্যান্ড পারহ্যাপস এখনো হয়তো ট্রটস্কাইট। কিন্তু ম্যান্ডেল হলেন রিয়্যালি একজন মহান অর্থনীতিবিদ। প্যারিসে, ছাত্ররা যখন আটষট্টিতে রাস্তায় নেমেছে, সময়টা ভাব, প্যারিস ওয়াজ বার্নিং তখন একটা গাড়ি পুড়ছে দাউ দাউ করে আর ম্যান্ডেল দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে—এই হল বিপ্লব। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!'

—'তার সঙ্গে তোমার ফিয়াট!'

—'যে গাড়িটা পুড়ছিল সেটা ছিল ম্যান্ডেলের নিজের গাড়ি। এবং ঠিক সেই কারণেই আমি চাই না যে আমার কষ্টার্জিত অর্থে ক্রয় করা পুরনো ফিয়াটটা আজ কলকাতার বিপ্লবী জনগণ বনফায়ার করে দিক। তার কারণ আই অ্যাম নো ম্যান্ডেল। আমি কি নিজেকে বোঝাতে পেরেছি, বস্?'

কোবা দেখল বাংলার পাঁইটটা ওয়ান থার্ড ভর্তি।

—'পারফেক্টলি।'

কাচের লো টেবিলের ওপরে হিম শীতল জলের বোতল। গেলাশ। এতক্ষণে কথা বলল মেখলা। মেখলা খুব ক্লান্ত। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলে যেন,

—'তোর এত দেরি হল। বললি যে তাড়াতাড়ি আসবি।'

—'এসেছিলাম মা। নীচে বাচ্চারা ধরল, ওদের বাজি পুড়িয়ে দিতে হল। জ্বালতে পারে না। বোমা, রকেট—কত কি!'

—'মামুর ফোন এসেছিল। তোকে চাইল।'

—'কী বলল?'

—'জানুয়ারিতে আসবে।'

কয়েক মিনিটের অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। মা টিউবটা জ্বালেনি কেন? ডিম একটা আলো জ্বলছে।

লেনিন রচনাবলীর ওপরে ছবিটা অন্ধকার—রণজয়, মেখলা, কোবা।

—'আমি ঘরে আছি।' কোবা চলে গেল।

কোবা নিজের ঘরে গিয়ে পিংকিকে ছেড়ে দিল। বলটা টেবিল থেকে নিয়ে নীচে গড়িয়ে দিল। পিংকি কাৎ হয়ে শুয়ে বলটাকে থাবা দিয়ে দিয়ে কাছে এনে কামড়াতে লাগল।

কোবা ঘরের আলোটা নিভিয়ে টেবিলল্যাম্প জ্বালল। লিখতে শুরু করল, ইংরাজিতে,

"ফারেনহাইটের প্রথম কনসার্টে সেদিন নতুন যে দুজন 'আইজ' থেকে এসেছে সেই লিড গিটারিস্ট সন্দীপ বোস এবং বাসিস্ট শুভায়ন গাঙ্গুলি তাদের ক্ষমতার পরিচয় দিল—আয়রন মেডেন, ডিপ পার্পেল, ব্রায়ান অ্যাডামস্—এইসব চেনা ক্লাসিক দিয়ে শুরু। বন জোভির 'রানঅ্যাওয়ে' দুর্দান্ত জমেছিল। অসবোর্নের 'বার্ক অ্যাট দা মুন'-এর সময় কৌশিক একটা গিটারকে স্টেজে আছড়ে ভাঙল। এটা হাস্যকর গিমিক। বিভাস চক্রবর্তী গিটার আর কি-বোর্ড-এর রণজয় দত্ত অসামান্য। কিন্তু 'ফারেনহাইট' যখন পিংক্ ফ্লয়েডের 'অ্যানাদার ব্রিক ইন দা ওয়াল' বাজাতে যায় তখন দুঃখজনক হলেও থলির বাইরে ঘেয়ো বেড়াল বেরিয়ে পড়ল...

"এরপর এল 'হাই'। যাদের কতা নবীনতর প্রজন্ম কতটা জানে এই সমালোচকের জানা নেই কিন্তু ভারতীয় রক সঙ্গীতে 'হাই' এক প্রবাদ। ড্রামে ছিল নন্দন বাগচী। গিটারে লু হিল্ট, অমিত দত্ত ও অন্যান্যরা। 'টাইম টু গো হাই' ও 'আ প্লেস ইন দা সান' অসামান্য জমেছিল। হিল্ট-এর মাউথ অর্গ্যান কেউ ভুলতে পারবে? 'স্যাড স্টোরি' এবং 'টারপেন্টাইন গ্রাস' ভালো লাগল। কিন্তু অতীব দুঃখের ব্যাপার হল এর পরেই 'শিভা'-র উন্মত্ত সমর্থকরা চিৎকার করে, আওয়াজ দিয়ে 'হাই'-এর অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিল। 'শিভা'-র সমর্থকদের সমর্থক না হলেও আমি না বলে পারছি না ওদের নতুন ভোকালিস্ট গ্যাভিন ডে কুনহা যথেষ্ট ক্ষমতাবান। 'শিভা' সেদিন বন জোভি, ইগল্স্, আয়রন মেডেন, ভ্যান হ্যালেন এবং পিংক ফ্লয়েডের বাছাই করা গানে অনুষ্ঠান জমিয়ে দেয়। তবে তাদের শেষ উপস্থাপনা, 'স্মোক অন দা ওয়াটার' খুব জমেছিল কি? রক তারকা হয়ে উঠতে হলে গাভিন ডে কুনহাকে কি আর একটু ভাবতে হবে না?

"তবে 'শিভা' 'হাই' এবং 'ফারেনহাইট' আমাদের যা দিয়েছে তা এতই আনন্দের যে আমাদের ভেবে দুঃখ হয় না যে ব্রুস স্প্রিংস্টিন কখনো নজরুল মঞ্চে আসবেন না বা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে কখনো 'উডস্টক' হবে না। তবে শেষে একটা কথা না বলে পারছি না, "ইফ দা পিপল কান্ট অ্যান্ডারস্ট্যান্ড 'হাই'—হোয়াই দা হেল ডু দে কাম ফর দা শো। নিও-রিচরা সমাজের সর্বস্তরে আলগা পয়সা দিয়ে অসভ্যতা করছে। গানের গ না বুঝলে কি হবে, পকেটে অঢেল রেস্ত।" লেখাটা শেষ করার পর কোবা কিছুক্ষণ আলো নিভিয়ে শুয়ে থাকল। কিন্তু পিংকি কুঁই কুঁই করে ডাকছিল কোবাকে। কোবা অন্যদিন হলে পিংকিকে নীচে দিয়ে যেত। আজ ছাদে নিয়ে গেল। আটতলার ছাদে বাজি জ্বালানো বারণ। বেরোবার সময় দেখল পার্থকাকু যায়নি। ছাদে পিংকি একটু ছোটাছুটি করল। হিসু করল। রকেট আকাশে ফাটতে কোবার কাছে দৌড়ে এল। কোবা আর পিংকি কিছুক্ষণ ছাদে ছুটোছুটি করল। এরপর স্যাম ধরার ব্যাপারটা দারুণ মজার। কোবা চিৎ হয়ে শুয়েছিল আকাশের দিকে তাকিয়ে। ওর বুকের ওপরে পিংকি শুয়েছিল। হঠাৎ পিংকি মাথা তুলে কিছুক্ষণ গর্গর্ করে অন্ধকারে কাকে তেড়ে গেল। ছাদের দরজার কাছে চেনা গলার চিৎকার, বাসন পড়ার শব্দ, পিংকির চিৎকার। কোবা গিয়ে দেখে এক কাণ্ড। রাতে ছাদে পিকনিক হবে। দারোয়ান, সুইপার আর ড্রাইভারদের। ওরা স্টোভ, বাসনপত্র, মাংস—সব আনছিল। অবশ্য পিংকি ওদের চিনতে পেরেছে বলে কামড়ায়নি। ওদের কাছে কোবা অতীব শ্রদ্ধেয়। কোবা যেন কো-অপারেটিভের সেক্রেটারি মল্লিকবাবুকে কিছু না বলে।

মাঈজী যেন জানতে না পারে। কোবা সহজে ছাড়ার পাত্র নয়।

—'এখনই আমি মল্লিককে ডাকছি। আগে বল তোরা কালীপুজোর রাতে স্রেফ ভাত-মাংস খাবি? মাল নেই?'

—'না দাদা।'

—'নেই।'

—'রামকসম কোবাদা।'

—'ঠিক আছে। আমি মল্লিককে নিয়ে আসছি।'

তখন ওরা কোবাকে দেখাল ডিশ অ্যান্টেনার তলায় লুকোনো একটা বাজার ব্যাগ। তার থেকে বাংলার বোতলের ছটা ছিপি উঁকি মারছে। কোবা ওদের চল্লিশ টাকা দিল। পিংকিকে কোলে নিয়ে নামার সময় বলে এল কোনো বাওয়াল-ফাওয়াল হলে কিন্তু সে বলবে যে সে কিছুই জানে না। ওরা তো মহাখুশি। কোবাদা হল ভগবান। ভগবান জানলে তো ভালো। মল্লিকবাবু বহোৎ হারামি। ও না জানলেই হল। হবি তো হ ল্যান্ডিং-এ মল্লিকের সঙ্গে দেখা।

—'কোবা, ও তুই! আমি বারান্দা থেকে কিছু সারেপটিশাস মুভমেন্ট লক্ষ করলাম। ব্যাগ নিয়ে সুইপার ঢুকল। হোসেন তাকে জাপটে ধরল। স্ট্রেঞ্জ!'

মল্লিককাকু তখন ঈষৎ, যাকে বলে পগারু মানে পগার পেরোয়নি, কিন্তু পেরোব পেরোব করছে।

—'নাথিং অফ দ্যাট সর্ট, কাকু। আমি কোনো ঝামেলা হচ্ছে কিনা দেখার জন্যে দা মোস্ট লাইকলি স্পট্—ছাদে গিয়েছিলাম। শান্ত। কেউ নেই।'

pathagar.net

—'নেই তো?'

—'কেউ নেই।'

—'ওঃ কোবা! তুই, রিয়্যালি। তোকে দিয়ে হবে। এতগুলো ছোটলোক নিয়ে ডিল করা।'

—'ও আপনি ভাববে না কাকু।'

—'ব্যাস্। নাউ আই ক্যান রিল্যাক্স!'

ফ্ল্যাটে ঢুকে কোবা দেখল পার্থকাকু চলে গেছে। টেবিল পরিষ্কার। মেখলা বারান্দার গ্রিলে মোমবাতি বসাচ্ছে। চারদিকে প্রচণ্ড শব্দ। পাতার পর পাতা কালীপটকা একসঙ্গে ফাটছে। দোদোমা, চকোলেট ফাটছে। বিস্ফোরণের শব্দের মধ্যে কোনো ছেদ বা বিরাম নেই। কোবার মনে হল দুনিয়ার সব কটা রক ব্যান্ডের ড্রামাররা খেপে গেছে। অনেক বাড়িতেই মোমবাতি নিভে গেছে বা দু-একটা টিমটিম করছে।

—'মা, দেখ, যেন যুদ্ধ হচ্ছে। হরিব্‌ল। তুমি এই রোগা রোগা মোমবাতিগুলো কিনেছ কেন? বাটির মতো ক্যান্ডেলগুলো কিনতে পারতে।'

—'রঘুর দোকানে এগুলো ছাড়া কিছুই ছিল না। তুই তো এখানে সেখানে যাস। আনতে পারতিস।'

—'এখন আনব?'

—'না, থাক। এগুলোই জ্বালি না। কিছুক্ষণ তো জ্বলবে। তুই বাজিগুলো নিয়ে আয়।'

কোবা বাজির প্যাকেটটা নিয়ে এসে দেখল ঝলমলে মোমের আলোয় মেখলা বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে মাকে। কিছু চুল পেকে গেছে—সেগুলো রুপোর জরির কাজের মতো। গত বছর বাথরুমে পড়ে গিয়ে মেখলার কোমর ভেঙে গিয়েছিল। ডঃ হোম

চৌধুরী অপারেশন করেন। হাড়ের জোড়ের জায়গায় স্টিলের বল বসানো আছে। মেখলা সিঁড়ি ভাঙতে পারে না। বেঁকে বেঁকে হাঁটে। যেখানে না গেলেই নয় সেরকম জায়গায় যেতে হলে কোবা সঙ্গে থাকে।

মা আর ছেলে মিলে অনেকক্ষণ ধরে বাজি পোড়াল। মেখলা রং দেশলাই জ্বালল। শব্দহীন এইসব আলোর বাজি দেখতে পিংকিও এল। কিন্তু কোবা সাপবাজি জ্বালতে ভয় পেয়ে ভেতরে চলে গেল।

—'একটা কিছু রেখে তার ওপরে জ্বাল্ না। বিচ্ছিরি দাগ হয়ে যায় বারান্দাতে। ওঠে না।'

—'ও এত দাগ হয়ে গেছে যে আর কিছু হবে না। বরং এই দাগটা হওয়া দরকার!'

—'সে আবার কি!'

—'বাঃ, দাগগুলো দেখলে একটা অ্যাপ্রক্সিমেট আইডিয়া পাওয়া যাবে যে কতগুলো সাপবাজি জ্বালানো হয়েছে। ও এই সাপটার সাইজ দেখ মা—শেষই হচ্ছে না।'

—'লোকে শুনলে কি বলবে? পঁচিশ বছরের বুড়ো ছেলে সাপবাজি জ্বালছে।'

—'কি হয়েছে? আর তুমি যে রং দেশলাই জ্বালছ সেই থেকে।'

—'রং দেশলাই-এর আলোটা কী সুন্দর দেখেছিস?'

জোরে বাতাস দিল। মোমবাতির শিখাগুলো একদিকে হেলে গেল। উল্টোদিকের বারান্দায় বিরাট একটা রংমশাল জ্বালিয়েছে অভীর বাবা। চারদিক আলো হয়ে গেল। সেই আলোয় কোবা দেখল তার মা-র ছায়াটা বিরাট হয়ে বারান্দার দেওয়ালে ঘুরছে। পিংকি আবার ফিরে এসেছে। সন্দিগ্ধ মুখে সাপগুলোকে লক্ষ করছে। বিকট শব্দে বোমা ফাটল নীচে। পিংকি আবার দৌড়ে পালাল।

রাতে খেতে বসে কোবা বলল, বাইরে বোমা ফাটছে,

—'আমি যা যা করি সব কিছুই তোমাকে জানাই। কথাটা কি সত্যি?'

—'হঠাৎ?'

—'আঃ, যা বলছি সেটার উত্তর হয় ইয়েস আর নো। আমি কিছু লুকোই তোমার কাছে?'

—'নো'। মেখলা হাসে।

—'তাহলে তুমি লুকোও কেন?'

—'কী লুকিয়েছি তোর কাছ থেকে?' খুব আস্তে, প্রশ্ন করে মেখলা।

—'লুকিয়েছি।'

—'কী লুকিয়েছি বল?'

পিংকি চেয়ারের তলায় শুয়ে কোবার পা কামড়াচ্ছে।

—'আঃ, কী হচ্ছে কী পিংকস্? অবশ্য আমি দেখিনি। কিন্তু গেরিক তোমায় দেখেছে। ও ফালতু কথা বলার ছেলে নয়?'

—'কী দেখল আবার গৈরিক?'

—'বাঃ, চমৎকার। কী দেখল? তোমার সিঁড়ি ভাঙা বারণ, একলা বেরোনো বারণ আর তুমি নকসালাইট মিটিং অ্যাটেন্ড করতে সেই চৌরঙ্গিতে যাচ্ছ?'

—'একবারই তো গিয়েছিলাম। ভাবলাম তোর বাবার কোনো বন্ধুর সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়। আর এরকম ব্যাপারে যাওয়া উচিত? উফ্ যা নার্ভাস করে দিয়েছিলিস।'

—'তবে এগুলো তোমার করা ঠিক নয়। মেট্রো করে গিয়েছিলে, না?'

—'হ্যাঁ।'

pathagar.net

—'অতগুলো সিঁড়ি। দরকার হলে বলবে--আমি নিয়ে যাব বা কাউকে বলব।'

—'আচ্ছা, আমার কাছে যে পার্থ আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়। তোর কিছু মনে হয় না?'

—'হ্যাঁ হয়। ও হল একটা পারপ্লেস্‌ড্‌ মোরন। এবং মোরনটার তোমার সম্বন্ধে উইকনেস আছে।'

—'আর আমার?'

—'যতদূর জানি নেই। হলে সত্যিই—রিডিকিউলাস।'

—'রিডিকিউলাস কেন হতে যাবে। ভালোবাসা তো ভালো। আচ্ছা, কৌশিকের কী হল বল তো? এল না।'

রাত্তিরে কোবা কিছুক্ষণ পড়ে। মেখলা ওর টেবিলে বুকলেটটা রেখে গেল।

কোবা পড়তে শুরু করল। বাবার সময়ের অনেক, অনেক কিছু কোবা জানে। কিন্তু কোবার জানা ছিল না যে...এখনো...

"সুদীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর মামলা চালিয়ে নকশালবাড়ি আন্দোলনের অনুগামী ১৮ জন গরিব কৃষককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডিত করা হয়েছে। সম্প্রতি বিচার-প্রহসনে ঝরে গেছে দুটি অমূল্য তাজা প্রাণ। সর্বস্বান্ত গরিব কৃষক নিমাই সরকার আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। আরেক কৃষক একই কারণে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছেন। আমরা মনে করি এ ঘটনা নিছক আত্মহত্যা বা মৃত্যু নয়—রাষ্ট্র দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ড। বাকি দেড় শতাধিক মামলাধীন সংগ্রামী মানুষও একই সম্ভাবনার সম্মুখীন।"

কোবা শুনতে পায় মেখলা দেবব্রত বিশ্বাসের ক্যাসেট বাজাচ্ছে। বোমার শব্দের মধ্যে,

'তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না,
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল।'

মেখলা জানে কোবা ঠিক ওর বাবার মতো। কেটে কেটে কথা বলে। ঘুম আসে না মেখলার। কোবাও ঘুমোয়নি, অদ্ভুত সব নাম, যাদের মামলায় জড়ানো হয়েছে—বুধারী মারতি, নসীব দেবশর্মা, মাংতা রাজবংশী, তালা মুর্মু, ফেলু দেশি—কিশোর 'দেশদ্রোহী'র 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের' বিচার (?) চলছে জুভেনাইল কোর্টে নয়—

১) অশান্ত দেবশর্মা (ছোট)—ইটাহার ৩১(২)৮১ ; ৩৯৫/৩৯৭/১২০ বি ; ১৯৮১ সালের গ্রেপ্তারের সময় বয়স ছিল ১০ বছর।

২) সহদেব মাল—সিউড়ি সেশন কেস নং ৮০/৮৫ ; এস আর কেস নং ১৭২/২ গ্রেপ্তারের সময় বয়স ছিল ১১ বছর।

৩) শীতল দেবর্শমা (জন্মের তারিখ ৪-৫-১৯৭০) ইটাহার পি এস কেস নং ৩১ তাং ২৩-২-৮১ ; ৩৯৮/৩৯৭/১২০/১২০বি/৩৪ আই.পি.সি ; ২৫/২৭ আর্মস অ্যাক্ট ; চার্জশিট তাং ২৫.১০.৮৪ ; যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত (?)

...পরে, মেখলা একসময় উঠে এসে দেখল যে কোবা ঘুমিয়ে পড়েছে। কোবা বলে দিয়েছে চাকরি করবে না। যাদবপুর থেকে ইংরেজিতে এম. এ-র পর কোবা এক অনিশ্চিত রোজগারের জীবন বেছেছে। এই রক ব্যান্ডের প্রোগ্রাম রিভিউ করছে, এই আবার চলল কোল ইন্ডিয়ার কি এক ওয়ার্কশপের রিপোর্ট তৈরি করতে। চাকরি ভালো লাগে না। বেশি রোজগার করতেও

কোবা আগ্রহী নয়। তবে মেখলা জানে যে কোবা একটা উপন্যাস লিখছে। এবং সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের সেটা হল উপন্যাসটা বাংলায় লেখা হচ্ছে বলে শোনা গেছে। মেখলা কোবার ঘর থেকে বসার জায়গায় চলে এল। পার্থকে মেখলা বলেছে তুমি দিশি খাও, যা খাও যাওয়ার সময় বোতলটাও যেন নিয়ে যেও। কোবা ঠিক বলেছে। পারপ্লেক্সড্ মোরন। মেখলা সেই ডায়রিটা লেনিন রচনাবলীর পেছন থেকে বের করল। উনিশশো ঊনসত্তরে রণজয়-মেখলার বিয়ে হয়। রণজয়ের সাতাশ, মেখলা পঁচিশ। সব গুলিয়ে যায়। মানুষের জীবনের এত যে সমস্যা তার একটা বড় কারণ হল তারা দুমুখু খোলা সময়ের মধ্যে নিজেদের সময়ের হিসেব রাখে না। সময়ের পাশে পাশে পৃথিবী পাল্টাচ্ছে, পয়সা পাল্টাচ্ছে, হিরো-হিরোইন পাল্টাচ্ছে, রাজনীতি পাল্টাচ্ছে—এরও হিসেব রাখে না। তারপর একটা সময় আসে যখন হিসেব রাখার ক্ষমতাও থাকে না। তখন মানুষ হয় ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট বা ইনটেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিটে চলে যায়। ডাক্তারদের বড় একটা হিসেব রাখার কথা নয়। বাইরে রাখা ভিজিটার্স কার্ড নিয়ে ঘেমো হাতে রেলিং ধরে ধরে ওঠে বা লিফটের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাদেরও হিসেব গুলিয়ে না যাওয়ার কথা নয়। এসব হল তাও সেইসব প্রাত্যহিক ব্যাপার যার হয়তো লেখাঝোকা থাকে। আবার হিসেব যেখানে হয় না, যেখানে হিসেবের তলায় গণিতটা বড়ই জটিল—"২৭ আগস্ট, ১৯৯৪। ফলিডলের শিশি গলায় ঢেলে দিয়েছিলেন নিমাই সরকার। মামলার বোঝা বইতে না পারার ফলেই যে তিনি, আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন এই সত্যটুকুও গোপন করেছিলেন পরিবার-পরিজন। ডায়রিয়াতে নিমাই মারা গিয়েছেন এমনই প্রচার করেছিলেন তাঁরাই। কারণ? পুলিশের ভয়। ১৯৮০ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন নিমাই। ১৯৮১ সালে গ্রেপ্তার হন একটি খুনের অভিযোগে। ১৪ বছর মামলা চালাতে হয়েছে তাঁকে। গত ১৯ নভেম্বর রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার ও বন্দী মুক্তি কমিটি এবং পিইউসিএল (পশ্চিমবঙ্গ শাখা)-র একটি যৌথ তদন্ত দলের প্রতিনিধিদের নিমাই সরকারের বিধবা মা সন্ধ্যারানী সরকারের দেওয়া সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে উক্ত ঘটনাটি জানা গেল।" বিয়ের বছরেই কোবা হয়। রণজয় ইতিহাসের এম. এ। স্কুলে পড়াত। ১৯৭০-এ রণজয় ধরা পড়ে। ১৯৭৩-এ ছাড়া পায়। ১৯৭৪-এ প্রথম লক্ষণগুলো ধরা পড়ে। ১৯৭৩ থেকে অ্যাসাইলামে যাওয়া অবধি রণজয় কৌশিককে পড়িয়েছিল। দাদা অর্থাৎ কোবার 'মামু'—তিয়াত্তরে এসেছিলেন। তিনি রণজয়ের অ্যাসাইলামের খরচা নিয়মিত পাঠান। বেলজিয়ামে থাকেন। অবশ্য ইউ এন-এর কাজে আজ কিউবা, কাল নরওয়ে লেগেই আছে। মেখলার দাদার স্ত্রী ফরাসি মহিলা। ওঁদের এক মেয়ে। যে এখন পেরুতে, লিমা-র কাছেই একটি এনজিও-র হয়ে কাজ করছে। বোমা ফাটল কোথাও। আকাশে আলো উড়ল। মামু মেখলাকেও টাকা পাঠান। অনেক টাকা। মেখলা আই এস আই-এর চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। কোমর ভাঙার পর। সেভাবে বললে কোনো অসুবিধে নেই। এছাড়া মধ্যমগ্রামে রণজয়ের বাবা দেড় কাঠা জমিতে ছোট্ট একটি একতলা বাড়ি বানিয়েছিলেন। বাবা ছাড়া রণজয়ের বলতে কেউ ছিল না। কারণ রণজয় কখনো কারো কথা বলেনি। রণজয় অ্যাসাইলামে যাওয়ার পর রণজয়ের বাবা কোবার নামে বাড়িটা লিখে দিয়ে চলে যান—পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। স্বদেশী যুগের দুই সহকর্মী ওখানে অনেকদিন ছিলেন। তাঁরাই ওঁকে যেতে বলেছিলেন। বাড়িটা তালাবন্ধ। মাঝেমধ্যে কোবা ওর বন্ধুদের নিয়ে যায়। বন্দী মুক্তির মিটিঙে হঠাৎ বৃষ্টি এসেছিল। অসংখ্য পুলিশ। খাকি পোশাকের। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়েছিল, চা খাচ্ছিল, ভারতের পার্লামেন্টের মতো বলয়াকৃতি প্রস্রাবাগারের সামনে কেউ কেউ খুঁচিয়ে কান পরিষ্কার করাচ্ছিল। বৃষ্টিটা থামতে মিটিং শুরু হল। শ-দুয়েক লোক।

কেউ মেখলাকে চিনতে পেরেছিল। সে গিয়ে বলায় মঞ্চ থেকে কাঁচাপাকা চুল, অল্প দাড়ি, সৌম্য চেহারার একজন ভদ্রলোক নেমে এসে নমস্কার করে আলাপ করলেন। গৈরিক এসব 'কমি'-দের মিটিং শোনার ছেলে নয়। ও চৌরঙ্গিতে গিয়েছিল মেট্রোর গলি থেকে রিচার্জেবল ব্যাটারি কিনতে। দূর থেকে গৈরিক দেখল কোবার মা ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছে। রণজয়দাকে চিনতাম। জানি, খবর পেয়েছি। আমার নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। এপিডিআর-এর—সুজাত ভদ্র ও প্রিইউসিএল-এর দেবাশিস আইচের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল।

আনসারি সাহেবের স্পেশাল শ্যামা-পার্টির থেকে ফিরে বসাক তার একলার শোবার ঘরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে দেখল কণ্ঠা অবধি শুকিয়ে খস্ খস্ করছে ও তেড়ে পেচ্ছাপ পেয়েছে। বসাক সেই বিরল মানুষদের মধ্যে একজন যারা যুক্তিনির্ভর স্বপ্ন দেখে। এবং দেখতে শুরু করে গোড়ার থেকেই যখন চোখ দ্রুত এপাশ-ওপাশ করে। একে বলে র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট বা আরইএম। এই নামে একটি রক ব্যান্ড রয়েছে কোবা যাদের খুবই পছন্দ করে। বসাক যা শুনেছে বা যা করেছে সেই ঘটনা বা অবস্থাকে যথোচিত ভাবে দেখতে পায়। সেদিন বসাক তার খুঁটিয়ে পড়া একটি বইয়ের বিশেষ একটি অংশ স্বপ্নে দেখছিল। প্রথমে দেখল বড় বড় পাতাওয়ালা কচুগাছ। উপড়োনো তুলসীর গাছ যার বিবিধ শেকড় আকাশে শুঁড় ওড়াচ্ছে। তারপর বীভৎস চিৎকার করে বোয়াল মাছের একটি খণ্ডবিখণ্ড মাথার ওপরে একযোগে জনাবিশেক কালো বেড়াল লাফিয়ে পড়ল যাদের সামনে পেছনে মিলিয়ে তিনটি পা বলে তারা প্রায়ই হাস্যকরভাবে পড়ে যায়, এ ওকে কামড়ায়, ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে। এরপরই দেখা গেল দুর্বল মৃত ঘাসের বৃত্তাকার বাসায় ছোট ছোট অসহায় ডিম এবং পায়ের তলায় সুড়সুড়ি। এ অবধি ঠিকই ছিল। তারপরই বসাক দেখল বেবাক বর্ষার ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে তিনফলা ত্রিশূলের মতো নিড়ানি কেঁচোগেলা মাটি খুঁড়ছে এবং কচুগাছ, তুলসী গাছ হটরপটর উল্টোচ্ছে। এবং এই উৎপাটনকে আলোকিত করে রেখেছে একটি হেডলাইট—একচোখ কানা পুলিশভ্যান। বসাক ঘুম থেকে উঠে রেগে গেল।

কোবার ঘুমিয়ে থাকা, মেখলার জাগরণ ও বসাকের নিদ্রাভঙ্গের সময়ে কোনো নামহীন স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়তে দেরি হচ্ছিল। সেই নামহীন অন্ধকার স্টেশন টেমির আলোর পাশে কয়েকটা মুড়ি দেওয়া লোক বসেছিল। সেখানে রেডিওতে গান বাজছিল। রণজয় বিড়বিড় করে বলল, "গ্রামাঞ্চলে রেডিও নেওয়ার ব্যাপারে জোর দাও। পিকিং রেডিও প্রতিদিন শোনা একটা অবশ্যকরণীয় কাজ হিসাবে নিতে হবে। আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব প্রায় প্রতিদিন নির্দেশ দিচ্ছেন, সে নির্দেশ আমাদের বুঝতে হবে এবং কাজে লাগাতে হবে। আমি এখানে যদি কোনো নতুন ছেলে পাই তাহলে তাকে তোমাদের কাছে পাঠাব। উদাহরণ থেকে আমাদের সকলকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তোমাদের অবশ্যই অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কেন এরকম হল ভাব এবং তা থেকে শিক্ষা নাও—তাহলেই ভবিষ্যতের বিচ্যুতি থেকে বাঁচবে। বন্দুক সংগ্রহ কর, এটাই আজকের রাজনীতি।"

ঘুমের কোনো সমস্যা বসাকের কস্মিনকালেও ছিল না। বরানগর, বারাসাত, সন্তোষপুর, বেলেঘাটা—কত জায়গায় থেকে বসাক কত কাণ্ডের পরে রাত করে ফিরে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। এবং পরে বহুবার সে সব কালান্তক দৃশ্য স্বপ্নে দেখে অকাতরে ঘুমিয়েছে এবং ঘুম থেকে নবোদ্যমে জেগে উঠেছে। বসাক অন্য মেকদারের মানুষ। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, স্নানের পরে বসাক কখনো গা মোছে না। ওর সবকিছু ঘড়িবাঁধা এবং আপাদমস্তক সে ফিটনেস ম্যানিয়াক। বিশাল অফিসে নিজের এসি ঘরে বসে বসাক এক্সারসাইজ করে। বাঁদিকের দাপনাটা

শক্ত করল। আগলা করে দিল। ডানদিকের দাপনাটা শক্ত করল। আলগা করে দিল। টেবিলের উল্টোদিকে বসে যে লোকটা ন্যাশনাল হাইওয়ে থার্টি ফোর সম্বন্ধে বসাকের বিশদ জ্ঞান দেখে থ মেরে গেছে সে বুঝতেই পারে না। পুলিশের চাকরি হেলায় ছেড়ে দিয়ে ১৯৮০-তে দুর্গাপুরে এক ব্রিটিশ কোম্পানিতে সিকিউরিটি অফিসার হিশেবে যখন ডবল মাইনেতে বসাক ঢুকেছিল তখন কেউ বুঝতেই পারেনি যে বসাক কী হতে চলেছে। গোটাদুয়েক লরি দিয়ে শুরু। তারপর নিজের সিকিউরিটি এজেন্সি। শুরু হতে না হতে ক্যুরিয়ার সার্ভিস। অথচ বসাকের সহকর্মীরা একসময় বলত এত বীভৎস টর্চার যে করতে পারে সে হয় খতম হয়ে যাবে নয়তো পাগল হয়ে যাবে। সত্তরের ডামাডোলে বসাকের নিজস্ব ও একান্ত নিজস্ব ভোকাবুলারি দেখে ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার—ডি সি, এ সি-রাও চমকে যেতেন। বসাক কখনো নকশাল বলত না, বলত 'নুড়কুৎ'। চোদ্দ থেকে ষোল—'নুংকু'। ষোল থেকে আঠারো—'গ্যাঁজ'। আঠারো অতিক্রম করার পর ক্রমানুযায়ী—'ডগা', 'ভাইড়ু', 'কোন্ডা' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব কারণেই বসাক হল বসাক। বসাকের বাড়িটি দোতলা। একতলায় বউ, দুই ছেলে এবং তাদের বউ। দোতলায় বসাক। একা। তিনটি ঘর নিয়ে যার একটি বসাকের বেডরুম। আগেই বলা হয়েছে যে ঘুম নিয়ে বসাকের কোনো সমস্যা ছিল না। বলতে গেলে এখনো নেই। তবে তার নানাবিধ স্বপ্নের শেষদিকে কখনো-সখনো তিনফলা নিড়ানির আবির্ভাব ঘটলে বসাক রেগে যায়, দুশ্চিন্তা হয় তার এবং কিছু আফশোসও আসে। বরং একাদিক্রমে ঘুম না আসার সমস্যাটা বছর তিনেক আগে বেড়েছিল বসাকের বউ সন্ধ্যার। থাইরয়েডের সমস্যায় সন্ধ্যা বড় মোটা। তারপর একদিন রাতে দেখা গেল নিদ্রাহীন সন্ধ্যা ছেলেদের ঘরের দরজা ধাক্কাচ্ছে এবং গালিগালাজ করছে। হাতে ব্রা। বসাক শলাপরামর্শ করে ডঃ অঙ্কুশ মিত্রর কাছে সন্ধ্যাকে নিয়ে গিয়েছিল। ডঃ মিত্র অনেকক্ষণ দুজনের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর একসময় বসাককে বললেন,

—'মিঃ বসাক, কিছু যদি মনে না করেন আমি কয়েকটা কথা ওঁকে একটু আলাদা করে জিজ্ঞেস করতে চাই। ইফ ইউ ডু নট মাইন্ড।'

—'না, না, এতে মনে করার কি আছে। আমি বাইরে আছি। আপনি কথা বলুন।'

বাইরের ঘরটায় একটি মেয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। মেয়েটির স্বামী ও তার বন্ধুরা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিল। মেয়েটা থেকে থেকে চিৎকার করে উঠছিল,

—'আমি একটুও কাঁদব না। আগে বল, প্রিয়াংকাকে তোমরা কোথায় নিয়ে গেলে? আমায় কেন যেতে দিলে না? কেন?'

—'শোনো, সুমনা, শোনো—প্রিয়াংকা কোথাও যায়নি, প্রিয়াংকার কিছু হয়নি। ডঃ মিত্র সবকিছু তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন। তুমি মিথ্যে মিথ্যে এত আপসেট হচ্ছ!'

বিরাট, ভয়ংকর, সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাওয়ার পরে তেমন কিছু হয়নি এমনি বোঝাবার এই চেষ্টা দেখে বসাকের মনে পড়ে গেল বসাক সরে যাবার পর শীর্ণ, ভীত যুবকটি যখন বিহ্বল হয়ে ঠোঁট চেটে চেটে নিজের রক্তের স্বাদ পাচ্ছে, একটা ভয়াবহ অধিবেশন সত্যি শেষ হল কিনা ভাবছে তাকে কেমন অবাক করে সুদর্শন কোনো এসবি অফিসার এসে বিস্মিত করে দিত।

—'এই ব্রুটালিটি আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। সিগারেট খান তো? নিন। ইস্, ঠোঁট্টা ফেটে গেছে। সাইড দিয়ে ধরান। চা খান।'

সাময়িকভাবে এই 'মানবিকতা'র ফাঁকে ফাঁকে।

—আপনার ইউনিটে আর কে কে আছে?

—কার কাছ থেকে পার্টির কাজের টাকা পান?

—আপনাকে পার্টি কত টাকা দেয়?

—জীবনটাকে এইভাবে নষ্ট করলেন কেন?

বসাক খুব নিস্পৃহভাবে একটা তুলনা টানার চেষ্টা করছিল। তারপর সহসা দেখল যে সুমনা নামক মেয়েটির, বেশ দেখতে যদিও এখন ন্যালাক্ষ্যাপা, মেয়েটির ব্যাপারে সে বলতে গেলে বিরক্তই এবং ভেতরে সন্ধ্যা নামধারী তার স্ত্রীর ব্যাপারে সে উদ্বিগ্ন—এবং এখনই তার নীল রং করা ট্রাক দুর্দান্ত গতিতে বীরপাড়া ফরেস্ট চিরে এগিয়ে চলেছে—গরম লাগল বসাকের। বাইরের বারান্দাটা ঠাণ্ডা। সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বসাক। ভেতরে মেয়েটা চেঁচাচ্ছিল। বারান্দায় একটা টুল আছে। তাতে গালে দাড়ি রোগা একটা লোক বসেছিল। বসাক হঠাৎ দেখল গরমকালে ওই লোকটা একটা পুরোহাতা গরম জ্যাকেট পরা। লোকটারও নিশ্চয় গরম লেগে থাকবে। সে পেটচেরা শব্দ করে, চেন টেনে, জ্যাকেটটা খুলল। ভেতরে হাত ঢুকোল। মেয়েটা আবার চেঁচাচ্ছে। লোকটা উঠে দাঁড়াল। বারান্দায় তিরিশ পাওয়ারের আলো। কার সাধ্য যে মুখ চিনবে? রিফ্লেক্সগুলো আগের মতো থাকলে বসাক কি অমন ভুল করত?

pathagar.net

৩

৩.১১.৯৪

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই তৈরি এই বাড়িটা ছিল গোড়াতে ইস্কুল। চলেনি। পোড়ো হয়ে পড়ে ছিল। পরে কলকাতার এক ব্যবসায়ী বাড়িটা কিনে নিয়ে সম্ভবত পারিবারিক কোনো কারণে এটিকে পাগলখানায় পরিবর্তিত করেন। কেউ বলে তাঁর বউ পাগল ছিল। আবার কেউ বলে তাঁর ভাই ছিল পাগলের ডাক্তার। কলকাতায় তেমন পসার না পাওয়ায় এইখানে এসে দাদার কেনা বাড়িতে পাগলখানা খোলেন। যাইহোক, তারপরেও হাতবদল হয়েছে এবং পাগলখানাটি তাই রয়ে গেছে। চুপচাপ জায়গা। হৈহট্টগোল নেই। পাগলগারদ থেকে বেরিয়ে যেদিকে রণজয় অস্ত্রের খোঁজে গিয়েছিল তার উল্টোদিকে সাত কিলোমিটার মতো এঁকেবেঁকে গেলে পরে একটি পাওয়ার স্টেশন। বর্ষায় ইটভাটাগুলো থেকে জলের তাড়া খেয়ে সাপ পালায়। অনেক সময় পাগলখানায় এসে ওঠে। স্টেশনের ওপারে এখানকার পুরনো ডাক্তার থাকেন। ডাক্তার দাম, তিনি এখানে বাড়ি করেছেন। কলকাতা থেকেও সপ্তাহে দুজন ডাক্তার আসে। তারা কমবয়সী এবং কি যে হিজিবিজি বলে তা দাম ডাক্তার বুঝতে পারেন না। পারার কথাও নয়। তবে তিনি মোটের ওপর ওদের কথা শুনে চলেন। ওদের কথামতোই তিনি ফুলবাগানের সঙ্গে সবজির বাগান করিয়েছেন, পোলট্রি বানিয়েছেন। রোগীরাই এগুলো দেখাশুনো করে। একবারই শুধু তিনফলা নিড়ানি নিয়ে রণজয় পালিয়েছিল তিন বছর আগে। তার আগেও দুবার পালাবার চেষ্টা করেছিল। পারেনি।

কালীপুজোর পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ দাম ডাক্তার উঠোনে মোড়ায় বসে রসুন তেল মাখছেন। হঠাৎ শুনলেন গেটে সাইকেলের ঘণ্টা। গোবিন্দ দারোয়ান, মালি, ওয়ার্ড বয়—অনেক কিছু।

—'ডাক্তারবাবু, রণজয়দাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

—'অ্যাঁ! রণজয়। সব দিক দেখিছিস! বাথরুম!'

—'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। ভেতরে কোথাও নেই।'

—'কাল রাত্রে ঠিক সময় তালা পড়েনি?'

—'পড়েছিল। তবে পুজোর রাত তো।'

ডাক্তারবাবুর নাতনি বেলী দাঁড়িয়ে শুনছিল। সে দৌড়ে দিদিমাকে খবর দিতে গেল।

—'অ দিদা, একটা লোক না পালিয়েছে।'

তেল হলুদ মাখা হাত শাড়িতে মুছতে মুছতে ডাক্তারগিন্নী বেরিয়ে এলেন। দাম ডাক্তার রণজয়কে বড় ভালোবাসেন। নার্ভাস হয়ে পড়েন।

—'ফোন তো খারাপ!'

—'হ্যাঁ।'

—'তুই এক কাজ কর। পাওয়ার স্টেশনের দিকটা একবার দেখে, ওখানে কথা বলে থানায় চলে যা। দারোগাবাবুকে তো চিনিস। ওঁকে বলে, ওফ্ সব গুলিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালে ফিরে আগে অফিস থেকে রণজয়ের বাড়ির ফোন নম্বরটা নে। তারপর পাওয়ার স্টেশন হয়ে থানা। দারোগাবাবুকে বলে একটা এফআইআর কর।'

—'সেই সেবার যেমন করেছিলাম?'

—'হ্যাঁ, আর...আর...দারোগাবাবুকে নম্বরটা দিয়ে বলবি একটা ফোন করে দিতে কলকাতায়, বলবি আমি বিশেষ করে বলেছি, আমাদের ফোনটা সেই কবে থেকে খারাপ হয়ে আছে। আর...আর...না, আর কিছু নয়...তুই চলে যা।'

গোবিন্দ রওনা দিতে দাম ডাক্তার তাড়াতাড়ি কুয়োতলায় স্নান সারলেন। ধুতি, শার্ট পড়লেন। ভট্‌ভট্ করে শব্দ। বেলী এসে বলল পুলিশ এসেছে। আবার ধড়াস ধড়াস। চশমা পরে চটপট গেটের কাছে গিয়ে দেখলেন পুলিশ নয়, মাথায় ক্র্যাশ হেলমেট পরা কালো কোলো মোটাপানা একজন।

—'দাদু, আপনি পাগলখানার ডাক্তারবাবু?'

—'হ্যাঁ, কেন ভাই?'

—'খবর নিয়ে নিয়ে এলাম। কাল রাতে একজন লোককে স্টেশনের কাছে ফাঁসির মোড়ে ছেড়ে দিয়েছিলুম। উল্টোপাল্টা বকছিল। তখন বুঝতে পারিনি। ভাবলুম মাতাল। পরে সকালে উঠে কেমন খটকা লাগল। ভাবলুম...'

—'আরে হাসপাতাল থেকে একজন তো কাল পালিয়েছে। নাম বলেছে? কেমন দেখতে...লম্বাটে, দাড়ি আছে...'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি নাম যেন বলল?'

—'রণজয়?'

—'হ্যাঁ, তবে ঠিক মনে নেই, হেব্বি গামবার্ট টাইপের, রিভলভার, আর্মস—এইসব বলছিল, ঘাবড়ে দিল।'

—'হায় ভগবান!'

—'ও আপনার লাস্ট ট্রেন ধরেচে। কলকাতার।'

—'আপনার নামটা?'

—'সে বলব না। কি হবে, পাগল কাকে ঝেড়ে দেবে আর আমি ফেঁসে মরব। স্রেফ আপনাকে বললাম। একটা ডিউটি যেন। আপনাকে নাম বলতে আবার কি—কিন্তু ওই পুলিশ কেসফেস যেন...'

—'না, না বাবা। তোমায় নাম বলতে হবে না। বুঝতে পেরেছি।'

—'দেখুন, এখন খুঁজে পেলো ভালো। পায় চোট ছিল জানেন। লেংড়ে লেংড়ে হাঁটছিল। তবে হ্যাঁ, কথা না বুঝলে কিছু বোঝার জো নেই। কি ছিল দাদু, মানে ম্যাডকেসের আগে? ডাকাত?'

দাম ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,

—'হ্যাঁ, তবে স্বদেশী ডাকাত, ভালো ডাকাত।'

—'তাহলে আমি চলি দাদু, পরে না হয় এদিক পানে এলে একবার খবর করব।'

—'হ্যাঁ, এস বাবা। দুগ্‌গা, দুগ্‌গা।'

প্রফুল্ল বাইক স্টার্ট দিয়ে ঘুরিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

এই ঘটনার কিছুদিন আগে একদিন সকালে হাসপাতালে গিয়ে দাম ডাক্তার দেখেছিলেন রণজয় খালি পায়ে ঘাসের ওপরে হাঁটছে।

'রণজয়, শিশিরভেজা ঘাসের ওপরে হাঁটছ?'

—'হ্যাঁ।' রণজয় হাসল।

—'ভালো লাগছে?'

—'খুব ভালো লাগছে।'

হঠাৎ রণজয় একটা লম্বা ঘাস নিচু হয়ে ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কামড়ে ধরে বলেছিল,

—'ডাক্তারবাবু, আপনি একটা লোহার শেকল এনে আমাকে মারবেন?'

—'আমি তোমাকে কেন মারব, রণজয়?'

—'শেকল দিয়ে জোরে জোরে মাথায় মারবেন। মাথা ফেটে রক্ত পড়বে। ঠিক হবে।'

—'কী হয়েছে তোমার বলো তো? ভালো ঘুম হয়নি। ওষুধটা খাওনি? আমি তোমাকে কোনোদিনও মেরেছি?'

রণজয় তখন দাম ডাক্তারকে একটা গল্প বলেছিল। রাশিয়ার গল্প। বিপ্লবের আগে, অনেক আগে। ককেসাস অঞ্চলে খনি শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছিল। ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপরে জারের পুলিশের বীভৎস অত্যাচার শুরু হল। দুপাশে সার দিয়ে মাতাল পুলিশ দাঁড়িয়ে—তাদের হাতে চাবুক, লোহার শেকল। মাঝখানের সরু পথ দিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকরা হেঁটে যাচ্ছে। কারো পায়ে ছোঁড়া বুট, কারো পায়ে দড়ি দিয়ে ন্যাকড়া জড়িয়ে বাঁধা। শ্রমিকদের মাথায়, বুকে পিঠে এলোপাথাড়ি চাবুক আর শেকল আছড়ে পড়ছে। কেউ পুরো লাইনটা পার হতে পারছে না। তার আগেই রক্তে ভেসে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যাচ্ছে। গোঙাচ্ছে। সবার পরে এলেন সেই বলশেভিক নেতা। এবং দু'সার পুলিশের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করার আগে দাঁতে কামড়ে নিলেন ঘাসের একটি পাতা। মাথা ফেটে, রক্তে সারা শরীর ভিজে গেল। শেষ শেকলটি আছড়ে পড়ার পরও তিনি অবিচল। বিস্মিত পুলিশকর্তা দাঁড়িয়ে। হতবাক। একি মানুষ না অন্য কিছু? দাঁতের কামড় থেকে ঘাসের পাতাটি সেই পুলিশের কর্তার হাতে দিয়ে সেই বলশেভিক নেতা বলেছিলেন,

—'নিন, এইঘাসের ফলাটা রেখে দিন। এর ওপরে আমার দাঁতের দাগ নেই। এটা যখনই দেখবেন তখনই আমার নাম আপনি মনে করতে পারবেন। আমার নাম স্তালিন।'

দাম ডাক্তার আকাশের দিকে তাকালেন। ছেঁড়া ছেঁড়া শাদা মেঘ ভাসছে। রণজয় তাহলে কলকাতায়। গতবার তো ডঃ মিত্রর চেম্বারে ওই কাণ্ড ঘটিয়েছিল। ছেলেটাই-বা কত বড় হল! কৌশিক বলে সেই ছেলেটার কী হল? হাসপাতালে সব ব্যবস্থা করে ডাক্তার দাম ঠিক করলেন

রাতের গাড়িতেই কলকাতা যাবেন। সেবার পুলিশ অফিসারটাকে মারতে পারেনি। এবারও কি তারই খোঁজে গেছে রণজয়? কলকাতায় বড় মেয়ের বাড়ি শ্যামবাজারে। সেখানে উঠবেন। ওখানে ফোন আছে। যোগাযোগ করতে সুবিধেও।

তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে আধ ঘন্টা শুতে না শুতে গোবিন্দ আবার এল।

—'এফআইআর হয়েছে কিন্তু ফোন তো করা যাচ্ছে না। দারোগাবাবু বলচেন কলকাতায় ফোনের নম্বরটম্বর সব পালটে গেছে। তাছাড়া লাইনও পাওয়া এক হ্যাপা।'

—'ভালোই হল। আমি তো এরমধ্যে খবর পেয়ে গেছি যে রণজয় কালকের লাস্ট ট্রেনে কলকাতা গেছে।'

—'তাহলে আমি যাব না আর কাউকে পাঠাবেন? ঠিকানা টিকানা লিখে দিলে না হয়...'

—'না রে, এ আমাকেই যেতে হবে। এ তো শুধু বাড়িতে জানান দেওয়ার ব্যাপার নয়। চেষ্টা করে দেখতে হবে যদি কোনো অনর্থ ঠেকানো যায়। তুই যা। একটু পরে আমি আসছি।'

গোবিন্দ চুপ করে দাঁড়িয়ে।

—'আর কিছু বলবি?'

—'ডাক্তারবাবু, দোষটা আমারই। কিন্তু বড়জোর তিন-চার মিনিট নীচটা খোলা ছিল।'

—'সে না হয় একদিন হল। কিন্তু কাল, দুপুরের ওই হট্টিচাল্লির পর—তুই একটা এতদিনের বিশ্বাসী লোক হয়ে...'

—'মাপ করে দিন ডাক্তারবাবু, বিশ্বাস করুন রণজয়দাদার জন্যে মনটা বড় কেমন কেমন করছে, ওনার কিছু হয়ে গেলে বড় পাপী হয়ে থাকতে হবে...'

—'যাকগে ওসব কথা থাক। তুই এগো। কাল শুভঙ্কর ডাক্তারের আসার দিন। ওকে বলিস কেন কলকাতায় গেছি।'

হাসপাতালের ঘরে ঘরে ঘুরে দেখলেন দাম ডাক্তার। নিজের ঘরে চেয়ারে বসে নতুন কাচা ধুতি ও শার্ট পরা মহীতোষ কী একটা পত্রিকা পড়ছিলেন। উঠে এলেন। নমস্কার করে বললেন,

—'এত করে আপনাকে বললাম অথচ শুনলেন না। যা বলেছিলাম তাই তো ঘটছে এখন। উঃ কি সীমাহীন আস্পর্ধা।'

—'মানে, কাল দুপুরের গণ্ডগোলের ব্যাপারটা বলছেন তো?'

—'কী অসভ্যতা। এই এতগুলো বদ্ধ পাগল জুটিয়েছেন, ফলভোগ করতেই হবে। ও হ্যাঁ, সংবাদটি পেয়েছেন আশা করি।'

দাম ডাক্তার গত আট বছর ধরে একদিন দুদিন অন্তর সংবাদটি শুনে আসছেন।

—'আগামী মাসেই বড়ছেলে আমাকে অ্যামেরিকা নিয়ে যাবে। ছোট ছেলেকে টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে।'

—'বাঃ এ তো সুসংবাদ! খুব ভালো।'

—'এই অসভ্য জানোয়ারগুলোকে আর দেখতে হবে না।'

—'না, না। কজনের এমন সৌভাগ্য হয়? আমি তাহলে একটু নীচে যাই। কাজকর্ম আছে।'

—'হ্যাঁ, আসুন। বাড়ির সব ভালো তো?'

—'হ্যাঁ, ভালো।'

দাম ডাক্তার সিঁড়ির দিকে এগোন। মহীতোষের বড়ছেলে বছর নয়েক আগে আমেরিকাতে মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। ছোটছেলে বম্বেতে থাকে, ওষুধ কোম্পানিতে বড় চাকরি করে। নিয়মিত বাবার জন্যে টাকা পাঠায়। ঘর থেকে খুঁজে রণজয়ের ডায়রি আর অফিস থেকে

pathagar.net

রণজয়ের ফাইল থেকে কয়েকটা কাগজ নিলেন দাম ডাক্তার। বেশিরভাগ কাগজই হলদেটে, পুরনো। একেবারে প্রথম দিকে দেওয়া ডঃ মিত্রের প্রেসক্রিপশন। এই হাসপাতালের নাড়ি নক্ষত্র দাম ডাক্তারের জানা। কারচুপিগুলোও তাঁর অজানা নয়। এটাও দাম ডাক্তার জানেন যে ভ্যানরিকশা করে যে লোকটা মাছ দিয়ে যায়—সেগুলো পাওয়ার স্টেশনের কোয়ার্টারে বিক্রির পর ঝড়তিপড়তি পেটগলা তেতো মাছ, কখনো কখনো মাথাটা পচতে শুরু করেছে। ওয়ার্ডবয়, দারোয়ান, মালি এরা যে নেশাভাঙ করে, ওদের দোষেই যে রণজয় দরজা খোলা পেয়েছে সেটাও ভালোমতোই জানেন তিনি। কিন্তু কী করা যাবে? কাকে চটালেন দাম ডাক্তার? এই সাতাশজন পুরুষ আর পেছনের দিকেরা নটি মেয়ের দায়িত্ব কেউ তাঁর মতো করে বুঝবে? হয়তো বুঝবে কোনোদিন। সকালে ও শোবার আগে মেডিটেশন করেন দাম ডাক্তার। চিত্তহীন হতে চেষ্টা করেন। ভাবো যে তোমার সামনে অপার নিস্তরঙ্গ সমুদ্র বা নীল মহাকাশ। অথবা নিজের কোনো প্রিয় দৃশ্য ভাবো। অথবা ইষ্টদেবতাকে মনে কর। কোনো প্রিয় মূর্তি। আজ রাতেই একা একা কলকাতা যাচ্ছেন দাম ডাক্তার। রণজয়ের জন্য দুশ্চিন্তা উদ্বেগ ও আক্ষেপের সঙ্গে সারা রাত ধরে একা, এইসব কিছুর থেকে দূরে কলকাতায় চলেছেন ভেবে তাঁর আনন্দও হয়। বিকেলের মাঠে ইটভাটা দেখতে কি ভালো লাগছে। শীত কোথায় যে বিকেল তাড়াতাড়ি ফুরোবে? দাম ডাক্তার সাইকেলের বেল বাজাতে একটা ছাগলছানা রাস্তার পাশে সরে যায়। নড়বড়ে পায়ে উৎকর্ণ হয়ে দেখে যে দুই ঘুরন্ত গোল চাকার ওপরে এক বৃদ্ধ মানুষ কোথাও চলেছে। তারপরই অবোধ আনন্দে ছুটতে ছুটতে আবার দাঁড়িয়ে যায়, ঘাড় ঘুরিয়ে খোঁজে।

সন্ধেটা বড় ভালো কাটল মেখলার। কোবা ওর ঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে ডায়ার স্ট্রেইটস্ শুনছিল আর ওর উপন্যাসটার তৃতীয় পর্ব লিখছিল। উপন্যাসটির শুরু এইভাবে, কৌশিক বা মেখলা কেউ জানে না, 'মানুষের কিছু অসম্ভব স্বপ্ন থাকে। আরো নির্দিষ্টভাবে বললে কিছু কিছু, কোনো কোনো মানুষের। তারা এই স্বপ্নগুলোকে হাতেনাতে ধরার চেষ্টা করে। কখনো ধরেও ফেলে। চেষ্টার সময় তার ক্ষ্যাপামি দেখলে গতানুগতিক, গৎবাঁধা লোকেরা প্রায়শই তাকে উন্মাদ আখ্যা দেয়। এই উপন্যাসটির রচয়িতা একরম একজন চলচ্চিত্র পরিচালক ও সুরস্রষ্টাকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনে যার একটা স্বপ্নও এখন অবধি, সে যেমন চায় তেমন করে সেলুলয়েডের ফ্রেমে বা স্বরলিপির চিত্রময় বয়ানে ধরা পড়েনি। কিন্তু তার সম্ভবনা যতটুকু আন্দাজ করা গেছে, ছিটেফোঁটা যা পরিচয় পাওয়া গেছে তা চমকিত করে। বিস্ময়াবিষ্ট না হয়ে উপায় থাকে না। তেমনই এক মানুষকে নিয়ে এই কাহিনী যা কল্পবিজ্ঞানের আওতায় হয়তো বা পড়ে। এখন অবধি সে যা করতে পেরেছে তা জানতে হলে পাঠককে বলে নেওয়া ভালো যে গত সপ্তাহে কিঞ্জল বুধবার রাতে এইরকম একটা স্বপ্ন দেখেছিল—ঝলসে যাওয়া শাদা একটা কংক্রিটে বাঁধানো বিশাল শুকনো চত্বর। চত্বরটা চৌকো। কিঞ্জল সেটা নানাভাবে দেখছে যেন। কখনো তার এক কোণে দাঁড়িয়ে। তখন তার মনে হচ্ছে এটা কি বিমান অবতরনের জন্য তৈরি? তারপরেই আবার কিঞ্জল যেন বিমান থেকে দেখছে—একটা শাদা রুমাল। সাঁ সাঁ করে বাতাসের শব্দ। এই বাতাসের এলোমেলো উল্টোপাল্টা হয়ে উড়তে উড়তে একটা খোলা কালো ছাতা চত্বরটাতে ঢুকল। যার ছাতা সে কিন্তু এল না। ছাতাটা উড়তে উড়তে চলে যাচ্ছে। স্বপ্নটা কিঞ্জল এই অবধিই দেখেছিল।'

'এবারে পাঠক, সামনে যে চলচ্চিত্রের মতো ঘটনা দেখতে পাচ্ছেন সেদিকে মনোনিবেশ করুন। ওই যে শার্টের হাতা গোটানো হাতটা ভিসিআর-এ ভিডিও ক্যাসেটটা ঢুকিয়ে দিল ওই হাতটা কিঞ্জলের। ওই দেখুন ভিসিআর-এর আলোগুলো জ্বলে উঠল। এবার দেখুন ক্যাসেটটা

চালানো হয়েছে কারণ লাল তীরচিহ্ন জ্বলে উঠেছে এবং দৃশ্যমান আলোকিত সংখ্যা ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে। সংখ্যাগুলো বাড়ছে ০০৩৭, ০০৩৮, ০০৩৯, ০০৪০...এবারে চোখ সরিয়ে আনুন টিভি মনিটরের পর্দায়। প্রথমে শাদা কালো ঝিরি ঝিরি, কালোশাদা তুষার ঝড়। এবার ভালো করে দেখুন হঠাৎ ঝিরি ঝিরি চলে গিয়ে অবশ একটা নীল আলো সারা পর্দা জুড়ে। তার সঙ্গে ওই যে ভারি ড্রাম বিট শুনতে পাচ্ছেন তো। ওই নীলটা হল কিঞ্জলের ঘুম। ওই ড্রাম বিট কিঞ্জলের হৃদযন্ত্রের। এবারে সাবধান হতে হবে—দেখুন, এক আধ সেকেন্ড মাত্র দেখা যাবে—পুরো পর্দাটা শাদা আলোয় ঝলসে উঠতেই কালো হয়ে গেল, সাঁ সাঁ বাতাসের শব্দ। ওই তেতে ওঠা শাদাটা হল স্বপ্নের সেই চত্বর আর কেন যে ছাতাটা আড়াল করল।'

'কিঞ্জল যখন ঘুমোয় তখন ওর মাথায় অনেক জায়গায় ইলেকট্রোড লাগানো থাকে। নিশ্চয়ই দেখেছেন ওর মাথায় কয়েকটা জায়গা খাবলা খাবলা। চুল নেই। গত তিন বছর ধরে স্বপ্নের ছবি তোলার চেষ্টা করছে কিঞ্জল। ওই এক-আধ সেকেন্ডের স্বপ্নের ছবিটা ছাড়া আর কিছুই সে তুলতে পারেনি। কিন্তু স্বপ্নে শোনা শব্দ ধরার ব্যাপার ওর কাজ অনেকটা এগিয়েছে।'

কৌশিকের ফোন এল। দিনদুয়েকের মধ্যেই আসবে।

—'ভেবেছিলাম কালকে তুই আসবি।'

—'আরে, আমিও তো ভেবেছিলাম যাব। কিন্তু একটা রোম্যান্টিক জায়গাতে এমন ফেঁসে গেলাম সব গুবলেট হয়ে গেল। রিয়্যালি সরি, মেলাদি।'

—'সেখানে জয়িতা ছিল বুঝি?'

—'ধুস্। জয়িতা ছাড়া আর মেয়ে নেই নাকি?'

—'ঠিক আছে, জয়িতাকে বলে দেব।'

—'দিও। বাঁচা যায়। আর হ্যাঁ, গ্র্যাহাম গ্রিনের খবর কী?'

—'কি আবার, কানে হেডফোন লাগিয়ে কি সব লিখছে খাটে উপুড় হয়ে।'

—'চমৎকার আইডিয়া তো। আজকেও কি রেটে ফাটছে দেখেছ তো। হেডফোন ছাড়া উপায় নেই।'

—'এদিকেও খুব আওয়াজ হচ্ছে। আজকে তো ভাসান।'

—'ও কেউ ভাসান দেবে না। চারদিন ধরে রেখে বাঁদরামি করবে। যাইহোক, হয় কাল, নয় পরশু, এনি টাইম গিয়ে উদয় হব। পুত্রকে সাবধান করে রেখ।'

—'আচ্ছা।'

—'আর ও মেলাদি, ফ্যান্টাসটিক একটা খবর পেলাম। তোমাকে না বলে পারছি না।'

—'কী?'

—'তুমি শোলে দেখেছিলে?'

—'না, একবার ওই কোবা ক্যাসেট এনেছিল। নোংরা পড়া ক্যাসেট। কিছু দেখাই যায় না।'

—'ও তোমাকে ভালো প্রিন্ট আমি দেখিয়ে দেব। শোন না, শোলের প্রডিউসার ডিরেক্টর সিপ্পিদের নাম শুনেছ তো?'

—'হ্যাঁ, শুনেছি।'

—'শুনলাম যে ওদের বাড়িতে নাকি একটা ফ্যাবুলাস কালেকশন অফ মার্কসিস্ট লিটারেচার রয়েছে। কোনো ইউনিভার্সিটিতেও নাকি এমন নেই। ভাবতে পারো—ওফ্ এ শালা ভি বাঁচ গয়া—তেরা ও হাত মুঝে দে দে গব্বর—তার সঙ্গে মার্কসিজম। যাইহোক, এখন নীরব হচ্ছি। দেখা হবে।'

—'খুব তাড়াতাড়ি যেন হয়।'

—'ও সিওর। বাই। ঘ্যাচাং।'

ফোন নামাবার আগে কৌশিক 'ঘ্যাচাং' বলবেই।

আইএসআই-এর শুভব্রত-র মাধ্যমে কৌশিক রণজয়ের কাছে আসে। কৌশিকের তখন ইতিহাসে অনার্স। ফার্স্ট ইয়ার। জেলের পরে যে বছরখানেক রণজয় কলকাতায় ছিল সে সময়টা কৌশিকের জীবনে এক অবিস্মরণীয় সময়। কোর্সের পড়া নয়। রণজয় কৌশিককে একটার পর একটা বই পড়তে দিত। ঘণ্টার পর ওকে যুদ্ধের গল্প, স্তালিনগ্রাদ, লং মার্চ, ভিয়েৎনাম, কিউবার মুক্তিযুদ্ধ বর্ণনা করে যেত। রণজয়ের মতো অসামান্য স্মৃতিশক্তি কৌশিক কোথাও দেখেনি—এবং বিশ্লেষণের ক্ষমতা—যুদ্ধবিজ্ঞানের মতো একটি জটিল ব্যাপারকে কত সহজে ব্যাখ্যা করত রণজয়। কৌশিক পরে জেএনইউ-তে যায়। সেখান থেকে অক্সফোর্ডে। কিন্তু বিদেশে থাকার ছেলে কৌশিক নয়। ওদের বাড়িতে ব্যবসা করে লক্ষপতি হয়নি কৌশিক একাই। কৌশিক দেশে ফিরে এখানে ওখানে পড়িয়েছে। বর্তমানে সেন্টার ফর সেন্ট্রাল এশিয়ান স্টাডিজ-এ আছে। ওর স্ত্রী জয়িতা অক্সফোর্ডেই ইংরাজি পড়ত। এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছে।

রণজয় পাঁউরুটিটা কেনার পরেও দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়েছিল। এমনিই। ওরা তখন কি ভেবে একটা পলিথিনের প্যাকেট দিল। এদিকটায় বিস্ফোরণের শব্দ কম। দূরে ফাটছে। রণজয় যে রাস্তাটা দিয়ে এগোচ্ছিল সেটা ওপরে উঠে গেল। ডবল রেললাইন পেরোল। তারপর সোজা চলে গেল। ডানদিকে যে রাস্তাটা নেমে গিয়েছে সেটা দিয়ে হাঁটতে থাকল রণজয়। একটু ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু ঘুম নেই। বাঁ পায়ের ব্যাথাটা অবশ হয়ে গুম মেরে রয়েছে। যারা ম্যারাথন হাঁটার প্রতিযোগিতায় নামে তাদের কোমরের তলা থেকে আধখানা শরীর নিজস্ব ভরবেগে এগিয়ে চলে। হঠাৎ দমকা বাতাস দিল। ধুলো উড়ছে। অন্ধকার বস্তি এলাকা। মাঝেমধ্যে ইলেকট্রিক বাল্‌বও জ্বলছে। ইট বের করা নিচু বাড়িগুলোর মধ্যে টিউব। টিভি-র শব্দ। আবার অন্ধকার। পেছনে বড় গাড়িটা হেডলাইটের আলোয় রণজয়ের লম্বাটে ছায়া ধোঁয়া ধোঁয়া রাস্তায় লম্বা করে ফেলে আবার গুটিয়ে নিয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বাতাসের থাপ্পড় মুখে লাগল, কাগজ উড়ল সেটা একটা ভাসান ফেরতা ট্রাক। লম্বা দুটো বরবটি বেলুন একটা ছেলে চেপে হাওয়ার বিরুদ্ধে ধরে রেখেছিল বলে বিকট একটা হাসির শব্দ হচ্ছিল। ট্রাক থেকে কারা কাদা ছুঁড়ল। রণজয় ট্রাকটাকে দেখল। এক দঙ্গল লুচ্চা তার ওপরে লাফাচ্ছিল। রণজয় বুঝতে পারল যে সাধারণ, খেটে খাওয়া, অভাবী মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দেওয়ার জন্য ফাসিস্ত লুম্পেনদের রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে চলেছে। রিভিশনিস্ট পণ্ডিত সুশোভন সরকার একেই বলেছিলেন, 'দুর্দম প্রসার-প্রবৃত্তি' তাঁর লেখা 'ফ্যাসিবাদের পশ্চাৎপট'-এই রণজয় পড়েছিল, 'সাম্যবাদীরা যে-সময় রাশিয়ায় কর্তৃত্বস্থাপনে ব্যস্ত, তখন ইটালিতে ফ্যাসিজম নামে এক নূতন আন্দোলনের উদয় হয়। পরে এই ফ্যাসিস্ট মতোই সকল প্রকার সমাজতন্ত্রবাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ইওরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ; মার্কসপন্থার প্রতিক্রিয়াই তার মূল প্রেরণা।' রণজয় রাস্তার ধারে একটা উল্টোনো ব্যাটারির খোল দেখে তার ওপরে বসে পড়ে। সামনে পা মেলে দেয়। দূরে একটা আলো ঝুলছে। তার তলায় ছেলেদের একটা জমায়েত কি যেন করছে। তারা রণজয়কে লক্ষ করেছিল। জনাদুয়েক এগিয়ে এল। রণজয় চোখ বন্ধ করে শুয়েছিল পা টান করে। ওদের পায়ের শব্দ কাছে আসতেই রণজয় উঠে দাঁড়াল। এত ক্ষিপ্রগতিতে রণজয় উঠে দাঁড়াবে ওরা ভাবেনি। একটু হটে যায়। রণজয় চিৎকার করে উঠেছিল, 'দা স্ট্রাগল এগেন্‌স্ট ফ্যাসিজম মাস্ট বি কংক্রিটাইজড্‌।' রণজয় এগোয়, হাতে পাঁউরুটির পলিথিন

প্যাকেট ঝুলছে, দুলছে, ওরা দৌড়ে উল্টো আলোর তলায় চলে যায়। সেখানে ক্যারমবোর্ডে জুয়া চলছিল। কিছু পোকা উড়ে উড়ে বোর্ডে এসে পড়ে। ছোট, বড়, নানা সাইজের উচ্চিংড়ে ও শ্যামাপোকারা। তাদের মধ্যে যারা ভাগ্যহীন তারা স্ট্রাইকারের বাড়িতে, ঘুঁটির অপ্রকৃতিস্থ নড়াচড়ায় থেঁৎলে যায়। ওরা ফিরে এসে বলে 'ও শুড্ঢা পাগলা হ্যায়'। রণজয় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখে। বলে, 'স্ট্রাটেজি অ্যান্ড ট্যাকটিক্স্, রণনীতি ও রণকৌশল কখনোই এক হতে পারে না। কৌশিক, যদি গাধা হয়ে না থাকতে চাস তো দিমিত্রভ আরো মন দিয়ে পড়। বারবার পড়। তবে তো বুঝবি।' রণজয় এগোয়। ওরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছিল যে রণজয় আলোর ওপারে চলে যাচ্ছে।

ডঃ মিত্রকে ফোন করে বসাক তার সহসা দুঃস্বপ্নের কথাটি বলেছিল। ডঃ মিত্র বলেছিলেন লোরেল-১ একটা করে খান। ও কিছু নয়। খুব মাইল্ড। বসাক ওষুধটি আনিয়ে নিল। একটি ফোল্ডারে চারটি শাদা ট্যাবলেট। চার রাতের নিরুপদ্রব ঘুম। ব্রিটিশদের আবিষ্কৃত এই অনাচ্ছাদিত বড়িতে রয়েছে মাত্র এক মিলিগ্রাম লোরাজেপাম। সাহেব ডাক্তারদের কি মহিমা। মাত্র একটি বড়ি কর্মক্লান্ত দিনের শেষে মেরে দিলে কোনো দুশ্চিন্তা নেই, কোনো নিড়ানি নেই। শিডিউল 'এইচ' ড্রাগ।

কেউ যখন আসে না, কেউ বিরক্ত করে না তখন এই রাত্তিরগুলোতে খেতে বসে কোবা অনেক ব্যক্তিগত কথা মেখলার কাছে জানতে চায়।

—'মা, বাবা খুব স্পেশাল কী ভালোবাসত খেতে?'

—'কোবা, অনেকবার বলেছি বাবার সম্বন্ধে পাস্ট টেন্সে কথা বলবে না।'

—'ও, আমি সরি মা। ছাড়ো না বলো, কি খেতে চাইত?'

—'উঃ। ছোট মাছ। আমরা তখন বিয়ের পরে। আমি তো মাছ-টাছ কাটতে পারি না।'

—'তখন?'

—'সে মধ্যমগ্রামের বাড়িতে। রাত্তিরে এসে বলল, দেখ, কী এনেছি। পাঁচশো গ্রাম খরশোল মাছ। বলল, মেলা, এ মাছ তুমি কখনো খাওনি। পারশে কিন্তু পারশে নয়। আমি তো বোকা, দাঁড়িয়ে আছি।'

—'তারপর কি হল?'

—'কি আবার! যা হত। সেই রাত্তিরে তো দাদু এসে মাছগুলো কাটলেন। উনি, কি আর করবেন, বসে বসে দেখলেন। সেই মাছ ভাজা হল, খাওয়া হল।'

—'মা! খরশোল মাছ কিরকম খেতে?'

রণজয় এবার সত্যি একটা অন্ধকার জায়গায় পড়ল। এই দোকানগুলো কেউ কি কখনো খুলেছিল? কারা কিনতো এসব দোকান থেকে? বড়ই অন্ধকার। না কি এর উল্টোদিকে একটা বাজার রয়েছে? এটা কি একটা গ্যারেজ? কেউ এর সামনে টায়ার আর মবিল মোছা তুলে পুড়িয়েছিল! লাথি মারলেই ছাই আকশে ওড়ে। অনেক বড়সড় একটা মরচে পড়া বন্ধ গেট। রণজয়ের পায়ের ধাক্কায় একটুকরো পিসবোর্ড উড়ে যায়। তাতে লেখা '৬৫ দিবস। আজ আমাদের অবস্থানের ৬৫ দিবস।' শুকনো সুতো সুতো ওই যে ন্যাকড়াটা বুকে জড়িয়ে হেঁটে গেল রণজয় সেটা একটা রক্ত পতাকা। কাদের? পশ্চিমবঙ্গে কার না লোহিত পতাকা নেই? রণজয় পাঁউরুটির কারখানা মাড়িয়ে যায়। উল্টোনো ভ্যানগাড়িতে অ্যাকসময় এসিডের বোতল যেত। ডিস্টিলড্ ওয়াটার যেত। কারা নিয়ে যেত রণজয়? শোনাশুনির বালাই নেই, রণজয় হাঁটছে। এই ছোট ছোট কারখানাগুলো যখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—পাঁউরুটির, ছোট লেদ,

প্লাস্টিক ডাইস, গ্যারেজ—তখন কী আশা, কী উদ্দীপনা, কত ভরসা—আর—তারপর? একটা কী পায়ে লাগতে রণজয় তুলে নেয়। ছেঁড়া এক পাটি কেডস। পাশেই ওই যে আধপচা, পোকাখাওয়া বাঁশের খুঁটিটা মরা হাড়ের মতো মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে। ওটা ছিল চারটে খুঁটির একটা যার ওপরে পলিথিনের কালো চাদর বেঁধে লাগাতার অবস্থানের ঘাঁটি তৈরি করা হয়েছিল। যারা করেছিল তারা কোথায়! একরাশ ছোটো ছোটো মাটির ভাঁড়—উল্টো, চিৎ ঝিনুকের মতো নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে পায়ে পায়ে পিষে যাওয়ার।

'শরীরে রক্ত থাকলেও মানুষের, অন্তরে বিবেক
মেনে নিয়েছি আতসবাজি কারখানার শিশু শ্রমিকের
বিকেল
মেনে নিয়েছি বাড়ি তৈরির মেয়ে কামিনদের
দুঃখী হাসি
অ্যাসবেস্টস খনির ফুসফুস-ফুটো মজদুর
অ্যাসিডে গলে যাওয়া গ্লাভস্
কনস্ট্রাকশন সাইটে খবরের কাগজে ঢাকা মৃতদেহ
পাতাল রেলের বাতিল মাটি কাটাদের দল
কত কি মেনে নিয়েছি
কী ক্ষমতা আমার মেনে নেওয়ার'

সামনে অন্ধকার পর পর চালাঘর। তারমধ্যে একটু ভেতরে ঢোকানো একটা চালায় ঢোকার মুখে একটা প্যাকিং বাক্স রাখা। সেইদিকে চোখ পড়তে রণজয় কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। প্যাকিং বাক্সর ওপরে একটা কুপি জ্বলছে। আলোটা দেখে কিছু একটা মনে পড়েও পড়ে না। মেদিনীপুর? মুশাহারি? রাত করে কোনো সভা? সেখানে গেরিলা 'অ্যাকশন' সম্বন্ধে কমরেড মজুমদারের কথাগুলো বোঝার ও বোঝানোর চেষ্টা করা? বুদ্ধিজীবী সংগ্রামী হিসেবে সঙ্গে একটা ছোট পিস্তল ছিল? কিন্তু কমরেড, লড়াই-এর এই স্তরে কোনোরকম আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নয়। রণজয় কুপির আলোটার দিকে এগোয়। গেরিলা ইউনিটকে সম্পূর্ণভাবে দা, বল্লম, সড়কি, কাস্তের ওপরে আস্থা রাখতে হবে। 'না, কমরেড, এটা দেশি বন্দুক কেনা বা তৈরি করা বা বন্দুক দখলের পক্ষে উপযুক্ত সময় নয়। হাতে বন্দুক পেলেই কি আমরা রাখতে পারব? না। পুলিশ ঠিক ওগুলো দখল করে নেবে।' রণজয় ঘরটায় ঢুকে দেখল কেউ নেই। 'যদি তা সত্ত্বেও কিছু বন্দুক জোগাড় হয়ও, আমরা তা নিশ্চয়ই নষ্ট করব না বা শত্রুর হাতে তুলে দেব না বরং ভবিষ্যতের জন্যে লুকিয়ে রাখব এবং এর নিস্ফল ব্যবহারে বাধা দেব।' একা একা কুপির আলোটা জ্বলছে। কালো ধোঁয়া শিখার ওপর।

রণজয় দেখল ছোট ছোট বান্ডিলে বাঁধা আধহাত, একহাত করে খড়ের টুকরো সারা ঘরটায় ছড়ানো। পেছনে কাৎ হয়ে রয়েছে বাস বা লরির বিরাট একটা টায়ার। অনেকগুলো খালি বোতল। তিন-চারটে কার্ডবোর্ডের বাক্স। একদিকে একটার পর একটা বস্তা ডাঁই করা। বস্তাগুলো জ্যালজেলে চটের ও ভর্তি। আলোতে চোখটা ধাতস্থ হলে বোঝা যায় ওগুলো কালো কালো কাচের বোতলে ভর্তি। এক কোণে অনেকগুলো ছিপি। রণজয় কুপি বসানো প্যাকিং বাক্সটার ভেতরে দেখল। এখানেও অনেকগুলো খালি শিশি ও বোতল। কিন্তু সেগুলো ওই কালো বোতলের মতো গোল নয়। এগুলো শাদা কাচের, চ্যাপটা। তার ওপরে দুটো ফানেল, প্লাস্টিকের। একটা বড়, একটা ছোট। প্যাকিং বাক্সের পেছনে তলায় বসার একটা জায়গা—পুরু

pathagar.net

করে খড় বিছিয়ে তার ওপরে বস্তা পাতা। রণজয় রুটির প্যাকেটটা ডাঁই করা বস্তার ওপরে রেখে পা দিয়ে দিয়ে অনেক খড়ের বান্ডিল এক জায়গায় করল। তারপর রুটির প্যাকেটটা পাশে নিয়ে বস্তায় হেলান দিয়ে বসে পা ছড়িয়ে দিল। পা দুটোর একটু বিশ্রাম দরকার। না ঘুমোলেই চলবে। আর ঘুমই-বা কোথায়? শরীরটা আলগা করতে পিঠের ওজনে বস্তার মধ্যে বোতলগুলোয় কাচের সঙ্গে কাচ ঘষার শব্দ হল।

রণজয় প্যাকেট থেকে রুটিটা বের করে মোড়কের কাগজটা ছিঁড়ল। তারপর একটু একটু করে ভেঙে খেতে শুরু করল। তারপরই শুনতে পেল কেউ এদিকে আসছে। বাঁ হাতের কাছে একটা বড় কালো বোতলের গলাটা শক্ত করে ধরল রণজয়। লোকটা লুঙ্গি আর ঢোলা শার্ট পরা। হাড়গিলে। মাথায় তামাটে লম্বা লম্বা ঘাড় অবধি চুল। সে গুনগুন করে গান করছিল। লোকটা শার্টটা তুলে কোমরে গোঁজা একটা খালি বোতল বার করল। প্যাকিং বাক্সের ওপরে রাখল। রণজয় দেখল সে যে বোতলটার গলা ধরে রেখেছে বাঁ হাতে ওই বোতলটাও ঠিক একই রকম দেখতে। রণজয় হাতটা আলগা করে দিল। লোকটা গিঁট খুলে লুঙ্গিটা শক্ত করে বাঁধতে বাঁধতে বলল,

—'মণ্ডল কোথায়?'

রণজয় লোকটাকে দেখল।

—'কে মণ্ডল?'

—'এ কি রে বাবা! মণ্ডলের গলতায় বসে ঠ্যাং ছড়িয়ে পাঁউরুটি খাচ্ছ আর মণ্ডল কে জান না?'

—'না।'

—'যত শালা বিদঘুটে পাবলিক!'

রণজয় একটু উঠে বলে,

—'গালাগালি করলেন আমায়?'

লোকটা ঘাবড়ে যায়।

—'গালাগালি করিনি তো। বলচি মণ্ডলকে চেনেন না, অবাক লাগচে। এটা মণ্ডলেরই ঠেক তো, তাই বলছিলাম।'

রণজয় আবার হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ে। পাঁউরুটি খায়। খিদের মুখে বেশ লাগছে খেতে। ওই কথার পরে লোকটা গানের গলাটা একটু চড়িয়েছে। এর মধ্যে মণ্ডল এসে ঢুকল। সঙ্গে বস্তা পিঠে দুটো লোক। ওরা বস্তা দুটো পেছন দিকে নামিয়ে চলে গেল। মণ্ডল একবার রণজয়কে দেখল। কিছু বলল না। ওই লোকটা বলল,

—'কোথায় মারাতে গিয়েচিলি? সেই থেকে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেদিয়ে যাচ্চি।'

—'এই, একদম আলফাল বকবে না। বুঝলে? মেজাজ একেবারে খিঁচড়ে রয়েছে?'

—'কেন, কী আবার হল তোর? বউ ঝ্যাটা মেরেছে?'

—'সকাল থেকে সেই একা একা ঠেক সামলাচ্ছি। বাড়ি যাব, সে রাত একটা-দেড়টা হয়ে যাবে। এরপর ঝ্যাটা মারলে বলার কিছু থাকবে?'

—'দে এবার মালটা দে। দেখে দিবি। ননীবাবুর মাল।'

মণ্ডল নতুন বস্তার থেকে খড়ের বান্ডিল বাঁধা একটা বোতল বের করে। বোতলটা বান্ডিল থেকে খুলে কুপির আলোয় উল্টো করে দেখে এগিয়ে দেয়।

—'ও যে বাবুর মালই হোক না কেন, মণ্ডল তোমার ওই গ্যাঁজা ওঠা মাল কখনো দেয়

না।'

—'তোর ওই চামচাটার কী হল?'

—'আরে ওর জন্যেই তো আমার এ হুজ্জুতি। বলল বাড়ি যাবে, তা বললাম বেশ হাজারটা টাকা নিয়ে যা। বাড়িতে গেলে বলো, খরচ-খরচা হবেই।'

—'কদিনের জন্যে ছাড়লি?'

—'সে তো মাত্তর একদিন। এদিকে তিন দিন হয়ে গেল। ওই টাকা কিন্তু মাইনের টাকা নয়। তার ওপর আমার বলাই আছে যে মাল যত ইচ্ছে খাও তবে ঠেকে বসে। ও রাম, হুইস্কি যা ইচ্ছে খাও। এত সুবিধে। তা তিনদিন হয়ে গেল।'

—'দ্যাখ্, ওই ভাইফোঁটা পার করে আসবে।'

—'তাই আমিও ভাবছি। তবে ও আমাকে যা একটা জিনিস এনে দিয়েচে যে দাম শুনলে কেলিয়ে যাবে।'

—'ও তোর সেই ভিসিআর?'

—'ভিসিপি। ন্যাশানালের। দাম কত নিয়েছে জানো? মাত্তর সাড়ে ছ-হাজার। এখানে তুমি সাতের তলাই ফুনাই পাবে না।'

—'না, না, ছেলেটা ভালো। দ্যাখ্ কাল-পরশুর মধ্যে এসে পড়বে। চলি রে।'

—'এসো।'

লোকটা গুণগুন করে গান করতে করতে চলে গেল। মণ্ডল রণজয়ের দিকে দেখল। বলল,

—'আপনার কী চাই বাবু, আমার কাছে বাংলা, বিলিতি সব আছে।'

—'তোমার কাছে একটু জল হবে?'

—'জল। হ্যাঁ, এই তো?'

একটা বড় বোতল এগিয়ে দেয় মণ্ডল।

—'এটা মদ-টদ নয় তো?'

—'না, না, জল। আমি নিজে মদ জানবেন টাচ করি না।'

—'আমিও না। তবে ঘুমের ওষুধ খাই। না খেলে আমার ঘুম হয় না। আজ রাতেও হবে না।'

রণজয় অর্ধেকটা পাঁউরুটি মণ্ডলের দিকে এগিয়ে দেয়।

—'খাবে?'

—'না, না, আপনি খান না!'

—'নাও না, দিচ্ছি, নাও। কক্ষনো একলা খেতে নেই।'

মণ্ডল নেয়। রণজয় খাওয়া শেষ করে জল খায়। তারপর চশমাটা খুলে বুকের ওপরে ভাঁজ করে রাখে। দু-হাতে নিজের কপালটা টেপে।

—'মণ্ডল তো তুমিই।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, কী করে জানলেন?'

—'ওই লোকটা বলছিল। শুনলাম। তো সে যাইহোক, আমি কয়েকটা কথা তোমাকে বলতে চাই। কারণ আমার মনে হচ্ছে তোমকে কথাগুলো বলতে আমি পারি। অবশ্য তার মানে এই নয় যে তুমি আমাকে ধরিয়ে দেবে না। যাইহোক, আমি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের একজন কর্মী'। রণজয় হাত দুটো পাশে রাখে। চোখ বন্ধ।

—'দাদা, একটা কথা বলব সাহস করে?'

Pathagar.net

—'বলো।'

আপনি নকশাল, না?'

—'হ্যাঁ।'

—'ঠিক ধরেছি। ও আমার চোখ এড়াবে না। দাদা, আপনি কানাই বঙ্গ-র নাম শুনেছেন? আমাদের পাশের বাড়ির লোক ছিলেন। শান্তিপুরে আমার বাড়ি।'

রণজয় উঠে বসে। মণ্ডলের দিকে তাকায়।

—'কানাই! কানাই বঙ্গ! কানাই! কিলড ইন বেরহামপোর সেন্ট্রাল জেল টুগেদার উইথ এইট আদার কমরেডস ইনক্লুডিং তিমির বরণ সিংহ। আমি তখন কোথায়?'

—'দাদা, আমি তখন ছোট জানেন। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে। বহরমপুর থেকে সার্চলাইট লাগানো সাতটা ভ্যানে ঘিরে কানাই কাকুর বডি এনেছিল—সে কি মিলিটারি, সিআরপি পুলিশ—গলায়, কানের কাছে, কিচ্ছু নেই—খোবলানো খোবলানো—দেখেছি, মনে আছে।'

—'ও হ্যাঁ, আমি বোধহয় তখন আলিপুর স্পেশাল জেলে। বোধহয়, না কি? মনে পড়ছে না।'

দুজন খদ্দের এসে গেল। দুটো পাঁইট কিনল। ওরা ওখানে ছিপি খুলে খেতে যাওয়ায় মণ্ডল বাধা দেয়।

—'এই, এখানে খাওয়া বারণ, জানো না?'

—'কী হয়েচে খেলে? খেয়ে বোতলটা দিয়ে চলে যেতুম।'

—'সে তুমি বোতল দেবে কি দেবে না আমার জানার দরকার নেই।'

—'ফালতু কিচায়েন করে লাভ নেই। চল্ খেতে বারণ করচে।'

—'আমি তো বারণ করবই। ওপর থেকে বলা আছে। আরো বলতে হবে?'

—'না, না, আমরা চলে যাচ্চি গুরু।'

—'হ্যাঁ, যাও। এই শালা রাত করে যত মালখোরদের ঝামেলা।'

ওরা চলে যাবার পরে চুপ করে শুয়ে থাকা রণজয়কে দেখে মণ্ডল ভাবল রণজয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

—'যাইহোক, মণ্ডল। অল্প কথায় ব্যাপারটা বলার চেষ্টা করছি। আমি কলকাতায় থাকি না। কলকাতায় কিছু চিনতেও পারছি না। আমাকে যে করে হোক একটা জায়গায় যেতে হবে। যাদবপুর লেভেল ক্রসিঙের ওপারে। ওখানে গেলে আমি বাকিটা চিনতে পারব। কিন্তু কী করে যাব ওখানে? কাজটা সেরেই আমাকে ফিরতে হবে। ফেরার সময় সঙ্গে বেশ ভারি কিছু লাগেজ থাকবে...'

—'যাদবপুর। লেভেল ক্রসিং তো স্টেশনের সামনের রাস্তা দিয়ে। এখন আটকে দিয়েছে জানেন তো?'

—'মানে, যাওয়া যায় না?'

—'হ্যাঁ, গাড়ি যেতে পারে না। লোক, সাইকেল পারে। গাড়ি, বাস, মিনি সব সুকান্ত সেতু হয়ে যাচ্ছে।'

—'এই অন্ধকারে নয়, আমি একটু আলো থাকার সময় যেতে চাই।'

—'এই রাত্তিরে তো যেতেই পারবেন না। কাল না হয় আমি আপনাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেব। দু-দুবার বাস পাল্টাতে হবে।'

—'কাল সকাল সকাল যেতে পারব।'

pathagar.net

—'সকালে আমি উঠি না। তবে দাদা, আপনার জন্য উঠব। আমি এসে আপনাকে নিজে না হয় বাসে তুলে দেব।'

রাত একটা নাগাদ মণ্ডল চলে গেল। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে। রণজয় দেখল অসম্ভব মশা আসছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে একটা বস্তা নিয়ে মুখের ওপরে চাপা দিল। ইঁদুরের শব্দ। কোথায় একটা কেউ চেঁচাল। অনেক দূরে বিস্ফোরণের শব। জেগে রয়েছে রণজয়। মাথার মধ্যে জেল, মদের গন্ধ—সবকিছু তালগোল পাকাচ্ছে। ঘুম নেই। কোবা কী করছে এখন? ছোট্ট কোবা—নিশ্চয়ই মেখলা পাশ ফিরে আছে—আর তার বুকের কাছে ঘেঁষে কোবা ঘুমোচ্ছে। মেখলার একটা হাত কোবার গায়ে আলতো করে রাখা।

সকাল সাতটা নাগাদ ঘুম চোখে মণ্ডল এসে দেখল কেউ নেই।

৪

১৯৭৭ সালের পশ্চিবঙ্গের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি রাজনৈতিক কর্মী ও বিপ্লবীদের ওপরে রাষ্ট্রশক্তির হিংস্র নিপীড়ন সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। বর্তমানে এটি দুষ্প্রাপ্য। এর একটি কপি কৌশিকের কাছে রয়েছে। তাতে রণজয়ের খবর দুটি ভিন্ন অংশে পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের যেখানে রণজয়কে ধরা হয়েছিল সেটা একটা গ্রাম। তিন-চারদিন ধরে রণজয় জায়গা পাল্টাচ্ছিল। এবং তেভাগা আন্দোলনের বিপ্লবী নেতাদের কিছু অভিজ্ঞতা অজান্তে প্রয়োগ করে দেখেছিল রণজয়। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। যেমন যে গ্রামটিতে শেলটার নেওয়ার কথা সেখানে পৌঁছতে, কেন জানি না একটা খটকা লাগল। অথচ শরীর তখন ভেঙে পড়ছে। তবুও কষ্ট করে অনেকটা পথ হেঁটে অন্য একটা গাঁয়ে চলে গেল রণজয়—এবং সেই রাতেই আগের গাঁ-টিকে ঘিরে ফেলল পুলিশ। রণজয় যখন ধরা পড়ে তখন সূর্য হেলতে শুরু করেছে। রুক্ষ, ধারালো, চষা মাঠ। 'ধরার সাথে সাথে পিছন দিক দিয়ে কোমর ও কোমরের তলায় বেয়নেট চার্জ করে তাঁকে মাটিতে ফেলে দেয় ও তারপরে আরো বেয়নেট চালিয়ে শরীরের ওই অংশটিকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেয়। স্বভাবতই এই অবস্থায় তিনি দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছিলেন না। কিন্তু সেই অবস্থাতেই তাঁকে প্রায় আড়াই মাইল পথ চষা জমির ওপর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে টেনে নিয়ে গিয়ে থানায় তোলা হয়। পথে এক চায়ের দোকানে গ্রেপ্তারকারী ইএফআর (ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স্‌) ও পুলিশের লোকেরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল ও চা খাচ্ছিল তখন তাদেরই কয়েকজন দোকানের উনুন থেকে জ্বলন্ত কয়লা উঠিয়ে তাঁর সারা গায়ে ছেঁকা লাগায়। সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলন্ত সিগারেটের ডগা দিয়েও ছেঁকা দেওয়া চলতে থাকে। এরপরে পুলিশ হাজতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁকে ইলেকট্রিক শক্‌ দেওয়া হয়, আবার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় ও সর্বোপরি চোখে পিন ফুটিয়ে দেওয়া হয়। ইএফআর-এর এক কনস্টেবল হত্যার দায়ে এঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। যে ইএফআর কনস্টেবল হত্যার মামলায় এঁকে জড়ানো হয়েছিল সেই ঘটনাটি সম্পর্কে পরবর্তী বিবরণ থেকে জানা যাবে।' এসবই কখনো কখনো স্বপ্নের মতো রণজয়ের মনে ভেসে ওঠে বা উঠলেও সে বোঝে না।

বসাক যে যুক্তিনির্ভর স্বপ্ন দেখে কালীপুজোর রাতে ঘুম ভেঙে উঠে সবিশেষ রেগে গিয়েছিল তার উৎসে রয়েছে একখানি বই যার নাম—'আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সারকথা'। গ্রন্থকার হলেন

মহা মহাধ্যাপক কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক, কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ। এরপরে তাঁর আরো যা পরিচয় রয়েছে তা হল আয়ুর্বেদ বৃহস্পতি ডিএসও এবং গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ। বসাক হল এথনিক। বসাক পড়েছিল,

'বীর্য্যস্তম্ভ অধিকার

ওল বা তুলসীর মূল তাম্বুলের সহিত ভক্ষণ করিলে বীর্য্যস্তম্ভন হয়। কাল বিড়ালের বামপদের অস্থি দক্ষিণ অঙ্গে ধারণ করিয়া রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে বীর্য্যক্ষরণ হয় না। চড়ুই পক্ষীর ডিম নবনীতের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দারা পাদদ্বয় লেপন করিয়া রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে যাবৎ ভূমিস্পর্শ না হয়, তাবৎ বীর্যপাত হয় না। নীলোৎপল, শ্বেতপদ্ম কেশর, মধু ও চিনি এই সমুদয় নাভিরন্ধ্রে লেপন করিয়া স্ত্রীসঙ্গমে প্রবৃত্ত হইলে বহুক্ষণ পর্যন্ত বীর্য্যক্ষরণ হয় না। এইজন্য অর্জকাদি বটিকা ও শুক্রবল্লভ রস বিশেষ উপকারী।'

বসাক এসব কিন্তু নিজের প্রয়োজনে পড়ে না। বসাক আয়ুর্বেদিক মেডিসিনের এক ব্যবসা ফাঁদতে চলেছে। নিজে তাই কিছু চটি বই কিনে পড়েও দেখছে যাতে সঙ্গে যে আরো তিনজন পার্টনার আছে তারা তাকে আরো বেশ কয়েক কয়েক কাঠি সরেস বলে মনে করে। বসাক তখনই দেখেছিল যে, যে উঠতি বয়সের পুলিশ অফিসাররা মাও, চে গুয়েভারা বা কারলোস মারিঘেল্লা ইত্যাদি আওড়াত, কোথাকার কোন টুপামারো গেরিলাদের খবর রাখত—বড়কর্তারা তাদের দিকেই বেশি নেকনজর দিত। তবে আসল কাজে লেখাপড়ার খুব একটা ভূমিকা ছিল কি? সাগরদ্বীপে অনেকটা জমি নিয়ে বসাকের হার্বাল মেডিসিনের প্রোজেক্ট। অবশ্য এখনো ভাবনাচিন্তাই চলেছে।

রণজয়কে গ্রেপ্তার করার দিনই আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল। 'পুলিশ ও ইএফআর বাহিনীর একটি দল একজন নকশালপন্থী কর্মী সুনীলবরণ রায়ের খোঁজে তাঁর দাদা মালদহের একজন বিডিও অনিলবরণ রায়ের কোয়ার্টারে হামলা চালায়। খানা তল্লাশের নামে তারা যখন বাড়ির জিনিসপত্র ভাঙচুর শুরু করে তখন সুনীল রায়ের স্ত্রী তাতে বাধা দিতে যাওয়ায় তাঁর ওপর ইএফআর ও পুলিশের লাথি কিল ঘুসি নেমে আসে। হামলা শুরু হওয়ার সময় অনিল রায় বাড়ি ছিলেন না। খবর পেয়ে তিনি ছুটে এসে হামলাকারীদের কাছে জবাবদিহি চান যে একজন বিডিও-র বাড়িতে কোন অধিকারে তারা বিডিও-র অনুমতি ছাড়া ঢুকে পড়েছে। জবাবে শ্রী রায়ের ওপর বেয়নেট চার্জ শুরু হয়। ঠিক এই সময়েই সুনীল রায় ঘটনাস্থলে প্রবেশ করেন। চোখের সামনে দাদা ও স্ত্রীর ওপর এই ভয়াবহ অত্যাচার স্বভাবতই তাঁকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। ঘরের মধ্যে পড়ে থাকা কাঠ কাটার একটি কুড়ুল তুলে তিনি আক্রমণরত ইএফআর লোকেদের পাল্টা আক্রমণ করেন। তাঁর কুড়ুলের আঘাতে একজন ইএফআর-এর কনস্টেবল ঘটনাস্থলেই নিহত হন। সাথে সাথেই অন্য পুলিশ ও ইএফআর-রা সুনীলকে গুলি করে হত্যা করে।' অনিল রায়ের ওপরে ইএফআর কনস্টেবলের হত্যার মামলা চাপানো হয়েছিল। রণজয়কেও মিথ্যেভাবে এই মামলায় জড়িয়ে ফেলা হয়। 'লক্ষ্য করার বিষয়, কনস্টেবল হত্যার মামালায় দুজনকে মিথ্যাভাবে জড়িয়ে দেওয়া হল, কিন্তু সুনীল রায়কে হত্যার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হল না—যদিও জেলাশাসককে লিখিতভাবে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে সুনীল রায়ের আত্মীয়স্বজনরা এর প্রতিকার প্রার্থনা করেছিলেন।'

বসাক প্রথমে বুঝতেই পারেনি যে লোকটা তার ওপর ওইভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বসাক পড়ে গিয়েছিল আচমকা লোকটা লাফিয়ে পড়ায়। এবং বারান্দায় সাজানো টবের একটা বসাকের মাথায় লেগে ভেঙে যায়। ওরা দুজন কিছুক্ষণ ঝটাপটি করার পর চিৎ হয়ে পড়ে—বসাক

লোকটার কাঁধ দুটো ধরে ওকে দূরে ছিটকে ফেলতে চেষ্টা করছিল আর লোকটার বাঁ হাতের নখগুলো বসাকের গলায় বসে যাচ্ছিস। মুখ দিয়ে বোবা জানোয়ারের মতো শব্দ করছিল দুজনেই। এইসময় ডঃ মিত্রর কোনো বেয়ারা বা অন্য কেউ দরজা খুলে বাইরে আসে। বেরিয়ে এই দৃশ্য দেখে লোকটা চিৎকার করে উঠেছিল আর গেটের কাছে দুজন দারোয়ানও শুনতে পেয়েছিল। চিৎকারের ফলে বসাকের আক্রমণকারী একটু আলগা দিয়েছিল। সেই সুযোগে বসাক তাকে উল্টে ফেলে তার গলা টিপতে চেষ্টা করে। এইসময় বসাক হঠাৎ বুঝতে পেরেছিল যে তার পেটে ধারালো কিছু একটা ঢুকছে। জ্বালা করছে। বসাক লোকটাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে লোকটাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। হাতে তিনফলা নিড়ানি। বসাক দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকেছিল। এরকম ভয় সে কখনো পায়নি। ডঃ মিত্র, বসাকের বউ, সেই মেয়েটা, তার স্বামী, স্বামীর বন্ধুরা দেখল পেটে রক্তমাখা বসাক ঘরের কোণে টেবিল দিয়ে নিজেকে আড়াল করছে। বাঁ হাতে পেটটা চেপে ধরা। লম্বাটে, ছাঁটা কাঁচাপাকা হলদেটে চুল লোকটা বসাকের দিকে এগোচ্ছে। হাতে রক্তমাখা নিড়ানি। খুব উঁচু গলায় নয়, অনেকটা নিচু গলায় মন্ত্র বলার মতো লোকটা বলে যাচ্ছে, 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম, অমর শহীদ কমরেড চারু মজুমদার লাল সেলাম, শ্রীকামুলামের অমর শহীদ লাল সেলাম!' ডঃ মিত্র চিৎকার করে উঠেছিলেন,

—'রণজয়, কী করছ কী?'

রণজয় উত্তর দিয়েছিল,

—'শ্রেণীশত্রুকে লিকুইডেট করছি!'

বলে লাফিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। দুজন দারোয়ান আর ক্লিনিকের অ্যাসিস্ট্যান্ট রণজয়কে জাপটে ধরে ফেলার আগেই হাত ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নিয়ে রণজয় নিড়ানিটা ছুঁড়ে মেরেছিল। সেটা বসাকের কপালে লাগে। বসাক চিৎকার করে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। ওরা রণজয়কে বেঁধে ফেলেছিল। পুলিশ এসেছিল। মেখলার কাছে খবর গিয়েছিল। কোবা তখন জামশেদপুরে গিয়েছিল। কৌশিক তার বন্ধুদের নিয়ে এসেছিল। ট্রাঙ্ককলে খবর পেয়ে দামডাক্তার এসেছিলেন। ভ্যানগাড়ি ভাড়া করে রণজয়কে অ্যাসাইলামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সঙ্গে গিয়েছিল কৌশিক এবং ডঃ মিত্রের একজন লোক। দূর থেকে ট্যাক্সিতে বসে দেখেছিল মেখলা। এটা পুলিশভ্যান ছিল না। রংটাও শাদা আর ছোট। গাড়িতে ওঠবার সময় রণজয় একবার পেছন ফিরে তাকিয়েছিল। মেখলা ভেবেছিল রণজয় হয়তো তাকে বা কোবাকে খুঁজছে। আসলে রণজয় কাউকে খোঁজেনি। এমনিই তাকিয়েছিল। ফেরার সময় রণজয়কে কিছু টাকা দিয়েছিল কৌশিক।

বসাক এরপর এক সপ্তাহ নার্সিংহোমে ছিল। পেটের ইনজিউরি এমন কিছু হয়নি। নিড়ানির ফলা ভেতরে খুব একটা ঢোকেনি। কিন্তু মোদ্দা ব্যাপারটা হল পেটে আর কাপালে কোঁচকানো দাগ হয়ে গেল আর আসল দাগটা হয়ে গেল মনে। খুব একটা স্পেসিফিকভাবে রণজয়কে মনেও করতে পারেনি বসাক। পরে মনে পড়েছিল। আসলে ওই সময় বসাক ঢক করে রাম মেরে দিয়ে কাজে নামত—রণজয় নামটা তার অবশ্যই জানা ছিল কিন্তু ঠিক কোন রাতে বা কখন ইন্টারোগেশন হয়েছিল, কী হয়েছিল অত মনে ছিল না। তবে লোকটা তখন অনেকগুলো ইনজিউরি থেকে সেরে উঠছে। গায়ে ছ্যাঁকারও দাগ ছিল। কোমরের তলায় ব্যান্ডেজ ছিল। তখনও কাঁচা। তাই হাতের ওপরে, মুখে গলায়...বসাক এই ঘটনার পরে বাইরে নেপালি দারোয়ান রাখল। মান্না আর তারক বলে দুটো বডিগার্ড রাখল। মান্নাকে দিয়েছিলেন আনসারি সাহেব। বলেছিলেন খুব তৈরি ছেলে। আর তারক বসাকেরই লরির ড্রাইভার ছিল। ফরাক্কার কাছে একটা ডাকাতির সময় আচমকা জানা গিয়েছিল যে ড্রাইভারির মতো অন্য কিছু কাজও

pathagar.net

তারক ভালোই পারে। ওকে নিয়ে নিল বসাক। মান্না ক্যারাটে জানে। যন্তরটন্তর চালাতেও জানে। তারক অসম্ভব সাহস রাখে। ওদের দুজনকে নিয়ে বসাক সব জায়গায় ঘোরাঘুরি করে। বসাককে আবার টালিগঞ্জের ভগবতীবাবু বেয়াড়া একটা গল্প বলে বেদম ভয় ধরিয়েছিল। এক শালা নকশাল নদে না কোথায় যেন সেলুনে কাজ করত। সেখানে এক পুলিশ ইনস্পেক্টর নাকি তারই হাতে দাড়ি কামাতে এসেছিল। গালে সাবান-টাবান লাগিয়ে তো শান্তশিষ্ট হয়ে বসে আছে। আর এই নকশালের বাচ্চা ক্ষুরটা চামড়ায় দুবার এসপার-ওসপার করে হঠাৎ গোটা গলাটা! চারটে কারখানা, বেশ কয়েকটা গোডাউন আর কলকাতার অন্তত গোটা দশেক বড় ফ্ল্যাটবাড়িতে বসাকের সিকিউরিটি এজেন্সি পাহারাদারি করে। লাইসেন্সড রিভলভার বসাকের বরাবরই ছিল কিন্তু বসাক চেম্বারটা কাছে রাখত না। ওই ঘটনার পর থেকে কাছে রাখতে শুরু করে। বসাক একটা মারুতি জিপসি করে ঘোরে। পাশে থাকে মান্না। চালায় তারক। এরপর শহরের আলো-আঁধারিতে অনেকবার বসাকের ভুল হয়েছে। এমন নির্ভুলভাবে সে রণজয়কে নানা জায়গায় দেখেছে যে যাচাই করার জন্যে ডঃ মিত্রকে ফোন করেছে। ডঃ মিত্র বলেছেন যে তাঁর কাছে এরকম কোনো খবর নেই যে রণজয় অ্যাসাইলাম থেকে পালিয়েছে। বসাকের সিকিউরিটি এজেন্সি কোবার ওপরেও নজর রাখে—যদিও সবসময় নয়। ছোঁড়াটা মোটের ওপর হার্মলেস। তবে বসাক তারপর থেকে সবসময় তৈরি থাকতে চেষ্টা করে। তৈরি থাকেও। তবে হিসেবটা বসাকের গুলিয়ে যায়। যা করেছি, যখন করেছি তখন সেটা ছিল আমার ডিউটি। গভর্নমেন্ট যা চেয়েছিল তাই করেছি। হাত খুলে করছি। মারতে চেয়েছে, মেরেছি। ইন্টারোগেশনের সময় কোনো গণ্ডি বেঁধে দেয়নি যে মুখের ওপরে ছ্যাঁকা দেওয়া বা কাঁচা নখ উপড়ে নেওয়া বা যা খুশি তাই করা যাবে না। কিন্তু তার জন্যে আজ যদি কেউ প্রতিশোধ নিতে তিনফলা নিড়ানি নিয়ে আড়ালে আবডালে ঘুরে বেড়ায়? তাহলেও কিছু করা যেত। কিন্তু পাগল? পাগলের বিরুদ্ধে মামলা চলে? আর লোকেই-বা শুনলে কী বলবে—শুনেছেন মশাই বসাক—হ্যাঁ, হ্যাঁ দেবী রায়ের ডান হাত—সেই মাল নাকি এমনই ডরপুক হয়ে গেছে যে পকেটে চেম্বার আর দু'দুটো বডিগার্ড ছাড়া কোথাও যায় না। সামনে হয়তো কিছু বলে না, কিন্তু অজান্তে হাসি-মশকরা করতেই পারে।

কিন্তু তিনবছর আগে তিনফলা নিড়ানি নিয়ে রণজয় কি বসাককে খুন করার জন্যে ডঃ মিত্রের চেম্বারের বারান্দায় তিরিশ পাওয়ারের আলোয় ঘাপটি মেরে বসেছিল? যে রণজয় তার স্ত্রী, ছেলে কৌশিক কাউকে চিনতে পারে না অর্থাৎ যেভাবে চিনলে ঠিক ঠিক চেনা সম্ভব সেটা পারে না, সে বসাককে মনে রেখে দিয়েছিল যে বসাক অসংখ্য ইন্টারগেশনের মধ্যে চারটে বা পাঁচটা কয়েক ঘণ্টার স্পেশাল সিটিঙে রণজয়ের সঙ্গে বসেছিল—এটা কি সম্ভব? আবার অসম্ভব নাও হতে পারে। ঠিক করে কী হয়েছিল সেটা জানার কোনো নির্ভুল উপায় কি আছে? বরং ডঃ মিত্রের চেম্বারে রণজয়ের যাওয়ার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। রণজয়ের অসুস্থতার প্রথম দিকে তার চিকিৎসা ডঃ মিত্রের কাছেই শুরু হয়েছিল। নিয়মিত ওষুধে রণজয় ভালোই ছিল কিন্তু সেটা প্রথম দিকে। পরে এমন একটা অবস্থা দাঁড়াল যে ডঃ মিত্র তখন বললেন যে এ রোগীকে অ্যাসাইলামে না পাঠালে উপায় নেই। গোড়ার দিকে রণজয় মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠত বা বাথরুমে টপটপ করে জল পড়ার শব্দ শুনলে বিরক্ত হত। এরপর রণজয় প্রথমে দেওয়াল ঘেঁষে, তারপর ঘরের কোণে গিয়ে কুঁকড়ে বসতে শুরু করল যাতে কোনোমতেই পেছন থেকে কেউ না আসতে পারে। চুল কাটতে দিত না। দাড়ি কাটতে দিত না। নখ কাটতে দিত না। যাইহোক, এমন হতে পারে যে রণজয় কলকাতায়

এসে কিভাবে কেউ জানে না খুঁজে খুঁজে ডঃ মিত্রের চেম্বারে এসেছিল এবং সেইসময় বসাককে দেখে বা আরো নির্দিষ্টভাবে বসাককে সস্ত্রীক ঢুকতে দেখে রণজয়ের হয়তো কিছু মনে পড়ে গিয়েছিল। ওইসময় রণজয়ের জীবনের ওই পর্যায়ের সঙ্গে জড়িত অন্য কোনো অফিসার, জেলের ওয়ার্ডার, জেলার বা অন্য কেউ এলেও হয়তো একই ঘটনা ঘটত। তিনফলা নিড়ানি নিয়ে বসাককে আক্রমণ করার পরে পরে বা ফিরে গিয়ে কোথাও, কখনো রণজয় কিন্তু বসাকের নাম করেনি। জেল থেকে ফিরে মেখলা বা কৌশিকের সঙ্গে কত কথা বলেছিল রণজয়। কিন্তু বসাকের নাম কখনো কেউ শোনেনি। পশ্চিবঙ্গের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির পুস্তিকাতে রণজয়ের অভিজ্ঞতার সামান্য এক অংশের কিছুটা বিবরণ রয়েছে। রণজয় বলেছিল, 'ঘরটার মধ্যে ঢোকাতেই সামনে যেকজন ইনস্‌পেক্টর, এসআই ছিল লাফিয়ে উঠল। জিজ্ঞাসাবাদের ধার দিয়েও গেল না। উলঙ্গ করে পেটাতে লাগল। তখন মুখ দিয়ে গাঁজলা তুলছি। এমন সময় আরেকজন ইনস্‌পেক্টর কিংবা এসআই অশ্রাব্য গালাগালি করতে করতে আমার মুখে পেচ্ছাপ করতে এল। আর এতক্ষণ যাইহোক হজম করেছি, কিন্তু চোখের সামনে পুলিশ অফিসারের অণ্ডকোষ ঝুলতে দেখে আমার পেটের মধ্যে গোলাতে লাগল। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। ওরা দফায় দফায় আমাকে পিটিয়ে চলল।' রণজয় মনে করে খুব বেশি কিছু আর বলতে পারেনি কারণ তখন অসুস্থতার ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেছে। ওই পুলিশ অফিসার কী বসাক? নাকি চোখের ওপরে মগজ শুকিয়ে ফুটিফাটা করে দেওয়া চড়া আলোর ওপার থেকে যে পুলিশ অফিসার রণজয়কে উদ্ভট প্রশ্ন করে কিছুটা কমিক আনন্দ দিয়েছিল সে-ই বসাক?

—'আচ্ছা, রণজয়বাবু, ইন্ডিয়া থেকে আপনাদের একটা ডেলিগেশন আলবানিয়া যাওয়ার জন্যে ঠিক হয়েছিল। আলবানিয়ার প্রেসিডেন্ট এনভার হোজা-র সঙ্গে মিট করার জন্যে। আপনি এই ডেলিগেশনের একজন মেম্বার ছিলেন। বলুন, ঠিক না?'

—'আপনাদের ইন্টারন্যাশনাল কনট্যাক্টগুলো আমরা জানার চেষ্টা করছি। আচ্ছা, হল্যান্ডে আপনাদের লোক আছে না? না হলে কলকাতা থেকে অন্ধ্রে যাওয়ার রাস্তায় আপনাদের যে লিডার এনকাউন্টারে মারা যান, নামটা আপনি ভালো করেই জানেন—সে খবরটা কলকাতায় আমস্টার্ডাম থেকে কে পাঠিয়েছিল?

—'আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার সম্পর্কে মারিঘেল্লার থিওরি আপনি জানেন? নিন, চা খান। আরে আপনার ব্র্যান্ড তো চারমিনার। দেখেছেন তো, আপনি আমাকে চেনেন না অথচ আপনার সব খবর আমরা রাখি। হিসট্রিতে এত ভালো রেজাল্ট আপনার, স্কুলে পড়াতে গেলেন কেন?'

প্রশ্নগুলো হাস্যকর বলে মনে হওয়ায় রণজয় উত্তর দেয়নি। একবার শুধু বলেছিল—'রিডিকিউলাস!'

সে কি বসাক ছিল? সম্ভবত নয়। আলোর পেছনে অন্ধকারে যে ছিল সে খচে গিয়ে বলেছিল,

—'রণজয়বাবু, কো-অপারেট করুন। বেঘোরে মরে লাভ কী? আর এই যে আপনারা দিনরাত মাও মাও করে এই খুনোখুনি করে চলেছেন সেই মাও, 'দা গ্রেট হেমসম্যান',—লোকটা মার্কসসিজমের ম-ও জানে না। আই হ্যাভ গ্রেট রেসপেক্ট ফর মার্কসসিজম, বাট মাও—'পলিটিকাল পাওয়ার কামস্ আউট অফ দা ব্যারেল অফ আ গান'—ইউ কল দিস মার্কসসিজম!'

রণজয় হিংস্র আলোটার দিকে তাকিয়েছিল। ধরে নিয়েছিল যে এই আলোটাই একচোখো প্রশ্নকর্তার চোখ। এটাও রণজয় জানত যে, এরপর আবার পেটানো শুরু হবে। হবেই। চা-টা শেষ করল রণজয়। সিগারেটটা একটা টান মেরে চায়ের কাপে ফেলে দিল। দরকারের সময়

যা পাওয়া যাবে না তা খেয়ে লাভ?

—'আমায় কিছু বলতে হবে?'

—'বললে ভালো।'

—'হ্যাঁ, না বললে যে খারাপ সেটা আশা করি আপনিও জানেন। বললেও যে অন্য কিছু হবে না সেটাও আপনি জানেন। এবং এর পরে যা হবে সেটা জেনেই তো এসব চা, সিগারেট, মাও—তাই না?'

—'রণজয়বাবু।'

—'থামুন! ওই যে শেষ একটা সেনটেন্স বললেন না, ওতেই আপনার দৌড় আমি বুঝতে পেরেছি। অ্যামেরিকান মেরিন কোরের দুটো লোক মাও আর চে ট্রানশ্লেট করেছিল। সেই দুটো অনুবাদের অ্যান্থোলজিও আপনি কিন্তু পুরো পড়েননি। যাইহোক, ওই বইটাই পড়ে দেখলে আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবেন।'

—'বলুন, রণজয়বাবু, শুনছি।'

—'শুধু একটা সময় জানলেই হবে। ১৯১৭ সাল। দুনিয়া কাঁপানো অক্টোবর বিপ্লবের বছর। মাও গ্র্যাজুয়েশন-এর পরে পিকিং ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর চাকরি পান। এই সময় লি তা চাও আর চেন তু শিউ যে মার্কসবাদী পাঠচক্রগুলো চালাচ্ছিলেন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন মাও। এখানে তিনি লেনিনের প্রবন্ধ, ট্রটস্কির ভাষণ এবং মার্কস ও এঙ্গেলস খুঁটিয়ে পড়েন। ১৯২১ সালে সাংহাই-তে যখন সিসিপি স্থাপিত হয় তখন মাও তাতে যোগ দেন। তখন তিনি গভীরভাবে মার্কসবাদ বিশ্বাসী। একজন আসল কমিউনিস্ট। আশা করি আপনার ভুল ধারণাগুলো পাল্টে নেবেন। অবশ্য না পাল্টালেও কিছু এসে যায় না।'

মেখলার দাদাই মেখলার সব। প্রায় বাবার মতো। ফার্ন রোডে একলাই ছিল মেখলা। অবশ্য পুরোনো কাজের লোক গৌরীদি আর ছোটবেলায় আসা গণেশ ছিল। মেখলার মা যখন ক্যানসারে মারা যান তখন মেখলা ক্লাস টেনে পড়ে। বাবাকে মেখলা কখনো দেখেনি। তারপর দাদাও তো চলে গেল। মাসীরাও একলা মেয়ের খোঁজ নিত না। নিজেদের ছেলেমেয়েদেরও মিশতে দিত না। রণজয় অ্যাসাইলামে গেল। রণজয়ের বাবাও চলে গেলেন। মেখলা ছেলেকে নিয়ে আবার এসে ফার্ন রোডের বাড়িতে উঠল। তলায় ভাড়াটে। তারা নানারকম ঝামেলা করত। ভয় দেখাত। দাদা এলেন। এসে সবকিছু দেখেশুনে বললেন,

—'মেলা, আমি যা বুঝছি তাতে এই বাড়িতে তোর থাকা চলবে না।'

—'তাহলে আমি কোথায় থাকব দাদা?'

—'রাস্তার থাকবি। লাইক এ পেভমেন্ট ডুয়েলার। কলকাতায় কত লোক বাচ্চা নিয়ে রাস্তায় থাকে। ঠাস করে একটা চড় মারব। ছেলে নিয়ে এই অসভ্য ভাড়াটেদের সঙ্গে থাকতে হবে না। আমি একটা ফ্ল্যাট বুক করেছি, সেখানে থাকবি। এই বাড়িটা প্লাস অল দা ইনেভিটেবল নস্টালজিয়া আমি বেচে দেব।'

এই সময় কোবা মামুর আনা একটি বিশাল, শাদা, মেরুভল্লুক সহ মামুর ওপরে লাফ দিয়ে উঠেছিল। মামু কোবাকে বুকে জড়িয়ে দুলতে থাকেন।

—'ব্যাং লাফানো ডোবা, মধ্যে বসে কোবা। মেলা, তুই ওই টিপিক্যাল কান্নাকাটিগুলো বন্ধ করবি? রিয়ালি, ইউ ওনলি ডিজার্ভ আ রিসাউন্ডিং স্ল্যাপ এবং ঢাকুরিয়া ফ্লাইওভারের তলায় আ ডুয়েলিং প্লেস। কি যেন বলে, দিল্লিতে খুব শুনলাল, ঝুগগি-ঝোপড়ি।'

মেখলা চোখ মুছে দাদার পাশে এসে বসে। দাদা কাঁদছে। সোনালি চশমাটা খুলে ফেলেছে।

—'মেলি! ডোন্ট বি আ সিলি গার্ল! আমি কাঁদছি কেন বল্ তো? আনন্দে। বাবার কথা ভেবে। কোনো চিন্তা করবি না। রণজয় হল একটা টাইটান। আমি ওর সব খরচ দেব। এটা আমার প্রিভিলেজ। নতুন ফ্ল্যাটে তোর ফোন থাকবে। আমি খবর নেব। আর ওই ছেলেটা, কৌশিক! খুব ভালো ছেলে। মোট কথা, তুই কোনো কথা ভাববি না। তবে হ্যাঁ, আমার ফরাসি বউ তাড়িয়ে দিলে, ও অবশ্য তাড়াবে না, আমার একটা আনরিটেন ক্লেম রইল। বাবা নেই! মা নেই! তুই কি ভাবিস, তোর দাদা মরে গেছে?'

রণজয়ের ধুতি আর পাঞ্জাবি পরা দাদা, মেখলার সর্বস্ব যে দাদা, তিনি ডুকরে ডুকরে কাঁদেন। মেখলাও কাঁদে। মেঝের ওপরে মেরুভল্লুক চিৎ হয়ে পড়ে। তার উল্টোনো চোখে ঘরের ছাদ। অপরিচিত। কারণ সে পশ্চিমের আকাশ দেখে অভ্যস্ত। কোবা দাদার কোলে মাকে মাথা রাখতে দেখে, লাফ দিয়ে নেমে, একটু দূর থেকে, মেরুভল্লুককে কাছে টানতে টানতে বলে,

—'মামু, মাম্ মাম্ কি পাগল? গৌরী দিদি বলেছে বাবা পাগল। মাম্ মাম্ কি পাগল, মামু?'

ইস্কুলে না হলেও কলেজে প্রশ্নটা কোবার কাছে ঘুরেফিরে এসেছিল। ক্যাথলিক স্কুলে কেউ খুব আগ্রহ নেয়নি। পেরেন্ট টিচার্স মিটিঙে মেখলা যেত। কখনো মেখলা-কৌশিক। ক্লাস নাইন-টেনে গণ্ডগোল শুরু হয়। একবার স্কুলের গেটে মামু এসেছিল। তাঁকেই সবাই ধরে নিল মিস্টার মেখলা। তাহলে ওই ভদ্রলোকই বা কে? একবার সারা কলকাতা জুড়ে প্লাবন, ক্যামাক স্ট্রিটে ভাঙা, উপড়োনো ক্যাকটাস ভাসছে। কৌশিকের ফোন খারাপ! পার্থ এসেছিল সরকারি জিপ নিয়ে। পার্থই বা কে? এই প্রশ্নগুলো হাত ফেরৎ হয়ে কোবার কাছেও এসেছিল। কোবা কলেজে। কোবা জয়েন্ট দেয়নি। ক্লাসেরই কোনো অধ্যাপক, বিদেশি ডিগ্রিধারী, সদ্য এসেই,

—'অনির্বাণ তুমি রণজয়ের ছেলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'বাবাকে তুমি চেন?'

—'হ্যাঁ!'

—'তোমার বাবা কি বেঁচে আছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমাদের সঙ্গেই থাকে?'

—'হ্যাঁ।'

—'ঠিক আছে। তুমি যাও।'

অথবা তার বেশ কয়েক মাস পরে,

—'অনির্বাণ, তুমি তো রণজয়ের ছেলে, না?'

—'হ্যাঁ!'

—'আমরা একসঙ্গেই জেলে ছিলাম।'

—'ছিলেন?'

—'মানে?'

—'মানে একসঙ্গেই জেলে ছিলেন?'

—'তুমি কী আমাকে প্রশ্ন করছ?'

—'না। আমি প্রশ্ন করছি না। আপনি প্রশ্ন তুলছেন।'

—'অনির্বাণ?'

—'থামুন! আমিও কিছু কিছু খবর জানি।'

—'অনির্বাণ!'

—'সার! আমার সঙ্গে একটা ডায়েরি আছে। ডায়েরি নয়, নোটবুক। তার থেকে কয়েকটা নাম আপনি চিনতে পারবেন। অন্তত চেনার কথা। প্রথমত আপনি একসঙ্গে ছিলেন না।'

—'কোথায় ছিলাম?'

—'সেফ কোনো জায়গায়। যখন আমার বাবা সলিটারি সেলে একলা মাথা ঠুকছিল। কোথায় ছিলেন, মনে আছে? দমদম সেন্ট্রাল জেলে?'

—'অনির্বাণ?'

—'নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান, ফোর্টিনথ মে। কেষ্ট, স্বপন, হেমন্ত, গোপাল, নবেন্দু, তপন, প্রণব, পার্থ, সুদীপ, বীরেন, সুজিত, শান্তি...'

—'অনির্বাণ!'

—'টেস্টের রেজাল্ট নিয়ে আপনি আমাকে চমকাচ্ছেন, না?'

—'না, অনির্বাণ!'

—'একটা নম্বর নিয়েও আমার যদি সন্দেহ হয় তাহলে আমি কিন্তু আপনাকে চমকাব!'

—'হাউ ডেয়ার ইউ?'

—'এই, গলা নামিয়ে কথা বলুন। আপনি বার বার বাবার কথা টেনে আনেন, কেন?'

—'মানে, রণজয়, তুমি রণজয়ের ছেলে...'

—'থাক্। প্রথমবার আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, সবটা জেনেই আপনি ভাঁড়ামি করেছেন। আপনি ভালোভাবেই জানেন যে আমার বাবা অ্যাসাইলামে। ভালোভাবেই জানেন যে আমি একা, হেলপ্‌লেস—বাট ইউ আর রং! ইউনিয়ন করি না কিন্তু আমার এনাফ ক্লাউট রয়েছে।'

—'ভয় দেখাচ্ছ, জান আমি কে?'

—'চুপ্। হ্যাঁ, ভয় দেখাচ্ছি। একটা স্পাইকে ভয় দেখাচ্ছি। এরপরে আর ভয় দেখাব না। যেটা দরকার সেটা করব। ছিঃ। বাংলা বলে দিচ্ছি, শুনে নিন আমাকে টেস্টে খজরামি করে ডিসঅ্যালাও করলে আমিও আপনাকে ডিসঅ্যালাও করে দেব।'

—'অনির্বাণ, তুমি আমাকে থ্রেট করছ।'

—'হ্যাঁ, করছি। এরপর অন্তত মুখে আর করব না।'

—'জানো, আমি কী করতে পারি।'

—'জানি। জেলে তো করেই ছিলেন। এখন, আপনি আমার ছিঁড়বেন।'

—'অনির্বাণ।'

কোবা গটগট করে বেরিয়ে এসেছিল। রণজয়ের কাছে কৌশিক যে অনেক, অনেক কথা শুনেছিল কোবা সেগুলো কৌশিকের কাছে শুনেছিল। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির পুস্তিকাটি কৌশিক কোবাকে দিয়েছিল। কোবা তার বহু জায়গা মুখস্থ বলে যেতে পারে। শ্যামল চক্রবর্তী, প্রবীর রায়চৌধুরী, মদন দাস, পার্থসারথী ঘোষ ও প্রতীপ ঘোষের মুণ্ডু-থ্যাঁৎলানো মৃতদেহের বিবরণ দিতে পারে। রড, লাঠি, বুলেট, বেয়নেট তরতাজা কয়েকজন জোয়ানকে পিটিয়ে, থেঁৎলে, খুঁচিয়ে, চিরে কি বীভৎস চেহারা করে দিতে পারে। পুস্তিকাতে ওই পাঁচজনের ছবিই ছিল। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল, ১৯৭০, ১৬ ডিসেম্বর। ৯ জনকে হত্যা করা হয়। ১৯৭১, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১ জন মারা যায়, ৫ জন আহত। বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল, ১৯৭১, ২৪ ফেব্রুয়ারি। ৯ জন মারা যায়—'নিহত একজন তরুণ বন্দীর (২৪) নাম তিমিরবরণ সিংহ বলে জানা গেছে। এঁর বাড়ি কলকাতায় ছিল। ইনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর (বাংলা) একজন

ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই গল্প, কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে সম্ভাবনাময় ও মানবদরদী একজন তরুণ সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর পরিচিতি ঘটেছিল। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে জানা গেছে কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিমির সিপিআই (এমএল) দলে যোগ দেন এবং আরামপ্রদ জীবন ও ব্যক্তিগত উন্নতির পথ পরিত্যাগ করে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে চলে যান। সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর আত্মীয়দের কাছ থেকে জানা যায় যে, লাঠির আঘাতে তাঁর দেহ রক্তমাংসের এমন একটি পিণ্ডে পরিণত হয় যে তাঁর শবদেহ শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। চোখদুটিও তাদের স্বস্থান থেকে উপরে উঠে এসেছিল। শবদেহের এই বীভৎস মূর্তির জন্য আত্মীয়রা তাঁর মাকে সন্তানের মৃতদেহ দেখতে দেননি। কড়া পুলিশ প্রহরায় তাঁর মৃতদেহ দাহ করা হয়। ১৯৭২, ২০ ফেব্রুয়ারি। একজন নিহত, ৯ জন আহত—'একবছর আগে বহরমপুর জেলে নিহত তাঁদের সহকর্মীদের স্মরণে বন্দীদের সভা করার প্রস্তুতিতে কারারক্ষীরা বাধা দেবার চেষ্টা করলে সংঘর্ষটি ঘটে। দমদম সেন্ট্রাল জেল, ১৯৭১, ১৪ মে। ১৫ জন নিহত ও ৭৩ জন আহত—'জেলের রক্তপিপাসুরা জেলারের প্ররোচনায় পরিস্থিতিটাকে তাদের একটা উৎসবে পরিণত করল।...এটা তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য নয়, হত্যার জন্য। একে একে তরুণেরা লুটিয়ে পড়তে শুরু করল। তাদের রক্তে মাটি ভিজে উঠল। কিন্তু তাদের জ্ঞানহীন শরীরের উপরই পেটান চলতে লাগল। কেউ কেউ সাথে সাথেই মারা গেল। অন্যেরা মৃত্যু যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগল।...হাওড়া জেল, সিউড়ি জেল, আলিপুর স্পেশাল জেল, আসানসোল স্পেশাল জেল, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, হুগলি জেল, বর্ধমান জেল, বহরমপুর স্পেশাল জেল, বাঁকিপুর সেন্ট্রাল জেল, হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেল, ভাগলপুর স্পেশাল সেন্ট্রাল জেল, গয়া সেন্ট্রাল জেল...টেস্টে কোবা সেকেন্ড হয়েছিল।'

—'কৌশিক, এই বইগুলো তোমার কাছে আপাতত থাক। আমার এই অসুবিধেগুলো যখন থাকবে না তখন...মানে আমার তো এইভাবে শুয়ে বসে থাকলে চলবে না...এত কাজ বাকি অথচ কি যে হল...কৌশিক, একবার দেখে এসো তো দরজার বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে শুনছে কিনা—আমি দেখলাম একটা শ্যাডো সরে গেল—ওঃ আচ্ছা কৌশিক, এই ওষুধগুলো কেন দেয় তুমি জান? অবশ্য তুমিই-বা কিভাবে জানবে। তোমার জানার কথা নয়। কেউ ছিল দরজার বাইরে? ছিল। তুমি যেতে সরে গেছে। আবার আসবে। কৌশিক, তুমি কিন্তু বইগুলো ভালো করে রেখ। অনেক কষ্ট করে জোগাড় করা। র‍্যালফ ফক্সের 'কমিউনিজম' তোমায় দিয়েছি, না? আই বট ইট ইন এলাহাবাদ। চকের কাছে—একটা লোক ডাঁই করে গোটা চল্লিশেক কপি নিয়ে বসেছিল। আট আনা করে। কিতাবিস্তানের বই। চারটে কপি কিনে এনেছিলাম। কোন ইয়ারে বলো তো? র‍্যালফ ফক্স, ডেভিড গেস্ট, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, জন কর্নফোর্ড—কৌশিক স্পেনের খবর কী তুমি জান? বার্সিলোনা বম্বড় হচ্ছে? ওই তো আবার এসেছে। শ্যাডো। মাথাটা ঝিমঝিম করছে কৌশিক। বইগুলো ভালো করে রাখবে। আমার লাগবে, মেলার লাগবে, তোমার লাগবে, বড় হলে কোবার লাগবে। কে আসছে। কে? কৌশিক, মেলা, তোমরা সরে যাও, কোবাকে সরিয়ে নাও, ওরা কাউকে স্পেয়ার করবে না।'

রণজয় দাঁড়িয়ে উঠে চোখ বন্ধ করে—হাত দুটো মুঠো করে বলে গিয়েছিল,

—'দ্যাখো, আকাশের উত্তোলিত হাতে সূর্যের গ্রেনেড
বিকেলের শেষে, রক্ত ও ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে
পশ্চিমে মুক্তিযোদ্ধারা
অন্ধকার পাহাড়ে চলে যাচ্ছে

ওই দ্যাখো, সকালের পূব
জ্বলে যাচ্ছে নিশানের লালে
বিপ্লবের মৃত্যু হয় না জিভ কেটে নিলে
বা ফাঁসিতে ঝোলালে।'

রণজয়ের বাবা ঘরে ঢুকে কাঁদতে কাঁদতে রণজয়কে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

—'রন্টু মাই সান, মাই ব্রেভ সান! এট্টু থির হও বাবা। আমি, আমি তো আছি।'

—'বাবা, আপনি?'

—'আমিই তো। আস, আস বাবা। বস।'

—'হ্যাঁ, বাবা, বাবা, আমার না, আমার মাথা ঝিম ঝিম করছে। বাবা, ওরা না, ওরা আমায় ভীষণ মেরেছে। জানো...'

—'কে আমার রন্টুরে মারে, আসুক দেখি। আমি জিন্দা থাকতে কেউ আর তর কেশাগ্র স্পর্শ করব না। বউমা, আমি রন্টুরে দেখতাছি, কোনো চিন্তা নাই, আমি থাকতে কোনো চিন্তা করবা না। তুমি এট্টু শোও দেখি বাবা। কোনো চিন্তা নাই। এই তো আমি বাবা!'

রণজয় শুয়ে পড়েছিল। রণজয়ের বাবা ওর বুকে, মুখে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। ঘরের কোণে কৌশিক ডুকরে ডুকরে উঠে আসা কান্না গেলে। রণজয় বলতে থাকে

—'বাবা, তুমি যখন জেলে আসতে, ওরা কথা বলতে দিত না। তুমি কতদূর থেকে আসতে, ওরা কয়েক মিনিট পরেই আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যেত। খুব খারাপ লাগত আমার। বাবা, তুমি কেমন আছ?'

—'আমি, আমি তো ভালো আছি। দিব্য আছি।'

—'তোমার চশমার ওই কাচটা ঘষা কেন বাবা? বাঁ চোখ তো। বাঁ চোখে তুমি দেখতে পাও না?'

ছানি কাটানোর ফ্রি আই ক্যাম্পে অপারেশন করানোর পর বাঁ চোখটা রণজয়ের বাবার নষ্ট হয়ে যায়।

—'হাই পাওয়ার তো! তাই অমন কাচ। দ্যাখা, পড়া, সব পারি। বউমা, আমারে এক গ্লাস জল দিবা?'

—'বাবা, তোমাকে পুলিশ আর ভয় দেখায়?'

—'কে পুলিশ? তুই চল্! কেউ তর ত্রিসীমানায় আইব না। পুলিশ, পুলিশরা সব ভয় পাইয়া পলাইছে।'

—'বাবা, মা-র সেই পায়ের ছাপ দেওয়া ছবিটা?'

—'আছে!'

—'গাছগুলো!' রণজয়ের ঘুম পাচ্ছে।

—'গাছ মানে সেই পেয়ারা গাছ তো। আছে। বহালতবিয়তে। খুব পেয়ারা হয়। ছাওয়ালপাল আসে। সক্কলে খায়। বড় পয়মন্ত গাছ।'

—'বাবা!'

—'কও!'

—'বাবা!'

—'কও বাবা, আমি শুনতাছি!'

রণজয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

৫

৪.১১.৯৪ রাত

ট্যানারির চামড়ার গন্ধ এখানকার আকাশে বাতাসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে সয়ে গেছে বলে তারা আর গন্ধটা পায় না। এতক্ষণ ধরে সোজা যে রাস্তাটা এসেছে তার আশেপাশে ছিল হয় ভেড়ি, নোংরার গাদা আর তরকারির খেত। প্রচণ্ড জোরে গাড়ি চলে। দূর থেকে সাইরেনটা শুনে রণজয় একবার রাস্তার ধারে নেমে গিয়েছিল। সামনে এটা বড় পুলিশের গাড়ি। জিপ পরপর দুটো। মধ্যে কয়েকটা শাদা গাড়ি। পেছনে আবার পুলিশের গাড়ি। সাইরেনটা বাজছে। লাল আলো জ্বলছে-নিভছে। দেখলে মনে হবে লাল, শাদা, কালো—কয়েকটা গাড়ির রেস হচ্ছে। দঙ্গলটা চলে যাবার পরে পরেই রণজয় রাস্তায় উঠে এল। দঙ্গলটা তেড়ে আসার জন্যে যে লরি আর বাসগুলো রাস্তা ছেড়ে দিয়েছিল এবার তাদের যাওয়ার পালা। বড় বড় গাড়িগুলো চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে থতমত বাতাস রণজয়কে ধাক্কা মারে। বাতাসটা একটু ঠাণ্ডা এই সকালের দিককায়। ট্যানারির বিরাট উঁচু দেওয়াল ঘেঁষে রাস্তার ধারে চায়ের দোকান। দেওয়ালটা দেখতে অনেকটা জেলের দেওয়ালের মতোই। রণজয় বেঞ্চির এক কোণে বসে চা খেল আর দুটো নোনতা বিস্কুট। বিড়ি ধরাল। তারপর পকেট থেকে হলদেটে দোমড়ানো ভাঁজে ভাঁজে ছেঁড়া দাগ লাগা আজকের খবরের কাগজটা বের করে বিড়বিড় করে পড়তে থাকল,

—'সাতই নভেম্বর মস্কোর রেড স্কোয়ারে লেনিন সৌধের মঞ্চ থেকে কমরেড স্তালিন ফ্রন্টের দিকে আগুয়ান লাল ফৌজের সৈন্যদের এক ভাষণে বলেছেন যে, পবিত্র রাশিয়াকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে হবে।'

—'৩১ অক্টোবর জার্মান বিমানবাহিনী পঁয়তাল্লিশ বার মস্কোর উপরে বোমাবর্ষণ করে। ২৫ অক্টোবর মস্কো ফ্রন্টে প্রবল তুষারপাত। ২৯ অক্টোবর নাৎসি জেনারেল ভাগনার বলেছেন, 'আমরা নিশ্চিত যে মস্কো শীঘ্রই খতম, হবে।' ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯—'চেয়ারম্যানের চীন আক্রান্ত হতে পারে, বিপ্লবের কাজ দ্রুততর করুন'—চারু মজুমদার। ১৭ নভেম্বর ভলোকোলামস্কের কাছে ট্যাংক-বিরোধী গোলন্দাজ এফিম দিসকিন মারাত্মক আহত হয়েও পাঁচটি জার্মান ট্যাংক ধ্বংস করে দেন। ৬ নভেম্বর বলশেভিক মহাবিপ্লবের চব্বিশতম বার্ষিকী অনুষ্ঠানের কমরেড স্তালিন মস্কোর পার্টি কর্মীদের বলেছেন জার্মান সেনারা হল, 'জন্তুর নীতিবোধওয়ালা মানুষ।...ওরা যদি নিশ্চিহ্ন করার যুদ্ধ চায় তাহলে সেই যুদ্ধই তাদের দেওয়া হবে।' আজ ভারতের প্রতিটি কোণ অগ্নিগর্ভ থাকায় শ্রীকাকুলামের সশস্ত্র লড়াই শুধু শ্রীকাকুলামেই আটকে থাকতে পারে না। খোকনের (অসীম চট্টোপাধ্যায়) ১১ মে তারিখের চিঠির জবাব...জেলের হত্যাকাণ্ডের বদলা নাও...মাগুরজানে রাইফেল সংগ্রহের মধ্য দিয়ে গণমুক্তি ফৌজ গড়ার কাজ শুরু হয়েছে...চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে কমরেড লিন পিয়াওে চারটি প্রধান দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন...'

রণজয় উঠে হাঁটতে থাকে। ২৩ নভেম্বর জার্মান বাহিনী ইসত্রা গ্রামে পৌঁছেছে। ইসা থেকে মস্কোর দূরত্ব তিরিশ মাইল। লেনিনগ্রাদে নভেম্বরে ১১ হাজার নাগরিক খাদ্যের অভাবে মারা যাচ্ছে। আকুলোভো গ্রামে, মস্কো-মোঝাইক হাইওয়ের ৬ মাইল দক্ষিণে জার্মান সৈন্যরা দূরে ক্রেমলিনের চূড়া দেখতে পাচ্ছে। রণজয় হাঁটছে তো হাঁটছেই। কোথায় যেন সেই জড়ানো মৃতদেহের মতো অস্ত্রসম্ভার? কোথায়? একটা গাড়ি প্রায় রণজয়কে ঘেঁষে চলে গেল। ড্রাইভার খিস্তি করল। শুনতে পেয়েছিল রণজয়। রণজয় চিৎকার করে দূরে মিলিয়ে যাওয়া গাড়িটার

দিকে কথাগুলো নিক্ষেপ করে—

'ঘৃণা করুন, চূর্ণ করুন মধ্যপন্থাকে।'

কোবা সকালে কোথায় যেন বেরিয়েছিল। তখন বেলা দশটা হবে। মেখলা মাথায় স্যাম্পু ঘষছিল। ফেনায় মুখচোখ ঢাকা। মেখলা সাবধানে একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে স্নান করে। মেখলা শুনেছিল ফোনটা অনেকবার বেজে থেমে গেল। পিংকি ঘেউ ঘেউ করল। স্নান করে, হাউসকোট পরে বেরিয়ে এল মেখলা। পার্থকে বোঝে না মেখলা। একসময় রণজয়ের বন্ধু ছিল। অবশ্য গা বাঁচিয়েই। এখানে এসে বসে বসে ওই বিচ্ছিরি গন্ধের মদ খাবে, একটার পর একটা সিগারেট খাবে আর কী সব যে বলে মেখলা সবটা বোঝেও না। খলিল জিবরান, কলিন উইলসন, অ্যাডভেঞ্চারের বই, থ্রিলার আবার সেই সঙ্গেই জয়ের কবিতা, সিলভিয়া প্ল্যাথ, কমলকুমার—মেখলার মনে হয় পার্থ এইসব কথাগুলো হয় তার বউকে বলে না, বলতে পারে না বা কেনই যে বলে—পার্থর মুখটা কেমন পাঁউরুটি-পাঁউরুটি, অসহ্য গরমে নিয়মিত সিন্থেটিক কাপড়ের বুশশার্ট পরে—এলেই বলে—সে কি মেলা, তোমরা কেবল নাওনি! জিটিভি, সিএনএন...বিবিসি-তে একটা ফিল্ম দেখলাম—অন বুখারিন—স্তালিন ওয়াজ আ ব্লাডসাকার—রণজয়ের কনভিকশনকে আমি অনার করি, কিন্তু—যাইহোক মেলা, চলো দুদিন আমরা কোথাও ঘুরে আসি—তুমি তালসারি গেছ?

আবার ফোন বাজল। পিংকি ডাকল। মেখলা গিয়ে ফোন ধরল।

—'হ্যালো!'

—'হ্যাঁ, হ্যালো। আচ্ছা, মিসেস সেনগুপ্ত আছেন? খুব শব্দ হচ্ছে ফোনে...'

—'কথা বলছি!'

—'কিছু শোনা যাচ্ছে না। মিসেস সেনগুপ্ত আছেন?'

—'হ্যাঁ, কথা বলছি।'

—'আমি ডক্টর দাম। নিউ লাইট হোম-এর ডক্টর দাম।'

—'হ্যাঁ, বলুন। আমি মেখলা বলছি। রণজয় কেমন আছে?'

—'হ্যাঁ, খুব শব্দ! আমি ডঃ মিত্রের চেম্বার থেকে বলছি। রণজয়কে দুই তারিখ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। শুনতে পাচ্ছেন?'

পিংকি ঘেউ ঘেউ করছে। তলায় বাচ্চারা খেলা করছে। বাড়িটা নেগেটিভ ছবি, আবার ছবি।

—'শুনুন। রণজয় কলকাতা এসেছে। গতকাল। আজ আমি এসেছি। আমি গিয়ে সব বলব! আজকেই যাব।'

ফোনটা কেটে গিয়ে হঠাৎ একটা মেয়ের গলা এল, সার্ভিস টু দা কলড্ নাম্বার হ্যাজ বিন টেমপোরারিলি উইথড্রন...সার্ভিস টু দা কলড্ নাম্বার...

মেখলা ফোনটা রেখে বারান্দায় গেল। বাইরে দেখল। তলায় গেটের কাছে ইস্ত্রিওয়ালা ইস্ত্রি করছে। রোজ যেমন হয়। গাড়ি ঢুকছে। বেরোচ্ছে। রণজয় কলকাতায় এসেছে। কোথায়? রণজয় কি বসাককে মারতে যাবে? কিন্তু কোবা কোথায় গেল আজ? কোবা জানলেই-বা কী হবে? পার্থ সরকারী অফিসিয়াল। পার্থ কিছু করবে? কৌশিক! কৌশিক ছাড়া কে এখন মেখলাকে দেখবে? মেখলা কৌশিককে ফোন করল। ধরল জয়িতা।

—'কে? মেলা বউদি?'

—'হ্যাঁ। তুমি একটু কৌশিককে দেবে?'

—'কুশ তো বাথরুমে। ওকে বলছি বেরিয়ে তোমাকে ফোন করতে।'

—'হ্যাঁ, বেরিয়েই যেন করে। আমি রাখছি জয়িতা।'

—'তোমরা ভালো তো, কোবা, পিংকি?'

—'সবাই ভালো। রাখছি।'

মেখলা ঘুরে গিয়ে সেই ছবিটার সামনে এল। মেখলা কাঁদছে

—'তোমার কথা সবসময় অন্যরা বলে, তুমি বলো না কেন?'

হোপে—চাহার—শানসি এলাকার উ তাই শান জেলা এলাকার সীমান্ত বরাবর এইটথ রুট আমি গেরিলা তৎপরতার এক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে...

সেনাবাহিনী সরে যাওয়ার পরেও সাংহাই উসাং এলাকার গেরিলা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে...গেরিলারা তিউং পিউ-এর রেলপথ এবং পিং শিং গিরিবর্ত ও ইয়াং ফাং কু-এর মোটরযান চলাচলের রাস্তা ধ্বংস করে দিয়েছে...প্রত্যেকটি গেরিলা ব্যাটালিয়নের থাকবে ৩০৬টা রাইফেল, ৪৩টা পিস্তল, মেশিনগানের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়...গেরিলা রেজিমেন্টের থাকবে ১৮৯টা পিস্তল ও ৯৫৪টা রাইফেল...

একটা অটো পাশে গতি ধীর করে। চোয়াড়ে চেহারার চালক দাঁতে একটা ফিল্টার সিগারেট কামড়ে।

—'বস্, চলোগে!'

রণজয় উত্তর দিলনা।

—'সরি বস্। টা টা! কালি কালি আঁখে...' সরস, যুবক অটোওয়ালা চলে যায়। একটা দানব একটা টায়ার তুলে ধরেছে—এমআরএফ-এর বিশাল হোর্ডিংটার দিকে তাকায় রণজয়। গিট্ গিট্ গিট্ গিট্ শব্দ করে একটা হেলিকপ্টার উড়ছে। রণজয় আকাশের দিকে তাকায়। হেলিকপ্টার।

—'সাইগন থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে তিন দিয়া গ্রামে একের পর এক মার্কিন হেলিকপ্টার নামছে। নামছে না। নিচু হয়ে উড়ে যাচ্ছে মেশিনগান চালিয়ে। প্রেসিডেন্ট জনসন হাসছেন। রবার্ট ম্যাকনামার হাসি। সর্বাঙ্গ নাপামে পুড়ে যাওয়া একটি শিশু! নগুয়েন ভ্যানত্রয়! হ্যাঁ, আমার জীবনের চূড়ান্ত ব্যর্থতা এইটাই যে আমি ম্যাকনামারকে হত্যা করতে পারিনি।'

রণজয় হাঁটতে থাকে। তার পায়ে লেগে ফ্রুটির খালি স্ট্র ভরা বাক্স, পানপরাগের প্যাকেট, শাদা হয়ে যাওয়া নিঃশেষিত মশা তাড়ানোর ম্যাট, ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ, ছেঁড়া খবরের কাগজ ছিটকে যায়। এতসব জিনিস কী তা রণজয় জানে না। ট্যাক্সি থেকে কেউ হাত নাড়ল?

—'কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য, সমর্থক ও তাদের পরিবারবর্গকে হাজারে হাজারে হত্যা করা হচ্ছে। দূরের জেলাগুলিতে জিজ্ঞাসাবাদের মহড়ার পর সামরিক ইউনিটগুলি হাজার হাজার কমিউনিস্টকে হত্যা করছে। পারাং নামে চওড়া ফলার ছোরাতে সজ্জিত হয়ে উগ্র মুসলিমদের দল রাতে কমিউনিস্টদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে—নির্বিচারে সকলকে খুন করেছে এবং মাটি অল্প খুঁড়ে পুঁতে ফেলছে। পূর্ব জাভার গ্রামাঞ্চলে এই হত্যাভিযান এত নৃশংস হয়ে উঠেছে যে তীক্ষ্ণ বাঁশের ওপরে কমিউনিস্টদের মাথা গেঁথে গ্রামে গ্রামে দেখানো হচ্ছে। এত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে যে, পূর্ব জাভা ও উত্তর সুমাত্রায় মৃতদেহ পচনের দুর্গন্ধ একটি সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এই সব অঞ্চলের খবরে জানা যায় যে, ছোট ছোট নদী এবং খাল অসংখ্য মৃতদেহতে আটকে গেছে। কোনো কোনো জায়গায় জলপথে চলাচল অসম্ভব হয়ে উঠেছে।'

কোবার বেল বাজল। খুব কম সময়ের জন্যে, কিন্তু যারা শোনে তারা জানে আড়াইবার।

ধোপা, সুইপার, পার্থ বা অন্য কারো বেল বাজলে পিংকি ঘেউ ঘেউ করে। শুধু কোবার বেল বাজলে কুঁই কুঁই করে। কৌশিক অত্যন্ত অসভ্য। সে কদাপি বেল বাজায় না। হয় নীচ থেকে উৎকট হর্ন বাজায় বা দরজা ধাক্কায়। মেখলা দরজা খুলতেই কোবা ঢুকল। হাতে একগাদা বই, ক্যাসেট।

—'কোবা!'

—'কী হয়েছে মা!'

—'কোবা!'

—'কী হয়েছে বলবে তো।'

—'এইমাত্র ডক্টর দাম ফোন করেছিলেন। তোর বাবা মিসিং। উনি বললেন সে কলকাতাতেই এসেছে। এখন...আমি...'

কোবা দেখল মেখলা ঘামছে। মুখটা একটু ফাঁক। ঠোঁট কাঁপছে।

—'আমি তোমাকে প্রথমে যেটা বলব সেটা হল প্যানিকি হয়ো না। আই আন্ডারস্ট্যান্ড কিন্তু হতে একবার শুরু করলে দেয়ার ইজ নো এন্ড টু ইট—স্টেডি হও। কৌশিককাকুকে ফোন করেছিলে?'

কোবার কথার সঙ্গে সঙ্গে ফোন বাজল। মেখলা বলল,

—'কৌশিকেরই ফোন!'

—'দাঁড়াও, আমি ধরছি।'

কোবা ফোন ধরল,

—'হ্যাঁ, আমি। আচ্ছা শোনো বাবা অ্যাসাইলাম থেকে, হ্যাঁ, সেই যে ডক্টর দাম, মাকে ফোন করেছিলেন এক্ষুনি। শুনে মা-র কি অবস্থা বুঝতেই পারছ। কথা বলবে, মা ধরো।'

—'বল্ কৌশিক...'

—'শোনো, একদম নার্ভাস হবে না। ও আমি ঠিক খুঁজে বের করব, দেখে নিও। যাইহোক, চিন্তা করবে না। এনিটাইম আমি যাব। ঠিক আছে? এখন রাখছি কারণ স্ট্র্যাটেজিটা একটু ভেবে নিতে হবে। আর শোনো, ওই বসাক লোকটা খবর পেলে যোগাযোগ করতে পারে। প্যানিক তো ওর হবার কথা...'

—'আমার ভীষণ ভয় করছে, কৌশিক। রণজয় যদি ফের কিছু করে বসে...'

—'ও তুমি ভেব না বলছি না। ও খবরটা পেলে দশটা তালা মেরে খাটের তলায় ঢুকে যাবে। মোর ওভার রণজায়দা ওর বাড়ি চেনে না, হোয়্যার অ্যাবাউট্স্ জানে না। সেবার বাইচান্স সামনে পড়ে গিয়েছিল। যাই হোক যে কথাগুলো বললাম শুনো। রাখছি।'

বসাককে খবরটা দিয়েছিলেন ডঃ মিত্র। নিজের ভয়েই। বসাককে কৌশিকও ফোন করল।

—'খবরটা আমি পেয়েছি।'

—'পেয়েছেন? ভালো। মনে হল জানিয়ে দেওয়া দরকার, জানালাম।'

—'সে ভালো। আমি প্রিকশান যা নেবার নিচ্ছি। তবে এবার কিছু হলে—'

—'মানে?'

—'মানে যা বোঝার বুঝে নিন। আপনারা এডুকেটেড লোক...পাগল-ফাগল যাইহোক আমাকে তো নিজেকে ডিফেন্ড করতে হবে...'

—'সে তো হবেই। রণজয়দার খবর পেলে আপনাকে জানিয়ে দেব...'

—'আপনারা কী সব ফালতু অ্যাসাইলামে রাখেন বলুন তো, বার বার পালায় কী করে?'

pathagar.net

—'সে কী মশাই, এত খবর রাখেন আর এইটা জানেন না?'

—'কী?'

—'অনেক খুঁজে এই অ্যাসাইলামটা আমি ঠিক করেছিলাম, এই কারণেই...'

—'কী কারণে?'

—'যাতে দুদিন অন্তর অন্তর পালিয়ে আপনাকে খুঁজতে পারে।'

—'ইয়ার্কি দিচ্ছেন? জানেন আমি কে?'

—'জানি, হরিদাস পাল।'

কৌশিক ফোনটা রেখে দিল। আবার মেখলাকে ফোন করল।

—'শোনো, বসাক খবর পেয়েছিল। আমিও বলে দিয়েছি। তোমাকে জানিয়ে দিলাম।'

—'এখন কী হবে, কৌশিক?'

—'ওফ্, বলছি তো কিছু হবে না। সবটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

—'আচ্ছা।'

বসাক মান্না আর তারককে ডেকে রণজয়ের একটা মোটের ওপর বর্ণনা দিল। বাড়ির আশপাশে ওরকম চেহারার লোক দেখা যাচ্ছে কিনা, পেলে কী করতে হবে, আবার ভুলচুকে বেশি কিছু না হয়ে যায়, এইসব। ওরা সব শুনেটুনে ঘাড় নেড়ে চলে যাচ্ছিল কিন্তু বসাক ফের ওদের ডাকল।

—'আরো শোন্, রোগাপটকা দেখতে কিন্তু পাগল তো। রেগে গেলে ওদের গায়ের অসুরের মতো শক্তি আসে। যা কিছু করতে হবে সাবধানে। আর আমার বাইরের সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল। শুধু কাল রাতে গ্র্যান্ডের উল্টোদিকে যাব—একটা দরকারি মিটিং আছে। যা...'

বসাক জানলা দিয়ে নীচে দেখল। স্বাভাবিক রাস্তাঘাট। কাগজ বিক্রিওয়ালা ওপর দিকে তাকিয়ে চেঁচাচ্ছে। একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। তার থেকে চশমা পরা একটা মোটা লোক নেমে উল্টোদিকের বাড়িতে ঢুকে গেল। পানের দোকানের পাশে, রকে, পাড়ার ছেলেদের ভিড়। পালালি পালালি, আবার মরতে কলকাতায় আসা কেন রে বাবা! তারপর ওই কৌশিক নামে ছেলেটা—ঠিক সময় যদি হাতে পেতুম তাহলে একেবারে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিতুম। সেদিক দিয়ে হাত-পা বাঁধা। তবে সেবারেই দেখেছিল বসাক—বেশ কিছু ইয়ং আইপিএস অফিসার ওর বন্ধু। হত সেই টাইম...আফশোস হয় বসাকের। জামানা অনেক পালটে গেছে। আর তাছাড়া বসাকের বিজনেসগুলোও তো ক্লিন নয়। কানাঘুসো রয়েছে। এক্স-কলিগরা হিংসে করে। লরি নিয়ে ঝামেলা তো লেগেই আছে। তিন-তিনটে জমি কিনেছিল—সেখানে লোকাল লোকেরা প্রোমোটারদের বাড়ি করতে দেবে না। শালা সিপিএম-এর আইনও বসাকের বিরুদ্ধে। একের পর এক ফ্যাচাং। তার মধ্যে শালা, কিছুর মধ্যে কিছু নেই, পাগলার ভয়। পাগলরা যে কেন সুইসাইড করে না। আরে বাবা, গাড়ি চাপা পড়লেও তো পারে, বাঁচা যায়। আর লোকে শুনলেই-বা কী বলবে—বসাক, যার নামে কত লোক মুতে ফেলত, সে কিনা পুরো শুড়ঢা হয়ে গেছে। পাগলটার আবার বউ, ছেলে রয়েছে। শালা নাকি ওদের চিনতে পারে না। ওদের চিনতে পারে না, তা আমাকে কী করে চিনতে গেলে বাবা! না চিনলে চলছিল না? তাও ভালো ছুরি-টুরি কিছু জোটাতে পারেনি। বা ভোজালি, কাতান, ক্ষুর বা সোর্ড। ক্ষুরের কথায় আবার সেই বিচ্ছিরি গলা নামিয়ে দেওয়ার অস্বস্তিকর গল্পটা মনে পড়ে গেল। গল্পটা নির্ঘাৎ ঢপ। কিন্তু থেকে থেকে মনে পড়ে যায়। চামড়ার ফিতেয় চকাচক ঘষছে আর ওদিকে গালে সাবান মেখে আয়নার দিকে তাকিয়ে বসে আছে, জানে না যে ক্ষুর কেন ধার দেওয়া হচ্ছে।

কোনোমতে পাগলটা যদি একটা ফায়ার আর্ম পেয়ে যায়। ধরা যাক, কারো কাছ থেকে কেড়ে নিল। কেনার পয়সা ওর কাছে থাকার কথা নয়। কিন্তু যদি ফাঁকতালে পেয়ে যায়?

'বেলেঘাটার পুলিশবাহিনী আবার পাঁচটি তরুণকে ধরে গুলি করে হত্যা করেছে। সরকার আজ এই নীতিই গ্রহণ করেছে সমস্ত ক্ষেত্রে ও সমস্ত জায়গায়। তারা গুলি করেই বিপ্লবীদের হত্যা করবে। হত্যার বদলা একমাত্র হত্যার দ্বারাই সম্ভবপর। আজকে জনসাধারণকে হত্যা করার চেষ্টা করছে সরকার। তাই জনসাধারণের পক্ষ থেকে আজ আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে হত্যা দিয়ে এই হত্যার বদলা নেওয়া...রাইফেল সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে মাগুরজান থেকে এবং ঘটেছে অনেক জায়গায়, এমনকি বেহালাতেও। এ অভিযান আমাদের রাজনৈতিক অভিযান, আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষা, "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয়।"

পড়ন্ত বিকেলে রণজয় যখন যাদবপুর লেভেল ক্রসিং পার হল তখন দুপাশে গেট পড়ে গেছে। রণজয় যখন হেঁটে এগোচ্ছিল তখন দুপাশ দিয়েই ট্রেন আসছিল। লোকজন চেঁচিয়ে উঠেছিল। রণজয় দুটো ট্রেনের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। চিৎকার, লোকের—ট্রেন থেকে কে যেন কী বলে চেঁচাল, খিস্তি করল। দুটো ট্রেন চলে যেতে রণজয় এগোচ্ছে দেখে,

—'কী হল দাদা, সুইসাইড হল না! আবার ট্রাই করুন।'

—'বেশি সাহস!'

—'ছাড়ুন তো, দেখে বুঝতে পারছেন না? মাথার ঠিক আছে যে দেখে চলবে।'

ওপারে গিয়ে রণজয় সোজা হাঁটছিল। আলো কমছে। পাশের দোকানে হঠাৎ দেখল ঘুগনি, রুটি। খাবারের গন্ধ। কিন্তু এমন সময় খাওয়ার পেছনে নষ্ট করা যায় না। রণজয় পকেটে হাত দিয়ে বিড়ির প্যাকেট আর দেশলাইটা বের করল। পা চালাতে হবে। সামনে অনেক কাজ। মাটি খুঁড়তে হবে। তক্তা সরাতে হবে। মরা মানুষের মতো জড়ানো অস্ত্রগুলোকে বের করতে হবে। সেগুলো নিয়ে ফিরে যেতে হবে। কতদিন তুমি বাইরে আছ রণজয়? কতদিন? এর মধ্যে ছোট্ট কোবা স্কুল থেকে রিকশাভ্যানে বাড়ি ফিরে মেঝের ওপরে ভিজে পায়ের দাগ ফেলে ফেলে হেঁটেছে। মাথাটা ঝিমঝিম করে রণজয়ের। কয়েক লহমার জন্যে। হঠাৎ দৃশ্যমান সন্ধ্যা, সন্ধ্যার আলো, রিকশা, ভিড় টাল খেয়ে গেল। কতদিন ওষুধ খাওনি, ঘুমোওনি, বাড়ি ফেরনি রণজয়? টিউবওয়েল থেকে একটা লোক বালতিতে জল ভরছিল। লোকটা বালতি সরিয়ে নিল। চলে গেল। রণজয় বাঁ হাতে কলটা চালিয়ে হাতে মুখ চেপে জল জমিয়ে খেল। তারপর সরে এসে কলটাকে ভালো করে দেখল। কলটা তো এখানেই থাকার কথা। তাই তো আছে হাত তুলে রাখা মানুষের মতো। তাহলে রাস্তাটা যে বাঁদিকে গেছে সেটা কী কলটার আগে না পরে? আগে তো বাঁদিকে কোনো রাস্তা নেই।

কৌশিক সারাদিন গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেককে খবর দিয়েছে। ফোন করছে। সন্ধেবেলা যাদবপুরে এইটবি স্ট্যান্ডে এসে রতনের খোঁজ করল কৌশিক। রতন রণজয়কে চেনে। এখন যাদবপুর গড়িয়াহাট রুটে অটো চালায়। রতন ওই সময় জঙ্গি ক্যাডার ছিল। রতনের অটোতে সামনে বাবা লোকনাথ। ধূপদানি। রতন দেবনাথের জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়াল কৌশিক। পেল অনেক পরে। রতন সবটা শুনল। শুনে বলল যে খেয়াল রাখবে। অবশ্যই রাখবে। কৌশিক বলল আরো কেউ যদি রণজয়কে চেনে তাকে যেন রতন জানিয়ে দেয়। সাড়ে আটটার সময় কৌশিক বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে মেখলার কাছে গেল। গিয়ে—দেখল মা, ছেলে মুখভার করে বসে আছে। ঢুকতেই মেখলা ঘরের টিউবআলো জ্বালল। মেখলার চোখ ফোলা। কোবা উস্‌কোখুস্‌কো।

pathagar.net

—'বাঃ এই নাকি এঁরা স্টেডি থাকবেন। বলেছি না—পুরো দায়িত্বটা আমার। তোমাদের নিয়ে পারা গেল না।'

—'কী হবে কৌশিক?'

—'কী আবার হবে। রণজয়দাকে আমি খুঁজে বের করব। বহাল তবিয়তে ফেরত পাঠিয়ে দেব।'

—'কিন্তু যদি না পাওয়া যায়?'

—'ওফ্, এই নেগেটিভ কথাগুলো আমি স্ট্যান্ড করতে পারি না। খুঁজে আমি পাবই। যাইহোক সারাদিন ধরে ঘুরছি। এরপর হয়তো সারা রাত ধরেও ঘুরতে হবে। এক কাপ স্ট্রং টি আর গেলবার মতো কিউট কিছু যদি থাকে দেবে, না চলে যাব?'

—'দিচ্ছি, তুই কোথায় কোথায় গেলি?'

—'সে জেনে তুমি কী করবে? পুরো এক বোতাল ঠাণ্ডা জল আনো তো।'

মেখলা জল আনতে গেল। কোবা চুপ করে সোফাতে বসে ছিল। কৌশিক ওর পাশে ধপাস করে বসে কাঁধটা জড়িয়ে বলল,

—'কি রে, কৌশিককাকুর কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?' কোবা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মেখলা এসে জলের বোতলটা রেখে কোবাকে কাঁদতে দেখে নিজে কাঁদতে শুরু করল।

—'সারাদিন ধরে আমাকে বলছে স্টেডি থাকো, কেঁদো না। আর নিজে...'

কৌশিক কোবাকে কাছে টেনে নেয়।

—'এই যে ইয়ং ম্যান। কী হচ্ছেটা কী শুনি? আমার নিজের কি খুব ভালো লাগছে। বাট্ ইউ, তোমাকে স্ট্রং হতেই হবে। যে কোনো এক্সিজেন্সি হলে কে আমার সঙ্গে থাকবে? তোকেই তো থাকতে হবে। তোমার বাবা একজন সাহসী লোক। তার ছেলের কাছে এভরিওয়ান এক্সপেক্টস—বি স্টেডি কোবা। আরে! মা ছেলেতে মিলে তোমরা কী শুরু করলে বলো তো?'

মেখলা চা করতে গেল। ফোন বাজল। কোবা ধরে মাউথপিসটা চেপে ধরে কৌশিককে বলল,

—'বসাক!'

কৌশিক গিয়ে ফোনটা ধরল।

—'হ্যাঁ, বলুন মিস্টার বসাক।'

—'একি রে বাবা। গলা পাল্টে গেল। কে কথা বলছে?'

কৌশিক বুঝতে পারল বসাক কয়েক পেগ চড়িয়েছে,

—'গলা শুনে চিনতে পারছেন না? সকালে আপনাকে এইচ. ডি. পল বললাম?'

—'এটা কী মেখলা সেনগুপ্তর বাড়ি?'

—'ইয়েস, সার। এটাই মেখলা সেনগুপ্তর বাড়ি।'

মেখলা এসে দাঁড়ায়। কোবাও ঘেঁষে এসেছে। পিংকি ঘরে ঢুকে তিনজনের দিকে তাকিয়ে।

—'আপনি কে কথা বলছেন ত্যাড়াত্যাড়া।'

—'শুনন, লেটেস্ট খবর আপনাকে দিচ্ছি।'

—'ধরা পড়েছে? ক্যাপচার্ড?'

—'না, ধরা তো পড়েইনি। উপরন্তু এবার সঙ্গে কী আছে বলুনতো?'

—'কী?'

—'এ.কে ফর্টিসেভেন।'

—'সকালে আপনিই ইয়ার্কি দিচ্ছিলেন, না? এখন ওই বাড়িতে বসে ইয়ার্কি দিচ্ছেন!'

—'ইয়ার্কি নয়, মিস্টার বসাক। আপনি লালবাজারে একটা ফোন করে জানিয়ে দিন। রণজয়দা একটা এ.কে ফর্টিসেভেন নিয়ে আপনাকে খুঁজছে। জানিয়ে দিন।'

—'ইউ নট নো হুম ইউ টক, আমি হলাম বসাক।'

—'চুপ! রাস্কেল। তাহলে তুমিও শুনে রাখ বসাক অ্যান্ড কোম্পানি, এখানে আর যদি তুমি ফোন করো তাহলে তোমার ওই হায়ার্ড ক্রিমিনাল দুটোকে আমি অ্যারেস্ট করিয়ে দেব। স্কাউন্ড্রেল!'

—'এই, এই মশাই, গালাগালি করছেন কেন? আমি তো কিছু বলিনি।'

—'বলবেন না। সকালে আপনাকে তো বললাম খবর পেলে জানাব। কোন সাহসে আপনি এখানে ফোন করেছেন?'

—'সাহসে নয় ভাই। টেনশন হচ্ছে তো। তোমাকে মানে আপনাকে অ্যাটাক করলে বুঝতেন।'

—'ঠিক আছে, টেনশন হচ্ছে তো আরো দুতিন পেগ মাল চড়িয়ে নিন। তবে জানবেন, ইউ আর আন্ডার সারভেইলান্স। অ্যান্ড নেভার ফরগেট, আমার নাম কৌশিক মিত্র। ঠিক আছে?'

—'খুব ঠিক আছে ভাই। তবে আমিও কিন্তু ত্যাঁদড়ামি করতে জানি।'

—'ফের বাঁদরামি হচ্ছে?'

কোবা হেসে ফেলে। মেখলাও হাসে।

—'কেন, কী বাঁদরামি করলুম?'

—'এখান ফোন করেছেন কেন? হোয়াই?'

—'আরে বাবা।'

—'কোনো আরে বাবা নয়। এখানে ফোন করবেন না। দরকার হলে আমাকে করবেন। বাড়িতে। নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে—রণজয়দার কোনো হার্ম যদি হয় তাহলে আপনি ও আপনার ওই বডিগার্ড আর সিকিউরিটি ঘেঁচুকলা আমি একেবারে ফিনিশ করে দেব।'

—'এ তো থ্রেটনিং হয়ে যাচ্ছে ভাই?'

—'হ্যাঁ হচ্ছে। হবে। শোনো বসাক, কান খুলকে শুন লো, তোমার, তোমার বডিগার্ড, তোমার সিকিউরিটির ঢপ, সব কিছুর ওপরে পুলিশ নজর রাখছে। তোমার কিছু হবে না। আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ। কিন্তু তুমি যদি উজিয়ে কিছু করতে যাও তাহলে কিন্তু হামসে বুরা কোই নেহি হোগা।'

এবারে কোবা জোরে হেসে ওঠে। মেখলা চা আনতে গিয়েছিল।

—'হাসল কে? বলছি হাসছে কে?'

—'কে হাসল? শুনবে? যার কাছে এ.কে ফর্টিসেভেন আছে, সে।'

—'অ্যাঁঃ আমি এখুনি লালবাজারে ফোন করব।'

—'লালবাজারে কেন, তুষার তালুকদারকে বলো, রণজয় সেনগুপ্ত এ.কে ফর্টিসেভেন নিয়ে তোমাকে খুঁজছে।'

—'বলব। তাই বলব।'

—'সকালে তোমাকে কী বলেছিলাম মনে আছে?'

—'কী?'

—'হরিদাস পাল।'

pathagar.net

—'হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

—'পুরোটা বলিনি। আগে একটা লাইন আছে।'

—'জানি, বালস্য বাল!'

কৌশিক ফোনটা রাখে। রেখে দুপাক ঘুরে যায়। বসে। টোস্ট খায়। চা খায়। ওরা তিনজনে রণজয়ের গল্প করে। নর্থ বেঙ্গলে যাওয়ার আগে মেদিনীপুরে কী হয়েছিল। কলকাতার এক সিম্প্যাথাইজার কবি বই-এর মধ্যে কুরে বসানো একটা রিভলভার ডেলিভার করতে এসে মাতলামি করে কী কেচ্ছা করেছিল। মালটা ডেলিভার করছিল ঠিকই কিন্তু ওকে পরে বালেশ্বর দিয়ে ট্রেনে ফেরৎ পাঠানো হয়। জেলে পট্টির মাল আর মাছ ভাজা খেয়ে, গলায় ঝিনুকের মালা পরা, তলায় শুধুই আন্ডারওয়্যার। বিকট সেই মদ্যপকে দেখে পুলিশ কিছু বুঝতেই পারেনি যে মাল ও প্রায় খায়নি। রণজয় সেই কবির নাম কৌশিককে বলেনি। কৌশিক তুখোড় ছেলে। কিন্তু অনেক খোঁজ করেও কিছু জানতে পারেনি। ওকে কবি না বলে প্রাণী বলাই ভালো। ঝাউবনে ঘুমোত। দীঘার বে কাফের দোতলায় রুমালের ভাঁজ খুলে কাঁকড়া ছেড়েছিল। মহিলারা-চেঁচামেচি করেছিলেন। সেই কবি ছিল রণজয়ের বন্ধু। কিন্তু রণজয় কখনো তার নাম বলেনি।

বাঁদিকের রাস্তাটা পেয়ে গেল রণজয়। গোড়ার দিকটা দিকটা তেমনই আছে। মাটি, খোয়া, এবড়ো-খেবড়ো। হ্যাঁ, সেই নিচু, নিচু আলো-কম ঘরগুলো পেরোতেই চোখে বাঁধা লাগে। এখানে একটা ডোবা ছিল। একটা ক্লাবের ছাদের ওপরে বাটির মতো একটা জিনিস উল্টো করে লাগান। জোরে গানের শব্দ হচ্ছে। রাস্তাটার গোড়ার দিকটা কিন্তু পাল্টায়নি। ডোবাটার পরেই অনেকগুলো কলাগাছ ছিল। রণজয় এগোয়। কাঁটাতারের বেড়ায় ধাক্কা খায়। একটা বোর্ড। জলের ফিল্টার তৈরির কারখানা। এখানেই তো দুই ভাই, চুনি আর বলরাম থাকত। ওদের বাড়িটার কাছ ঘেঁষে একটা জলা ছিল, না? জলাটায় বর্ষার সময় ভালো জল হত। মাছ ধরার মাচায় বসে বোমা বাঁধা হত। একি? কংক্রিটের রাস্তা কি জলা মাড়িয়ে তৈরি হয়েছে? জলাটারই এই কোণায় তো ইলেকট্রিকের পোস্টটা ছিল, যেটা থেকে উত্তর দিকে গেলে শ খানেক পা—রণজয় চারতলা, নতুন, আলো ঝলমলে বাড়িগুলোর সামনে থমকে দাঁড়ায়। তাহলে জলাটা কোথায়? ভীষণ আলোয় চমকে যায়। একটা মারুতি গাড়ি পেছনে দাঁড়িয়ে। স্টিয়ারিঙে একটা মেয়ে। গাড়িটা হর্ন বাজায়। রণজয় সরে দাঁড়ায়। গাড়ির থেকে মুখ বের করে কয়েকটা বাচ্চা চিৎকার করে বলে,

—'থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কেল।'

আবার টাল খাচ্ছে। তাহলে ওই যে কংক্রিট বাঁধানো জায়গাটায় সুন্দর চেহারার ছেলেরা ব্যাডমিন্টন খেলছে আলোয় ওখানেই কি? নাকি, ওই দোকানটার তলায়? দোকানের মধ্যে টিভি চলছে। কোকা কোলা, পেপসি। এভারেডি ব্যাটারির চিৎকার—গিভ্ মি রেড। রণজয় রাস্তার ধারে বসে পড়ে। বড় দুর্বল লাগে। এইসময় যে লোকটা একটা পা ফেলে, দুটো ক্রাচে ভর করে এগিয়ে এসেছিল সে বলল,

—'বাড়ি খুঁজছেন? কত নম্বর?'

রণজয় উঠে দাঁড়ায়। মুখোমুখি।

—'বাড়ি নয়, রাইফেল!'

লোকটা ঝুঁকে পড়ে রণজয়কে দেখে।

—'মিলনভাই, তুমি!'

টেক-নেমটা রণজয়ের মাথায় আছড়ে পড়ে।

—'তুমি, তুমি কে?'

—'মিলনদা, আমি সুশীল...তুমি মিলনদা, বেঁচে আছ?'

রণজয় লোকটাকে দেখে।

—'সুশীল! সুশীল! সুশীল, আমাদের রাইফেলগুলো কোথায়?'

সুশীল রণজয়কে চুপ করতে বলে।

—'চুপ করুন। মিলনদা, আপনি!'

—'হ্যাঁ, আমি!'

—'ওর ওপর বাড়ি উঠে গেছে। সব ফ্ল্যাট বাড়ি। কিচ্ছু নেই।'

—'মানে?'

—'আশুদা মরে গেল। আপনি চলে গেলেন! কত কী হয়ে গেল মিলনদা। কোথায় ছিলেন তখন?'

—'কোথায় ছিলাম?'

—'মিলনদা, ও রাইফেল টাইফেল কিচ্ছু নেই। সব ফ্ল্যাটবাড়ি হয়ে গেছে। ও জলা নেই। কিচ্ছু নেই।'

—'কিন্তু আমার রাইফেল। মাটির তলায় আমরা রেখেছিলাম না। খুব দরকার! ওরা মারছে।'

—'মদনদাকে তোমার মনে আছে। মিলনদা! সেই যে বোমা বাঁধার সময় বার্স্ট হয়েছিল। মুখ পুড়েও গেল। বলল, মদ দে, মদ দিয়ে আমাকে বেহুঁশ করে দে।'

—'হ্যাঁ, মদন কোথায়?'

—'নেই। ও রিকশ চালাত। পরে দণ্ডকারণ্যে চলে যায়। আমারও পা চলে গেল। এখন ইস্তিরি করি!'

—'কিন্তু আমার রাইফেল! আমার রাইফেলের কী হবে?'

—'ও নেই। সব বাড়ি উঠে গেছে। সেকি আছে? সব মাটি হয়ে গেছে। মিলনদা, আমি কিন্তু সিপিএম হয়ে গেছি। ইস্তিরি করি। এইসব ফ্ল্যাটবাড়ির জামাকাপড়। অনেক পাই।'

—'কিন্তু, কী নাম বললে, হ্যাঁ, সুশীল, আমার আর্মস-এর কী হবে? লড়াই যে আমাদের করতেই হবে সুশীল!'

—'মিলনদা, আমি বলব কি তুমি এখান থেকে চলে যাও। পুরনো লোকেরা চিনতে পারলে অসুবিধা হতে পারে। মানে ওই বন্দুক টন্দুকের কথা শুনলে।'

—'সুশীল, তোমার একটা পা নেই। কেন?'

—'দুইখানা গুলি লেগেছিল। বিষিয়ে গিয়েছিল। গেনরিন না কি যেন বলে।'

—'সুশীল, সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। আমরা একটা গর্ত খুঁড়েছিলাম। মানুষের মাপের বড় গর্ত। তলায় ইট দিয়ে তার ওপরে পলিথিনের চাদর আর চট দিয়ে বাঁধা দু-দুখানা রাইফেল...'

—'মিলনদা, চলো, তোমাকে এগিয়ে দিই।'

—'রাইফেল ছাড়া আমি কোথায় এগোব?'

—'ওসব আর ভেব না মিলনদা, ভুলে যাও। এখন থাক কোথায়?'

—'কী! থাকি একটা ঘাঁটি এলাকায়। কিন্তু রাইফেলগুলো আমার যে বড় দরকার ছিল।'

—'এস। তোমাকে চেনা রিকশা ধরিয়ে দিই। তোমাকে সুকান্ত সেতু অব্দি নিয়ে যাবে।

pathagar.net

একটু হেঁটে উঠলেই মেলা বাস, মিনি পেয়ে যাবে।'

ব্রিজের তলায় রিকশার ভাড়া বের করতে গিয়ে রণজয়ের পকেট থেকে টাকা পড়ে গিয়েছিল। রিকশাওয়ালাও দেখতে পায়নি। পরদিন সকালে এক ভদ্রলোক মর্নিং ওয়াক করতে গিয়ে দোমড়ানো টাকাগুলো পান। বেশি নয়—আশি টাকার মতো। ব্রিজের তলায় একটা ফাঁকা জায়গায় হরিসভার কীর্তনের আসর বসে। রিকশাওয়ালা, দোকানদার, সন্ধ্যাবাজারের ব্যাপারিরা হরিনাম করে। সেখানে প্রণামীর বাক্সে টাকাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক।

বাসে বসে রণজয় দেখল ফাঁকা। বাস উড়ছে। ঠাণ্ডা বাতাস ব্যাগি স্পোর্টস শার্ট ফুলিয়ে দিচ্ছে। তুলকালাম স্পিড। কন্ডাক্টর রণজয়ের পাশে বসে টিকিট চাইল। রণজয় পকেট হাতড়ে কিছু খুচরো পয়সা, দুটো এক টাকার কয়েন আর পাঁচ টাকার একটা নোট বের করল। আরো টাকা ছিল যে! অবশ্য টাকাটা ম্যাটার করে না। রাইফেলই পাওয়া গেল না, রাইফেলের ওপরে বাড়ি উঠে গেছে, ভিতের মধ্যে ঢুকে গেছে, প্রোথিত এক অজানা অন্ধকার মৃত্তিকাগর্ভে, সেখানে রাইফেলগুলো এক সময় মাটি হয়ে যাবে। রণজয় কন্ডাক্টরের দিকে বিষণ্ণ মুখে তাকায়,

—'রাইফেল পাওয়া গেল না।'

কন্ডাক্টার বলল,

—'এ বাস আপনার রাইফেল রোড যাবে না।'

রণজয়ের কথাটা শুনে খুব হাসি পেল। টাকা নেই, রাইফেলও নেই। রণজয় হা হা করে হেসে উঠতে কন্ডাক্টর ঘাবড়ে উঠে গিয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল। রণজয় আরো জোরে হেসে উঠেছিল। বিপ্লবী হলেই যে কাঠখোট্টা হতে হবে কে বলেছে? বিপ্লবীরা হবে রোম্যান্টিক। ভেঙে পড়লে চলবে না। স্বপ্ন দেখতেই হবে। সেই সঙ্গে লড়তে হবে। রণজয় এখন যেটা করছে সেটা গেরিলা অ্যাকশন না মোবাইল যুদ্ধ? হঠাৎ কমরেড লিন পিয়াও-এর কথাটা মনে পড়ে গেল, 'তোমরা তোমাদের কায়দায় লড়, আমরা আমাদের কায়দায় লড়ি। যখন জিততে পারি তখন আমরা লড়ি, যখন জিততে পারি না তখন আমরা সরে পড়ি।' রণজয়, ভুলে যেওনা তুমি একজন পেটিবুর্জোয়া কমরেড। তোমার তো ভুলচুক হবেই! কিন্তু রাইফেলের ওপরে বাড়ি উঠে যাওয়ার ভুলটা কার? রণজয় ছুটন্ত বাসের জানলার বাইরে ধাক্কা খাওয়া হাওয়াকে বলে, 'আমার ভুল হতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে লি লি সান বা ওয়াং মিং-দের মতো আমি পালিয়ে যাব।'

রণজয় যে জায়গাটায় বাস থেকে নামল তার উল্টোদিকে একটা পার্ক। পার্কের রেলিং ঘেঁষে ছন্নছাড়াদের ঘরবাড়ি। নোংরার গাদা। রণজয় একপাশে একটা উঁচু জায়গায় বসল। উঁচু জায়গাটা হল জমে যাওয়া কয়েকটা সিমেন্টের বস্তা।

একটা বিড়ি ধরাল রণজয়। রাস্তায় হলদেটে চড়া আলো। চোখে কেমন গরম লাগে। বিড়ির ধোঁয়া ছড়িয়ে যায়। এই আলোগুলো দেখতে ভালো লাগছে না। এইসব আলোর মধ্যে বড় বেশি চিৎকার রয়েছে। রণজয় উঠে হাঁটতে থাকে।

৬

৫.১১.৯৪

রণজয়ের ডায়েরিটা মন দিয়ে পড়ছিলেন ডক্টর দাম। কোনো লেখার ওপরেই কোনো তারিখ নেই। দিন আলাদা করার জন্য বোধহয় আড়াআড়ি দাগ কেটে কেটে আলাদা করা।

'আজকে বিজয় খুব চেঁচাবে। হেক্সিডল ফোর্ট তিনবার করে কোবা কোবা মেলি। বাকো। ইস্কুল ছিল না। চেকোস্লাভাকিয়া সম্বন্ধে পরিমলবাবুর লেখার ভুল হল ক্যাপিটালিজম এরকমই করবে আমিলিন রণ। মহিতোষ ন্যাংটা। বাব বাবু বাবা। শেয়াল ডাকল। শুনি চরম দজং লেনিন লেনিন।'

'একটা পিঁপড়েকে তেড়ে গেল। পোকা। পিঁপড়ে পালাল। ভুল হল। মসক বিচার হল। ঠিক হল। জিনভিয়েভ কামেনেভ বুখারিন চকর ঠিক হল। মেলি ভালো। ঠিক হল। যাব। মহীতোষ ন্যাংটা। ঠিক হল। বাবা এল। গেট হল। ভুল হল। বথা পায়।'

আবার কখনো লেখা অনেক গুছনো।

'বিষ্টির জল পেয়ে উইপোকা বেরল। দুইজন গিরগিটি তাদের খেল। ফুলের বাগানে। কেউ দেখেনি। কোবা খুব ভিতু। ঘেরাও ও দমন। রণজয়।'

'টানেল ও মাইন। কাগুজে বাঘ। জনগণের ওপর ভরসা রাখুন। পার্টির ওপর ভরসা রাখুন। শ্রেণীসংগ্রামের প্রত্যেকটি স্তরে রাজনৈতিক কাজের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটাই চেয়ারম্যানের শিক্ষা। রণজয়।'

ডক্টর দাম ডায়েরিটা বন্ধ করলেন। ওষুধ না পড়ার ফলে রণজয়ের কী হতে পারে সেটা ভাবতে লাগলেন। ঘুম আসার কথা নয়। বড়জোর একটা ঝিমুনির ভাব আসবে কিন্তু তাও থাকবে না। রণজয় কী করছে বা কী করতে চায় তার ওপরে নির্ভর করবে ও কতটা উত্তেজিত হয়ে পড়বে। সেরকম কিছু হলে সাংঘাতিক রেগেও যেতে পারে। সামান্য যে চটকা আসবে তার মধ্যে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখতে পারে। তখন খুব ভয় পেয়ে যেতে পারে। রাগে বা ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লে অনেক কিছু করে ফেলতে পারে। তাছাড়া কী খাচ্ছে এই কদিন ধরে? ওই তো রোগা, হাড়জিরজিরে চেহারা! সারা গায়ে টর্চারের দাগ। গত বছর একবার দাঁতের ব্যাথায় খুব কষ্ট পেয়েছিল। ইনফেকশন হয়ে গোটা মুখটা বীভৎসভাবে ফুলে গিয়েছিল। সেরকম যদি হয়। যদি চোট পায়! গাড়িচাপা পড়ে! ধাক্কা খায়। এই হাজার হাজার গাড়ির মধ্যে রণজয় নিজেকে বাঁচাতে পারবে? আবার রণজয়ের ডায়েরিটা খুললেন ডক্টর দাম। এবারে শেষ দিকের পাতাগুলো দেখলেন। শেষদিকে লেখা প্রায় নেই। কিন্তু ছবি আছে। মাছ আর পাখির ছবি। মাছের গায়েও পাখির মতো বড় বড় ডানা। কিছু ইংরেজি অক্ষর। আবার পাখির ছবি।

সকাল থেকে তিন-চারটে ফোন পেয়েছিল কৌশিক। রণজয়ের পুরনো বন্ধুদের। কেউই খবর পায়নি। এরই মধ্যে যাদবপুর থেকে রতনের ফোন পেল কৌশিক একটু বেলায়।

—'খবর পেয়েছি কৌশিকদা কিন্তু সেখানে নেই। চলে গেছে।'

—'কোথায়?'

—'সকালে সন্তোষপুরে গিয়েছিলাম, বোনের জামাইকে একটা খবর দিতে। ঠ্যাং-কাটা সুশীলের সঙ্গে দেখা হল। সুশীলকে চেনেন?'

—'না!'

—'খুব অ্যাকশন করত একসময়। ওর ওখানে কাল সন্ধেবেলা মিলনদা এসেছিল। ও দেখেছে

উল্টোপাল্টা বকছে। রাইফেল না কিসের খোঁজ করছে। ও রিকশ ধরে সুকান্ত সেতু পাঠিয়েছে। বলেছে ওখান থেকে বাস ধরে নিতে।'

—'কাল কখন?'

—'সন্ধে মানে এই আটটা ফাটটা হবে।'

—'আর কিছু বলল ওই সুশীল?'

—'বলল ভালোই দেখেছে। একটু যেন খুঁড়োচ্ছিল।'

—'ইস্, তোমার সঙ্গে দেখাটা হলে কত ভালো হত।'

—'আমি নজর রাখছি কৌশিকদা।'

—'আচ্ছা ভাই, অনেক ধন্যবাদ। কিছুটা চিন্তা কমল।'

—'রাখলাম তাহলে।'

—'আচ্ছা।'

ডঃ দাম আর মেখলাকে খবরটা দিল কৌশিক। কিন্তু কী বলল রতন? রাইফেলের খোঁজে! একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেল কৌশিক। জয়িতাকে বলল আজ তাকে অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্যে সেন্টারে যেতেই হবে। তাজিক একটা ডেলিগেশন আসবে। সে ব্যাপারে কয়েকটা চিঠিপত্র লিখতে হবে। খবর নিতে হবে। কোনো ফোন এল যেন জয়িতা তাকে সেন্টারে জানায়। কোনো ফোন আসেনি।

ফোন এসেছিল মেখলার কাছে। পার্থর। পার্থর ফোন যেমন হয়, চালাক ফোন। ধরেছিল কোবা। তখন মাথায় কোবার নতুন প্রমিস। বাবার যদি কিছু হয়ে যায়, যদি বাবা রাস্তায় গাড়িচাপা পড়ে বা কোনো কারণে, জলে ডুবে বা আগুনে পুড়ে বা বুট-বুলেটে জেরবার হয়ে মরে যায় তাহলে কোবা তার কল্প-বিজ্ঞান উপন্যাসের তিনটি পর্ব কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ছাদ থেকে উড়িয়ে দেবে যার নির্গলিতার্থ হল স্বপ্নর শব্দময় ছবি তোলার কিঞ্জলের যে বিপুল আয়োজন তা বাতাসের ঢেউয়ের আসা যাওয়ার অনন্ত সমুদ্রে লোপাট হয়ে যাবে। এরপর কেউ আর কখনো জানবেই না কিঞ্জল কে ছিল, সে কী করতে চেয়েছিল, সে কে, কী এবং কেন। এই আলটিমেট মেজাজের বশেই পার্থকাকুর ফোন ধরে কোবা বলেছিল,

—'না, আজকে নয়। তোমার এখন আসাটা ঠিক হবে না। মা খুব ডিসটার্বড। আমিও। বাবা এখন কলকাতায় কিন্তু কোথায় আমরা কেউ জানি না।'

—'মানে রণজয় আবার অ্যাসাইলাম থেকে পালিয়েছে?'

—'বাবা অ্যাসাইলাম নেই। বাবা কলকাতায়। কোথায় আমরা জানি না। দ্যাটস্ অল্। ঠিক আছে?'

—'না, ঠিক নেই। তুই মেলাকে দে।'

—'সম্ভব নয়।'

—'মানে?'

—'মানে সম্ভব নয়। আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না। মোরওভার, তুমি বেটার কালকে ফোন কোরো। ইনেব্রিয়েটেড লোকদের...'

—'কোবা!'

—'চেঁচালে, না? আমার ওপর চেঁচালে? ঠিক আছে। এসো, এসো। এখনই এসো। আমি নিচে অপেক্ষা করছি।'

—'এসব কথার মানে কী, কোবা?'

—'মানে আমি সহজেই এক্সপ্লেইন করে দেব। এইসময় তুমি এসে আর মাকে ডিসটার্ব করবে না, আমি অ্যালাও করব না।'

—'ঠিক আছে।'

—'রাখছি।'

ঠাস্ করে রিসিভার রেখে দিয়েছিল কোবা। কোবা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। শহর জুড়ে আলো। আজকাল লোডশেডিং কমে গেছে। দূর এ তো দিনের বেলা। এখন কিসের আলো! বোমা ফাটছে। একটা আধটা। অনেক অনেক দূরে। মাথা ধরেছে। মাথা ব্যথা করছে। দুটো ডিস্প্রিন এক গেলাস জলে ফেলল। ফেনামাখা ট্যাবলেট দুটো নাচছে। ভাসছে। অসংখ্য, অজস্র বুদবুদ। ফাটছে আর এক গেলাস জলের সমুদ্রে ছটফট করে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে। গেলাসের জলটা পুরো খেয়ে কোবা নিজের ঘরে যাওয়ার পথে দেখল মা দাঁড়িয়ে। কোবা গিয়ে মা-র কপালে চুমু খেল। বলল,

—'বাবার কিচ্ছু হবে না মা। তুমি দেখে নিও।'

কোবা টর্চার এবং অত্যাচারিতের মনস্তত্ত্ব নিয়ে বেশ পড়াশুনো করেছে এবং এ বিষয়ে সে নিজে একজন তরুণ মনস্তত্ত্ববিদ বন্ধুর কাছেও গিয়েছিল। আসলে সে কোবার বন্ধু ছিল না। বন্ধু রঞ্জনের বন্ধু। বন্ধু হয়ে গেল। বাঙ্গালোর থেকে এম. ডি. করেছে। ভায়োলেন্ট মানসিকতার নানা স্তর ও বিস্তৃতি নিয়ে একটা প্যান এশিয়ান স্টাডি হচ্ছে এক মার্কিন ফাউন্ডেশনের টাকায়—সেই প্রোজেক্টে আপাতত কাজ করছে। এর জন্যে যেমন খালিস্তানি, এলটিটিই, অন্ধ্রের পিপলস্ ওয়ার গ্রুপ, বিহারের এমসিসি ও নাগা, কুকি, মিজো, বোরো বিদ্রোহীদের ওপর স্টাডি চলছে, তেমনই চলছে পাকিস্তানে, আফগানিস্তানে, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া ও কাম্পুচিয়ায়। কাম্পুচিয়াতে ১৯৭৫-এর এপ্রিল থেকে ১৯৭৭-এর মধ্যে নিহতের সংখ্যা ১,২০০,০০০।

ছেলেটির নাম সমীরণ। কোবার চেয়ে সামান্য বড়ই হবে।

—'দেখুন, টর্চার হল বলতে পারেন সর্ট অফ এক্সসেসিভ স্টিমুলেশন। যাকে করা হয়, ধরুন নখের তলায় সুঁচ ঢুকিয়ে দিল বা চোখের ওপরে ব্লাইন্ডিং আলো ফেলে বিশ্রি গালাগালি করল—এটা কোনো কোনো মানুষের কাছে আনইউসুয়ালি ক্যাটাসট্রফিক হতে পারে। ওই মানুষটা তো এর জন্য প্রিপেয়ার্ড ছিল না। টর্চার জিনিসটা নর্ম্যাল হিউম্যান অভিজ্ঞতার বাইরে—আজকাল আমরা যেটা করতে চেষ্টা করি, খুব সাকসেসফুলি বলব না, কনসার্নড্ ইনডিভিজুয়ালকে নিয়ে একটা সাইকো-সোশিও-বায়োলজিক্যাল মডেল তৈরি করার চেষ্টা করি। দেখুন, আলটিমেটলি হল সকলের কোপিং সিস্টেম তো সমান নয়—এখানে তার ব্যাকগ্রাউন্ড, ফ্যামিলি সেট-আপ, পার্সোনালিটি ট্রেইট, হেরিডিটি, এনভায়রনমেন্ট—সবটা বোঝার দরকার। তবে এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত কিছু কথা আছে—এইগুলো ঠিক ঠিক ধরার জন্যে যে ইলাবোরেট সিস্টেম দরকার সে এখানে নেই। কখনো সম্ভব হবেও না। যাইহোক। টর্চারের ফলে যে গণ্ডগোলগুলো হয়—তাকে পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার বলা যায়। ও হ্যাঁ, সবথেকে ভয়াবহ টর্চার কী জানেন তো? এটা হল সলিটারি কনফাইনমেন্ট। এখানে অনেক সময় ইমপেনডিং ডেথের একটা ভয় হয়। এর ফলে ওরিয়েন্টেশন গোলমাল হয়ে যেতে পারে। আমি বেশ কয়েকটা কেস দেখেছি—যেখানে কনটিনুয়াস ক্রনিক সিজোফ্রেনিয়া বা ধরুন খুব অ্যাকিউট ডেলিউশনাল ডিসঅর্ডার হয়ে গেছে। ভিসুয়াল অ্যাগনোশিয়া হতে পারে...হিস্টিরিক্যাল অ্যামনেশিয়ার কেসও দেখেছি... প্যারানয়েড ডিলিউশান... ডিলিউশনাল বিলিভ সিস্টেম... টাইম

অ্যান্ড স্পেস... সাইকোলজিক্যাল টর্চার... তার ড্রিম নাইটমেয়ার, বিজার... লার্গাকটিল... হ্যালোপেরিডল... ক্লোরপ্রোমাজিন... হেক্সিডল প্লাস... নাইট্রোশান... সেরেনেল... ফেনারগান...'

রণজয়ের সব পয়সা শেষ হয়ে গিয়েছিল। হাতে ছিল শেষ কেনা একটা কোয়ার্টার পাউরুটি যেটা রণজয় কুড়োনো একটা পলিথিনের প্যাকেটে ভরে হাতে ঝুলিয়ে রেখেছিল। রণজয় সামনে একটু ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল এবং চারপাশ দিয়ে, নানাদিকে, যে অসংখ্য মানুষ যাচ্ছিল, আসছিল, থামছিল, উবু হয়ে বসে রেসের বই দেখছিল, সাট্টার নম্বর মেলাচ্ছিল বা নানাভাবে বেঁচে ছিল তাদের কেউই রণজয়ের মতো করে, একটু ওপরের দিকে মুখ তুলে সেই মুখটির দিকে তাকিয়েছিলনা। ধোঁয়া ধোঁয়া ধুলোয়, ডিজেল মবিল পেট্রলের ঝাঁঝে, চোখে দূষণ না কান্নার জ্বালা নিয়ে সেই মুখের দিকে তাকিয়েছিল রণজয়। একজন রণজয়কে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। রণজয় ফিরেও তাকাল না। লোকটি রাতকানা বলে সদ্য নেমে আসা সন্ধ্যায় তালকানা হোঁচট খেয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গেই রণজয়ের ধাক্কা লেগেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'সরি'। রণজয় শুনতে পায়নি। ওই তো আলো পড়েছে মুখের ওপর। লোহার উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা। বন্দী। রণজয় ভাবল কমরেড লেনিন বিশেষভাবে তাকেই বেছে নিয়েছেন, তার জন্যেই হাসছেন, এক্ষুনি নেমে আসবেন তারই বুকের মধ্যে, জড়িয়ে ধরবেন রণজয়কে, বলবেন,

—'কেমন আছেন কমরেড রণজয়!'

রণজয় শুনতে পেল। হাতে ঝুলন্ত পলিথিনের নোংরা প্যাকেটে পাউরুটি। রুটি! রুটি! রণজয়ের পেছনে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক দাঁড়িয়ে। ব্যানার, পতাকা, ফেস্টুন উড়ছে। ধরা গলায় গান ধরল একজন—

—ভেদী অনশন, মৃত্যু, তুষার ও তুফান... লক্ষ কণ্ঠে কমরেড লেলিনের আহ্বানের গান একটা সমুদ্রের মতো শব্দ গড়ে তোলে। পেত্রোগ্রাদ! ওই তো, কমরেড লেনিন হাসছেন, স্পষ্ট দেখা গেল। একজন শ্রমিক চিৎকার করে উঠল,

—'কমরেড লেনিন আমাদের সাম্যবাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। সবরকম কষ্ট সত্ত্বেও আমরা আপনার সঙ্গে থাকব।' সমুদ্র সায় দেয়।

—'জমিদারেরা ফিরে এসে আমাদের কাছ থেকে জমি নিয়ে নিতে পারে—এরকম ভয় পাবার কারণ নেই। লাল ফৌজের সঙ্গে ইলিচ ও বলশেভিকরা আমাদের সাহায্যের জন্যে আসবেন।' সমুদ্র মুঠি তুলে সমর্থন করে।

—'কমরেড লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।'

ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে রণজয়! না চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল! ওই, ওই তো সমুদ্র বলছে,

—'কমরেড লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।'

রণজয়, চোখ মুছে দেখ তো, লেনিন মূর্তির দুপাশে কাদের দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সামনের দিকে, কাছে। হ্যাঁ, ঠিক তুমি কমরেড স্তালিনকে চিনতে পেরেছ। কমরেড জে ভি স্তালিন। ১৯১৯ সাল থেকে পলিটব্যুরোর পূর্ণ সদস্য। ওই দেখ কামেনেভ। এল বি কামেনেভ। ট্রটস্কি। ক্রেসতিনস্কি। জিনোভিয়েভ। বুখারিন। মলোটভ। কালিনিন। রিকভ। টমস্কি। কুইবিশেভ। এঁদের ওপরে আলোর কিছুটা পড়েছে তাই হয়তো দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু এর পরেও রয়েছেন সকোলনিকভ, ঝেরঝিনস্কি, ফ্রুনজে, ভরোশিলভ্, রুদজুতাক, পেত্রভ[illegible], [illegible]গলানভ, অরজোনিকিদজে, আন্দ্রিয়েভ, কিরভ, মিকোয়ান, কাগানোভিচ, চুবার, কসিয়র, বমান, সিরৎসভ, বগদানভ, এইখে, ইয়েজভ, ক্রুশ্চেভ... লেনিনকে ধরলে তেত্রিশজন... এর মধ্যে একুশ জনের

মৃত্যু স্বাভাবিক নয়... রণজয়...

রণজয় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে সে জানে না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে তাও জানে না। কী করে জানবে? লেনিন বলছেন,

—'রণজয়, শুনুন, আমি আপনাকেই বলছি...'

—'বলুন, কমরেড লেনিন!'

—'পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের প্রথম জলোচ্ছ্বাস সরে গেছে, দ্বিতীয়টি এখনো ওঠেনি। এ বিষয়ে কোনোরকম বিভ্রম পোষণ করা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হবে। আমরা সম্রাট জারেক্স নই যিনি সমুদ্রকে শেকল দিয়ে আঘাত করতে আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা পরম্পরাকে এইভাবে বোঝার অর্থ কি চুপ করে বসে থাকা, অর্থাৎ লড়াই পরিত্যাগ করা?'

—'না, কমরেড লেনিন!'

—'ঠিক বলেছেন। কখনোই তা নয়। শিখুন, শিখুন, শিখুন! কাজ, কাজ, সবসময় কাজ করে যাবেন!'

—'হ্যাঁ কমরেড লেনিন!'

—'আমাদের তৈরি হতে হবে, খুব ভালো করে তৈরি হতে হবে যাতে ভবিষ্যতের বিপ্লবের ঢেউ এলে তাকে সজ্ঞানে ও সবলে সম্যকভাবে কাজে লাগাতে পারি। এটাই হল আসল কথা।'

—'আমি মনে রাখব, কমরেড!'

—'প্রয়োজন হল অক্লান্ত পার্টি-আন্দোলন আর প্রচার-কাজের, আর তারপর—পার্টির কাজ। কিন্তু সেই ধরনের পার্টির কাজ যার মধ্যে এই ধরনের হঠকারী ধারণা নেই যে, সেটা জনগণের আন্দোলনের স্থান গ্রহণ করতে পারে। আমরা, যারা বলশেভিক, নিজেদের একথা বলতে পারার আগে জনগণের মধ্যে কী কঠিন পরিশ্রমই না করতে হয়েছিল : "প্রস্তুত, অগ্রসর হও।" অতএব, জনগণের প্রতি মন দিন! ক্ষমতা লাভের প্রাথমিক সোপান হল জনগণের হৃদয় জয় করা।'

হঠাৎ আলোগুলো নিভে যায়। অন্ধকার। তখন উল্টো ফুটে হঠাৎ পুলিশের হকার ধরার রেড শুরু হয়েছিল। হল্লার ভয়ে চেঁচামেচি, চিৎকার। এপারেও কিছু লোক ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করল। রণজয় একটু দিশাহারা হয়ে পড়ে। কমরেড লেনিন যদি আরো কিছু বলতেন! রণজয় চিৎকার করে উঠেছিল,

—'কমরেড লেনিন! কমরেড লেনিন!'

রণজয় এগোতে গিয়ে একজনের গায় গিয়ে পড়ে। তাকে জড়িয়ে ধরেই টাল সামলায়—

—'কমরেড লেনিন, আমি রণজ-য়!'

লোকটা ভয় পেয়ে ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। সে ভেবেছিল ছেনতাই পার্টি। আচমকা অন্ধকারের সুযোগ নিয়েছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আলো ফিরে এল। লোকটা দেখল, যে ছেনতাই করতে এসেছিল সে লেনিনের মূর্তির দিকে তাকিয়ে কাঁদছে, গাল গড়িয়ে জল নামছে, হাতে স্বচ্ছ প্যাকেটের মধ্যে কোয়ার্টার রুটি দোল খাচ্ছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে—

—'কমরেড লেনিন! কমরেড লেনিন! কমরেড...'

লোকটা কাছে এসে রণজয়ের কাঁধে হাত রেখেছিল,

—'এ বাবু, বাবু! ও তো সিরিফ স্টাচু আচে। আপনি ডাকলে কথা করবে! কেয়া বেকার লেলিন, লেলিন করচেন।'

রণজয় লোকটার মুখের দিকে তাকাল। তোবড়ানো গাল তার মতোই একটা ভাঙাচোরা মানুষ। রণজয় একটু হাসল। তারপর হাঁটতে থাকল। কিন্তু পায়ে অসহ্য ব্যথা। একবার ভাবল

রুটিটা খাবে। পকেটে দুটো বিড়ি আছে। একটু বসে নিলে হয়। পা-টা টান করে একটু জিরিয়ে নিলে আবার হাঁটা যাবে। তারপর কোথাও না হয় বসে রুটিটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে রণজয়। বড় পেচ্ছাপখানাটার বাইরে যে পাঁচিল রয়েছে তাতে ঠেস দিয়ে বসে বসে ঝিমুনি এল রণজয়ের। ঝিমুনিতে দেখল আবছা আবছা ছবি দেখা যাচ্ছে। পরে বুঝল ওগুলো উল্টোদিকের আলো। পাশে তিন-চারটে ছেলে ছাতার মতো একটা গোল চক্করে অনেক গেঞ্জি ঝুলিয়ে বসে আছে। ওরা একটা আলোও জ্বেলেছে হ্যাজাকের। খদ্দের নেই। দেখতে দেখতে আবার ঝিমুনি এল রণজয়ের।

বসাক নেই রাতে সিল্কের লুঙ্গি আর ঝোলা ফতুয়া পরেছিল। এটা বসাকের নিজের ডিজাইনের ফতুয়া—সাধারণ মাপের চেয়ে বড় এবং যেটা স্পেশাল সেটা হল এতে বড় কলার রয়েছে। ফতুয়ার দুটো পকেটই বেশ ভারি ছিল। একটাতে ছিল ছোট একটা অ্যামেরিকান রিভলভার। অন্যটাতে টর্চ। সন্ধেবেলা ভেবেছিল অল্প ফুরফুরে নেশার জন্য হুইস্কির একটা নিপ টুকটুক করে জল মিশিয়ে খাবে। কাজের কথা বলতে গেলে নেশাফেশা একদম গণ্ডগোলের ব্যাপার। ঝামেলা হয়ে গেলে বেফাঁস কিছু বেরিয়ে যেতে পারে। টেম্পার উঠে যেতে পারে। সাড়ে নটায় গ্র্যান্ড হোটেল আর্কেডের উল্টোদিকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। লোকটা ক্রিম রঙের কনটেসা নিয়ে আসবে। লোকটা পাঞ্জাবি কিন্তু পাগড়ি পরে না। ভবানীপুরে নতুন একটা বার খুলেছে। বসাকের তার সঙ্গে প্রোজেক্টটা অন্য ব্যাপারে। যাইহোক, যা হবার তাই হল। হুইস্কির নিপটা ফুক করে শেষ হয়ে গেল। আবার বড় বোতল থেকে চালতে হল। দামি স্মিরনভ ভদকা। একটু বেশিই ঢালা হয়ে গেল। সেটা অনেকক্ষণ ধরে খাবার চেষ্টা করেছিল বসাক। আবার বেরোবার মুখে মনে হল ওয়ান ফর দা রোড—এবারেরটাও বড় হয়ে গেল—পাতিয়ালা ধাঁচের। মারুতি জিপসিতে ওঠার সময়েই তারক আর মান্না দেখল বসাক মুচকি মুচকি হাসছে আর গুনগুন করে গান করছে। শ্যামসংগীত। তারক মান্নাকে চোখ মারল। মান্না ফিক করে হাসল। বসাক খচে গেল,

—'এই শালা মান্নার বাচ্চা। হাসলি কেন? হোয়াট ফর ইউ লাফ? আমাকে দেখে হাসি পাচ্ছে তোমার?'

—'কি যে বলেন স্যার। আপনি আসার আগে তারক এমন বটকেরা করছিল, তাই মনে করে হাসি এল।'

—'তাই মনে করে হাসি পেল?'

—'বিশ্বাস করুন সার।'

—'ঠিক আছে। যত খুশি হাস। শুধু আমাকে দেখে নয়। জানবে, বসাক ইজ বসাক।'

—'জানি সার।'

রাস্তায় একটা ফিয়াট বেগড়বাঁই করছিল। তারক মুখে কিছু বলেনি। বসাক না থাকলে খিস্তি করত। তারক যে খিস্তি করতে চাইছে বা ছোট্ট একটা ছোঁয়ায় গাড়িটার ব্যাকলাইটটা ভেঙে দেবার জন্য উসখুস করছে সেটা বুঝতে পেরে বসাক বলে,

—'তারক! না। একদম মাথা গরম করবি না। আমাদের তাড়া নেই। ও করছে বলে তোকেও করতে হবে? কক্ষনো না। অলওয়েজ মাথা ঠাণ্ডা। কুল!'

গাড়িটাকে ওভারটেক করল তারক বাঁদিক দিয়ে।

—'তারক! আবার নিয়ম ভাঙলি। খুব অন্যায়। তোদের কেউ ডিসিপ্লিন শেখাতে পারবে না। আমিই পারলুম না। এই মান্না!'

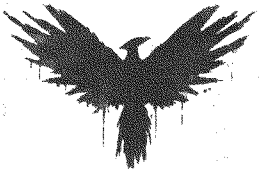

—'বলুন সার।'

—'তোর কাছে বিড়ি আছে?'

—'আপনি, বিড়ি খাবেন সার?'

—'কেন খাব না, দে।'

মান্না বিড়ি লাইটার দেয়। বসাক উল্টো ফুঁ-তে ধুলো ঝাড়ে। ধরায়।

—'বিড়ি বেটার। কাগজের ধোঁয়ার থেকে পাতার ধোঁয়া ভালো। তারক, তুই বিড়ি খাস?'

—'হ্যাঁ, সার, দু-একটা।'

—'গুড। গুড।'

নেশা চড়ছে, নেশা চড়বে। হামা দিতে দিতে লালিপপ। বসাক নামল। এদিক-ওদিক দেখল। হাঁটাহাঁটি করল আলগা।

—'কটা বাজে রে?'

বসাক ঘড়ি পরে না।

—'নটা চল্লিশ, সার!'

—'তার কানে অলরেডি দশ মিনিট লেট! এ একেবারে আমার ধাতে সয় না। টাইম ইজ মানি, কী মনে হচ্ছে, মালটা আসবে, না আসবে না?'

—'কি মরে বলব, সার?'

হঠাৎ বসাক টলে যায়। মান্না ধরে নেয়।

—'এই, গায় হাত দিবি না। ও আমি ঠিক স্টেডি আছি। বসাক ইজ বসাক।'

আরো সময় যায়। বসাক আবার গাড়িতে উঠে বসে। সঙ্গে একটু মাল থাকলে ভালো হত। মাল না থাকলেও নেশার মিটার উঠতেই থাকে। বসাকও সেটা বোঝে। যে নিপটা মেরেছিল সেটা হল দিশি হুইস্কি, কানট্রি মেড ফরেন লিকার। কিন্তু ফরেনের মালের মজা হল নেশাটা টক করে ধরবে না। আস্তে আস্তে বুঁদ হয়ে ছড়াবে। আলোগুলো ফাটছে। ফেটে আলোর ভুরভুরি ছিটকোচ্ছে। অনেকক্ষণ আগেই পেয়েছিল। বসে থাকার জন্যে আরো বেশি লাগছে। কিডনির ফাংশন সম্বন্ধে বসাক খুব সচেতন। রোজ দশ গেলাস জল খায়। সিস্টেমটা ক্লিন রাখে। কিছুক্ষণ হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে আর গুটিয়ে এক্সারসাইজ করে নিল বসাক। একইসঙ্গে ফোর আর্মের কাজটাও হয়ে গেল। দুটো মেয়ে ঘুরঘুর করছে। মাগিগুলো ছিল উল্টোদিকে। গাড়িটা তিনটে লোক নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে দেখে এপারে চলে এসেছে। কেলটে মুখে একগাদা পাউডার চাপানো। নাইলনের শাড়ি। শালা, চেরা শায়াতে শহরটা একেবারে ছেয়ে গেল! ফের গাড়ি থেকে নামল বসাক।

—'তোরা এখানে থাক। মালটা যদি লেট করেও আসে। এখানে লোকজন রয়েছে। আমি পেছনে একটু গিয়ে পুকুরপাড়ে পেচ্ছাপ করে আসছি।'

—'সেকি স্যার! একলা যাবেন?'

—'দূর। পেচ্ছাপ করব তার আবার বডিগার্ড!'

—'কিন্তু স্যার, সেই পাগলটা!'

—'ছাড় তো, কোথায় শালা পাগলা আর কোথায় আমি। তোরা দাঁড়া। আমি আসছি।'

বসাক টলমল করতে করতে এগোয়। দূরের আলোগুলো থেকেও মাল ঠিকরে বেরোচ্ছে। তলপেটে প্রচণ্ড চাপ। হামা দিলে কেমন হয়, বসাক? হামা দিতে দিতে লালিপপ। এ এক মালমৃগয়া বা অভাবনীয় শিকার। সত্তরে যা সম্ভব হয়নি চুরানব্বইতে তা কার সাধ্য যে রুখবে?

pathagar.net

ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রথমটি যদি ট্র্যাজেডি হয় তাহলে দ্বিতীয়টিকে কি ফার্স হতেই হবে? মহামতি মার্কেসের সব কথাই কি ঠিক?

রণজয় যখন মনোহর দাস তড়াগের পাশের উঁচুনিচু, কেৎরে যাওয়া, এবড়োথেবড়ো জমি ভেঙে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছিল তখন কাছাকাছিই কোথাও সিল্কের লুঙ্গি তুলে, আন্ডারওয়্যার গুটিয়ে, পেচ্ছাপ করছিল বসাক। রিভলভারটা ফতুয়ার পকেটে ভারি হয়ে ঝুলছে। রণজয়ের হাতের রুটির প্যাকেটটা দুলছিল। বসাকের হাতে টর্চ। জ্বলন্ত। সেই টর্চের আলোয় বসাক হলদেটে পেচ্ছাপের লাইনটা চিকমিকে করে তুলেছে। মোনা মালটা তাহলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করল? হঠাৎ মুখ তুলে শহীদ মিনারের আলোটা দেখে পুরনো, প্রেত-তাড়িত জায়গাটায় যাবার বিশেষ ইচ্ছে হল বসাকের যেখান থেকে কবে যেন আটটা ছেলেকে রাত্তিরে তুলে নেওয়া হয়েছিল। পেচ্ছাপের তরোয়াল টিপনি ছুরির ফলা হয়ে ঢুকে গেল, টুপটাপ খুচরো ফোঁটা ও শিহরণ। যন্তরটাকে নেড়ে আবার সিল্কের লুঙ্গির তলায় আন্ডারগ্রাউন্ড। মহান্তি-টা মোক্ষম বলেছিল,

—'নিউটনের ফোর্থ ল জানো তো গুরু? যতই নাড়ো শেষ ফোঁটা আন্ডারওয়্যারে লাগবেই।'

সব শালা চুপ। নরম্যাল শহর কলকাতা। এখানে যত ক্রিমিনাল বাড়ছে, ড্রাগ বাড়ছে, প্রোমোটার বাড়ছে, হাই রাইজ, এখানে সেখানে মেয়েছেলের মাংসের কারবার বাড়ছে, লিভিং টুগেদার বাড়ছে, গ্রুপ সেক্স, গোপন 'সেক্সাশ্রম', সেক্সারসাইজ় বাড়ছে তত নরম্যাল হয়ে উঠছে কলকাতা। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক শহরের মধ্যে এই জলসবুজ নোংরার মধ্যে, টর্চের আলোয় আচমকা বসাক দেখল প্যাঙ্গোলিনরা ছুটোছুটি করছে। বসাক দেখল আবছায়া অন্ধকারে কী এক হারামি কুহকে প্যাঙ্গোলিনরা উধাও, বেপাত্তা, ফোট্‌লাস্‌। বরং ডানদিকের ডুমো স্লোপ বেয়ে উঠে আসছে রণজয়। টর্চের আলোয় বসাক দেখল রণজয় ব্যাটম্যানের মতো ডানা নাড়ছে। শুওরের বাচ্চাটাকে ইন্টারোগেশনের সময় লাথিয়ে মেরে ফেললে এভাবে অন্তত দেখতে হত না। এভাবে হত না এই অভাবিত, আকস্মিক, কাকতালীয় সাক্ষাৎকার। ব্যাটম্যান ঝটরপটর করে ডানা নাড়ে। নাকি বসাকই আসলে ব্যাটম্যান? নিয়ান্ডারথাল মানুষের ওপর যখন ডাইনোসোরাস উড়ে এসে এরকম করে ডানা নাড়ত তখন কী করত নিয়ান্ডারথাল মানুষ যে লড়ে লড়ে কায়েম করে চলেছিল তার তড়াগলগ্ন কিম্ভূত পৃথিবী? একেবারে দরজার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা যে গৌতম চক্রবর্তীর চোখের তলা দিয়ে বুলেটটা ঢুকে ব্রেনের মধ্যে চলে যায় ও বহু বছর পরে অ্যান্টি-বডিতে ঘেরা সেই মরা বুলেট নিয়ে গৌতম চক্রবর্তী ফের রাজনীতিতে ফিরে যায়, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, তাকে কী বলা যায়? আজকে আবার জ্যান্ত বুলেট দিয়ে গৌতম চক্রবর্তীকে শেষ করে দিলে কে বা কারা টিটিক্কার দেবে? কে বলতে পারে যে কিম্ভূত পৃথিবীতে গৌতমের আরো বুলেট বরাদ্দ নেই? যে বুলেট ওই ভুল করবে না! এইসব ভাবনা বসাকের তখন মাথায় এসেছিল কি আসেনি জানার কোনো উপায় নেই। জানার উপায় নেই মহানায়ক কুয়াশাচ্ছন্ন ময়দানে কোন নিধন ও শিরচ্ছেদ দেখেছিলেন এবং দুঃস্বপ্নতাড়িত ম্যাজিকের ওই মতোই সন্ত্রস্ত ধোঁয়াছায়ায় বসাককে সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক'-এর হিরো দেখতে পেয়েছিলেন না পাননি বা এসব দেখা, না দেখা নিয়েই তো আমাদের এত চাওয়া পাওয়া। বসাক টর্চের আলোয় রণজয়কে ধরে। এবং রিভলভার চালায়। এই যে তুই দুমড়ে দুমড়ে নোংরা মাটিতে গড়াচ্ছিস এটা স্রেফ তোর ডান হাঁটুতে গুলি লেগেছে বলে। রণজয়কে যুগ যুগ ধরে মারলেও বসাকের মারার নেশা মিটবে না। শালা, ভালো করে দ্যাখ্‌! কিম্ভূত পৃথিবীতে স্বাভাবিক শহরের মাটির ক্যারেকটার! তলায় মেট্রোর নল, আরো তলায় ব্রিটিশ সাহেবদের অধঃপতিত

কামানলিঙ্গ, ভূপৃষ্ঠে দুধ খাওয়ার পর মাদার ডেয়ারির ফাঁকা মাই। ইতস্তত উজবুক ঘাস ও বিষাক্ত পার্থেনিয়াম। কোথাও কোথাও সেই প্রসিদ্ধ থানকুনি। পরের গুলিটা কোমরের ওপরে। স্পাইনাল কর্ড ছিঁড়ে। রণজয় উলটে যায়। টর্চের আলোয় বসাককে দেখে। আমার সঙ্গে ভেনডেট্টা মারাতে এসেছ? বসাক ইজ বসাক। এবার যেখান থেকে বেরিয়েছিলিস সেই জায়গাটা মনে কর্—শালা, সেবার আমাকে মারার জন্যে বাগানের নিড়ানি নিয়ে পালিয়েছিলে, না? উত্তরে রণজয় হাঁ করে। জলের জন্যে। এও একটা প্যারাডক্স—মানুষ কেন মরার আগে জল চায়। জল তো ছিল। তোকে পেয়ে যাব জানলে পেচ্ছাপটা ফালতু খরচ করতাম না। অ্যামেরিকান ক্যানড্ বিয়ার খেয়ে যত পেচ্ছাপ আমি আজ অব্দি ধরে রেখেছি তোদের ওই হেঁপো চারু মজুমদার সাঁৎরালেও পার হতে পারবে না। রণজয়ের হাঁ মুখের মধ্যে গুলি করে বসাক। শাদাকালো দাড়িচুল, মোটের ওপর ইলিপটিকাল মাথাটা বুলেটের বিদারণে রম্বাস হয়ে যায় এবং তার ভুজগুলি ফেটেফুটে হতবাক, অসহায় ঘিলু বেরিয়ে সারেন্ডার করে। হাত, পা কাঁপে ও নড়ে। ও মুরগির গলা কাটার পরে বসাক অনেক দেখেছে। এইসময় চারদিকে লোডশেডিং হয়। স্রেফ টর্চের আলো। মরা, কিলড্, লিকুইডেটেড রণজয়ের শরীরের ওপর থেকে টর্চের আলোকস্তম্ভ ঘুরিয়ে আকাশে ফেলে বসাক। কৃষ্ণ গহ্বর আলো শুষে নেয়। রণজয়ের বডিটা পা দিয়ে অনুভব করে বসাক। ধুকপুক নেই। থিতোচ্ছে। জ্যান্ত মানুষ মড়া হতে হলে থিতোয়। বসাকের হাওয়াই চটি পরা এক জোড়া চামড়া হাড় মাংসের পা হঠাৎ খিমচে ধরে রণজয়। বসাক চিলচিৎকার করে জানান দেয়। টর্চের ব্যাটারিটা কাজ করছে না? নাকি, রিভলভারে গুলি নেই? প্রাক-ইতিহাসের যুগ থেকে রণজয়ের দুটো হাত বসাকের দুটো ঠ্যাং খিমচে খিমচে ওপরে উঠছে। লিফট উঠছে। বাস্কেটের মধ্যে গেঞ্জির বুকে লেখা 'ওয়ান্স ইজ নট এনাফ' একটা নাতনির বয়সী মেয়ের সঙ্গে বেলুনিং করছে বসাক। হঠাৎ বাস্কেটের মেঝে ফাটিয়ে ঘিলুমাখা রম্বাস বেরোয়। এবং বসাকের পা কামড়ে ধরে। রণজয়ের মাথাটা ভেঙেচুরে ঝুরঝুরে হয়ে গেল কিন্তু তার থেকে কোটি কোটি লাল পিঁপড়ে বেরিয়ে আসে। তাদের অনেকেরই ডানা ছিল।

গুলির আওয়াজ আর চিৎকার ধাওয়া করে মান্না আর তারক এসে দেখল বসাক দাঁড়িয়ে। ছেৎরে যাওয়া একটা ডাবের খোলায় ওর পা আটকে আছে। কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না। ওরা বসাককে ধরে নিয়ে গেল। বসাক তখন গোঙাচ্ছে।

মনোহর দাস তড়াগের কোণে, প্রেস ক্লাবের দিকে যে শানবাঁধানো ছাদওয়ালা জায়গাটা রয়েছে সেখানে বসে রণজয় গুলির তিনটে আওয়াজ আর তারপর চিৎকার শুনেছিল। দেখেছিল টর্চের আলো জ্বলছিল। তারপর নিভে গেল। আবছা কি সব নড়াচড়াও দেখা গেল যেন। তারপরে সব শুনশান।

পায়ের ব্যথাটা বেশ বেড়েছে। কিন্তু ব্যথা পাটাই কি যেন শুঁকছে। তারপর বোধহয় রুটির গন্ধটা পেয়ে কালো, কাদামাখা কুকুরছানাটা রণজয়ের কাছ ঘেঁষে এসে বসল।

কুকুরছানাটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রণজয়। কাদা শুকিয়ে শুকিয়ে রয়েছে। কুকুরছানাটা কুঁইকুঁই করে আরো কাছ ঘেঁষে এল। রণজয়ের পাশে, সারা গা দগদগে শাদা একজন কুষ্ঠরোগীও বসেছিল। সারা গায়ে ব্যথা। কুকুরছানাটা গা বেয়ে উঠে এল। উঠে, কুঁকড়ে শুল।

—'রাইফেল পাওয়া গেল না। রাইফেলের ওপরে সব বাড়ি বানিয়েছে। বাড়ি। খুব বড়। বড় বড় বাড়ি। আমি কী করে খুঁড়ে বের করব। কত জোর আছে আমার গায়ে? কোদালটাও ছোট। ও বড় হলে... ভুল হল।'

রণজয়ের খুব কান্না পায়। ডুকরে ডুকরে কান্না পায়। কিন্তু কমরেড লেনিন যদি জানতে পারেন যে রাইফেল পায়নি বলে হাল ছেড়ে দিয়ে রণজয় ডুকরে ডুকরে কাঁদতে চাইছে। কুকুরছানার গায়ের গরমটায় বেশ আরাম লাগছে রণজয়ের। গরমটা ব্যথার দিকে ছড়াচ্ছে। খুব ভালো লাগছে। কোবা পা টিপে টিপে এসে কানের কাছে ফিসফিস করে কি বলছে, বলেই চলেছে, কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে রণজয় কিন্তু কথাগুলোর মানে বুঝতে পারছে না, কোবার ঠোঁট কানে লাগছে রণজয়ের। ভালো হল। কুকুরছানাটা একটু নড়েচড়ে উঠে আবার গুটিসুটি হয়ে শুল, একবার জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। ঠিক হল। জেল গেটের বাইরে হাতেকাচা ধুতি আর খদ্দরের শাদা, ময়লা পাঞ্জাবি পরে বাবা দাঁড়িয়ে। হাতে একটা কাপড়ের থলি। তার মধ্যে একটা টিফিন বাক্স। দুবান্ডিল বিড়ি। দেশলাই। টিফিন বাক্সের ভেতরে কী আছে? বাবা নিজে তৈরি করে এনেছে না কিনে এনেছে? বাবা ভালো। মাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিল বাবার সঙ্গে রণজয়। যেখানে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় বাবা হোঁচোট খেয়ে পড়ায় নতুন কেনা মাটির কুঁজোটা ভেঙে গেল। তারপর বাবার মুখটা। বাবা ভালো। চট আর পলিথিনের চাদরে জড়ানো অনেকটা মানুষের মতো দেখতে শুয়ে আছে। কোবা কথা বলেই চলেছে কিন্তু কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। কোবা ভালো, কোবা ছোট। ঠাণ্ডা বাতাস এসে মেলির আঙুল হয়ে চুলের মধ্যে দিয়ে, মুখের ওপরে বুলোয়। মেলি ভালো। জলের তলায় একটা ঘণ্টা বাজছে তার আওয়াজ নেই। তাড়াতাড়া অন্ধকার। লেনিন কথা বলছেন। হাসছেন। তারও শব্দ নেই। কোনো আলো নেই, শব্দ নেই...কিন্তু জেগে থাকা আছে।

কুকুরছানাটা হঠৎ উঠে গরগর করে ওঠায় রণজয়ের চটকাটা ভেঙে গেল। কুকুরছানাটা লাফিয়ে মেঝের ওপরে নেমে সরু গলায় ডাকতে থাকে। কিছু একটা বড়সড় দেখে ভয় পেয়ে থাকবে। রণজয়ের বড় ভালো লেগেছে কুকুরছানাটাকে। কুকুরছানাটা আবার ফিরে আসে রণজয়ের কাছে। বসে লেজ নাড়ে। কুঁইকুঁই করে। ওর খিদে পেয়েছে টের পাওয়ার সঙ্গে রণজয় বোঝে যে তার নিজেরও খিদে পেয়েছে।

—'খিদে সকলেরই পায়। তোমারও পেয়েছে, আমারও। এইবার পাঁউরুটি খাওয়া হবে। দাঁড়াও, আগে ভাগ করি।'

পাঁউরুটিটা ভেঙে তিনভাগ করে রণজয়। কুষ্ঠরোগীকে বলে,

—'রুটি খাবে?'

ও হাত বাড়ায়। ওকে দিয়ে তারপর কুকুরছানাটাকে দেয়। সে রুটির টুকরোটা পেয়েই চারদিকটা একবার দেখে নেয়। কেউ আছে কিনা। তারপর পরিস্থিতি নিরাপদ বুঝে দুথাবার মধ্যে রুটির টুকরো ধরে আধশোয়া হয়ে খেতে থাকে।

একটু একটু করে ভেঙে ভেঙে খায় রণজয়। এরকম করে খেলে অনেকক্ষণ ধরে খাওয়া যায়। কুষ্ঠরোগীর টিনের কৌটো থেকে একটু জলও খায়। টিনের ধারটা ধারালো। মরচে পড়া। খাওয়ার পর জামার ওপর থেকে গুঁড়োগুলো তুলে পাশে মাটির দিকে ছুঁড়ে দেয়। কুকুরছানাটা ওকে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে ভেবে তড়াক করে উঠেছিল।

—'ওগুলো তোমার জন্যে নয়। তোমার চেয়েও ছোট পিঁপড়েরা আছে। আরো কত ছোটপোকা আছে। তারা খাবে না?'

কুষ্ঠরোগী হেসে উঠেছিল রণজয়ের কথায়। শাদা মুখের মধ্যে শাদা দাঁত। রণজয় পা দুটো মুড়িয়ে কাছে নিয়ে আসে। হাত বুলোয়।

পরের দিন ভোরবেলা কৌশিক বেরিয়েছিল গাড়ি নিয়ে। ভেবেছিল ময়দানের ধারে গাড়িটা

রেখে একটু হাঁটবে বা জগিং করবে। এমনিতে কৌশিক এই রুটিনটা ফলো করে। কিন্তু পার্কস্ট্রিটের মোড় অব্দি গিয়ে কৌশিক দেখল ভালো লাগছে না, গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে। গাড়ি ঘুরিয়ে ফেরার রাস্তায় দেখেছিল প্ল্যানেটেরিয়ামের সামনে দিয়ে একজন হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে কাছাকাছি গিয়ে, ফার্স্ট গিয়ার, প্রায় থেমে থেমে, ফলো করেছিল। সেন্ট পলস্-এর পাঁচিলের সামনে রণজয়কে ছেড়ে কয়েক পা এগিয়ে এসে গাড়িটা পার্ক করে নেমে এসেছিল। দশ হাত দূর থেকে, সামনাসামনি, বলে উঠেছিল,

—'রণজয়দা!'

রণজয় দাঁড়িয়ে যায়।

এগিয়ে এসেছিল কৌশিক।

—'রণজয়দা, আমি কৌশিক!'

রণজয় কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল। মুখে চিনতে না পারার—হাসি।

—'রাইফেল পাওয়া গেল না। সব বাড়ি উঠে গেছে।'

—'এসো, গাড়িতে ওঠো! দাঁড়াও দরজাটা খুলে দিই।'

৭.

pathagar.net

কৌশিক রণজয়কে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। রণজয়ের ব্যাগি স্পোর্টস শার্টের পিঠের দিকটা ছেঁড়া, শুকনো রক্তের দাগ। টেরিকটনের প্যান্ট কাদা মাখা। কৌশিকদের পৈতৃক বাড়িটা পুরনো আমলের। গাড়িবারান্দা সংলগ্ন বিশাল বসার ঘর। সেখানে রণজয়কে বসাল কৌশিক।

—'রণজয়দা, চা খাবে?'

এই লোকটা কী স্পাই? স্পাইরা অনেক সময় অযাচিতভাবে ভালো ব্যবহার করে। রাস্তা থেকে গাড়িতে তুলে নেয়। বাড়িতে নিয়ে যায়। চা খাবে কিনা জিজ্ঞেস করে। এই কদিনে বুঝে গেছে রণজয় যে বিরাট একটা ইনটেলিজেন্স নেটওয়ার্ক কাজ করছে। একদিকে প্রাণপণে রক্ষা করা মুক্তাঞ্চল যে লাল বাড়ির ঘাঁটি, পাহাড়ে নয়, সমতলে, তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য সামরিক হামলা চলছে। অথচ অন্যদিকে আপাতভাবে দেখলে কলকাতায় দেখা যাচ্ছে চাপা উত্তেজনা থাকলেও, সমাজতন্ত্রের জন্য রাস্তার গরিব ভিখিরি ও কোনো প্রাণীর উৎসাহ থাকলেও, যুদ্ধ হচ্ছে না। অন্তত প্রত্যক্ষভাবে। অবশ্য কিছুই যে হচ্ছে না সেটাও ঠিক নয়। তা না হলে সেই পর পর পুলিশভ্যান, জিপ, অ্যাম্বাসাডরের কনভয় সাইরেন বাজিয়ে গিয়েছিল কেন? কেন রণজয়দের গোপন অস্ত্রাগার, যেখানে আচ্ছাদিত শবদেহের মতো অস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তার ওপর সিমেন্ট কংক্রিটের ঢালাই হয়ে যায় এবং তার ওপরে একের পর এক বাড়ি তৈরি হয়? অবশ্য এই লোকটা যদি স্পাই হয়ও এবং শেষ অব্দি রণজয়কে ধরিয়েই দেয় তাহলেও কি খুব দুঃখজনক কিছু ঘটবে? যে অভিমান যা মিশনের জন্য রণজয় এসেছিল তা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। এটা নির্মমভাবে সত্যি। ওদিকে কতদিন স্কুল থেকে ফিরে কোবা তার মা-র সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে ঘরে ঢুকে দেখছে তো দেখছেই যে বাবা নেই। নিরুদ্দেশ। কখন ফিরবে, কিভাবে ফিরবে, ফিরবে কিনা, কেউ জানে না। কিন্তু এই লোকটা নাম জানল কী করে? এই লোকটার সঙ্গে কি ওই লোকটার যোগাযোগ আছে যার ঘরে কুপি জ্বলছিল আর অন্য কারা যেন মদ কিনতে আসছিল। আবার সেই লোকটার কি সেই, সেই রাতের লোকটার

সঙ্গে যোগাযোগ আছে যে মোটরসাইকেলে চড়িয়েছিল। আবার এদের সবার সঙ্গে কি ওই এক পা লোকটার কথাবার্তা হয় যে গোপন অস্ত্রগারের খবর রাখে? এরা কি সবাই মিলে নিজেদের কথাগুলো একজনকে গিয়ে বলে আসে? হঠাৎ কেন জানে না তিনফলা নিড়ানির কথা মনে পড়ে গেল রণজয়ের আর খুব হাসি পেল।

—'রণজয়দা, চা খাবে?'

—'হ্যাঁ, জিভ পুড়ে যাবে এমন গরম। কিন্তু রাইফেল পাওয়া গেল না।'

কৌশিক ওদের ড্রাইভারকে বলল ওখানে থাকতে।

—'আসলাম, তুমি একটু দাদার কাছে থাকবে। ওঁর যদি কিছুর দরকার হয়।'

কৌশিক ভেতরে গিয়ে জয়িতাকে বলল। জয়িতা বলল রণজয়দার কথা সে এত শুনেছে, একবার দেখবে।

—'একটু দরজার ফাঁক থেকে দেখ। খুব সামনে যেও না। কিভাবে রিয়্যাক্ট করবে জানি না। যাই হোক চা-টা আগে চটপট পাঠাও।'

কৌশিক প্রথমে ডঃ মিত্রকে বাড়িতে ফোন করল। ডঃ মিত্র শুনে বললেন যে ডঃ দাম-এর কনট্যাক্ট নাম্বারটা তাঁর কাছে রয়েছে। উনিই ডঃ দামকে খবর দেবেন। কৌশিক তারপর মেখলাকে ফোন করল।

—'মেলাদি, গ্রেট নিউজ! পেয়েছি। না, না, জামাকাপড়গুলো নোংরা—আদারওয়াইজ ঠিকই আছে। একটু লিম্প্ করছে বলে মনে হল, বাট দ্যাটস নাথিং। কোবাকে খবরটা জানিয়ে দাও। কী বলছ? তুমি আসবে? তবে আমি কি বলব, জানো—এসো, কিন্তু ডিরেক্টলি সামনে এস না। আমাকে চিনতে পারেনি। তোমাকেও ধরে নেওয়া যায় পারবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি একেবারে ইমোশনাল হচ্ছি না। এই সময় যেটা দরকার সেটা হল ক্লিনিক্যাল ডিটাচমেন্ট। হ্যাঁ, অলরেডি আমি ডঃ মিত্রের সঙ্গে কথা বললাম। উনি ডঃ দামকে বলে, আই থিংক, নেসেসারি অ্যারেঞ্জমেন্ট সবই করবেন। হ্যাঁ, যেতে পারি। আগে দেখি ওঁরা কী বলেন। আর নতুন কোনো ডেভেলপমেন্ট হলে তোমাকে জানাব। আর শোনো, মেলাদি, তুমি কিন্তু আপসেট হবে না। কথা দিতে হবে। পাওয়া যাচ্ছিল না, সেই টেনশনটা তো টাচ উড কাটল, এখন রণজয়দাকে আবার ওর নিজস্ব নিয়মের মধ্যে পাঠাতে হবে। এ-কদিন ওষুধ খায়নি তো বটেই, ঘুমোয়নিও নিশ্চয়। যাই হোক আমি রাখছি।'

এমনিতে সিগারেট খায় না কৌশিক কিন্তু কখনোসখনো একটা আধটা খায়। ইন্ডিয়া কিংস-এর প্যাকেট আর লাইটারটা বের করে একটা সিগারেট ধরাল। প্যাকেট আর লাইটারটা পকেটে রাখল। লাইটারটার ওপরে লেখা রয়েছে। 'ইউনিভার্সাল স্টুডিওজ'। তার তলায় 'হলিউড'। এটা যখনই কেউ লক্ষ করে তখনই খুব নির্লিপ্তভাবে কৌশিক বলে যে, এনভায়রনমেন্ট বিষয়ক একটা কনফারেন্সে ওকে পল নিউম্যান এটা দিয়েছিল। এত পাজি যে জয়িতার দাদাকেও এটা বলেছিল।

—'নাউ, অপারেশন বসাক।'

ফোন করতে যাবে, এমন সময় ঘরে জয়িতা ঢুকল।

—'রণজয়কে খুঁজে পেয়েছ, সেই আনন্দে সিগারেট খাওয়া হচ্ছে বুঝি?'

—'তোর কি রে হতচ্ছাড়ী? আজ শালা সিগারেট খাব, চোলাই খাব, খেয়ে বাওয়াল করব।'

—'জানো, তোমার রণজয়দাকে দেখে এলাম। ইনস্যানিটি বলো, যাই বলো, চেহারাটার মধ্যে একটা সেজলাইক ব্যাপার রয়েছে। এল গ্রেকোর আঁকা কোনো সেন্টের ছবির মতো।'

—'কথাটা মন্দ বলনি। দা কমপ্যারিজন ইজ রাদার গুড। গড, তোমার সম্বন্ধে আমার অ্যাসেসমেন্টটাই দেখছি পাল্টাতে হবে।'

—'পাল্টাও। এখন আমাকে কী করতে হবে বলো!'

—'তোমাকে ও হ্যাঁ, এক্ষুনি মেলাদি আসবে, সঙ্গে কোবা উল্লুকটাও থাকবে। ওদের ভেতরে নিয়ে আসবে। মেলাদিকে সামনে যেতে দেওয়াটা আমার মতে ডক্টর দামের সঙ্গে কথা না বলে ঠিক হবে না। বুঝলে? আর, এখন চুপ করে পাশের ঘরে গিয়ে রিসিভারটা তুলে শুনে যাও আমি জনৈক মিঃ বসাককে কী বলছি।'

বসাকের নম্বর ডায়াল করল কৌশিক। বেশ কয়েকবার রিং হয়ে গেল কেউ ধরল না। কৌশিক রিসিভার নামিয়ে রাখল। জয়িতা পাশের ঘর থেকে বলল,

—'কী হল? পেলে না?'

—'দাঁড়াও তো! পেলে না? প্রথমে অ্যাডভান্স এলার্মটা দিলাম। এবার তুলবে।'

—'ও'।

আবার ডায়াল করল কৌশিক। আট বার রিং করার পরে ঘুম জড়ানো গলায় একটি পুরুষ কণ্ঠ,

—'কাকে চাই?'

—'তোর বাবাকে চাই। মানে, আপনি মিস্টার বসাকের ছেলে তো?'

—'হ্যাঁ। এত সকালে।'

—'একে এত সকাল বলে না সোনা। সকাল অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। তুমি একটু তোমার বাবাকে দেবে?'

—'বাবা এখন আসতে পারবেন না।'

—'আসতে তো বলিনি। ফোনটি শুধু দয়া করে ধরবেন। এই কথাটা বলে দাও দাদু।'

—'বাবা আসবে না, বাবা ঘুমোচ্ছে।'

—'ঘুমোচ্ছে? ঘুমিয়ে থাকলে মিটে যাবে সব। অ্যাঁঃ, ভেবেছ এই সাতসকালে আমি ইয়ার্কি দিচ্ছি! এক থাবড়া মারব পাঁচটা উইকেট পড়ে যাবে।'

—'কে কথা বলছেন আপনি?'

—'আমি পুলিশের ডিসি। পাঁচুগোপাল ডিহিদার। ডিসিডিডি পিকিউআরএল। বাবাকে ডাকো।'

—'কেন?'

—'কেন? ন্যাকামি হচ্ছে। তোমার নাম কী ছোকরা? তোমার, হ্যাঁ তোমার বাবার সিকিউরিটি ঘেঁচুকলার লোকরা জোকার ফেরোকোটিং কারখানাতে ডিউটি করে। জানো?'

—'হ্যাঁ জানি।'

—'সেখানে ওঃ মার্ডার মোস্ট ফাউল, গতরাতে তেরোটা মার্ডার হয়েছে!'

—'অ্যাঁঃ!'

—'অ্যাঁ ফ্যাঁ নয়, থার্টিন জলজ্যান্ত মানুষ—সবকটি গার্ড, দারোয়ান, অফিসার সব কচুকাটা, তেরোটি ছিন্ন মুণ্ডু গড়ায় ধরণীতলে, ডাক্ বাবাকে, হিঁচড়ে ঘুম থেকে তোল্। স্টুপিড।'

—'হ্যাঁ, ডাকছি।'

ঘটরঘটর করে রিসিভার রাখার শব্দ! ওদিকে হইচই শোনা যায়। জয়িতা এবার হেসে কুটিপাটি হয়। শুনতে পায় কৌশিক।

pathagar.net

—'কি হচ্ছে কি কুশ!'

—'কিছুই হচ্ছে না। একটু ডুশ দিচ্ছি। কৌশিক কূ মাল তুমি জানো না, বসাকও জানে না। এইবার জানবে। ইয়ো হো হো অ্যান্ড আ বটল্ অফ রাম! ক্লাইভের রণবাদ্য শুনতে পাচ্ছ?'

দড়াম ধড়াম দরজার শব্দ। চটির শব্দ কাছে আসে। একবার রিসিভারটি হাত ফস্‌কে যাওয়ায় বিদঘুটে শব্দ হয়।

—'হ্যাঁ... লো?'

—'গতরাতে কত পেগ সাঁটিয়েছিলে চাঁদু যে হাত থেকে ফোন হড়কে যাচ্ছে?'

—'কে কথা বলছেন?'

—'কেন জোনাকি, আমার গলা তুমি চেন না, বস?'

—'ও, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, আপনি সেই কৌশিকবাবু।'

—'সেই কৌশিকবাবু নয়, এই কৌশিকবাবু, এরকম মাল এক পিস তৈরি করে ভগবান ডাইস ভেঙে দেয়।'

—'তা এত সকালে কেন?'

—'ইয়ার্কি দেব বলে!'

—'মানে?'

—'চুপ! তোমাকে জানিয়ে দিলাম বসাক যে রণজয়কে পাওয়া গেছে!'

—'অ্যাঁঃ ক্যাপচার্ড! ক্যাপচার্ড!'

—'খুব আনন্দ হচ্ছে না?'

—'তা একটু তো হবেই।'

—'ঠিক আছে। এ.কে ফর্টিসেভেনটা এবার মিস করল। বেটার লাক নেক্সট্ টাইম।'

—'মানে?'

—'পরের বার আমি একটি হাইলি পাওয়ারফুল উজি সাবমেশিনগান হাতে রণজয়দাকে পাঠাব। নিজেই আপনার বাড়িতে নিয়ে যাব। উজি কী যন্তর জানেন তো? ওই সব তারক, মান্না, গুষ্টির পিণ্ডি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ধুনে দেবে!'

—'আমি পুলিশে খবর দেব।'

—'হ্যাঁ, দিন। প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করুন। তবে নেক্সট্‌বার পালানো অব্দি কোনো চিন্তা নেই। নামটা মনে রাখবেন, উজি। রাখলাম। ঘ্যাচাং।'

জয়িতা এ ঘরে এল। এসে কৌশিককে একটা চুমু খেল।

—'মুখে বিচ্ছিরি সিগারেটের গন্ধ। আর কি জঘন্য করে কথা বলতে পার!'

—'অনেক কিছু পারি জয়িতা, দুঃখ এই যে, কেউ বুঝতেই পারলো না। আমি নীচে গেলাম, রণজয়দার কাছে!'

ফোন বাজল। ডক্টর দামের ফোন। ডক্টর দাম বললেন যে উনি ট্যাক্সি নিয়ে সোজা কৌশিকের বাড়িতে আসবেন। জায়গাটা ভালো করে জেনে নিলেন। জানালেন ডক্টর মিত্র লেক রোডের একটা জায়গায় বলে দিচ্ছেন, ওরা অ্যাম্বুলেন্স পাঠাবে। আর ডক্টর দামকে রাস্তায় অ্যাসিস্ট করার জন্য দুজন ট্রেন্ড অ্যাটেনডেন্টকেও পাঠাচ্ছেন। নীচে নেমে কি সাত পাঁচ ভেবে আসলামকে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দিল কৌশিক ট্যাংক ফুল করে পেট্রোল আনার জন্যে। বাড়ির আরো দুজন কাজের লোককে গেটের কাছে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল কৌশিক। ট্যাক্সি এলেই যারা আসবে নিয়ে আসতে হবে। এইসব তাড়াহুড়োর মধ্যে হঠাৎ কৌশিকের মনে হল যে,

pathagar.net

রণজয়দার সই করা একটা বই নিয়ে গিয়ে বলবে যে বইটা চিনতে পারছে কিনা। যেমন, ভিলহেল্‌ম্‌ লিবনেখত্‌-এর 'অন দা পলিটিকাল পোজিশন অফ সোশাল-ডেমক্র্যাসি' বা কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদে ক্লারা সেৎকিন-এর 'আমার স্মৃতিতে লেনিন' অথবা 'রিডার্স গাইড টু দা মার্কসিস্ট ক্লাসিকস'—মরিস কর্নফোর্থের—লরেন্স অ্যান্ড উইশার্ট লিমিটিড, ১৯৫৩ অথবা গিওর্গি দিমিত্র্যভের 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট অফ দা ওয়ার্কিং ক্লাস এগেসন্ট্‌ ফ্যাসিজম'। ১৯৩৫-এ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম বিশ্বসম্মেলনে প্রদত্ত এই প্রতিবেদনটি কলকাতার 'কালচার পাবলিশার্স' ১৯৬৮-র মে দিবসে প্রকাশ করেছিল। এই বই, আরো কত বই, রণজয়দাকে দেখাবে কৌশিক? রণজয়দা যদি চিনতে না পারে? রণজয়দা কেন বলল যে, রাইফেল পাওয়া গেল না?

ট্যাক্‌সি থেকে মেখলা আর কোবা নামল। কোবার কাঁধে একটা ওভারনাইট ব্যাগ। মেখলার চুল আঁচড়ানো নেই। কোনোমতে শাড়ি পরেছে। কৌশিক তখন রণজয়ের কাছে বসেছিল। একটু আগে বলেছিল,

—'সিগারেট খাবে রণজয়দা?'

—'দাও।'

চশমাটা খুলে বড় টেবিলটার ওপর রাখল রণজয়। তারপর পা ছড়িয়ে চোখ বুজে সিগারেট খাচ্ছিল। হঠাৎ কাশি হল রণজয়ের। সিগারেটটা চায়ের খালি কাপে ডুবিয়ে মারল। এই লোকটা কিভাবে যেন নামটা জেনে গেছে। রণজয় ভাবল মেখলা আর কোবার কাছে কী করে ফিরে পাওয়া যায়। এমন সময় মেখলা আর কোবা ঘরে ঢুকেছিল। নার্ভাস হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল কৌশিক। চশমা না পরা চোখে দুটো আলোমাখা অবয়ব দেখল রণজয়। হাত নেড়ে ডাকল। এরপরের ঘটনাটার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না কৌশিক। কোবাও ছিল না। মেখলা হেঁটে হেঁটে রণজয়ের কাছে এল। পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসেছিল জয়িতা। কোবা ঠায় দাঁড়িয়ে, কাঁধে ওভারনাইট ট্র্যাভেলিং ব্যাগ। মেখলা রণজয়ের পাশে দাঁড়িয়ে নিচু হল। কোবা জানে মা-র ওরকম করে নিচু হলে কষ্ট হয়। জয়িতা এগিয়ে এসেছিল। কোবাও ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে এগিয়ে এসেছিল। কোবাকে ধরেছিল কৌশিক। কোবা দেখল কৌশিককাকুর হাতটা তার ঘাড়ে খিমচে ধরেছে।

মেখলা রণজয়ের পাশে নিচু হয়ে রণজয়ের গলা জড়িয়ে ধরে রণজয়ের মাথায় চুমু খেয়েছিল আর এই চুম্বনের সময় নিজের কান্নাও খেয়েছিল মেখলা। রণজয়ের কপালে, ক্লান্ত চোখে, গালে, ঠোঁটে। রণজয়কে জাপটে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল মেখলা। মেখলার কান্না, মেখলার মুখের লালা, মেখলার নিঃশ্বাস রণজয়ের খাড়া খাড়া হলদেটে চুলে, দাড়িতে, বন্ধ করা চোখে। অনেকক্ষণ ধরে রণজয়কে কান্না দিয়ে আদর করার পর মেখলা উঠে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়েই কোমরের ব্যথার জন্যে টলে যায় আর তখনই জয়িতা পেছন থেকে মেখলাকে ধরে নেয়। রণজয় হাতড়ে হাতড়ে চশমাটা নিয়ে পরল, শার্টের হাতায় ঠোঁটটা মুছল, তারপর হেসে ঘাড় ঘুরিয়ে মেখলা আর জয়িতার দিকে তাকাল। ওদের থেকে চোখ সরিয়ে নিল রণজয়। সামনে যে দুজন দাঁড়িয়ে তাদের ওপারেও দেখা যায়। খুব নিচু গলায় রণজয় বলে। কিন্তু আস্তে বললেও শোনা যায়,

—'রাইফেল পাওয়া গেল না। রাইফেলের ওপরে বাড়ি হয়ে গেছে। আমার গায়ে কি এত জোর আছে? কুকুর ছানা ছোট। ভালো হল। কুকুরছানা পারবে? ভুল হল। বাবা জেলে, বাজে জেলে, ভুল হল। মেলি ভালো। ঠিক হল। কোবা ভালো। ঠিক হল। বাবা জেলে, ভুল হল।'

রণজয় উঠে দাঁড়ায়। টলতে টলতে এগোয়। কৌশিক গিয়ে আলতো করে রণজয়কে ধরে। কৌশিকের দিকে হাসিমুখে তাকায় রণজয়,

—'রাইফেল মাটির তলায়। ভুল হল। কমরেড লেনিন আমাকে বকলেন। ঠিক হল। আমাকে ধরিয়ে দেওয়া হল। ঠিক হল। কুকুর ছানা রুটি খেল, শাদা শাদাও রুটি খেল। ভালো হল। পিঁপড়েরা রুটি খেল। ঠিক হল। বাবা এল। বা...বা!'

রণজয় চিৎকার করে,

—'বাবা!'

রণজয় উঠে সামনে এগোয়। কোবাকে থামিয়ে কৌশিক পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

—'বাবা! ওরা খালি ভয় দেখায়। আর মারে। রাইফেল নেই। বাবা নেই। বাবা!' কেঁদে কুটিপাটি হয় রণজয়। আবার শান্ত হয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

—'জেলে হল। ভুল হল। কুকুরছানা এল। ঠিক হল। কোবা। ঠিক হল। মেলি! মেলি ভালো। মেলি খুব ভালো। মেলি রুটি খায়। ভালো হল। ঠিক হল।'

কৌশিক আবার বলে।

—'রণজয়দা, চলো। গিয়ে বসবে চলো।' রণজয় বলে,

—হ্যাঁ, চলো।

রণজয় ফিরে এসে বসে।

—'পায়ে খুব ব্যথা।'

বাঁ পাটা ফুলেছে।

pathagar.net

দামডাক্তার এলেন। স্নানটান সেরে এসেছেন। সচরাচর প্যান্ট পরেন না। আজ প্যান্ট, বুশ শার্ট। শার্টটা নতুন। বড় মেয়ে দিয়েছে। সঙ্গে ছোট সুটকেস, কাপড়ের ঢাকনা পরানো। উনি এসে রণজয়ের উল্টোদিকে চেয়ার টেনে বসলেন।

—'কেমন আছ রণজয়?'

—'ভালো হল। কিন্তু পায়ে খুব ব্যথা।'

—'দেখি পা-টা। ও আমি ওষুধ দেব সেরে যাবে।

স্প্রেন-টেনের কোনো মলম আছে নাকি?'

কৌশিক বলল,

—'আছে।'

—'নিয়ে এসো। আর এক গ্লাস জল। রণজয় একটা ওষুধ খাবে।'

—'রাইফেল পাওয়া গেল না! সব বাড়ি উঠে গেছে।'

দাম ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে মেখলার কাছে গেলেন,

—'একেবারে আপসেট হবেন না। রণজয়কে এত ভালো অবস্থায় পাব বলে ভাবিনি। কোনো চিন্তা নেই। আর তুমিই তো অনির্বাণ, এসো, কাছে এসো—বাঃ ব্রাইট ইয়ং ম্যান, কী করছ কী এখন?'

মেখলা একটু নালিশ করে নেয় এই ফাঁকে,

—'দেখুন না, কিছুতেই চাকরি করবে না। বলে, করলে বড়জোর বাবার মতো পড়াতে পারি। কথা শোনে না।'

—'সে তো হবেই। বাপকা বেটা তো। জানো, এখনো মাঝে মাঝে তোমার বাবার কাছে এত চমৎকার সব কথা, গল্প শুনতে পাই যে প্রাণটা ভরে ওঠে। বাবাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে

না, কেমন? সব দায় আমার। সে না হলে এই বুড়ো বয়সে ছুটে আসি?'

—'আচ্ছা ডাক্তারদাদু, বাবা এইভাবে, মানে, মাঝে মাঝে এসকেপ করেন কেন?'

দাম ডাক্তার একটু চোখ বুজে হাসেন।

—'দ্যাখো দাদু, হাঁপ ধরে যায়। আটকে থাকতে থাকতে হাঁপ ধরে যায়। সারাদিন ধরে বাড়িতে থাকলে তোমার বা আমারই কি ভালো লাগবে? লাগবে না। মনে হবে যাই একটু ঘুরে আসি। ওরও তাই। এখন এই বেরোনোর, মানে ইচ্ছেটা, তার এইম আর কি, ও যে কিভাবে ঠিক করে সেটা আমরা জানি না।'

কৌশিক জল আর অয়েন্টমেন্ট হাতে দাঁড়িয়েছিল। দামডাক্তার বুক পকেট থেকে ওষুধটা বের করেন। স্ট্রিপ থেকে নেওয়া হলদেটে একটা ট্যাবলেট,

—'নাও, এই ওষুধটা খেয়ে নাও তো। লক্ষ্মী ছেলে। এবারে ফিরে যাব না আমরা, রণজয়?'

—'হ্যাঁ।'

—'সেই ফুলগাছ, শীত পড়ছে, কত ফুল ফুটছে।'

—'হ্যাঁ।'

দাম ডক্তার রণজয়ের পায়ে মলম লাগিয়ে দেন।

—'এই তো এবার ব্যথা কমে যাবে।'

রণজয় শান্ত হয়ে চুপ করে বসে থাকে। দাম ডাক্তার গিয়ে হাত ধুয়ে এলেন। কৌশিক বলল,

—'আমি আর কোবা যাচ্ছি, আমার গাড়িতে। রণজয়দা সেফলি পৌঁছে গেলে, সন্ধেবেলা আমরা ফিরে আসব।'

—'ফিরবে কেন? একটা রাত তোমরা আমার বাড়িতেই থাকতে পার।'

—'সে তো পারিই। কিন্তু কাল খুব জরুরি কাজ রয়েছে। আমাকে ফিরতেই হবে। তবে ডাক্তারবাবু, এবার ঠিক করেছি অন্তত দুমাস অন্তর আমরা একবার ঘুরে আসব, তখন থাকা যাবে।'

কৌশিক রেডি হতে চলে গেল। মেখলা দাম ডাক্তার বলল,

—'ডাক্তারবাবু, রণজয়কে বড় বেশি রোগা লাগছে। মাস চারেক আগেও যখন দেখতে গিয়েছিলাম তার চেয়েও বেশি।'

—'এখন যেটা দেখেছেন সেটাতে এই ধকলের ছাপটা রয়েছে। ওটা কেটে যাবে। তবে, আমি ওর ডায়েটটা এবার একটু সুপারভাইজ করব। আসলে কি জানেন, একা হাতে কত দিক সামলাব? ওর বলে নয়, নিজের মুখেই বলছি, খাওয়াদাওয়াটা ওখানে কিছুদিন হল বেশ খারাপ হয়ে গেছে। কিছু একটা এবার আমাকেই করতে হবে।'

দাম ডাক্তার জানতে চাইলেন যে, রণজয় সকাল থেকে কী খেয়েছে? চা খেয়েছে এক কাপ।

'রণজয়? রণজয়?'

মাথাটা ঝুঁকে পড়েছিল রণজয়ের।

—'কি?'

—'কিছু খেতে ইচ্ছে করছে?'

—'না। রুটি ছিল।'

—'এখন কিছু খাবে?'

—'না। রুটি খেয়েছি। কুকুরছানা।'

pathagar.net

দাম ডাক্তার মেখলাকে বললেন,

—'একটু ঝিম ধরা থাকবে। রাস্তায় থামতে তো হবেই। আমার সঙ্গে খাবার আছে, মেয়ে বেশি করে দিয়েছে। আর মিষ্টির দোকান পাব। ঠিক আছে।'

দশটার সময় কৌশিকদের বাড়ি থেকে দুটো গাড়ি বেরিয়ে গেল। প্রথমে একটা শাদা অ্যাম্বুলেন্স। ওপরে নীল আলো বসানো। পেছনে ব্রাউন ওল্ড মডেলের মারুতি। গাড়ি দুটো বেরিয়ে ডানদিকে মোড় নিল। বাঁদিকে, দূরে একটা মারুতি জিপসি দাঁড়িয়েছিল। সেটাও চলে গেল। কেউ খেয়াল করেনি।

অ্যাম্বুলেন্সে ওঠার আগে, কাছে গিয়ে রণজয়ের মাথায় হাত রেখে মেখলা বলেছিল,

—'ভালো থেকো।'

রাস্তায় রণজয় বেশিরভাগ সময়টাই চোখ খুলে শুয়েছিল। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করলেও ঘুমোয়নি। রণজয় দেখছিল ওপরে, টানা রডের গায়ে সার সার চামড়ার হাতল ঝুলছে, দুলছে। মনে হবে সার দিয়ে ফাঁসির দড়ি ঝুলছে। জয়া শুরার গল্প। ফুচিক। রণজয় চোখ বন্ধ করে। একটানা গাড়ির ইনজিনের শব্দ। কোবা আর মেলার কাছে ফিরে যাচ্ছে রণজয়। রাইফেল, সেই চট আর পলিথিনে জড়ানো মানুষের মতো দেখতে, হাঁটু ভাঙা, তলায় ইট বিছোনো, ওপরে পেরেক বের হয়ে থাকা কাঠের তক্তা, তার ওপরে ইট, মাটি, বাড়ি, তলায় মানুষের মতো দেখতে, কমরেড লেনিন, কী বলেছিলেন যেন। পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের প্রথম জলোচ্ছ্বাস...জনগণের প্রতি মন দাও...ইঞ্জিনের শব্দ...অ্যাম্বুলেন্স যখন ধীর হয়ে যায়, হাম্প টপকায়, তখন তলা দিয়ে একটা ঢেউ চলে গেল, সমুদ্রের ওপর দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স চলেছে, লাল ফৌজ চলেছে, রণজয় চলেছে, হঠাৎ পকেটে হাত দেয় রণজয়, খবরের কাগজটা রয়েছে, লাল ফৌজের সাঁড়াশির আঁটুনির মধ্যে, অবিশ্রান্ত ট্যাংক চলার ঘর্ঘর শব্দ, স্তালিনগ্রাদ, কারা 'হুররা' বলে চেঁচাল, বরফ-রক্ত-মাংস-লোহা-বারুদের কাদা হয়ে গেছে, কামান, মর্টার, অ্যাম্বুলেন্সের ইঞ্জিনের শব্দ যার মধ্যে রণজয় চলেছে দুর্ভেদ্য লাল ঘাঁটিতে, টেলিফোনে মার্শাল রকোসভ্স্কির সঙ্গে কথা বলছেন কমরেড স্তালিন, মাইনাস বত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে লড়াই চলছে, লড়াই হচ্ছে কুর্স্ক, লড়াই চলছে, লড়াই চলবে, কানের কাছে এসে রোগা কুকুরছানাটা শুঁকছে, তাকে বুকের ওপরে তুলে নিল রণজয়, সঙ্গে যাবে, কোবার সঙ্গে খেলা করবে, কোবা মুরগিদের ভয় পায়, কোবা বড় হচ্ছে, নিরন্তর যুদ্ধের মধ্যে কাঁটাতারের পেছনে লক্ষ লক্ষ শিশুর মুখ, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, গ্যাস-চেম্বার, তার মধ্যে বড় হচ্ছে কোবা, কোবা পালাচ্ছে গেস্টাপোর হাত থেকে, অ্যাম্বুলেন্সের ছাদের রডের ফাঁসির দড়ি থেকে ঝুলছে পার্টিজানদের নিষ্প্রাণ দেহ...

দাম ডাক্তার কখনো বাইরে দেখছিলেন। কখনো খবরের কাগজ পড়ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া করার জন্য রাস্তার ধারে একটা বড় ধাবা দেখে গাড়ি থামানো হল। দাম ডাক্তার বললেন,

—'তোমরা ওখানে খাও। তড়কা-রুটি আমি রণজয়কে খেতে দেব না। খুব ঝাল, মশলা থাকে। আমি ওকে উল্টোদিকে মিষ্টির দোকানে নিয়ে যাচ্ছি।'

কৌশিক, কোবা ও বাকি তিনজন ধাবায় গেল। মিষ্টির দোকানে দুজন গ্রামের লোক আলুর দম দিয়ে মুড়ি মেখে খাচ্ছিল। রণজয় খেতে চাইল। এরকম খাবার সে কখনো খেয়েছে। কখনো, কোথায়? না কি মুড়ি জল দিয়ে মেখে তার সঙ্গে আলুর চপ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছিলে রণজয়। তোমার মনে পড়ে না? দাম ডাক্তারের খুব ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু রণজয় যখন চাইল তখন খাক। লোকে তো খাচ্ছে। রণজয় খুব তৃপ্তি করে খেল। হেসে বলল,

—'ঠিক হল।'

—'মিষ্টি খাবে রণজয়? চমচমটা বেশ টাটকা মনে হচ্ছে। খাবে?'

—'না।'

দাম ডাক্তার মেয়ের দেওয়া স্যান্ডউইচ আর সন্দেশ খেলেন।

—'সন্দেহ খাবে, রণজয়?'

—'না।'

বাকি রাস্তাটা রণজয় আর শোয়নি। বসেছিল। বাইরে দেখছিল। রোদ্দুরের তেজ কম। গাছপালা, মাঠ, লেভেল ক্রসিং সব কেমন আঁকা আঁকা। নিথর।

অ্যাসাইলামে ওদের পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল সাড়ে চারটে হয়ে গেল। দাম ডাক্তার রণজয়কে নিয়ে ওপরে গেলেন। রণজয়ের জন্যে গরম জল এল। খোলা বাথরুমে স্নান করার পর রণজয়কে কাচা পাজামা, শার্ট পরানো হল। রণজয় ঘরে বসে বিকেলের দুধ-পাঁউরুটি খেল। ওষুধ খেল। গোবিন্দকে একটা টুল দিয়ে বাইরে বসিয়ে রেখেছিলেন দাম ডাক্তার। রণজয় ছেঁড়া খবরের কাগজটা নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর পকেটে করে যে রিফিলটা নিয়ে গিয়েছিল সেটা দিয়ে কয়েকটা খবরের তলায় দাগ দিল,

—'স্পেনে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ৪০,০০০ বিদেশী স্বেচ্ছাসৈনিক এসেছেন। এঁদের নিয়ে গঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক ব্রিগেড।'

—' "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!" নগুয়েন ভ্যান ত্রয়ের শেষ উক্তি, এগারোটা বাজতে দশ, ১৫ অক্টোবর, ১৯৬৪।'

—'বেলেঘাটা হত্যাকাণ্ড, ২০ নভেম্বর, ১৯৭০।'

—'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ৩১.৭.৭২—শ্রীকপুরী ঠাকুর অভিযোগ করেন যে "চারু মজুমদারকে হত্যা করা হয়েছে, তিনি অসুখে মারা যাননি।" '

pathagar.net

রণজয় গোবিন্দকে ডাকল। হাত নেড়ে।

—'কী চাই রণজয়দাদা?'

—'আমাকে একটা বিড়ি দেবে?'

—'নাও।'

বিড়িটা ধরিয়ে রণজয় ধোঁয়াটা ভেতরে নিল।

—'রাইফেল পাওয়া গেল না।'

—'হ্যাঁ, রণজয়দাদা।'

—'ওপরে সব বাড়ি উঠে গেছে। ভুল হল।'

দূরে কোথাও বোমা ফাটল। অনেক দূরে।

কৌশিক আর কোবা ফুলগাছের বেডের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। দুজনেই সিগারেট খাচ্ছে। কোবা হঠাৎ বলল,

—'ফুলগাছের চারাগুলো কয়েকটা জায়গায় থেৎলে গেছে। দেখেছো!'

মরসুমি ফুল। ফুটতে শুরু করেছে। চন্দ্রমল্লিকা! ফ্লকস্। বোতামফুল। গাছগুলো আরো বড় হবে। ডালিয়াতেও ফুল ধরেছে। আরো বড় হবে। ভালো হল।

—'ওই যে মুরগির ঘর।'

—'ওটাই হল মডার্ন অ্যাপ্রোচ। বুঝলি কেন এগুলো করেছে। হোলিস্টিক একটা সেট-আপে পেশেন্টদের নিয়ে আসা।'

কোথাও কেউ চেঁচাল। গলাটা রণজয়ের নয়। দুজনেই সেই দিকে তাকাল। মুরগির ফোকর ফোকর ঘর পাঁচিলের গায়। পাঁচিলের ওপরে কাচ বসানো। তার ওপরে লোহার অ্যাঙ্গেলে লাগানো টান টান তিন সার কাঁটা তার।

—'একটা লোকের ওপরে আমার খুব রাগ আছে, জানো?'

—'কে?'

—'তুমি কাউকে বলবে না তো?'

—'না। রেশমির কথা আমি কাউকে বলেছি?'

—'বলবে। আর একটু স্টেবল হতে দাও আমাকে। তখন বলবে।'

—'কার ওপরে তোর রাগ?'

—'পার্থকাকু।'

—'আমারও আছে। তবে ওকে তুই আনঅ্যাভয়ডেবল নুইসেন্স হিসেবে ট্রিট করতে পারিস।'

—'তাই তো করি।'

—'দ্যাখ্, এটা একটা হোলি প্রেস। ওখানে রণজয়দা থাকে। এখানে আমরা না হয় ওই ভামটাকে নিয়ে কথা নাই বা বললাম।'

—'সেই ভালো।'

—'আজকের, মানে এই গোটা এপিসোডটার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপারটা কী বল্ তো?'

—'তোমার বাবাকে খুঁজে পাওয়া।'

—'হ্যাঁ। স্ট্রেঞ্জ। যাদবপুর আর প্ল্যানেটেরিয়াম। টেলিপ্যাথির মতো। ভাবা যায় না।

হো হো হাওয়া আসে। ফুলেরা নড়ে চড়ে। মুরগিরা কঁক্ কঁক্ করে ওঠে। গার্ডদের ঘরে রেডিও বাজছে? বাইরে আকন্দগাছ, কালকাসুন্দার বন দুলে দুলে উঠেছিল। ঠিক হল।

দাম ডাক্তার কৌশিক আর কোবাকে ওঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে ওরা হাতমুখ ধুল। পরোটা, আলুভাজা খেল। বেলী ক্যাসেটে সুমনের গান শুনছিল। দাম ডাক্তারও খেলেন। পরোটা, আলুভাজা। মেয়ের দেওয়া সন্দেশ। সবাই খেলো। পরে চা।

—'অনির্বাণ! তোমাকে আমি একটা কথা বলি, মনে রাখবে?'

ঘরে কেউ নেই। কৌশিক, কোবা আর দাম ডাক্তার।

—'বলুন, ডাক্তার দাদু।'

—'আমরা একবার পড়েছিলাম একটা কথা। এক্সাইটমেন্ট মানে উত্তেজনা আর ডিপ্রেশান, এর মধ্যের স্টেজটা হচ্ছে নরম্যাল অবস্থা। মানে, ওপরেও ওষুধ দরকার। নীচেও ওষুধ দরকার। মধ্যে রণজয় কেন, আমরা সকলেই স্বাভাবিক। তখন কি ওষুধ লাগে?'

—'না!'

—'রণজয়! ইয়োর ফাদার! তোমার বাবা! সেই অবস্থাতেও থাকে। আমরা কথা বলি। গল্প করি।'

—'মানে, সেই অবস্থাটা আসে?'

—'হ্যাঁ, আসে।'

—'মানে রণজয়, রণজয়,—ওর একটা ভিশন রয়েছে...ও কিছু দেখে, না দেখলে কেন পালাতে যাবে? হোয়াই?...' শীতের উদ্বেল হাওয়া আসে। কৌশিক বলে,

—'ডাক্তারবাবু আমাদের ফিরতে হবে। সন্ধে হয়ে গেল।'

—'হ্যাঁ, সন্ধে হয়ে গেল।'

—'ডাক্তারদাদু, আমি একবার বাবার সঙ্গে দেখা করব।'

—'হ্যাঁ, করবে। আমরা সকলে করব।'

—'কোবা, উল্টোপাল্টা কিছু বলিস্ না।'

—'না, কৌশিককাকু, আমি উল্টোপাল্টা কিছু বলব না।'

—'কোবা, দিস ইজ ক্রুশিয়াল। ডু নট একসাইট হিম।'

—'না, কৌশিককাকু।'

কৌশিকের মারুতি গাড়িতে অ্যাসাইলাম গিয়েছিল ওরা। ওপরেও উঠেছিল। শীত পড়ছে আর বাড়ির ভেতরটা ঠাণ্ডা। শনশন হাওয়া। দূরে কোথাও বোমা ফাটে। তার আওয়াজ হাওয়াতে ভাসে। লো ভোল্টেজ। টিউব জ্বলছে না। রণজয় জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। বারান্দায় গোবিন্দ, দাম ডাক্তার, কৌশিক। কেউ চিৎকার করল। আকন্দ গাছ, কালকাসুন্দার বন, ওপারের জলা—সব আবছা হতে হতে অন্ধকার মাখছে মুখে। পতঙ্গের অবিরাম শব্দ। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রণজয়। প্রথমে জাল। তার ওপারে শিক। তলাগুলো মরচে ধরা, সরু। রণজয় কাচা ডোরাকাটা শার্ট আর পাজামা পরা। ঘরে কেউ ঢুকতে রণজয় সচকিত হয়।

—'কে?'

—'আমি।'

—'তোমার কাছে রিভলভার আছে?'

—'আমি, কোবা!'

—'তুমি এখানে কী করছ?'

—'তুমি, বাবা, তুমি পালাও কেন? মা-র কষ্ট হয়। আমাদের কষ্ট হয়।'

pathagar.net

মস্কোর তিরিশ মাইলের মধ্যে নাৎসিরা অপেক্ষা করছে। চীন! ভিয়েতনাম! রাশিয়া! কমরেড লেনিন কথা বলছেন! কোথাও আবার বোমা ফাটল, আকাশে আলো উঠল! আকাশ জুড়ে তারা, উল্কা, বিস্ফোরণ, মেঘ, মেলা, মেখলা...'

—'বাবা!'

—'তুমি এখানে কী করছ? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ইউ আর অ্যান এবলবডিড ইয়ং ম্যান—তুমি জানো না? মস্কোর থেকে তিরিশ মাইল দূরে নাৎসিরা পৌঁছে গেছে। সকলে ফ্রন্টের দিকে যাচ্ছে। কমরেড স্তালিন বলেছেন হোয়াট দা হেল ইউ আর ডুয়িং হিয়ার? যাও, ফ্রন্টে যাও! মুভ! যাও।'

ফস্ফর স্বপ্ন ও স্নায়ু গ্যালাক্সি একাকার। তার মধ্যে কালপুরুষ কোবা কোমরে তরোয়াল ও লুব্ধক কুকুরকে নিয়ে ফ্রন্টে চলেছে...

কোবা ফ্রন্টে চলেছে বরফ, কাঁটাতার মাড়িয়ে, নাকি কোবাই রণজয়কে ফ্রন্টে নিয়ে যাবে বলে হেঁটে আসছে, আর দেখা যায় না, ঝাপসা হয়ে যায়, কান্নার জল চোখ পোড়ায় অথচ ঘুম নেই, ঘুম কি কোথাও আছে না কি, না ঘুমই আসছে নানা অছিলায় যার কোমরে তরোয়াল, ছোট্ট ছোট্ট পা আর ঘেউ ঘেউ ডাক ছোট্ট কুকুর ছানার।

৮

অন্তে, সকলেরই এটা জেনে রাখা ভালো যে এই আখ্যান রচনা বা পাঠের সমাপ্তির সঙ্গে রণজয়ের ঘুম আসা বা না আসার কোনো সম্পর্ক নেই।

খেলনা নগর

pathagar.net

খেলনানগরের পশ্চিম দিকে, রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় আবর্জনার পাহাড় যেদিকে ঢালু হয়ে পাড়ি নদীর ওপারে সমতলে, বালি-কাঁকরের মাটিতে গিয়ে মিশেছে, সেইদিকে নানারকম রঙের আভায় শীতের বোবা সূর্য ডুবছিল। তখনও আলো ছিল যা কিছুক্ষণ পরে অন্ধকারে ছায়া ছায়া হয়ে মিলিয়ে যেতে শুরু করে। খেলনানগরের উত্তর ধরে যে টানা সিধে সড়ক চলে গেছে সেই রাস্তা বরাবরই ধাতব ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। কখনও জোরে কখনও আস্তে। পুতুল কারখানার ছাদের ওপরে তেপায়া কাঠামোর ওপরে যে বিশাল বার্বি পুতুল বাতিল রাজকন্যার মতো দাঁড়িয়ে আছে তার আধপোড়া চুলগুলো বাতাসে একটু একটু উড়ছিল। দিনটা ছিল দুহাজার চার সালের চৌঠা ডিসেম্বর। ঘটনাটা ঘটেছিল তার আগের দিন বিকেলে।

দুবছর আগে, দেশের উত্তর ও পশ্চিমে পারমাণবিক আঘাতের ফলে যে ব্যাপক সর্বনাশ হয়েছিল তার রেশ মিলোবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা আঁচ করেছিলেন যে দেশের আবহাওয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। কিন্তু বোমাগুলো, বিশদভাবে বললে দুটো বোমাই ১ মেগাটন করে হলেও নিউক্লিয়ার শীতের মেঘ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। প্রথম বোমাটিতে ৯০ লক্ষ ও দ্বিতীয়টিতে ৮৯.৩৬ লক্ষ লোক মারা যায়। দুহাজার চার সালে খেলনানগরে বেশ শীত পড়েছিল। উত্তরমুখী দিকটা ফাঁকা। ফলে শীতের হাওয়া যথেচ্ছ আসে। এসে খেলনানগর পার করে আবর্জনার পাহাড়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে চলে যায়। আবর্জনা পাহাড়ের বিষাক্ত, ভারী নীল ধুলো একটু বিরক্ত হয়, আবার থিতিয়ে বসে।

পুতুল কারখানার সামনের যে চত্বর, সেখানে কারখানার শেষ দুজন শ্রমিক তথা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর মৃত্যুদণ্ড দেখার জন্য নগরের ৪৮৭ জন বাসিন্দার মধ্যে যে শ'দেড়েক মানুষ জড়ো হয়েছিল তারা চত্বরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। শীতের বিকেলে মৃত্যুদণ্ড আয়েস করে দেখতে হয়। যারা রোদগরম সিমেন্টের খাটো দেওয়ালে হেলান দিয়ে ছিল তারা সেই অবস্থাতেই ছিল। শুধু যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের পড়ে যেতে হয়। পুতুল কারখানার ছাদের তেপায়া কাঠামো থেকে দুজনের মৃতদেহ পা বাঁধা অবস্থায় উল্টো হয়ে ঝুলছিল আর বাতাসে সামান্য দোল খাচ্ছিল। উলঙ্গ। মুখ ও মাথা থ্যাঁৎলানো। গায়ে ছুরি মারার ক্ষত ও রড পেটানো কালো দাগ। গলায় দড়ি দিয়ে দুজনেরই কাগজ বাঁধা। তাতে যথাক্রমে লেখা '৮' ও '৯'। এর আগের সাত জনকে মারা হয়। এই দুজনই বাকি ছিল। একটা ভুল শুধরে নেওয়া যায়। নগরের বাসিন্দার সংখ্যা ৪৮৭ না হয়ে ৪৮৫ হবে। কারণ দুজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীকে আগেই মেরে ফেলা হয়। এগুলো হয়েছিল ঘটনাটা ঘটার আগে। এই হিসেবে কিন্তু উইন্ডচিটার পরা লোকটাকে সঙ্গত কারণেই ধরা হয়নি। এই সুবাদে এর পর থেকে ওই লোকটাকে উইন্ডচিটার বলে ডাকা হবে কারণ ওর আসল নাম কেউ জানে না। এটাও ঠিক বলা হল না। কিছু লোক নিশ্চয়ই জানে কিন্তু তারা অন্য কাউকে বলবে না।

খেলনানগর খেলনার মতোই ছোট। আগে এখানে কিছুই ছিল না। কয়েকটা টিলা, কাঁটাঝোপ, একটা পরিষ্কার জলের ছোট্ট নদী, তার স্বচ্ছ স্রোতের উল্টোদিকে কয়েকটা মাছের

এগোবার চেষ্টা এইরকমই, আরও অনেক জায়গার মতো। তারপর কিভাবে এখানে খেলনানগর গড়ে উঠল সে কথা একটু পরেই জানা যাবে।

খেলনা কারখানার সামনের চত্বরে ঝুলন্ত দুই ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর মৃতদেহর কথা বলা হয়েছে। পনেরো দিন আগে হাতকাটা আর তার দলবল যে শকুনটাকে "হুব্বা! হুব্বা!" বলে চিৎকার করতে করতে তাড়া করে শিকার করে সেই মরা শুকনো কানা পাখিটাও ডানা ছড়িয়ে ঝুলছিল। ওই দুজনের পাশেই। তেপায়া কাঠামো থেকে।

চত্বর পেরোলেই যে চার-পাঁচ মানুষ চওড়া রাস্তাগুলো চলে গেছে তার ধারে ধারে অ্যাসবেস্টসের ছাদওয়ালা একঘর দুঘরের ছোট ছোট বাড়ি। রাস্তায় আলো নেই। কোথাও আলো নেই। বহুদিন ধরেই নেই। অন্য সময় রাসায়নিক আবর্জনায় নাক জ্বালা করা গন্ধটা খেলনানগর জুড়ে ম ম করে। হাড় কাঁপানো উত্তুরে বাতাসে গন্ধটা দুহাজার চার সালের চৌঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উড়ে গিয়েছিল আবর্জনার পাহাড়েরই দিকে।

বরবাদ হয়ে যাওয়া এস. টি. ডি-আই. এস. ডি বুথের দরজার ভেতরে অকেজো টেলিফোন লাগানো দেওয়ালে অকথ্য নোংরা কথা লেখা ও নোংরা ছবি আঁকা। তারই মেঝেতে পড়ে ছিল জিশা ও কুমার। ওখানেই তাদের শেষ দেখা হয়। খেলনানগরের দক্ষিণ প্রান্তে, যেখানে চারটে কাঠের ঘর বেশ্যাদের জন্য বরাদ্দ ছিল, তার ভেতরেই বেশ্যাদের মড়াগুলো পড়ে ছিল। ওদের ঘরের বাইরে কাশির ওষুধ কাফিড্রিল-এর শিশি ডাঁই করা।

সেলাই মেশিনের পাশে খাটিয়াতে বুড়ো দরজি শুয়ে ছিল। তার ঘরের দেওয়ালে উইন্ডচিটার-এর চক দিয়ে আঁকা বেড়ালের ছবি। দমকা বাতাস ঢুকতে বুড়োর চুলগুলো হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে, তারপরই সমান হয়ে যায়। দরজাটা বন্ধ হয়, খোলে, আবার বন্ধ হয়। শব্দটা হাওয়ায় বার বার বাজে।

যারা রাস্তায় ছিল, কথা বলছিল বা জল আনতে যাচ্ছিল তারা রাস্তাতেই পড়ে আছে। কেউ চিৎ হয়ে মরা চোখে আকাশ দেখছে, কেউ উপুড় হয়ে পড়ে। হাত ও পা অস্বাভাবিকভাবে ছড়ানো যেন কিছু ধরার চেষ্টায় বেহিসেব হয়ে গেছে। কারও হাতে আধ-কামড়ানো বিস্কুট ধরা, কারও হাতে জল তোলার টিনের কৌটোতে বাঁধা দড়ি। হাতকাটা আর তার দলের লোকেরা চত্বরে পড়ে ছিল। শেষ অবস্থায় হাতে যে ছুরি ও রড ধরা ছিল সেগুলো তেমনই ধরা ছিল। হাতকাটা বেশ মোটা। বাঁ-হাতটা কনুই থেকে নেই। লুঙ্গি পরা। ওর লোমশ বুকে, গলায়, মুখে '৮' ও '৯'-এর রক্তের ছিটে শুকিয়ে। হাতকাটার আশপাশে ওর সাঙ্গো? পাঙ্গোরা যেভাবে পড়েছিল দেখলে মনে হবে ঘটনাটা ঘটার আগে ওরা দল বেঁধে হাতকাটাকে তারিফ করছিল। কয়েকজন হাত ধরাধরি করে আছে। একজনের হাতে ছিপি খোলা কাশির ওষুধের শিশি। শিশিতে কিছুটা নেশা করার কাশির ওষুধ তখনও রয়ে গিয়েছিল।

খেলনানগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে, পাড়ি নদীর এপারে যে ঘরগুলো সেগুলো অনেকদিন ধরে, সেই পুতুল কারখানায় আগুনের পর থেকেই, খালি পড়ে ছিল। আগুনে পুড়ে যারা মারা যায় ওগুলো তাদের ঘর। অবশ্য এর মধ্যে একটা ঘরে সেই বামন থাকত, যার সঙ্গে উইন্ডচিটার -এর বিশেষ একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বামন মরা অবস্থায় একটা চেয়ারে বসে সামনের দিকে তাকিয়েছিল। দুটো হাত দিয়ে চেয়ারের হাতল শক্ত করে ধরা। পায়ের কাছে ওর কিছু জামাকাপড়, এক টিন গুঁড়ো দুধ, চ্যাপটা টিনের কৌটোয় বাতাসবন্দী আরব সাগরের মাছ ও ভাঁজে ভাঁজে জীর্ণ একটি ম্যাপ ক্যাম্বিসের একটা তালিমারা ব্যাগে গোছানো ছিল। ঘরের কোণে একটা ছেঁড়া ছাতাও ছিল। গোছগাছ দেখে মনে হয় যে উইন্ডচিটার-এর মতো ওরও বোধহয়

খেলনানগর থেকে পালাবার পরিকল্পনা ছিল।

'৮' আর '৯'-কে যখন হাতকাটা আর তার দল কুপিয়ে কুপিয়ে, পিটিয়ে পিটিয়ে মারছিল তখন খেলনা কারখানার পেছনের ভাঙা পাঁচিলের ফোকর থেকে সাদামুখ দেখছিল আর ভয়ে ঘামছিল। ওর হাতে ছিল একটা ভাঙা শিক যার মাথাটা ঘষে ঘষে ছুঁচলো করা। সাদামুখ জানত যে, '৮' ও '৯'-কে শেষ করার পর হাতকাটা তাকে ঠিক খুঁজে বের করবে ও তার রেহাই থাকবে না। একটা ছুঁচলো ভাঙা শিক নিয়ে কতক্ষণ আর পাঁচ-ছ জনের একটা দঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব?

এস. টি. ডি-আই. এস. ডি বুথ, যার মেঝেতে জিশা আর কুমার জড়াজড়ি করে পড়েছিল, সেটা ছেড়ে রাস্তা দিয়ে শ'দুয়েক মিটার এগোলেই খাবারের গুদাম। যুদ্ধের আগেই সামরিক কনভয় খেলনানগরে শুকনো ও টিনের খাবার দিয়ে যায়। অনেক। দুধ, বিস্কুট, মাছ, বিদেশ থেকে আনা নোনতা মাংস, ফল, টমেটোর সস, মেয়োনিজ ও আরও কত কী। বেশিরভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করা। এছাড়াও সামরিক বাহিনীর লোকেরা কিছু গ্যাস-মুখোস ও চিকিৎসার জিনিসও এনেছিল। এবং পর্যাপ্ত কাশির ওষুধ কাফিড্রিল যা খেলে নেশা হয়। দূরবর্তী ছোট ছোট 'হ্যামলেট'-এ এই ধরনের সরবরাহ-ই ছিল রেওয়াজ। দীর্ঘকাল ধরে কোনো যোগাযোগ না থাকলেও জনবসতি যেন খাবার বা নেশার জিনিসের অভাবে ধুয়ে মুছে না যায়। কাশির ওষুধ, নরম প্যাকেটের মার্কিনী সিগারেট ও স্বদেশি দেশলাই যে যার মতো লুটপাট করে স্টক করেছিল। তখনও টেলিফোন বা ফ্যাক্সে যোগাযোগ করা যেত। তখনও মাঝেমধ্যে কিছুটা সময় বিদ্যুৎ এলে টিভি বা রেডিও চলত। রাস্তায় আলোও জ্বলত। তারপর সব ব্যবস্থাই নষ্ট হয়ে যায়। টিনের মধ্যে আটকে থাকা কবেকার মাছ, মাংস বা ঝোলের মধ্যে ডুবন্ত কড়াইশুটি বা রাজমার দানা পচে যেতে শুরু করে। খোলার সঙ্গে সঙ্গে ছাতা পড়তে শুরু করে। পোকা কিলবিল করে। বরং দুধ ও বিস্কুট বিবর্ণ বিস্বাদ হয়ে গেলেও খাওয়া যায়। খেলে খিদে যায়। আর তাছাড়া নিয়মিত যদি কেউ কম করে খাবার পায় তখন ধীরে ধীরে তাতেই সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এরকম যদি না হত তাহলে নাকি মৃত্যুশিবিরের কথা কেউ জানতে পারত না যেমন জানতে পারত না গণতন্ত্র বাঁচানো বা সামাজিক-এঞ্জিনিয়ারিং-এর ধুয়ো তুলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তিলে তিলে বা সহসা হত্যা করার অসংখ্য ঘটনা। ক্ষুধা বা অখাদ্য একটা দুর্দান্ত অস্ত্র, এক মোক্ষম হাতিয়ার।

অস্ত্র বা হাতিয়ারের প্রসঙ্গে আর একটা কথা এসে যায়। গৃহযুদ্ধের সময় লুঠতরাজ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য গত শতাব্দীর শেষ বছরে একটেরে হয়ে পড়া জনবসতিগুলোতে ছোট ও মাঝারি মাপের কিছু আগ্নেয়াস্ত্র বিলি করা হয়েছিল। খেলনানগরেও একসময় কিছু অস্ত্র ছিল। কিন্তু সেগুলো ছিল মূলত হাতকাটা ও সাদামুখদের হাতে। একসময় নেশা করার কাশির ওষুধের হাহাকার দেখা দেওয়ায় ওই সব অস্ত্র চোরা চালানদারদের হাতে চলে যায়। তখনও উত্তরমুখো সিধে সড়ক দিয়ে কখনও কখনও একটা আধটা লজ্ঝড়ে, গোলার আঘাতে তুবড়োনো বা মেশিনগানের বুলেটের ফুটো ফুটো চিহ্ন গায় লরি বা বাতিল ট্যাংকার খেলনানগরে আসত কাফিড্রিল নিয়ে। এরকমই একটা লরিতে ক্লিনার হিসেবে এসেছিল কুমার। এসে খেলনানগরে থেকে যায়। জিশার প্রেমে পড়ে।

একেই কড়া শীত। তার ওপরে চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। '৮' '৯' ও শকুন তো বটেই, বাকি ৪৮৫টা মৃতদেহ জমে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। খেলনানগরে কোনো পিপড়ে বা মৃতদেহর সদ্ব্যবহার করতে পারে এমন কোনো কীট, পতঙ্গ বা মানুষের মাংস ভালবাসে এমন কোনো

প্রাণী বা পাখি ছিল না। থাকলে মৃতদেহগুলো অবিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকত না। ঠাণ্ডার জন্যে পচনের প্রক্রিয়াটিও পুরোদমে শুরু হয়নি। শুধু হাতকাটার পেটটা একটু বেশি ফুলে গিয়েছিল।

এমনিতে সব আকাশই ধোঁয়া ধোঁয়া। তারা বা গ্রহ বা কৃত্রিম উপগ্রহ দেখাই যায় না। অসুস্থ চাঁদও আসে কুয়াশা কুয়াশা ঘোলাটে আলো নিয়ে। কিন্তু দুহাজার চার সালের দোসরা ডিসেম্বর রাতে প্রচণ্ড ঝড়জল হয়। অপ্রত্যাশিত। তাই আকাশ দুদিন পরেও কিয়দংশে পরিচ্ছন্ন ছিল।

অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে যারা অনেক দূরের জেনারেটরের শব্দ বাতাসে ভর করে আসতে শুনেছে তাদের শব্দটা হয়তো চেনা। গুঁড়ি মেরে শব্দটা কাছে আসতে আসতে যান্ত্রিক গর্জনে পরিণত হয়। আরও বাড়ে। হিংস্র ঘুরন্ত পাখায় বাতাস কেটে চাপ চাপ অদৃশ্য কিমায় পরিণত হয়। তীব্র নীলচে সার্চলাইটের সন্ধানী স্তম্ভ আকাশে কাটাকুটি খেলে। ঝলসানো আলোয় লুকোচুরিতে খেলনাগর দৃশ্যমান হয়, আবার অতলে হারায়। তিনটে সামরিক পুমা হেলিকপ্টার খেলনানগরের চত্বরের ওপরে স্থির হয়ে বাতাস কাটে— বেপরোয়া হাওয়ায় বিশাল বার্বি পুতুলের আধপোড়া চুল খিলখিল করে ওড়ে। মধ্যে অবতরণের উপযুক্ত ফাঁকা জায়গা খোঁজে তিনটে হেলিকপ্টার।

সামরিক আলো এস. টি. ডি-আই. এস. ডি বুথের ধুলোর আস্তরণ পড়া কাচের মধ্যে দিয়ে ভেতরে বার বার ছুবলে পড়ায় মনে হয় জিশা ও কুমারের মৃতদেহ নড়ছে। চেয়ারে বসা মরা বামনকেও মনে হয় এই বোধহয় উঠে দাঁড়াবে বা কিছু বলে উঠবে।

চত্বরে ছড়িয়ে থাকা ইতস্তত মৃতদেহের মধ্যে অবতরণের লাগসই ফাঁকা জায়গা খোঁজে তিনটে হেলিকপ্টার। '৮' ও '৯' জোরে জোরে দোলে। মরা, ঝুলন্ত শকুনও পাক খেয়ে খেয়ে উড়তে চেষ্টা করে।

pathagar.net

যোগাগ্নি শরীর

১৮ নভেম্বর ২০০৪

যে খেলনানগরে বলতে গেলে প্রায় কিছুই ঘটে না সেখানে এই দিন পরপর দুটো ঘটনা ঘটে গেল। কাফিড্রিল-এর ঘোর কাটিয়ে উঠে সত্যিকারের জেগে উঠতে খেলনানগরের অনেকটা সময় লাগে। আবার বিকেল ফুরনোর পরে বেশিক্ষণ কেউ জেগেও থাকে না। চাঁদের আলো থাকলে ভালো। না থাকলেও ক্ষতি নেই। বরং অন্ধকারের যে নিজস্ব আলো রয়েছে তার মধ্যে কোনও মাতালের চিৎকার বা হাসি বা গালাগালি বেশ মানানসই লাগে। '৮' ও '৯' নেশাখোর নয়। তারা অনেক রাত অবধি ইউনিয়নের ঘরে বসে তাদের আগামীদিনের রণনীতি নিয়ে আলোচনা করে। করতে করতে একসময় ঘুমিয়েও পড়ে। গতরাতে এইরকম কথাতে তাদের আলোচনা শেষ হয় :

—কাল আমরা তাহলে সাকুল্যে দশটা পোস্টারই মারব, না সবগুলোই খরচ করে ফেলব?

—কাগজ আর কালি যেভাবে ফুরিয়ে যাচ্ছে তাতে করে এই ক্যামপেন বেশিদিন টানা যাবে বলে মনে হয় না। তাই কয়েকটা পোস্টার হাতে রাখাই বোধহয় ভালো।

—তাই করব তাহলে। সবগুলো পোস্টার হাতছাড়া করব না।

—একেবারেই না।

—আর এবারে গতবারের ভুল করলে কিন্তু কমরেড আন্দোলন আবার চোট খাবে।

—ভুল নিয়ে তুমিও দেখছি ভেবেছ। আমিও ভেবেছি।

—কী ভেবেছ?

—আমার যেটা মনে হয়েছে সোজা বলে দিচ্ছি। গতবারের পোস্টারগুলো মারার পর আমরা দুজনেই একটু ঢিলে দিয়েছিলাম। নতুন পোস্টার পড়ে কে কী ভাবছে সেটা জানতে চেষ্টা করিনি।

—তুমি ঠিক আমার মনের কথাটা বললে। এবারে আমাদের সজাগ থাকতে হবে।

এর উত্তরে আর কথা হয় না। অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্যজনও ঘুমিয়ে পড়েছিল। দুজনেরই পাশে নিশান ওড়াবার ডাণ্ডা রয়েছে। রাতের অন্ধকারে যদি হাতকাটার দল চোরাগোপ্তা হামলা চালায়? শত্রুপক্ষ ও তার দালালদের কখনওই কমজোরী ভাবলে চলবে না। লড়াই করতে হবে ও প্রস্তুত থাকতে হবে। ডাণ্ডা ছাড়াও ইউনিয়ন ঘরে মার্কস ও লেনিন-এর ছবির তলায় ডাঁই করে ইট ও পাথর রাখা আছে। সর্বহারার অস্ত্র। '৮' ও '৯' সংগ্রামের স্বপ্নে সেই রুগী মানুষটিকে দেখতে পায় যার পাথর কুড়িয়ে হাতিয়ার করে ফেলার মূর্তি অমর হয়ে আছে কোনো এক উদ্বুদ্ধ সোভিয়েত ভাস্করের দুরন্ত খোদাই করা কাজে। ওদের মধ্যে লাভা রয়েছে। তার আঁচে ওদের মুখ লালচে দেখায়। ঘুমের মধ্যে ওদের চোখের তারা ঘোরে। কপাল ঘামে। হাত মুঠো হয়। দুই বিশ্বস্ত সৈনিকের ঘুমের সময় দেওয়াল জুড়ে পাহারায় জেগে থাকেন মার্কস ও লেনিন। আন্দোলন থেকে এক আঙুলও পিছু না হঠার নির্দেশ বলবৎ রয়েছে।

বামন রোজই হাঁটতে হাঁটতে পুতুল কারখানার চত্বরে এসে বসে। একটা টিনে জল থাকে তার সঙ্গে। চত্বরে রোদে বসে জলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে ঠিক হিসেব করা দুটো বিস্কুট খায় ও বানান করে করে নতুন কোনো পোস্টার থাকলে বিড়বিড় করে পড়ে। রোজকার মতো সেদিনও জিশা নদী থেকে জেরিক্যান ভর্তি জল মাথায় করে ফিরছিল। বামনের চোখ পড়ল টিনের কৌটোর জলে। বিস্কুট ডুবোতে গিয়ে। নোংরা জলের আয়নায় বার্বি পুতুলের ছায়া পড়েছে। কিন্তু পুতুলের মাথায় ওটা কি? বামন ওপর দিকে তাকাতেই শকুনটা ডানা ঝটপট করে উঠেছিল। বোধহয় বেশি করে রোদ্দুর ধরার জন্যেই। বামন আঙুল দিয়ে ওপরে দেখাতে জিশাও একবার জেরিক্যানের ভার সামলে আড়চোখে ওপর দিকে তাকিয়েছিল। শীতের রোদে জিশার ফ্যাকাশে নীলচে মুখটি বড়ই সুন্দর। জিশা জেরিক্যান মাথা থেকে নামিয়ে ভালো করে দেখল। ও কখনও শকুন দেখেনি। বিরাট পাখিটা ফের ডানা নাড়ল। জিশা কথা বলতে না পারলেও খুব উত্তেজিত হলে কখনও কখনও অবুঝ একটা চিৎকারের মতো শব্দ করে ককিয়ে। জিশা চিৎকার করে উঠল। তারপর ছুটল বাতিল এস. টি. ডি-আই. এস. ডি বুথের কামরায় ঘুমন্ত কুমারকে ডাকতে। কুমারের হল কুম্ভকর্ণের ঘুম। ওর ঘরে একটা শাহরুখ খানের বড় ছবি আটকানো। কুমার কোনো সময় ঘরে না থাকার সুযোগে কেউ কখনও ছবির মুখে খানদানি পাকানো গোঁফ এঁকে দিয়ে গেছে।

জিশার মা-র রোজকার মতো ঘুম আগেই ভেঙেছিল। সে-ই জিশাকে অন্যদিনের মতো ঘুম থেকে ওঠায়। গায় কালো প্যারাশুটের কাপড় জড়িয়ে দেয়। জিশা চলে যাওয়ার পর সে অন্য তিনজনকে ডাকতে গিয়ে দেখে যে শীতের অন্য যে কোনো রাতের মতোই তারা একটা মিলিটারি তাঁবুর ক্যানভাসের কাপড়ের তলায় জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছে। রোজ রাতের মতো গতরাতেও তারা কলাই করা গামলায় জল ভরে তাতে প্লাস্টিকের পুতুল ভাসিয়েছিল। পুতুল যদি জলের মাঝখানে গোল হয়ে ঘোরে তাহলে বুঝতে হবে খেলনানগরে আকস্মিক কিছু ঘটতে চলেছে। আর যদি ভাসতে ভাসতে কানায় গিয়ে ঠেকে তবে মানে হল যে কে সেই ভাবেই

চলবে খেলনানগরের বিচ্ছিন্ন, একটেরে, অন্তহীন জীবন। তিন বুড়ি বেশ্যার এটা হল প্রায় রোজকার রাতের তুক বা খেলা। ওদের অন্য খেলাও আছে। সেটা ওরা কারও ওপর রাগ হলে খেলে। পুড়ে যাওয়া খেলনা কারখানার গুদাম থেকে খুঁজেপেতে ওরা একটা আধপোড়া পুতুল আনে। সেটাকে গামলার জলে ভাসিয়ে দেয়। বিড়বিড় করে কী বলে সেটা জিশার মা জানে না। হাসে। আর কাঠি দিয়ে চেপে ধরে পুতুলটাকে ডুবিয়ে দেয়। আবার ভাসায়। ফের ডুবিয়ে দেয়। যাকে ভেবে এটা করা হয় সে দুঃস্বপ্ন দেখে। দুঃস্বপ্নের রাক্ষস গলা টিপে ধরে তার দম বন্ধ করে দেয়। সারা রাত তবে এভাবে কাটে। ঠিক কী হয় তা বলা কঠিন কারণ কাফিড্রিল খেলে নানারকমই হতে পারে। অবশ্য যারা এটা জানে তারা ওই তিনজনকে ভয় পায়। হাতকাটা ভয় পায়। সাদামুখও ভয় পায়। '৮' ও '৯' এসব বিশ্বাস করে না।

বামন কয়েকবার নিজের জল খাওয়ার টিনটাকে চত্বরের পাথরে ঠুকল। শকুনটা নড়াচড়া করল না। দু-একজন করে লোক জমতে শুরু করল। যারা দল বেঁধে ঘোরে তাদের মধ্যে প্রথমেই একা এল সাদামুখ। চেঁচাতে চেঁচাতে। উত্তেজিত হলে ওর মুখ দিয়ে লালা পড়ে।

—কী হয়েছে কী? জিশা দৌড়োতে দৌড়োতে গেল।

বামন উত্তর না দিয়ে ওপরে দেখাল। শকুনটা তখন যেন সাদামুখকে দেখাবার জন্যেই ডানাদুটো ছড়াল।

—কী ওটা?

সাদামুখ কখনও জীবনে শকুন দেখেনি এমন নয়। কিন্তু তখন উত্তেজনায় সব গুলিয়ে গিয়েছিল।

pathagar.net

—শকুন! মড়াখেকো শকুন!

সাদামুখ চেঁচাতে চেঁচাতে সকলকে জানাতে গেল।

—শকুন! শকুন! শকুন এসেছে!

শ...কু...ন।

ওর পুড়ে যাওয়া সাদা মুখে জলের বিষের নীল নীল ছোপ। মুখ দিয়ে লালা পড়ছে।

সাদামুখকে যদি একটি নিউট্রন ধরা যায় তাহলে সে চেঁচাতে চেঁচাতে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম-এর নিউক্লিয়াস-এ আঘাত হেনে দুটো সমান অংশে বিভাজিত করে দিচ্ছিল যাকে ফিশন ফ্র্যাগমেন্ট বলা হয়। নিউক্লিয়াস যখন ভাঙে তখন এর জড়ের সামান্য অংশ বিপুল পরিমাণ শক্তি বা এনার্জি-তে পরিণত হয়। এইসঙ্গে আরও দুই বা তিনটি নিউট্রন মুক্ত হয়। এরা আবার অন্যান্য নিউক্লিয়াসে-এ আঘাত হানে। এই প্রক্রিয়াটিকে যদি চলতে দেওয়া হয় তাহলে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চেইন রিঅ্যাকশন শুরু হয় যেখানে প্রতিটি বিভাজিত নিউক্লিয়াস অন্যান্য নিউক্লিয়াসকে ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় নিউট্রন সরবরাহ করে। অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় এই চেইন রিঅ্যাকশন একটি ফিশন বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে। তবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চেইন রিঅ্যাকশন-এর জন্য এক নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণ বিদারণযোগ্য পদার্থের দরকার— এর নাম হল ক্রিটিকাল মাস।

মার্কস-এর মুখের ওপরে ত্যারচা হয়ে সকালের রোদ্দুর এসে পড়েছে। লেনিনের মুখে পৌঁছায়নি। বাইরে লোকের হট্টগোলে '৯'-এর ঘুম ভেঙে গেল। সে কিছুক্ষণ আওয়াজগুলো শুনল তারপর পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে '৮'-কে ডাকল।

—ওঠো। শুনছ! বাইরে খুব হট্টগোল।

'৮' ধড়মড় করে উঠে বসে।

—অ্যাটাক করছে নাকি?

—বোঝা যাচ্ছে না। হাতকাটা হয়তো আমাদের বিরুদ্ধে লোক ক্ষেপাচ্ছে!

—আবার এমনও তো হতে পারে যে কারখানা খোলার কোনো খবর এসেছে!

—সবগুলো সম্ভবনাই আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তবে সেদিনের ভুলটা করো না।

—কী ভুল?

—পোস্টার মারার পরের দিন। মনে নেই? তুমি ফাঁকা হাতে বেরিয়েছিলে।

'৮' জবাব না দিয়ে ডাণ্ডা তুলে নেয়। শতছিন্ন অলিভ গ্রিন সামরিক প্যান্টের পকেটে দুখানা ভারী পাথর ঢোকায়।

—আমার মন বলছে এমনও হতে পারে যে মালিক এসে পড়েছে।

—ফের ভুল করছ। ওসব মন বলাটলায় আমরা বিশ্বাস করি না। মন অনেক কথাই বলে। বাস্তব পরিস্থিতি সেই কথাগুলোকে তছনছ করে দেয়।

লেনিনের মুখে রোদ পৌঁছায় অবশেষে।

কুমারকে ঘুম থেকে উঠিয়ে জিশা যখন চত্বরে পৌঁছল তখন বিরাট ভিড় জমে গেছে। খিস্তি আর হাসির হররা ছুটছে। শকুন ঝটপট করে বার্বি পুতুলের মাথা থেকে কারখানার ছাদে নেমে আসে। হাততালি পড়ে। সিটি দেয় কেউ। এক মাথা-ন্যাড়া-ন্যাবা ছেঁড়া হাফপ্যান্ট পরে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। ফলে তার সামনে পেছনে সবকিছুই দেখা যায়। ভিড়ের থেকে বেশ কিছুটা দূরে আকাশের দিকে হাঁ মুখ করে থাকা একটা বরবাদ অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট্ কামানের পেছনে দাঁড়িয়ে গোটা ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে '৮' ও '৯'।

—আমাদের কাজটা ভেস্তে গেল।

—কেন? পোস্টার মারব না?

—আজ মেরে লাভ নেই। কেউ পড়বে না। এরপর ওরা শকুনটাকে মারার চেষ্টা করবে। তারপর সেই নিয়ে মশগুল থাকবে।

—কিন্তু শকুনটা তো উড়েও পালাতে পারে।

—দেখে মনে হচ্ছে কমজোরী বা চোট খাওয়া।

—একটা কাজ করলে কেমন হয়?

—কি?

—হাতকাটা আর সাদামুখের দলের মধ্যে তো আকচা-আকচি আছেই। সেটাকে এই তালে চাগিয়ে দিলে কেমন হয়!

—মোক্ষম! ঠিক সময়ে ব্যাপারটা মাথায় খেলেছে তোমার।

—মানে, হঠাৎ মন বলল এটাই আমাদের এখন প্রধান কাজ।

—ফের সেই মন বলল। মন বলার কোনো দাম নেই। কথাটা হাজারবার বুঝিয়েছি তোমায়। মন বলা ফালতু। মাথা খেলানোটাই হল আসল।

—বার বার আমার কমরেড এই ভুলটা হয়ে যায়।

জিশা-র মাকে বুড়ি বলা চলে না। অন্য তিন বুড়ি বেশ্যার চেয়ে সে আগে আগে ছোটে। ওরা তিনজন তিনটে শিক বেরোনো ছেঁড়া ছাতা নিয়ে পেছনে পেছনে সরু গলায় চিৎকার করতে করতে আসে। তিনজনের একজন ডাইনে বাঁয়ে থুথু ছিটোয়। একজন বিড়বিড় করে মন্তর বলে নেয়। তারপরেই চিলচিৎকার দিয়ে হেসে ওঠে। অন্যজন ছাতা বনবন করে ঘোরায়। উপুড় হয়ে শোয়া ন্যাড়া পাগলের নিতম্বে আধবুড়ো একটা লোক কাঠি দিয়ে খোঁচায়। ন্যাড়া

পাগল উল্টে যায়। জিশা আনন্দে বোবা চিৎকার করে। কারণ শকুনটা ফের ডানা ঝটপট করছিল। নাচ শুরু হয়ে যায় চত্বরে। দঙ্গলের মধ্যে তিন বুড়ি বেশ্যার ছেঁড়া ছাতা চক্কর খায়।

কারোরই খেয়াল হয়নি যে অনেক দূর থেকে গোটা ঘটনাটা লক্ষ করছিল একজন। অনেক রাস্তা হেঁটে সে খেলনানগরে সবে ঢুকেছে। এতটা পথ হাঁটলে, বিশেষত পিঠে ছেঁড়া হ্যাভারস্যাকে অত রাবিশ মাল থাকলে জাঁকাবারই কথা। হ্যাভারস্যাকের সঙ্গে আবার বিবর্ণ নাইলনের দড়ি দিয়ে দুটো সাইকেলের চাকা বাঁধা। প্রায় ৬ ফুট লম্বা। এত দাড়ি আর বড় চুল যে চিনতে অসুবিধে হয় না লোকটা হয় পাগল নয় ফেরার ডাকাত বা পলাতক সৈনিক। অবশ্য নিছক নির্জলা হোব বা ভাবঘুরে হতেও আপত্তি নেই। জিপ খোলা একটা উইন্ডচিটার পরা। ভেতরে নোংরা শার্ট। দুটো হাঁটুতেই তালি মারা জিনস। গলায় কালো কারে বাঁধা একটা ছোট্ট বালিশের মতো দেখতে তাবিজ। দুটো হাতেই তিনটে করে আংটি। পাঁচটাতে ধ্যাবড়া ঘষা সস্তার পাথর। একটাতে রেড ইন্ডিয়ান যোদ্ধার ধাতব মুখ। নাকটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। উইন্ডচিটার যে শুধু দূর থেকে ভিড়ের দিকেই তাকাচ্ছিল এমন নয়। পেছনের বিষাক্ত পাহাড়, আকাশে দাঁড়ানো আধপোড়া চুল বার্বি পুতুল, ছেঁড়া ছেঁড়া ধোঁয়া রঙের মেঘের ব্যান্ডেজে তাপ্পি মারা জখম আকাশ, অচেনা হয়ে যাওয়া ভূ-চরাচর—সবকিছুই সে দেখছিল।

'৮' আর '৯' আলাদা হয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। '৮' গেল জটলার সেই দিকটায় যেদিকে হাতকাটা তার দলের কয়েকজনকে নিয়ে দাপাচ্ছিল।

—উফ্, এই শকুনটাকে ঘায়েল যে করবে সে মায়ের দুধ খেয়েছে মানতে হবে। যা ডানার জোর। পাহাড়ী শকুন বলে কথা।

হাতকাটার দলের ঘেয়োর কানে কথাটা গেল।

—জীবনে ক'টা শকুন দেখেছ যে চিনলে ওটা পাহাড়ী শকুন। লাল বই-তে লেখা আছে?

—আছে আবার নেইও বটে।

—মানে?

—মানে ফানে জানি না। লক আউটের সময় দেখেছি যারা রেল লাইনে গলা দিত তাদের পাহাড়ী শকুন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত। পুবদেশে। এটাও সেই জাতের। মদ্দাই হবে।

—নিকুচি করেছে মদ্দা শকুনের!

ঘেয়ো একটা কাফিড্রিলের ফাঁকা শিশি ছোঁড়ে। পৌঁছয় না। ওদিকে '৯' দলের হালকা সাদামুখদেরও তাতিয়ে দিয়েছে। সাদামুখের হাতে গোনা দুজন সাকরেদ—বস্তা আর রুমালী। তারা তাল ঠুকে এগিয়ে যায়। কারখানার বাড়ির জাল বসানো জানলা বেয়ে একতলার আলসেতে উঠে পড়ে। হাতকাটা তাদের একটা লাঠি এগিয়ে দেয়। লাঠিটার ডগায় একটা ভাঙা ঝাঁটা বাঁধা। সেটা হুশ হুশ করে শূন্যে দোলাতে শকুনটা ভয় পায়। হঠাৎ উড়ে ভিড়ের দিকে নেমে আসে। লোকজন এদিক ওদিক ছিটকে যায়।

এরপরই শকুনটা অদ্ভুতভাবে ডানদিকে নড়ানড়ি করে কয়েকটা পা হাঁটে। অনেকটা কাঁকড়ার মতো। তারপর উড়ে দরজির ঘরের ওপরে গিয়ে বসে। টাল সামলায়। এদিকে হাতকাটা আর তার দলের অন্যরা বরকন্দাজ, ঘেয়ো, দাগী সবাই মিলে বলতে শুরু করে, মন্ত্রের মতো নিচু স্বরে।

—হুব্বা! হুব্বা! হুব্বা! হুব্বাঃ লোকেরাও তাদের সঙ্গে গলা মেলায়। সাদামুখরা গলা মেলায় না। তারা দলে কম। বুঝতে পারে যে শকুন শিকারের অধিকার ওই বিচিত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। হাতকাটারা শকুনটাকে ধাওয়া করে। ইটপাথর

pathagar.net

ছোঁড়ে। ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। দেরি করে যারা হল্লা দেখতে আসছিল তারা হাতকাটাদের দৌড়োবার জন্যে ফাঁক হয়ে রাস্তা করে দেয়। ওদের পেছনে জনতা ছোটে। সাদামুখরা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। '৮' আর '৯' ওদের কাছে যায়।

—কি হল? তোমরা শকুন মারতে গেলে না?

ওরা জবাব দেয় না।

—শকুন মারার পরে হাতকাটার দর বেড়ে যাবে। লোকে ওকেই খেলনানগরের রুস্তম বলে মেনে নেবে।

এবারে সাদামুখ রেগে ওঠে।

—আমরাই তো শকুনটাকে নামালাম। ওদের ধকে কুলোতো? কত বলে রুস্তম দেখলাম।

—ওসব কথা লোকে শুনবে? যে মারবে তারই নাম থাকবে। বাকি সব ভক্কা!

—হুব্বা! হুব্বা! হুব্বা! হুব্বা!

চিৎকারটা দূর থেকে উইন্ডচিটারের কাছে আসে। ও হ্যাভারস্যাক থেকে গায় ফেল্ট জড়ানো একটা ওয়াটার-বট্ল বের করে। ঠোঁট ভিজোবার মতো এক চুমুক জল খায়। ছিপি বন্ধ করতে করতে দূরে দেখে।

পুরো খেলনানগর ঘুরে বিজয় মিছিল ফিরছে। লুঙ্গি পরা পেটমোটা হাতকাটা সকলের আগে। সে এগোচ্ছে দড়িতে বাঁধা পায়ের নখ, রক্তাক্ত মাথা, ঠোঁট ছেঁড়তে ছেঁড়তে চলে হাতকাটার পেছনে পেছনে। বরকন্দাজ, ঘেয়ো, দাগী, সকলেই শকুনের এক একটা পালক ছিঁড়ে হাতে নিয়েছে। তিনটে ছেঁড়া ছাতা সাঁই সাঁই করে পাখসাট মারে ও উলু দেওয়ার মতো সরু চিৎকার সমবেত হুব্বা! হুব্বা-র সঙ্গে সঙ্গত করে। খেলনানগরে কাউকে যখন দল বেঁধে মারা হয় তখন তাকে কারখানার ছাদে, বার্বি পুতুল দাঁড়াবার তেপায়া স্তম্ভ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সরব উল্লাসের মধ্যে মরা শকুনকেও ঠ্যাঙে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর বিকেল পড়তে না পড়তে কাফিড্রিল-এর আসর জমে ওঠে। জিশার মা-কে হাতকাটা ডেকে পাঠায়। সাদামুখ নেশায় চুরমার হয়ে নিজের দলের লোকদের বেইমান বলে দূষতে থাকে। '৮' আর '৯' সারাদিনের ঘটনা বিশ্লেষণ করে ও আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে করতে ঘুমে ঢলে পড়ে।

বামন সেই রাতে ঘুমোয়নি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরটাও ভাল থাকে না। বার বার পেচ্ছাপ করতে উঠতে হয়। পাশাপাশি অতগুলো ফাঁকা ঘরের মধ্যে থাকতে তার ভয় করে না। বামন বাইরে এসে দেখল চাঁদ বেশ আলো দিচ্ছে নিশুতি খেলনানগরে। সকালে সে-ই প্রথম শকুনকে দেখেছিল। এবারও সে-ই প্রথম। উত্তরদিকে খেলাননগরে ঢুকতেই যে ডানহাতি ঘর, যেখানে গার্ডরা রাতে বসে থাকত, সেই ঘরটায় ম্লান আলো দেখা যাচ্ছে। খেলনানগরে কেউ তো আলো জ্বালে না। একবার শীতের হাওয়ার মতোই ভয়টা এল। আবার চলেও গেল। বামন ঘরে ঢুকে বিছানা থেকে চাদরটা নিয়ে গায়ে জড়াল। বালিশের তলা থেকে ভাঁজ করা ক্ষুরটা নিয়ে প্যান্টের পকেটে ঢোকাল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে সন্তর্পণে দরজাটা ভেজিয়ে দিল শব্দ না করে। পাড়ি নদীর বিষাক্ত জল চাঁদের আলোয় অসংখ্য রুপোলি চুমকিতে সেজেছে। বামন চাদরে কান মাথা জড়িয়ে নেয়।

আবজানো দরজায় টোকা পড়ে। ঠক ঠক ঠক।

—দরজা খোলা আছে।

বামন দরজাটা ফাঁক করে তাকায়। একটা মোমবাতি জ্বলছে। সেই আলোতে হুমড়ি খেয়ে

উইন্ডচিটার একটা বই পড়ছিল।

—তুমি কে?

—আমি? আমি বিদেশি নই। আজই এসেছি।

—নাম?

—যখন যেখানে যাই সেখানে লোকে যা ভালো লাগে তেমন একটা নাম দিয়ে দেয়।

—ভবঘুরে?

—বললে আপত্তি নেই। ওই প্যাকিং বাক্সটায় বসা যাবে? বামন বসে। উইন্ডচিটার চশমাটা খোলে। ভাঁজ করে।

—আমার কাছে কিন্তু কোনো অস্ত্র নেই।

—মানে?

—তোমার পকেটটা ছোট মাপের। তাই জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে। বামন পকেটের ক্ষুরের ওপর দিয়ে হাত চাপা দেয়।

—থাকুক না। বের না কারলেই হল। ভাঁজ করা ছুরি হতে পারে। তার মনে হচ্ছে ক্ষুর। খুব খারাপ জিনিস।

বামন বিষয় পাল্টায়।

—ওটা কী বই? কতদিন বাদে একটা ইংরেজি বই দেখলাম।

উইন্ডচিটার বইটা এগিয়ে দেয়। বামন মলাটটা পড়ে—'দা নিউক্লিয়ার উইনটার'।

—এখন আর এই বই পড়ে লাভ?

—লাভও নেই ক্ষতিও নেই।

—এই জায়গাটার নাম তুমি জানো?

—হ্যাঁ। রাস্তায় কয়েকটা দিকচিহ্ন রয়েছে। তাতে লেখা আছে।

—রাস্তায় ডাকাত বা ঠগীরা ধরেনি?

—ধরেছিল। আমার কাছে নেবার মতো কিছু নেই। খেলনানগর সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি? অসুবিধে না থাকলে।

—আজই?

—আপত্তি না থাকলে।

—না মানে, অতটা পথ, আজ রাতটা জিরিয়ে নিলে হত না?

—জিরিয়ে নিয়েছি। শকুনটাকে মারার পর উত্তেজনা যখন ঝিমিয়ে গেল তখন আমিও একটু ঘুমিয়ে নিলাম।

—শকুনটাকে মারা তুমি দেখেছ?

—ঠিক দেখিনি, তবে মারা যে হয়েছে সেটা দূর থেকেই আঁচ করলাম। একটা ফাঁড়া কাটল।

—কিসের ফাঁড়া?

—শকুন! শকুন আসা ভালো নয়। অমঙ্গল হয়। ওটাকে মারতে না পারলে খুব ক্ষতি হয়ে যেত তোমাদের।

বামন আর উইন্ডচিটার কথা বলতে থাকে। মোমবাতিটা নিভিয়ে দেয় উইন্ডচিটার। ওদের কথা চলে। বামন উইন্ডচিরটারকে বলে খেলনানগরের বিচিত্র ইতিহাস।

মরা শকুনটা হাওয়ায় সিঁটিয়ে সিঁটিয়ে শক্ত হয় আর দুলতে থাকে। পাখিটাকে যারা পিটিয়ে মেরেছিল ও তারপর বার্বি পুতুলের তেপায়া থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল তারা খেয়ালই করেনি

যে শকুনটার ফুটো কোটর কানা বাঁ চোখটার ভেতরে একটা প্রায় অদৃশ্য সবুজ কাচ বসানো আছে এবং ওর পালকের ফাঁক দিয়ে দিয়ে চুলের মতোই সরু দুটো তার বুনে বুনে পেটের দিকে গিয়েছে যেখানে তীরটা মাংসের ভেতরে ঢুকে একটা মাইক্রোব্যাটারির সঙ্গে জোড়া।

হিরণ্য শরীর

খেলনানগরের ইতিহাস বলার সময়ে বামন কয়েকবার ভেবেছিল যে উইন্ডচিটার বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তা নয়। শেষ রাতে বামন যখন বাড়ি ফেরে তখন উইন্ডচিটার তাকে কিছুটা এগিয়ে দিয়েছিল। তারপর উইন্ডচিটার আলো ফোটা অবধি পাড়ি নদীর পাড়ে যে বড় বড় কয়েকটা পাথর রয়েছে তার একটার ওপরে বসেছিল।

১৯৯০ সালে একজন ব্যবসায়ী খেলনানগরের পত্তন করে। তার আগে জায়গাটা কেমন ছিল সেটা প্রথমেই বলা হয়ে গেছে। তখন এই জায়গাটাকে ঘিরে বেশ কয়েকটা গ্রামও ছিল। সাদামুখের মতো অনেকেই এখনও খেলনানগরে রয়েছে যারা ওই সব গ্রামে থাকত।

ওই ব্যবসায়ীর বংশগত ব্যবসা ছিল খুবই বড় ও লাভজনক—বরবাদী জাহাজ ভাঙার কারবার। কিন্তু যা হয়, শেষ অবধি ভাইদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সে নিজের অংশ বেচে দেয়। দিয়ে এই খেলনানগর তৈরি এখানে যা তৈরি হত তাকে বলা হয় স্টাফড্ টয়—নানারকম। খেলনানগরে কিন্তু বার্বি পুতুল তৈরি হত না। ওই ব্যবসায়ীর একমাত্র মেয়ে বার্বি পুতুল খুব ভালবাসত বলে সে দোতলা কারখানার মাথায় তেপায়া স্তম্ভের ওপরে ওই বিশাল বার্বি পুতুল বসায়।

কারখানার দোতলা পোড়া বাড়িটা এখন ভূতের মতো পড়ে রয়েছে কিন্তু তখন ওর জেল্লা ছিল খুবই। লোকটা ব্যবসা শুরুই করেছিল আঁটঘাট বেঁধে—কানাডা আর ইতালিতে খেলনা পাঠাবার মোটা অর্ডার ছিল তার কাছে। স্টাফড্ টয় বানাবার জন্যে যা যা প্রধানত দরকার হয় তা হল ফাইবার, ফোম রবার ও উলের কাপড়। কারখানার একতলাটা ছিল গুদাম। এখানে ওই সব মাল রাখা থাকত। দোতলার ছিল পুতুল তৈরির ব্যবস্থা। এখানে কুকুর, ভালুক, খরগোশ, হাতি, বাঁদর, কুমির, কচ্ছপ, পেঙ্গুইন, ডলফিন, জেব্রা, বেড়াল, তিমি মাছ, বাঘ, ক্যাঙারু ইত্যাদি নানারকম জীবজন্তুর আদলের কাপড় কাটা হত, তারপর ভেতরে মাপমতো ফোম রবার দিয়ে সেলাই করা হত। এই সেলাই করার বেশিটাই হত হাতে যদিও কয়েকটা সেলাই মেশিনও চলত। দোতলায় ছিল দুটো ডিপার্টমেন্ট, প্যাকিং আর সিউইং। গোড়ার দিকে, সবে খেলনা তৈরি শুরু হয়েছে, এমন সময় কম মজুরি দেওয়ার জন্য শ্রমিক বিশেষত মেয়েরা ধর্মঘট করায় বেশ কিছুদিনের জন্য কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর নতুন ম্যানেজার এনে নতুন করে কাজ শুরু হয়।

বাইরে থেকে ব্যবসায়ী জনা দশেক দক্ষ পুরুষ শ্রমিক আনিয়েছিল। তাদের মধ্যে '৮' আর '৯' বেঁচে আছে। ধর্মঘটের সময় কারখানার সশস্ত্র গার্ডদের গুলিতে '১' থেকে '৫' মারা যায়। পরে যখন গুণ্ডামি করার জন্যে হাতকাটা ও অন্যদের আনা হয় তখন রাস্তা অবরোধ করার আন্দোলনে '৬' ও '৭' খুন হয়েছিল। এখানে কোনোদিনই কোনো আইন চলত না। কারখানায় আগুন নেভাবার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক যোগাযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়ী যখন গাড়ি যাতায়াতের পূর্ববর্ণিত উত্তরমুখী সিধে সড়ক বানায় তখন আগুন লাগতে

পারে কি না দেখার জন্যে একজন ইন্সপেক্টর এসেছিল কিন্তু তাকে মোটা ঘুষ দিয়ে সার্টিফিকেট আদায় করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। লোকটা তখন সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। প্রথমে গাঁইগুঁই করেছিল যেমন গোড়ার দিকে সকলেই করে। কিন্তু পরে যখন বোঝে যে হয় ওপরতলায় উল্টো রিপোর্ট চলে যাবে বা হাতকাটার দল খুন করে নদীর পাড়ে পুঁতে রেখে দেবে তখন সব মেনে নেয়। দোতলায় শ্রমিকরা ঢুকে যাওয়ার পরে গ্রিলের দরজা তালা দিয়ে দেওয়া হত। কেউ যাতে মাল চুরি না করতে পারে সেইজন্যে প্রত্যেকটা জানলায় শিক তো ছিলই, বাইরে থেকে জালও লাগানো হয়েছিল।

—আগুনটা লেগেছিল কবে?

—বলছি। একটু জল হবে?

—হবে।

অন্ধকারে এখন বেশ দেখা যাচ্ছে। উইন্ডচিটার ওয়াটার বটলের মুখ খুলে এগিয়ে দেয়। বামন জল খায়।

—এই জলের স্বাদটা অন্যরকম। পুরনো কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

—তোমরা কোন জল খাও?

—আমরা ওই নদীর জল খাই। জানি বিষাক্ত, কিন্তু উপায় কোথায়? তাই আমাদের হাতের তেলো, পায়ের চেটো ও মুখে দেখবে নীল নীল ছোপ। পরে ওগুলো ঘা হয়ে যায়। আর সারে না।

—জলটা বিষাক্ত! কেন?

—বলছি। আগুন, জল, যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, খেলনানগর একটা মরা জায়গা, একটা ভাগাড়। একটা কথা বলি। যত তাড়াতাড়ি পারো চলে যাও।

—আমার কিন্তু খারাপ লাগছে না।

—এত কিছু শুনেও খারাপ লাগছে না?

—না। আমি অনেক জায়গা ঘুরেছি। নানারকম দেখেছি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ বাষ্প হয়ে উবে যায় তখন আর কিছুতেই অবাক লাগে না। এটা সওয়া হয়ে যায়।

—এই কথায় মনে পড়ল। কারখানার মালিক ওই ব্যবসায়ী রাজধানীতেই থাকত। ওখানেই তো প্রথম বোমা পড়ে।

—হ্যাঁ। তারপর বন্দর—শহরে।

—জানি। তবে একটা বাঁচোয়া। খেলনানগরে কখনও বোমা পড়বে না। হয়ত আমরা ধুঁকে ধুঁকে মরব। কিন্তু বোমায় পুড়ে মরতে হবে না।

যুদ্ধের আগে, বিশ্বায়নের রমরমা বাজারে প্রথম বিশ্ব থেকে খেলনার অর্ডার অনেক বেড়ে যায়। '৯৮-এর বিশ্বকাপ ফুটবলের আগে ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক টয় ফুটবলের অর্ডার এসেছিল। তাই জন্যে আরও বেশি শ্রমিক, বিশেষত সেলাই জানা মেয়েদের দরকার হয়ে পড়েছিল। পুরোদমে যখন কাজ চলছে তখনই আগুনটা লেগেছিল। তখন দিনরাত মিলিয়ে চারটে শিফটে কাজ চলছিল। ইঁদুরে কাটা হাই ভোল্টেজ তারে শর্ট সার্কিট হয়ে একতলার গুদামে আগুন লাগে। দিনটা ছিল মে দিবস ১ মে। মুহূর্তের মধ্যে লেলিহান আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। দোতলায় ওঠার যে একটাই সিঁড়ি সেটা ছিল কাঠের। ওপরে, হিসেবমতো বলা হয়েছে ৮১জন পুড়ে মারা যায়। ৬ ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বলেছিল। যারা মারা যায় তাদের মধ্যে বেশিরভাগই মেয়ে। এরা আশপাশের গ্রাম থেকে আসত বা বাইরে থেকে এসে

খেলনানগরে থাকত। মৃতের সংখ্যা অবশ্য কখনওই ঠিক করে জানা যাবে না। কারণ অনেককে আলাদা করে চেনাই যায়নি।

—আর একটা ব্যাপার আমি নিজের চোখে দেখেছি বলে ভালো করেই জানি। বেশ কিছু বাচ্চাও বড়দের আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে কাজ করতে আসত।

—মালিক কোনও ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল?

—কিসের ক্ষতিপূরণ? বরং যারা আহত হয়েছিল তাদের হদিশই পাওয়া যায়নি। যদিও বলা হয়েছিল যে চিকিৎসার জন্যে তাদের বাইরে পাঠানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে একমাত্র সাদামুখ লুকিয়ে সেরে ওঠে। '৮', '৯' আর বুড়ো দরজি বেঁচে যায়। কিন্তু দুর্ঘটনার পরে ওদের তিনমাস আটকে রাখা হয়েছিল যাতে খবর না পাচার হয়।

—তোমাকে?

—আমি হিসেব কষতাম। দিনমজুরি দিতাম। আরও অনেক কাজ করতাম। ওরা জানত যে আমি বলব না।

—কেন?

—ভয়ে।

—আমাকে যে সব কথা বললে!

—এখন বলা না বলাতে কিছু যায় আসে না। '৮' আর '৯' কিন্তু সেই থেকে কারখানা খোলার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। আমার তো মনে হয় ওরা পাগল।

—কেন?

—কে কারখানা খুলবে? কে টাকা দেবে? আর কারখানায় কাজ কারা করবে? কে অর্ডার ধরবে? কী করে কী হবে?

—কেন? খেলননাগরে যারা থাকে, তারা পারবে না?

—ওরা কিছুই করতে পারবে না। যতদিন মজুত খাবার আর কাফিড্রিল আছে ততদিন। তারপর শুকিয়ে মরে যাবে।

—'৮' আর '৯' কী করে?

—ওরা দুজনে মিলেই মিছিল বার করে। পোস্টার মারে। লোকে বুঝতে চায় না, শুনতে চায় না তবুও বোঝায়, বলে। তবে একটা ব্যাপারে ওদের আমি তারিফ করি।

—কী ব্যাপারে?

—এ তল্লাটে সবাই হাতকাটার দলের ভয়ে থাকে। ওদের সঙ্গে লাগলে আর রক্ষে নেই। ওরা কিন্তু হাতকাটাদের ভয় পায় না। এটা কম কথা নয়। আজই তো হাতকাটার রমরমা আরও বেড়ে গেল। কাল থেকে দেখবে ওদের ডমফাই ডবল হয়ে গেছে।

—কেন?

—ওরাই তো শকুনটাকে মারল। তোমার কথায় বড় একটা ফাঁড়া কাটল। এই ব্যাপারগুলো আমি বুঝি না।

—কী?

—এই ফাঁড়া, বিপদ, অশুভ সব ব্যাপার। '৮' আর '৯'-এর সঙ্গে এ ব্যাপারে আমি একমত।

—তা হতে পারো। কিন্তু আমার কথাগুলো মিথ্যে নয়। শকুনটাকে কারা ডেকেছিল বলতে পারবে?

—কে আবার ডাকবে? শকুনকে কেউ ডাকে?

—ডাকে। তা না হলে মরা নেই, ভাগাড় নেই, কিচ্ছু নেই, হঠাৎ করে শকুন আসবে কেন? ডাক পেয়েছে তাই এসেছিল।

—কারা ডেকেছিল?

—যারা পুড়ে মরেছে তারা। ওরা এখনও জ্বালায় ভুগছে, খিদেয় পুড়েছে, অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তোমরা বুঝতে পার না?

—না।

—ওদের চিৎকার বা কান্না শুনতে পাও না?

—না। তবে কেউ কেউ বলে রাতে নাকি দোতলার থেকে আর্তনাদ শোনা যায়।

—সেটাই তো স্বাভাবিক। কেউ কেউ নয়, সকলেই শোনে বা একদিন শুনবে। বাধ্য হয়ে শুনবে। আমি এরকম অনেক দেখেছি।

পুতুল কারখানায় আগুনের পরই এককথায় বলতে গেলে খেলনানগর মরে গেল। তারপর থেকে যেটা বেঁচে আছে সেটাকে হয়ত বা খেলনানগরের ভূতই বলা যায়। খেলনা আর পুতুল ঘিরে যে ছোট্ট উপনিবেশটা গড়ে উঠেছিল সেটা যে আর বেঁচে বর্তে নেই বা খরচের খাতায় চলে গেছে সেই খবরটা নির্ঘাৎই ওপর মহলে পৌঁছে গিয়ে থাকবে। তা নাহলে যুদ্ধ লাগার কয়েক মাস আগে অর্থাৎ দেশ জুড়ে যখন ঘোর গৃহযুদ্ধ চলেছে তখন হঠাৎ খেলনানগরের পশ্চিম দিকে তেজস্ক্রিয় ও রাসায়নিক আবর্জনা ফেলে কৃত্রিম পাহাড় বানাবার পরিকল্পনা নেওয়া হবে কেন? বা এমনও হতে পারে যে এখানে ওই আবর্জনা ফেলার পরিকল্পনা যারা করেছিল তাদের হয়ত এটাই বলা হয়েছিল যে একসময়ে ওখানে পুতুল তৈরির কারখানা ছিল, লোকজন থাকত কিন্তু আগুন লেগে কারখানা ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার পরে সেখানে আর মানুষজন নেই এবং অদূর ভবিষ্যতে যে মানুষ এসে আবার সেখানে থাকবে এমন কোনো সম্ভবনাও নেই।

—আমরা অবাক হয়ে দেখতাম। তাজ্জব এক কাণ্ডকারখানা। পরের পর ট্রাক আসছে, পোড়াপাথর বা রবারের দলার মতো দেখতে জিনিস ফেলছে তারপর ফের ওই আবর্জনা আনার জন্যে ফাঁকা ফিরে যাচ্ছে। নিয়ম মেনে যেরকম পিঁপড়েরা সার দিয়ে কাজ করে সেরকম। ট্রাকগুলো সড়ক ধরে আসত। তারপর খেলনানগরে ঢোকার মুখে ডানদিকে বাঁক নিয়ে নদীর ওপর দিয়ে পেছন দিকে চলে যেত। এই ট্রাকগুলো খুব বড় আর চাকাগুলো দেখতে খাঁজ কাটা কাটা—ট্র্যাক্টরের চাকার মতো। আমরা ট্রাকগুলোর নাম দিয়েছিলাম বেলচাগাড়ি। বেলচার মতোই গাড়িগুলোর পেছনের মাল নেওয়ার জায়গাটা উল্টে আবর্জনা ফেলত।

—কখন তোমরা বুঝতে পারলে যে ওই আবর্জনা বিষাক্ত!

—পরে। ওরা আবর্জনা ফেলেছিল শুখা মরশুমে। তখন কিছু হয়নি। ওদিকে যাওয়াও বারণ ছিল। তবুও সাহস করে যারা যেত তাদের কেউ কেউ পায়ে জ্বালা করার বা পরে ছোট ছোট ফোস্কার মতো হওয়ার কথা বলত। তখনও আমরা বুঝিনি।

—তারপর?

—বোঝা গেল বৃষ্টির পর। নদীর জলের রঙ পালটে গেল। মাছ মরে গেল। গাছপালা এদিকে এমনিতেই কম কিন্তু নদীর পাড় দিয়ে একজাতের কাঁটা ঝোপ হত। ওতে হলুদ ফুল হত। সেই ঝোপগুলোও মরে গেল।

—তোমরা ওই নদীর জল খাও?

—উপায় কী? ওই জলই খাই। জানি বিষ খাচ্ছি কিন্তু কী করব? অন্ধকার রয়েছে, তা না হলে দেখতে আমার হাতে পায়ে নীল নীল দাগ। সকলের এরকম আছে। কালকে আলোয়

দেখো। গৃহযুদ্ধের সময়েও যারা খেলনানগর থেকে পালিয়েছে মনে হয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাঁচতে পেরেছে। বাকিদের তো এই অবস্থা!

বামন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। উইন্ডচিটার আর বামন দুজনেই দুজনের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনে কিছুক্ষণ।

—এমন বিষ যে পোকা, মাছি, মশা কিছুই তুমি দেখতে পাবে না। শকুনটাকে যদি হাতকাটারা না মারত তাহলেও এমনিই মরে যেত। মারতে হত না। তাই তোমাকে বলছি যে যতই দেখে থাক না কেন এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি চলে যাবে ততই মঙ্গল। এখানে কেউ আসে না। কতদিন কেউ আসে না। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলেই গেছি। ওই যে ট্রাক আসত আবর্জনা নিয়ে তার এক ড্রাইভার নাকি '৮' আর '৯'-কে বলেছিল এইসব আর্বজনা নাকি আমাদের দেশ অনেক, অনেক টাকা পাবার জন্যে বিদেশ থেকে এনেছে। ওরা নিজেদের দেশে, বড়লোকদের দেশে এসব আবর্জনা তৈরি করলেও জমতে দেয় না, গরিব দেশগুলোতে পাচার করে দেয়। এটাই নাকি এখন দুনিয়ার নিয়ম। তোমার কি জানা আছে? এটাই নিয়ম?

—ঠিক লেখাপড়া করা নিয়ম বা আইন রয়েছে কি না জানি না। তবে কথাটা বোধহয় ঠিকই। গোটা দুনিয়া জুড়েই এরকম একটা অন্যায় চলেছে। গরিব দেশগুলোর লোক ভুগছে। করবেটা কী?

—উত্তরটা আমি জানি। কিচ্ছু করতে পারবে না। কিচ্ছু না। এক এক সময় ভাবি। '৮' আর '৯' না হয়, যতই পাগলাটে হোক, একটা বিশ্বাসের জোরে বেঁচে আছে। একদিন না একদিন পুতুল কারখানা নাকি খুলবেই। তা সে মরুকগে ওরা ওদের বিশ্বাস নিয়ে। অত যে নচ্ছার, ওই হাতকাটারও বেঁচে থাকার একটা কারণ হয়ত আছে। কিন্তু আমি বেঁচে আছি কেন? বামন হয়ে জন্মালাম, আস্ত মানুষ কিভাবে বেঁচে দেখেই গেলাম। অতবড় আগুন লাগল, অতগুলো লোক জ্যান্ত পুড়ে মরল আমার গায়ে আঁচটুকুই লাগল। তার বেশি নয়। তারপরেও দেখলাম জলের বিষে কত লোক মরে গেল এদিকে আমি যে কে সেই, ভূষণ্ডীর কাক হয়ে জ্যান্ত মরার মতো তিলে তিলে দগ্ধাচ্ছি। করে যে এর শেষ হবে বলতে পার?

—বলতে হয়ত পারলেও পারতে পারি, কিন্তু সত্যি যদি বলতেই হয় তাহলে বলব এসব কথা জানলেও বলতে নেই। আমাকে বরং তুমি একটা কথা বলবে?

—কি?

—'৮' আর '৯'-এর যে বেঁচে থাকার একটা কারণ রয়েছে সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু হাতকাটা? ও এখানে পড়ে থাকল কেন?

—আরে ও তো এসেছিল সেই ব্যবসায়ীর পোষা গুণ্ডা হিসেবে। আগে ওই বন্দর শহরে চোরাচালানের কাজ করত। আগুন লাগার পরে ওর তো থাকারই কথা নয়। কিন্তু ও থেকে গেল। ও যা যা জানে তার জন্যে অন্য জায়গায় গেলে ওকে লুফে নেবে। কিন্তু ও যাবে না। কিছুতেই না।

—কেন?

—তোমার সঙ্গে আজ যত কথা বলেছি তত বোধহয় গোটা জীবনে আর বলিনি আর বলবও না। যদি কথা দাও যে বন্ধুত্বের মান রাখবে, কথাটা কাউকে বলবে না, কাউকে না, তবেই বলতে পারি।

—তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমি কথা দিচ্ছি।

—আগুন লাগার সময়ে কারখানার যে ম্যানেজার ছিল সে-ই একদিন নেশার ঘোরে আমাকে

বলেছিল। খেলনানগরেরই কোথাও নাকি ওই ব্যবসায়ীর অনেক সোনার বিস্কুট লুকোনো রয়েছে। কথাটা নাকি হাতকাটাও জানে। কিন্তু জায়গাটা যে কোথায়, তা ওই ম্যানেজারও জানত না, হাতকাটাও জানে না।

—সেই ম্যানেজার এখন কোথায়?

—আগুন লাগার পরেই সে তল্লাট ছেড়ে পালায়। কোথায় কোনো হদিশ নেই।

—তুমিও কি বিশ্বাস করো যে সেই ব্যবসায়ীর সোনার বিস্কুট রয়েছে? এই খেলনানগরেই?

—আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কী এসে যায়? তবে আমি গোপনে নজর রেখে দেখেছি যে হাতকাটা অনেক জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি করছে বা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে শানের ওপরে বাড়ি মেরে মেরে ফাঁপা আওয়াজের তল্লাশ করছে। আমার নিজের চোখে দেখা।

—আমি একথা কাউকে বলব না ঠিকই, তবে একটা কথা। আমি যদি ওই সোনার বিস্কুট খুঁজে পাই তুমি তোমার ভাগ নেবে?

—আমার ভাগ! মানে?

—মানে খুবই সোজা। তুমি না বললে আমি তো কিছুই জানতে পারতাম না। আমি যে সোনার বিস্কুট খুঁজে পাব এমন কথাও বলছি না। কিন্তু যদি পাই তুমি কি নেবে তোমার ভাগ?

বামন জবাব দেয় না। তার জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ে। কাশে।

—এখন বলতে হবে না। অনেক রাত হয়েছে। ঘরে ফিরে যাও। গিয়ে ভাবো। কাল বা পরশু আমাকে বললেই হবে।

উইন্ডচিটারের কথার ধাঁচটা এতই গম্ভীর ঢঙের ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর যে বামন কোনো জবাব খুঁজে পায় না। তার জবাব খুঁজে না পাওয়া মৌন সম্মতিরই সামিল।

—চলো, তোমাকে এগিয়ে দিই।

—আমি নিজেই চলে যেতে পারব।

—সে তো পারবেই। আমি কি বলেছি তুমি পারবে না। আসলে আমারও এখন ঘুম আসবে না। বরং ঠাণ্ডায় কিছুটা হাঁটতে ভালোই লাগবে। চলো!

আদিত্য শরীর

বামনের পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠতে বেলা গড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উইন্ডচিটারের ঘুম ভেঙেছিল আগেই। জেগে উঠে উইন্ডচিটার দেখল এখন তার না উঠলেও চলে। তাই সে ভাবল এই অবশ জেগে থাকার মধ্যে একটা স্বপ্ন দেখলে কেমন হয়? স্বপ্নে সে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। কেউ কেউ বলে স্বপ্নে বা আধা জাগরণে মানুষ নাকি শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে— অ্যাসট্রাল ট্র্যাভেল বা আউট-অফ-ডি এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে একসময় পাগলামি কম হয়নি। বিশেষত ৯০ দশকে যখন ওলটপালট করা ঝড় এক মেরু বিশ্বের দিকে বাঁক নিল তখন তথাকথিত নয়াচিন্তার নামে হাবিজাবি আজগুবি ভাবনা কিছু কম হয়নি। স্বপ্নের মতোই। স্বপ্নটা কি চেনা কোনো জায়গা বা ঘটনা থেকে শুরু করা যায়? অথবা গায় পড়া উইন্ডচিটার, তার দাঁত ভাঙা জিপ ফাসনার থেকেই। কোথায় পড়েছিল যে জিপ ফাসনারের সঙ্গে রেলপথের একটা মিল আছে। কোথায়? কিন্তু দাঁত ভাঙা জিপ ফাসনারের জন্যে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এলে গলা অবধি টেনে দেওয়া যায় না। এটা ঠিক স্বপ্ন নয়। একটা

বাস্তব সমস্যা। এর মধ্যেই থাকতে থাকতে উইন্ডচিটার শুনতে পেল অনেক দূরে চড়া গলায় কেউ বকাবকি করছে। ঠিক তা নয়। কারণ তালে তালে কেউ বকে বা ধমকায় না। ঢংটাও অচেনা নয়। ওটা শ্লোগান।

শকুন মারার পর হাতকাটার দলের ওজন যে বেশ বেড়ে যাবে এটা '৮' আর '৯' ভালোই বুঝেছিল। সাদামুখদের তাতিয়ে কোনো লাভ হয়নি। অবশ্য এটাও মনে রাখতে হবে যে ভবিষ্যতে কোনো সংঘাত বা সংঘর্ষ, যা অনিবার্য, তা যখন হবে তখন হয়ত সাদামুখরা লড়াকু শ্রমিকদের পক্ষই নেবে। মোটের ওপর এরকমই ছিল '৮' ও '৯'-এর ধারণা। চত্বরে ওরা চারটে পোস্টার মেরেছিল—'মালিক তুমি পালিয়ে পার পাবে না!' 'জঙ্গি শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াও!' অমর শহিদ লাল সেলাম!' ও 'দুনিয়ার মজদুর— এক হও!'

উইন্ডচিটার গত রাতের কথার সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে পারল যে '৮' ও '৯'-এর আন্দোলন চলছে। শ্লোগানগুলো দূরে সরে যেতে লাগল। '৮' আর '৯' একজায়গায় থেমে নেই। ওরা খেলনানগর পরিক্রমা করছে।

—বন্ধ কারখানা খুলতে হবে। কোনো জবাবী শ্লোগান নেই।

—কী হল? আওয়াজ কোথায়?

—পারছি না। গলায় কষ্ট হচ্ছে।

—পারছি না আবার কি? কষ্টফষ্ট ভুলে যাও। গলা চিরুক।

—দুঃখিত কমরেড। শ্লোগান দাও।

—মালিকের কুত্তা গুণ্ডা-বদমাশ হুঁশিয়ার।

—হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!

—দালালদের হালাল কর!

—হালাল করো! হালাল করো।

—পুলিশ দিয়ে আন্দোলন বন্ধ করা যায় না, যাবে না।

ফের জবাবী শ্লোগান নেই।

—কী হল?

—এবার কমরেড তোমারই ভুল। আমার গলার নয়। পুলিশ কোথায়?

—ঠিকই তো। অভ্যেস হয়ে গেছে বলে বলে। গুলি মারো। আচ্ছা, আজকের কর্মসূচিতে স্ট্রিট কর্নার ছিল না?

—দাঁড়াও। একবার দেখে নিই।

'৯' পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে। পড়ে।

—হ্যাঁ, কারখানার চত্বরে।

—তাহলে তুমি একটু জিরিয়ে নাও।

—হ্যাঁ, বড্ড হাঁপিয়ে গেছি। ওরা যখন জিরিয়ে নিচ্ছিল তখনই বরকন্দাজ দেখেছিল যে, দূরে গার্ডের ঘরের কাছে একটা লোক, লম্বা, দাড়িওয়ালা, উইন্ডচিটার আর জিনস পরা এদিক ওদিক দেখছে। লোকটা রাস্তা থেকে কী একটা কুড়িয়ে নিল। পকেটে রাখল। নদীর দিকে তাকিয়ে থাকল। বরকন্দাজ দৌড়োল হাতকাটাকে খবর দিতে।

অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফ্‌ট কামানের গায়ে হেলান দিয়ে জিশা আর কুমার বসেছিল। কুমার একটা কুড়িয়ে পাওয়া বই-এর পাতায় যতটুকু পড়া যায় সেটা পড়ছিল আর জিশা ওর কাঁধে মাথা রেখে চুপ করেছিল। পাতাটার ওপর দিকে পাশাপাশি তিনটে নকশা আঁকা— একটা লম্বাটে

pathagar.net

পাইপের মতো, একটা গোল আর তিন নম্বরটা অনেকটা গেলাশের মতো—তিনটে ছবির ওপরে যথাক্রমে ইংরেজিতে ছাপা-গান-টাইপ ফিশন বম্ব, ইমপ্লোশন টাইপ ফিশন বম্ব ও থার্মোনিউক্লিয়ার ওয়ারহেড। প্রত্যেকটা ছবির আবার বিভিন্ন অংশের পরিচয় তীরচিহ্ন দিয়ে লেখা। যেমন তিন নম্বর ছবিটার তিনটে ভাগ— লিথিয়াম ডিউটেরাইড, ইউ-২৩৮ এবং ফিশন ডিভাইস। পাতাটা হাতে মুচড়ে দলা পাকিয়ে কুমার দূরে ছুঁড়ে দিল আর ঠিক সেই সময়ে, কাছেই, চত্বর থেকে শ্লোগান শোনা গেল :

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

—জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ।

—ভুখা মজদুর করে পুকার।

—ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

কুমার জিশার মাথায় একটা চুমু খেল। জিশার শরীর জুড়ে আদর খাওয়া বেড়ালের মতো একটা স্পন্দন।

'৯' গলা খাঁকারি দেয়। তারপর বলে :

—কমরেডস, পুতুল কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও আপনাদের প্রিয় শ্রমিক নেতা কমরেড '৮' এখন বক্তব্য রাখবেন।

'৮' ভাষণ শুরু করে।

—কমরেডস, খেলনানগরের নাগরিকবৃন্দের কাছে... আজ আমাদের আন্দোলন... নানা ধরনের প্ররোচনা চলছে... কিন্তু আজ অবধি ন্যায্য ক্ষতিপূরণ নিয়ে মালিক পক্ষ আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসা তো দূরের কথা... বিশ্বায়নের নামে দুনিয়ার সমস্ত গরিব দেশের মেহনতি মানুষকে নিঃস্ব করে দেওয়ার এই চক্রান্ত... বুজরুকি আমরা অনেক সহ্য করেছি... আমরা জানি যে আমাদের কারখানায় যে পুতুল তৈরি হত তার চাহিদা এতটুকুও কমেনি... বাজার অর্থনীতির এই চক্রান্ত... আমাদের আবেদন যে আপনারা নিরাশ হবেন না, ভেঙে পড়বেন না, মালিকের দালালের মিথ্যা প্রচারের ফাঁদে পা দেবেন না... আমরা ওদের জানিয়ে দিতে চাই যে নতুন করে হামলা চালাবার ঝুঁকি যদি ওরা নেয় তাহলে আমরাও প্রস্তুত... আমরা হিংসা ও সন্ত্রাসের বিরোধী ঠিকই কিন্তু... যেন মনে রাখে আমাদের ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে... যুদ্ধ কারা বাধিয়েছে আপনারা ভালোভাবেই জানেন... এই যুদ্ধ, এই অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতি, এই প্রাণহানি... পরিস্থিতি যে একান্তই জটিল তা আমরা অস্বীকার করি না... আমাদের যে কমরেডরা সশস্ত্র পুলি ও মালিকের গুণ্ডাবাহিনীর চোরাগোপ্তা আক্রমণে শহীদ হয়েছেন... কমরেডস, দুনিয়ার যে মনগড়া ব্যাখ্যাই ওরা দিক না কেন আমরাই তাকে পালটাবার ক্ষমতা রাখি... তাই আজ আমাদের নতুন করে শপথ নিতে হবে যে... আমাদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই... আমরা জানি যে আমাদের এই লড়াই একটা ঐতিহাসিক সংগ্রাম... শেষ রক্তবিন্দু না ঝরা পর্যন্ত... আপনাদের সকলকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে ও আগামী দিনে আমাদের এই লড়াইকে আরও তীব্র আরও জোরদার করে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে... ইনক্লাব জিন্দাবাদ, পুতুল কারখানার লড়াকু শ্রমিক ইউনিয়ন জিন্দাবাদ।

ভাষণ শেষ করে '৮' হাঁপায়। '৯' ওর কাঁধে চাপড় মারে।

—দারুণ হয়েছে।

—কিছু বাদ যায়নি তো!

—তেমন কিছু মনে পড়ছে না তবে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির ব্যাপারটা একটু আগাম

জানিয়ে রাখলে হয়ত...

—কিন্তু তোমার সঙ্গে সিটিং না করে সেটা কি করে বলব?

—তা অবশ্য ঠিক।

—একটু জল খাওয়াতে পারো?

উইন্ডচিটার বলল, —পারি। '৮' আর '৯' চমকে উঠেছিল। এত কাছে, মাত্র কয়েক হাত দূরে, একটা সিমেন্টের চাঙড়ের ওপরে বসে লোকটা যে ভাষণ শুনছিল সেটা ওরা খেয়ালই করেনি। অথচ না দেখতে পাওয়ারও কথা নয়। চারদিকে ধা ধা আলো। উইন্ডচিটার ওয়াটারবটল এগিয়ে দেয়।

—বক্তব্যটা আমারও বেশ মনে ধরেছে। যদিও তোমাদের মতো ব্যাপারটা আমার জানা নেই।

—তুমি কি মালিকের লোক?

—মনে তো হয় না।

—তোমার নাম?

—যা ইচ্ছে দিতে পারো। শেষ যে শহরটায় ছিলাম সেখানে ওরা আমাকে উইন্ডচিটার বলে ডাকত।

—তুমি কি ছাঁটাই শ্রমিক?

—না।

—আর্মি থেকে পালিয়েছ?

—না। তাও নয়।

—তাহলে তুমি কী?

—উইন্ডচিটার। নাও, জল খাও। অনেকক্ষণ চেঁচিয়েছ।

'৮' ওয়াটারবটল খুলে জল খায়। উইন্ডচিটার বার্বি পুতুলকে দেখে। মুখে হাসি। ওদের দিকে জিশা আর কুমার এগিয়ে আসে। '৮' ওয়াটারবটল ফেরৎ দেয়।

—খুব মিষ্টি জল। এটা আমাদের নদীর জল নয়। তেতো ভাবটা নেই।

—শেষ যেখানে আমি ছিলাম সেখানে একটা কুয়ো থেকে এই জলটা ভরে নিয়েছিলাম।

—সেটা কত দূরে?

—অনেক।

—কবে এসেছ?

—কাল।

—দেখিনি তো।

—আমি ওই ঘরটায় আছি।

উইন্ডচিটার দূরে গার্ডদের ঘরটা দেখায়।

—কাল এই শহরে একটা কাণ্ড ঘটেছে। জানো?

উইন্ডচিটার ঝুলন্ত শকুনের দিকে তাকায়।

—জানি। কাণ্ডটা না ঘটলে খুব ক্ষতি হয়ে যেত তোমাদের।

—মানে?

—শকুন খুব অশুভ।

—তুমি ওইসব শুভ অশুভ মানো?

pathagar.net

উইন্ডচিটার জবাব দেয় না। জিশা আর কুমারকে দেখে। চেনা লোককে যেভাবে চেনা লোক দেখে। '৮' আলাপ করিয়ে দেওয়ার কাজটা করে।

—এ হল জিশা। ও কথা বলতে পারে না। ও হল কুমার। ভালো মেকানিক। আমাদের বন্ধু।

কুমার হাত বাড়িয়ে দেয়। উইন্ডচিটার হাতটা ধরে। ধরে '৮' আর '৯' এর সঙ্গে কথা বলে।

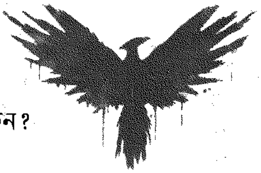

—তোমরা তো চাও যে কারখানাটা খুলুক।

—আমরা কেন? সবাই চায়।

—তাহলে সবাই তোমাদের কথা শোনে না কেন?

ওরা জবাব দেয় না।

কুমার বলে, আমি ওদের বলেছি। এসব বেকার হল্লাবাজি করে কি লাভ আছে? কে শোনে কার কথা? আরে, কারখানা কি নিজে নিজে খুলবে। কে খুলবে? বলছি হাতের কাজ জানো। চলো, দূরে কোথাও চলে যাই। ফালতু এখানে পড়ে থেকে লাভ?

—ওরা যদি না যায় তাহলে তুমি জিশাকে নিয়ে চলে যাও না কেন?

কুমার থতমত খায়।

—বাইরে, ঠিক ভরসা হয় না।

—আমি তো বাইরে থেকেই এলাম। যাক্ গে হোক, এখন চলি। আমার খুব ঘুমোনোর দরকার। পরে দেখা হবে।

যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় উইন্ডচিটার। শকুনটাকে দেখে। পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে। লাইটার। ধরায়।

—কেউ নেবে সিগারেট?

কুমার এগিয়ে যায়। কুমারকে দুটো সিগারেট দেয়। কুমার লজ্জা লজ্জা ভাব করে একটা বুকপকেটে রাখে। একটা ধরায়।

—চলি।

উইন্ডচিটার হাঁটতে থাকে। কুমার ফিরে আসে।

—বেশ দিলদরিয়া লোকটা। '৮' আর '৯' কিছু বলে না। হাওয়ার দমকে দড়িতে বাঁধা শকুন গোল হয়ে ঘোরে। ঠাণ্ডায় শুকোয়। কুমার যে ছেঁড়া পাতাটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তাতে ওই তিনটে নকশা ছাড়াও কিছু কথা লেখা ছিল। যেমন তীব্র তাপে হালকা ওজনের নিউক্লিয়াসের ফিউশন থেকে থার্মোনিউক্লিয়ার আয়ুধ তার ক্ষমতা পায়। এর জন্য দরকার সূর্যের কেন্দ্রের যে তাপ বা তারও বেশি—প্রায় ১৫,০০০,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ফিশন বিস্ফোরণ দিয়ে এই ত্রাস সৃষ্টি করা হয় বলে থার্মোনিউক্লিয়ার অস্ত্রকে ফিশন-ফিউশন বোমাও বলা হয়। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ফেলা হয়েছিল ফিশন বোমা। হিরোসিমার বোমাটি ৭০,০০০ থেকে ১০০,০০০ মানুষকে হত্যা করে। বর্তমানের থার্মোনিউক্লিয়ার অস্ত্র এর চেয়ে ৮ থেকে ৪০ গুণ শক্তিশালী। এক মেগাটনের একটি থার্মোনিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা ২০০,০০০,০০০ কামানের গোলার সমান। এইসব আরও অনেক কথা ওই পাতাটাতে ছাপা ছিল যা পুরনো হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে 'দা নিউক্লিয়ার উইন্টার' নামে যে বইটা বামন উইন্ডচিটারকে পড়তে দেখেছিল তার বক্তব্যও পুরনো হয়ে গেছে। কিন্তু মজা এইখানেই যে মানুষ যতটা জানে ততটাই বেশি করে জানতে শেখে বা চায়। যতটা সে জানে না তা নিয়ে তার মাথাব্যথা কম।

pathagar.net

বা থাকলেও অন্যের ভাবনা, সঁপে দেওয়া, মানুষের কাছে নয়। শুধু খেলনানগর নয়, নিউইয়র্ক, মস্কো, বেজিং, কলকাতা সব জায়গাতেই এই কথা খাটে।

গতরাতে বামন কিন্তু একটা আস্ত স্বপ্ন দেখেছিল। সেই স্বপ্নটা হল পুতুল কারখানায় হাজার হাজার পুতুল-বামন তৈরি হচ্ছে। সেই পুতুলগুলো স্টাফড্ টয় নয়, ফাঁপা। পেছনে, মলদ্বার যেখানে থাকে সেখানে বাঁশি লাগানো। ফলে টিপলে প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করে। এই পুতুল ছাপ মেরে বাজারে পাঠাবার পরে অনেক বামন এসে এইসব পুতুল কেনে। এবং তারাও গিয়ে বামন পুতুল তৈরির কারখানা বসায়। সেখানে আরও বামন তৈরি হয় এবং কানাডা ও ইতালিতে পুতুল পাঠাবার অর্ডার যে পেয়েছিল সেই মালিক অর্থাৎ আসল মালিক এবার বামনকে বলে গোটা ব্যাপারটার হিসেব কষতে। ঘামতে ঘামতে ঘুম থেকে উঠে বামন দেখল তাকে ধাক্কা দিয়ে বুড়ো দরজি ডাকছে।

—কী ব্যাপার! স্বপ্ন দেখছিলে?

—হ্যাঁ।

—আমি ভাবলাম, বেলা গড়িয়ে গেল, তুমি এলে না, শরীর খারাপ টারাপ হল কি না।

—কাল একজন খেলনানগরে এসেছে।

—কোথা থেকে?

—জানি না।

—নাম?

—নাম বলেনি।

—কাল রাতে কী হয়েছে জানো?

—কী?

—পুতুল নাকি গোল হয়ে ঘুরেছে। শুধু তাই নয়। ডুব সাঁতার দিয়েছে আবার মাথা তুলে হেসেছে।

—তুমি কী করে জানলে?

—আমি যখন আসছিলাম তখন জিশার মা বলল। ও নাকি তিনজনের কাছে শুনেছে।

—বলল আর তুমি বিশ্বাস করলে?

—ঠিক তা নয়।

—ওরা বলেছিল শকুন আসবে?

—জানি না।

বুড়ো দরজি আর বামন গার্ডদের ঘরে গিয়ে দেখল উইন্ডচিটার নেই। ওর হ্যাভারস্যাক খুলে সব ছড়ানো ছিটোনো।

দুটো মাইকেলের চাকা, কয়েকটা মোমবাতি, একটা ভাঙা ট্রানজিস্টার রেডিও, কয়েক প্যাকেট বিস্কুট, একটা টিনের কৌটোয় কিছু চুরুট ও ভাঙাচোরা কিছু ঘড়ি বা ক্যালকুলেটরের টুকরো, জং ধরা কয়েকটা ব্যাটারি, তামাক খাওয়ার পাইপ, কয়েকটা শিশিতে কিছু ট্যাবলেট, তিন চারটে বিদেশি ম্যাগাজিন ও দুটো বই। হাতকাটা তার দল নিয়ে ওর ঘরে এসেছিল। এসে হ্যাভারস্যাক উপুড় করে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু সন্দেহজনক পায়নি। দাগী বাইরে পাহারা দিচ্ছিল। উইন্ডচিটার আসেনি। বামন ও বুড়ো দরজিও উইন্ডচিটারের দেখা পেল না।

মুখে মুখে সকলেই জেনে গেল যে খেলনানগরে একজন নতুন লোক এসেছে। এ ধরনের খবর চাউর হলে এটাই স্বাভাবিক যে আগন্তুকের সঙ্গে নগরের বাসিন্দারা দেখা করতে চাইবে,

pathagar.net

আলাপ করবে, দুটো নতুন কথা শুনবে। কিন্তু পর পর তিনদিন উইন্ডচিটারকে কেউ খুঁজে পায়নি। অনেকেই ধরে নিয়েছিল যে ওইসব ভাঙাচোরা জিনিসপত্র বা ছেঁড়াখোঁড়া হ্যাভারস্যাকটা নিতে লোকটা আর আসবে না। নিজের মর্জিতে এসেছিল। নিজের মর্জিতেই চলে গেছে। '৮' আর '৯' সবগুলো সম্ভবনাই খতিয়ে দেখেছিল।

—মুখে না বললেও আমার মনে হচ্ছে যে লোকটা আদতে মালিকেরই। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চলে গেছে।

—কী বুঝতে পেরেছে যে চলে যাবে?

—আমি এইভাবে ব্যাপারটা দেখছি। ওকে পাঠিয়েছিল মালিক কারণ তার নিজের আসার সাহস নেই। ও এসেছিল আমাদের আন্দোলন জারি রয়েছে কি না এই খবরটা নিতে। এসে দেখলটা কী? দেখল আমাদের আন্দোলন শুধু চলছেই না, বরং নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আরও জোরদার হতে চলেছে। ভুলে যেও না যে গোটা মিটিংটা ও বসে বসে শুনেছে। শুনেছে শুধু তাই নয়, মিটিং-এর পরে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে আমাদের হাবভাবটাও ভালোভাবে জেনে নিয়েছে। এমনকি খোলাখুলিভাবে এ প্রশ্নও করেছে যে সবাই আমাদের কথা শোনে না কেন। সব মিলিয়ে যখন আঁচ করেছে যে কিছুতেই আমরা লড়াই থেকে সরব না তখন চলে গেছে। মালিক হয়ত এই আশাতে ছিল যে আমরা ঝিমিয়ে পড়েছি।

—তোমার কথাগুলোয় যুক্তি নেই তা বলছি না তবে এরকম নাও হতে পারে। লোকটা হয়ত ওসব কিছুই না, নিছকই ভবঘুরে, এ শহর ও শহর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

—দেশের যা হাল তাতে এভাবে ঘুরে বেড়ানোর মানে হল নিজের ওপর বিপদ সেধে ডেকে আনা। পাগল না হলে সেটা সম্ভব নয়। আমার কিন্তু লোকটাকে মোটেও পাগল বলে মনে হয়নি।

হাতকাটার দলেও উইন্ডচিটারকে নিয়ে আলোচনা হয়।

—ওস্তাদ, তোমার কি মনে হয় যে লোকটা '৮' আর '৯' কে মদত দিতে এসেছিল?

—কুমারের কাছে যতটুকু শুনেছি তাতে তেমন লাগেনি। বরং ও নাকি বলেছে যে শকুন মারার কাজটা ভালো হয়েছে। না মারলে অশুভ কিছু ঘটত। আর ওর মালপত্তর দেখেও আমার খারাপ কিছু লাগেনি। গোলমেলে লোক হলে বোঝা যেত। অত ভুল আমার হয় না।

—তবে লোকটার চেহারাটা বেশ রংবাজের মতো। দূর থেকে দেখেছি। ইয়া লম্বা।

—সে যাই হোক, লোকটা যখন কেটে পড়েছে তখন আর ওকে নিয়ে ফালতু কথা বলে লাভ নেই।

হাতকাটাকে একজন ছিপির প্যাঁচ কেটে কাফিড্রিলের শিশি এগিয়ে দেয়। হাতকাটা অন্যদের মতো জল মিশিয়ে খায় না। নিট গলায় ঢলে। ধকটা মৌজ করে অনুভব করে। ফের ঢালে।

—'৮' আর '৯' লোকটাকে দলে টানতে চেষ্টা করেছিল। লাভ হয়নি। ওরা সাদামুখকেও দলে টানার ধান্দা করছে। ভাবছে এইভাবে দল ভারী করে আমার সঙ্গে টক্কর দেবে।

—আমি কিন্তু দেখেছি যে অনেকে কাছাকাছি না থাকলেও অন্তত গোপনে গোপনে ওদের কথাগুলো তারিফ করে। শুধু মুখে বলতে সাহস পায় না।

—সাহস পাবেও না। খেলনানগরে হাতকাটার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার বুকের পাটা কারও নেই। আসলে '৮' আর '৯'কে খতম করার জন্যে আমার একটা মওকার দরকার। ঠিক ঠিক হাওয়া

না উঠলে সেটা হবে না।

—কিভাবে হাওয়াটা উঠবে?

—হাওয়া কি নিজের থেকে উঠবে নাকি! ওঠাতে হবে। সময় হলে সব আমি বলে দেব।

২২ নভেম্বর, দুপুরবেলা জিশার মা নদী থেকে জল আনতে গিয়ে দেখেছিল উইন্ডচিটার বালির ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। জুতো পরা দুটো পা নদীর জলে। পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে জিশার মা নিশ্চিত হয়েছিল যে কোনো জ্যান্ত লোক ওভাবে পড়ে থাকতে পারে না। ওর চিৎকার শুনে লোকজন দৌড়ে আসে। সাদামুখ ওকে চিৎ করে বুকের ওপরে কান রেখে বলে উঠেছিল।

—মরেনি। ধুক ধুক করছে।

মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। চুল দাড়িতে বালি মাটি লেগে। সারা গায়ে কাদা। সবাই মিলে ধরাধরি করে ওকে নিয়ে গিয়ে গার্ডদের ঘরে শোওয়ায়। বামন আর বুড়ো দরজি দেখল জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। বাঁ হাতটা অস্বাভাবিক ফুলে গেছে। চোখগুলো আধবোজা। বিড়বিড় করছে।

বুড়ো দরজি অনেকক্ষণ ধরে নাড়ি দেখল।

—হাতে বিষাক্ত কিছু কামড়েছে বলে মনে হয়।

—কিন্তু কী আছে এখানে যে কামড়াবে!

—হয়ত দূরে কোথাও গিয়েছিল।

হাতকাটা একটিন গুঁড়ো দুধ দিয়ে গেল। জিশা আর বামন পালা করে উইন্ডচিটারের কপালে জলপট্টি দিতে লাগল। শীত বাড়ল। জ্বরও বাড়ল। সন্ধেবেলায় জিশাকে নিয়ে গেল কুমার। ওকে বাড়িতে পৌঁছে এস. টি. ডি-আই. এস. ডি বুথে নিজের ডেরায় ফিরবে। আলো কমে এলে জিশাকে বাইরে থাকতে দেওয়া নিরাপদ নয়। রাতে বামন আর সাদামুখ উইন্ডচিটারের কাছে থাকল। আরও রাতে এল '৮' ও '৯'।

—ওর ওই শিশিগুলোর মধ্যে যে ওষুধগুলো রয়েছে সেগুলো কাজে লাগবে না?

বামন জলপট্টি পাল্টাতে পাল্টাতে বলল, আমি ওষুধগুলোর নাম পড়ে কিছু বুঝিনি। রাতটা ভালোয় কেটে গেলে কাল বরং দরজিকে দেখতে বলব ও চেনে কিনা।

হিমেল বাতাসে শকুন এদিক ওদিক দোলে। বার্বি পুতুল তার আধপোড়া চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। গামলার জলে গোল হয়ে ঘোরে প্লাস্টিকের পুতুল। জিশা ঘুমের মধ্যে গোঙায়। জিশার মা ওকে থাবড়ে শান্ত করে।

শেষ রাত থেকে শুরু হয় উইন্ডচিটারের ডিলিরিয়াম।

boighar.net

সৌম্য শরীর

বুড়ো দরজির কাছে অনেক পুরনো, কার্যকরী থাকার মেয়াদ বহু আগে ফুরিয়ে যাওয়া কিছু ট্যাবলেট ছিল। আন্ত্রিক জ্বরের। দুদিন দেখার পরে বুক ঠুকে তাই খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। গত রাতে ভুল বকাটাও কমে গিয়েছিল। বারবার জেগে উঠছিল। হাতের ব্যথায় ককাচ্ছিল। সকালে বামন দেখল ঘেমে সপ সপ করছে। তবে একটু পরে জ্ঞান এল। খুব শান্ত দেখায় উইন্ডচিটারকে। একটু দুধ খায়। পুরোটা গিলতে পারে না।

—আমি কোথায়?

কথাটা প্রথমে বামন বুঝতে পারেনি কারণ বড়ই জড়িয়ে জড়িয়ে বলা। পরে স্পষ্ট হয়।

—আমি কোথায়?

—খেলনানগরে। গার্ডদের ঘরে। এখন কেমন লাগছে?

—ভালো। আমার কী হয়েছিল?

—জ্বর।

—আমার হাতে খুব ব্যথা।

—ঠিক হয়ে যাবে। তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

—বলছি। একটু জল খাব।

জিশা জল দেয়। উইন্ডচিটার হাসে। '৮' আর '৯' এসেছে। উইন্ডচিটার ডানহাতটা তোলে।

—আমি কী বলছিলাম জ্বরের ঘোরে?

—আবোলতাবোল সব কথা জল, বিষ, পাথর, পাহাড়, যুদ্ধ— নানা কথা। কোনো মানে নেই।

—মানে আছে। খুব বড় মানে আছে। একটু উঠিয়ে বসাও আমাকে। মনে পড়ছে।

—মাথা ঘুরে যায় যদি!

—ঘুরবে না। মাথা ঘুরবে না। আমি সেরে গেছি।

—কোথায় চলে গিয়েছিলে?

—কোথাও চলে যাইনি। আমার হ্যাভারস্যাক, মালপত্র সবই তো এখানে ছিল। আমি গিয়েছিলাম আবর্জনা পাহাড়ের ওপারে।

—সে কি! সে তো অনেক দূর!

—হ্যাঁ। অনেক দূর। পাহাড় পেরোবার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। বাঁ হাত কেটে গিয়েছিল।

—তার মানে বিষ ঢুকেছিল তোমার শরীরে।

—বিষ বলে বিষ। সে কি মারাত্মক যন্ত্রণা। হাতটা এখনও ভারী হয়ে আছে। যাই হোক ভালোই হল। অশুভটা আমার ওপর দিয়েই গেল। আমি জানতাম কিছু একটা হবে। তোমাদের নদীর জলটাও আমার সহ্য হয়নি।

—এই বিষই তো আমরা দুবেলা খাই।

—কথা আছে, এই নিয়েই কথা আছে। আমি জলের খোঁজ পাব। ভাল জল।

—কিন্তু আবর্জনা পাহাড়ের ওপারে, অতদূর থেকে জল আনা যাবে কী করে?

—ওপারে যেতে হবে না। এপারেই জল পাওয়া যাবে। আমি জল খুঁজতে জানি। জল বলে দেবে কোথায় আছে।

'৮' আর '৯' বুঝতে পারে না।

—জল কথা বলে?

এর উত্তরে উইন্ডচিটারের চাহনিটা একেবারেই অন্যরকম। গলার আওয়াজেও যেন সম্মোহনের কুহক মেশানো।

—জল কথা বলে। জল কথা না বললে গাছ, প্রাণী, মানুষ ওরা কেউ থাকতে পারত না। জল হচ্ছে মানুষের সঙ্গে অসীমের যোগাযোগের এক মাধ্যম। তুমি যখন জলকে স্পর্শ করো তখন আরও কত কী যে তোমাদের স্পর্শ করে তোমরা ভাবতে পারবে না। তোমরা কি মনে করো জল মৃত, তার প্রাণ নেই?

—জলের প্রাণ?

—হ্যাঁ, জলের প্রাণ। জল বিষমুক্ত হতে চায়। নিজের চেষ্টাতেই সে বিষমুক্ত হয়। তোমাদের এত কাছে সে রয়েছে অথচ তোমরা তার কথা শুনতে পাচ্ছ না। আমি পাচ্ছি।

—তোমার কথার কোনো মানে হয় না।

—কে বলেছে হয় না? আসলে তোমাদের কান নেই, বোধশক্তি নেই— থাকলে শুনতে জলের আন্দোলন, জলের শ্লোগান, তোমাদের চেয়ে কত বড় একটা কাণ্ড সে ঘটিয়ে চলেছে—আসলে তোমাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। মানুষই ভুলে গেছে এসব কথা। মানুষ জলে বিষ মিশিয়েছে, জলকে আহত করেছে কিন্তু জল সবসময় মানুষকে ক্ষমা করে এসেছে, জানো? ওই হলুদ শিশির থেকে দুটো বড়ি আমাকে দাও। ওটা বিষের ওষুধ। আমার খুব ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু ওবেলা তোমরা সবাই এস। কোথায় জল আছে আমি বলে দেব। আমার কাছে আর কাউকে থাকতে হবে না। আমি ঠিক হয়ে গেছি।

উইন্ডচিটারের কথা আদেশের মতো মেনে নিয়ে সকলে চলে যাচ্ছিল। উইন্ডচিটার ওদের ডাকে।

—শোনো। আজ কত তারিখ?

'৮' আর '৯' জানে না। বামন বলে, ২৫ নভেম্বর।

—২৫? পাঁচ আর দুয়ে সাত। ভালো দিন আজ। ৭ হল ম্যাজিক সংখ্যা—অপার রহস্য লুকিয়ে আছে। সপ্তশরীর, সপ্তপাতাল, সপ্তসাগর—ভাবতে থাকলে পাগল হয়ে যাবে। ঠিক আছে। এবার যাও। তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। অনেক কষ্ট করেছো আমার জন্যে। ও, আর একটা কথা। কথাটা মনে রেখ। আমি আবর্জনা পাহাড়ের ওপারে কেন গিয়েছিলাম জানো?

—কেন?

—জল আমাকে ডেকেছিল বলে। এরকম অনেক কিছু আমায় ডাকে। যাও।

ফেরার রাস্তায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। '৮' আর '৯' বেশ ফাঁপরে পড়েছে। '৮' আরও বেশি করে।

—আমার কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। কিছু থই খুঁজে পাচ্ছি না। আচ্ছা, ওর কথাগুলো কি সত্যি?

বামন মাথা নাড়ে।

—জানি না। আর কতটুকুই বা বুঝি আমরা। তবে একটা ব্যাপার মানবো। আমার কিন্তু মুখের ওপর না বলায় সাহস হয়নি। জ্বর থেকে ওঠা ইস্তক একেবারে অন্য মানুষ, অন্য হাবভাব।

—সেটা আমারও ঠেকেছে। এখন মনে হচ্ছে ও অনেক কিছু জানে যেগুলো আমরা বুঝি

না।

'৯' নদীর দিকে তাকায়।

—ও যদি সত্যি আমাদের ভালো জলের সন্ধান দিতে পারে আমি ওর কথা মেনে নেব।

—আমিও। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে আমাদের কারখানা খুলবে কি খুলবে না সেটা ও বলে দিতে পারে।

—তা হয়ত পারে। কিন্তু তা বলে আমাদের আন্দোলনে ঢিমে দিলে কিন্তু চলবে না।

ওরা চলে যাওয়ার পরে উইন্ডচিটার কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকল। বাঁ হাতটা কষ্ট করে কয়েকবার ভাঁজ করল, সিধে করল। গোটাকয়েক বিস্কুট আর একটু জল খেল। তারপর জং ধরা দুটো ব্যাটারি নিয়ে ভাঙা ট্র্যানজিস্টার রেডিওতে লাগাল। তারপর উইন্ডচিটারের পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। খুব কাশি হল প্রথমে। তারপর সয়ে গেল। শরীরটা খুবই দুর্বল। জ্বলন্ত সিগারেট হাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সিগারেটটা আলগা আঙুল থেকে পড়ে একটু গড়িয়ে গিয়ে থেমে থাকল। তারপর জ্বলে জ্বলে পুরোটা ছাই হয়ে গেল।

বামন গিয়েই কুমারকে বলেছিল সে যেন হাতকাটা, সাদামুখ ও যতজনকে পারে বলে দেয় ওবেলা উইন্ডচিটারের কাছে যেতে।

জলের বিষের থেকে শরীরে যে নীল নীল ছোপগুলো হয় সেগুলো পা থেকে শুরু হয় তারপর হাত ও শেষে মুখে দেখা দেয়। এদের ঘাও শুরু হয় পা থেকে। যাদের হয় তারা অসহ্য ব্যথায় হাঁটতে পারে না। পায়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া পুরু করে জড়িয়ে বেঁধে নিতে হয়। তা না হলে পা ফেলা যায় না। শীতকালে কষ্টটা একটু কমে কিন্তু গরমে অসহনীয় হয়ে ওঠে। বয়স যাদের কম, যাদের যুঝবার ক্ষমতা আছে তাদের রোগটা ধরতে সময় লাগে। আর সবারই যে সমানভাবে হয় এমনও নয়। জিশার হয়েছে। কুমারের এখনও হয়নি। জিশার মারও হয়েছে। তিন বুড়িকে তো সেই কবেই ধরেছে।

বিকেলে সবার আগে এসেছিল হাতকাটা। এসে দেখল উইন্ডচিটার ঘুমোচ্ছে। পাশে ট্রানজিস্টার। হাতকাটা একাই এসেছিল। তারপরেই এল '৮' ও '৯'। ওরা হাতকাটাকে দেখে বিরক্ত হল। কথা বলাবলি নিজেদের মধ্যেই।

—আর কেউ তো আসেনি দেখছি।

—এসে পড়বে। আর ওর বিশ্রামেরও তো দরকার।

নিচু গলায় কথা বললেও উইন্ডচিটারের ঘুম ভেঙে গেল। উইন্ডচিটার হাসল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

—হাতের ব্যথাটা কমেছে?

—অনেকটা। ফোলাটা রয়েছে। তবে কমছে।

হাতকাটা বলে, তুমি যন্ত্রণা কমাবার জন্যে কাফিড্রিল খেয়ে দেখতে পারো। আমরা ওটা নেশা করার জন্যে খাই।

'৮' বলে ওঠে

—খবরদার কাফিড্রিল খেয়ো না। ওটাও বিষ। আমাদের জলের চেয়েও খারাপ। উইন্ডচিটার হেসে দুপক্ষকেই থামায়।

—যন্ত্রণা কমে যাচ্ছে। কোনো ওষুধেরই আর দরকার হবে না। কেউ একজন বাইরে গিয়ে কয়েকটা পাথর নিয়ে এসোতো।

pathagar.net

হাতকাটা বলে, আমি যাবো!

—তোমাকে তো একহাতে আনতে হবে। বরং অন্য কেউ যাক।

—এত হাতেই যা ভেলকি রয়েছে সেটা অনেক দুহাতই পারবে না।

—তা কি জানি না? শকুনটাকে যা মেরেছিলে তুমি। সব শুনেছি।

—একটা প্রশ্ন করব?

—বলো।

—তুমি ওই ভাঙা ট্রানজিস্টার রেডিওটা দিয়ে কী করো?

—কিছুই করি না। ও অনেকদিন আমাকে অনেক কথা, খবর সব শুনিয়েছে। এখন আমি ওকে কথা শোনাই।

—এটা তো হেঁয়ালি হয়ে গেল।

—হেঁয়ালি নয়। আমি বানিয়ে একটাও কথা বলি না।

'৯' কয়েকটা পাথর নিয়ে আসে। কুমার, বামন, সাদামুখ, বুড়ো দরজি সকলেই একে একে এসে পড়ে। উইন্ডচিটার এক টুকরো নাইলনের সুতোর সঙ্গে একটা ছোট পাথর বাঁধে। কয়েকটা পাথরকে সাজায়।

—তোমাদের কেন আমি ডেকেছি নিশ্চয়ই জানা আছে। ওবেলাই বলেছি। যারা ছিল না তারাও নিশ্চয়ই জেনে গেছে। কিন্তু আমাকে একটা কথা দিতে হবে সকলকে।

pathagar.net

—কী কথা?

—জল কোথায় আছে আমি বলে দেব। বরং বলতে পারো জল নিজেই বলে দেবে। কিন্তু তার জন্যে হাতেনাতে যে খাটনি সেটা কিন্তু সবাই মিলে করতে হবে। হাত মিলিয়ে। তোমরা পারবে?

—হ্যাঁ পারব।

—এই একটা কাজ মনে রাখবে কেউ নিজের জন্যে করছ না। সবার জন্যে করছ। কোনো দলাদলি থাকলে চলবে না।

সকলেই চুপ করে থাকে।

—তাহলে ধরে নিচ্ছি যে আমার কথা তোমরা মানবে। এখন ভালো করে দেখো—এই তিনটে পাথর কী বলো তো? বলতে পারলে না তো। আচ্ছা এটা যদি ধরে নেওয়া যায় যে নদীর রাস্তা অর্থাৎ এই দিকে নদীটা বয়ে চলেছে তাহলে এপারে কি তিনটে বড় বড় পাথর নেই?

—হ্যাঁ, এপারেও আছে, ওপারেও আছে।

—না, ওপারে বেশি পাথর আছে কিন্তু সেগুলো বেশ দূরে। হাতে গুণলে পাঁচটা। আমি এপারের কথা বলছি। এখন ভাবছি কি বোকাই না আমি। তিন পাথরকে জিজ্ঞেস না করে আবর্জনা পাহাড়ের ওপারে কেন মরতে গিয়েছিলাম? কেন?

—কেন?

—কোনো অশুভ শক্তি আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। সে চেয়েছিল যে ভালো জলের খোঁজ যেন আমি না পাই। জ্বর, হাত বিষিয়ে যাওয়া সব, সব তার চক্রান্ত। যাই হোক সেটা কাটিয়ে উঠতে পারা গেছে। আচ্ছা সবাই তোমরা একমনে ভাবোতো যে এক জায়গায় পরিষ্কার, ঠাণ্ডা, শান্ত জল রয়েছে। এত শান্ত, এত চুপচাপ যে তাতে কোনো ঢেউ নেই। স্বচ্ছ, মিষ্টি জল। মন দিয়ে ভাবো। আর কোনোকিছু নিয়ে চিন্তা করো না। তাহলে আমার কাজটা সহজ হবে।

উইন্ডচিটার সুতোয় বাঁধা পাথরটা ঝুলিয়ে দেয়। স্থিরভাবে ধরে রাখে। দোলকটা প্রথমে কিছুটা এদিক ওদিক করে স্থির হয় তারপর প্রথমে অল্প ও পরে বেশ জোরে দুলতে থাকে। দোলকটা উইন্ডচিটারের হাতটা সরিয়ে নিয়ে যায়। তারপর তিন পাথরের ওপরে এসে গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে স্থির হয়। উইন্ডচিটার খুব ধীরে দোলকটা নিচু করে।

—এই তিন পাথর দেখবে একটা জায়গায় মিলেছে। আসলে মেলেনি। ওখানে একটা চ্যাপটা পাথর রয়েছে। তিন পাথরের মধ্যে এমনভাবে ওই পাথরটা রয়েছে ওকে আলাদা করে চেনা যায় না। জল রয়েছে ওখানেই। ওই পাথর ভাঙলে জল উঠবে।

—কিন্তু অত বড় পাথর ভাঙা যাবে?

—খুব বড় নয়। ভাঙা যাবে না কেন? তবে কাজটা কঠিন। কারণ জায়গাটা অপরিসর। গাঁইতি চলবে না। শাবল আছে তোমাদের কাছে?

সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে? কুমার বলে, শাবল আছে। বড় স্টিলের রডও আছে।

—ওতেই হয়ে যাবে বলে মনে হয়। আমাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যেতে পার। আজ তো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। কাল ভোর থেকে কাজ শুরু করতে হবে।

কুমার সাদামুখকে নিয়ে ওগুলো আনতে যায়।

—এটা কিন্তু, আবার বলছি, একার কাজ নয়। সকলকে হাত লাগাতে হবে।

হাতকাটা বলে, কিন্তু পাথর ফাটিয়ে যদি জল না পাওয়া যায়?

—না পাওয়া গেলে শাবলটা দিয়ে আমার মাথাটা ফাটিয়ে দিয়ো। আর কিছু বলবে?

—ছি, ছি, আমি কি তাই বলেছি?

—তুমি তো বলনি! বলেছি আমি। তবে জেনে রেখো জল কিন্তু বেশি উঠবে বলে মনে হয় না। দেড় হাত মতো উঠবে। ওখান থেকেই পাত্র ডুবিয়ে নিতে হবে। আর সব সময় খেয়াল রাখতে হবে। কোনোমতেই যেন নদীর জল ওখানে এসে না মেশে। বর্ষায় কি জল খুব বাড়ে?

—খুব একটা না। হলেও কখনওই বড় পাথরের ওপরে ওঠে না।

—তাহলে তো ভালোই হল। এখন তোমরা যাও। কাল সকালে আমাদের কাজ শুরু হবে। সকলে এসে যেয়ো। আমি ঠিক আলো ফোটার মুখে পৌঁছে যাব।

কুমার আর সাদামুখ শাবল আর রড নিয়ে আসে।

—শাবলটা আর একটু লম্বা হলে ভাল হত। কষ্ট হবে। কাজ চলে যাবে।

পরদিন উইন্ডচিটারের ঘুম ভাঙতে আরও দেরি হত বামন এসে না ডাকলে।

—ওরা কাজ শুরু করে দিয়েছে। ভাবলাম তোমায় না ডাকাটা'বোধহয় ঠিক হবে না।

—ভালই করেছ ডেকে। তা না হলে উঠতে কত দেরি হত কে জানে?

—এখন কি অনেকটা সুস্থ লাগছে?

—পুরোই বলা চলে। হাতের ফোলাটাও নেই। ভাল কথা, এখন কেউ নেই। তোমাকে কালকেই বলব মনে করেছিলাম। খেলনানগরের একটা ম্যাপ কি করে পাওয়া যায় বলতে পারো?

—খেলনানগরের একটা খসড়া প্ল্যান আমার কাছে আছে। সেটা ম্যাপের মতোই। কিন্তু তাতে আমি যেখানে থাকি সেখানকার ঘরগুলো দেখানো নেই। ওগুলো পরে বানানো।

—ওতেই খুব ভালো করে চলে যাবে। তুমি আমাকে দিয়ে যেয়ো। কিন্তু কেউ যেন জানতে না পারে।

—কী ব্যাপার বলো তো? কী দেখবে তুমি ওতে!

—দেখব সত্যিই সেই মালিকের সোনার বিস্কুট কোথায় থাকতে পারে। এই সব কাজে ঠিক

ঠিক ম্যাপ পেলে খুব সুবিধে হয়।

—জল যদি পাওয়া যায় আমি তোমার প্রত্যেকটা কথা মেনে নেব।

—দেখা যাক কী হয়। জল না পাওয়া গেলে হাতকাটা কেন, তুমিও যে আমাকে ছাড়বে না সেটা ভালোভাবেই টের পাচ্ছি।

তিন পাথরের মধ্যে একটা ফোকর রয়েছে ঠিকই কিন্তু সেটা একটু ত্যারচা হওয়ায় শাবল পৌঁছলেও ভালোভাবে মারা যাচ্ছিল না। কুমার ঠাণ্ডার মধ্যেই ঘেমে নেয়ে গেছে। ওই এতক্ষণ শাবল চালাবার চেষ্টা করেছিল। উইন্ডচিটার শাবলটা নেয়। ফোকর দিয়ে নিচ অবধি নামায়। একটু তোলে। আবার নামায়। ঠং করে একটা শব্দ হয়। যথেষ্ট জোরে নয়।

—বুঝতে পেরেছি। আগেই বলেছিলাম জায়গা খুব কম। এত সরু সেটা অবশ্য ভাবিনি।

—কী হবে তাহলে?

—কী আবার! উপায় একটা রয়েছে। বড়, খুব বড় লোহার হাতুড়ি আছে?

কুমার মাথা নাড়ে।

বুঝতে পেরেছি কিন্তু অত বড় হাতুড়ি নেই।

—তাহলে ভারী লোহা বা পাথড়ের চাঙড় দিয়ে মারো। একজন শুধু শাবলটা ধরে থাকবে।

হাতকাটা এক হাতে শাবলটা ধরে। '৮' একটা বড় পাথর দিয়ে মারে। এই প্রথম বহুদিন পরে ওদের কথা হয় :

—দেখো, ফস্কে গেলে কিন্তু আমার হাত বলে কিছু থাকবে না।

—ঘাবড়িও না। ফস্কাবে না।

'৮' প্রচণ্ড জোরে জোরে মারে আর প্রত্যেকটা আঘাতের পর পর হাতকাটা শাবলটা একটু ঘুরিয়ে দেয়। শব্দটাও ধারালো হয়। পাথরে নির্ঘাৎ চিড় ধরছে বা কিছুটা জায়গা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে শাবলকে জায়গা করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। কিছুটা পরে ওরা দুজনে হাঁপিয়ে পড়ে। হাতকাটা হাত ঝাড়ে।

—একটা কাপড় জড়িয়ে নিলে ভালো হয়।

এবারে রুমালি আর '৯' ওদের জায়গা নেয়। '৯' শাবল ধরে। রুমালি মারে। কিছুক্ষণ এইভাবে চলে। দুজনে হাঁপিয়ে পড়তেই হাত বদল হয়। ঘণ্টা দুয়েক যায়।

—দাঁড়াও তো! এইবার মারো। আমি আওয়াজটা শুনব।

—ঠং!

—শাবলটা বার করো।

—শাবলের ফলাটা শুকনো। গরম।

—এবারে স্টিলের রডটা ঢোকাও তো। ঢুকেছে? হ্যাঁ, এইবার মারো। আরও জোরে! হ্যাঁ, আরও জোরে। রডটা একটু বেশি ডেবে যায়। উইন্ডচিটার চেঁচিয়ে ওঠে

—চিড় ধরেছে। পাথরটা এইবার ভেঙে যাবে। রডটা আর একটু ডেবে যায়।

—বের করো তো!

রডের মুখটা ভিজে ভিজে।

—জল উঠছে। এবারে বেশি নয়। অল্প মারো। হ্যাঁ। আর একটু জোরে! আর একটু। বের করো।

ফোকরটা ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সকলে। একটু একটু করে জল উঠছে। জলটা কালো দেখায়।

—প্রথম দিকের কিছুটা ফেলে দাও। ধুলোটা চলে যাক।

টিনে করে জলটা তুলে সকলে দেখে। টিনটা হাতে হাতে ঘোরে। তিনদিকে পাথর ঘেরা বলে জলটা কালো দেখায় কিন্তু টিনের মধ্যে বেশ স্বচ্ছ। উইন্ডচিটার কিছুটা জল খায়।

—আমার তো ভালোই মনে হচ্ছে। এবার তোমরা দেখ! জলটা আর একটু উঠবে। তবে তোমাদের ইচ্ছেমতো নয়। নিজের ইচ্ছেমতো।

সকলে জল খায়। মুখে মাথায় মাখে। এ ওর গায়ে ছিটিয়ে দেয়। উইন্ডচিটার একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। সিগারেট ধরায়। ওদের দেখে। কেউ শুয়ে পড়ে হাত ঝুলিয়ে জল ধরার চেষ্টা করছে। কুমার ওর কাছে এগিয়ে আসে।

—তুমি সত্যিই যাদু জানো। একটা সিগারেট চাইব? অবশ্য আপত্তি না থাকলে। উইন্ডচিটার সিগারেট প্যাকেট ও লাইটার এগিয়ে দেয়। নিচু গলায় বলে, তুমি জিশাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে চেয়েছিলে না?

—হ্যাঁ, সবসময় ভাবি।

—আমি তোমাদের নিয়ে যাব। কথা দিচ্ছি। কিন্তু কাউকে বলা চলবে না।

—না, আমি জিশাকেও এখন বলব না।

—তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

—বলো।

—পুতুল কারখানার পেছনে একটা লোহালক্কড়ের জাংক ইয়ার্ড আছে?

—আছে।

—সেখানে আমি অনেক কিছু দেখেছি। আমার কাছে দুটো সাইকেলের চাকা আছে। ওখান থেকে বাকিটা পাওয়া যাবে?

—মানে, চলে এমন একটা সাইকেল!

—হ্যাঁ, চলে এমন একটা সাইকেল। মানে হলে ভালো হয়। কাজটা তোমায় করতে বলতাম না, কিন্তু খেলনানগরে কোনো সাইকেল আমার চোখে পড়েনি।

—তুমি খুঁজেছ?

—খুঁজিনি। দেখেছি।

—আমি তোমাকে একটা সাইকেল দিতে পারব। আছে।

—কোথায়?

—আছে হাতকাটার বাড়ির পেছনে একটা ফাঁকা শেডের তলায়।

—ও জায়গাটা তাহলে আমি দেখিনি।

—কেউ যেন না জানে।

—কেউ জানবে না। কিন্তু তুমি চলে যাবে? তাহলে আমার আর জিশার যাওয়ার কি হবে?

—সেটাই তো ঠিকঠাক করতে হবে আমায়। আমাকে একটু যেতে হবেই।

—তুমি কি আবার ফিরে আসবে?

—না। আমি তোমাকে খবর পাঠাব।

—কি ভাবে?

—ফোন করে।

—ফোন করে?

—হ্যাঁ। আমি যে সময় বলব ঠিক সেই সময় তোমার ঘর অর্থাৎ ওই বাতিল এস. টি.

pathagar.net

ডি-আই এস ডি বুথের অকেজো ফোনটা বেজে উঠবে। তার আগে অমন বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটবে। মাথা ঘামাবে না। যাই হোক না কেন। উইন্ডচিটার যা বলে তার অন্যথা হয় না। আমাকে কোনো প্রশ্ন করবে না।

—সাইকেলটা আমি রাখব কোথায়?

—পরে বলে দেব। ওরা আসছে। চুপ করো। অন্য কথা বলো।

—এই জলটা খেলে কি ওই নীল দাগ হবে না?

—না। এই জল ওই নদীরই জল কিন্তু এত পাথর আর বালির মধ্যে দিয়ে ওকে আসতে হয়েছে যে ওর মধ্যে বিষ নেই।

অন্যরা এসে ওদের ঘিরে বসে।

—এই জল হল পবিত্র একটা শক্তি। ওর সততা আর মায়া ঐশ্বরিক, কখনও জলকে অসম্মান করবে না। সমীহ করবে। যে কোনো আকার যে নিতে পারে তার অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। ব্যাপারটা ভেবো। এর ওপরে ধ্যান করলে আরও ভালো। দেখবে জল তখন কত কথা বলবে তোমাদের সঙ্গে।

সবাই চুপ করে থাকে।

—তোমাদের মতো অসহায় মানুষ আমি কোথাও দেখিনি। জল একা কেন, আরও কত কি যে তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে তোমরা জানো না। সব আনন্দ, প্রাচুর্য, সুখ, সব কিছুর চাবিকাঠি তোমাদের কাছেই রয়েছে কিন্তু তোমরাই নেই।

—বুঝতে পারলাম না।

—মানে যেভাবে আছ সেটাকে থাকা বলে না। এভাবে বাঁচার কোনো মানে হয় না। এভাবে থাকলে তোমরাও একদিন ক্ষুধার্ত প্রেত হয়ে যাবে। অন্যের অমঙ্গল করার চেষ্টা করবে। শকুনের মতো অশুভ পাখিকে ডেকে আনবে। তোমাদের রক্ষা করে এরকম কোনো অদৃশ্য প্রাণী নেই। কী অসহায় তোমরা। থাকলে শকুন আসতে পারত না। কিছুতেই পারত না। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো জীবজন্তু বা পাখি কিছু পুষেছিলে কোনোদিন?

সবাই চুপ করে থাকে। বুড়ো দরজি বলে, খেলনানগরে নয়, এর আগে আমি যেখানে থাকতাম আমার একটা বেড়াল ছিল। এখানে আসার সময়ে সেটাকে ফেলে এসেছিলাম।

—তুমি বেড়ালটাকে মনে করতে পারো?

—হ্যাঁ, পারি।

—এমনিই মনে করা নয়। তার রং, তার চলা, তার চলার ধরন, তার থাবা চাটার ভঙ্গি, খাবারের জন্যে ডাকাডাকি, অন্ধকারে তার স্বচ্ছন্দ গতিবিধি, জ্বলন্ত চোখ, ঝগড়া করার সময় ফুলে ওঠা ল্যাজ ও বেঁকে যাওয়া শরীর, তার পায়ে মাথা ঘষে ঘষে আদর পাওয়ার চেষ্টা, আদর করলে আস্তে আস্তে তার গোটা শরীর জুড়ে আরামের শব্দ, সবকিছু মনে করতে পারো? এমনভাবে মনে করতে পারো যেন সে তোমার কাছেই রয়েছে। একেবারে কাছে। ইচ্ছে করলেই তুমি তাকে স্পর্শ করতে পারো। এভাবে পারো তাকে কাছে রাখতে?

—না।

—পারবে। একটু চেষ্টা করলেই পারবে। আমি কাল তোমার বাড়িতে গিয়ে সেই বেড়ালটার একটা ছবি এঁকে দিয়ে আসব। তারপর তুমি ওই ছবিটাকে ঘিরে আমি যেভাবে বলেছি তাকে ভাববে। তারপর এই ভাবনাটা সহজ হয়ে যখন তোমার নিজের, একান্ত নিজের হয়ে যাবে তখন দেখবে ও তোমার কথা শুনবে, নানা বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবে, আরও কত কিছু

করে দেবে যে তুমি কল্পনাও করতে পারব না।

—তুমি না এলে এই কথাগুলো আমরা জানতেই পারতাম না।

—মজার ব্যাপারটা তো এইখানেই। মানুষ থার্মোনিউক্লিয়ার আত্মহত্যার রাস্তায় অনেক এগিয়ে গেছে, এ ব্যাপারে তার দক্ষতা সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে অথচ এই সহজ ব্যাপারগুলো তার মনে নেই। অথচ এগুলো মনে রাখতে পারলে তার এই দশা হত না।

উইন্ডচিটার উঠে পড়ে। শীতের ঝোড়ো হাওয়া তার ঝাঁকড়া একমাথা চুল এলোমেলো করে দেয়।

—আজ অনেক কাজ হল। আমার মাথাটাও শাবলের আঘাত থেকে বেঁচে গেল। কাল কথা হবে। আমি চললাম।

সেইদিন রাতে '৮' '৯' কে বলেছিল :

—উইন্ডচিটার ঠিক বলে দিতে পারবে আমাদের কারখানা খুলবে কিনা।

—বলে দেওয়া তো ওর কাছে জলভাত, আমার মনে হয় ইচ্ছে করলে ও নিজেই এই কারখানা খুলে দিতে পারে। ওর সে ক্ষমতা আছে।

—তাহলে আমাদের আন্দোলনের এখনকার কর্মসূচি কী হবে?

—কি আবার। আন্দোলন চলবে যেমন চলছে। কাল আমরা বাকি পোস্টারগুলো মারব।

সেই রাতেই বামন গিয়ে উইন্ডচিটারকে খেলনানগরের প্রাথমিক খসড়া প্ল্যান দিয়ে এসেছিল।

pathagar.net

আকাশশরীর

—বেড়ালের ছবিটা ঠিক হয়েছে? মানে একেবারে তোমার বেড়াল যেমন ছিল তেমন হবে না। আসল ব্যাপারটা হল ছবিটাকে ঘিরে যে মণ্ডল তুমি ভাবনায় গড়ে তুলবে তার মধ্যে তোমার সেই বেড়াল, যাকে ফেলে এসেছিলে, সে ঘোরাঘুরি করতে পারলেই হয়। বুঝেছ?

—অনেকটা। আচ্ছা তুমি এইসব আশ্চর্য ব্যাপার জানলে কি করে?

—সে কথা থাক। আমি আগেই আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু দুদিন আমি বলতে গেলে ঘর থেকেই বেরোইনি।

বুড়ো দরজি ওর বিছানার তলায় কী খোঁজে। পায় না। একটা জং ধরা তোরঙ্গ খোলে। পুরনো জামাকাপড়ের ফাঁকে ফাঁকে খোঁজে।

—কী খুঁজছে?

—তোমাকে দেব বলে একটা জিনিস।

—কী?

—দাঁড়াও আগে খুঁজে পাই।

তোরঙ্গতে নেই। এইবার খাটের তলায় উপুড় হয়ে ঢুকে পড়ে। একটা ডালাভাভা, ধুলোপড়া বাক্স টেনে বের করে। তার মধ্যে কয়েকটা মরচেপড়া কাঁচি, সেলাই মেশিনের ববিন, দরজির ফিতে—এই সবের তলায় কাপড়ে জড়ানো ছিল।

—এটা একটা রিভলভার। খুব ভালো। আমার হাতে এসেছিল। কোনো কাজে লাগে না। কয়েকটা গুলিও আছে।

—আমি কী করব রিভলভার দিয়ে?

—কেন? তুমি ভবঘুরে লোক। ফেরার বেপাত্তা মানুষের মতো ঘুরে বেড়াও। যদি ডাকাতটাকাত ধরে।

—কী নেবে ডাকাত আমার কাছ থেকে?

—তা হোক, এটা তুমি রাখো।

—না। আমার অস্ত্র রাখা বারণ। ছোঁয়াও বারণ। তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। যেভাবে বললাম সেটা করলে তোমার কেন সকলেরই ভাল হবে।

উইন্ডচিটার রাস্তায় বেরিয়ে আসে। হঠাৎ দূর থেকে একটা বিস্ফোরণের শব্দ আসে। নাকি শব্দটা ঝোড়ো হয়ে ওঠা শীতের হাওয়া নিয়ে এসেছিল? উইন্ডচিটার রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে। কয়েকজন লোক রাস্তায় বেরিয়ে এল। তারাও শব্দটা শুনেছে।

—কোন দিক থেকে এল শব্দটা?

উইন্ডচিটার উত্তর দিকে তাকায়। জবাব দেয় না। সিগারেট ধরায়। হাঁটতে থাকে। আরও দুটো শব্দ হয় বিস্ফোরণের। এবার একটু জোরে। শব্দগুলো আবর্জনা পাহাড়ের দিকে চলে যায়। রাস্তায় জল নিয়ে যারা ফিরছিল তাদের মধ্যে জিশাও ছিল। সকলেই জানে যে এই লোকটাই তাদের পরিষ্কার খাওয়ার জলের সন্ধান দিয়েছে। সবাই কথা বলতে সাহস পায়নি। গার্ডের ঘরের দরজার সামনে টিনের খাবার, বিস্কুট বা গুঁড়ো দুধের বাক্স রেখে এসেছে। এক প্যাকেট সিগারেটও ছিল, কিন্তু খাওয়া যায়নি। নষ্ট হয়ে গেছে।

ইউনিয়নের ঘরে '৮' মার্কস আর লেনিনের ছবি থেকে ধুলো ঝাড়ছিল আর '৯' মেঝের ওপরে ছড়িয়ে একটা তিন বছরের পুরনো খবরের কাগজ পড়ছিল। হঠাৎ দরজায় আলো ঢাকা পড়তে দুজনেই ঘুরে তাকাল। প্রায় গোটা দরজা জুড়ে উইন্ডচিটার দাঁড়িয়ে আছে।

—তোমরা শব্দগুলো পাওনি?

—কিসের শব্দ?

—বিস্ফোরণের শব্দ। একটা নয়। প্রথমে একটা। পরে দুটো হল।

—আমরা তো পাইনি।

'৯' হলদেটে খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রাখে।

—আমি এসেছিলাম তোমাদের সঙ্গে একটা জরুরি আলোচনা করতে গোপন।

'৮' আর '৯' উত্তেজনায় শিহরিত হয়।

—তুমি বসো। আমরা একবার চারদিকটা দেখে নিই। কেউ আড়ি পেতেছে কিনা। কিছুই বলা যায় না।

—ঠিক আছে দেখে নাও।

'৮' বাঁদিকে ও '৯' ডানদিকে চলে যায়। গলিটা দেখে নেয়। কেউ নেই। ওরা ফিরে আসে।

—কেউ নেই। তবুও সাবধান থাকতে হবে। ফিশফিশ করে কথা বলতে হবে।

—তোমরা কি বুঝতে পেরেছ আমি কে?

—হ্যাঁ, তুমি অনেক কিছু পারো। আমাদের বন্ধু।

—এখনও পুরোটা বোঝনি। সেটা অবশ্য তোমাদের দোষ নয়। আমি তোমাদের বুঝতে দিইনি।

—তার মানে? তুমি কমরেড?

—চুপ! যা বোঝার বুঝে নাও। এবারে বলো, কারখানা খুলতে চাও? আমি আর রেখে

ঢেকে কথা বলতে পারব না। অনেক হয়েছে।

—আলবাৎ চাই।

—এখুনি চাই। ই...ন...কে!

—চুপ। এভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়লে আমাদের গোটা প্ল্যানটাই ভেস্তে যাবে।

'৮' রেগে যায় '৯'-এর ওপর।

—অল্পতেই ওর মাথা গরম হয়ে যায়। কত বলেছি।

—আমি আর ওরকম করব না।

—মনে থাকে যেন!

—যাই হোক, এবার দুজনেই মন দিয়ে শোনো। কারখানা খোলার জন্যে আমাদের মালিকের দরকার নেই। মূলধন আমাদের কাছেই আছে।

—সে তো অনেক টাকার ব্যাপার। মালিক শ্রেণী ছাড়া অত টাকা কাদের কাছে থাকবে?

—শোনো, তোমাদের সেই মালিক, যার আর খোঁজ নেই, তার অনেক সম্পদ এই খেলনানগরে লুকোনো আছে। টাকা নয়, সোনা। সোনাকে টাকা করে নিতে কতক্ষণ? সেটাই আমাদের দরকার।

—সেটা আর কেউ জানে?

—কেউ না। শুধু তোমরা দুজন।

'৮' আর '৯'-এর কপালে ঘাম। থরথর করে কাঁপছে '৯'-এর ঠোঁট।

—এইবার আমাদের আঁটঘাট বেঁধে এগোতে হবে। যা বলছি মানতে হবে অক্ষরে অক্ষরে। মনে রাখতে হবে, জয় আমাদের হবেই।

—জয় আমাদের হবেই। বলো কী করব আমরা। পুরো জান লড়িয়ে দেব।

—আজ ২৯ তারিখ। কাল নভেম্বর, আমাদের প্রিয়, ঐতিহাসিক নভেম্বর মাস শেষ।

এবার ফের বিস্ফোরণের শব্দ হল।

—এবারে শুনতে পেয়েছে? শব্দটা উত্তরদিক থেকেই আসছে।

—কি করে বুঝলে?

—উত্তুরে হাওয়া বইছে। সেই হাওয়াতেই শব্দটা আসছে। গুলি মারো, কাল নভেম্বর ফুরোবে। আমার অন্য কাজ থাকবে। পরশু অর্থাৎ ১ ডিসেম্বর আমি পাকা খবর পেয়ে যাব যে সোনাটা কোথায় রয়েছে। তারপর সেটা যদি বের করতে হয় তোমাদের লাগবে।

—আমরা তাহলে এখন কী করব?

—একনম্বর হল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনো চেষ্টা করবে না। যখন দরকার হবে আমি করব। দুনম্বর এখনই তোমরা দুজনে বেরিয়ে যাবে। জল খুঁজে পাওয়ার পর থেকে খেলনানগরে দলাদলির ভাবটা কম। এটাকে কাজে লাগিয়ে নিঃশব্দে যাচাই করবে যে আমাদের এই পরিকল্পনার কোনো আঁচ ঘুণাক্ষরেও কেউ পেয়েছে কিনা। তিন নম্বর, কাউকে না জানিয়ে মাটি খোঁড়া যায় এমন কিছু খন্তা বা শাবল জাতীয়, না পেলে সিক বা বড় ছুরি জোগাড় করবে। কুমারের কাছে চাইবে না। কেউ জানবে না আমরা কী করতে চলেছি। যখন জানাব আমরা তৈরি হয়েই জানাব।

'৮' আবেগে ও আনন্দে কেঁদে ফেলে।

—কমরেড! কমরেড!

—তুমিও তো দেখছি আবেগপ্রবণ কম নও। একটু আগেই না '৯' কে বকছিলে। আর চার

pathagar.net

নম্বর, শেষ ও চূড়ান্ত নির্দেশ কি হতে পারে সেটা বলতে পার?

'৮' ও '৯' নিরুত্তর।

—ধরো সব যদি ওলটপালট হয়ে যায়, আমাদের এই দীর্ঘদিনের দাঁতে দাঁত লড়াই যদি পরাজিত হয়, আমাদের স্বপ্নের ইমারত যদি ধূলিসাৎ হয়ে যায়, তাহলে আমরা বীরের মতো মরব। কিন্তু শত্রু বা মালিকের দালালদের কাছে মাথা নিচু করব না।

তিনজনে তিনজনের হাতের ওপরে হাত রাখে।

—আর একবার বাইরে উঁকি মেরে দেখে নাও। আমি চলে যাব।

ওরা দেখে আসে। কেউ নেই।

—বিদায় কমরেড!

উইন্ডচিটার বেরিয়ে যায়। '৮' ও '৯' পরস্পরকে বুকে জড়ায়। দুই বিশ্বস্ত সৈনিকের এই আনন্দঘন মুহূর্ত মার্কস ও লেনিন দেখে যান।

খেলনানগরের চত্বরে বামন বসে রোদ পোয়াচ্ছিল। বিস্ফোরণের শব্দে অনেকেই সেখানে বামনকে ঘিরে জড়ো হয়েছে। ওরা দেখল একটা ফাঁকা টিনের কৌটোয় লাথি মেরে এগোতে এগোতে উইন্ডচিটার আসছে। হাতে সিগারেট। বামন বলে, আওয়াজ পেয়ে সবাই ভয় পাচ্ছে।

—আমিও পেয়েছি। কিন্তু তাতে লাভ কী? আর পরে মনে হল আওয়াজটা অনেক দূরে হচ্ছে। বাতাসে নিয়ে আসছে। ধারে কাছে কিছু ঘটছে বলে মনে হচ্ছে না।

শুনলে তো। ভয়ের কিছু নেই। এ আমার কথা নয়।

ভিড় হালকা নয়। বামন নিচু গলায় বলে,

—প্ল্যানটা কাজে লাগল?

—লাগছে। হলে বলব।

জল আনতে গিয়ে হাতকাটার সঙ্গে '৮'-এর দেখা হয়। অস্বস্তি কাটিয়ে ওরা কথা বলে।

—এটা কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপার হল।

—ব্যাপার বলে ব্যাপার। এই জল খেলে আর আমাদের নীল দাগ হবে না। সবাই বাঁচতে পারব।

—উইন্ডচিটার কিন্তু যা বলে তাই হয়।

—জল খুঁজে পাওয়াটা বলছ?

—শুধু তাই নয়। বলেছিল জলটা হাত দেড়েকের বেশি উঁচুতে দাঁড়াবে না।

দূরে, এবার বিস্ফোরণের শব্দ হয়। একটু হালকা, পরপর একসঙ্গে টানা শব্দ।

—মনে হচ্ছে মেশিনগানের আওয়াজ।

—আমারও তেমনই লাগল।

—কার সঙ্গে কার লড়াই চলছে বোঝার উপায় নেই।

—কিন্তু দ্যাখো, লড়াই হলে পাল্টা আওয়াজও হত। ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আমিও না।

এস. টি. ডি —আই. এস. ডি বুথের দরজাটা খুলে জিশা অবাক হল। কোনোদিনও সে কুমারকে ফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখেনি। কুমার কানে লাগিয়ে কিছু শুনছে? জিশা ইশারায় জিজ্ঞেস করে। কুমার হাসে।

—এমনিই ভাবলাম কোনো শব্দ যদি শোনা যায়।

জিশা মেঝেতে বসে। কুমার আধখানা আধপোড়া সিগারেট বের করে।

—দূর ছাই! আগুন নেই। ধরানো যাবে না।

ফের আধপোড়া সিগারেটটা পকেটে রেখে দেয়। দূর থেকে একটা এরোপ্লেনের শব্দ কাছে আসে অথচ একেবারে ওপর দিয়ে নয়, খেলনানগরকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

জিশা ডানহাতের বুড়ো আঙুল আর কড়ে আঙুল ছড়িয়ে এরোপ্লেনের ডানা বানায়। মাঝের তিনটে আঙুল এরোপ্লেনের শরীর। এরোপ্লেনটা কুমারের মুখের কাছে এসে একটু ছুঁয়ে ফের দূরে উড়ে যায়। ফিরে আবার ঘুরে আসে। আবার চলে যায়। কুমার কিছু একটা ভাবছে। খুব মন দিয়ে ভাবছে। এরোপ্লেনটা ফের জিশার হাত হয়ে যায়। হাতের জ্বলজ্বলে টানা ভাগ্যরেখা, আয়ুরেখা ও অন্যান্য রেখার মধ্যে নীল নীল দাগ।

তারপরের দিন কোনো বিস্ফোরণের শব্দ হয়নি। কুমার সকালে একবার এসেছিল। শব্দ নেই। ফের ঘুরে এসেছিল বেলায়। তখনও দরজা বন্ধ কিন্তু মনে হয়েছিল ঘরের মধ্যে উইন্ডচিটার কথা বলছে। দরজায় শব্দ করেছিল কুমার।

—কে?

—আমি, কুমার।

—দাঁড়াও, খুলছি।

একটু সময় লাগে। উইন্ডচিটার প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে খুলে দেয়। বোধহয় শুয়েই ছিল।

pathagar.net

—আমি আর একবার এসেছিলাম।

—কখন?

—সকালে।

—আজ ঘুমটা কিছুতেই ভাঙতে চাচ্ছিল না। সিগারেট খাবে?

সিগারেট জ্বালাবার সময় কুমার দেখে ভাঙা ট্র্যানজিস্টার রেডিও। জং ধরা ব্যাটারি।

—এখুনি একটা মজার স্বপ্ন দেখছিলাম। এর আগে যে শহরটায় ছিলাম সেখানে ফিরে গেছি।

—স্বপ্ন দেখতে দেখতে কথাও বলছিলে।

—তাই?

—শোন, তোমার সাইকেল রেডি।

—কোথায়?

—বলছি। লুকনো রয়েছে।

—কেউ দেখেনি তো?

—কেউ না।

—বলো।

—উত্তরমুখো যে সোজা সড়ক আছে সেটা দিয়ে কিছুটা এগোলে, তা বেশ কিছুটা হবে, বাঁদিকে একটা ভাঙা দেওয়াল পাবে।

—আসার সময়ে ডানদিকে পড়ে। দেওয়ালে একটা আড়াআড়ি শিক দেওয়া জানলা রয়েছে।

—ঠিক। ওই দেওয়ালটার ওপারে সাইকেলটা দাঁড় করানো আছে।

—চলবে তো?

—চলবে। আমি ট্রায়াল দিয়েছি। তবে চেনটা কমজোরি। এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় বার বার পড়ে যাবে। আর প্যাডেল একটা নেই। ব্রেক নেই। বেলও নেই।

—তুমি কিন্তু আর আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবে না। সময়টা ভালো নয়। আমার মন বলছে খুব বিপদ আসছে।

—তাহলে আমাদের কী হবে? আমার, জিশার? আমাদের যাওয়ার? ফোনটা আমি দেখেছি। একেবারে ডেড। কতদিন কেউ জানে না। ওটা বাজবে কি করে?

—আমি তো তোমাকে বলেছিলাম। দিন আর সময়টা বলব। বাকি কোনও কিছু নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

—আমি জিশাকে কিছু জানাইনি।

—জানাবে না। এর মধ্যে কারও নজরে না পড়ে এইভাবে যা না হলেই নয় এরকম কিছু জিনিস গুছিয়ে রাখবে।

—তোমার সঙ্গে আর যদি দেখা না করি তাহলে কি করে জানতে পারব যে কবে, কখন ফোন বাজবে?

—আমি এখনই বলে দিচ্ছি। তিন তারিখ! থার্ড ডিসেম্বর। বিকেল পৌনে পাঁচটা থেকে সোয়া পাঁচটার মধ্যে। তুমি জিশাকে নিয়ে রেডি থাকবে। আর আগেই তোমাকে বলেছি। তার আগে অনেক কিছু ঘটবে। মাথা ঘামাবে না। আমি তোমাদের নিয়ে যাবই। আমার কখনও কথার খেলাপ হয় না।

—আমি তাহলে এখন যাই?

—যাও। শোনো, এই সিগারেট প্যাকেট আর লাইটারটা নিয়ে যাও। দিয়ে দিলাম।

—তোমার?

—আমার আর সিগারেট খাবার দরকার নেই। অনেক খেয়েছি। কুমার চলে যাওয়ার পরে উইন্ডচিটার দরজাটা বন্ধ করল। ঘরের মেঝেতে বসে জং ধরা ব্যাটারিগুলো ভাঙা ট্রানজিস্টার রেডিওতে লাগাল।

১ ডিসেম্বর খেলনানগরের ঘুম ভেঙেছিল খুব নিচু দিয়ে জেট ফাইটার উড়ে যাওয়ার বুক কাঁপানো শব্দে। যারা গতরাতে কাফিড্রিল খেয়ে চুর হয়েছিল, তাদেরও ঘুম ভেঙে যায়। গতরাতে তিন বুড়ির সামনে গামলায়-ভাসানো প্লাস্টিকের পুতুল ভাসতে ভাসতে ধারে গিয়ে ঠেকেছিল যার অর্থ হল তেমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটতে যাচ্ছে না। জেট ফাইটারগুলো চলে যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ কিন্তু কোনো শব্দ হয়নি।

বামন ঘুম থেকে উঠে ভেজানো দরজাটা খুলল। বাইরে বেরিয়ে পেচ্ছাপ করল। তারপর ফিরে এসে কৌটো থেকে বরাদ্দ দুটো বিস্কুট বের করার সময় দেখল যে কৌটোর ওপরে খেলনানগরের খসড়া ম্যাপটা রাখা আছে। ম্যাপটা সে লুকিয়ে ফেলল।

'৮' আর '৯' দেখল পোস্টার লাগাবার আঠা আর নেই। তখন তারা ঠিক করল যে চত্বরে ওগুলো নুড়ি পাথর চাপা দিয়ে রেখে দিয়ে আসবে।

—যা শব্দ করে প্লেনটা গেল। আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

—দেওয়ালের ফটোগুলো দেখি নড়ছে। আমি ভাবলাম কী কাণ্ড। ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি?

—ফের যুদ্ধ লাগবে? কী মনে হয়?

—এতে মনে হওয়ার কি আছে! লাগলেই হল। যুদ্ধ মানেই তো মুনাফা।

—সে যাই হোক। কারখানা খুলবেই। আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ।

ওরা দুজনে ইউনিয়নের ঘর থেকে বেরিয়ে গলি দিয়ে চলছে। হাতে পোস্টার। নিঃশব্দে কখন যে উইন্ডচিটার পেছন থেকে এসেছে ওরা বুঝতে পারেনি। চমকে গিয়েছিল দুজনেই।

—দাঁড়াও। সময় নষ্ট করবে না। যা বলছি শোনো। কাল, দু তারিখ। রাত ১২টার পরে বার্বি পুতুলের তলায় আসবে। ঠিক তলায়। খোঁড়ার জিনিস জোগাড় হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—ভালো। ওগুলোতে দরকার হলে কাপড় জড়িয়ে নেবে। শব্দ যত কম হয় ততই মঙ্গল। আর কেউ যদি এসে পড়ে তাহলে কী করবে?

—কী করব?

—জানে খতম করে দেবে। হত্যা করায় আমরা বিশ্বাস করি না কিন্তু কারখানা খোলার পথে কোনো বাধা আমরা সহ্য করব না।

—না।

—আমি চললাম। আর শোনো, যাই ঘটুক, বিচলিত হবে না। জয় আমাদের হবেই। কাল রাতে।

তিনজনেই ডান হাত ওপরে তুলে মুঠো করে।

সেদিন দুপুরের পর থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডাটা কমে গিয়ে আকাশে মেঘলা দেখা দিল। গুমোটও হল। রাতে কয়েকবার মেঘও ডেকেছিল। ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টিতে ভিজে গেল বার্বি পুতুলের আধপোড়া চুল ও মরা, শুকনো শকুনের শক্ত হয়ে যাওয়া পালক। পরদিন সকালে উইন্ডচিটারের ঘরের দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা মারার শব্দ। বৃষ্টির শব্দও রয়েছে। ঘুমচোখে উইন্ডচিটার দরজা খুলে দেয়। বাইরে অনেকে। তার মধ্যে চেনা অচেনা অনেকে রয়েছে। সকলেই ভিজে। উইন্ডচিটার শুধুই শার্ট পরা। হাতকাটা চিৎকার করে ওঠে,

—সর্বনাশ হয়ে গেছে!

—কী? কী সর্বনাশ!

—এ জলের মধ্যে, কেউ বিষ মিশিয়েছে।

—মানে?

—পাহাড় থেকে আবর্জনা এনে জলের মধ্যে ফেলেছে। অনেক। ধারেও পড়ে আছে।

—তোমরা দেখেছ?

—আমরা সেখান থেকেই আসছি।

—দাঁড়াও, আমি উইন্ডচিটারটা পরে নিই। বৃষ্টি পড়ছে।

উইন্ডচিটার ওদের সঙ্গে এগোয়। ও আগে আগে যায়। হাঁটে না। প্রায় হোঁচট খেতে খেতে দৌড়োর। একবার পা পিছলে পড়ে যায়। সাদামুখ ওকে হাত ধরে তোলে। ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেয়। দৌড়োয়। অন্যরাও দৌড়োয়। বামন আর বুড়ো দরজি দৌড়োতে পারে না। ওরা জোরে হাঁটতে চেষ্টা করে।

তিন পাথরের ফোকরে জল আর দেখার উপায় নেই। পোড়া রবার আর গলানো ধাতু মিলিয়ে নীলচে ছাই ছাই দলা পাকানো মণ্ডের মতো বিষাক্ত জিনিস তিন পাথরের মধ্যে অপরিসর ফোকরটা প্রায় ভরিয়ে ফেলেছে। পাথরের ওপরেও ছড়িয়ে আছে বিষ।

উইন্ডচিটার উপুড় হয়ে শুয়ে হাত ঢুকিয়ে দেয়। একদলা তুলে ছুঁড়ে দেয়। আবার তোলে। ওপরে ছড়ানো বিষধোয়া জলও বিন্দু বিন্দু করে গড়িয়ে ফোকরের মধ্যে যাচ্ছে।

—একটা শিক নিয়ে এস। জলদি। লম্বা একটা শিক।

দুজন শিক আনতে যায়।

—এত লোকের পরিশ্রম। আমার সব চেষ্টা। সব কথা। সব নষ্ট করে দিল? আমিও দেখে

নেব। আমার নাম উইন্ডচিটার। ঠিক খুঁজে বের করব।

—কিন্তু একাজ কে করতে পারে?

—তুমি করতে পারো, ও করতে পারে, সে করতে পারে। কে এখন আমি জানি না। কিন্তু জানব। নির্ঘাৎ জানব। যার মনে অত বিষ সে ধরা দেবেই। বিষের জ্বালাতে নিজেই ধরা দেবে।

বিস্ফোরণের শব্দ হয়। বেশ জোরে। সকলেই বুঝতে পারে এটা মেঘের ডাক নয়। শিক নিয়ে দৌড়ে আসে দুজন। ভিজে সপ সপ করছে।

—শিক দিয়ে খুঁচিয়ে দেখ। যদি ফাটলের ভেতরে ঢুকে যায় কিছু করার নেই।

—কী হবে এখন?

—জানি না কী হবে? হাত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে সব বিষ বের করতে হবে। এখন এ জল নদীর জলেও চেয়েও বিষাক্ত। কাটতে অনেক সময় নেবে।

—তারপর?

—আমি আর জানি না। জানার ইচ্ছেও আমার নেই। আবার কেউ এসে বিষ মিশিয়ে দেবে না কেউ বলতে পারে? এই তো, হাত দিয়ে তুললাম বলে জ্বালা করছে।

উইন্ডচিটার হাত বৃষ্টির জলে ধুতে চেষ্টা করে।

—এখন আমরা কি করব?

—পারবে যা করলে কাজ হবে করতে? যাও। গিয়ে খবর নাও কাল রাতে কে ঘুমোয়নি। কে বেরিয়েছিল। কে এই আবর্জনার পাহাড়ে গিয়ে বৃষ্টির মধ্যে পিঠে করে বিষ নিয়ে এসেছে। খবর নাও যদি পারো। যদি ধরতে পারো তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারো তোমরা। আমাকে জানাবার দরকার নেই। আমি চললাম।

উইন্ডচিটার বৃষ্টির মধ্যে চলে যায়। সাদামুখ, হাতকাটা, '৮', '৯', বামন, বুড়ো দরজি, অন্যরা—সকলে নিজেদের দেখে। চাহনিগুলো পালটে যাচ্ছে। বিস্ফোরণের শব্দ হয়। সবাই উত্তরের দিকে তাকায়। বৃষ্টি বাড়তে থাকে। মেঘের ডাক ও বিস্ফোরণের শব্দ জড়িয়ে যায়। ফোকরের মধ্যে বৃষ্টির জল জমা হয়। বিষধোয়া জল নিচের বিষাক্ত জলের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়। বৃষ্টি আরও বাড়ে।

বামনই একবার সন্ধের মুখে উইন্ডচিটারের ঘরে গিয়েছিল। বৃষ্টি তখনও পড়ছে। বামনের একটা ছাতা ছিল। ঘরে আলো নেই।

—কে?

—আমি।

—ম্যাপটা পেয়েছি। তোমার কি কাজ হয়েছে?

—কী কাজ?

—সোনা খোঁজার কাজ?

—জলের ব্যাপারটার পর সত্যি বলতে কিছুই আমার মাথায় নেই। মাথা কাজই করছে না।

—আমি বলি কি ওই সোনার বিস্কুট খুঁজে বরং লাভ নেই। আর ওর ভাগ নিয়ে আমারই বা কী হবে? পেলে তুমিই সবটা নিতে পার?

—তুমি কি মনে কর সোনার আমার খুব দরকার?

—তা বলছি না। তুমি এখনও কত জায়গায় ঘুরবে। কত দেখবে শুনবে। ওই সোনা হয়ত তোমার কাজে লাগবে।

—এর আগেও আমি অনেক জায়গায় ঘুরেছি। অনেক কিছু দেখেছি। তার জন্যে সোনার দরকার হয়নি। তুমি বরং এখন যাও। আমার ঘুম পাচ্ছে।

বামন চলে যাওয়ার পরে উইন্ডচিটার অন্ধকারেই হ্যাভারসাক গুছিয়েছিল। পকেটে একটা ওষুধের শিশি রেখেছিল। বৃষ্টি একটু ধরেছে।

'৯' ইউনিয়ন ঘরের দরজার সামনে বসে বিদ্যুতের আলোয় ঘড়ি দেখল। বারোটা বাজতে পাঁচ। '৮' লেনিনের ছবির তলায় মাথা ঠেকিয়ে চুপ করেছিল। '৯' কাঁধে হাত রাখল।

—কমরেড! সময় হয়েছে।

—চলো।

'৯' দুটো কাপড়ে জড়ানো মাটি খোঁড়ার জিনিস নিয়ে নেয়। একটা খুরপি। একটা মোটা লোহার পাত। ছোট শাবল ওরা পায়নি। দুজনেই খালি পায়ে। প্যান্ট গোটানো। গায়ের জামার বোতাম খোলা। পেটের কাছে গিঁট দিয়ে বাঁধা।

অন্ধকারেই মিশে উইন্ডচিটার দাঁড়িয়েছিল। ওরা প্রথমে দেখতে পায়নি। উইন্ডচিটার এগিয়ে আসাতে দেখতে পেল।

—তোমাদের সুবিধের জন্যে জায়গাটা আগে চিনিয়ে দিই। আমাকে একটা হাতিয়ার দাও। দাগ দেব।

—নাও। তোমার কী মনে হয় জলে বিষ মিশিয়েছে কে?

—তোমরা যাকে ভাবছ আমিও তারই কথা ভাবছি। কিন্তু একহাতে ও এতটা পারবে?

—বিস্তর জোর আছে ওর ওই হাতে। আমরা জানি।

—এই জায়গাটা। আস্তে আস্তে খুঁড়বে। শব্দ করবে কম। ঠাণ্ডায় '৮' আর '৯'-এর দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।

—এই ট্যাবলেট দুটো দুজনে মুখে রাখো। ঠাণ্ডাটা কম লাগবে। আমিও একটা নিই। শীত করছে। তোমরা শুরু করো। আমি চারদিকটা একবার ঘুরে দেখে আসি।

'৮' আর '৯' কাজ শুরু করে। বৃষ্টিটা অল্প বাড়ে। চত্বরটা শান বাঁধানো হলেও সেটা স্ল্যাব ফেলে ফেলে করা। স্ল্যাবগুলো বেশ বড়।

—এই ফাঁক বরাবর গভীর করতে পারলে চাড় দিয়ে স্ল্যাবটা তোলা যাবে।

—চাড় দিলে স্ল্যাবটা ভেঙেও যেতে পারে।

—ভাঙুক। তলায় তো মাটি।

ওরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দুই স্ল্যাবের মধ্যে ফাঁকটা চওড়া করে।

চাড় দেয়। স্ল্যাবটা অল্প কিছুটা ভেঙে যায়। টুকরো ছুঁড়ে দূরে ফেলে দেয়। আবার চাড় দেয়। এবার আরও বেশি ভাঙে। তলায় মাটি। বৃষ্টিটা বাড়ে। দুজনেই অঝোরে ভেজে।

—ভালো দেখা যাচ্ছে না। উইন্ডচিটার আসছে না কেন বল তো?

—বলল তো, চারদিকটা দেখে আসছে।

—ঘুম পাচ্ছে নাতো তোমার?

—না। তোমার?

—আমারও পাচ্ছে না।

স্ল্যাবের আধখানা ভেঙে উঠে আসে। এপাশটায় মাটির বদলে খোয়াপাথরের গাঁথনিও আছে। কাজটা একটু বাড়ে।

—মাথা ঝিমঝিম করছে না তোমার?

—না। তোমার?

—আমারও না।

উইন্ডচিটার আসে। পকেট থেকে সুতোয় বাঁধা পাথরটা বের করে ঝোলায়। ফের পকেটে রাখে।

—ঠিক আছে। এখানেই রয়েছে। হাত দুয়েক খুঁড়লেই পাওয়া যাবে। বাক্সটা লোহার হতে পারে। সাবধানে। বেশি শব্দ না হয়।

—বাক্সটা কী করব আমরা।

—আমাদের ঘরে নিয়ে যাবে। কিছু চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখবে।

—তোমার ঘরে?

—না, না, তোমাদের ঘরে। এখন আর থেম না। খুঁড়ে যাও। দাঁড়াও, কিছুটা মাটি আমি সরিয়ে দিই।

—কেউ নেই তো!

—কোথাও কেউ নেই। আর তা ছাড়া আমি তো নজর রাখছি! ওরা খোঁড়ে আর পাশে মাটি তুলে রাখে। হঠাৎ একটা শব্দ হয়। একটা পাথর। ওরা সরিয়ে পাশে রাখে। হাতখানেক খোঁড়া হয়ে গেছে।

—এক মিনিট জিরিয়ে নেব।

—আমিও।

—ঘুম পাচ্ছে না তো তোমার?

—না। তোমার?

—আমারও না।

বৃষ্টি জোরে হয়। গর্তটা বেশ চওড়া হয়েছে। আরও কিছুটা খুঁড়তে হবে। তারপর দুজনে মিলে বাক্সটা নিয়ে যেতে হবে। কতটা ভারী হবে বাক্সটা! ওই বাক্সটা দিয়েই কারখানা খুলবে।

উইন্ডচিটার এসে দেখল দুজনেই ঘুমিয়ে রয়েছে। হাতে লোহার পাত আর খুরপি আলগা হয়ে গেছে। উইন্ডচিটার পকেট থেকে চকচকে একটা গোল ধাতব মুদ্রা বের করে। গর্ততে ফেলে দেয়। হাঁটতে থাকে। ঘরের সামনেই হ্যাভারস্যাকটা রাখা ছিল। নিয়ে নেয়।

পরদিন অনেক বেলায়, দুপুর গড়াবার মুখে '৮' আর '৯'-এর যখন ঘুম ভেঙেছিল তার আগেই ওরা হালকা আধো ঘুম আধো স্বপ্নের মধ্যে এত লোকের একসঙ্গে কথা বলার শব্দ পাচ্ছিল যে মনেই হতে পারে যে কারখানা খুলছে ও তাই নিয়ে সকলে আলোচনা করছে। ঘুম ভাঙতে তারা দেখল অবশ লাগছে। হাত ও পা বাঁধা। ঘুমের মধ্যেই কারা তাদের জামা, প্যান্ট সব খুলে নিয়েছে। হাতকাটা, বরকন্দাজ, ঘেয়ো দাগী, এরা তো আছেই। আরও অনেক লোক। সকলের হাতেই কিছু না কিছু। ছুরি, রড, শাবল এমনকি গতরাতে যে দুটো জিনিস ওদের হাতিয়ার ছিল সেই খুরপি ও পাতটাও ওদের হাতে।

—কি রে! শুয়োরের বাচ্চা! এবার কোন উইন্ডচিটারের বাপ তোদের বাঁচাবে? হুব্বা... হুব্বা... হুব্বা...

'৮' আর '৯' কিছু বুঝতে পারে না। হাতকাটা ও অন্য সকলের মুখে কাফিড্রিলের ঝাঁঝালো গন্ধ।

—সব সোনা নিয়ে উইন্ডচিটার ভেগেছে আর তোদের জন্যে এইটা রেখে গেছে।

হাতকাটা একটা চকচকে স্বর্ণমুদ্রা দেখায়।

pathagar.net

—এইটা সঙ্গে দিয়ে তোদের জ্যান্ত কবর দেব। হুব্বা... হুব্বা...

—আমরা কিছু জানি না। উইন্ডচিটারকে ডাকো। আমরা কারখানা খোলার জন্যে সোনা খুঁজছিলাম।

—মাজাকির আর জায়গা নেই। কারখানা মারাচ্ছে। সোনা তোরাই খুঁড়ে দিয়েছিস উইন্ডচিটারকে।

—উইন্ডচিটারকে ডাকো না একবার। ও জানে।

—হুব্বা... হুব্বা... হুব্বা...

কুমার চোখ বন্ধ করে। কারণ, হাতবাঁধা '৯' কে ছুরি খেতে দেখে হাত পা বাঁধা অবস্থাতেই '৮' চিৎকার করে ওঠে

—ইনকেলাব...

—হুব্বা... হুব্বা... হুব্বা...

তার মাথায় রড পড়ে ও জনতা উল্লসিত হয়ে ওঠে। ছুরিটা অল্প ঢুকিয়ে বের করে দেয় হাতকাটা। ভিড়ের পেছন থেকে বামন চলে যায়। তার গা গুলোয়। '৮' মাথা উঁচু করে দেখে যে দুজনের হাতে তাদেরই দুটো পোস্টার। উলটো ধরা। তাতে লেখা '৮' ও '৯'।

হুব্বা... হুব্বা... হুব্বা... হুব্বা...

খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, পিটিয়ে পিটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ওদের মারা যায়। কখন যে ওরা মরে গিয়েছে সেটা বোঝাও যায়নি। মরার পরেও কেউ কেউ মারছিল নিশ্চয়ই। এরপর বিকেল হতে না হতে ওদের বার্বি পুতুলের তলার তেপায়া কাঠামোয় শকুনের পাশাপাশি পা বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়ার তোড়জোড় চলে।

pathagar.net

বামন ওর ঘরে ওর যা কিছু আছে তালিমারা ক্যাম্বিসের ব্যাগে গুছিয়ে হাঁপিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসে ছিল। কুমার জিশাকে নিয়ে গিয়েছিল তার ঘরে। জিশা কখনও ডুকরে, কখনও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিল আর কুমার তাকে আদর করার ফাঁকে ফাঁকে ফোনটার দিকে তাকাচ্ছিল।

শদেড়েক লোক চত্বরে দাঁড়িয়ে যা আয়েস করে বসে দেখল উলঙ্গ অবস্থায় '৮' ও '৯' কে ওপর থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল। তলায় চলছিল হাতকাটার দলের নাচ ও কাফিড্রিল খাওয়া।

হুব্বা... হুব্বা... হুব্বা... হুব্বা...

অনেক ওপরে একটা এরোপ্লেনের শব্দ। অনেক, অনেক ওপরে ছোট্ট প্লেনটা দেখা যায়। তার থেকে একটা কিছু বেরিয়ে আসে। প্যারাসুট খুলে যায়। দুলতে দুলতে নামছে। প্লেনটা চলে যাচ্ছে। নামছে ধীরে। অনেক সময় ধরে।

বার্বি পুতুলের অনেক ওপরে, ঝুলন্ত '৮', '৯' ও শকুনের অনেক ওপরে, খেলনানগরের ওপরে প্যারাসুটটা ধীরে ধীরে নিচে যেখানে মানুষ থাকে সেই জায়গাটায় বাঁধা জিনিসটার ভারে নামার সময় একটা তীব্র ঝিলিক ও তুমুল একটা শব্দ... আকাশ একটা ঝুলন্ত বিস্ফোরণ... তার হাল্‌কা ও স্বল্পস্থায়ী ঝড় তোলা শব্দ...

এর পর মর্ত্যশরীর।

অশরীর

আমি উইন্ডচিটার। উইন্ডচিটার আমার নাম নয়। আমাকে চিটার বলা যেতে পারে। কিন্তু আমি কথার খেলাপ করি কেউ বলতে পারে না। প্রথম কথাটাই হল সত্যি বলে কিছু নেই। গালফ যুদ্ধের সময়ে আমার সামরিক সংবাদদাতা হিসেবে হাতে খড়ি। সারা দুনিয়া জানত যে সাদ্দাম ইরাকের মরুভূমিতে দুর্ধর্ষ সৈন্য ও দুরন্ত সব কামান সাজিয়ে রেখেছে। এমন পরিখা রয়েছে যা দুর্ভেদ্য। এইসঙ্গে রয়েছে রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র। এসব কথা বানানো। যা হয়েছিল তা হল একতরফা এক গণমেধ, যেখানে ট্যাঙ্কের সঙ্গে বা বুলডোজারের সঙ্গে যান্ত্রিক লাঙল লাগিয়ে ১০০,০০০ মানুষকে বালির মধ্যে পিষে মারা হয়। এই পদ্ধতি এর আগে বিশ্বের কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। কতজন জানে এই কথা? এখনও কতজন? অথচ সেই যুদ্ধ নাকি টিভিতে দেখানো হয়েছিল। হয়েছিল?

খেলনানগরে আমাদের ছিল একটা টপ সিক্রেট সামরিক তৎপরতা যার নাম 'অপারেশন ভালচার'। রিমোট সেন্সিং-এর যন্ত্র বসানো শকুন তখন অনেক ওরকম বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন হ্যামলেটে পাঠানো হয়। দেখা হয় সেখানকার মানুষ কী মানুষ রয়েছে, না অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে যাদের খরচ করে ফেলা যায়? এরকম অনেক জায়গাই ছিল এবং আমার মতো অনেক উইন্ডচিটারই সেখানে গিয়েছিল।

সংক্ষেপে বললে আমার কাজ ছিল মাইক্রোলেভেলে সবটার ব্যবস্থা করা এবং বিনা ঝামেলায়, চোখের আড়ালে, কাউকে না জানিয়ে কী করে কাজটা সফল করা যায় সেটা সুনিশ্চিত করা। এর আগে ফিশন ও ফিউশন অস্ত্র আমরা তৈরি করেছি, এর আঘাত যেমন খেয়েছি তেমন এর আঘাতও হেনেছি। খেলনানগরে আমরা পরীক্ষা করেছি নিউট্রন বোমা যার বিশেষ পারদর্শিতার জন্যে কেউ কেউ একে 'ক্যাপিটালিস্ট বম্ব'-ও বলে থাকে। খেলনানগরের ওপরেই আমাদের নিউট্রন বোমার প্রথম পরীক্ষা হয় ও সেই পরীক্ষা সম্পূর্ণ সফল। 'এনহানস্ড্ রেডিয়েশন ওয়ারহেড' বলে অভিহিত এই অস্ত্র নিউট্রন ফিশনের ওপরে নির্ভরশীল। এর বিস্ফোরণের ফলে যে তাপ ও ঝটিকাঘাতের সৃষ্টি হয় তা তুলনামূলকভাবে ছোট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু ওই জায়গাটুকুর মধ্যে নিউট্রন ও গামা তেজস্ক্রিয়তার ব্যাপক তরঙ্গ ওঠে যা বর্ম বা পুরু আস্তরণ অক্লেশে ভেদ করে ও যে কোনো জীবন্ত কোষকে নিমেষে ধ্বংস করে। সম্পদ বা অন্য কিছু এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। স্বল্প পরিসরের মধ্যে এর ধ্বংসক্ষমতা পর্যাপ্ত এবং এর রেশ দীর্ঘমেয়াদি নয়। তাই ট্যাঙ্ক বাহিনীর বিরুদ্ধে রণকৌশলগত অস্ত্র হিসেবে এর ব্যবহার খুবই কার্যকর হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এবং এই অস্ত্র যেখানে ব্যবহৃত হবে তার কয়েক মাইল দূরে যদি জনবসতি থাকে তার কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা খেলনানগরের ওপরে বিমান থেকে নিউট্রন বোমা ফেলেছি। কিন্তু ল্যান্স ক্ষেপণাস্ত্র বা ৮ ইঞ্চি অর্থাৎ ২০ সেন্টিমিটার হাউইটজার কামানের সাহায্যেও নিউট্রন বোমা ছোঁড়া যায়।

আমাদের একটা ভয় ছিল। সেটা হল খেলনানগরের ওপরে আমাদের এই পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ যদি সফল না হয় তাহলে বা কেউ বেঁচে এখান থেকে পালাতে পারলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। এই কাজে সবচেয়ে বিপদজনক হয়ে উঠতে পারত '৮' ও '৯'— ওদের রোখ এতই জোরদার যে ওদের মতো মানুষকে নিয়ে কোনো পরীক্ষার ঝুঁকি নেওয়া চলে না। তাই ওদের সম্বন্ধে আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

ওখানে পাথরের গঠন দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে জল পাওয়া যেতে পারে। তার

জন্যে দূরে, এমনকি আবর্জনা পাহাড়ের কাছেও যে পাথরের আউটক্রপ রয়েছে সেগুলো আমার দেখার প্রয়োজন ছিল। ওখানকার কোনো বড় পাথরই বোল্ডার বা বিচ্ছিন্ন পাথরের খণ্ড নয়। চিটারদের অনেক কিছুই জানতে হয়। এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে আপাতভাবে দেখলে যা মনে হয় সেই ভাঙা ট্রানজিস্টার রেডিও ও জং ধরা ব্যাটারি আসলে অন্য কিছু। আমার বলা কথা যে ট্রানজিস্টর রেডিও শোনে সেটা অবশ্য আমি রাখঢাক না করে বলেই দিয়েছিলাম। এরকম অনেক কিছুই আমি বলেছি যার মধ্যে অনেক মানে ছিল। কেউ যদি বুঝতে না পারে তাহলে কিছু করার নেই। জলে বিষ মিশিয়েছিলাম আমিই। আমারই পাঠানো বার্তা পেয়ে উত্তরদিকে বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করা হয় যাতে খেলনানগর থেকে কেউ না পালায়। সোনার বিস্কুট আমার কাছে ছিল না। একটি স্বর্ণমুদ্রা আমি খরচ করেছিলাম যদিও চত্বরে পড়ে থাকা হাতকাটার লাশের হাতে ওঠা ছিল। ওঠা আর আমি নিইনি। যদিও নিতে পারতাম।

খেলনানগরের কথা আর কেউ জানতে পারবে না। জানার কোনো উপায়ই নেই। সমস্ত লাশ এনে বার্বি পুতুলের সামনের চত্বরে ডাঁই করে পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। আমি কথা দিয়েছিলাম কুমারকে যে জিশা ও ওকে আমি নিয়ে যাব। আমি কথা রেখেছি। মেল ও ফিমেল বডিতে চড়া নিউট্রন ও গামা রেডিয়েশন কী ঘটায় তা ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ করে জানার জন্যে ওদের দুজনকে প্লাস্টিকের জিপ্ ফাসনার টানা বস্তায় হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাওয়া হয়।

pathagar.net

কাঙাল মালসাট

pathagar.net

কাতার দিয়ে কাটা মুণ্ডু আদি গঙ্গার পাড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। অর্থাৎ রাতে ভয়াবহ কিছু ঘটেছে। বস্তা করে মুণ্ডুগুলো ডাঁই করে রেখে সটকেছে? ধড়গুলোর তাহলে কী হল? কুপিয়ে কাটা না পোঁচ দিয়ে দিয়ে? মুণ্ডুগুলো কি ব্যাটাছেলের না ফিমেল? এরকমই ছিল একটি ভাষ্য। অপরটি হল সাইক্লোনজনিত ঘোলাটে আকাশের তলায় খলবলিয়ে মাথার খুলি নাচছে। আগে অনেকগুলো নাচছিল। কিন্তু যেই পুলিশ এল অমনি বাকিগুলো ভ্যানিশ হয়ে মাত্র তিনটে রইল। আর পুলিশ যখন ভাবছে পা বাড়াবে কি বাড়াবে না, নতুন কোনো কেচ্ছায় জড়িয়ে পড়ার মন্দ ভালো সাত-পাঁচ ঠিক সেই সময় ঐ তিনটে খুলিও মুচকি হেসে উদ্বেল জোয়ারে লোপাট হয়ে গেল। পাবলিক এই সূত্র ধরে উবু হয়ে বসেছিল কিন্তু সন্ধেবেলায় বেসরকারি একটি বাংলা চ্যানেলের সংবাদে দেখা গেল লম্বামুখো এক পুলিশ অফিসার বলছে যে ঐ খুলিগুলো শিরিটির শ্মশান থেকে এসেছিল। এক জোয়ারে এসেছিল, পরের জোয়ারে আবার ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন। পুলিশেরই অন্য একটি মহলের মতে তথাকথিত ঐ 'ড্যান্সিং স্কালস্' শিরিটির মাল নয়, ক্যাওড়াতলার। জোয়ারের টানে পলিব্যাগ, হাওয়াই চটি, কলার খোলা, ফুল ইত্যাদি ইন্যানিমেট অবজেক্টের সঙ্গে ডাউন সাউথ মহাবীরতলা চলে গিয়েছিল।

মনে হয় এই বিচিত্র ও বিশিষ্ট ঘটনাটি সম্বন্ধে পাবলিক বা পুলিশ যাই ভাবুক না কেন আমাদের উচিৎ হবে একটি স্বতন্ত্র অবস্থানই গ্রহণ করা বা যে কোনো অবস্থানই পরিহার করে চলা। ঘটনাটি ঘটেছিল ২৮ অক্টোবর ১৯৯৯—শুধু তারিখটা মনে রাখতে হবে। আগে থেকে সব জেনে যারা ঘটনা এলে সেই পরিচিত হাসিটি হাসে তাদের গেঁড়ে মদনা না বলার কোনো কারণ আছে কি? অগণিত করোটি শোভিত এই শতাব্দীর শেষ লগ্নে কী ভেবেছিলেন আপনারা? বুলবুলিপাখি ডিগবাজি খাবে? পাড়ায় পাড়ায় নহবৎ বসবে? সাধনার যে স্তরে ইলবিলা ইড়বিড়া ভেদাভেদ ঘুচে গিয়ে বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের আভা দেখা যায় বাঙালি তার ধারে কাছেও নেই। অতএব কেঁদে ককিয়ে লাভ তো হবেই না, উপরন্তু বিপদ বাড়বে। জাতির এরকমই এক মহাসংকট কালে শ্রী কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯৭০) হিন্দি ভাষায় একটি গান লিখেছিলেন, যেটি ১৯০৬ সালে কলকাতার কংগ্রেস সম্মেলনে সগৌরবে গাওয়া হয়েছিল।

ভেইয়া দেশকা এ কেয়া হাল।
খাক মিট্টি জহর হোতি সব, জহর হোই জঞ্জাল।

হিন্দি গান শুনলেই সকলেই ভাবে সিনেমার গান। এ গান সে গান নয়। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে আরও জানিয়েছেন। 'স্বদেশী সভায় তিনি একটি নূতনত্বের আমদানি করেন; উহা—সভার সূচনায় ও শেষে স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক সঙ্গীতের আয়োজন। নিজে সুগায়ক না হইলেও সঙ্গীত রচনায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা ছিল। স্বদেশী সভায় যোগদানকালে তিনি দুইজন বেতনভোগী সুকণ্ঠ গায়ককে সঙ্গে রাখিতেন...'। ঠিক এরকম না হলেও কাছাকাছি কোনো সুরে মন বেঁধে আমাদের করোটি নৃত্যের ব্যাপারটি ভাবতে হবে। তবে যদি কিছু হয়। আপাতত এটুকুই আয়ত্তে থাকলে যথেষ্ট যে খুলি-ড্যান্সের অনুষ্ঠানটি আরও

বড়, অভাবনীয় রকমের বড় এক প্রকাণ্ডকাণ্ডের ইঙ্গিত।

এই বার আমরা অবলীলায় চার দিন পেছিয়ে যেয়ে ২৪ অক্টোবর ১৯৯৯-এর আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় চতুর্থ পৃষ্ঠা অর্থাৎ ১২ নং পাতার নিম্নার্ধে মনোনিবেশ করব। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়, এরকম আমরা অবশপাঠক হিসেবে করেই থাকি যেহেতু এইটুকু বুদ্ধি আমাদের হয়েছে যে পিছিয়ে পড়ার চাইতে পা পিছলে আছাড় খেয়ে পড়াও ভাল। কর্মখালির পাঁচটি কলামের মধ্যে বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়টিতে একটি বিজ্ঞাপন রয়েছে যার বয়ান,

দেশ বিদেশ ভ্রমণ

২৭ বৎসর সম্মানিত বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর আনন্দ-র সাংস্কৃতিক দলের জন্য আকর্ষক সুন্দর তরুণ, তরুণী, কী বোর্ড প্লেয়ার, ড্রামার, বেঁটেমানুষ, অনুভবি ছুতোর মিস্ত্রি লাইসেন্সড পারসন, ম্যানেজার এবং ইলেকট্রিসিয়ান চাই। আকর্ষণীয় বেতন, শিক্ষা, আসা-যাওয়া, খাওয়া-থাকা, মেডিক্যাল সুবিধা। তিনদিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। সময় : সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ঠিকানা : যাদুঘর আনন্দ, C/o ম্যাজেস্টিক হোটেল, রুম নং ২০৭, ৪সি ম্যাডান স্ট্রিট, কলি-৭২ (নিউ সিনেমার পাশে)।

pathagar.net

প্রথমেই আমরা এই ভেবে সচকিত হই যে, ভোজবাজির চেয়েও রহস্যমণ্ডিত এই কাকতালীয় কাণ্ড। ২৪ তারিখের পর থেকে যোগাযোগের তিনদিন ধরলে ২৫, ২৬ ও ২৭ গেল—চতুর্থ দিবসেই খুলির নৃত্যানুষ্ঠান! ম্যাজিকের কি এই তবে শুরু? আমরা জানি যে, পুলিশ আমাদের আবেদনে কর্ণপাত করবে না ; কিন্তু ব্যাপারটি কি যথেষ্ট রহস্যঘন নয়? এ বিষয়ে পুলিশের চেয়ে রসবেত্তা আর কে হতে পারে? এরপরেই সন্দিগ্ধ মনে যে ফ্যাকড়া ক্রমেই আস্তানা গাড়ে তা হল নামের এই মিল অর্থাৎ যাদুকর আনন্দ ও আনন্দবাজার পত্রিকা—আনন্দের ভেতরে আনন্দ—একি নিছকই ভবেশ্বরের খেলা না পিশাচসিদ্ধ হেঁয়ালি না ঘোমটাপরা ঐ ছায়ার মায়াময় হাতছানি? তবে আমাদের মনের এই ফ্যাকড়াকে কেউ যেন আনন্দবাজার পত্রিকার মতো সুমহান প্রতিষ্ঠানের পেছনে কাঠি করা অপচেষ্টা বলে না ভাবেন। দুইহাতে সংবাদ ও সাহিত্যের মন্দিরা যে প্রতিষ্ঠান নিয়তই বাজিয়ে চলেছে তার পোঙায় লাগতে যাওয়া মোটেই ফলপ্রসূ হতে পারে না। উল্টে হুলো হয়ে যেতে পারে।

এই হুলো কী বস্তু তার একটি টিপিকাল কেস হল মিঃ বি. কে. দাস-এর জীবন। ঘটনাটি আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে কোনোমতেই জড়িত নয়। মিঃ দাস ইংরেজি ভাষায় স্বল্প দৈর্ঘ্যের উপন্যাস লিখতেন। মাত্র দুটিই তিনি লিখেছিলেন— 'দ্যা মিসচিভাস ইংলিশম্যান' এবং 'অ্যান অ্যাফেয়ার উইথ অ্যালিগেটরস।' তখন কলকাতার নামী ইংরেজি দৈনিক ছিল 'দ্যা ডেইলি প্লেজার' —সেখানে গ্রন্থ সমালোচনার পাতা দেখতেন মিঃ প্যান্টো এবং ঐ পাতাতেই 'লিটেরারি স্নিপেট্‌স' লিখতেন মিঃ পি.বি.। মিঃ বি.কে. দাস বার বার তাঁর নিজের খরচে বার করা দুখানি চটি নভেল নিয়ে উপরোক্ত পত্রিকার দরজায় কড়া নেড়েছেন তা গোনা যায় না। রিসেপশনে একটা গুঁফো গুণ্ডা বসত। তার নাম মিঃ শান্টু। এর নামে মার্ডার কেস ছিল বলেও জনশ্রুতি ছিল। এর কাজ ছিল লোক তাড়ানো। মিঃ বি. কে. দাস চার চারবার মিঃ শান্টু-র কাছে মিঃ প্যান্টো ও মিঃ পি.বি.-র জন্য দুখানি করে বই রেখে এসেছিলেন। প্রতিবারই নক্সাদার বিলেতি মার্বেল কাগজের মোড়কে লাল রিবনে বাঁধা অবস্থায়। মোট আট প্যাকেট 'দ্যা মিসচিভাস ইংলিশম্যান' ও 'অ্যান আফেয়ার উইথ অ্যালিগেটরস' জলে গেল। কী হয়েছিল জানা যায়নি।

অনুমান করা যায় যে মিঃ প্যান্টো ও মিঃ পি.বি. ঐ দুটি উপন্যাস ফেলে দিয়েছিলেন। অথবা ফেলে দেবেনই এরকম অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা থেকে মিঃ শান্টু রিভিউ সেকশনে বইগুলো পাঠায়নি। এবং মার্বেল পেপারের মোড়ক দিয়ে নিজের সংগ্রহের পর্নোগ্রাফির ফটো বইগুলোর মলাট দিয়েছিল এবং বইগুলি ওজনে ঝেড়ে দিয়েছিল—এমন হতেই বা বাধা কোথায়? কিন্তু মিঃ বি. কে. দাস ফঙ্গবেনে ধাঁচের ছিলেন না, যেমন মোটা ঘাড় তেমন ছিল তাঁর নলেজ ও রোখ। তিনি লেখা ছেড়ে দিয়ে আসামের জঙ্গলে ময়াল সাপের ভয়াল জগতে পাড়ি দিলেন—ময়ালের বাচ্চা ধরে এনে নানা চিড়িয়াখানায় সাপ্লাই দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। এবং এই কাজ করতে করতেই তিনি ফৌৎ হন। ভালুকের ছানা টুপিতে ভরে আনবার সময় সহসা, দুর্ভাগ্যবশত, সেই ছানাটির অভিভাবকরা এসে পড়েছিল। ভালুক শাবক সম্পর্কিত এই নির্মম অথচ যুক্তিসঙ্গত ঘটনাটি ঘটার মাত্র সাত দিন আগে কটকে পোয়েট-ফ্রেন্ড জি. এস. রায় কে-তিনি বাংলায় একটি চিঠি লিখেছিলেন। যা পরে উইতে খেয়ে নেয়। এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'মিঃ প্যান্টো-র প্যান্টোমাইম আর টলারেট করা যায় না। রিভিউ যদি নাও হয় 'লিটেরারি স্নিপেটস্'-এ একবার মেনশন হইতে পারিত। এই পি.বি-টি কে? আমি বাংলা ভালো জানি না কিন্তু এটার নাম পরার্থলোভী বকরাক্ষস বা পায়ুকামী বোম্বেটে দিয়াই স্যাটিসফায়েড থাকিলাম। ভাবনা করিয়াছি কয়েকখানি পাইথন লইয়া উহাদের গায়ে দিব। বেষ্টন করিয়া ভক্ষণ করিবে।'

আজকাল কেন বহুদিনই স্বল্প দৈর্ঘ্যের উপন্যাস নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলে আসছে। ১৯০৯ সালে প্রকাশিত শ্রী সুরেশচন্দ্রর চক্রবর্তী 'কাশ্মীরে বাঙালি যুবক' একটি উদাহরণ। তবে লেখক এ ঘাটে বেশিদিন জল খাননি। 'অল্প বয়সে একবার কেবল ইংরাজী শিলিং উপন্যাসের অনুকরণে, কতগুলি ছোট উপন্যাস বাঙ্গালায় লিখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল।' উপন্যাসটি মোটের উপর কেউ কেউ ভালো বললেও লেখকের ভাষায় 'ঐরূপ বই লিখিয়া কিংবা পড়িয়া, কেহ কি এখনকার দিনে সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে?' শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বলিলেন বইখানি তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর ভাল লাগিয়াছে, তবে তাঁর কাকা পড়িয়া কিছু বলেন নাই।' এই কাকাটি রবীন্দ্রনাথ। যাই হোক মিঃ বি. কে. দাস-এর মতো একেবারেই স্বতন্ত্র্যও অভিনব। 'এখনকার পাঠক খচ্চর ও তালেবর হয়ে উঠেছে। এদের জন্যে নো রাইটার শুড ওয়েস্ট হিজ টাইম। কেহবা বলে পাঠকের সময় কম। মাই ফুট! আমি বলি লেখকের সময় কম।' তত্ত্ব হিসেবে এটি কতটা ভারালো সে না হয় বিজ্ঞজনেরা বুঝবেন। আমরা জানলাম যে লিটেরারি এসটাব্লিশমেন্ট লেখককে কী করতে পারে। আজ যদি কোনো লেখক আনন্দবাজারকে খচায় তার কী দশা হবে ভেবে আতঙ্কিত হওয়া যাক।

আজকাল বাঙালি জীবনে বিশিষ্ট বাঙালিদের জীবনী পড়ার রেওয়াজ প্রায় নেই। যদি কোথাও থেকে থাকে তাহলে সেই গুণবান পাঠক যেন ঔপন্যাসিক মিঃ বি.কে. দাস-কে বৈমানিক বিনয়কুমার দাস (১৮৯১-১৯৩৫)-এর সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলেন। বৈমানিক মিঃ বি.কে. দাস-এর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল 'ব্যাঁটরা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস' নামক কারখানা প্রতিষ্ঠা। ১৯৩৫ সালের ২৮ এপ্রিল বেলা ১০টা। ভাবলেই গায় কাঁটা গজায়। দমদমা খপোত ঘাঁটির নিকটস্থ গৌরীপুর গ্রামের আকাশ। বিনাশক শক্তির এমনই গোঁ যে বি. কে. দাস-এর বিমান ও ডি.কে. রায়ের বিমানে ধাক্কা লেগে গেল। তখন এখনকার মতো উন্মত্ত বিমান আনাগোনা হত না। আকাশও সস্তা ছিল। পাওয়াও যেত প্রচুর। বাঙালি অবশ্য অচিরেই সেই শোক কাটিয়ে ওঠে। তার জিনগত অভ্যাসই হল আলুথালু হয়ে হাঁউমাঁউ করা পরক্ষণেই পাল্টি খেয়ে দাঁত ক্যালানো। এই প্যাটার্ন অ-বাঙালি অর্থাৎ নাগা, রুশ, জার্মান বা হাবসি ইত্যাদির মধ্যে দেখা যায় না।

এখান থেকে লেনিনীয় নির্দেশে এক পা আগে-র পরে যদি দুই পা পিছোনো যায় তাহলে সেই আনন্দবাজার প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে। আমাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এমনই হওয়া বরং শ্রেয় যে আনন্দবাজার পত্রিকা ও ম্যাজিসিয়ান মিঃ আনন্দ আলাদা, দুইয়েরই কক্ষপথ ভিন্ন, ডি. এন. এ ইত্যাদি দুরূহ ছকে গঙ্গা গঙ্গা ফাঁক অতএব একটিকে খপ করে ধরে ক্লোন করলে অন্যটি হবে না। যাদুকর আনন্দ 'বেঁটে মানুষ' চেয়েছেন 'বেঁটে লেখক' চাইলে বরং সন্দেহের অবকাশ থাকত। তবে একথা না বলা বোধহয় অন্যায় হবে যে আনন্দবাজার না থাকলে মুষ্টিমেয় যে কয়জন বাঙালি লেখক মালদার হয়ে উঠেছেন তাঁদেরও এতটা ফুলে ফেঁপে ওঠা সাধ্যে কুলোতো না। হাতে হ্যারিকেন হয়ে যেত। বাঙালিদের মধ্যে কিন্তু হ্যারিকেন হাতে লেখকের ঘাটতি নেই। সাধারণ রঙ্গালয়ের গোড়ার দিকে যে মাদী ও মদ্দারা থিয়েটারে ভিড়ত তাদের সম্বন্ধে রসরাজ অমৃতলাল বসু যা লিখেছিলেন তা হ্যারিকেন হাতে লেখকদের ক্ষেত্রেও খেটে যাচ্ছে,

নিজ পরিবার মাঝে বিরক্তিকাবণ।
কুটুম্ব সমাজে লজ্জা নিন্দার ভাজন॥
দেশের দশের পাশে শ্লেষ ব্যঙ্গ হাঁসি।
সরে গেছে বাল্যসখা তাচ্ছিল্য প্রকাশি॥

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ট্র্যাজিক ফিগার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩১৯ সালের ২১ আশ্বিন আমেরিকার ইলিয়ন থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে বলেছিলেন,

'বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কটের কথা শুনিয়া দেশে ফিরিবার জন্য আমার মন টলিয়াছিল। কিন্তু আমার এখানকার বন্ধুরা বারম্বার আমাকে আশ্বাস দিতেছেন যে আমার বই ছাপার ভালরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিদ্যালয়ের আয় সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে। সেইজন্য আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু বই বিক্রি করিয়া কিছু পাইব এ কথা বিশ্বাস করিবার ভরসা আমার চলিয়া গিয়াছে।'

আজ কলকাতায় যখন বইমেলা হয় তখন আনন্দ পাবলিশার্স-এর সামনে বাঙালি যেভাবে দীর্ঘ লাইন লাগায় তা দেখলে মনে হয় আহা! এমন একটি নয়নাভিরাম দৃশ্য যদি রবীন্দ্রনাথ দেখতেন তাহলে তাঁর কী সাতিশয় আনন্দই না হত!

আমাদের জানা আছে যে রবীন্দ্রনাথকে ট্র্যাজিক ফিগার বলার জন্য অনেকেই কুপিত হবেন এবং নুলো হলেও আস্তিন গুটোবেন। তাঁদের আমরা আগে ভাগেই জানিয়ে রাখি যে এরপর যে রামধোলাই তাঁরা খেতে চলেছেন তা কিন্তু ঝাপটের ঢাল দিয়ে ঠেকানো সম্ভব নয়।

নলেন! ন-লে-ন! এই গুয়োর ব্যাটা নলেনের বাচ্চা! কানে কি হোগলা গজিয়েচে? ভদি ছাদ থেকে চেঁচাচ্ছে। কাকের দল ছাদের এককোণে কাকবলির খৈ খাচ্ছে। ভাঙা টবে মরা তুলসীগাছ। তার গোড়ায় পচাফুল। ন্যাড়া ছাদে শ্যাওলা। খোবলা ইঁটের ফাঁকে গোল গোল গেঁড়ি। বটের চারা বেরিয়েছে। ছাদে রোজকার মতোই তেলচিটে, ধার ছেঁড়া মাদুর পাতা। তার ওপরে রাখা তুলো ভরা বার্লির পুরনো জং ধরা টিনের কৌটো, মান্ধাতার আমলের একটি ম্যাগনিফাইং লেন্স, লাল নীল কাচের টুকরো, ইঁট চাপা দেওয়া একটি সেইদিনের আনন্দবাজার পত্রিকা যার ফর ফর করে ওড়ার চেষ্টা নিরন্তর। ভদি ন্যাড়া ছাদের ধারে গিয়ে তলায় উঠোনের দিকে তাকায়। নলেন পেতলের সাজিতে টগর ফুল তুলে তুলে রাখছে।

—গাঁক গাঁক করে চিল্লোচ্চি, শালা, কানে ঢুকচে না?

—আঁজ্ঞে, শুনতে পাইনি। যাব?

—হ্যাঁ, যাবে! ক্যাওড়াতলায় যকন মুখে নুড়ো জ্বালব তোর তকন যাবি। বেচামণি কী করচে?

—গিন্নিমা তো পাইখানায়।

—বেরুলে বলবি ঝটপট চান-ফান সেরে চাবির গোছটা বের করতে। ক-ঘর ভরল?

—আঁজ্ঞে, দুটো। তিন আর এক।

—আরও আসবে। তুই ব্যাটাও ধোয়া-পাখলা করে চান সেরে ফেলবি। গঙ্গাজল আনতে হবে।

—কেন? এত সকালে।

—যা বলচি তাই কর। আজ শালা চাকতির ঘর খোলা হবে। মা! মা গো! মা!

২৪ অক্টোবর, রবিবার, সকালে এমনটিই হয়েছিল। ভদি যাদুকর আনন্দর বিজ্ঞাপনটি পড়ে এবং গূঢ় নির্দেশ পায় যে চাকতির ঘর খুলতে হবে। হ্যারিকেনের ভূতুড়ে আলোর দপদপানিতে এ পর্যন্তই এখন দেখা থাকল।

শীত পড়তে অল্প বিস্তর দেরি। কিন্তু শীতের কবিতা লেখা শুরু হয়ে গেছে। একটি স্যাম্পেল দেখা যেতে পারে।

ওই দ্যাখো ঢুলু ঢুলু গ্রাম,
মাঝে মাঝে হাঁটে জলপিঁপিঁ,
ক্যাতামুড়ি চাষা, চাষা-বউ
নাক ডেকে যায় ফুলকপি।

· অনবদ্য এ কবিতাটি কার? ভদিই বা কে? চাকতির ঘরে কী আছে? হঠাৎ এই কবিতাটিই বা শান্টিং করা হল কেন?

হুজ্জত-এ-বাঙ্গালা, হিক্‌মৎ-এ-চীন!

(চলবে)

২

প্রথম পর্বের মিলেনিয়াম অন্তে চারটি প্রশ্ন উঠেছিল। নেমে গেছে। অথবা সাফ সাফ জানিয়ে দেওয়াই হল মুরুব্বির কাজ—ওসব জবাব-ফবাব এখন হবে না। এখানে কেউ ইস্কুলের পরীক্ষা দিচ্ছে না যেখানে পরীক্ষার খাতার ওপরে টুকলিবাজদের জন্যে লেখাই থাকত, 'মনে রাখিবে যে নিজে চেষ্টা করে ঈশ্বর তাহার সহায় হন'। তবে পাঠান ও মোগল সম্বন্ধে যাদের অনুসন্ধিৎসা প্রবল তাদের শ্রী বিমলাচরণ দেব সেই কবেই জানিয়ে রেখেছেন, 'হুজ্জত-এ-বাঙ্গালা, হিকমৎ-এ-চীন' এর অর্থ... 'যদি হাঙ্গাম হুজ্জুতের কথা বল, তাহা হইলে বাংলাকে হারানো শক্ত, যদি শিল্পীর শিল্পচাতুর্যের কথা বল, তাহা হইলে চীনে কারিগরকে হারানো শক্ত'। আজ যে রাজ্য বনাম কেন্দ্রের লড়াই আমরা স্বচক্ষে দেখি তা সি.পি.এম শুরু করেছে বলে অনেকেই মান্য করে। বাংলার রাজারা বরাবরই ডাকাবুকো টাইপের ছিল। মোগল-পাঠানদের হুকুমদারি মানত না। 'একটা হাঙ্গাম ভালো করিয়া থামিতে না থামিতে আবার একটা হাঙ্গাম আরম্ভ হইত,' বাংলার এ এক মহান ঐতিহ্য। ১৯৯৯-এর শেষ দিকটায় সেই একই কেলো। ম্যালিগন্যান্ট

ম্যালেরিয়া ও চলচ্চিত্র উৎসবের রণবাদ্য শেষ হতে না হতে বাস চাপা ও বাস জ্বালানোর দামামা বেজে উঠল। ফাঁকফোঁকরে কিছু কিডন্যাপ, কবিতা উৎসব, মার্ডার আর তহবিল তছরুপের টুকটাক প্রোগ্রাম। এইসব থিতোতে না থিতোতে বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলনের বিউগল ও ব্যাগপাইপ। বাজারে কানাঘুষো নতুন ইংরেজি বছর অবিরাম কেক-ভক্ষণ প্রতিযোগিতা দিয়ে শুরু হলেও আচমকা নাকি অন্যদিকে মোড় নেবে। তাই বুঝি কেমন একটা গা-ছমছমে, কী হয়, কী হয় ভাব। এই স্টেজে খোঁচাখুঁচি না করাই বুদ্ধির কাজ।

বড়িলাল বরাবরই ছোট সাইজের কিন্তু তাকে ঠিক বেঁটে মানুষ বলা যাবে না। হালদারপাড়ায় তার ছোট একটা দোকান আছে যেখানে রঙিন চক, নানা রঙের মার্বেল কাগজ, রাংতা, উপহারের প্যাকেট বাঁধার জরিদার ফিতে, পেন্সিল, নানা আকৃতির গন্ধওয়ালা ইরেজার, স্কেল, খুবই হালকা ও নানা রঙের প্লাস্টিকের বল, প্লাস্টিকের শাটল কক, কাগজের বাক্সে জালি বার্বি পুতুল, খোঁচা-ওঠা টিনের এরোপ্লেন, সেলফোন-সদৃশ পেন্সিল বাক্স, ক্রিকেট প্লেয়ারদের স্টিকার, মিনি ক্রিকেট ব্যাট, লুডো, প্লাস্টিকের ডাইনোসর সেট 'জুরাসিক পার্ক', সাব-মেশিনগান, পিস্তল, পিচকিরি, একই বাক্সে রান্নাবাড়ি সেট, ঐ ডাক্তারি, টিকটিকি, তেঁতুল বিছে— এইসব ও আরও কত কী পাওয়া যায়। পুরো ঝাড় না হলেও দোকান খুব ভালো চলে না। বড়িলাল যা হয় তাতেই খুশি থাকে। 'বর্তমান' কেনে ও আদ্যোপান্ত পড়ে। বড়িলাল জানে যে লজেন্স, বাদাম-বিস্কুট, টফি, চকোলেট রাখলে বিক্রি বাড়বে। এ-বুদ্ধিটা অনেকেই তাকে দিয়েছে।

—রক্ষে করো বাবা! তারপর যত্তোন পিমড়ে-আঁশোলায় ছেঁকে ধরবে তকোন! এমনিতে তো গ্যাদাখানেক টিকটিকি— চাদ্দিকে হেগে ছয়লাপ করচে।

—তা সবাই যা করে তেমন মুখ বন্ধ বয়ামে রাখবে। মালকে মালও থাকল পোকামাকড়ও ঢুকল না।

—ও তুমি চেনো না। ঠিক ফিকির করবে। শালারা খুব হারামি। আমার খুব ভালো আইডিয়া আচে।

—তোমার যত ফালতু ভয়! লোকে যেন করচে না।

—করবে না কেন? করচে। তেমন মরচে। ডাঁস, আঁশোলা, তারপর তোমার গিয়ে মাকড়সা, উইপোকা। এদের চেনো না। কেউ আড়ালে-আবডালে বই, কাপড় সব খাচ্ছে, টুঁ শব্দটা হচ্ছে না। কেউ-বা আবার চেটে দিল তো হয় ঘা নয় চুল উঠবে না।

মোটের ওপর বড়িলাল যে থিওরিতে দোকান চালায় তাকে স্মল ইজ বিউটিফুল হয়তো বা বলাই যায়। বড়িলাল বিয়ে করেনি। চেতলায় বাপের ভাগের এক ঘরে থাকে। হোটেলে খায়। কোনো ঝক্কি নেই। তবে ঘরে বজরংবলি হনুমানের ফটো আছে। সেখানে নকুলদানা, জল দেয়। ছোটবেলায় থানায় কনস্টেবলদের কুস্তি দেখে ঠিক করেছিল, কুস্তিগীর হবে। তারকদার আখড়াতেও গিয়েছিল কয়েকদিন। আখড়ার দেওয়ালে গোবর গুহ, বড় গামা, ছোট গামা, জিবিস্কো ও স্যান্ডোর ছবি ছিল। দড়িতে সার দিয়ে মরা বাদুড়ের মতো ল্যাঙট ঝুলছে। হুপ্-হাপ্ শব্দ। তারকদার রোগা প্যাঁটকা এক চেলার মিডিয়াম একটা রদ্দা খেয়ে বড়িলালের ঘাড় বেঁকে গিয়েছিল। কুস্তিগীর না হয়ে শেষে দোকানদার। তবে হনুমানজীকে ছাড়েনি। তার অন্য কারণও আছে। হনুমানজী বাদে অন্য কোনো ঠাকুরের ভূত তাড়াবার ক্ষমতা নেই। বরং ভূতেরা এমনই খচ্চর যে যার যে ঠাকুর হয়তো সেই চেহারা নিয়েই হাজির হল। তুমি তো আহ্লাদের কাঁকুইদানা হয়ে ভাবছ যে, এমন ডাকা ডেকেছি যে ইষ্টদেবতা বাধ্য হয়েছেন দর্শন

দিতে। ভূতেরা এইসব রগড় করে। উল্টো পড়িয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে পালায়। তাছাড়া কিছু ঢ্যামনা লোকও আছে যারা ভূত পোষে। যার ওপর রাগ তাকে ভূত দিয়ে সাইজ করায়। অবশ্য এসবই বড়িলালের শোনা কথা। শোনা কথা যে সহসা সত্যি হয়ে যেতে পারে সেটা বড়িলাল জানত না। আমরাও। অজানাকে জেনে জেনেই আমাদের এগোতে হবে। পাঠক্ষেত্রটিও আখড়াবিশেষ। সেখানে নিয়তই পাছড়াপাছড়ি চলেছে। গাপ হয়ে রয়েছে বলে সবসময় বোধগম্য হয় না। যাই হোক, পোকামাকড় ও ভূত সম্বন্ধে সদাসতর্ক বড়িলালের মধ্যে কিন্তু কোনো মজ্জাগত গর্ভচেটবৃত্তি ছিল না। এই প্রথমে নির্বাক ও পরে সবাক শতকের হাফটাইমের বেশ কিছু আগে জন্মালেও বড়িলাল চাকর, খানসামা বা খিদ্‌মদগারের মনোভাব নিয়ে কোথা মনিব, কোথা মনিব বলে কেঁদে বেড়াত না। বরং হয়তো বড় পালোয়ান হয়ে একমণি লোহার মাদুলি পরে গঙ্গাতীরে প্রাতঃভ্রমণ করত বা পাড়ার গবা-ঘণ্টে-পল্টনদের একজোট করে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করত। জন্মের টাইমের হেরফেরে নানা হেরাফেরি হয়। এই কথা যে কত অকাট্য সত্য তা পরে জানা যাবে।

২৪ অক্টোবর, রবিবার, ১৯৯৯ সকালে বড়িলাল দেখল তার সামনে তিনটি সম্ভবনা। সে সিনেমা দেখতে যেতে পারে। বেলঘরিয়াতে তার একমাত্র বোন করবী-র শ্বশুরবাড়িতে যেতে পারে। অথবা কিছুটা আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য কেওড়াতলায় গিয়ে মানবাকৃতির জারিজুরি ফাঁক স্টাডি করতে পারে। কোনো গোপন কারণে বড়িলাল দেখল, কেওড়াতলাই তাকে টানছে। বড়িলাল সেই টানে বডি ছেড়ে দিল।

কেওড়াতলা শ্মশানে কোনো গাইডেড ট্যুরের ব্যবস্থা নেই। ‘এবারে পুজোয় কেওড়াতলায় চলুন’ বা ‘চলুন, সবান্ধবে কেওড়াতলা ঘুরে আসি’ বলে কোনো ট্র্যাভেল এজেন্সি বিজ্ঞাপনও দেয় বলে জানা নেই। কিন্তু বড়িলাল দেখেছে যে, অদৃশ্য কোনো গাইড জীবন্ত দর্শকদের প্রথমেই অবধারিত ভাবে শ্মশানের সেই অংশে নিয়ে যায় যেখানে বিদ্যুৎচুল্লি বডির সাইজ ও ওজন অনুযায়ী হাঁ ও কপাৎ, হাঁ ও কপাৎ করে চলেছে। অবশ্য বিগড়ে না গেলে। এবং কখনোই সব চুল্লি একসঙ্গে চালু এরকম অলৌকিক দৃশ্য কেউ দেখেনি। অন্যদিকে মড়ার কোনো কমতি নেই। এক একসময় এমন লাইন পড়ে যায় যে, কেওড়াতলায় হাউসফুল দেখে মড়ারা শিরিটি বা গড়িয়ায় বোড়ালে গিয়ে অবয়বমুক্ত হয়। দর্শকরা বিদ্যুৎচুল্লি দেখেই শ্মশান দেখার তৃপ্তি ও মানব-জীবনের অকিঞ্চিৎকর তাৎপর্য সম্বন্ধে অবহিত হয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে খাবারদাবারের দোকানের দিকে এগিয়ে যায়। অথচ আগে লোকে মরলে কাঠেই পুড়ত। বিদ্যুৎচুল্লি তো সেদিনের ব্যাপার। এখন অবশ্য মাইক্রোওয়েভ ওভেন নামে ঐ চুল্লিরই একটি মিনি সংস্করণ সম্পন্ন গৃহে গৃহে জায়গা করে নিয়েছে। অবশ্য এই চুল্লি ছাইভস্ম তৈরি করে না ; রোস্ট, তন্দুর, গ্রিল, বেক ইত্যাদি করে। এবং সচরাচর মানুষকে নয়। বড়িলাল কখনোই ঐ অদৃশ্য গাইডের ইঙ্গিতে সম্মোহিত হয়ে পড়ে না। সে চেতলা ব্রিজ দিয়ে নেমে রাস্তা পার হয় এবং উল্টোদিকের পানের দোকান থেকে বিড়ি কিনে দড়ি থেকে ধরায় ও ফের রাস্তা পেরিয়ে কাঠের চুল্লির অঙ্গনের দিকে অগ্রসর হয়।

আজ সে অঙ্গনে নজর করে দেখল, ভোররাতে কেউ কাঠে পুড়িয়েছে কারণ ব্যাপক ভস্মের মধ্যে কয়েকটি পোড়া কাঠ থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে সেই প্রসিদ্ধ ভারতীয় দড়ির খেলা দেখাচ্ছে এবং পাশেই এত পুরনো, কালো ও অংশত ভেজা একটি ফাটা তোষক পড়ে যে কেউ নিয়ে ঝামেলা বাড়ায়নি। সাইড দিয়ে অঙ্গনটি অতিক্রম করে বড়িলাল শ্মশানপ্রান্তের গেট দিয়ে ঢুকে ঘাটের আগেই বাঁদিকে ঢুকল। ইতস্তত জল জমে আছে। গুমোট গন্ধ। দুটি কুকুর আপসে

কামড়াকামড়ি করছে। ডানদিকে তাকাতেই,

স্মরণীয়

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

জন্ম	মৃত্যু
১৭ই আষাঢ়	১০ই জ্যৈষ্ঠ
১২৭১ সন	১৩৩১ সন।

হায়, রয়াল বেঙ্গল টাইগার। হায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। হায়, কলকাতা কর্পোরেশন। কী হাল সমাধিমন্দিরের। নোংরা, রংচটা, ফাটল-ধরা, পক্ষীপুরিষে চিত্রিত। ওপরে একটি ধেড়ে বটগাছ। তারই একটি ছানা তলায় গজিয়েছে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে বট কোম্পানির অমোঘ বিধ্বংসী শেকড় গুঁড়ি মেরে মেরে এগোচ্ছে। হায়, বাংলার বাঘ যিনি সন্দেশের মাংস খেতে বড়ই ভালোবাসতেন। হালুম!

অবশ্য আশুতোষকে আর বাংলার বাঘ বলা ঠিক নয়। কারণ নিত্যযাত্রীরা অবশ্যই অবহিত যে, ল্যান্সডাউন-পদ্মপুকুর সংযোগস্থলে দুটি বাম্বুতে লাগানো বোর্ডে দীর্ঘ, দীর্ঘ দিন লেখা ছিল,

বাংলার বাঘ

সোমেন মিত্র

জিন্দাবাদ।

এখন লিখন অন্যরূপ।

সোনার বাংলার

সোনার ছেলে

সোমেন মিত্র জিন্দাবাদ।

এরই নাম ম্যাজিক। এই ছিল বাঘ। সাট্ করে সোনার ছেলে হয়ে গেল। আজ যিনি শার্দুল কাল তিনিই গৌরাঙ্গ। বোঝাই যায় যে, কংগ্রেসিদের মাথার জায়গায় যে লক্ষ্মীর ভাঁড় ছিল সেখানে মা ভবানী গেঁড়ে বসেছেন।

মরুক গে যাক্। স্যার আশুতোষের উল্টোদিকে মুখোমুখি রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এনার কেসও গোলমেলে। পাতাখোর ভ্যান্ডালরা বেদি ফাটিয়ে শেকল ঝেড়ে দিয়েছে। খুব যদি ভুল না হয় তা হলে এঁর সম্বন্ধেই শ্রী সুবলচন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন, 'শ্বেতাঙ্গ বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইঁহার ন্যায় মর্যাদা ও প্রতিপত্তি কোনো বাঙালিরই নাই।' শ্বেতাঙ্গ তো দূরের কথা, লর্ড লেডিদের বাদ দেওয়াই ভালো, কৃষ্ণাঙ্গ নেটিভ লুম্পেনরা অবধি এখন তাঁকে পাত্তা দেয় না। এঁর মাথায় একটি ঘোড়ানিম।

বড়িলালের আরো বাঁদিকে ঘোরার পরিকল্পনা বাতিল করতে হল কারণ বমি, শ্যাওলা, গু ইত্যাদির সংগ্রহ পেরোতে হবে। উপচে ঐ সমাহারের দিক থেকেই একটা বাতাসের ঝলক আসাতে বড়িলাল ওখান থেকে কেটে পড়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করল। বড়িলাল জানে, এখন কী করতে হবে। ডানদিকে গেট তালাবন্ধ। তারা মার মন্দিরে চাবি থাকত। ডুপ্লিকেট শ্মশানের অফিসে। কিন্তু ক্যাওড়াদের ভয়ে এখানে আর চাবিই রাখা হয় না। অতএব ঘাটের পাশ দিয়ে ওপরে উঠে বড়িলালকে ব্যাঁকাত্যাড়া রেলিং টপকাতে হবে। পথের দাবি মেটানো বড়ই দুরূহ।

ঘাটের দুধারে বসার রোয়াক। বাঁ-দিকটাতে তিনজন বসেছিল। একজন ঢ্যাঙা, একজন বেঁটে-মোটা আর তিনননম্বরকে দেখলেই বোঝা যায় পাগলাখ্যাঁচা। উল্টোদিকে লুঙ্গি আর হলদে স্যান্ডো গেঞ্জি পরা একটা তাগড়াই মাল চোখ বন্ধ করে বিড়ি টানছিল। বোঝাই যায় যে, লোকটা

এলিতেলি নয়। 'আমাকে ঘাঁটিও না, আমিও ঘাঁটাব না' ধাঁচের। বড়িলাল ডানদিক ওপরে উঠে গেল। গঙ্গায় জল বাড়ছে। এবারে টপকাতে হবে। কুঁচকিতে খিঁচ না লেগে গেলেই হল।

এই ফাঁকে বলে নেওয়া যাক যে, বাঁ-দিকের তিনজন হল ফ্যাতাড়ু যারা গোপন একটি মন্ত্রের বলে উড়তে পারে এবং নানা ধরনের অনুষ্ঠান বা সুখের সংসারে ব্যাগড়া দিয়ে থাকে। ফ্যাতাড়ু আরও অনেক আছে। কিন্তু আপাতত এই তিনজনকে চিনলেই কাফি। ঢ্যাঙা মালটা হল মদন। ওর ফলস্ দাঁত পকেটে থাকে। বেঁটে-কালো-মোটাটা হল ডি. এস। ঐ নামে একটি হুইস্কি আছে— ডিরেক্টরস্ স্পেশাল। ওর তোবড়ানো-মচকানো ব্রিফকেসের দু-পাশে নাম ও পদবীর আদ্যক্ষর সাঁটা আছে যদিও পড়া কঠিন। তিন নম্বর স্যাম্পেলটা হল কবি পুরন্দর ভাট। এরা মোটের ওপরে আমোদগেঁড়ে। পুরন্দর বলে উঠল,

কত না ফুলের তোড়া
কত ফটো তোলাতুলি
ভাঙিলে লাগে না জোড়া
কত বৃথা কোলাকুলি।

জয় গঙ্গা, জয় রাম
কবি পুরন্দর ভাখে
মড়া আসে অবিরাম।
টুটিছে কত না জোড়া
ফুটিছে কত না শাঁখা
বড়বাবু ও বেয়ারা
দেখি পাশাপাশি রাখা।

মড়া আসে অবিরাম
কবি পুরন্দর বলে
জয় গঙ্গা, জয় রাম।

এই এলিজি গোছের কবিতাটি শুনে ডি. এস ঘাবড়ে গিয়ে খিঁচিয়ে উঠল,

—একটু ঝিমুনি ধরব-ধরব করছিল! কিছুর মধ্যে কিছু নেই— মড়ার কেত্তন শুরু করল।

—তা শ্মশানে মড়ার কেত্তন হবে না তো কি বিয়ের পদ্য লেখা হবে? যেমন তুমি তেমন তোমার আক্কেল।

মদনের ঝাড় খেয়ে ডি. এস একটু চুপসে গেল।

—না, সে কারণে বলিনি।

—তো কী কারণে বলেছ?

—পুরন্দরের কবিতায় একটা বি. জে. পি লাইন চলে আসছে, তাই বললাম।

এতক্ষণ পুরন্দর কিছু বলেনি। সে 'যাঃ বাঁড়া', বলে স্বগতোক্তি করে একটা বিড়ি ধরাল। বিড়ির প্যাকেটের খচর-মচর শুনে ডি. এস বলল,

—বেঙ্গল বিড়ি! দেখি একটা ছাড়ো তো!

উল্টোদিকে হলদে স্যান্ডো গেঞ্জি একধারে হেলে প্রবল নাদে এক বাতকর্ম করে উঠে চলে গেল।

—বুড়ীমা-র চক্‌লেট বোম!

মদন ফের খ্যাঁক্ করে উঠল,

—সবকিছু নিয়ে কিছু বলতেই হবে।

পুরন্দর এই তালে ঝাল মিটিয়ে নিল,

—মদনদা, ডি. এস-এর কিন্তু কোনো দোষ নেই। ওরকম হবেই।

—মানে?

—হাফছুটির বারবেলায় পয়দা হলে ওরকম হয়।

বড়িলাল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমাধি-মন্দিরের সামনে দাঁড়াল। বাঙালি জাত ও বাংলা সাহিত্যের দশা এমনই। ধুলোমাখা শরৎচন্দ্রের মাথাটি সামনে গ্রিল না থাকলে গলা কেটে উঠিয়ে নিয়ে যেত। কারো কারো যেমন নিয়ে গেছে। অবজ্ঞা, অপমান ও উপেক্ষার অন্ত নেই। ডানদিকে চোখ রেখে সবই দেখছেন। গলায় একটি শুকনো গাঁদাফুলের মালা। সেই মালা থেকে মাকড়সার জাল ছড়িয়েছে। ভেতরটা ঝুল নোংরায় ভর্তি। সৌধের সামনের দিকটা ভাঙাচোরা। ভেতরটি একটি সংগ্রহশালা বিশেষ। ভাঙা বাঁখারির টুকরো, মরা পায়রার সাদা পালক, শুকনো পাঁচটা মালা, পাতা কাগজ, পানপরাগের প্যাকেট এবং হাজার হাজার কালো পিঁপড়ের আনাগোনা। এদিকটায় বন্ধ থাকলেও অনেকগুলো কুকুর। এদের সকলেরই নাম 'ভেলু' দেওয়া হল।

শরৎচন্দ্রের পাশেই শ্রীশ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব-এর শ্মশানসৌধ। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের গুরুদেবের ভাগ্য অপেক্ষাকৃত ভালো। গন্ধবাবার ভক্তজন আছেন কারণ গ্রিলটি রুপোলি রং করা। তারপর আবার সেই উপেক্ষিতের স্মৃতি। পরপর। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পরেরটি কার, বোঝার উপায় নেই। চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দেশপ্রেমিক কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়। অজিতেশ্বর ভট্টাচার্য। সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক। সুরবালা ঘোষ। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সোনালি জরি, গাঁজার কলকে, মিষ্টির বাক্স, ডাবের খোলা, প্লাস্টিকের জলের বোতল ও গ্লাস ও অসংখ্য নোংরা পলিব্যাগ। এবং সর্বত্রই সেই বিচিত্র গন্ধ।

বড়িলাল ঘাটে এসে দেখল, ভুঁড়ো একটা লোক নানা সাইজের বিলিতি মালের বোতলে গঙ্গাজল ডুগবুগ-ডুগবুগ করে ভরে একটা বিগশপার ব্যাগে ভরছে ও বাঁ-দিকের রোয়াক থেকে বেঁটে-মোটাটা দেদারে আওয়াজ দিচ্ছে।

—ওই, ঐ পলকাটা বোতলটা হল স্কচ-হুইস্কির। এক বোতল কিনতে গেলে গাঁড় ফেটে যাবে। শালা, কত আর দেখব। মালের গন্ধ যায়নি, ওর মধ্যেই গঙ্গাজল ভরছে। এই, এইটা হল হারকিউলিস রামের। ডিফেন্সের ঝাড়া মাল।

মদন কিন্তু এবারে আপত্তি করেনি। বরং মুচকি-মুচকি হাসছিল।

—ওরে, তোর মনিবটা তো জব্বর মাল। কোনো পাঁইট, নিপ এসবের কারবার নেই। সব বোতল। এত জল দিয়ে কী করবি? হেভি চোদনা টাইপের লোক তো! এত বলছি, কিন্তু রা কাড়ার নাম নেই। ভালো-মন্দ কিছু একটা বল। না হয় দুটো খিস্তিই কর। তিনজনে আছি বলে ভাবছিস, ক্যালাব? শালা, বোধহয় জন্মবোবা। নয়তো হাড়হারামি।

ভুঁড়োর শেষ বোতলটি ভরা হয়ে গেল। বোতলটা বিগ শপারে ভরে সে উঠে দাঁড়াল। অতগুলো জল-ভরা বোতল কিন্তু কোনো ক্যাঁ-কোঁ নেই। যেন তাকিয়া বগলে আসরে চলেছে। লোকটা ব্যাগ হাতে ঘাট থেকে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই অদ্ভুত কাণ্ডটা হল। ঠিক দড়ি-বাঁধা কুকুর যেমন হ্যাঁচকা মেরে মনিবমুখো হয় তেমনই তিনজন ঝাঁকুনি খেয়ে রোয়াক থেকে নিচে নামল। তারপর লোকটার পেছনে সুড়সুড় করে রওনা দিল। মুখে কোনো শব্দ নেই। উল্টোদিকে

একটা মেয়ে এসে পড়েছিল বলে ভুঁড়ো ডানদিকে হেলল। ঐ তিনটেও ডাঁয়া ভাঁজ মারল। বড়িলাল ওদের ফলো করতে শুরু করল। মড়া নিয়ে একটা কাচের গাড়ি এল। পেছনে দুটো টেম্পো-ভরা লোক। নলেন নমস্কার করল। ওরাও নমস্কার করল। নলেন বাঁদিকের দাবনা চুলকোতে চুলকোতে রাস্তা পেরোল। মদন, ডি. এস ও পুরন্দর ভাটও নিজের নিজের বাঁদিকের দাবনা চুলকোতে চুলকোতে রাস্তা পার হল। তারপর এ-গলি, সে-গলি পেরিয়ে একটা বড় উঠোনের মতো জায়গা ফেলে, নর্দমা টপকে, হরিণঘাটার দুধ দেওয়ার ভাঙা খাঁচা বাঁ-দিকে রেখে ফের একটা গলিতে ঢুকে যে বাড়িটার দিকে নলেন চলল সেটা যে ভদির একতলা ন্যাড়াছাদ-ওলা বাড়ি তা আমরা জানি। বাড়ির ওপরে একটি লজঝড়ে অস্পষ্ট সাইনবোর্ড কেৎরে ঝুলছে। একটু ঘাড় কেলিয়ে পড়তে হয়। বড়িলাল দেখল, লেখা আছে এবড়ো-খেবড়ো অক্ষরে, 'বিবিধ অশুভ অনুষ্ঠানে ঘর ভাড়া দেওয়া হয়'।

'ওই বুঝি করে হাঁ নাহি যার নাম'।

(চলবে)

৩

আজকাল কোনো শিশুই 'লাল-কালো' পড়ে না। অতএব কে অন্ধকারে হাঁ করতে পারে, এই ভয় কেন বিকট-দর্শন ডেঁও জল্লাদকে ঘর্মাক্ত করে তোলে প্রভৃতি প্রশ্নাবলী ওঠে না। গিরীন্দ্রশেখর স্বপ্নের জগৎ থেকে সুষুপ্তির জগতে নির্বাসিত। যেমন নির্বাসিত দক্ষিণারঞ্জন, ধনগোপাল, হেমেন্দ্রকুমার, সুনির্মল, খগেন্দ্রনাথ, সুখলতা ও খ্যাত-অখ্যাত শত শত সাহিত্যিক যাঁরা শিশুদের জন্য লিখতেন। এখন সাহিত্যিক-শিশুদের যুগ। ছোটরা কেবলই ফেলুদা বা টিনটিন পড়ে। বাপ-মাগুলোও অগা। ছোটবেলা থেকে হাই প্রোটিন, ব্রেনোলিয়া, সুলভ ব্রয়লার, কেলগ ইত্যাদি গিলে অকালেই কেঁদো কেঁদো হয়ে ওঠে। তারপরই দেখা যায় হয় কমপিউটার শিখছে বা লুচ্চামি। বিগ বং-এর বাচ্চারা হাঁদা-ভোঁদা, নন্টে-ফন্টে, বাঁটুল দি গ্রেট এমনকি চেঙা-বেঙা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত। ছোটবেলা থেকেই এত স্বার্থপর ও খচ্চর অন্য কোনো দেশের শিশুরা হয় না। যেমন পাশেই বিহার দেশের কথা ধরা যায়। অথবা নেপাল। সেখানে সরলমতি শিশুদের দেখা পাওয়া যায়। হামেশাই। আপাতত বড়িলাল।

ফলের বাক্সের কাঠের গায়ে বিস্কুট-টিন কেটে পেরেক মারা বেঁকাতেড়া দরজাটায় ফুটো ছিল বলে বড়িলাল দেখতে পাচ্ছিল ভেতরে অর্থাৎ ভদির উঠোনে কী হচ্ছে। ভদি ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বেরিয়ে এল।

—এই তিনটে বানচোৎকে আবার নিয়ে এলি কেন?

—খুব দেখি বোলচাল দিচ্ছে। ভাবলুম ধরে নিয়ে যাই। পরে সাইজ করা যাবেখনি।

—দাঁড়া, দাঁড়া। অত সোজা কেস নয়। ভাবচি, এই দিনে হঠাৎ ফাঁদে পা দিল কেন?

—জলছিটে দিয়ে দিন। মাথাগুলো কেটে ফেলি। বলিও হল, ধড়, মুণ্ডু সব সাধনার কাজেও লেগে গেল। কিছুই ফেলা গেল না।

—মন্দ বলিসনি। কী গো, মালে ঝালে একেবারে কন্দর্পকান্তি। খুঁড়ছিল কেঁচো...

—বেরিয়ে পড়ল ঘুরঘুরে। এবারে রা কাড়ছে না যে? ওফ্, সে খিস্তির একেবারে খই ফুটোচ্ছে।

প্রথম ডি. এস এবং তার দেখাদেখি পুরন্দর ও মদনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। বড়িলাল শুনতে পেল আশপাশে কেউ মন্তর পড়ছে। ন্যাকড়াপোড়া গন্ধ। নলেন এর মধ্যেই গিয়ে ল্যাগব্যাগে একটা টিনের খাঁড়া নিয়ে এসেছে যা দিয়ে কিছুই কাটা সম্ভব নয়। এটা দেখেও ওদের কান্না থামছে না। ভদি তিনজনের সামনে পায়চারি করছে আর থেকে থেকে চেঁচাচ্ছে,

—এসপার ওসপার হবে যখন হয়েই যাক। নিন্দে যখন শালা একবার রটেচে তখন বিয়েই করব। মুণ্ডু নেচেচে। মুণ্ডু নাচবে। উফ্, ইয়া বড় চাকতি মাপের মুণ্ডু গাঁথা মালা। এসপার ওসপার। মুণ্ডু নির্বিকার। ধড় শুধু ধড়ফড় করছে। হাত খিঁচোচ্ছে। পায় টান মারছে।

ফ্যাতাড়ুরা এবার সমস্বরে একেবারে রোলারুলি কান্না জুড়ে দিল। এতক্ষণ বড়িলাল ভাবছিল বাজারে মুরগির মুণ্ডুকাটা দেখলেই তার গলায় কেমন শিরশির করে আর তিন-তিনটে জলজ্যান্ত মানুষের মুণ্ডু... এরা কি কাপালিক-টাপালিক... নরবলির দু-একটা খবর তো এখনও কাগজে বেরোয়... নাকি এখনই গিয়ে থানায় খবর দেবে...

বেচামণি একেই বেজায় মোটা তায় পাটভাঙা লাল-সোনালি বেনারসি পরেছে বলে খোলতাই আরো বেড়েছে, স্যাম্পু করা চুল,

—ফের... ফের সেই অশৈল?

ভদির গর্জন।

—ব্যাটাছেলের ব্যাপারে নাক গলাবে না কতবার বলেছি!

নলেনের আবেদন।

—গিন্নি মা, খাঁড়া চুলকোচ্ছে, রক্ত ছেটাছেটি হবে, আপনি থাকবেন না...

বেচামণির মুখে সেই মহামায়া সুলভ হাসি

—পুজোগণ্ডার দিন। ফেতুড়ে অতিথি এয়েচে। তা সে ভয়ডর দেখিয়েচ ভালো করেচ। শান্ত হয়ে বসো তো বাছা তোমরা। কেউ মুণ্ডু কাটবে না। ওসব হল গদির বটকেরা। নলেন, ওদের জলবাতাসা দিয়ে বসা।

—তাহলে বলি দেব না বলচ?

—ফের সেই অলুক্ষুণে কতা। দেখচ ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপ ধরেচে।

—বারণ যখন করচ এত করে, তখন... যাঃ, এ যাত্রা ছেড়ে দিলুম। তবে যেখানে সেখানে অজানা অচেনা লোক দেখলে পোঁদে লাগা মোটেও ভালো কতা নয়। এই বলে দিলুম।

ডি. এস ফুঁপোতে ফুঁপোতে বলে,

—আঁজ্ঞে গদির বটকেরা কী? ওইটে বুঝলুম না।

বেচামণি ঘোমটা দেয়। ভদির প্রসন্ন ব্যাখ্যা।

—আমার নাম হল গে ভদি। তা বউ হয়ে তো সোয়ামির নাম মুখে নিতে পারে না। তাই বলে গদি। এবারে বুঝলে গদির বটকেরা।

পুরন্দর ও মদন বসে। ওদের দেখাদেখি ডি. এস-ও। তিনটে ভাঁড় আর এক বোতল বাংলা নিয়ে নলেন সামনে রাখে।

—গদির বটকেরা তো দেখলে, এবার একটু নলেনের গুড় চেখে দেখ।

—তখন উল্টোপাল্টা অনেক বলে ফেলেছি। কিছু মনে রেখ না ভাই।

—দ্যাখো ভায়া, তোমরা হলে ফ্যাতাড়ু। ফ্যাতাড়ুর কাজ ফ্যাতাড়ু করেছে... আর...

ভদি নলেনকে হাত নেড়ে থামায়।

—এবারে আমাকে বলতে দে। আজ এক মহাযোগের দিন বুঝলি। লাস্ট এই দিনটা এসেছিল

কমবেশি দেড়শো বছর আগে। চাকতির খেলা যখন শুরু হয় তখন চোক্তারের সঙ্গে ফ্যাতাড়ুরা এক পার্টি হয়ে যায়।

—আজ্ঞে, চোক্তার কী? মোক্তার, ডাক্তার হয় বলে জানি...

—আরে উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, পেশকার ওইসবের যেমন ফ্যাতাড়ু মেলে না তেমন চোক্তারও মেলে না। আমরা ঠিক বলিয়ে কইয়েদের দলে পড়ি না। তাই কেউ টেরও পায় না যে আমরা আছি। এই যেমন ধর তোরা—তোরা যে ফ্যাতাড়ু সেটা কটা লোক জানে? খবরের কাগজে নেই, খাসখবরে নেই, কোথাও নেই। সেইরকম চোক্তারদের বেলায়। কোথাও নেই। লোকে জানেই না। নে মাল ঢাল। ও নলেন ছিপি খুলেই দিয়েচে। চেতলার মাল। রসা ডিস্টিলারির বলে একটু গন্দ লাগবে। এদিকে আবার ফারিনি-র ছাপটা দেয় না। সব হল গওরমেন্টের হারামিপনা। তা বাবা মদন, মুখের কুলুপটা এবারে একটু খোল।

—আমি অবাক হয়ে ভাবচি আপনাকে কোথায় যেন দেখেচি দেখেচি।

—ওরে চোক্তারের ওপরে ফ্যাতাড়ুর জন্মের টান। এতে অবাক হওয়ার কী আচে। একি এক-দুদিনের সম্পক্ক। নাও, ভাটকবি, এক্ষুণি যে পদ্যটি ভাবলে বলে ফেল তো,

—বলব?

—বলবি না তো কি গিলে বসে থাকবি! বল্।

পুরন্দর গলা খাঁকারি দেয়।

—আমার এই কবিতাটির নাম 'যার যা কাজ'।

ডি. এস অমনি বলে ওঠে,

—ওরকম নাম কবিতায় চলে না। 'যার যা কাজ'। দেখলেই লোকে পাতা উল্টে চলে যাবে।

—কেন?

—এই কারণে যে নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এটা জ্ঞানের কবিতা। লোকে কবিতা পড়বে আনন্দ পেতে, ওসব জ্ঞানমারানি ঢপ লোকে শুনতে চায় না।

মদন বলে

—ডি. এস তুমি থামবে? না শুনেই আগে ঝগড়া!

—বাগড়া দিও না ভাই। আনন্দ তো অনেক পেয়েছ। এবারে ভাবার আগে শুনে নাও, আমার কবিতা হল, 'যার যা কাজ'

শশধর ধরেছে শশক
মহীতোষ মেরেছে মশক
উভয়েই স্ব স্ব কাজে পটু
পেট থেকে পড়া ইস্তক।
বনমালী করে বন খালি
ডালে বসে গোড়া কাটে কালি
ডাকে তারা যাহা থাকে ঝাড়ে
যমদূত দেয় করতালি।

ভদির মুখে হাসির ময়ান।

—বাঃ বাঃ বেড়ে হয়েচে। এই, এই হল কবিতা। রস আচে, অলঙ্কার আচে, গভীর অর্থ আচে, চনমনে ছন্দ আচে। এই না হলে পদ্য। আজকাল কী যে সব বালের ছাল লেখে। কোনো কাক-কাঁকুড় বালাই নেই। কেমন লাগল, ডি. এস!

pathagar.net

—ভাবতে হবে। জ্ঞানমারানি পদ্য তো, ঝপ্ করে কিছু বলব না। তবে, মনে হচ্ছে পুরন্দর এর মানেটা বুঝে লেখেনি। পেয়ে গেছে, ছেড়ে দিয়েছে। কী, ঠিক বলিনি!

—নেহাৎ ভদিদা, বউদি, মদনদা সব সামনে বলে কিছু বললাম না। অবশ্য পুরন্দর ভাটের জীবনে এটা নতুন কিছুই নয়। যুদ্ধ যারা করে তারা মশার কামড় নিয়ে মাথা ঘামায় না।

—তার মানে আমি মশা?

—হ্যাঁ, অ্যানোফিলিস।

—আঃ, তোরা থামবি? বেকার ঝগড়া করে কোনো লাভ নেই। পরে আমি ওকে পদ্যটা না হয় বুঝিয়ে দেব।

টিনের দরজার ফুটোর সঙ্গে চোখ সাঁটানো বড়িলাল হঠাৎ বোধ করল তার পা বেয়ে কী একটা উঠছে। চোখ সরিয়ে দেখল একটা ডেঁও পিঁপড়ে। তাকে সরাতে গিয়ে টিনের দরজায় হাঁটু ঠুকে ডুম্ম করে একটা আওয়াজ হল। অন্য কেউ না খেয়াল করলেও শব্দটা নলেনের কান এড়ায়নি। সে উঠতে যাবে কিন্তু ভদি তাকে থামাল।

—ও কিছু নয়। সাক্ষী। সবকিছুর সাক্ষী থাকে। থাকতে হয়। পাত্তা দেবার দবকার নেই। এবারে তোরা কী জানতে চাস কম কথায় বল।

—আঁজ্ঞে, চোক্তার তাহলে ঠিক কী?

—এ কথার কোনো মানে নেই। ফ্যাতাড়ু কী? তেমনই চোক্তার কী? চোক্তার হল চোক্তার। তবে এটুকু বলতে পারি হুজ্জত লাগাতে চোক্তারের কোনো জুড়ি নেই। তবে ঠিক টাইম না হলে কিচ্ছুটি হবার উপায় নেই।

—খোলসা হল না।

—হবে কী করে! আজকে তো সিরিয়ালের পয়লা এপিসোড। তিনশো পেরিয়ে গেল, 'জন্মভূমি'-তে ঠিক কী হচ্চে লোকে শালা বুঝতে পারছে না। আর এক নম্বরেই তোরা এত বড় কাণ্ডটা সাইজ করবি সে কী করে হয়? আর আমিই বা গাণ্ডুর মতো অত বড় ঘোমটা দিতে যাব কেন যাতে পোঁদ বেরিয়ে পড়ে!

বেচামণি লজ্জা পায়।

—গদির মুখটাই ওরকম। খুব অশৈল।

—থামো তো। অশৈল! ভেতরে ভেতরে রাবড়ির জাল দেবার থেকে পেট খুলে দুটো খিস্তি করা সাধুসন্তের লক্ষণ। ঝটপট বলে যা আর কী বলবি।

এবারে পুরন্দর ভাট।

—আচ্ছা ভদিদা, তোমার দরজায় সাইনবোর্ড লেখা 'অশুভ অনুষ্ঠানে ঘর ভাড়া দেওয়া হয়'। এর মানে?

—দ্যাখ্, রোজ, নিত্য, অন্তহীন অশুভ অনুষ্ঠান চলচে! আজকের জীবনে পার হেড দশ-বিশটা করে শত্তুর। লোক চেনা দায়। মামলা, জালি কারবার, বউ ভাঙানো, ভোট মারানো, অর্ডার ধরা, খুচরো দুসমনি, চিটিং কেস, টাকা গাপ, চোরকাঁটা দিয়ে ডাকাতকাঁটা তোলা, মাগি চালান, পলিটিক্যাল চুদুড়বুদুড়, নমিনেশন— এই সব কম্মোকাণ্ড নিয়ে মারণ, উচাটন, বশীকরণ, ব্ল্যাক ম্যাজিক নিত্য চলছে। সেই কারণে, স্রেফ এইসব যারা করে তাদের আমি ঘর ভাড়া দিই। বিয়ে, অন্নপ্রাশন তারপর গিয়ে শ্রাদ্ধফাদ্ধ-তে আমি নেই। এখনই তো একটা ঘরে চলচে তাকিয়াচালান, অন্যটায় কী কেস রে নলেন?

—আঁজ্ঞে কিছু বলেনি। দাড়িওলা একটা লোক মাঝবয়সী একটা মেয়েমানুষ নিয়ে দরজা

বন্ধ করে রেখেছে। ঠিক কী করছে জানি না। তবে ন্যাকড়া পুড়িয়েচে।

--গাঁড় মেরেচে। দরজা ধাক্কে বের কর। টাকা বুঝে নিয়ে লাথ মেরে পেছনের দরজা দিয়ে তাড়া।

নলেন উঠে গেল। তারপর ধুপধাপ. কাঁইমাঁই।

—ও নিত্যকার ব্যাপার। ধাওয়া খেয়ে চলে যাবে। এই শালাদের জন্যেই তো পুলিশ খচড়ামির চান্স পেয়ে যায়।

—তাকিয়াচালানটা কী কেস ভদিদা?

—ভেরি ইন্টারেস্টিং। কংগ্রেস, তারপর গিয়ে কংগ্রেস ভেঙে অনেক দল যেসব হয়েছে ওরা তো ফরাস আর তাকিয়া নিয়ে বসে। ভালো তাকিয়াচালান হলে পিঠ হেলাতে গেল কি তাকিয়াও গড়িয়ে সরে যাবে। ঠেসই দিতে পারবে না। চিৎ হয়ে পড়বে। মানেই হ্যাটা। মানেই কেরিয়ারের পুঁটকিজাম। এরকমই কত কী—শ্মশানবন্দ, ভূত লাগানো, পেটপোড়া, ক্ষুর চালা, চুরির তুক, কলেরা বা প্লেগের তদ্‌বির, নিশির ডাক কাটানো, হাগা বাণ, রাঁড়-ঢ্যামনা কাটার মন্তর— এইজন্যে ঘর ভাড়া। দিচ্ছে কে? চোক্তার ভদি। মাথায় কিছু ঢুকছে?

—না ঢুকে পারে? একেবারে চাম্পি বিজনেস!

—তবে হ্যাঁ। সব বড় বড় খদ্দের। মিনিস্টার, সিনেমা স্টার, ক্রিকেট প্লেয়ার, ডাক্তার, ব্যারিস্টার— কেউ বাদ নেই। খুব আবডাল রাখতে হয়। লোক জানাজানি হলে রক্ষে নেই।

—কিন্তু সাইনবোর্ড দেখেই তো জানবে।

—ওইখানেই তো চোক্তারের ফন্দি। হেঁজি-পেঁজি এল তো এল। পেছনে অন্য দরজা আছে। দরকার হলে বোরখা, ছাতার কাপড়ের আলখাল্লা, ফলস্ দাড়ি, পরচুলা— সব ব্যবস্থা আছে।

—পুলিশ ঝামেলা করে না?

—করবে না কেন? নতুন ও.সি. ফোসি হলে গোড়ার দিকে একটু লপচপানি মারে তারপর সাইজ হয়ে যায়— যেখানকার যা নিয়ম। হাত মে মাল্লু, ঘর যা কাল্লু। ব্যাস্, কোনো ঝুটঝামালা নেই। গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো। আর মোলায়েম করে মেরে যাও। চোক্তারের কারবারের এই হল ধম্মো। তবে সি. পি. এম-এর গওরমেন্ট তো, যে কোনো টাইমে খচড়ামি করতে পারে। করলেই লাইন উপড়ে সাইনবোর্ড পাল্টে দেব।

—কী করবে অমন হলে?

—নার্সিং হোম খুলে দেব। নামও ঠিক করা আছে। 'মৃত্যুদূত নার্সিং হোম'।

—উরিঃ সাঁটি। ঐ নাম শুনলে কেউ আসবে!

—আসবে মানে? পিলপিল করে আসবে। সকলেই জানে যে রোগী কোথাও বাঁচে না। অতএব মরুঞ্চে মাল হলেই এখানে চালান করে দেবে। নার্সিং হোমেও দেওয়া হল, দাঁত কেলিয়ে পটলেও গেল। নো প্রবলেম। দুটো ডাক্তারও আমি ফিট করে রেখেচি। ওদের হাতে আজ অবদি একটা রোগীও বাঁচেনি! ঐ দুটোকে রাখব। তারপর বেচামণি আচে, নলেন আচে...

—আমরাও আছি, ভদিদা।

—সে তো বটেই। এই রে! বাবা এসে গেচে। এবারে ঝটপট কাজ না এগোলে খচে যাবে।

—বাবা মানে? কোথাও কেউ তো নেই!

নলেন ফিক্ ও বেচামণি খিলখিল করে হাসি জুড়ে দেওয়ার ফলে আতঙ্কময় মুহূর্তটি অচিরেই প্রার্থিত মাত্রা পেয়ে যায়। বড়িলালও খটকায় দুলছে। ভদিরই কোনো বিশিষ্টার্থক হেলদোল নেই। ন্যাড়া ছাদের আলশের দিকে হাতজোড় করতে ফ্যাতাড়ুর ছটি ও বড়িলালের দুটি চোখ সেইদিকে

ধায়— আলশের ধারে একটি সুবৃহৎ, প্রাচীন ও প্রাজ্ঞ দাঁড়কাক বসে চোখ পাকিয়ে সব দেখছে।

—চাকতির ঘর খুলবে। মন্তরে মন্তর, যন্তরে যন্তর— সব মিলে গেল। জানতুম বাবা না এসে পারবে না।

যে বাংলা ভাষা আর কখনোই হাসিল হবে না সেই বাংলায় এই পাখিটিরই নাম দণ্ডকাক। দণ্ডকারণ্যে হয়তো এই ধরনের কাক দেদারে দেখা দেয় এমন হতে পারে। না হলেও কোনো খিঁট নেই। এই টাইপের কাক কলকাতায় বেশি দেখা যায় না। তবে বেগম জনসনের আমলে কলকাতায় দাঁড়কাকের ছড়াছড়ি ছিল বলেই শোনা যায়। বেগম জনসন (১৭২৮-১৮১২) প্রসঙ্গে আমাদের পরে যখন না এসে উপায় নেই তাই একটু আগেই গাওনা গেয়ে রাখা ভালো। এই কলকাতাতেই তিনি সেন্ট জনস চার্চ গোরস্থানে জব চারনক ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের কাছেই কবরস্থ অবস্থায় আছেন। ভূমিকম্প জাতীয় কিছু না হলে ওভাবেই থাকবেন এ আশা দুরাশা নয়। আপাতত ভদির পিতৃরূপী গাঢ় একটি কর্কশ আবার নিক্ষেপ করল যা আর যাই হোক ‘কা...আ...’ কখনোই নয়।

—কী চাইছ বাবা? আনন্দলাড়ু খাবে?

এইবার দাঁড়কাক নির্ভেজাল মনুষ্যকণ্ঠে বলল বা বলিল,

—অতীব আনন্দঘন কাল। মন্তর ও যন্তর সব মিলে গেছে, আনন্দবাজারে আনন্দ, চোক্তারের ঘরে ফ্যাতাড়ু, চারদিন পরে কাটা মুণ্ডুর ভোজবাজি সবই যখন ডগোমগো তখন আর কালক্ষয় কেন?

—এঁজ্ঞে, আপনি না এলে...

—চোপরাও। ফের কতা বললে মুকে আঁশবঁটি ভরে দেব। খোল্, শালা চাকতির ঘর।

ভদি আর কালবিলম্ব না করে বেচামণির কাছ থেকে চাবির গোছাটি নেয়। চাকতির ঘরের তালাটি কোম্পানির গোড়ার দিকের দাসলক। চাবিটিও তেমনই আখাম্বা। দরজার ওপারে বোঁ-বোঁ শব্দ—যেন হাজার খানেক ভীমরুল পাখসাট মারছে। ঘর খুলতেই ছোট সাইজের কয়েকটি চাকতি বা উড়ন্ত চাকি সাইরেনের মতো শব্দ করে তেড়ে বেরিয়ে ঘোলাটে আকাশে উধাও হয়ে গেল। বড় চাকতিগুলো বন্‌বন্ করে ঘুরছে কিন্তু বেরোচ্ছে না।

—দরোয়াজা খোলাই থাক। ওরা ইচ্ছেমতো বেরোবে, ঢুকবে। তোরা তোদের কাজ করে চল্। ঠিক টাইমে আমি ফের এসে পড়ব।

দণ্ডকাক হুস্ করিয়া উড়িয়া গেল।

বড়িলাল দেখল এবারে কেটে পড়াই ভালো কারণ খিদে পেয়ে গেছে। পরে না হয় এসে দেখা যাবে জল কতটা গড়াল। ঠাণ্ডার দাঁত না থাকলেও মাড়ি রয়েছে। আবার গরমও লাগছে। ফেরার রাস্তায় বড়িলালের চোখ পড়ল দেওয়ালের গায় বিরাট এক দাড়িওয়ালা মুণ্ডু এবং তারই পাশে কামান দাগার মতো জাঁদরেল লেখা ‘মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান কারণ ইহা বিজ্ঞান’। এই লিখন যে নোনাধরা দেওয়ালের গায় সরব তার নিচে নর্দমা। তাতে জমা জলে কালচে তন্বী শ্যাওলা কোমর দোলায় ও হাজার হাজার মশার লার্ভা নাচানাচি করে।

‘সকলি ধ্বংসের পথে! সকলি ধ্বংসের পথে!
কেহ অশ্বে কেহ গজে,
কেহ যায় পদব্রজে,
কেহ স্বর্ণ-চতুর্দোলে, কেহ যায় পুষ্পরথে ;
সকলি ধ্বংসের পথে! সকলি ধ্বংসের পথে!’

(চলবে)

৪

এখন চলছে ক্যুইজের যুগ। পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে, কলতলায় কলতলায় চলেছে অবিরাম ক্যুইজ। মানুষের জ্ঞান যত বাড়ছে, মানুষের বাচ্চাদের হেডপিস যত সরেস হচ্ছে ততই অবধারিত হয়ে উঠছে ক্যুইজের প্রয়োজনীয়তা। কলকাতায় কবে প্রথম পেচ্ছাপখানা চালু হল, লন্ডনে রাস্তায় হাগলে কত পাউন্ড জরিমানা হয়, কপিলদেবের দাদুর নাম কী, শান্তিনিকেতনে কোথায় কোথায় মাল কিনতে পাওয়া যায়, হাতিবাগানের শেষ বেবি-ট্যাক্সির ড্রাইভার কে, ক্রিকেট ব্যাটে ঘুণ ধরে না কেন—এরকম নানা প্রশ্ন ও তদনুযায়ী জবাবও মজুত রয়েছে। কিন্তু এই সিরিয়াল নভেলটি-র গত এপিসোডের শেষে ঐ কবিতাটি কার লেখা? অনেক ক্যুইজ মাস্টারও কেলিয়ে পড়বে। এবং শিশুদের প্রশ্নটি করে লাভ নেই। তাদের বাপগুলিও জানে না। তার আগের কোম্পানি হয়তো বা জানত কিন্তু তাদেরও বেশিরভাগ অন্তর্হিত। সেই কবি এখনকার কাব্যকারদের মতো ঢ্যামনামি জানতেন না। তবে দুনিয়ায় হারামির হাট তখনও যে বসেনি এমনটি নয়। না হলে তিনি কোন দুঃখে লিখতে যাবেন,

‘একটুকু ভালোবাসা একটি স্নেহের ভাষা,
এক ফোঁটা আঁখিজল কোথাও না পাই!
সত্যই এ বসুন্ধরা কেবলি রাক্ষস ভরা,
দয়ার সে দেবতারা এ জগতে নাই!
মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই।’

এঁরই সম্বন্ধে ১৩৫৫ সালে শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখেছিলেন, ইনিই ‘বাঙ্গালাদেশের শেষ, জাতীয় বাঙ্গালী কবি’ এবং তাঁর আশা ছিল কেন, তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে ‘একথা সকলেই স্বীকার করিবেন।’ বলাই বাহুল্য যে কেউই এসব কথায় বিশ্বাস করে না। সেটা সম্ভবত আগেভাগেই আঁচ করেছিলেন শ্রী কৈলাসচন্দ্র আচার্য। ঐ কবির কাব্যসংকলনের তিনিই ছিলেন প্রকাশক যার ভূমিকা লিখেছিলেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ঐ ভূমিকাটিতে আর কী কী ছিল জানার বোধহয় আর উপায় নেই কারণ ‘প্রকাশকের কথা’-য় কৈলাসবাবু সাফকথা শুনিয়ে দিয়েছেন ‘কাগজের অভাবের জন্য বিশেষ অনিচ্ছায় ঐ ভূমিকার অধিকাংশ বাদ দিয়া তাহা মুদ্রিত হইল।’ ১৩৫৫ সালে পুঁজিবাদী বাজারে কাগজের ক্রাইসিস হয়েছিল, না হয়নি তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের বিতর্ক চলবেই। যে কবিকে নিয়ে এত কিছু তাঁর কিন্তু অনেক সহজ সমাধান জানা ছিল,

‘গু মাখিয়া মারি ঝাঁটা যত মনে লয়!
বাঙ্গালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয়?’

বাঙালি তাঁকে মনে রাখেনি। রাখবেও না। অবশ্য তাতে স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কিছু আসবে যাবে না।

জানা আছে, যে নানা অভিযোগ উঠবে। বেশ বাঁশবেড়ে-গুপ্তিপাড়া রুট খুলেছিল, আচমকা ধরতাইটা ভারিক্কি ধাঁচের হয়ে গেল কেন ঠাকুর? কিন্তু অনাদ্যন্ত চ্যাংড়ামি চলবে এরকম কোনো গ্যারান্টি কি ছিল? লেখকের মার্জি, তার খোলতাই, প্যাঁচ লড়াবার ধান্দা, বিশেষত আওকাৎ যদি ঠিক থাকে তাহলে ফলানা ডিমকা থেকে এক ডাইভে হেথা নয়, হেথা নয় হয়ে যেতেই পারে। আধুনিক আখ্যান খুবই অনেকান্তবাদী। ঐ হা হা হাসি, এই হু হু হাওয়া। এরকমই এখন চলবে। থেকে থেকে লেখকের নাক ডাকবে কারণ সে লেখার স্বপ্নে বিভোর। পাঠক কিন্তু সজাগ। যে প্রান্তরে পাঠানরা যুদ্ধ করেছিল এখন সেখানে পাঁঠা চরছে। এমতাবস্থায় পাঠককে

pathagar.net

জেগে থাকতে হবেই। সাহিত্য নামধারী বিশাল জঞ্জালের পাহাড় থেকে একটি কুটোও যেন না হারায়। গেলে রক্ষে নেই। মাত্র কিছুদিন আগে এরকম ছিল না। তখন পাঠক সাহিত্যকর্মকে পাশবালিশ বা বাঁটরটুপি মনে করত। এখন আর তা হওয়ার উপায় নেই। টিকিট কেটে হাতি চড়ার যুগ বিগত। চিরতরেই। এখন টিকিট নয়, খাল কাটার যুগ। এবং খাল কাটলে যা ঢোকার তা ঢুকবেই। বৃহত্তর, চক্রাকার জিলিপির প্যাঁচের মধ্যে এ হল একটি ছোট্ট পয়জার।

সব সিরিয়ালে না হইলেও বেশ কয়েকটিতে রিক্যাপ বলিয়া একটি অংশ থাকে। ইহার ফলে আগে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার মর্মসার বুদ্ধিমান দর্শক অচিরেই আত্মসাৎ করিয়া ফেলে এবং মাঝে মধ্যে ক্লাস 'বাংক' করিলেও মূল বিষয়টির অসংখ্য ডালপালার কোনো কুসুম হতেই নেশাচুর ভ্রমরের মতো কদাচ চ্যুত হয় না। সেমতোই এমনও নিশ্চয় ঘটিবে যে কোনো পাঠক হয়তো এই পর্ব হইতে বা ধরা যাক, এই বড় করিয়া ৵ হইতে এই মেট্রো নভেলটি পড়িতে শুরু করিলেন। এমনও প্রায়শই ঘটিয়া থাকে যে তিনি ইহার পূর্বে 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' পাঠ করিয়া এমনই তুরীয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন যে 'মাধবীকঙ্কন' তাঁহার নিকট নিতান্তই রাবিশ বলিয়া মনে হইয়াছিল। তিনি হয়তো নিতান্তই স্নেহবশত বা আধিখ্যেতা করিয়া নভেলটি-র নাম ভাবিলেন 'বাঙালী জীবন-নাইট'। অবশ্য এসবই মৃতপাঠ কারণ আগেভাগেই বড় করিয়া ৵ আছে। সিরিয়াল নভেলটিতে রিক্যাপ চলিবে? শেষের সেদিন যদি আজ না হয় তাহলে পাঠক তুমি নিরুত্তর কেন? দিবসের শেষে তোমাকে কুমিরে নেবে। কিন্তু তারও দেরি আছে। এত তাড়া কিসের?

বড়িলাল কেটে পড়ার ঘণ্টাদুয়েক বাদে ফ্যাতাড়ুরাও ভদির বাড়ি থেকে টলমল পায়ে বেরিয়ে এল। যদিও মাথা যথেষ্ট টরটরে।

—উফ্ এতদিন কী খামকাজটাই না করে এসেছি!

—যেমন?

—ভাবতুম আমাদের কেউ ডিঙোতে পারবে না। ফ্যাতাড়ুদের সঙ্গে টক্কর দেনেওয়ালা কোনো মায়ের লাল পয়দা হয়নি। এখন দেখচি...

—কী দেখচ?

—দেখচি কোথায় বাঘের রোঁয়া, কোথায় ঝাঁটের লোম। চোক্তাররাই তাহলে টপ। যাক বাবা, ভাগ্যে দলে ভিড়িয়ে নিল। ভাবো তো, তিনজনের মুণ্ডু কেটে যদি টগরগাছের গোড়ায় ধড়সুদ্ধু পুঁতে দিত কোনো মামা বাঁচাতে পারত? নো পুলিশ কেস, নো ট্রেস।

—আমার তো বাঁড়া ওদিকে অন্য চিন্তা। লাইফ-টাইফ নিয়ে ডি. এস ঘাবড়ায় না কিন্তু বউ-এর আট মাস চলছে। ছেলেটাকে একবার বাপের খোমাটা অবদি দেখাতে পারব না।

—ঢপ মেরো নাতো, সবার আগে ব্রেক ডাউন করল কে? বল মদনদা।

—মদনদা কী বলবে? ছেলেটার কথা ভেবেই তো কেমন যেন ডুকরে উঠল...

—আহা হা, কে আগে কাঁদল তাতে কী আসে যায়। বাংলা কথা সকলেরই পোঁদে ভয় ঢুকে গিয়েছিল।

—হ্যাঁ, হেভি!

—যাইহোক সে ভয়টয় কেটে গেছে অতএব ওসব নিয়ে ফালতু চুদুড়বুদুড় করে কোনো লাভ নেই।

—একদম না।

—এখন ঠাণ্ডা মাথায় বসে আমাদের ব্যাপারটা একবার ঝালিয়ে নিতে হবে। এতদিন

ফ্যাতাড়ুই ছিল বড় তরফ। শের। কিন্তু চোক্তার দেখা যাচ্ছে সেরের বাবা, পাঁচ পো। গপ্পোটা জানো তো?

—আমি জানি।

—আমি জানি না।

—ঠিক আছে, ডি. এস এক ফাঁকে তোমাকে বলে দেবে। মোট কথা, এখন আমাদের চোক্তারের চামচাগিরি করতে হবে। চোক্তার লিডার, আমরা ক্যাডার। চোক্তার কাঁঠাল, আমরা লিচু।

—চোক্তার তুমি এগিয়ে চল! ফ্যাতাড়ু তোমার সঙ্গে আচে।

—কুত্তার বাচ্চারা করে ঘেউ ঘেউ।

—চোক্তার কেঁদোবাঘ, ফ্যাতাড়ুরা ফেউ।

—এইসব কথার মধ্যে বানালে?

—জানবে।

—মদনদা, পুরন্দর একটা জিনিস। আর ঝগড়া করব না।

—আর একটা বানালুম। তবে জোরে বলা যাবে না।

—আস্তেই বল না। কয়েকটা ঝি বাসন মাজছে। কী করবে শুনলে?

—বাগানে শোভিছে কত
সি. পি. এম ফুল
তলায় ঘাপটি মেরে
বাড়ে তৃণমূল

—ঝিগুলো কিন্তু তাকাচ্ছে।

—তাকাবেই তো। এই পাড়ায় আগে কংগ্রেসের হেভি রোয়াব ছিল। পরে মেজরিটি সি. পি. এম হয়ে গেল। এখন আবার তৃণমূল বাড়ছে। যে কোনো টাইমে ক্যালাকেলি লেগে যেতে পারে।

—তুমি এতসব জাহাজের খবর জানলে কী করে?

—আরে বাবা, কবি হলেই তো হল না। চোখকান খুলে রাখতে হয়। আমরা হলুম জানবে পলিটিক্যাল পোয়েট। ওসব ন্যাকড়ামো পদ্য-ফদ্য লিখি না। সবসময়ে তরতাজা। জ্যান্ত ট্যাংরা। একবার কাঁটা মেরে দিলেই সেপটিক। ক্যাপসুল না ঝাড়লে উপায় নেই। মাথায় ঢুকল?

—ওসব পদ্য-ফদ্য মাথায় ঢুকিয়ে মরি আর কী। হাজারটা চিন্তা। এক কান দিয়ে শুনলুম। আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। খেল খতম।

—তাই তো হবে। দু-কানের মধ্যে স্রেফ ফাঁকা। ধরবে কীসে? ভগবান যে কতরকমের গাণ্ডু বানিয়েচে।

মদন বুঝল ফের ক্যাচাল শুরু হবে,

—থামো তো! যে যেমন বুঝেছ তাই নিয়ে থাকো। ভদিদা যা যা বলেচে সেগুলো মনে আচে? ডি. এস বলো তো চোক্তারের গুষ্টির আদিপুরুষ কে?

—শুনেছিলুম। কিন্তু মনে নেই।

—এই যে কোনো কিছু মন দিয়ে শোনো না, এর ফলে কিন্তু একদিন মোক্ষম ফেঁসে যাবে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই শুনলে আর ভুলে মেরে দিলে?

—মাল খেলে এরকম হবেই।

pathagar.net

মদন রেগে দাঁত খুলে পকেটে ঢোকায়।

—বাল! আমি আজ অবদি যত মাল খেয়েচি তুমি সাঁতরে পার হতে পারবে না। মাল খেলে এরকম হবেই!

—ঠিক আচে বাবা। খেয়াল করে শুনিনি, গোক্ষুরি হয়েচে। এবার বলে দাও। আর ভুলব না।

—জানি না বাবা, ভদিদা সব জানতে পারচে কিনা। ভদিদা খচে গেলে কী হবে আন্দাজ আচে?

—আরে বাবা, আচে বলেই তো এই নাও দু কান ধরচি। এমন আর কক্ষুনো করব না।

—ঠিক আচে। পুরন্দর, তোমার?

—মানে তখন বউদির মাথায় ঐ শ্যাম্পু করা চুল দেখে একটা কবিতা ঘুরছিল তাই...

—বাঃ চমৎকার, একেবারে ডুগিতবলা। ওটা কী শ্যাম্পু মনে আচে?

—না।

—ওটা হল ডগ স্যাম্পু। সায়েবরা কুকুরদের মাখায়। সায়েবদের কুকুর দেখেচ? ইয়া বড় বড় সোনালি লোম। ঠাণ্ডার দেশের কুকুর তো। বরফের মধ্যে হাগতে বেরোয়।

—তাহলে ভদিদা বউদির জন্যে ঐ স্যাম্পু আনতে গেল কেন? নিজের বউ বলে কতা।

—বলচি। সাধনা করে করে বউদির মাথায় এমন জট পড়ে গিয়েছিল যে এমনি স্যাম্পুতে হত না। তখন ভদিদা নলেনকে দিয়ে ঐ স্যাম্পু আনাল। গায়ে কুকুরের ছবি। কেরোসিনে গোটা মাথা ভিজিয়ে নিল। উকুন-টুকুন সব হাওয়া হয়ে গেল। জটও আলগা হল। তারপর ডগ স্যাম্পু। এখন চুল দেখো না! চুল তো নয়, যেন পেখম।

এর পরপর যে ঘটনাটা ঘটল তা বড়ই দুষ্প্রাপ্য। বস্তুত, ইন্টারনেটের মশারির মধ্যেও এই ধরনের ঘটনা যে ঘটতে পারে তা ভেবে ফেলাও খুবই সাহসের কাজ বটে। এই ঘটনাটিই তখন তার চেতলার বাড়ির ভাগের ঘরে শুয়ে বড়িলাল স্বপ্নে দেখেছিল। তার পেটে তখন প্রায় টেবিল চেয়ার ওল্টানো হোটেলের কুড়িয়ে বাড়িয়ে যোগানো ঠাণ্ডা কাঁটা কাঁটা ভাত আর পুরো ফুটে যাওয়া, সজারুর মতো দেখতে ফুলকপি ও আলুর ডালনা এবং পাকা মাছের লেজের তেলতেলে ছাল সব ওলটপালট খাচ্ছিল। বড়িলালের স্বপ্নটিতে সাউন্ড ট্র্যাক এক থাকলেও দৃশ্যটি সাদাকালো।

ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন, টগবগ টগবগ, সাঁই সপাশ্ সাঁই সপাশ্ ও ক্যাঁচকোঁচ ক্যাঁচকোঁচ শব্দ। আচমকা এই সশব্দ দৃশ্যটি ফ্যাতাড়ুদের প্রায় ঘাড়ে এসে পড়ায় তারা ত্রস্ত নেটিভের মতো অবিকল দক্ষতার সঙ্গে রাস্তার ধারে ছিটকে সরে যায়। এই হল কলকাতার সেই প্রসিদ্ধ 'হাওয়া খানা' বা ('eat the air')—ঝকমকে পালিশ করা ফিটন গাড়ি। সামনে চোখ বাঁধা আসল ঘোড়া, বেতো খচ্চর নয়। সহিসের মাথায় পেল্লায় পাগড়ি। মনে হবে রাজ্যপালের এডিকং। খোলা ফিটনে বিশাল আকৃতির এক মেমসাহেব বসে। ইনিই তিনি অর্থাৎ যার কথা আগেই বলা আছে সেই বেগম জনসন। চোখ প্যাঁটপ্যাঁট করে রাস্তার দুধারই নেকনজরে রাখছেন। উল্টোদিকের সিটে তন্বী দুটি কচি মেম। ঘুমন্ত বড়িলাল ও জাগন্ত ফ্যাতাড়ুদের কানে অদৃশ্য কোনো নম্র প্রেত বলে গেল, 'বাঁ-দিকেরটিকে—চিনলে? উনি মিস স্যান্ডারসন। পাশেই মিস এমা র‍্যাংহাম!' চারজনেই ফটাফট সেলাম ঠোকে। উরি গুরুঃ। ফিটনের পরেই একেবারে ব্রিচেস ও হাতঢোলা সাদা সার্ট পরা দুই সাহেব। স্ব স্ব ঘোড়ায় দুলকি ঢঙে চলেছে। দুই সাহেবই একযোগে মুখ তুলে সিনেমার হোর্ডিং-এ রানি মুখার্জির পাগলা করে দেওয়া ছবিটা একবার

মেপে নিল। এবং তারপরই দুই কচি মেমের দিকে। এবারে প্রেত-কণ্ঠের দরকারই হয় না। চারজনেই বুঝে যায় যে, অবধারিতভাবে একজন যেহেতু মিঃ স্লিম্যান সুতরাং অন্যজন মিঃ শেরউড হতে বাধ্য। ১৭৮১ সালে ক্যালকাটায় এরকম একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় (আনন্দবাজারে নয়)—'To be sold by private sale : Two coffree boys, who play reasonably well on the french horn ; about eighteen years of age ; belonging to a portuguese padre lately deceased' এই দুটি কাফ্রি যুবককে মিঃ স্লিম্যান ও মিঃ শেরউড খরিদ করিয়াছিলেন। এই 'হাওয়া খানা'-র শব্দময় দৃশ্যটি যেমন অতর্কিতে এসেছিল তেমনই ভ্যানিশ করে যায়। এ তো সবে শুরু। এরকমই এখন হতে থাকবে। ১০ নম্বর ক্লাইভ স্ট্রিট ছিল বেগম জনসনের ঠিকানা। অন্য দুই মিসিবাবার ঠিকানাও হয়তো একদিন আমরা পেয়ে যাব।

—কী বুঝলে? ডি. এস?

—মেম দুখানা কিন্তু কঁ্যাচা মাল, কিন্তু মুটকিটাকে দেখলে ভয় করে।

—শোনো, ওদের সম্বন্ধে সমঝে কথা বলবে। একবার যদি সায়েবদের কানে ওঠে তাহলে দফারফা। পুরন্দর?

—আমি ভাবছি এসবই কি চাকতির চক্কর? ভদ্দিদা যে বলল সব তুলকালাম কাণ্ড হবে।

—এ তো কলির সন্ধে। এখন তো আসর সবে বসতে শুরু করেচে। যাত্রাপার্টি এসে পৌঁছয়নি।

—মানে, জল আরও গড়াবে বলচ?

—অনেক দূর। সোজা কথা হল চোক্তারি পরোয়ানা একবার জারি হয়ে গেলে আর কেউ থামাতে পারবে না।

স্বপ্ন ফুরোবার পরে বড়িলালের ঘুম আরও গাঢ় হল। একই স্বপ্নে রানি মুখার্জি, মিস স্যান্ডারসন ও মিস এমা র‍্যাংহাম-কে পাওয়া যেমন সুখের তেমনই বিরক্তিকর বেগম জনসন ও দুই কামুক সায়েবকে সহ্য করা। এতক্ষণ একটা রুগ্ন মাছি হনুমানজীর সামনে বসে নকুলদানা খাচ্ছিল। এবারে কী খেয়ালে সে বড়িলালের নাকে এসে বসল এবং এর ফলে ঘুমের ঘোরেই বড়িলাল পাশ ফিরে শুল। ঘোড়ার রেস চলছে। বড়িলালের ইতিহাস নিয়ে কোনো মাথাব্যাথা নেই। থাকতেই বা যাবে কেন? কিন্তু এই শিক্ষাপ্রদ ঘুম তাকে ছাড়বে কেন? এবারে আর সাহেব মেম নয়, ঘোড়া। ঘোড়ার জল খাওয়ার চৌবাচ্চা বড়িলাল দেখেছে। এবারে সে জেনে ফেলল যে, ১৮১০ সালে বর্তমান রেস কোর্সটির পত্তন হলেও, এর আগেই, গার্ডেন রিচ-এর শেষ মাথায় একটি রেস কোর্স ছিল। হিকি'স গেজেটে ১৭৮০ সালেই রেস মিটিং ও রেস বল-এর খবর পাওয়া যায়। বেঙ্গল জকি ক্লাব স্থাপিত হয় ১৮০৩ সালে। বলাই বাহুল্য যে জকিগিরির সঙ্গে বাঙালির যোগাযোগ নিবিড় বলে কোনো সোচ্চার তথ্য পাওয়া যায়নি। যদিও ঘোড়ায় চড়ে হাগতে যাওয়া যে বাঙালির হাতের পাঁচ তা কে না জানে? বড়িলাল উপুড় হয়ে শুল।

—তবে একটা কথা। ভদিদা যা বলেছে তা কিন্তু কাউকে বলতে যেও না। মানে এমন ভাবটি দেখাবে যে, তুমি কিচ্ছু জানো না।

—খেপেচ? যার ভরসায় থাকা তার নাম মুখে আনা নেই।

—টুঁ শব্দটি না। ভদিদা বলেচে কয়েকদিন আমাদের ওপর নজর রাখবে। তারপর একটা দুটো করে কাজ দিয়ে শুরু করবে।

—আচ্ছা, ঐ যে কয়েকটা চাকতি যে উড়ে বেরোল সেগুলো এখন কী করে বেড়াচ্চে

বল তো?

—জানবার যো নেই। সব গোপন খেলা। তবে ঐ যে 'হাওয়া খানা' ফিটন গেল, এটা চাকতিরই কারবার।

—ছোট করে একটু আঁচ দিয়ে গেল। তাই না মদনদা?

—তা তো বটেই। তবে ভদিদা বলেচে এখন দিন তিনচার বেশি কিছু হবে না। ডি. এস মালকড়ির খবর কী?

—আজ আমার পকেট সাকুল্যে চার টাকা।

—পুরন্দর?

—কত লাগবে?

—বেশি না। অন্ধকারটা না জমলে উড়তে পারব না। এই ফাঁকে একটু চা-বিস্কুট প্যাঁদাব ভাবছিলুম।

—সে হয়ে যাবে। টাকা বারো আছে।

—আমি নেই।

—কেন?

—একবার মাল স্টার্ট হয়ে গেলে তারপর চা-ফা খেতে আমার ঘেন্না করে। চার্জিং বল তো আচি।

—পকেটে তো চার টাকা। কী চার্জিং করবে। পোড়া ডিজেল?

ডি. এস ওর তোবড়ানো ব্রিফকেসটা রাস্তার ওপরে রাখল। তারপর প্যান্ট আর পেটের তলার মধ্যে হাত গলিয়ে জাঙিয়ার ভেতর থেকে সরু করে ভাঁজ করা একটা একশো টাকার নোট বের করল। ভাঁজ খুলতে নোটটা হাওয়ায় দুলতে লাগল।

—আমার নাম ডি. এস, বুঝেচ? পুজোর বাজারে আমার কাছে অল টাইম একটা দুটো বড় পাত্তি থাকবেই।

—উরি শালাঃ হেভি হারামি তো!

—তবে! কীরকম দিলুম মদনদা। বল!

—শোনো, তুমি যদি জাতক্যাওড়া না হতে, তোমাকে আমি ফ্যাতাড়ু করতুম?

—নতুন এনার্জি এসে গেল। কেমন যেন ন্যাতাজোবড়া লাগছিল।

—কোথায় যাবে? গাঁজা পার্ক না গরচা?

—কোনোটাতেই না। দুটো ঠেকেই নানা উল্টো পাল্টা পাবলিক। তার চেয়ে বরং টালিগঞ্জ ফাঁড়িতে চল। জায়গাটা ছড়ানো। ভিড়ভাট্টাও কম।

—এখানে কিন্তু মালটা সবসময় আসলি দেয় না, জানো তো? জল পাঞ্চ করে।

—ছাড়ো না। আমার সঙ্গে জালি করা অত সোজা নয়। ওরা লোক চেনে।

ফ্যাতাড়ুরা খুবই আনন্দময় বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সহযোগে টালিগঞ্জগামী একটি ২৯ নম্বর ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে উঠে গেল। এবং ট্রামটিও কালবিলম্ব না করে সংরক্ষিত ডাঙা দিয়ে ঝ্যাড়র ঝ্যাড়র শব্দ করতে করতে গড়াতে শুরু করল। এই লাইনের দুপাশেই কিছু ঘাস, কিছু বেঁটে মাপের টোপাকুল গাছ, কিছু অজানা গুল্ম ও অনেক পরিমানে গু-এর পিরামিড দেখা যায়। দুপাশেই পিচ রাস্তা দিয়ে বিস্তর গাড়ি। দূষণের ধোঁয়া সবকিছুতেই এক মায়াময় মলিনতা আনে। আর ঝোড়ো বেয়াড়া বাতাস দিলেই দেখা যায় শান্তির সেই সাদা কবুতরের মতোই নানা মাপের পলিব্যাগ ওড়াউড়ি করছে। যারা পথে তাদের বাড়ির দিকে মন। যারা বাড়িতে তাদের টিভির

দিকে। অতএব এসব খুচরো অলৌকিক দৃশ্য দেখার জন্য কারোরই টাইম নেই। অবশ্য পাগল ও চামচিকেরা এ বিষয়ে খুবই সমঝদার। যে কলকাতাকে ভেঙে, দুমড়ে, ঝলসে, গলিয়ে, থেঁৎলে, খুবলে অজানা এক ধাতু ও সিন্থেটিক পদার্থের বিকট সমাহারে ঢেলে পাল্টানো হচ্ছে সেই কলকাতার আসল বন্ধু হল পাগল ও চামচিকেরা। সেই সঙ্গে কয়েকটা রঙ-মাখা মেয়ে, কুকুর, বাদুড়, বেড়াল, প্যাঁচা, ইঁদুর, ছুঁচো, আরশোলা, ভিখিরি ও পিঁপড়েরাও রয়েছে। মশা, মাছি ও শেষ কয়েকটি প্রজাতির শ্বাসরুদ্ধ প্রজাপতি ও মথ এবং চড়াই, শালিখ, কাক, চিলরাও এই দলে যোগ দিল। কেউ যদি বাদ পড়ে যায় তাদের জন্যেও এই জায়গাটা খোলা থাকল বলে ছেদচিহ্ন দেওয়া হল না

কারোর মুখের ওপরে দরজা বন্ধ করে দেবার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই। কেউ শুনুক বা না শুনুক এর জন্যে চেষ্টা একটা চালাতে হবেই। লেখায়, না লেখায়—সব জায়গায়। সব সময়। তবেই না আসতে পারবে। আরে বাবা, সব থেকে যার গুমোর সেই গনগনে চুল্লির দরজাকেও খুলতে হয়। ফুরসৎ পেলে এসব ভাবনায় তো ফিরে আসাই যায়।

সেই রাতেই টালিগঞ্জ ফাঁড়ির বাংলার ঠেকে ঢোকবার গলিতে ছোলাভেজা কেনার সময় ডি. এস-এর সঙ্গে একজন গাল তোবড়ানো, খোঁচা দাড়ি আধবুড়ো ড্রাইভারের আলাপ হল। ওর বগলে একটা পাঁইট ছিল। পকেটে একটা প্লাস্টিকের গেলাশ। মুখে নেভা বিড়ি। দাঁতে কামড়ানো। ডি. এস তাকে বগলদাবা করে বাকি দুজনের কাছে নিয়ে এসে বসাল। লোকটা মালে জল মেশায় না।

—আমি এখানকার রেগুলার খদ্দের। রোজ আসি। একটা পাঁইট খাই। তারপর কেটে পড়ি। কোনো ঝুটঝামেলা নেই। পাঁইট ফুরোবে, আমিও হাওয়া। এক ফোঁটাও বেশি খাব না। কমও খাব না।

—সব সময় হিসেব ঠিক থাকে?

—রাখতে হয়। সব শিখেছি কাকে দেখে জানেন। আমার মালিককে দেখে। হেভি ঠাণ্ডা মাথার লোক। আজ অবধি কোনোদিনও বলবে না, বলাই, দেরি হয়ে যাচ্চে। ঐ গাড়িটাকে ওভারটেক করো। ওকে চাপো। বরং বলবে যার বেশি বাপের বিয়ের তাড়া তাকে রাস্তা দিয়ে দে। সত্যিই বলুন। আপনাকেও যেতে হবে। আমাকেও যেতে হবে। এর মধ্যে গাঁড় মারামারি করে কোনো লাভ আছে?

—এই কথাটাই তো লোকে বুঝতে চায় না।

—একেই জানবেন রাস্তা কম। তারপর নিত্যি নতুন গাড়ি বেরুচ্ছে। আন্‌কা ছোঁড়াগুলো স্টিয়ারিং ধরেই ভাবছে কী হনু রে। আরে বাবা, এর নাম কলকাতা। একানে রংবাজি করেচ কি মরেচ।

পুরন্দর মালের গেলাশে আঙুল ডুবিয়ে একটা পোকা তুলল।

—ভাগ্যে আপনার গেলাশে পড়েনি। নিট মালে কখন সাইজ হয়ে যেত।

—সে ওর যা ভাগ্য তাই হবে। সব কপাল।

—আপনি ভাগ্য-ফাগ্য মানেন?

—আগে মানতুম না। আমার চার বছরের ছেলেটা, আজকে থাকলে জোয়ান হয়ে যেত, বুঝলেন, ডাক্তারের উল্টো টিটমেন্টে মরে গেল। সেই থেকে মানি।

—কী হয়েছিল কী?

—ওর আপনার একটা খিঁচ ধরত বুঝলেন। মিগি টাইপের। আমাদের মাতাতে কী যে ভর করল। পাড়ার ডাক্তার ছেড়ে বড় ডাক্তার দেখাতে গেলাম। ছেলেটা তখন সদ্য হাম থেকে উঠেচে।

—এখনকার বড় ডাক্তার মানেই হারামি। খালি পয়সা খ্যাঁচার ধান্দা। গরিব ধরো আর বাঁড়া মুরগি বানাও।

—আমাকে অনেকে তাতিয়েছিল। বলল ডাক্তারের সঙ্গে কেস করতে। আমি বললুম কেস করলে আমরা, গরিবরা কোনোদিনও পারব? কেউ পেরেচে? উকিল, পুলিশ—সব ওদের হাতের পাঁচ।

—আর কেসে জিতলে কি ছেলে ফিরে পেতেন?

—সেই না কতা। ওর ভাগ্যে যা ছিল হয়েচে। কী করা যাবে?

একটু দূরে একটা ছেলে উবু হয়ে বমি করছে। বমিটা মেঝেতে ঢাল আছে বলে গড়াচ্ছে। বমি টপকে টপকে খদ্দেররা ঢুকছে। বেরোচ্ছে।

—ঠিক আচে ভাই। দেখা হবে। নামটা মনে রাখবেন। বলাই। আমি কখনো মুখ ভুলি না।

বলাই চলে যাবার পরে ডি. এস একটা চারমিনার ধরাল।

—এই দুক্‌কের কতা শুনলে কেমন মুড অফ হয়ে যায়। আমি আর একটা বোঁতল নিয়ে আসি।

—আবার বেশি নেশা হয়ে যাবে না তো! তারপর বাসট্রামে লোকে খিস্তি করবে!

—কে খিস্তি করবে? কোন ল্যাওড়া খিস্তি করবে?

ডি. এস বেশ জোরেই চেঁচায়। ফলে আশপাশের লোকজন ওকে দেখতে থাকে।

—কী হচ্ছে কী? লোকজন সব দেখচে। মাল আনবে তো মাল আনো, এর মধ্যে আবার। ফালতু হুপহাপ আমি একদম বরদাস্ত করতে পারি না।

এইবার ডি. এস বুক পকেট থেকে মাঝে মাঝে দাঁত ভাঙা একটা ময়লা চিরুনি বের করে চুল আঁচড়ে নিতে নিতে টলমল করে দাঁড়ায়। মুখে প্রায় হাসি।

—খিস্তিটা কাকে করলাম সেটা বলতে পারবে?

—পারব।

—কাকে?

—ওই বোকাচোদা ডাক্তারকে।

চাকতির ঘরে তুমুল বোঁ বোঁ-র হট্টিচাল্লি। নানা মাপের চাকতি সারা ঘরে চরকি খাচ্ছে। কয়েকটা ম্যানহোলের সাইজের, তারপর বগিথালা, রেকাবি, সোডার বোতলের ছিপি— ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন গোল মালের আদলে। তাজ্জব ব্যাপার হল এই বিকট বোম্বাচাকের মধ্যে কিন্তু চাকতি-চাকতি কোনো ধাক্কাধাক্কি বা ট্যাকলিং নেই। কেবল যখন তারা ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ করতে করতে খুব কাছে এসে পড়ছে তখন নীলচে ফুলকি উড়ছে। চাকতির ঘুঘুচক্কর এখন যেহেতু বহাল থাকবে অতএব আমরা বরং চাকতির ঘরের সামনে বারান্দায় কী হচ্ছে সেইদিকে ধাবিত হতে পারি। একই দৃশ্যে আবদ্ধ থাকলে চোখে ঝিঁঝি ধরে যেতে পারে এমন বিপদও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বারান্দায় পঁচিশ পাওয়ারের একটি নোংরা ছাতাপড়া ডুম জ্বলছে বলে সবই কেমন ঘোলাটে ও ছত্রাকাছন্ন। গায়ে একটি আরশোলায় ফুটো করা চিমসে র‍্যাপার জড়িয়ে ভদি বসে আছে।

পাশেই জবার মালা পরা বেচামণি। মালাটি হল জালি। প্লাস্টিকের জবাফুল, মধ্যে মধ্যে জরির জাঁক। ভদির সামনে গোটা পাঁচেক শুড়ঢা আর শুড়ঢি থেকে থেকে ভদিকে স্যালুট করছে এবং তাদের ক-হাত পেছনে ধুনুচিতে হাতপাখা মারছে নলেন। ভদি একতরফা তার ভলান্টিয়ারদের ডেঁটে যাচ্ছে।

—গত বছর পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীতে আমি কী বলেছিলুম? কী?

—আঁজ্ঞে, সময় হলেই মহাচক্রপালা শুরু হবে।

—আর কী বলেছিলুম?

যে জবাব দিচ্ছিল সে মশা কামড়ানোর ফলে মাথার জায়গায় পোঁদ চুলকোয়।

—ঠিক স্মরণে নেই।

—গাণ্ডু হলে থাকবে কী করে? আমি বলিনি যে, সেইদিন সমাগত প্রায়।

—আঁজ্ঞে হ্যাঁ।

—যা বলব নামতা না করতে পারলে বাড়ি গিয়ে লিকে রাখবি। শালা! একটা পদ্য পড়েছিলুম। কেউ বলতে পারবি?

—আঁজ্ঞে পারব।

—তো বল্।

সেই শুড়ঢাটি গলা খাঁকারি দিয়ে রেডি হয় কিন্তু আচমকা বেচামণি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠায় ঘাবড়ে যায়।

—ও কিছু না। ভর হচ্ছে তো। এরকম হবে! তুই বলে যা।

—মুণ্ডু মারেন উঁকি
ফিক্ লো কালো খুকি
জয় মহাভয় চাকতির জয়
ধুকপুকি ধুকপুকি

—বাঃ বাঃ তোর হবে। বলে দিলুম তোর হবে।

আনন্দলাড্ডুর মধ্যে আনন্দবটিকা
যবন বর্ষশেষ, ঘোর বিভীষিকা।

কী বুঝলি?

—আপনার শাস্ত্রকথা, আমরা কী করে বুঝব?

—বুঝবি। আমাকে বোঝাতে হবে না। পরের ইংরেজি মাসের সাত তারিকে কালীপুজো। ওইদিন দুনিয়া বুঝবে। আর চারদিন পরেই একটু জানান দেবে। নে এবার কেটে পড় তো। একদিকে ভলান্টিয়ার, দিনটা খেল ফ্যাতাড়ু, একন আবার বউ-এর ভর। নকড়া ছকড়া করে দিল।

নকড়া ছকড়া করে দিল। ওরে নলেন। নলেন রে!

পাঠান, পাঁঠা, পাঠক, পাঠ— এইরকমই হবে। যাইহোক, আনন্দলাড্ডুর মধ্যে আনন্দবটিকা মানে যে আনন্দবাজারে যাদুকর আনন্দের বিজ্ঞাপন সেটা ক্লিয়ার হল। যবনবর্ষ মানে ১৯৯৯-এর ২৪ অক্টোবরেই আমাদের বলির পাঁঠাটি ঘুরপাক যাচ্ছে। এরপর নভেম্বর, ডিসেম্বর। ঘোর বিভীষিকা। ২৮ তারিখ যে মুণ্ডু-ড্যান্স হয়েছিল তা সকলেই জানে। অতীব সংস্কৃতিবান পাঠক নিশ্চয়ই মুণ্ডু-ড্যান্সকে ক্যান্ডি-ড্যান্সের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না। ফেললেই বা কী? যাহা ক্যান্ডি

তাহাই মুণ্ডু। যে কোনো মোমেন্টে বিশৃঙ্খলা বিশালত্ব পেতে পারে। ভদি ভীমনাদে ‘বেচামণে!’ বলে ডেকে উঠতে পারে। এবার দেখা যাক কালীপুজোয় কী হয়। সাহিত্যেও আজকাল বিধিসম্মত সতর্কীকরণ সবিশেষ জরুরি হইয়া পড়িয়াছে।

ওপারে যেওনা ভাই ফটিংটিং-এর ভয়
তারা তিন মিনষে মাথা কাটা, পা-য় কথা কয়।   (চলবে)

৫

(চলবে) বলে যে লেখার এক একটি পক্কড় শেষ হয় তার সঙ্গে তুলনীয় হল অতীব ভয়াবহ ঘাপটি মারা সাবমেরিন। ‘কাঙাল মালসাট’ নামক সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজটি মাসে একবার সুনীল ও ঘোলাটে জলরাশি, জেলিফিশ, টাইটানিকের দীর্ঘশ্বাস ও মরণোপম চৌম্বক মাইনের মধ্যে পিঠ দেখায় এবং তারপরই ক্যাপটেন নিমো-র নির্দেশে পুনরায় তলিয়ে যায়। শুশুকেরাও এরকমই করে যদিও তাদের কোনো পেরিস্কোপ, টর্পেডো ও আক্রমণাত্মক বাসনা থাকে না। এত খোলসা করে বলার টার্গেট একটাই। ডুবোজাহাজ ফুটো হয়ে জল ঢুকে যে কোনো সময় কেলো ও ট্রাজেডি ঘটে যেতে পারে। এই বিপদ এখন আসন্নপ্রায় কারণ পূর্ববর্তী ‘(চলবে)’-র শেষে যে ফটিংটিং-এর ভয় দেখানো হয়েছে তা মোটেই আজগুবি মাল নয়। স্রেফ লেখা বা লেখক নয়, এক একটা গোটা সমাজব্যবস্থা ও সাম্রাজ্য যখনই ফটিংটিং-দের এলাকায় মাজাকি মারতে গেছে তখনই যা ঘটেছে তাকে গন-ফট্ বলা যায়। অতএব সে বিপদ যে থেকে গেল শুধু তাই নয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা। অনেকেই আশা করেছিল যে ছড়া, প্রবাদ, পুরাণকল্প ইত্যাদি মিলিয়ে কিছু একটা হয়তো বা বলা হবে। কেন নায়করা নির্ভয় সীমান্ত পেরিয়ে অজানা বিপদের পথে যাবেই? প্রথমে ঝাড় খাবে, তারপর জ্ঞানী কোনো গুড়ঢা গাণ্ডুর পাঠশালায় কয়েকটা কোচিং নিয়ে ড্রাগন বা রাক্ষসের ব্যবসায় লালবাতি জ্বালাবে এবং মরচে ধরা, ঢপ কোম্পানির ডবল ডানা এরোপ্লেনে করে চাম্পি একটি মাল নিয়ে ব্যাক করবে। এই ঢ্যামনামির গল্পের রকমফের নানা দেশে চালু আছে। এবং আশু বিলুপ্তির কোনো আভাসও নেই। তবে এ বিষয়ে আমরা কিন্তু ঝেড়ে কাশার দলে নেই। পেরিস্কোপে দেখা যায়,

দিকে দিকে জ্বলছে ধুনি,
ভিড় করেছে জ্ঞানী-গুণী

(পুরন্দরের একটা অনবদ্য কাপলেট)

যা বলার ঐ শালারাই বলবে। চিরদিনই বলে আসছে। আমাদের কাজ হল ওদের খচানো, ভুলিয়ে ভালিয়ে এদিক সেদিক নিয়ে যাওয়া এবং তারপর তেরপল চাপা দিয়ে প্যাঁদানো। খেঁটো বাঁশ দিয়ে বেধড়ক ক্যালাও।

কী নির্জীব, কী নির্জীব,
নির্ঘাৎ ওটি বুদ্ধি জীব।

(পুরন্দরের আর একটি)

২৭ অক্টোবর ১৯৯৯ সকাল সাড়ে নটার সময় ভদির উঠোনের কোণে ঝুলন্ত, তলাখোলা বালতির মধ্যে কাকের ঠোঁটে এসে পড়া একটি মান্ধাতার আমলের কাঁটাচামচ নাচানাচি শুরু করাতে ধাতব সংঘাতের আধা সুরেলা শব্দ হতে থাকে এবং বেচামণি ঠাস্ করে একটি ভাঙা

থালা উঠোনে আছড়াতেই ভদি দুড়দাড় করে ছাদ থেকে নেমে এসে ফোন ধরে। বস্তুত পাঠকের পক্ষে এটা হজম করা বেশ কষ্টকরই হবে যে ইন্টারনেট ও সাইবারসেক্সের যুগেও এই টেকনোলজি বেশ বহাল তবিয়তে চালু আছে। এ হল সেই টেলিফোন যা একযুগে বাঙালি শিশুরা বানিয়ে খেলা করত। ভদি প্রাচীন ও জংধরা বেঙ্গল শটি ফুডের টিনটি কানে লাগায় যা একাধারে মাউথপিস ও রিসিভার।

ফোনটির অপরপ্রান্ত গেছে পাশের ফালি, এঁদো জমিটুকু পার হয়ে তেরচাভাবে অবস্থিত বাড়ির দোতলায়। মধ্যবর্তী ফালি জমিটুকুতে বুনোকচু গিজগিজ করছে এবং তার তলায় চার পাঁচ পুরুষের জঞ্জাল। চোর ছাড়া আর কেউ সেখানে ঢুকতে সাহস পাবে না এবং ঢোকার পরে চোরও ঘাবড়ে যাবে কারণ গিরগিটি, ব্যাঙ, বিছে ও সব জাতি ও প্রজাতির মশা সেখানে দুর্ভেদ্য জুরাসিক পার্ক তৈরি করে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। এরই ওপর দিয়ে ডবল তার চলে গেছে। একটি একটু আলগা, অন্যটি টান টান। আলগাটিতে ঠনকালে ফোন বাজে। ও বাড়িতে ঘন্টা দোলে, এখানে বালতির মধ্যে কাঁটাচামচ। কোনো ঝামেলা নেই। এ বললে ও শুনবে। ও বললে এ। একইসঙ্গে দুটো চলবে না।

যে শব্দটি বা কথা আসে তা খুব স্বাভাবিক নয়, একটু খোনা ধাঁচের, একটু ভূত ভূত ভাব। ভদি বলে,

—কী হঁল আঁবাঁর?

—কিঁছু নাঁ। অঁল ক্লিঁয়ার।

—কাঁল কঁটা গেঁল?

—অ্যাঁঃ

—বঁলচি কাঁল কঁটা গেঁল?

উল্টোদিকের থেকে চারটে টোকার শব্দ। ভদি ঠিক শুনল কিনা যাচাই করার জন্যে চারটে টোকা দেয়। উল্টোদিক থেকে,

—ছেঁড়ে দিঁলুম।

—আঁচ্ছা!

রোজই সকালে ভদির কাছে ক-বালতি মাটি সরল সেই খবরটা এসে যায়। সরখেলের সঙ্গে এরকমই ব্যবস্থা চালু আছে। এই মহতী প্রকল্পটিকে ঘিরে ভদি ও সরখেলের উচ্চাশার অন্ত নেই। কিন্তু ভদির থেকে থেকেই প্রামাণিকের সেই সাবধানবাণী মনে পড়ে যায়। ও. এন. জি. সি থেকে অনেকদিনই রিটায়ার্ড। কিন্তু একাধারে ভদির ভলান্টিয়ার ও ক্রিটিক। দেড় বছর আগে সাধনোচিত ধামে গমন করলেও প্ল্যানমাফিক স্বপ্নে সাক্ষাৎকার বহাল আছে। মরার পরে ভাষাও বেশ সাবলীল হয়ে উঠেছে। আগে প্রতিটি বাক্যেই কয়েক কিলো করে ভক্তি থাকত। এখন বড় তিরিক্ষে ও সিনিক।

—সরখেল বানচোৎ কী করছে?

—যা করার। মাটি সরাচ্ছে।

—বাল সরাচ্চে। টপ সয়েলে আঁচড়াচ্চে। বগল চুলকানোর মতো। তখন কত করে বললাম। যে মাল হবার নয় তাই তুমি সরখেল হইয়ে ছাড়বে।

—ছাড়বইতো! আমার নাম ভদি।

—যদি হয় নিজের নাম পাল্টে ফেলব। অনাদি প্রামাণিক হয়ে যাবে চুদির ভাই পরামাণিক। দু কান কেটে ফেলব। চশমা পরতে পারব না। মরে গেছি তো কী হয়েচে।

—এখনো জার্নাল টার্নাল পড়ি। আপ-টু-ডেট থাকার চেষ্টা করি। সব ছেড়ে দিয়ে, বলা যায় না, হয়তো একটা বিয়ে থা-ই করে বসব। পাগলে কী না করে!

—আজকাল প্রামাণিক বড় অল্পে খচে যাও। মরলে তোমার মতো জ্ঞানী গুণী লোক কেমন থুম্বো মেরে যায়। দেখলেই মনে হয় গুলি খেয়ে ঝিমোচ্চে। কেবল তোমারই দেখচি সব সময় ছটফট ছটফট কেমন কুকুরক্ষ্যাপা ভাব! এ তো ভালো নয়!

—তোমার হিসেব তোমার কাছে। এখানে সব ভেন্ন। আর তোমাদের ওখানে কী হল না হল তাতে আমাদের ভারী বয়েই গেল। স্রেফ ছাগলামি দেখলে টেম্পার চড়ে যায়।

—তার মানে তুমি বলতে চাও আমি আর সরখেল ছাগলামি করছি? বলি যে ঐ সন্ধান কে দিয়েছিল? আমরা কি জানতাম।

—আমি বললাম একটা কথার কথা, একটা জ্ঞানের কথা। আর অমনি ওনারা নেচে উঠলেন।

—চোপ! মরে গিয়ে ভেবেচে মাতা কিনে নিয়েচে!

—ওই মাথা কেনার থেকে একটা ডাবের খোলা কুড়িয়ে নিলেও লাভ আছে।

এই ধরনের বাদানুবাদের মধ্যেই ভদির গোঁ গোঁ শব্দ ও ভাবভঙ্গি দেখে বেচামণি ধাক্কে ওর ঘুম ভাঙায়।

—অ্যাঁঃ

—অ্যাঁ আবার কী? পেট গরম হয়েচে। বুঝেচ? পেট গরম।

—অ।

—কী যে কতার ধারা কিছু বুঝি না বাবা।

ভদি উত্তর দেয় না। ঘটি থেকে জল গলায় ঢালে। কিছুটা জল হাতে নিয়ে ভুঁড়িতে মাখে। ঘাড়ে, গলায় দেয়। বেচামণি শুয়ে পড়ে।

—কত বলি যে অত মাল খেওনি।

—থামো তো। কী হচ্চে না হচ্চে তা ঐ ঘটে ঢুকবে? প্যাঁকর্ প্যাঁকর্ করছে। মাগ মাগের মতো থাকবে।

—ও...ও...কী একেবারে পাটরানি করে রেখেচে আর দুবেলা মাগ্, মাগ্...

—তা মাগ্কে মাগ্ বলবে না তো কী বলবে?

ঘোর কলির এই অন্ধকারে বেচামণির ফুঁপ্ ফুঁপ্ শোনা যায়। অনুতপ্ত ভদি অন্ধকারে ওপর দিকে হাত বাড়ায়। সেই হাত বেচামণির স্যাম্পু করা চুলরাশির ওপরে বিলি কাটার ধান্দা করে। বেচামণি নিজের হাতে ভদির হাতটি ধরে সরিয়ে দেয়। হাতের বালা-চুড়ির শব্দ হয়। ভদি কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে। ফুঁপ্ ফুঁপ্। নাক টানার শব্দ করে বেচামণি। ফের ভদির হাত ওপর দিকে বাড়তে থাকে।

অক্টোবর, '৯৯-এর শেষ হপ্তায়—কলকাতায় একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু পাবলিক, বিশেষত বাঙালি পাব্লিক আজকাল এত আমোদগেঁড়ে হয়ে পড়েছে যে কোনো কিছুই টিভিতে না হলে তাদের নজরে পড়ে না। অতীতে যে মনস্বী বাঙালিরা ছিলেন তাঁদের এক জায়গায় জড়ো করা সহজ নয়। কিন্তু নেতাজী ইনডোর বা সল্টলেক স্টেডিয়ামে তাঁদের একটি জমায়েৎ বানিয়ে 'ব্রজাঙ্গনা'-র দুটি লাইন (পুরন্দরের নয়, মাইকেলের) প্রশ্ন হিসাবে রাখাই যায়।

'কেন এত ফুল তুলিলি সজনি, ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী তারার মালা?'

যাই হোক, যা হবার তা হবেই। এতে ভগবানের থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু আমাদের

pathagar.net

কোনো হাত নেই। একটা আস্ত জাত যখন ভোগে যাবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয় তখন তার জন্যে ইনিয়ে বিনিয়ে কোনো ফায়দা নেই। যাচ্ছে নিমতলায়। হাতে সেলফোন। এমন আঁট করে ধরে আচে যে শেষ অবদি ছাড়ানো গেল না। শেষে বাধ্য হয়ে সেলফোনসমেতই।

এই চিত্তাকর্ষক ঘটনাটি হল টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের পেছনের ফাঁকা জায়গা থেকে যখন ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এসে ঢোকে তখন একটি বিশাল দাঁড়কাক চার নম্বর কামরার ছাদে গুটি হয়ে বসেছিল। একাধিক দিনই এরকম ঘটে। বোঝাই যাচ্ছে যে দাঁড়কাকটি ডানার পরিশ্রম বাঁচাচ্ছে। এবং সে এসপ্ল্যানেড, চাঁদনি ও সেন্ট্রাল স্টেশনে নেমে প্ল্যাটফর্মে নাচানাচিও করেছিল। এই দাঁড়কাকের পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। শুধু মেট্রোরেল নয়, তাকে ট্রামের ছাদে বসেও এদিক ওদিক ট্রিপ মারতে দেখা গিয়েছিল যদিও কারোরই নজরে পড়েনি। আগে ভদির বাবাকে কালীঘাট চত্বরেই হিঁয়া হুঁয়া ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। কখনো খানকদের ঘরের চালের ওপরে বসে ঠুকরে ঠুকরে পাঁউরুটি খাচ্ছে বা মায়ের মন্দিরের পেছনদিকে ভিড়ভাট্টার ওপরে বসে পাঁঠাবলি দেখছে। একই ট্রেনে চাঁদনি থেকে জালি বার্বি পুতুল নিয়ে বড়িলাল কালীঘাটে এসে নেমেছে। কিন্তু তার কামরার ওপরেই যে দণ্ডকাক আসীন তা সে টেরই পায়নি। নানা আড়াল এইভাবে বিভিন্ন চরিত্রকে স্বস্ব ক্ষেত্রে দিকপাল হয়ে উঠতে সাহায্য করে। এরকম আড়ালই বিবিধ প্রস্রাবাগারে আমরা দেখেছি। অবশ্য এখানেও উঁকি মারামারি চলে। যারা উঁকি মারে তারা যে সকলেই হোমো এমনটিও নয়। এ নিয়ে বরং পরে কিছু ফাঁদা যেতে পারে। তখন কিন্তু ভাই কোনো রাখঢাক থাকবে না।

২৭ অক্টোবর ১৯৯৯ বিকেল যখন চলছে, তখনই ভয়ানক এক দুর্ঘটনার করাল গ্রাস থেকে কমরেড আচার্য যেভাবে বেঁচে যান তা আর কেউ না জানলেও কমরেড আচার্য জানেন। সেদিন পার্টি অফিসের দোতলায় কোনো ঘরে কেউ ছিল না। এমনটি কমই হয়। টেবিলের ওপর ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের কালো পাথরের মুণ্ডুটি একদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে কমরেড আচার্যের ঝিমুনি ধরেছিল। একে ঠিক ঘুম বলা যায় না। এমনিতেই নানাবিধ ধকল ও পার্টির মধ্যে কট্টরপন্থী ও উদারপন্থীদের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের জেরে সব নেতাই অল্পবিস্তর নাজেহাল। তার মধ্যে আবার কমরেড আচার্যের অবস্থাটা একটু করুণ সুরে যেন বাঁধা। তার কারণ এই আভ্যন্তরিক খিঁচ-এ ঠিক কোন সাইড নিলে ঠিক হবে এটা তিনি কিছুতেই হদিশ করতে পারছেন না। ঝিমুনির ঘোর ঘিরে এল। এর পরের ধাপটাই হল ঘুমের সেই ভাগ যেখানে চোখের তারা বড় বেশি নড়াচড়া করে। স্মৃতি সততই সুখের। কমরেড আচার্য দেখলেন যে তাঁর মার্কা মারা সাদা ধুতি, সাদা পাঞ্জাবি নয়, গরম প্যান্ট, ঝোলা ওভারকোট ও মাথায় রুশ বনবেড়ালের চামড়ার টুপি পরে তিনি উত্তর কোরিয়ার পিয়ংগিয়ং বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে আছেন। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়ছে। সামনেই কমরেড কিম ইল সুং-এর এক মূর্তি। মিলিটারি টিউনিক পরা। কিন্তু জীবন এতই জটিল দ্বান্দ্বিকতায় পরিপূর্ণ যে কমরেড আচার্য এই অনুপম দৃশ্যটি অর্থাৎ কমরেড কিম ইল সুং-এর নিথর, নির্বাক স্ট্যাচুটির দিকে মনোনিবেশ করে ধ্যানস্থ হতে পারছেন না অথচ সেটাই দরকার ছিল। এটাতে বাদ সাধছে একটি গান যার রচয়িতা ইন্দরজিৎ সিং তুলসি এবং সুর রবীন্দ্র জৈন-এর। 'চোর মচায়ে শোর' ছবিতে কিশোর কুমারের সেই সুপারডুপার হিট,

ঘুঙ্গরু কি তরহ বজতা হী রহা হুঁ ম্যায়ঁ
কভি ইস পগমে কভি উস পগ্‌মে...

চটকাটি টুটে যেতে বিস্মিত কমরেড আচার্য দেখলেন যে কমরেড কিম ইল সুং হাওয়া কিন্তু জানলা দিয়ে কিশোরের কণ্ঠস্বরটি আসছে। হায়, ঘুঙুরের কী নিদারুণ যন্ত্রণা। দিল্লিতে

বসে কম্পিউটার ঘাঁটাঘাটি করলে যদি সব কিছু বোঝা যেত তাহলে তো চিন্তাই ছিল না। ফোন বেজে উঠল। বাজুক। না ধরলেই হবে। কিন্তু এই ঝিমুনি! সেটার কী হবে? উপায়ান্তর না দেখে কমরেড আচার্য একটি কিংসাইজ সিগারেট ধরালেন এবং এই সিনথেসিসে উপনীত হলেন যে ভেতরের বারান্দায় একটু লং মার্চ করে নিলে কেমন হয়? এই সিনথেসিস যে আলেয়ার আলোর ভৌতিক আয় আয় ডাক তা দ্বান্দ্বিক জড়বাদী প্রজ্ঞা কি কখনো মানতে পারে? কখনোই না। এবং যেমন ভাবনা তেমন কাজ। সবে হাঁটতে শুরু করেছেন, এমন সময়,

—পড়বি! পড়বি!

সতর্কবাণী যখন কানে ঢুকেছে তখন কিন্তু কোলাপুরি চটিতে ধুতি জড়িয়ে কমরেড আচার্য পতন ও মূর্ছার ঠিক আগের সিঁড়িতে। ভাগ্যে সামনের রেলিংটা ছিল। বিপদ কেটে গেছে। বাঁ হাতই বাঁচিয়েছে তাঁকে। সাবাস। কিন্তু কে বলে উঠেছিল,

—পড়বি! পড়বি।

কেউ তো নেই। তবে রা কাড়ল কে? পরিশুদ্ধ বাংলা। যাকে যোগ্য মর্যাদা দেবার জন্য আজ বাংলা মা-এর কতিপয় দামাল ছেলে উঠেপড়ে লেগেছে। একেবারেই সেই বাংলাতেই, হুবহু, কোনো জর্জিয়ান টান নেই,

—ভেবেছিস ফটো বানিয়ে রেখে দিয়ে পার পেয়ে যাবি?

এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে কমরেড আচার্যের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে পাইপের ধোঁয়ায়।

—কমরেড স্তালিন!

—থাক্। ওসব ন্যাকামি আমি অনেক দেখেছি। ভেবেছ মালটা কিছু বোঝে না। আমি বুঝি না। অ্যাঁঃ আমি বুঝি না, তুই বুঝিস। কালকা যোগী। ঠিক টাইমে হাতে পড়লে তোর এই দোনামোনা ন্যাকড়াপনা ঘুচিয়ে দিতাম।

—সে তো জানি কমরেড।

—ঘেঁচু জানো। আর ফের যদি আমাকে কমরেড বলবি তো এক থাবড়া মারব। বিপ্লব করেছিস? কাকে বলে জানিস?

কমরেড আচার্য মাথা চুলকোন।

—করিস তো শালা ভোট। আর কিছু করতে পারবি বলেও তো মনে হয় না। যেগুলো আলটুফালটু গাঁইগুঁই করছে সেগুলোকে এত তোয়াজ করছিস কেন?

—ঠিক তোয়াজ নয় স্যার। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা আত্মপক্ষ...

—থামলি কেন, বলে যা—

—মানে স্যার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা ওদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যেখানে দু মাস বরাদ্দ সেখানে তিন মাস...

—কেন? সময় কি মাগনা না ফাউ? আর তুই, ওদের কথা বাদ দে, তোর মনটা কোন দিক? সেটা ঠিক করেছিস?

—আজ্ঞে, আপনিই বলে দিন। কিছু তো ভেবে উঠতে পারছি না।

—আর পেরে দরকার নেই। তোরও ভাগ্যে দেখছি... যাক্ শোন, যা বলি মন দিয়ে। আমার মতে এটা কোনো প্রবলেমই না। কুকুর যেভাবে বমির কাছে ফিরে যায় সেভাবেই ওরা বুর্জোয়া গলতায় গিয়ে ঢুকবে... তুইও কি ওদের দলে ভিড়ে...

—না স্যার যা ভাবছেন তা না... আমি শুধু চাই যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে...

—আমার কাছে ওসব প্যানপেনে ওজর শুনিয়ে কোনো লাভ নেই। গণতন্ত্র! হাতি ঘোড়া

তল পেল না, কালকা যোগী উনি এসেছেন গণতন্ত্র মারাতে, গণতন্ত্র, তবে শুনবি? শুনবি কীভাবে ব্যাটাদের টিট করতে হয়? বুকের পাটা আছে?

—আঁজ্ঞে ইদানীং হার্টটাই থেকে থেকে ধড়ফড় করে।

—তাই তো করে। করতে করতে এক সময় আর করবে না। খুবই যুক্তিপূর্ণ ও সহজ সমাধান... হাঃ হাঃ হাঃ কীরকম লাগছে? লৌহ মানবের হাসি? একনাগাড়ে ক বোতল ভদকা খেতে পারবি?

—ক বোতল কী বলছেন? একটু খেলেই তো...

—তোদের দৌড় আমার জানা আছে। সাধে কি আর দুনিয়া জুড়ে এই হাল? ভুলটার জন্যে এখনও হাত কামড়াই।

—ভুল, মানে আপনার?

—আমার না তো কার? অতগুলোকে মারলুম, নামের লিস্ট আসত। নামের পাশে লিখতাম— নীল পেন্সিলে 'For Execution.J.St.' আর্মিতে যখন পার্জ চলছে তখন একটা নামের পাশে শুধু 'The camps' লিখেছিলাম। বুঝলি? অন্য কাজ ঘাড়ে এসে পড়লে লিস্টগুলো যেত মলোটভ, কাগানোভিচ, ভরোশিলভ, শ্চাদেনকো বা মেখলিস-এর কাছে। ওরা ঝুটঝামেলায় না জড়াবার জন্যে 'For Execution'-ই লিখত। বুঝলি, সে একটা সময় ছিল। সেই তালে ইউক্রেনের মোটকাটাকেও ঝেড়ে দিলে হত।

—মানে, নিকিতা খ্রুশচভ?

—লেখাপড়া করেছিস দেখছি। যতটা ছাগল ভেবেছিলাম ততটা নয়। অবশ্য বেশি লেখাপড়া করা ভালো নয়। ট্রটস্কি বা বুখারিন তো কত পড়েছিল। কোনো লাভ হল? বেশি পড়লে মাথা গুলিয়ে যায়। কিছু একটা কড়া সিদ্ধান্ত নিতে গেলে মনে হয় অ্যা-ও হয় অ-ও হয়। এর ফলে সময় হাতছাড়া হয়। এবং ঐ হাতছাড়া সময়টাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিবিপ্লবী ঘোঁট আরো মুঠো শক্ত করে ফেলতে পারে। তাই এখন মনে হয় আমার আরো নির্মম হওয়া উচিত ছিল। আরো। আরো! অথচ আমি ভেবেছিলাম আমার শত্রুর শেষ না রাখার নীতিটা সফল হবে।

—হয়নি?

—হলে এই দশা হত? ১৯৩৫ এর ২৪ আগস্ট কী হয়েছিল জানিস? পাইপের ধোঁয়া ঘুরপাক খায়। স্লাভ ভাষায় কিছু চিৎকার। গুলির শব্দ।

—আজ্ঞে না।

—জিনোভিয়েভ, কামেনেভ আর স্মিরনভকে গুলি করে মারা হয়। তখনই স্মিরনভের বউ আর মেয়ে ওলিয়া-কে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩৭-এ দুজনকেই গুলি করা হয়। ঐ বছরেই জিনোভিয়েভের ছেলে স্তেপান রাদোমিস্‌লস্কি-কে গুলি করা হয়। কামেনেভ-কে মারার কয়েকদিনের মধ্যেই তার প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রীকে গুলি করা হয়। ১৯৩৯ সালে কামেনেভের বড় ছেলে আলেকজান্ডারকে গুলি করা হয়েছিল। অবশ্য এর আগেই,১৯৩৮-এর ৩০ জানুয়ারি কামেনেভের আর এক ছেলে ইউরিকে গুলি করা হয়েছিল। ছেলেটার বয়স তখন ১৬ বছর ১১ মাস। কামেনেভের নাতি ভিতালিকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৯৫১ সালে। ওর বয়স তখন ১৯। ২৫ বছরের কারাদণ্ড হয় তার। ছেলেটা ১৯৬৬-তে মারা যায়। এত মেরেও এত ধরেও পারলাম না। কোথাও একটা নরম হয়ে পড়েছিলাম। কোথাও একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। যা বললাম এবার বসে বসে ভাব। আলগা দিবি কি মরবি। বুঝলি?

—আঁজ্ঞে বুঝেছি।

—যাই হোক, আমি আবার আসব। সামনের ইতিহাসে অনেক স্তালিন আসবে। স্তালিন

যেমন আসবে তেমন জানবি হিটলার, তোজো, চার্চিল, রুজভেল্ট, ট্রুম্যান, টিটো সব ফের আসবে। তবে সবই ডামি। আসলি মাল আর হবে না।

—কী হবে তাহলে?

—তোর মতো উটকো কতগুলো ভোঁদড় জল ঘোলা করবে। আবার কী হবে?

পাইপের ধোঁয়া কমরেড জে. ভি. স্তালিনের ফটোর কাচের মধ্যে গিয়ে ঢুকতে শুরু করে। সব চুপচাপ। হাতের কিং সাইজ সিগারেট কখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। মাথা তো নয়, চাকতি।

কমরেড আচার্য ধীর পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন। মাথা ধরেছে। মাথাটাই বোধ হয় একবার ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া ভালো। ডিপ্রেশন না অ্যাংসাইটি— কী কারণে এমন হচ্ছে?

২৭ অক্টোবর, সন্ধেবেলায় কালীঘাট ট্রাম ডিপোতে একটি প্রাচীন ৩০ নম্বর ট্রাম ঢুকছিল। তার মাথার সেই দাঁড়কাক বসেছিল। এরপর সে পার্কের দিকে উড়ে যায়।

গোড়ার থেকে যাঁরা সস্নেহ মেহনত সহযোগে 'কাঙাল মালসাট' নামক ডুবোজাহাজটি (এখনই ডুবন্ত বা জাহাজডুবি জাতীয় অমাঙ্গলিক শব্দ ব্যবহার ঠিক হবে না) ফলো করছেন তাঁরা কেন, ভূভারতে সকলেই জানে যে, ২৮ অক্টোবর সেই খুলি নাচ হয়েছিল (প্রথম পর্ব দ্রষ্টব্য)। এরপর সাবমেরিনটি আবার ভুস করে ২১ কার্তিক অর্থাৎ ৭ নভেম্বর ১৯৯৯ ভেসে উঠবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করেছেন। যাঁরা অভব্য বাগাড়ম্বর পছন্দ করেন না, খিস্তি শুনলে যাঁদের কানে তালা লাগে তাঁরা স্বচ্ছন্দে এই ঘোরালো ঘটনার জন্যে অপেক্ষা না করে একের পর এক মুহ্যমান ও নেয়াপাতি গাধাবোট দেখে যেতে পারেন। তবে ছোট করে দুটো কথা। বেশি রাত অবদি গঙ্গার ঘাটে বসে না থাকাই ভালো। এবং ২১ কার্তিক অর্থাৎ ৭ নভেম্বর কালী পুজো।

২২	৬	৬		
১৮	৪	৩		
১৬	৪	৪		
২৫	১০	৪	৩	১

(চলবে)

৬

গত কিস্তিতে বা আগের অধ্যায়ের শ্বাস ওঠার সময় আমরা পর পর চারলাইনে যে রহস্যময় সংখ্যাগুলি সাজিয়ে ছিলাম তার প্রথম তিনটি পাতি লাল উড়ন তুবড়ির এবং শেষেরটি ইলেকট্রিক উড়নের ভাগ। আজকাল মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে যে নিরামিষ কালীপুজো চলছে তা এক অকহতব্য নিগ্রহ। বুড়ীমা-র চকোলেট, বাচ্চু ক্যাপটেন, সাচ্চু ক্যাপটেন, কালীবোম + পটকা + ধানী কলকাত্তাওয়ালীকে, একেই ন্যাংটো আরও হতশ্রী করে তুলেছে। উড়ন অবশ্য ৬৫ ডেসিবেলের ক্যাচালের আগেই ব্যানড্ হয়েছিল। তারও আগে আমরা নিষিদ্ধ হতে দেখেছি চটপটি, ছুঁচো বাজি, লোকের পিঠে মারার ভুঁই পটকা। এখনো গরিবদের পাড়ায় একটি দুটি মুহ্যমান চকোলেট বা আশার আলো চাগিয়ে তোলা উড়ন দেখা যায়। আতশবাজি কোনো নক্সাল চক্রান্ত নয়। বছরে একবার ধুন্ধুমার বাজি পোড়ালে ধোঁয়ায় নানা অপকারী ও উপকারী কীটপতঙ্গ যেমন শ্যামাপোকা ও মশা, খতম হয়। গন্ধকের ধূম কিছু হিংস্র জীবাণুকে ত্রাসে আক্রান্ত করে।

pathagar.net

পরন্তু ঐ একটি দিন বাঙালি যুদ্ধের একটু আঁচ পায়। কিন্তু কিছুই হবার উপায় নেই। যারা ছোটবেলা চাবিকামান দিয়ে হাত পাকিয়েছিল পরে তারা সহজেই পাইপগান ধাতস্থ করে ফেলে। মাইখেকো বাচ্চারা অবদি তুড়ি মেরে ৭২-১১-১১ ভাগে বারুদ বানিয়ে দড়ি বোমা বানাত। এই দিয়ে যার অচেনার ভয় কেটেছে সে তো পরে মলোটভ ককটেল না ঘেঁটে ছাড়বে না। নিদেন পক্ষে পাতি পেটো তো বাঁধবেই। সবাই এখন দাদু নাতি নির্বিশেষে ফুলঝুরি জ্বালাচ্ছে বা অসীম সাহসে বাপের মালের বোতলে বসিয়ে রকেট ছাড়ছে। এই বাঙালি ভবিষ্যতে ল্যাকটোজেন দিয়ে ভাত মেখে খাবে আর যৌবনে বগলে পাউডার দিয়ে সরকারি নন্দন চত্বরে গিয়ে ঝোপেঝাড়ে ঠেক খুঁজবে। অথচ এই বাঙালিই হেভি মারাকু টাইপের ছিল। বাঙালি, স্মরণ করো যে পেলের ব্রেজিলের স্বাধীনতার লড়াইতে কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের অঙ্গুলি হেলনে কামান গর্জন, স্মরণ করো সেই নমস্য বাঙালিদের যাঁরা নেটিভ রাজাদের জন্য মেশিনগান ও কামান বানাতেন। তুমি কি মউজার পিস্তলের গর্জন বিস্মৃত হয়েছ? লুইস গান, দমদম বুলেট, উইনচেস্টার রিপিটার ইত্যাদি নাম কি তোমাদের হুঙ্কার ছাড়তে প্রলুব্ধ করে না? তবে তুমি মায়ের ভোগে যাও। বহু জাত যেখানে গেছে। যেখান থেকে কেউই ফেরে না কারণ ভিসা পাওয়া যায় না। অবশ্য এতে করে নিজেদের স্পেশাল টাইপের ঢ্যামনা ভাবার কোনো কারণ নেই। আজ যারা বেশি প্যাঁকপ্যাঁক করছে কাল তারাও একই গলতায় যাবে। সেখানে আগে থেকেই ডাইনোসর ও ম্যামথেরা মালা হাতে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইতিহাস হল এক ঝকমারি প্রহেলিকা। আগে শুনতাম আরামবাগের গান্ধী। এখন আরামবাগ বললেই বাঙালি জানে যে কেঁদো কেঁদো রাক্ষুসে চিকেনের কথা বলা হচ্ছে। সেই চিকেনের একটি ঠ্যাঙ দেখলেই ভয় করবে। ভাগ্যে তাদের জ্যান্ত দেখা যায় না। তবে হ্যাঁ, বাঙালির ফুড হ্যাবিট খুবই আগুয়ান। সে এখন বাড়িতেই রেঁধে, অবহেলায়, চিকেন মাঞ্চুরিয়ান খায়।

১৯৯৯-এর কালীপুজোয় এবার 'কাঙাল মালসাট' ঢুকবে। এটি বেশ বড়ো স্টেশান। জংশন। তার আগে দুটি টিকিয়াপাড়া মার্কা ছোট স্টেশানে গাড়ি না দাঁড়ালেও বলে রাখা দরকার যে :

(১) কবি পুরন্দর ভাট অবজ্ঞার গ্লানি আর সহ্য করতে না পেরে সুইসাইড করেছে। ছিটকিনি টানা বন্ধ ঘরের থেকে বিকট পচা গন্ধ পেয়ে লোকে দরজা ঠেলে দেখে মড়া নয়, মরা ইঁদুর। দেওয়ালে পুরন্দর ভাটের একটি ছবি। মালা পরানো। এবং তলায় সুতো দিয়ে বাঁধা একটি কাগজ যাতে ব্যর্থ কবি পুরন্দর ভাটের ইহজীবনের শেষ কবিতাটি লেখা। লেখাটি দেখলে অবশ্যই জ্ঞানী পাঠকদের এসেনিন ও মায়াকোভস্কির আত্মহননের আগে লেখা শেষ কবিতাগুলির কথা মনে পড়বে। না মনে পড়লেও ক্ষতি নেই। বক্তব্যটি এই প্রকার।

চুতিয়া পৃথিবী
পুরন্দর ভাট
(১৯৪৮-১৯৯৯)

আমার জীবনে নাই কেন কোনো ড্রামা
তাই দিব আমি কার্পাস ক্ষেতে হামা
আমার জীবনে নাই কেন কোনো ড্রিম
টিকটিকি আমি, পোকা খাই, পাড়ি ডিম
আমার মরণে হয় না তো হেডলাইন
প্রাসাদ গাত্রে মুতিয়া ভাঙিব আইন

আমার মরণে কাঁদিবে না কোনো মেনি
লেডি ক্যানিং-এর নাম থেকে লেডিকেনি
এক পা স্বর্গে, এক পা নরকে, ঝোলা
একটি কামান, দুটি কামানের গোলা।

কবিতাটি পড়ে পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় ইস্কুল মাস্টারের সংলাপ :

—কিছু বুঝলেন?

—মারাত্মক!

—মানে?

—অ্যাসটাউন্ডিং ইমেজ সব। অথচ কোনো রেকগনিশন পায়নি। আমি তো নামই শুনিনি।

—পুরন্দর ভাট? নামটা কী? বেঙ্গলি?

—সে বলা যায় না। বিহার বা উড়িষ্যা বর্ডারেরও হতে পারে। বোধহয় ভট্ট থেকে ভাট হয়েছে।

—বাঃ এই তো একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট পাওয়া গেল। ফ্রম ভট্ট টু ভাট।

—কিন্তু লোকটা গেল কোথায়?

—ওসব পোয়েট ফোয়েট মানুষের কিছু বলা যায় না মশাই। হয়ত গঙ্গায় ডাইভ দিয়েছে। এতক্ষণে স্যান্ডহেড।

—অসামান্য। কবিতাটি আমি টুকে নেব?

—নিন। বুঝতে পারছি কেসটা সুইসাইড। কিন্তু কনফার্মড না হওয়াতক আমাদের লিখতে হবে 'মিসিং'।

—বডি পাওয়ার পরে?

—চুকে গেল। ফাইল ক্লোজড্।

(২) গোড়ার দিক থেকে যারা এই আখ্যানটি স্টাডি করছেন তাঁরা নিশ্চয়ই ভালুকের হাতে নিহত উপেক্ষিত ঔপন্যাসিক মিঃ বি. কে. দাসের কথা ভুলে যাননি। তিনি তাঁর ডায়রিতে (যা পরে ইঁদুরে খেয়ে নেয়) লিখেছিলেন :

'আমি বড় সাহিত্যিক তাই মাই জব ইজ পাঠককে বানানো ও পরে জবাই করা। মাই পেন ইজ আ নাইফ, ইফ নট আ সোর্ড। ছোটখাটো যে সব ট্র্যাশ অথরস্ আছে তারা রিডারদের মশা বানায় এবং পরে সেই মশার কামড়েই ম্যালেরিয়া হয়ে মরে। আমি অনলি দুইটা নভেল লিখিয়াছি। আর ইহাদের ওটি পেন না পেনিস কে বলিবে? কেবল পয়দা করিতেছে। গড আমার সহায়। এখন ডেভিল যদি একটু মায়ালু হন তো আই ক্যান শেক দা ওয়ার্ল্ড'।

পাঠককে মুরগি বা মশা বলে মিঃ বি. কে. দাস যে ভালো করেননি তা কে না জানে। আসামের জঙ্গলে আচমকা ধৃত ভালুক শিশুর ক্রন্দন, ধেড়ে ভালুকদের ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ আস্ফালন, মিঃ বি. কে. দাস-এর অন্তিম গোঁ গোঁ আর্তনাদ, ভীত বাঁদরদের চ্যাঁ চ্যাঁ চিৎকার— এই ট্র্যাজেডি 'হেকটর বধ' হইতে কোনো অংশে কম যায় না।

অরিজিন্যাল টালিগঞ্জ থানার অবস্থা এখন প্রাক্তন যুগোশ্লাভিয়ার মতো। মাফিয়া, ছেনতাইবাজ, হেরোইন পেডলার, সাট্টাবাজ, চামড়াচোর (মানে রেপ-এর আসামী) স্মাগলার এবং নতুন গজিয়ে ওঠা লালু ক্রিমিনালদের সঙ্গে রাউডিদের সংখ্যা এমনই কোয়ান্টাম ধাক্কায় বেড়ে চলেছে যে সেসব সামলানো এক থানার কম্মো নয়। ফলে টালিগঞ্জ থানা ভেঙে দু-টুকরো করা হয়েছে। কিন্তু শ্মশান সেই টালিগঞ্জ থানারই আওতায়। বেলগ্রেড যেমন অবশিষ্ট এক ফালি

যুগোশ্লাভিয়াতেই থেকে গেছে। তা হলেও, পুরনো হাতি বলে কথা।

৭ নভেম্বর ১৯৯৯, মা কালীর পূজা। সকাল থেকে নীরবে নিরুপদ্রবেই কাটছিল সিভিল সোসাইটির কালীপুজো। মালের দোকান বন্ধ। প্রত্যেকবারই থাকে। তাতে কার কী ছেঁড়া যায়, কেউ জানে না। কারণ আগের দিন দোকানে দু-তিন মাইল লাইন পড়ে। শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল। এশীয় বর্বরতার চিহ্নমাত্র নেই। উপরন্তু পরিশ্রমী ব্ল্যাকাররা বস্তা বস্তা মাল নিয়ে গিয়ে স্পেশাল স্টক করে। কলিকাতার কালীপুজোর আগেকার রূপটি আমরা যেমন রসঘনভাবে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'কালীপুজোর রাত'-এ পাই যে তারপর আর কোনো পাঁচুকেই ভাবা যায় না। সবই প্রায় আলগা ঠাসা বসন তুবড়ি যা থেকে থেকে ভ্যাঁস ভ্যাঁস করে এবং অচিরেই নিঃশেষিত তামাশায় পর্যবসিত হয়। কলির কলকাতায় হালফিল সাহিত্য ও বাজি বানানো মোটের ওপর একই চেহারা নিয়েছে। সোরা, গন্ধক, কাঠকয়লা বাদেও কতই না পদার্থের যোগান পড়িত। তখন অবোধ শিশুরাও বলিয়া দিত লাল তারা চাহিলে ভূষা কালি ও গন্ধক ছাড়াও পটাস্ ক্লোরস্ ও শুকনা নাইট্রেট অফ স্ট্রান্সিরা লাগিবে। এমনই একটি জায়েন্ট লাল তারা ক্রেমলিনের উপরে জ্বলিত। সবুজ তারা চাও? নাইট্রেট অফ ব্যারাইট ও হরিতাল জোগাড় করো। নীল তারা না হইলে মন ভরিতেছে না? কিন্তু ভাই, নিদেনপক্ষ দুই ভরি কাশ্মিরী জাঙ্গাল তো লাগিবেই। অবাক কাণ্ড যে বাজি-বোম ইত্যাদির সঙ্গে কাশ্মীরের যোগ সূত্র কী প্রাচীন! ফুলের মালা, বাতাসা, মতিয়া, লাট্টু, আনারসী, চন্দ্রমল্লিকা, দায়ুদী, হাজরা, গাঁদা, জুঁই, নসরিন— এ সবই নানা ধাঁচের তুবড়ির ডাক নাম। হায়! হায়! তখন দাদুগণ বলিত, 'বোমা? এতো ছেলেখেলা। নারিকেলের ছোট খোলে ছিদ্র করিয়া বন্দুকের দানা-বারুদ পুরিবে এবং ঐ ছিদ্রে লম্বা পলিতা দিয়া খোলের চর্তুদিকে উত্তমরূপে পাট জড়াইবে। এই বাজি পুষ্করিণীতে ফেলা ভালো। স্থলে পোড়াইলে বিপজ্জনক হইতে পারে।' আজ বাঙালি এইসব শুনিলে ভ্যাবাচ্যাকা মারিয়া যায়। বাঙালি যে কেবল বোম দিয়া সাহেব বা স্বজাতি মারিত এমনই নয়। দেশ স্বাধীন হইবার পর একটি ভারতীয় সেনা অভিযাত্রী দল পিণ্ডারি গ্লেসিয়ারে যায়। সেই দলে ছিলেন ক্যাপটেন শ্রী হেমেন্দ্র চন্দ্র কর, এম-এ। তিনি লিখিয়াছেন— 'আমাদের রাস্তার পাশেই সরযু নদী। পথ চলিতে চলিতে আমাদের হঠাৎ মাছ ধরিবার সখ হইল। সময় অল্প। তাই এক অভিনব উপায় অবলম্বন করা গেল। একটা গ্রেনেড (হাত বোমা) জলে ছুড়িয়া ফেলা গেল। অমনি জলের মধ্যে একটা তীব্র আলোড়ন শুরু হইল এবং ছোট বড় প্রচুর মাছ জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। মাছগুলি সংগ্রহ করিলাম।' সেই বাঙালি আজ ত্রস্ত বেড়ালের মতো, ভীত মার্জারের ন্যায় মাছের বাজারে চক্কর মারে ও ম্যাও ম্যাও করিয়া ক্রন্দন করে। বাঙালির লোম পড়িতেছে, লেজ ভিজা ও গোঁফ যা আছে তাহাতে তা দেওয়া সম্ভব নয়।

সাড়ে সাতটা, পৌনে আটটা— দুটোর একটা হবে— থানার ঘোড়েল ইনফর্মার গগন চূড়ান্ত উত্তেজিত হয়ে টাকলা ও. সি.র ঘরে ঢুকে পড়ে। মুখে অল্প রামের গন্ধ। হাতে স্তম্ভিত বিড়ি।

—স্যার! স্যার! ওফ্ ল অ্যান্ড অর্ডারের একেবারে গাঁড় মেরে দিয়েছে স্যার। আপনি ফোর্স নিয়ে না গেলে বানচোৎদের ট্যাকল করা যাবে না।

টাক্লা ও. সি ঘপ্ করে টুপিটা পরে নিল।

—কোথায়? কোন শালা?

—ওফ্ শ্মশান পেরোলেই দেখবেন। আদ্যিকালে এপারে ওপারে উড়নের ফাইট হতো। হাজারে হাজার, মানে অত না হলেও অন্তত শয়ে শয়ে উড়ন ছুটছে। সে কি খিস্তি আর খিল্লি। মাদি, মদ্দা সব লাফাচ্ছে আর ডিং মেরে মেরে চিল্লোচ্ছে।

—উড়ন? ইউ মিন উড়ন তুবড়ি। মালটা তো ব্যান্ড। পাচ্ছে কোত্থেকে?

—আপনি মাইরি বড় আলফাল বকেন। ব্যান্ড! গিয়ে দেখবেন চলুন ঐ বালের ব্যান্ড কেউ মানছে না। ওপারে জেলেপাড়া ন নম্বর বস্তির সব মাল। এপারে কালীঘাটের যত ক্যাওড়া। সেইসঙ্গে বোম যা ফাটছে। একেবারে ফ্রন্ট বলে মনে হবে স্যার।

—এই। এই, কী যেন নাম তোমার। গাড়ি বের করতে বল তো। আমার জিপ যাবে। সঙ্গে ...ফোর্স নেব?

—আগে আপনি দেখুন। গাদাগাদা লোক। হ্যাজাক জ্বেলে নানা দলও আসছে। কেমন যেন ঠেকচে। গায়ে তেল, হাতে কানচাপা লাঠি। ঠিক বুঝতে পারছি না কেসটা। আচ্ছা স্যার, বামফ্রন্ট গওরমেন্ট ফলটল করেনি তো?

—কি যে বকো না তুমি? কথার একটা ছিরিছাঁদ নেই। মালটাল পেঁদিয়ে কি দেখতে কি দেখেছ।

টালিগঞ্জ থানা থেকে জিপটি বেরিয়ে রাসবিহারীর দিকে ঘুরেই বাঁ দিকের গলতা ফুটো করে ঢুকে গেল। টাকলা ও. সি, খোঁচর ও কনস্টেবল্ কেউই জানল না যে ওপরে কালো জোব্বা পরে মদন ও ডি. এস উড়ে উড়ে ফলো করছে। ডি. এস ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে কাঁদছে।

—শালা পুরন্দরের বাচ্চা। সুইসাইড করে কালীপুজোটা একেবারে ঝুলিয়ে দিল। কত কী ভেবে বাংলা-র স্টক করলাম। আর... আমি কিন্তু ভেতর থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। সুইসাইড অথচ আমরা টের পেলুম না?

—আমার বাবা না আঁচালে বিশ্বাস নেই। ব্যর্থ কবি। সুইসাইড করতেই পারে। করবি তো বাবা বেগন ফেগন কিছু চোঁ চাঁ মেরে দে। তা না, লাশের কোনো পাত্তা নেই। কি জানি, মাথায় ঢুকচে না।

—অপঘাতে মৃত্যু! আবার ভূতফুৎ যদি হয়ে যায় তো বিপদ। কম খচিয়েছি ওকে? এখন বাদ দাও। নিচে দেখ। উরিঃ শালা। একসঙ্গে কতগুলো উড়ন ছাড়চে দেখেচ?

—এঁদো গঙ্গায় রিফ্লেকশন হয়ে আরো বেশি দেখাচ্ছে। বোম কালী।

ডি. এস এবং মদনের চেয়ে অনেক হায়ার অল্টিচুডে গোয়েন্দা উপগ্রহের মতো উড়ছিল বিকট সেই ভদির বাবা দাঁড়কাক। এবং সেও একা ছিল না।

—ডি. এস, আমাদের ভদিদা বলেচে ছাদে বসে সবটা ওয়াচ করতে। কিন্তু সব ছাদে তো লোক!

—বরং আমরা ঐ ঘোড়ানিম গাছটায় গিয়ে বসি। ওখান থেকে বিস্তর দূর অবদি দেখা যাবে।

—প্ল্যানটা মন্দ বাতলাওনি। এদিকটাও ক্লিয়ার। ওপরটাও। এদিক ওদিক দুদিক দেখে চুমুক মারো দুধের বাটি!

টাকলা ও. সি জিপ থেকে নামতেই অভ্যর্থনা জানাতে যারা দল বেঁধে এগিয়ে আসে তাদের হেডলাইটে দেখে ফিসফিস করে ইনফর্মার বলে,

—এদের ঘাঁটাবেন না স্যার।

—কেন! আর্মড?

—না স্যার, এরা কেউ মানুষ নয়। ভূত। এরা শ্মশানের রংবাজ ছিল। কবে মরে গেচে।

—বল কি ভায়া?

—হ্যাঁ নক্সাল আমলে অনেকে রিটায়ার্ড।

—আসুন স্যার! আসুন! সব কিছু একেবারে শান্তিতে চলছে। কোনো ঝুট ঝামেলা নেই।

ইনফর্মার কানে কানে বলে চলে,

—ওদের পেছনে সব বেপাড়ার মস্তান। আজ ওদের গেস্ট। জগা, ভানু, মংলা, ভুতনি, টালি, লন্ডন আর আর ঐ লম্বা কাবলেটা কে জানেন?

টাকলা ও.সি বেজায় ভয় পেয়ে গেছে।

—ও হল সার মিনা পেশোয়ারি। দাঙ্গার সময়ে মার্ডার হয়েছিল।

মাটি কাঁপিয়ে চকোলেট ও দোদমা ফাটে। একটা বড় হাউই আকাশে উঠে গিয়ে বুম করে ফেটে নেতাজির মুখ হয়ে গেল।

—এসব বাজি আর দেখবেন না স্যার। চিনা বাজারে অর্ডার দিতে হয়। আসুন স্যার।

এর মধ্যেই কাচের গাড়ি করে একটা বডি এল। ও. সি ঘামছে।

—মড়াটাও ভূত নাকি?

—হতে পারে স্যার। সবই হতে পারে। আপনি কোনো ট্যা ফুঁ করবেন না।

—পাগল নাকি। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই আমার।

গঙ্গার দুপাড়ে বস্তা বস্তা উড়ন। এপার ওপার চার্জ হচ্ছে। একদিক থেকে অ্যাটাক কমে গেলেই উল্টোদিক থেকে বহুস্বরে 'দুয়ো! দুয়ো!' রব উঠছে। উড়ন কখনো ছোঁড়ার দৌলতে ব্যাংবাজির মতো জলে বাউন্স করে ওপারে ধাওয়া করছে। মাঝে মধ্যে একটা আধটা পটাশ বা ইলেকট্রিক ঝড়ের উড়ন, রাতকে দিন করে দিচ্ছে। সেই শৈল্পিক আভায় দীন ও আনন্দময় ভূতগুলিকে স্পষ্টতর দেখায়। বেশিরভাগই খালি গা ও গামছা পরা। এদেরই বাড়ির মেয়ে ভূতেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে মশলা ঝেড়েছে, গুঁড়িয়েছে, ছেঁকেছে, রোদে দিয়েছে। ভূত শিশুরা লাল উড়নের 'সিটি' খোল ও ইলেকট্রিক উড়নের 'মতিয়া' খোলগুলো ছোট ছোট আঙুলে মশলা দিয়ে ভরেছে যদিও ঠাসার কাজটা সিনিয়র ভূতদের সাহায্য ছাড়া হয় না। অবশ্য কলকাতার লোকেদের এটা জানা দরকার যে কালীপুজোর পরদিন ভোরে যে শীর্ণ শিশুরা আধপোড়া বা নিভে যাওয়া বাজি কুড়োতে বেরোয় তারা ভূত নয় বরং ছোট সাইজের জ্যান্ত মানুষ। ছেঁড়া প্যান্ট দিয়ে নুনু বা পোঁদ দেখা গেলেও তারা লজ্জা পায় না। ঐ আধা-ন্যাংটো হাড় জিরজিরে শিশুদের প্রতি 'কাঙাল মালসাট' এর উপহার।

সোরা	গন্ধক	কয়লা
১০	৩॥	৩।
১০	২	৪
১৮	৩	৩
১৬	২॥	২
১৫	২	২
১৫	২	৩

ওপরের এই ভাগগুলো হল বন্দুকের বারুদের। এ বিষয়ে আর যা যা করণীয় তা ঠিক সাহিত্যের আওতায় পড়ে না।

হ্যাজাকের আলোয় লাঠির বোঁ বোঁ ঘুরণ ও ঠকাঠক সংঘর্ষ। তৎসহ লেঠেলদের লম্ফ ঝম্প ও সিংহনাদ।

টাকলা ও. সি-র কানে এবার অদৃশ্য ভৌতিক রেডিও বাজতে থাকে— 'এরা হচ্ছে সব বাঙালি লাঠিয়াল— নানা আখড়ায় এরা শিক্ষা পেয়েছে। যোগীন্দ্র চন্দ্র, হরিমোহন, কৃষ্ণলাল,

নারায়ণচন্দ্র, মতিলাল আর প্রিয়লাল বসুর আখড়াগুলোই আদি। ঐ যারা পাখসাট মারতে মারতে আসছে ওরা সব নতুন নতুন আখড়ায় শিখেছে। নুটুবিহারী দাস, গোপাল চন্দ্র প্রামাণিক, পাপড়ি আব্দুল, ডেঙো খলিফা, পচা খলিফা— কত নতুন নতুন আখড়া। ঐ ওই তো প্রফেসার এন. সি. বসাক। ওঁর বুকের উপরে ১০২৬ পাউন্ডের একটা পাথর রেখে লোহার হাতুড়ি দিয়ে ভাঙা হয়। ঐ মহিলা হলেন টুকুরানি—বারেল তোলায় ওস্তাদ, তিরিশটা লোক বসা গরুর গাড়ি বুকের উপরে চালায়।' একটি চকোলেট বোমা এসে টাকলা ও. সি-র পায়ের কাছে ফাটে ফলে ও.সি তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে।

—ঘাবড়াবেন না স্যার। ছেলে ছোকরার কাণ্ড। পুজোগণ্ডার দিন বলে কতা, আসুন, আমাদের রাঙ্গাজবা কম্পিটিশনটা একটু দেখে যান। সবে শুরু হয়েচে।

—রাঙাজবা কম্পিটিশন, মানে? কালীপুজোয় আবার ফুলেরও কম্পিটিশন বাঃ বাঃ।

এবারে ইনফর্মার গগন অ্যাকটিভ হয়। এবং তার ব্যাখ্যার সঙ্গে হাসিমুখে মাথা নেড়ে সায় দেয় আদি কলকাতার গুণ্ডারা।

—না, না, এটা ফুলের ব্যাপার নয়। বলচি। একটা বড় ড্রাম থাকে। বুঝলেন। বড়, গোল, কালো ড্রাম। ওতে যে যা মাল আনবে সব ঢালা হয়।

—ককটেল?

—শুনুন না। ককটেলের বাবা। স্কচ, বাংলা, চোলাই, ব্র্যান্ডি, রাম, ভদকা, জিন, ওয়াইন—সব এক জায়গায়। ভরে গেলে একটা রবারের টিউব ডুবিয়ে দেওয়া হয়। একটা স্কেল লাগানো থাকে। তার গায়ে আলতো করে ঠেকিয়ে একটা রাঙা জবা ভাসানো থাকে।

pathagar.net

—তারপর?

—এবার ঐ রবারের টিউব দিয়ে একেবারে টেনে রাঙাজাবা কে বেশি নামাতে পারে সেটা স্কেলে মাপা হয়। এবারে বুঝলেন?

—বুঝলাম।

—অবশ্য ফার্স্ট, সেকেন্ড, লাস্ট সব ওখানেই গড়াগড়ি যায়। অতরকম মালের মিশেল। বুঝতেই পারছেন। আমি কখনো টেস্ট করিনি তবে শুনেচি হেভি ধক্। তাবড়, তাবড় মালখোরকেও ঝট করে ফেলে দেবে।

—চলুন স্যার। একটু না হয় প্রসাদ করে দেবেন। শ্মশানকালী বলে কতা!

—না, না, আমি ওসব খাই টাই না। আপনারা কমপিট করুন। আমি না হয় হাততালি দেব।

—সেকি হয়। আপনি না হয় স্যার আলাদা করে একটু হুইস্কি খান। জাহাজী মাল। এখনো ক্রেট খোলা হয়নি। আর সেই সঙ্গে একটু কষা মাংস। না বললে শুনব না স্যার। আগে স্যার কত মান্যগন্য লোক আসতেন। ওঃ কী যুগ ছিল। গোপালদা এলে তো মেয়েরা উলু দিত।

—গোপালদা, মানে?

—গোপাল পাঁঠার নাম শোনেননি স্যার? তারপর আপনার গিয়ে রাম চাটুজ্জ্যে!

—আরে, শুনব না কেন। কে না শুনেছে? কী গগন, তুমি কী বলো? এনারা এত করে বলচেন।

—তা তো বটেই! তা তো বটেই!

—তাহলে দুপাত্তর টেনে ব্যাক করা যাক। রিফিউজ করলে খারাপ দেখাবে।

—কারেক্ট ডিসিশনটা নিয়েচেন স্যার। ওনলি দুপাত্তর। আপনি যান স্যার। আমরা বরং

এখেনে অপেক্ষা করি।

—সেও কি হয়? মায়ের পুজোয় আপনারা সব স্যারের সঙ্গে এসেচেন। সবাই হলেন অতিথি।

থানায় যখন জিপ ফিরল তখন রাত সাড়ে এগারোটা। সকলেই বেশ টম্বুর।

—তাহলে গগন, শেষে ভূতের হাতে মাল খাইয়ে ছাড়লে। কুঁক্। মাংসটায় বড় ঝাল দিয়ে ফেলেচে। কুঁক্। ভেরি হট!

—তবে মালটা কিন্তু সলিড।

—লেবেলটা পড়েছিলে? কুঁক্।

—হ্যাঁ স্যার। হোয়াইট অ্যান্ড ম্যাকে।

—এসব যে সে মাল নয় বুঝলে? আসলি স্কচ। এক একটা ঝরনার জল এক একটা কোম্পানির হুইস্কিতে, বুঝলে? স্কটল্যান্ড! স্কচ! আরে দূর, নামটা গুলিয়ে গেল।

—হোয়াইট অ্যান্ড ম্যাকে স্যার।

—থ্যাংক ইউ। কুঁক। কত ভালো ভূত বলো তো। মাল খাইয়ে কী আপ্যায়ন। অথচ ইচ্ছে করলেই ক্যালাতে পারত। কারো বাপ ছিল না বাঁচায়।

—ঠিক বলেচেন স্যার।

—তবে ভূতের হাতে মাল খাওয়ার কেসটা না জানাজানি হলেই ভালো, বুঝলে? বদনাম হয়ে যাবে।

—আমি তো এই খিল বন্ধ করলুম কিন্তু ঐ শালারা... মানে কনস্টেবল...

—ধ্যুৎ, এমনিতেই বুদ্ধি কম। তা না হলে দুনিয়ায় এত কাজ থাকতে কনস্টেবল হয়? যে রেটে মাল পেঁদিয়েচে তাতে কাল কিস্যু মনে থাকবে না। কুঁক্।

—স্যার, একটা কতা বলব।

—কী কতা?

—কেমন স্যার ভয় ভয় করচে।

—মা কালীর নাম করে লেটে যাও। আমরা তো আর ভূতের হাট বসাইনি। কুঁক্।

সবারই অলক্ষ্যে বড়িলাল একটা রকে বসে একটা একটা করে মুড়ি-লজেন্স খাচ্ছিল। এবার সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। ডি. এস আর মদন হঠাৎ দেখল সব ভোঁ ভাঁ। জিপ যেই গেল অমনি ফুশ্ করে সব ভ্যানিশ! টিকে পচা, কেলে পচা, লেঠেল, প্রোফেসার বসাক সব হাওয়া। আকাশে যুদ্ধ বিমানের শব্দ। দুজনেই ওপরে তাকাল। গোটা চারেক আলোকিত চাকতি উড়তে উড়তে খেলা করছে। এই চাকতিরই বাহারী নাম ইউ. এফ. ও বা আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট।

ভদি বারান্দায় বসেছিল। ডি. এস আর মদন উঠোনে নেমে মরা ডুম আলোয় ঝিম মারা বারান্দায় উঠল। নলেন স্ট্র দিয়ে চুক চুক করে ফ্রুটি খাচ্ছে। ভদি মাল সাজিয়ে বসেছে। পাশে বেচামণি গুটিশুটি মেরে ঘুমোচ্ছে। উঠোনে একটি বেড়াল বসে।

—কেমন জমেছিল?

—জব্বর। টাকলা ও. সি পুরো ধাঁ হয়ে গেছে।

—হুঁ হুঁ বাবা। বুঝবে। ধীরে ধীরে বুঝবে। এই মালটা কী জানো?

—ফরেন!

—না। এটা হল গোয়ার ফেনি। আজই হাতে এল।

ভদি ঢালে। হঠাৎ বেড়ালটা দুদ্দাড় করে পালায় কারণ বিশাল দাঁড়কাক নেমে আসে।

pathagar.net

—আমার জন্যেও ঢাল্। বাটিতে।

ভদি নলেনকে বলে,

—যা, বাবার বাটিটা নিয়ে আয়। আপনার ডানার বাত কেমন আছে বাবা? তেলটাতে কাজ হল?

—বাল হয়েচে। যেমন হারামি তুই তেমন তোর তেল। আর একটা গেলাসেও ঢাল।

—কে আসবেন বাবা?

—আসবেন টাসবেন না। এসে ওপরে ঘাপটি মেরে বসে আছে! ওরে। ঢের হয়েচে। এবার নেমে আয়।

হুস করে যে নেমে আসে তার নাম কবি পুরন্দর ভাট। মুখে একগাল হাসি। ডি. এস ভয় পেয়ে মদনকে জাপটে ধরে।

—তিন মাসের ভাড়া বাকি পড়েছিল। সুইসাইড নোট দিয়ে কেটে পড়লাম। এবারে বুঝুক শালারা। আমার হল এই টেকনিক। কয়েকদিন এক ঠেকে কাটাও। তারপর সুইসাইড নোট ঠেকিয়ে দিয়ে কেটে পড়।

—কিন্তু পুলিশ তো ছাড়বে না। ধরলে ফ্রড কেসে ফেলে দেবে।

—ছিঁচকে চোর ধরতে গেলে যাদের লাল সুতো বেরিয়ে পড়ে তারা ধরবে আমাকে? আই অ্যাম পোয়েট পুরন্দর ভোট। এই জানবে। ভদিদা তোমাকে আমি আগেই সবটা বলে রেখেছিলুম।

—হ্যাঁ, আমি কেসটা জানতাম।

বেচামণি হঠাৎ ঘুমের মধ্যে কথা বলতে শুরু করে।

—ওঁ নমঃ কট বিকট ঘোররূপিণী স্বাহা।

ওঁ বক্র কিরণে শিরে রক্ষ ভয়ে মায়া

হ্যা মৃতা স্বাহা

ওঁ সর্ব্বলোক বশঙ্করায় কুরু কুরু স্বাহা

দাঁড়কাক ডানা ঝাপটে ঝাপটে বউমাকে হাওয়া করে।

ভদি রাগি মুখ করে খপ্ করে এক গেলাস মেরে দেয়।

—মাগির গলায় একদিন পা তুলে দেব। এই বলে দিলাম। নয়ত শাবলের এক বাড়িতে মাথা ফাঁক।

ডানার হাওয়া পেয়ে আনন্দিত বেচামণি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। ঘুমের মধ্যেই। ভদির বাবা খচে যায়। খ্যাচম্যাচ করে নখ ঠোঁট নাড়ে। চোখদুটো টর্চের মতো।

—ফের বউমার নামে একটা কথা বললে কিন্তু আমি আর চুপ করে থাকব না। অন্যায় করবি আবার চোপাও চালাবি! নলেন বানচোৎ সব জানে। জেনে চোদনা সেজে থাকে। দেব, দেব ফ্যাতাড়ুদের সামনে হাতে হাঁড়ি ভেঙে?

—বাবা! আপনি পরিবারের হেড। দাঁড়কাক হলেও। আপনি সব ফ্যামিলি সিক্রেট ফাঁস করে দেবেন?

—বেশি তেড়ি বেড়ি করলেই দেব।

হঠাৎ নলেন চেঁচিয়ে ওঠে,

—ওই দ্যাখো!

বেচামণিও ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে ওঠে।

—কী হয়েচে? বলবে তো?

কেউই জবাব দেয় না। সবাই যেদিকে তাকিয়ে বেচামণিও সেইদিকে দেখতে থাকে।

হাউইটি উঠে অনেক ওপরে গেল। তারপর ফুটফাট ভুটভাট করে ফাটতে ফাটতে একটা লালচে কাস্তে হাতুড়ির চেহারা নিল। তারপর ধীরে ধীরে নামতে লাগল। (চলবে)

৭

পর্বে পর্বে চোক্তার ও ফ্যাতাড়ুদের মধ্যমণি বানিয়ে এই যে গেঁতো মালগাড়ি চলেছে তা পাঠকদের মধ্যে, বলাই বাহুল্য, বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। এ বিষয়ে কিছু বলার আছে এবং বলা হবেই। কিন্তু তার আগে কিছু না বলা কথা ট্রাজিক অবলার মতো নির্বাক থেকে বার বার সেমিজে চোখ মুছুক এমনটি নিশ্চয়ই হওয়া বাঞ্ছিত নয়। বাঞ্চতিত তো নেভার-ই নয়।

হাউই আকাশে উঠে কাস্তে হাতুড়ি হয়ে গেল এবং কক্ষপথে চিরতরে প্রোথিত না হয়ে ভস্মাকারে স্থাপিত হওয়ার জন্যে ধরাধামে নেমে এল— এ কাণ্ড অনেকেই মেনে নেবে না। কবুল করা ভালো যে, গত পর্বে একটু 'তাও' দর্শন ঢুকে পড়েছিল— যা কিছু ওঠে তা নামে এবং যাহা কিছু নামে তাহা উঠে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি যদি একটি ধানি পটকাও না ফাটিয়ে (যদিও এখানে কলকাতা হাইকোর্টের নিয়ম মানা হয় বলে কোনো পাকা খবর নেই) গোটা দেশটাকে মাফিয়া ও মাগি সাপ্লায়ারদের হাতে তুলে দিতে পারে তাহলে অসম্ভব বলে কিছু থাকল কি? এ মামলায় আর ফুট কাটতে আমাদের বয়ে গেছে। বেচামণি! বেচারি বেচামণি! ঘুমের মধ্যে ডগ স্যাম্পুতে চুল খোলতাই বেচামণি যে মন্ত্র বলে উঠেছিল এবং যা শুনে ভদি খচে যায় এবং দাঁড়কাক বাবার কাছে থ্রেট খায় তা হল বশীকরণ মন্ত্র। বেচামণির মধ্যে নিরন্তর এই ভয় হিডেন অ্যাজেন্ডা-র মতো কাজ করে চলে যে ভদি তার ভক্তদের মধ্যে কয়েকটি ফিমেলকে হুমা করার ধান্দায় আছে। সন্দেহটি অমূলক নয়। অজানা তো নয়ই। অবশ্য এর বিরুদ্ধে ভদি জবাব করতে পারে যে বেচামণিকেও সে ঝাড়ির টার্গেট হতে দেখেছে। নলেন হয়তো তাতে সায়ও দেবে। কিন্তু এই বিবাদে জড়িয়ে পড়লে আমাদের চলবে না। মাগি-মন্দার কারবারে আদ্যিকাল থেকেই এই ঢং। ঠাকুর দেবতারাও এই লাইনে যথেষ্ট বলশালী। এসব চলবেই এবং এর রকমফের নিয়ে আধবুড়ো কিছু গাণ্ডু শারদীয় কত কী-তে আধলা নামাবে এবং বাঙালি পাঠকরা মলাঙ্গা লেন বা মঙ্গোলিয়া, যেখানেই থাকুক না কেন সেগুলি পেড়ে ফেলবে। পড়ে তো ফেলেই। এই অসুখের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ট্রিটমেন্ট হল হনুমানের বাচ্চা। কিন্তু সেখানেও ফ্যাকড়া। পশুপ্রেমীরা হাঁউ হাঁউ করে উঠবে। নিরপরাধ, ঐতিহ্যবাহী, রামভক্ত হনুমানের বাচ্চাদের আপনারা কোথায় পাঠাচ্ছেন! জায়গাটা খাঁচা হলেও বা একটা কথা ছিল!

যাই হোক 'কাঙাল মালসাট', ইতিমধ্যেই, মানে, ধারাবাহিক পর্যায়েই, অর্থাৎ, গ্রন্থাকারে যন্ত্রস্থ হওয়ার প্রক্রিয়াতে ঢুকে পড়ার আগেই, ফিডব্যাক পেতে শুরু করেছে যার কিছু নমুনা টেস্ট করা যেতে পারে। নাম, ঠিকানা, গুহ্য রাখা হল।

১। ...চোক্তার ফোক্তার নিয়ে এই ক্যাঁচড়াবাজি আর সহ্য করা যাচ্ছে না! 'আগামী সংখ্যায় সমাপ্য'— কবে দেখতে পাব? ...কলম না বকলম ...গর্দভের সন্দর্ভ।

২। লেখা স্মার্ট কিন্তু মার্কসীয় freedom from এর ঘেরাটোপেই খাবি খাচ্ছে, freedom to নিয়ে সেই ভাবনাচিন্তা কোথায় যা আমরা পশ্চিমের অধুনা আখ্যানে...

৩। ...চাম্পি! পারি না! ...ঘ্যাম হচ্ছে। একটাই অনুরোধ—সহসা, কয়টাস্ ইন্টেরেপটাস্-এর মতো থামিয়ে দেবেন না। অথবা যেমন শীঘ্রপতন ঘটে যায়।...

৪। ...মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিক শোধনবাদী গাঁটছাড়া-র দালালি করে হাততালি কেনার এক ঘৃণ্য চেষ্টা...

অবশ্য কেউ যদি বলেন যে এরকম কোনো চিঠি কেউ লেখেনি, পুরোটাই জালি কেস তাহলেও কিছু বলার নেই। সবই হতে পারে। অনন্ত সম্ভাবনা যুক্ত হয়ে রয়েছে অপার রহস্যের সঙ্গে যা আবার অজানার পথ ধরে এগিয়ে চলেছে কালো ছাতা মাথায়—কোথায়? সবটা বলা যাবে না। আপাতত বেঙ্গল ইনডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের খোদকর্তার দপ্তরে।

উপরোক্ত সংস্থাটিকে অধিক বুদ্ধিমানেরা যেন নিম্নোক্ত সংস্থাটির সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলেন –WEST BENGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION (A Govt. of West Bengal Enterprise) 5, Council House Street, Calcutta- 700 001 Phone : 91-33-2105361-65 Fax : 91-33-2483737 E-mail : wbidc@vsnl.com, Internet : www.wbidc.com.

ফেললেই কিন্তু ক্যাচাল হয়ে যেতে পারে। সকলেই জানে এবং বিশেষত দেশ-বিদেশের শিল্পপতিরা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে নতুন জোয়ার আসছে। এবং এতে আড্ডার গুরুত্ব অপরিসীম।

আড্ডা বলতে আমরা যা বুঝি এটা কিন্তু তা নয়। এখানে গ্যাঁজানো বা গজালি করার কোনো স্কোপ নেই। এই আড্ডা হল ADDA, আসানসোল প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন এবং দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি এক হয়ে তৈরি হয়েছে আড্ডা বা ADDA যা হল আমাদের অর্থাৎ ভারতের রুর। হাওড়া যেমন ভারতের শেফিল্ড। সুন্দরবন যেমন ভারতের আফ্রিকা। দিল্লি যেমন ভারতের লন্ডন।

আমাদের একান্ত পরিচিত বড়িলাল একবার তার বোনের দ্যাওরের বউ-এর বাপের শ্রাদ্ধ খেতে দুর্গাপুর গিয়েছিল। সেখানে হবি তো তখন WBIDC-র এক দারুণ মিটিং ছিল। বড়িলাল বাপের জন্মে যা আর দেখবে না তাই দেখল। কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনে সব হোমরা চোমরা ও শিল্পপতিরা স্বয়ং বা প্রতিনিধি মারফৎ হাজির। দুর্গাপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটি কনটেসা গাড়ি দাঁড়িয়ে যেন সেও ট্রেনে উঠবে। চেয়ারম্যান সাহেব ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা কনটেসায় চেপে বসলেন এবং কনটেসা রওনা দিল। বড়িলাল তখনই অনুভব করল যে অচিরেই পশ্চিমবঙ্গ গোটা দুনিয়ার পুঁটকি মেরে দেবে। Making things happen—এই স্লোগান নির্দোষ বাতাকর্মের মতো ফাঁকা আওয়াজ নয়।

ডিসেম্বর ৯৯ এর শেষ পাদে যেন বা হাওয়া একটু ঠাণ্ডাটে হয়ে উঠেই থাকবে কারণ তা না হলে বেঙ্গল ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের সামনে বেলা এগারোটা নাগাদ যে ট্যাক্সিটা এসে থামবে তা থেকে কোট প্যান্ট ও হ্যাট মাথায় ভদি, রোঁয়া ওঠা আদ্যিকালের মেমেদের লম্বা কোট পরা বেচামণি ও স্যান্ডো গেঞ্জি ও শর্টস পরা বৃদ্ধ বিদেশি একে একে নামবে কেন? বুড়ো সায়েব এসব কলকাতার শীতফিত নিয়ে যে মাথা ঘামায় না সেটা বোঝাই গেল।

চেয়ারম্যানের কাছে একটি কার্ড গেল। তাতে লেখা—

আ.কু.৪৭
(একটি বাঙালি প্রতিষ্ঠান)
মালিক : শ্রী ভদি সরকার, শ্রীমতী বেচামণি সরকার
ব্যবসায়িক উপদেষ্টা : মিখাইল কালাশনিকভ
হিসাবরক্ষক : শ্রী নলেন

এই ঘটনাটির আগের দিন সল্টলেক এলাকা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক নিত্যকর্ম'-তে এই মর্মে একটি খবর বেরোয় যে কলকাতার আকাশে একাধিক উড়ন্ত চাকি দেখা দিচ্ছে। মানুষের মনে নানা প্রশ্ন উঠছে। কেন এই চাকতির আবির্ভাব? কী চায় এই চাকতি? এই চক্কর কতদিন চলবে? সরকার নীরব কেন? বিজ্ঞানীরা কেন মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন? 'নিজস্ব সংবাদদাতা'র এই সরব প্রতিবেদনের সঙ্গে সম্পাদকীয় সংযোজন— 'পশ্চিমী মনোবিদ য়ুং-এর কথা মানিলে মানুষ যাহা দেখিতেছে তাহা ঈশ্বরের চক্ষু। এই চক্ষু প্রতি মানুষের মধ্যেই মুদিত রহিয়াছে। সহস্রাব্দের মুখে কেন এরূপ ঘটিল তাহা জানা যায় নাই। পশ্চিমে উফো-চর্চা প্রবল। পূর্বে বিরল। কেহ যদি গোপনে উফো-চর্চা করিয়া থাকেন তাহলে এ ব্যাপারে আলোকপাত করিতে পারেন। তবে বিনা দক্ষিণায়। নাম ও ঠিকানা গোপন রাখা হইবেক।' এই প্রতিবেদনটি কোনোই আলোড়ন সৃষ্টি করতে অপারগ হয় কারণ 'দৈনিক নিত্যকর্ম'-র প্রচার সংখ্যা ৫ হইতে বাড়িয়া এই বছরই ৭ হইয়াছে। কলকাতায় বেশ কিছু ছিটিয়াল মাল বাস করে। বরাবরই। বলা যায় এরকমই রেওয়াজ।

ওরা তিনজন ঘরে ঢুকতেই হুমদো চেয়ারম্যান দাঁড়িয়ে ওঠে। হেঁড়ে গলা।

—হাউ ডু ইউ ডু...

ভদিও গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করে,

—নো হাডুডু। আমি বাঙালি। মাই বেটার হাফ বেচামণি বাঙালি। মিঃ কালাশনিকভ রাশিয়ান। কুছ পরোয়া নেই। আপনিও বাঙালি। বাংলাতেই বাৎচিত চলতে পারে।

—ইয়েস! পারেই তো। আচ্ছা, ইনি রাশিয়ান?

—স্পাসিবা। দোবরে উতরো!

—সে কী! বিখ্যাত লোক। আপনি মিঃ কালাশনিকভের নাম শোনেননি?

—ঠিক প্লেস করতে পারছি না। তবে শোনা শোনা লাগছে।

বেচামনি ফট্ করে কুমিরের চামড়ার হ্যান্ডব্যাগ খোলে এবং একটি ফটো এগিয়ে দেয়।

—দেখুন তো, চেনা চেনা লাগছে?

—অ্যাঁঃ এটা তো বন্দুক।

—হ্যাঁ। এ. কে. ফর্টি সেভেন।

—মাই গড্।

—এই এ. কে-র 'কে' হলেন কালাশনিকভ। মিখাইল কালাশনিকভ। এটা ওঁরই আবিষ্কার।

—ও লর্ড! আপনাকে ম্যাডাম কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে।

—অসম্ভব। আমি কোথাও যাই না।

—না, না। একবার হিথরো-তে আলাপ হয়েছিল।

—ভুল করছেন। আমি নয়। অন্য কেউ হবেন। আপনি বোধহয় বম্বের মিসেস পোচখানেওয়ালা-র সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছেন। অনেকেই ফেলে।

—তা হবে। সরি ম্যাডাম।

এইবার চেয়ারম্যানের হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত কারণ মিঃ কালাশনিকভ হঠাৎ বলে উঠেন,

—খারাশো! খারাশো! রবীন্দ্রনাথ আমার খুবই প্রিয়। রাজ কাপুর। ভারতকে আমি ভালোবাসে। আওয়ারা। জন-গণ-মন শুনি। মিঠুন। ডিস্কো ডান্সার।

—আরে, আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন।

—খারাশো। অচিন খারাশো। ভডিবাবু, আপনি প্রোপোজাল প্রকাশ করুন। আমড়াগাছি অনেক হইয়াছে।

—হ্যাঁ, ভদিবাবু, বলুন।

—বলচি। ব্যাপারটা টু সিক্রেট। নো গ্যাঁগো বিজনেস। ছুপকে ছুপকে করতে হবে। করলেই সব লাল হো যায়গা।

—ভডিবাবু, আপনি ঐ চুড়ুড়বুড়ুড় হইতে বিরত থাকুন। কাজের কথা বলুন।

—ইয়েস মিঃ কালাশনিকভ!

আমরা একটি রাইফেল কারখানা বানাব।—

—রাইফেল! কোথায়?

—এনিহোয়্যার। হলদিয়া, দুর্গাপুর, আসানসোল— ওপরে থাকবে অন্য জিনিস। ডিকয়। তলায় আসলি মাল। এ. কে. ফর্টিসেভেন— টিগিগ্ —টিগ্-টিগ্-টিগিটিগিটিগ্...

—বলেন কী?

—শুনুন, ওপরে লোকে জানবে ক্যানড্ জুস বা টমাটো পিউরি তৈরি হচ্ছে বা পিভিসি ব্যাগ অ্যান্ড স্পেশালিটি পলিমারস্। তলায় লে ধড়াধ্ধড়...

pathagar.net

—ইন্টারেস্টিং।

বেচামণি বলে এবার আপনি প্রোডাক্ট সম্বন্ধে বলুন...

—ভেরি সিম্পল। রেগুলার আর্মি হোক, গেরিলা গ্রুপ হোক— সবার মন পসন্দ হল এ. কে. ফর্টিসেভেন। আমারই তনয় বলিয়া নয় ইহা অতীব উপাদেয় অ্যাসল্ট রাইফেল। অ্যামেরিকান আর্মালেট এর ধারে কাছেও আসে না। সত্যি বলিতে এ. কে. ফর্টিসেভেন হল এক উন্নত সাব-মেশিনগান যা মিডিয়াম পাওয়ার কার্ট্রিজ ফায়ার করে। যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?

—সে প্রায় না জানালেই ভালো। বিশেষত এইসব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপার...

—থাক, থাক, আর বলিতে হইবে না। বুঝিয়াছি। আজকাল দরকার র‍্যাপিড ফায়ার পাওয়ার যাকে আরও মজবুত করিয়া মার্চিং ফায়ার বলা যায়।

চেয়ারম্যান ঢোঁক গেলেন,

—কিন্তু এদিয়ে আমরা কী করব? মিলিটারি তো আমাদের হাতে নয়...

—চোপ্, মিলিটারির দরকারটা কী? আশপাশে, এভরিহোয়্যার গেরিলা অ্যাকশন চলছে... এ. কে. ফর্টিসেভেন সকলের মনের কথা।

ভদি মাথা থেকে হ্যাট নামায়।

—ফিজি, সেচিলিস, নেপাল, বর্মা, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, বিহার, আসাম, মেদিনীপুর, সাউথ চব্বিশ পরগণা, চেচনিয়া, ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান—ডিম্যান্ডটা একবার ভেবে দেখেছেন? সাপ্লাই দিয়ে কুল পাবেন না। স্রেফ বন্দুক বেচে ওয়েস্ট বেঙ্গল লাল হয়ে যাবে। বাঙালির ঘরে ঘরে নোটের তাড়া আর কার্বাইন— ভাবা যায়?

—সে সব ঠিক আছে। কিন্তু...

চেয়ারম্যান ভদিদের কার্ডটা দেখেন।

—কিন্তু এখানে তো লেখা আ. কু. ৪৭, কেমন আকুপাংচার টাইপের নাম।

—প্রথমত নামে কি আসে যায়? দ্বিতীয়ত...

বেচামণি ভদিকে থামিয়ে দেয়।

—তুমি থামো ডার্লিং, লেট মি এক্সপ্লেন! এই নামটার একটা গভীর অর্থ আছে। ৪৭ হল স্বাধীনতার বছর আর আ. কু. মানে হল আকাশকুসুম।

—অ্যাঁঃ আকাশকুসুম!

—ঠিক তাই। ডিমের কুসুম নয়। ৪৭ সাল থেকে বাঙালি বন্দুকের স্বাদ পায়নি। প্রথমে আর. সি. পি. আই, পরে নক্সাল— সবই আনপ্রিপেয়ার্ড স্ট্রাগল। অথচ স্বপ্ন দেখা তো থামেনি। সেই বন্দুক আজ আমরা হাতে হাতে, ঘরে ঘরে...

—মিঃ চেয়ারম্যান, আমি করিয়া ছিলাম কী জার্মান এম. পি. ৪৩ ও এম. পি. ৪৪ যা থেকে ৭.৯২ মিমি কুর্জ এমিউনিশন ফায়ার হইত...

—প্লিজ মিঃ কালাশনিকভ ওসব টেকনিক ডিটেল আমার মাথায় ঢুকবে না...

—নিয়েৎ, আপনারা চাইলে আমি এ. কে ৭৪ অবধি বানাইতে পারি। ইহাতে এন. এস. পি নাইট সাইট এবং তার কাটার নাইফ-বেয়নেট ফিট হইতে পারে।

চেয়ারম্যান ঘামতে ঘামতে বেল বাজান।

pathagar.net

—স্যার!

—চার ঠাণ্ডা লে কে আও। না কি বিয়ারই বলব?

ভদি হ্যাট পরে ফেলে।

—বলবেন না, বিয়ার আমরা খাই না।

—তা হলে স্কচ!

বেচামণি বলে ওঠে,

—আমি শুধু পেপসি।

চেয়ারম্যান একটু হিসু করার অছিলায় সংলগ্ন লাক্সারি টয়লেটে ঢুকে টাকে কোল্ড ওয়াটার স্প্রে করেন। আয়নায় নিজেকে দেখেন। কেউ নেই অথচ কানে ভৌতিক রেডিও বেজে ওঠে,

—নতুন প্লাস্টিক ম্যাগাজিনে ৩০ রাউন্ডই ভরা যায়। প্রত্যেকটা বুলেটের ওজন ৫৩.৫ গ্রেইন, সেকেন্ডে ৯০০ মিটার যায়, ফ্ল্যাট ট্র্যাজেক্টরি ধরলে ৪০০ কেন, প্রায় ৫০০ মিটার...

—ওরে বাবা, এসব জেনে আমি করবটা কী?

—হিসি।

—ঠিক আছে। করছি।

—হ্যাঁ, ঠিক করে করো আর যা বলছি শুনে যাও। কালাশনিকভ অ্যাসল্টরাইফেলের সব মডেলই হল গ্যাস অপারেটেড।

—তাতে আমার কী?

—এক রাউন্ড ফায়ার করার সময় যে গ্যাস তৈরি হয় সেটা ব্যারেলের মাঝামাঝি জায়গা থেকে ওপরের গ্যাস সিলিন্ডারে চলে যায়...

—আমি শুনতে চাই না।

—কেউই চায় না কিন্তু শুনতে হয়। সিলিন্ডারে ঐ গ্যাসটা প্রসারিত হয়ে পিস্টনটা পেছন দিকে ঠেলে দেয়।

—আমি শুনব না।

—এবারে একটা ঝাপড়া মারব। শুনব না। মামাবাড়ির আবদার। চোপ্। পিস্টনটা লাগানো থাকে বোল্টের সঙ্গে যেটা পেছনে টান খায়। ফলে বুলেটের ফাঁকা খোলটা ইজেক্টর দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং ফায়ারিং হ্যামারটি কক্ড্ অবস্থানে চলে আসে। বোল্টটা চলার সময় একটা রিটার্ন স্প্রিং-এ চাপ দেয় সেটা আবার বোল্টটিকে...

—নিকুচি করেছে। এই আমি কানে আঙুল দিলাম।

—দে। কানে কেন। যেখানে পারিস দে। রিটার্ন স্প্রিংটা বোল্টটাকে এনে দেয় সামনে এবং এর মধ্যে ম্যাগাজিন এর থেকে নতুন এক রাউন্ড বুলেট চেম্বারে ঢুকে যায়। বোল্টটি তখন ফায়ারিং পোজিসনে লক্ড্ হয়ে যায়...

—বাঁচাও! বাঁচাও!

টয়লেটের দরজা খুলে ঘরে ঢোকেন চেয়ারম্যান। গেলাস-এর ঢাকনাটা হাত দুয়েক ওপরে উঠে বনবন করে ঘুরছে। ঘরে কেউ নেই। কমপিউটারের পর্দায় একটি এ. কে. ফর্টিসেভেনের নকশা নানাদিক থেকে দেখা যেতে থাকে। টিভি সেটটি সহসা চালু হয় এবং তাতে দেখা যায় মুখে কালো কাপড় বাঁধা একটি লোক চেয়ারম্যানের দিকে এ. কে. ফর্টিসেভেন তাক করছে, সেল ফোন বাজে, কানে ধরতেই ক্রমাগত ফায়ারিং-এর শব্দ... দ্বিবিধ পানীয়ের বোতল, গেলাস বরফ, চিমটে ইত্যাদি শোভিত ট্রে নিয়ে যে বেয়ারাটি ঢোকার কথা ছিল সে ঢুকল কিন্তু তারও হাতে অগ্নিবর্ষী এ. কে. ফর্টিসেভেন...

গুলিবিদ্ধ না হয়েই চেয়ারম্যান কেলিয়ে পড়লেন। পড়েও স্বস্তি নেই। মিঃ কালাশনিকভের সেই প্রসিদ্ধ রুশী হাসি ঘরে উড়ে বেড়াচ্ছে যার সঙ্গে স্তলিচনাইয়া ভদকার গন্ধ ও জোসেফ স্তালিনের পিঠ চাপড়ানি মিলেমিশে এক তাজ্জব সমাহার বানাইয়াছে ...টিগিগ্ ...টিগ্ ...টিগিগ্ ...টিগিটিগিটিগ্...

এতক্ষণ যা ঘটল তা-যেমন আকাট সত্যি তেমনই তিন সত্যি হল ঘটনাটা ঘটার সময় ভদি ও বেচামণি কালীঘাটে ছিল এবং মিঃ মিখাইল কালাশনিকভ ছিলেন মস্কোতে। এসব হুজ্জুতিতে মাইরি আমাদের কোনো হাত নেই। কিন্তু সমালোচকেরা ছাড়বে না। ছাড়তে পারে না। কেননা তারা প্রত্যেকেই এক একটি তিলে খ।

প্রায় অন্ধকার বারান্দা। ভূতুড়ে নোংরা ডুমটি জ্বলছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এটি ভদির বাড়ি। রাত এইটিশ বলা ভুল হবে। উত্তরের থেকে হিমেল হাওয়ায় কত মৃত সভ্যতার দুর্বোধ্য ই-মেল যে আসে তার ইয়ত্তা নেই। কী বার্তা যে তারা পাঠাতে চায় তা বোঝা শিবের বাপেরও সাধ্যে কুলোবে না। এবং বিশেষভাবে উচ্চারিত হওয়ার দরকার যে পাঠোদ্ধারের কোনো চেষ্টা নেই। সকলেই যখন গা এলিয়ে দিয়েছে তখন আমাদেরও এ নিয়ে গাঁড় মারিয়ে কোনো লাভ নেই।

একটি নড়বড়ে টুল। তেপায়া। তার ওপরে বসে বিশাল দাঁড়কাক। সামনে ভক্তবৃন্দের মধ্যে ভদি, বেচামণি ও অন্য সকলকেই দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারে কান-মাথা ঢাকা দিয়ে বড়িলালও এক ফোঁকরে ঢুকে পড়েছে। সাক্ষী গোপাল সকলেরই ঘরের লোক। কিন্তু সাক্ষী বড়িলাল?

টুলের ওপরে দাঁড়কাকের সামনে বাটিতে বাংলা ঢালা হয়েছে। দাঁড়কাক ঠোঁট ডুবোয়। গলাধঃকরণ করার জন্য মাথা উঁচু করে। তারপর বলতে শুরু করে—'এই যে ভদি বাঞ্চোত গাঁড়ে জটা নিয়ে গুরুগিরি করচে, ওকে আমি বলেছিলুম, দ্যাখ্, ভালো যদি চাস তো ভক্তের সংখ্যা বাড়াবি না। কিন্তু শালার হেভি খাঁই— স্রেফ মাল খাওয়ার ধান্দায় এলিতেলি ধরে ধরে

শিষ্য বানিয়েচে। দ্যাখ, মাল সাপ্লাই কর বা নলেনকে তেল দে— আমার কিন্তু জানতে বাকি নেই কার পোঁদে গু। ভদি এখনো জানে না কিন্তু সেও একদিন বুঝবে। আমি সোজাসাপটা বলে দিলুম— যে বেইমানি করবে আমি কিন্তু গাঁড় মেরে খাল করে দেব।'

সামনে থেকে আওয়াজ ওঠে—

—না, না, প্রভু, না।

—আমরা বেইমানি করব না।

—ছুটকো ছাটকা কিছু অশৈল করে থাকলে ক্ষমাঘেন্না করে দিন।

দাঁড়কাক ফের চুক্ চুক্ করে বাটি থেকে বাংলা খায়। এক পা তুলে ঘাড় চুলকোয়। ফের শুরু করে

—নতুন যারা এসেচে তাদের বলছি— আমরা হচ্চি আত্মারাম সরকারের বংশধর। বুঝলি? সুবল মিত্তিরের সরল বাঙ্গালা অভিধানে, নামও শুনিসনি বোধ হয়, যা আছে মেমরি থেকে কোট করে যাচ্ছি— 'আত্মারাম সরকার বঙ্গের বিখ্যাত ভোজবিদ্যাবিশারদ। ইঁহার প্রাদুর্ভাবকাল সঠিকরূপে জানা যায় না। 'ভারতবর্ষ' পত্রে গঙ্গাগোবিন্দ রায় লিখিয়াছেন যে, আত্মারাম "বনবিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত প্রকাশছিলিম নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" কিন্তু আত্মারামের বংশধর জীবনকৃষ্ণ সরকার উক্ত পত্রেই লিখিয়াছেন যে, আত্মারামের বাসস্থান হুগলী (বর্তমানে হাওড়া) জেলার অন্তর্গত কমলাপুর গ্রামে ছিল। আত্মারামের পিতার নাম মাধবরাম সরকার। মাধবরামের ৪ পুত্র, ১) বাঞ্ছারাম, ২) আত্মারাম, ৩) গোবিন্দরাম, ৪) রামপ্রসাদ। এক বাঞ্ছারাম ব্যতীত অপর তিন ভ্রাতার বংশ নাই। উল্লিখিত জীবনকৃষ্ণ সরকার বাঞ্ছারামের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ...'

দাঁড়কাক ফের বাংলা খায়। ঘাড়ের পালক ফোলায়।

—ফের কোট ঝাড়চি—মেমরি দেখেছিস ...'শোনা যায়, আত্মারাম কামরূপ কামাখ্যা হইতে যাদুবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিলেন, এবং দেশে আসিয়া বাজিকরদিগের কৌশল ব্যর্থ করিয়া দিতেন বলিয়া বাজিকরেরা অদ্যাপি তাঁহাকে গালি দিয়া থাকে। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। তিনি নাকি চালুনি দ্বারা শিবিকা বহন করাইতেন। শেষে ভূতেরাই নাকি ছিদ্র পাইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে।' আনকোট। কাজেই খুব সাবধান। ভদির বোতলবাজি দেখেচিস। কিন্তু খালি বোতলে ভদি কী পোষে, কী বল ভদি— কাজেই খুব সাবধান। খুললেই সব বেরিয়ে আসবে। এইসা কেলাবে যে...

সামনে ফের কলরোল,

—খুলবেন না দোহাই।

—ভদিদা জিন্দাবাদ। দণ্ডবায়স জিন্দাবাদ। বেইমানি নেহি চলেগা। নেহি চলেগা, নেহি চলেগা।

—চোপ। এত চ্যাঁ ভ্যাঁ করলে সব জানান হয়ে পড়বে। সায়লেন্স। তা আমাদের গুষ্টির নিয়ম হচ্ছে জন্মে জন্মে আমরা একবার করে মহাচক্রের খেলা, মহামণ্ডলের ঘুঘুচক্কর দেখিয়ে যাব। সেইমতোই চলেছে ভদির এই চাকতির মোচ্ছব। বুঝলি? আজ চেয়ারম্যান শালা নার্সিংহোমে গেছে, এর পরে দেখবি কী হয়। কোনো ঢপবাজকে আমরা রেয়াৎ করব না। কম করে ৫০ হাজার ছোট বড় কারখানা হয় বন্ধ নয় হাঁপের টানে ধুঁকছে। সেদিকে কারও খেয়াল নেই, বাঁড়া, ডাউনস্ট্রিম মারাচ্ছে। ফরমুলা ওয়ান রেসিং। হোটেল! কার পার্কিং প্লাজা! সামলাও এবার চাকতি?

ফের রব ওঠে।

—চাকতি কা খেল জিন্দাবাদ।
ডাউনস্ট্রিম মুর্দাবাদ

—বেচামণি বউদি জিন্দাবাদ।
কমরেড নলেন জিন্দাবাদ।

—চেয়ারম্যানেরা নিপাত যাক্।
নিপাত যাক। নিপাত্ যাক।

এরই মধ্যে পুরন্দর ভাট দুই লাইনের একটি মাল রেডি করে ডি. এস-কে কানে কানে বলে দেয়,

—জয়, জয়, আত্মারাম
চেয়ারম্যানের পুঁটকি জাম।

—বাঃ বেড়ে হয়েচে। ছাপতে দেবে না কি?

—ভাবচি।

ভাষণের শেষে দাঁড়কাক বলে

—'মহাপুরুষের বাণী শোন্। এটাও মেমারি থেকে কোট করচি। সাধুসন্তের কথা তো। বলতে গেলেই চোখে জলে এসে যায়।'

pathagar.net

দাঁড়কাক ডানা দিয়ে চোখ মোছে। ভক্তবৃন্দের মধ্যে ফুঁপিয়ে কেউ, কেউ ডুকরে ওঠে। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দ। দাঁড়কাক দুটি ডানাই দুপাশে মেলে দেয়। এ এক, এ এক অপার্থিব স্বর্গলোকেরই যেন বিজ্ঞাপন—

—'বৎস! আমি যে ভগবান ভুলিয়া তোদেরই সার করিয়াছি— তবে ভুলিব কাকে? তোদের ভুলিলে আর আমার থাকিবে কী? তোরা যে আমার হৃদয়-নিকুঞ্জের পোষা দোহেলা। সন্ধ্যা-সকালে তোদের কাকলি হৃদিতন্ত্রে না বাজিলে আমি যে অস্থির হইয়া পড়ি। ...তোরা দুঃখ পেলেও আমার তাতে আনন্দ হয়, আমি তোদের ভাবে বিভোর হইয়া থাকি।'

এই বাণী কার? মূঢ় পাঠক, তুমি বলিতে পারো? পাবার চান্স খুবই মিহি। যাইহোক, চেষ্টা মারানোতে দোষ নেই। ভুলভাল বললেও গর্দান যাবার চান্স নেই। একেই বোধহয় পণ্ডিতেরা বলেন বা বলবেন— গোলকায়নের বোম্বাচাক!

(চলবে)

৮

গত অধ্যায়ে একটি সাধুমার্কা কোটেশন ঝেড়ে পাঠকদের ডিরেক্ট চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল। কিন্তু জানাই ছিল যে, ঈশ্বর-বিমুখ বাঙালি পাঠকরা সে-চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারবে না। নিদেনপক্ষে কোনো ক্ষীণ প্রচেষ্টাও আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু সে ভেলিগুড়ে বালুকার ঢল নামিয়াছে। ঘেন্না ধরে গেছে। আজ বাঙালি কথায় কথায় সেমিনারে বাখতিন, ফুকো ঝাড়ে, ভবানীপুর এলাকায় পাঞ্জাবি ও গুজরাটিদের দাপট ও রোয়াব সম্বন্ধে গ্রামসির হেজিমনি তত্ত্ব আওড়ায়, বিগ ব্যাং হইতে স্মল ব্যাঙাচি সকলই তার নখের ডগায় ডগোমগো হইয়া রহিয়াছে, অথচ সে শালা পরমহংস শ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের বাণী সম্বন্ধে কিছুই জানে

না। এবিষয়ে আমাদের কিছু করিবার নাই। হিসাব কষিলে দেখা যায় যে, আর কোনো জাতিতে এত সংখ্যক পরমহংস জন্মান নাই। রেলাবাজের সংখ্যাও ততোধিক। কিন্তু অধঃপতনে কোনো জাতই এত পটু নয়।

মহামতি সাহেবরা বাঙালিকে মানুষ করিবার একটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন যাহাকে বলা যায়— 'বেবুন থেকে বাবু'। হল না। কিছু বেবুন থেকে গেল, কিছু মধ্যপথে বেবুনবাবু ও বাবুবেবুন এবং অবশ্যম্ভাবী কিছু বাবু। পরবর্তী ব্লু-প্রিন্ট বিবেকানন্দের। তিনি বললেন, শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে ফেলে দিয়ে ফুটবল খেলতে। প্রথম দিকে বাঙালি তাঁর কথা শুনেওছিল। না শুনলে ১৯১১ সালে গোরা একাদশকে মোহনবাগান ক্যালাতে পারত না বা ইয়োরোপের করিন্থিয়ানরা ঢাকায় ল্যাজেগোবরে হত না। কিন্তু খচড়ামি যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাকে বাঁচাবে কে? আজ বাঙালি অন্য নানা খেলার মতো ফুটবলেও কেলিয়ে পড়েছে এবং ক্রিকেট বা টেনিসে গুচ্ছের টাকা বলে বাঙালি বাপ-মায়েরা বাচ্চাগুলোকে হ্যাঁচকা টানে ঘুম থেকে তুলে মাঠে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে নাকি হুদো হুদো কোচ, যারা বরং কোচোয়ান হলে আরও ভালো হত। এরপর কংগ্রেস ভেবেছিল বাঙালিরা সবাই ডেকরেটারের ব্যবসা খুলবে এবং নানা কংগ্রেস সম্মেলনে তাকিয়া সাপ্লাই দিয়ে লাল হয়ে যাবে। নকশালদের কোনো পরিকল্পনা ছিল কি? থাকলেও আগেভাগেই তো তারা মরে গেল। এরপর এল সি. পি. এম। এঁদের পরিকল্পনাটি খুবই মহতী। কারণ শিক্ষা, সাহিত্য, ব্যবসা, প্রোমোটারি ইত্যাদি বিভিন্ন মহলের কৃতী দিকপালদের পরামর্শের সঙ্গে অভ্রান্ত বিজ্ঞানের মিশ্রণ ঘটিয়ে এঁরা বাঙালির সামনে যে মডেলটি রাখলেন, তার নাম 'বাঁদর থেকে সি. পি. এম।' মানেটা খুবই সহজ— প্রথমে বাঁদর, তারপর বনমানুষ। এইভাবে নিয়ানডারথাল-অস্ট্রেলোপিথেকাস-রামাপিথেকাস-পিকিং ম্যান হয়ে হোমো কোম্পানির নানা ঘাটে জল খেয়ে লাস্টে দৃপ্ত সি. পি. এম—কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে বাঙালি পুরুষ ও নারী কোনো অজানা কিন্তু মায়াময় রক্তিম ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। পরিকল্পনাটি সাধু। যেমনই সরেস হল 'বঙ্গ' বা 'কলকাতা' বানানো। কিন্তু এর জন্যে সি. পি. এম-কে প্রথম যেটা বুঝতে হবে সেটা হল, এই বাঙালিকে দিয়ে অত খাটনির কাজ হবে না। দ্বিতীয়ত, যত ঘটা করেই ২৫ বৈশাখ আর ২২ শ্রাবণ হোক না কেন, বাঙালি মজ্জাগতভাবে ভালগার ও খিস্তিবাজ। যেখানে ভালগারিটির তিলমাত্র সুযোগ নেই, সেখানেও সে অপ্রতিরোধ্য। তা না হলে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের সামনে বাস দাঁড়ালে বাঙালি কন্ডাকটর 'টেস্টিকেল! টেস্টিকেল!' বলে চেঁচাবে কেন? কেনই বা বালিখালগামী বাসের কন্ডাক্টর (অবশ্যই বাঙালি) বর্ণবিপর্যয় ঘটিয়ে 'খালিবাল' বলে নান্দনিক পরিবেশ দূষিত করবে। কেনই বা বাঙালি রেসের বই বিক্রেতা বনেদিপাড়ায় সাইকেল নিয়ে 'হোলরেস' বা আরও সংক্ষেপে 'হোল!' 'হোল!' বলে গর্জন করবে? জানি না বাপু কী করে কী হবে। বাঙালি সম্বন্ধে তৃণমূলেরও নির্ঘাৎ একটি রমণীয় ছক রয়েছে, যা সম্বন্ধে সুচিন্তিত মন্তব্য করার সময় হয়নি এখনও। আর যে যাই বলুক, মুড়ি দিয়ে চা খাওয়াটা মোটেই নতুন কিছু নয়। বরং এর সঙ্গে তেলেভাজা জুড়লে প্রস্তাবটি জম্পেস আড্ডার প্রারম্ভিক পর্ব বলে ভাবাই যায়। এতই যখন হল, তখন বি. জে. পি-ই বাদ যায় কোন সুবাদে। রাধানাথ শিকদার এভারেস্ট মেপে নাম করেছিল। অপর এক সদাহাস্য শিকদারের কর্মসূচি খুবই সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর— 'মানুষ থেকে হনুমান।'

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯, যা অবধারিত তাই ঘটল। ঘটাং! ব্যাপারটি যে কী ঘনত্বের, সেটা বুঝতে গেলে এটুকু বুঝলেই হবে ইংরিজি বছরের শেষ দিনে পালে পালে, দঙ্গলে দঙ্গলে ভদির চেলার দল গুরুদেবকে নানা টাইপের মাল এবং চানাচুর, ডালমুট, মুড়ুক্কু, চিপকি ছোলা,

ঝালবাদাম, কাজু ভেট দিতে এসে দেখেছিল ভদি নেই। নলেন হেভি ভলুমে এফ. এম রেডিও বাজাচ্ছে এবং ভদির উঠোনে ওল্ড স্টাইল মেমেদের পোশাক-পরা বেচামণি খুবই দক্ষতার সঙ্গে ব্যালে টাইপের কিছু নাচছে এবং তার হাত দুটি বেড় দেওয়ার ভঙ্গি থেকে বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে, তার নাচের পার্টনারটি কোনো সাহেবের অদৃশ্য ভূত। নলেন সকলকেই বিষাদ ও হতাশায় নিমজ্জিত করে জানিয়ে দিল যে গত রাতেই জরুরি এত্তেলা পেয়ে সামরিক তৎপরতায় ভদিকে চলে যেতে হয়েছে।

—সেবার জন্যে যে না এনেচো রেকে মানে মানে কেটে পড়। হুড়ুমতাল করেচো কি মরেচো। নতুন বছরে দেখা হবে বলে গেচে। আরও বলেচে...

—কী? কী?

—বলেচে এঁড়ে বাছুরের ছোট টুঁ-তে দোষ নেই। কিন্তু গুঁতোগুঁতি করলে শিং ভেঙে গুহ্যদ্বারে ঢুকিয়ে দেবে।

—বছরের শেষ দিনটায় প্রভুর অন্তর্ধান ঘটল। জাপটে ধরে রাখতে পারলে না?

—এইজন্যেই তো বোকাচোদা বলতে ইচ্ছে করে। যিনি কথায় কথায় সূক্ষ্মদেহ ধারণ করেন, তাঁকে কি জাপটে ধরে রাখা যায় রে পাগল!

বেচামণি হঠাৎ খিলখিল হাসি-সহ অদৃশ্য ভূত পার্টনারের সঙ্গে ওয়ালজ্-এর ঢঙে ঘুরপাক খায়। এটি একটি আত্মারাম সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট ম্যাজিক আইটেম (ম্যাজিক রিয়ালিজম নয়) যার নাম গিলিগিলি পাম্প। কেন এই নাম তা কোনো গবেষক কোনোদিনও হদিশ করতে পারবে না। সে না হয় না পারল, কিন্তু 'কাঙাল মালসাট' যে রাবড়ির জালের থিওরিতে ঘ্যাঁতাচ্ছে সেটা লুক্কায়িত কর্মসূচি বা হিডেন এজেন্ডা থাকছে না। বুদ্ধিভ্রংশ পাঠক, তুমি বাবু লুচি বা নুচি কাহাকে বলে জানো? সেই লুচির ফোসকা দিয়ে রাবড়ি প্যাঁদানোর যে নারকীয় আনন্দ তাহা কখনই উপলব্ধি করিয়াছ? এই সান্ধ্য জলখাবারের পর যা অবশ্যকরণীয়, তা হল মাগিবাড়ি যাওয়া। পরের অধ্যায়ে দেখিবে যে সাক্ষী বড়িলাল কী অবলীলায় মাগিবাড়ি যাওয়া রপ্ত করিয়াছে। আরও দেখিবে যে, এমনও মানবশিশু আছে যাহারা ধরাধামে পা রাখিয়াই অধরা মস্করায় লীলাবান হয়। কখনও ঘুণাক্ষরেও ভুলিবে না যে পাগলের হাতে সংসার। যে-কোনো মোমেন্টে হাম্পু চলে যেতে পারে। পরে, আরও পরিপক্ক টুকটুকে মাকাল হইলে বুঝিবে সাহিত্যের শব্দসাধনা এক অলৌকিক ঠগবাজি যাহার পিছনে কাতিন অরণ্যে এন. কে. ভি. ডি দ্বারা নিহত ১৩,০০০ পোলদেশীয় অফিসার গুরুগম্ভীর মুখে বার্লিওজ-সৃষ্ট 'সিম্ফনি ফ্যানতাস্তিক'-এর 'মাচ' টু দা স্ক্যাফল্ড' অংশটি শুনিতেছে, আলি সরদার জাফরি উদাত্ত কণ্ঠে 'লোহু কি পুকার' হইতে আবৃত্তি করিতেছেন এবং রক্তস্নাত পেশোয়ার এক্সপ্রেস নিরন্তর শব বহন করিতেছে। লেখক বা পাঠক বা প্রকাশক বা সমালোচক— কেহই রেহাই পাইবে না। আপাতত— ঘটাং! কিন্তু তার আগে পায়খানা ধোলাই করার অ্যাসিডের সুইমিং পুলে যে লেখকরা বারমুডা পরিয়া লাফাইতে বদ্ধপরিকর, তাহাদের জন্য রচিত পুরন্দর ভাটের কয়েকটি অমোঘ লাইন—

আজ্ঞাবহ দাস, ওরে আজ্ঞাবহ দাস
সারা জীবন বাঁধলি আঁটি,
ছিঁড়লি বালের ঘাস,
আজ্ঞাবহ দাসমহাশয়, আজ্ঞাবহ দাস!
আজ্ঞাবহ দাসবাবাজী, আজ্ঞাবহ দাস,

যতই তাকাস আড়ে আড়ে,
হঠাৎ এসে ঢুকবে গাঁড়ে,
বাম্বু-ভিলার রেকটো-কিলার,
গাঁট-পাকানো বাঁশ,
আজ্ঞাবহ দাস রে আমার, আজ্ঞাবহ দাস।

ঘটাং শব্দে মাটি খোঁড়ায় বাধাপ্রাপ্ত সরখেল আরও কয়েকবার শাবল চালাল কিন্তু মোদ্দা ফল হল শাবলের ডগা ভোঁতা, সরখেলের হাতে ফোসকা এবং গুবলেট। তখনই সরখেল পূর্ববর্ণিত টেলিকম যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভদিকে খবর দেয় এবং ভদি সরখেলকে অবিলম্বে অপারেশন বন্ধ করতে বলে।

—'মাঁটি খোঁড়া বঁন্দ রাঁখো।'

—'তাঁরপঁর?'

—'অ্যাঃ দাঁতও বাঁদাবেঁ না। কীঁ যেঁ বাঁল বঁলো!'

—'বঁলচি, তাঁরপঁর?'

—'চুঁপচাঁপ থাঁকো। আঁমি যাঁবো।'

—'কঁখন?'

—'ভোঁররাঁতে। যঁকন সঁব শাঁলা ঘুঁমোবে।'

—'আঁচ্চা!'

একে শীতকাল, তায় ভোররাত। আদিগঙ্গার ধারে তখন শামুক-পচা কুয়াশায় একপাল প্রায় ন্যাংটো মানুষ শুভ কাজে লিপ্ত। এরা প্রেতযোনি প্রাপ্ত নয়। ফ্যাতাড়ু নয়। চোক্তার নয়। স্রেফ মানুষ। এদের কাজ হল আদিগঙ্গার ফাঁকফোঁকর, নিমজ্জিত টায়ার, ইঁট, জুতো, মালসা, খুরি ইত্যাদির গা থেকে কুচো কেঁচো ধরে লাল-নীল মাছের দোকানে সাপ্লাই করা। এরা কখনো তালা, টাইমপিস ঘড়ি, মরচে-পড়া নেপালা ও চেম্বারও পায়। এরা চালু মাল। ওই জলে নামলে পা কেটে টুকরো হয়ে যেতে পারে। তাই এরা টায়ারের চটি বা শক্তপোক্ত কিছু পরে নেয়। আবার হয়তো দেখা যাবে, কারো পায়ে অ্যাডিডাস, লট্টো বা নাইকি-র স্নিকার। কীভাবে এত দামি জুতো এদের পায়ে আসে? আসলে সব সময় হিঁয়া থেকে হুঁয়া মাল লেনদেন হচ্ছে। জালি, আসলি, চোরাই, লুট— নানা মালে বাজার ছয়লাপ। এমনটিই তো হবে-হবে শোনা গিয়েছিল। হলও এবারে। ঠেলাটা বোঝো। আসলে সব রকমের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধেই লোকের আইডিয়া হল হাতি পাদেগা, হাতি পাদেগা—ফুশ্। উল্টোটা যখন হয় তখন শালাদের চোখ খোলে না। কিন্তু তাহাতে আগচ্ছমান মহাহুলোর একগাছা লোমের ক্ষতিও হয় না।

ভোররাতে সরখেল ভদির পোশাক দেখে অবাক। একেবারেই সামরিক পোশাক। অলিভ গ্রিন প্যান্ট। পায়ে হান্টার জুতো। গায়ে ছোপ-ছোপ দাগ-মারা কম্যান্ডো উর্দি এবং তার ওপরে যে মিলিটারি জ্যাকেট, তা সিয়াচেন গ্লেসিয়ারে বেড়াবার সময় হামেশাই চোখে পড়ে।

—'নো হ্যাংকিপ্যাংকি। নো গাঁইগুঁই। প্রবলেমটা কী?'

—'সে তো আমার ঘটেও ঢুকছে না। হাত পাঁচেক খোঁড়ার পরেই ঘটাং।'

—'শাবল মেরে ডেপথ্ চার্জ-এর মতো উড়িয়ে দাও। সাবমেরিনকে যেভাবে ক্যালাতে হয়।'

—'হুঃ, শাবলই বলে উড়ে যাচ্ছে। এই দ্যাখো না, হাতে গেলে-যাওয়া ফোসকা। বোরোলিন লাগিয়েচি।'

—'ওরে, ব্যাটলফিল্ডে বোরোলিন-ফোরোলিন চলে না। যেখানে চোট লাগবে অ্যাম্পুট

করো। হাত, পা, মুণ্ডু সব পড়ে থাক। শুধু এগিয়ে চলো।'

—'তুমি এগোবে তো এগোও। আমার আর ধকে কুলোচ্চে না। তার ওপর ভয়ও আচে।'

—'কিসের ভয়? কাকে ভয়? যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়! হাসালে তুমি আমাকে সরখেল!'

—'ওসব সোনাই দীঘি-মার্কা ডায়লগ আমিও দু-চারটে ছাড়তে পারি—

'দূত এসে বলল, মহারাজ! মহারাজ! দূর্গে শত্রু-সৈন্য ঢুকে পড়েচে। মহারাজ বলল, এই রে, গাঁড় মারিয়েচে। প্রম্পটার প্রম্পট্ করে শোনা নাহি যায়। চলো, রানি, অন্তঃপুরে গিয়ে প্রস্রাব করি।'

ভদি চুলবুলিয়ে হেসে ওঠে। গড়ায়।

—'টপ! টপ! ওঃ সরখেল, সলিড ছেড়েছ। এইবার গা-টা গরম হয়েচে। বলো, ভয় পাচ্চো কেন গো?'

—'আমি ভাবচি মোটা লোহার পাইপ। হয় শালা ভেতরে ইলেক্ট্রিকের তার নয়তো সায়েবদের বসানো গু-মুতের লাইন। ভাঙতে গিয়ে হয় কারেন্ট, নয়তো নফর কুণ্ডু কেস!'

—'শোনো, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক খোঁজপত্তর করে তোমার বাড়ির এই স্পটটা বাছা হয়েছিল। এখান দিয়ে লাইন যেতে পারে না। জল না, কারেন্ট না, গু না, কিচ্ছু না।'

—'তবে, ঘটাং করল কীসে?'

দুজনকেই চমকে দিয়ে ফিকে অন্ধকারে কেউ বলে উঠল,

—'কামান।'

বিশাল দাঁড়কাক অন্ধকার মেখে এমনভাবে ঘাপটি মেরে আছে যে বোঝবার জো নেই।

—'বাবা!'

—'হ্যাঁগো ভদিসোনা'।

—'এই ঠাণ্ডায়, একেবারে আদুল গায়ে...'

—'থাক, আর পিতৃভক্তি মারাতে হবে না। এবার যা বলচি শোন— আমার চোখে হঠাৎ নাইট-ভিশন এসে গেল— পষ্ট দেখলুম ওটা কামান।'

—'তাহলে কী হবে?'

—'ঘাবড়াবার কিছু নেই। কামানটা বড় নয়, ছোট। বলতে পারিস নুনুকামান।'

—'আঁজ্ঞে, দুমদাম কিছু হতে পারে?'

—'ভয়েতেই গেলি। ভেতরে গোলা নেই, বারুদ নেই। স্রেফ মাটি। হাত দেড়েক ছেড়ে বাঁদিকে ঝপাঝপ দুজনে মিলে খোঁড়্। তাহলেই হারামিটাকে তোলা যাবে।'

ভদি শাবল চালায়। সরখেল ভাঙা গামলায় মাটি সরায়। ভদি ঘেমে গিয়ে জ্যাকেটটা খুলে ফেলে। ঘপঘপ শাবল চালায়। এদিকে মাটিটা ঝুরঝুরে ছিল, তাই বেশি সময় লাগে না। শাবল ঢুকিয়ে বোঝা যায় যে কামানের একটা দিক শেষ হয়েছে।

—'মাথায় তোদের ভগবান বুদ্ধি বাদে সব দিয়েচে। এবার শাবলের কাজ আর নেই। শিক দিয়ে এপাশ ওপাশ আলগা কর। তারপর নেমে টেনে তোল।'

রোগা বলে সরখেলই নামে। কিন্তু শিক চালাবার পরেও কামান নড়াতে পারে না।

—'এ তো ঝকমারি হল! মাল নড়চে না।'

—'নড়বেও না। তলা দিয়ে দড়ি ঢোকা। তারপর ওপরে উঠে দুজন মিলে দু-দিক দিয়ে টান। ব্যাটা না উঠলেও কেৎরে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর তুলবি।'

আরো বেশ কিছুক্ষণ কসরত করার পরে হাত দুয়েক বেবি কামানটি ডাঙায় উঠে আসে।

pathagar.net

আকাশে বেশ আলো ধরেছে। রোজই ধরে।

সরখেল চেঁচে চেঁচে মাটি সরায়। গোড়ার দিক, মানে তোপ দাগার দিকটায় ডুমো মতো। মুখটা আবার সিংহের আদলে।

—'কাদের মাল এটা বুজলি?'

—'ধোয়া-মোছা করলে হয়তো লেখা-ফেখা কিছু বেরুবে।'

—'সে বেরুকগে। মালটা পোর্তুগীজ জলদস্যুদের। তখন তো আদিগঙ্গা ওখান দিয়ে বইত না। বিস্তর নৌকাও চলত। পোর্তুগীজ হার্মাদদের বোটে এই কামানগুলো থাকত। বজরা-ফজরা হলে এক গোলাতেই কুপোকাত। যে সে কামান নয়। খোদ লিসবনে বানানো।'

—'এখনও মালটা চালানো যাবে?'

—'যাবে না কেন? তবে যত্ন-মেহনত করতে হবে। বারুদ চাই। গোলা চাই।'

—'তাহলে কি মালটা আমরা স্টক করব?'

প্রশ্নটা সরখেলের। কারণ ভদি গোপনে যে অস্ত্রাগারটি বাড়িয়ে চলেছে তার দেখভাল সরখেলই করে।

—'যাদুঘর বা সায়েব ধরে বেচে দিলে ভালো মাল্লু পাওয়া যাবে। সব পুরনো মালের এখন হেভি বাজার।'

—'পাত্তি কিছু হবে। কিন্তু এই লোহা, এই মেকদার আর হবে না। আমি বলি কি, মালটা ধোলাই-ফোলাই করে কেরোসিন দিয়ে পালিশ কর। আমাদের স্টকেই থাক। এখনও গুছিয়ে ঝাড়তে পারলে একশো হাত দূরে পুলিশভ্যানের বিচি উড়ে যাবে।'

—'বাবা যখন বলচেন সরখেল তকন আর কতা বাড়িয়ে লাভ নেই মালটাকে আমরা স্টক করব।'

দাঁড়কাক ডানা ঝাপটাল।

—'তোরা বরং কামানটাকে রেডি কর। বছরের শেষ দিনে ভাল কাজ করলে ফল পাবি।'

—'আপনি থাকবেন না! তা হলে আমাদের গাইড করবে কে?'

—'আরে বাবা, এখন আমাদের এলিয়ট রোড যেতে হবে। সেখানে বেকারির পোড়া কেক্ খেয়ে সায়েবদের গোরস্থান। সেখান থেকে নিমতলা। এখন আমার দিনভর কাজ। পরে আমি আসব। এখন তো শুধু সাফসুরৎ করা। দুমদাম সব পরে।'

দণ্ডবায়স প্রশস্ত ডানা মেলিয়া উড়িয়া গেল। কাক, চড়াই, শালিখ ইত্যাদিরা ডাকাডাকি শুরু করিয়াছে। এই প্রভাত বড়ই মঙ্গলময়।

ভদি ও সরখেল পোর্তুগীজ কামানটি বহন করে দ্বিতলের কক্ষে নিয়ে যায়।

—'বাবা ঠিকই বলেচে। কত বছর মাটিতে পোঁতা ছিল কে জানে, কিন্তু কোনো মরচেফরচের বালাই নেই।'

—'পোর্তুগীজরা ভাল কামানিয়া ছিল বলতে হবে।'

—সে তো ছিলই। কোথায় এক এক রত্তি দেশ। সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে এসে আদি গঙ্গায় দমাদ্দম্ কামান দাগচে। টাকা, গয়না, মাগি— সব দুহাতে লুটচে। ভাবলেই ভয় করে।'

—'আমি একজন পোর্তুগীজ রংবাজের নাম জানি।'

—'কী?'

—'কারভালো।'

—'দূর! ও তো থিয়েটারের দেওয়া নাম। এককালে কারভালোর পার্ট বলে ভূমেন রায়—

হেভি নাম করেছিল।'

—'তা হবে।'

—'হবে না, হয়েচে। যাক আমি তো এদিকে ভেবে হাল্লাক হচ্চি যে মাটি খোঁড়া যদি ভেস্তে যায় তাহলে কিসের জোরে আমরা লড়ব?'

—'চিন্তাটা আমারও হয়েছিল। এত বড় একটা যুদ্ধের ছক।'

—'যাই হোক, ভগবান সহায়। বুজলে? তা না হলে শালা কিচুর মধ্যে কিচু নেই, হঠাৎ আমাদের হাতে পোর্তুগীজ কামান। ওফ্, একেবারে কামাল করে দেব। লাগুক না একবার।'

—কী কী মাল আমাদের জোগাড় হল তার একটা লিস্ট করতে হবে। তবে আমার একটা খটকা লাগছে।'

—'কিসের আবার খটকা?'

—'বন্দুকের লাইনে আমরা কিন্তু বেশি কিছু করতে পারিনি। একটা দোনলা গাদা তাও সেই মান্ধাতার আমলের। আর দুটো ঢপের পিস্তল।'

—'কমটা কি হে? কামান, বন্দুক, পিস্তল।' এরপর তোমার গিয়ে ছুরি, কাঁচি তারপর তোমার গিয়ে শাবল— সব এক করে ভাবো।'

—'কিন্তু যে প্ল্যান আমাদের...'

—'রোসো সরখেল, রোসো। কোনো মিলিটারি জানবে একদিনে তৈরি হয় না। আজ আমাদের অস্ত্রাগার দেখলে লোকে বলবে, হাসি পায় রিজিয়ার চাপদাড়ি দেখে। কিন্তু যখন দেকবে আদিগঙ্গায় ডুবোজাহাজের পেরিস্কোপ উঁকি মারচে, ঘাটে ঘাটে মাইন ভাসচে, জাহাজী সব ছ-ঘরা, দশ-ঘরা হাতে হাতে ঘুরচে তখন? ভয়তে পোঁদ শুকিয়ে যাবে। আর আর-একটা জিনিস মনে রাখবে। মোক্ষম।

—কী?

—নিজেদের মাল তবিল নিয়ে এমন ক্যামপেন চালাবে যে শত্রুর কানে যখন পৌঁছবে তখন ব্যাটা চমকে উঠবে। কানাঘুষো শুরু করে দিতে হবে। তবে টাইম বুজে। যেমন, আমাদের বলতে হবে আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্স— সব আমাদের আচে।

—নেভি? এয়ারফোর্স!

—ও কোনো ব্যাপারই না। একটু মাথা খাটালেই সাবমেরিন বানানো যায়। কিচুই না। নৌকো প্লাস ডুবসাঁতার ইজইকুয়ালটু সাবমেরিন।

—কিন্তু এয়ারফোর্স?

—কেন? চাকতি তো উড়চেই। কী ফোর্স! তারপর ফ্যাতাড়ুরা যদি হাই অল্টিচুড থেকে পেটো ড্রপ করে! বাবা আচেন।

—তাইতো। ভুলেই গিয়েছিলাম।

—এইতো সরখেল, নিজের তাগৎ নিজেকে জানতে হবে। এটা হল যুদ্ধের একেবারে গোড়ার কতা। অন্যটি করেচো কি মরেচো। এরপর হল প্ল্যান। শত্রু হয়তো ঢুকচে। আয় বাবা, আয় বাবা করে তুমি ঢুকতে দিচ্চো। সে বানচোৎও ভাবচে যে কেল্লা ফতে করে এনিচি। আচমকা শালা সাঁড়াশি থিওরিতে দুপাশ থেকে ধুমা ক্যালাও। এইরকম আর কী। আসল ব্যাপার হল ঘটে মাল থাকতে হবে। ইতিহাসে দেকবে বড় বড় সব দেশ— ইয়া আর্মি, তারপর গিয়ে উড়োজাহাজ— ছোট কোনো দেশের পোঁদে লাগতে গেল। তারপর হেগেমুতে এক্সা। এইসা ঝাড় যে ছোঁচানোর টাইম অবদি দেবেনা।

কথাবার্তার এই ধাঁচের মধ্যে ক্রমশ সত্যই কি প্রতীয়মান হয় না যে চোক্তাদের পরিকল্পনায় সম্মুখসমর বা ওই জাতীয় কিছু ভালোভাবেই রয়েছে? তবে এখনই পাঠক কি জানতে চায় যে পোজিশনাল ওয়ারফেয়ার না গেরিলা সংঘর্ষ— কোনদিকে 'কাঙাল মালসাট' চলেছে? মাও, লিন পিয়াও, টিটো, গিয়াপ, ফিদেল, চে— কোন কায়দায় লড়াই হবে? দুপক্ষই কি বাঙালি হবে না বিদেশি ভাড়াটে সেনারাও আসরে নামবে? আর যদি সত্যিই একটা বেধড়ক ক্যালাকেলি শুরু হয়ে যায় তাহলে পাঠক কোন দিকে ভিড়বে? এই সব ক-টি প্রশ্নই খুবই খুবই মূল্যবান, মাল্যবান ও জরুরি। কিন্তু এই হিমভোরে সদ্য কামান বেরোবার রণনীতি বা কৌশল সম্বন্ধে যার তিলমাত্র ধারণাও আছে সে-ই অনুধাবন করবে উপরোক্ত অবস্থান কতটা যুক্তিসঙ্গত। এই বোধ যদি ঘরে ঘরে জাগ্রত হত তাহলে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, বেঙ্গল রেজিমেন্ট বলে হেদিয়ে মরতে হত না। বাপ্ বাপ্ বলে বেঙ্গল রেজিমেন্ট তৈরি হত এবং বীরত্বে সকলকে ধুড় বানিয়ে ছাড়ত।

চন্দননগরের জনৈক বিখ্যাত বাঙালি একবার লিখেছিলেন,

'হারান চক্রবর্তী মহাশয় যথেষ্ট বলশালী ছিলেন। তিনি উদয়চাঁদ নন্দীর বাগানে একটি বড় লিচু গাছ বিনা অস্ত্রসাহায্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। দুইজনে সজোরে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিলেও তিনি একটি রম্ভা গলাধঃকরণ করিতে পারিতেন। গগনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুরন্ত ঘোড়াকে ভূমি হইতে শূন্যে তুলিয়াছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে পালপাড়ার বীরচাঁদ বড়ালের বাটীতে পালপাড়ার দলের উদ্যোগে ফরাসী গভর্নর বাহাদুরকে দেখাইবার জন্য ব্যায়ামক্রীড়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। লাটসাহেব তাহা দেখিয়া বাঙালীর ছেলের বল ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।'

কে তিনি? তিনি কে গো? কে গা? এর একমাত্র জবাব বাঙালির নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা। লজ্জায় আর কত অধোবদন হইতে হইবে? (চলবে)

৯

যে সন্দেহ এইবার বার বার উঁকি মারিবে ও ফিক্ করিয়া হাসি করিয়া ফেলিবে তাহা হউক এই যে 'কাঙাল মালসাট' কপর্দকহীনদের জন্য এক ব্যাদড়া কুইজ নাকি অন্য কোনো অভিসন্ধিমূলক অভিযান? যে কোম্পানি এই অহৈতুকি ব্যবসা খুলিয়াছে তাহাদের মুখে হয় লুপ নয়তো কুলু। এমন কেন হল গো? এও কি চাকতির হুজ্জতি। ইজ এনিবডি আউট দেয়ার? শুনশান। অনেকটা পায়খানার দরজায় আকুল ধাক্কার মতো? ভেতরে কে? সায়লেন্স। এই ঝুটঝামেলা অত সহজে মেটার নয়। এবং এর সমাধানের জন্য বঙ্গবালক ও বঙ্গবালিকাদের যে পদ্ধতি ইস্তেমাল করতে হবে তা যেমনই দুর্লভ তেমনই অনায়াস। 'আট'-এর শ্বাস ওঠার সময় চন্দননগরের জনৈক বিখ্যাত বাঙালির একটি গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের কিয়দংশ মুদ্রিত হয়েছিল যদি না প্রেসের ভুলে উড়ে যায়। সেই বাঙালিকে আমরা টুনি লাইটের আলোকসজ্জার মধ্যে গবাক্ষে হাস্যময় বলে ভাবতে পারি। তিনি ছিলেন অথবা হইলেন হরিহর শেট। ভবিষ্যতেও থাকিবেন। যেমন থাকিবে ডাইনোসরের ডিম, তবলার বিড়ের মতো দেখতে একটা জিনিস মাথায় বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি ও পৃথিবীর নানান গলতায় প্রোথিত টাইম ক্যাপসুল। কারো কোনো ওজর আপত্তি ধর্তব্যে নেওয়া হবে না। এরই মধ্যে পুনরায় সেই পরিচিত ওঁয়া ওঁয়া ধ্বনি!

মালের ধুনকি যদি কাটে, বাগিচায় খোঁয়ারি যদি ভাঙে তাহলে সাহস সঞ্চয় করে পাঠককে ইন্টারোগেট করা যায় যে উপরোক্ত ওঁয়া ওঁয়া-র একটি আগাম সতর্কবাণী আগেই আছে এবং তা কোথায়? কোনো হাত ওঠে না কারণ সবগুলিই চুলকাতে ব্যস্ত। ধিক্। শতধিক্। অক্টোবর '৯৯-এর শেষ হপ্তার মুখে ডি. এস-এর কবুলিতে কি জানা যায়নি যে তার বউ-এর আট মাস চলছে। চলছে মানে শুরু হয়েছে এমনই বা না হবে কেন? বরং দশ মাস দশ দিন, চিনতে না পারলে গলায় দড়ির দাগ, মা হওয়া কি মুখের কথা— সব অঙ্ক মেলানোর জন্যে তেমনই হতে হবে। হলও।

২০০০-এর জানুয়ারিতে, আগেকার কথা মতো, 'শিশুমার মেটারনিটি হোম'-এ, ড. গজেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরি বা যে নামে তিনি অধিকতর পরিচিত সেই গায়নো গজার নার্সিং হোম-এ সিজারিয়ান পদ্ধতিতে ডি. এস-এর কালো, মোটা, অল্প গোঁফওয়ালা ব্যাঙের মতো বউ-এর পেট কেটে জালি বা আসলি (দ্বিমত আছে) সহস্রাব্দের প্রথম ফ্যাতাড়ু জুনিয়রকে বের করা হল। নার্সিং হোমটির নাম শুনলে অবধারিতভাবে মনে হবে যে এখানে শিশুদের মেরে ফেলাটাই বিশেষত্ব। তা কিন্তু নয়। 'শিশুমার' শব্দটির আভিধানিক অর্থ জলকপি বা শুশুক। গজেন্দ্রকুমার শিশুকালে বাবার কোলে বসে দেখেছিল গঙ্গা বক্ষে শুশুক হু হু করে উঠছে ও তলিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ জলকপির দল এরকমই করেই চলেছে, করে চলেছেই। এই দৃশ্যটি গজেন্দ্রকুমারের শিশু মনে গভীর দাগ কাটে। এভাবেই তাঁর মধ্যে শুশুকের প্রতি দায়বদ্ধতা গড়ে ওঠে। তারই ফল পরিণামে হল 'শিশুমার মেটারনিটি হোম'।

বাইরে দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষমান ডি. এস, মদন ও পুরন্দর ভাট। সেখানে আরো পাবলিক রয়েছে। শীতের পোশাক কিন্তু উত্তেজনার গরম। ফুটের দোকান থেকে চা আনে পুরন্দর। সে নিজে আনে না। খাঁচাসদৃশ বস্তুটিতে গেলাস বসিয়ে আনে একটি পেটমোটা শিশু শ্রমিক। পুরন্দরের হাতে বাতিল লটারির টিকিটে মোড়ানো তিনটি বিস্কুট।

—ফার্স্ট বাপ হবে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে বলির পাঁঠা।

—আঃ পুরন্দর। সংসারধর্ম করনি তো। আলপটকা ওরকম বলা যায়। ডি. এস-এর অবস্থায় পড়লে বুঝতে।

—ক্ষ্যামোতা থাকলে একটা বিয়ে করেই ফেলো না। হিম্মত দেখি!

—তোমাকে হিম্মত দেখাতে গিয়ে গাঁড় মারাবার চক্করে আমি নেই। আর কবিদের কেসটা আলাদা। সব মনে মনে হয়।

—মানে?

—পরে একদিন বুঝিয়ে দেব। আরে বিস্কুটটা কামড়াবে তো!

—ভুলেই গেছি যে হাতে বিস্কুট।

—এরপর হাতে হ্যারিকেন ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

ঠিক এই সময়েই কালো পাথরের কানা উঁচু থালায় জল জমিয়ে ভদি উবু হয়ে বসে দেখছিল। নলেন জমাদারের সঙ্গে নালি পরিষ্কার করা নিয়ে ঝগড়া করছিল। বেচামণি স্নান সেরে পিঠের দিকে গামছা ধরে মাথা হেলিয়ে চুলে সপাট্ সপাট্ ঝাড়ছিল এবং ভদির বাবা ছাদের আলসেতে বসে দেখছিল যে বউমা-র মাথা থেকে জলকণাগণ সহসা উড়িয়া উঠিতেছে ও রোদ্দুরে রামধনুর রং এই আছে, এই নেই।

—যাক বাবা, ভালোয় ভালোয় হয়ে গেল।

বেচামণি আপনসুখে বলে,

—কী হল গো ভালোয় ভালোয়?

—ডি. এস-এর বাচ্চা হল। তা না তো কি তোমার পিণ্ডি হবে?

—কতা বলার ও কী ধরণ গো?

দাঁড়কাক ঘ্যাঁক করে ওঠে,

—ভালো করে মুখ না ছুঁচোলে অমন হয়। ছেলে না মেয়ে হল সেটা বলবি তো?

—ছেলে হয়েচে! এই নাদাপেটা!

বেচামণি খিলখিলিয়ে ওঠে,

—আমি আগেই বলেছিলুম!

ভদি ফের খিঁচিয়ে উঠতে গিয়ে বাপের কথা ভেবে গুটিয়ে যায়।

দাঁড়কাক ডানা ঝাপটায়।

—বাবা কি চললেন নাকি?

—যাই, বনি বেবি হয়েচে, বেগম জনসনকে খপরটা দিয়ে আসি। আগে হলে গড়ের বাদ্যি বসত। হিজড়ের নাচ হত।

দাঁড়কাক উড়ে চলে গেল

টাকলা ও. সি-র টেবিলে ফোন বাজল।

—হ্যালো!

—ওঁয়া! ওঁয়া!

—হ্যালো!

—ওঁয়া! ওঁয়া!

পার্টি অপিসে কমরেড আচার্য-র ফোনও ডেকে ওঠে। কিন্তু কমরেড আচার্য না থাকাতে ফোন বেজে বেজে থেমে যায়। কমরেড আচার্য, আপনি আগামী সম্মেলনের জন্যে খচড়া প্রস্তাব রচনায় লেগে থাকুন। ওদিকে যা হওয়ার তা হয়ে গেল। এর দাম আপনাকে দিতে হবে। আপনি চান বা না চান চোক্তাররা চমকাবে এবং ফ্যাতাড়ুদের বংশবৃদ্ধি ঘটবে। চাকতি উড়বে। বেগম জনসন গ্র্যান্ড পার্টি ডাকবেন। পাতিয়ালার মহারাজা ১০০১ টা নীলচে সাদা হীরের ব্রেস্টপ্লেট পরে উদোম ন্যাংটো হয়ে বছরে একবার করে নগর পরিক্রমায় বেরোবেন। জন স্টুয়ার্ট মিল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে ভারত একটি vast system of outdoor relief for Britains's upper classes হয়ে উঠেছে। চার্চিল বলবেন, I hate Indians, they are absolutely people with a beastly religion কাপুরথালায় একবার পালে পালে পঙ্গপাল ঢুকে ফসলের দফা রফা করে দিয়েছিল। এখন যেমন পঙ্গপাল ছাড়াই কাজটা হয়। তখন প্রজাদের হাঁউ মাউ কান্না শুনে কাপুরথালার মহা মাগিবাজ মহারাজা বলেছিলেন, Let the locasts dance, we are going to dance in Paris কমরেড আচার্য, আপনি খচড়া প্রস্তাব লিখতে থাকুন। আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আপনি আমাদের ওপর ভরসা রাখতে পারেন। আমরা চোরাবালির মতোই মমতাময়।

গোলাপি লিপিস্টিক চুলবুলে ঠোঁট আবছা ফাঁক করে ট্রেইনি নার্স মিস চাঁপা এসে ফিসফিসিয়ে উঠল,

—মিঃ ডি. এস কে আছেন?

—অ্যাঁ।

—আপনি মিঃ ডি. এস?

pathagar.net

—ইয়েস।

—ডক্টর রেচাউড্রে কথা বলবেন। প্লিজ কাম উইথ মি।

ডি. এস ঘামতে ঘামতে মিস চাঁপার সঙ্গে গিয়ে দেখে গায়নো গজার হাল খুবই বেসামাল। মালটা ঠ্যাংদুটো টেবিলে উঠিয়ে দিয়ে চেয়ারে কেলিয়ে রয়েছে। মাথায় ভিজে তোয়ালে দেওয়া। এবং সিনিয়র মেট্রন মিসেস পোড়েল গজার বাঁহাতটা মালিশ করচে।

—আপনি?

—কী?

—না, মানে, ওই যে ছেলেটা হল সেটার বাপ আপনি?

—ছেলে হয়েছে?

—ওপর ওপর দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি, তারপর গিয়ে আপনার বউ—আপনারা কী বলুন তো?

—মানে?

—মানে, সোজা, আপনারা কি মানুষ না ভূত-ফুৎ কিছু?

—কেন বলুন তো?

—কেন? দুনিয়ায় যত বাচ্চা পয়দা হয় সব কেঁদে ওঠে। আপনার ছেলে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল আর নাভি কাটার পরই, লাইক আ বার্ড, উড়তে শুরু করল—

—কেমন আছে ওরা?

—ভালো আছে। মা-র জ্ঞান ফিরবে একটু পরেই। কিন্তু...

ডি. এস কিছু বলার আগেই পেছন থেকে মদন আর পুরন্দর ঢুকে পড়ে।

—কোনো কিন্তু ফিন্তু নয়। মা, বাচ্চার কোনো এদিক ওদিক হলে কিন্তু গায়নো কোম্পানির তেশ মেরে দেব।

—আপনারা?

—চোপ। কোনো বেগড়বাঁই নেহি চলেগা। আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমরা মানুষ। কিন্তু আবার মানুষও নই। দেখবেন ছোট করে একটা ঘুঘুচক্কর?

ড. রায়চৌধুরি ওরফে গায়নো গজা, মিসেস পোড়েল এবং মিস চাঁপার বিস্ফারিত চোখের সামনে তিন ফ্যাতাড়ুই টেক অফ করল এবং হাত পাঁচেক উঠে হেলিকপ্টারের মতো দাঁড়িয়ে গেল। দুপাশে হাতগুলো ডানার মতো ওঠা নামা করছে। তিনজনেই দাঁত কেলিয়ে দিয়েছে। ডাঙায়ও তিনজন। তাদের প্রায় দাঁতকপাটির জোগাড়। ছটি স্তম্ভিত চোখের সামনে তিনজনেই ল্যান্ড করল।

ড. রায়চৌধুরির নির্দেশে তড়িঘড়ি মিসেস পোড়েল ও মিস চাঁপা কেটে পড়ল।

—কদিন লাগবে?

—হপ্তাখানেক তো বটেই। মানে মাদার, একটু বেশি বয়েস তো তাই ভাবছি...

—ও সে যা ভাবাভাবির আপনি করে ফেলুন। আমাদের কিছুটি বলার নেই। ডাক্তারি ব্যাপারে আমরা নাক-ফাক গলাচ্ছি না।

—'ডাক্তারি করে ডাক্তার
মোক্তারি করে মোক্তার
ফ্যাতাড়ুরা খেলে হারামির হাটে
চোক্তারি করে চোক্তার।'

কী বুঝলেন?

—আমার বুঝে কাজ নেই। যা বলার আপনারাই বলুন।

—তার মানে আনকন্ডিশনাল সারেন্ডার।

—শুনুন। অপরাধ নেবেন না। আমাদের হাতে পয়াকড়ি হেভি টাইট বুঝলেন। এদিকে আমাদের আগেভাগেই তো গাঁড়ে হনুমানের বাচ্চা চলে যাওয়ার জোগাড়। আপনার ছুরি ধরা, ও. টি চার্জ, বেড ভাড়া, আয়া— অত খরচা আমরা দিতে পারব না।

—পারলেও দেব না।

গরিবের গাঁড় যারা মারে।

ফ্যাতাড়ুরা হাগে তার ঘাড়ে।

—দোহাই, ওইটি করবেন না। আমি তো আপনাদের কোনো কথাতেই না বলিনি। আপনাদের যা প্রাণ চায় দেবেন। আমার কিছু বলার নেই।

—আমাদেরও আর কিছু বলার নেই।

—আপনি কি মাল খান?

—আমি?

—হ্যাঁ, তবে কি আমরা?

—আঁজ্ঞে, দিনান্তে সামান্য একটু ধরুন পেগ দেড়েক ব্রান্ডি!

—খুব ভালো। আপনাকে ভালো মাল খাওয়াব, ফরেন। মা বাচ্চাকে ভালো করে দেখুন। দেখবেন আপনার জন্যে কেমন জান লড়িয়ে দেব। কোনো অসুবিধা হবে না। এরপর একদিন আপনাকে ভদিদার ঠেকে নিয়ে যাব। দেখবেন ছপ্পড় খুলে যাবে। মাটাডোরে করে টাকা নিয়ে যেতে হবে। যা কিছু হচ্ছে সবই ভদিদার কৃপা।

—যাব। নিশ্চয়ই যাব। ওঁর কি কোনো আশ্রম আছে?

—আরে ওসব ভগবানের বাচ্চা ধরার কেস নয়। ভদিদা হল আপনার আমার মতোই। তবে হেভি কৃপা।

—নিশ্চয় যাব। আসবেন যখন ইচ্ছে।

—না, অন্যায়টা আমাদের করতে বলবেন না। ভদিদার বারণ আছে। আমরা ভিজিটিং আওয়ারেই আসব। বেটাইমে আসত যাব কেন?

—বেটাইমে এলে দারোয়ান দাঁত খিঁচোবে। আমরাও বেকার খচে লাথ-ফাত ঝেড়ে দেব। মধ্যে থেকে আপনার নার্সিং হোমের বদনাম। কোনো ক্যাচালে আমরা নেই।

—আজ তাহলে আমরা আসি?

—আসুন ভাই। আসুন। কী কপাল যে আপনাদের দেখা পেলাম। ভদিদাকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাবেন। একটু যদি কৃপা করে দেন। তেতলায় একটা এ. সি. ওয়ার্ড খুলব বলে মনে ভেবেছি। মাড়োয়ারিরা এ. সি চায়। পলিটিকাল লিডাররাও।

—সব হয়ে যাবে। ভদিদা একটু ছোট করে একটা মুচকি দিলেই কারো বাপ ঠেকাতে পারবে না।

শিশু ফ্যাতাড়ু ফড়ফড় করিয়া উড়িয়া বেড়ায় ও শূন্যে ডিগবাজি খায়। ডি. এস-এর বউ-এর জ্ঞান আসে এবং সিজার কেসে সচরাচর যা হয় তেমন নয়। কোনো ককানি ফকানি নয়। বেদনায় কাতর মুখমণ্ডল নয়। উড়ন্ত শিশুর দিকে হাসিমুখে মা দুহাত বাড়িয়ে দেয়। অমনি সেই শিশু বোঁ করিয়া দুধভরা মাই লক্ষ করিয়া ডাইভ মারে।

কলকাতার পোজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টারের তারাবীক্ষণ যন্ত্রে সহসা বহুত সংখ্যায় উড়ন্ত চাকি দেখা গিয়েছিল। সেন্টারের ডিরেক্টর মিঃ সিকদার স্বচক্ষে একাধিক চাকতি দেখেছিলেন। কিন্তু মানেননি। কারণ আসলি বিজ্ঞান উড়ন্ত চাকি-ফাকি মানে না। কল্পবিজ্ঞান বা পরাবিজ্ঞানকে আসলি মালের সঙ্গে ঘেঁটেঘুঁটে পয়মাল করে দেওয়ার যে অব্যর্থ চক্রান্ত চালু হয়েছে মিঃ সিকদার তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। নানা সেমিনারে, বিতর্ক সভায় ও টিভিতে তাঁর হুংকারে চমকে ওঠার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। অবশ্য এই 'আমাদের' মধ্যে বিজ্ঞানমস্ক পাঠকরাও কি পড়েন? ছোট্ট বন্ধুদের মধ্যে কেউ বলতে পারবে? ছোট্ট বন্ধুরাই বা কারা? আসরেই কি সব পাওয়া যায়? গল্পদাদুর বউ কি গল্পদিদিমা? এরকম ২০০০টি অসমাধিত হেঁয়ালির বই 'আনি মানি জানি না'-র চতুর্দশ সংস্করণের কয়েকটি কপি এখনও পুস্তকরাজির ছাইভস্মের মধ্যে ছুপা রুস্তম হয়ে গা ঢাকা দিয়ে আছে। 'এটির মধ্যে ওটি দিয়ে, মাগভাতারে রইল শুয়ে।' এর মানে কিন্তু যা ভাবা স্বাভাবিক তা নয়। এর অর্থ হল খিল। হেঁয়ালির জট খুবই জটিল। রুবিকের কিউব যেমন। ওপথে মহাজনদের শনৈঃ শনৈঃ যাওয়া আসা চলতে থাকুক। রাত বেড়েছে। চাদরমুড়ি দিয়ে বড়িলাল এই শীতের রাতে কোথায় যায়? কেন যায়? কেচ্ছার চান্সটা যেহেতু এই দিকেই তাই সেই দিকেই মনোনিবেশ করা যেতে পারে।

মন্দিরের পেছনের গলি দিয়ে বেরিয়ে বড়িলাল কিন্তু থমকে গেল। আদিগঙ্গার দিক থেকে একটা আঁশটে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। কিন্তু সে কারণে বড়িলাল দাঁড়ায়নি। একটা ভারি গাড়ির আওয়াজ জোরে হচ্ছিল। তার একটা হেডলাইট জ্বলছিল বলে ফুটপাথের এক সাইডেই বেশি আলো এবং হবি তো হ বড়িলাল পড়েছিল সেই দিকেই। গোঁ গোঁ, ঝড়র লঝড় শব্দ আর কার হতে পারে। ক. পু-র একটি ভ্যান যা কালবিলম্ব না করে ওজন দরে ঝেড়ে দিলেও গরিব'ও বঞ্চিত সরকারের ঘরে কয়েকটা পয়সা আসবে। ভেতরে ড্রাইভারের পাশে বসে টাকলা ও. সি। পেছনে তিনটে ঝিম মারা কনস্টেবল। এদিকটায় আনকা যারা মাগিবাড়িতে যায় তাদের ডবল ছেনতাই হয়—ছেনতাইবাজরা ঝেড়েঝুড়ে নেওয়ার পরে পুলিশের হাতসাফাই। এসব জৈব ভয় বড়িলালের না থাকলেও সে স্ট্যাচু হয়ে রইল এবং একচোখে ভ্যানটিকে নিরাপদ দূরত্ব অবধি যেতে দিল। চাদরমুড়ি বড়িলালের কাঁধে একটি বিবর্ণ বুদ্ধিজীবী ব্যাগ যার মধ্যে কাগজে জড়ানো একটি রামের পাঁইট। অতিবিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া বড়িলাল মালমুল টাচ্ করে না কিন্তু যখন খায় তখন ছ্যাঁচোড়ের মতো খায় না। বড়িলালের এই হিসেবী সংযম নিশ্চয়ই পাঠকদের একাংশ অনুকরণীয় বলে মনে করবেন। কিন্তু এই প্রস্তাব পাঁড় ও টুপভুজঙ্গদের অন্তরে কোনো বিবেচনার ঢেউ তুলবে না। তার কারণ কিন্তু হারামিপনা নয়। দেদারে যারা মাল প্যাঁদায় তাদের গুরু ও লঘু মস্তিষ্কে কিছু ভাইটাল রদবদল ঘটতে থাকে। সেই নিউরন-সমাহারগুলি অলস তাসা পার্টির সঙ্গে তুলনীয় যারা বায়না ফিরিয়ে দেয়। এর পরিণতি বিবেচনাবোধের হ্রাস, গতরাতের বাওয়াল ভুলে যাওয়া ইত্যাদি নানাবিধ সিনড্রোম যা নিয়ে আর গবেষণা করার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, গাঁজা নিয়ে গবেষকরা কিন্তু একমত নন। এ পর্যন্ত এর বেশি কেউ জানে না। আর অত জেনেই বা কী বালটা হবে?

কয়েক ঘরের শীতার্ত মাগিপাড়া। সব খানকির পাকা ঘরও নাই। বড়িলাল কিন্তু যে ঘরটির সামনে দাঁড়াইল সেটি কাঁচাপাকা। নানাদিক হইতে ত্যারচা গোয়েন্দা আলো ও এলোমেলো তস্কর ছায়া এসে এক অনির্বচনীয় মিশেলের সৃষ্টি করিয়াছে। বড়িলাল দরজায় দুইবার টুকটুক করিয়া গাঁট্টা মারিল এবং অনুচ্চ স্বরে ডাকিল,

—কালী! কা...লী...

ঘুমচোখে যে দরজা খোলে সেই কালী তা আবার নাই বা বলা হল।

—এসো। ভাবলুম আর না হয় এলে না। বসে বসে ঘুম ধরে গেল।

কালী ম্রিয়মান হ্যারকেনটির শিখা উস্কাইয়া দিল। ফলে অপ্রশস্ত দেওয়ালে নানা ঠাকুর দেবতার ছবির ওপর বড়িলালের রাক্ষুসে ছায়া পড়ল।

—সাবান আর একটা কাচা কাপড় দে।

বড়িলাল উঠানে গিয়া অর্ধ গোলার্ধের ন্যায় কাপড় কাচা সাবানে হাত, পা, মুখ ধুইয়া কক্ষে ফিরিল এবং চৌকাঠে শায়িত চটের টুকরোটিতে পা ঘসিয়া মুছিল। এবং ঘরে আসিয়া নিজের কর্মক্লান্ত বেশভূষা ছাড়িয়া কালীর কাচা কাপড়টি যাহার নমনীয়তা মায়াময় এবং কেমন চাঁদ চাঁদ গন্ধ, লুঙ্গি করিয়া পরিল।

ইতিমধ্যে কালী দুইখানি গ্লাস ও একটি রেকাবিতে ছোট চিংড়ির মাথা ভাজা ও বড় বোতলে জল সাজাইয়া বসিয়াছিল। বড়িলাল কালীর চিরুনী দিয়া চুল আঁচড়াইল। তাহার পর কালীর মেঝেতে পাতা ঢালাও বিছানাতে আধশোয়া হইয়া রহিল। হাতের উপর মাথাটি রাখিয়াছিল বলিয়া তাহার বাইসেপটি ফুলিয়া ওঠে। কালী বলে,

—হাত ব্যতা করবে। ওই কোলবালিশটা টেনে নাও।

কালী মাপ করিয়া ওল্ড অ্যাডভেঞ্চারার রাম ঢালে। জলের বোতল ধরে।

—আমার দিকে কী দেকচ? জল ঢালচি দেকবে তো!

আমরা জানি যে কালীকে যৌনকর্মী বলা উচিত না উচিত নয় তা নিয়ে সমাজের চিন্তাশীল অংশের মধ্যে বিতর্ক, বাদানুবাদ ও বিতণ্ডা প্রায়ই ঘটে। দুপক্ষই এমন লড়াকু যে পারে তো এখনই এ উহার গুহ্য মারিয়া দেয়। এই ঘোলা জলে ইচ্ছা করিলে দু একটি মৎস্যও যে ধরা যায় না তা নয়। কেবল একটি খ্যাপলা জাল রেডি রাখতে হবে।

কালীর ঘরে লণ্ঠন ওরফে হ্যারিকেনের আলো কমিয়া গেল। 'শিশুমার মেটারনিটি হোম' হইতে ওঁয়া ওঁয়া শোনা যায়। রাজ্যে যে শান্তি বিরাজমান তা রক্ষা করার দায়িত্ব সকলেরই হইলেও রাজাদেরই বেশি।

এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই আলমোড়া হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরায় মহারাজকুমার শ্রী ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন 'তোমাদের রাজ্যের হিতসাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তোমাকে অত্যন্ত সহিষ্ণু হইতে হইবে। ঘটনাক্রমে অনেক অন্যায় অবিচারও তোমাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইবে—তখন তোমার তেজস্বিতা যেন তোমাকে আত্মবিস্মৃত না করে। নীরবে অনেক আঘাত সহ্য করিতে হইবে— নিজের দিকে না তাকাইয়া নিজের কর্তব্যের দিকেই লক্ষ্য রাখিবে। তোমাদের রাজাকে ও রাজ্যকে যাহাতে কোনো প্রকার দুর্বলতা আক্রমণ করিতে না পারে— ক্রমে ক্রমে সুযোগ বুঝিয়া যাহাতে সমস্ত জঞ্জাল দূর করিতে পার সে জন্য তোমাকে অত্যন্ত সতর্কভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। হঠাৎ যাহাতে কোনো বিপ্লব বাধিয়া না উঠে, সে জন্যও বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক হইবে।'

ওঁয়া ওঁয়া। (চলবে)

১০

দশ ও দেশের মুখোজ্জ্বল করার অভিসন্ধি নিয়েই 'কাঙাল মালসাট' শুরু হয়েছিল কিন্তু গত অধ্যায় বা কিস্তিটা ছাপার সময় ভূতের খপ্পর কাকে বলে তা বোধগম্য হল। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে মানুষের কোনো হাত নেই। প্রথম প্রুফ যেই এল তখনই নজরে পড়ল যে শেষে যেখানে (চলবে) বলা থাকে সেখানে বেরিয়েছে (চলবে না)। সংশোধনের পরেও সেই আশাভঙ্গকারী 'না'। কমপিউটারের মাউস বা ক্যাট কেউই বাঁদরামি করছে না, তারা শুদ্ধ, ভাইরাস মুক্ত এবং যে পত্রিকায় এক এক পক্কড় করে ধরাশায়ী হচ্ছে সেখানেও কুচোকাচা কেউ ঢ্যামনামি করেনি। (চলবে না)—এর চেয়ে বরং ঢলবে না, টলবে না হলেও মুখরক্ষে হত কিন্তু (চলবে না) অবশ্যই অপমানজনক। লেখকের মধ্যে তখন খুবই প্রাকৃতিক ডাকের মতো যে উপলব্ধি পাওনা হল তা হল এ নিশ্চয়ই সম্পাদকের হারামিপনা। হয়তো তা প্রমাণিতও হত। এই নিয়ে বাদানুবাদের সময় সম্পাদক বরং শেষমেশ অপারগ হয়েই লেখকের দিকে পাণ্ডুলিপির জেরক্স ছুঁড়ে দিয়ে বলল—এটা কি আমার বাপের হাতের লেখা? লেখকের নিজেরই লেখা। অবিকল সেই হস্তাক্ষরে, নির্ভুল বানানে লেখা— (চলবে না)। সম্পাদকের কবুলতি হল চলুক বা না চলুক—কিছুতেই তার এক গাছাও ছেঁড়া যায় না। একই মত লেখকেরও। একইরকম গোঁ সব শালারই। রহস্য সায়ার মতোই রহস্যময়ী। আসল কারণ কেউই জানে না। প্রেতলোক অনেক সময়ই অটোমেটিক রাইটিং বা ওই জাতীয় কোনো ছলের আশ্রয় নিয়ে অপরিবর্তনীয় ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কিন্তু মানুষের ধাতে ভূতের নির্দেশ মানার কোনো সদিচ্ছা নেই। অবধারিত নিয়তি এভাবেই নির্জন জলার কাছে, আলেয়ার হাপসু গ্যাসালো আলোর নিকটস্থ নীরবে অপেক্ষারত দক্ষ ঠ্যাঙাড়ের সান্নিধ্যে ভ্রাম্যমাণ পথিকবরকে নিয়ে যায়। অতএব বোঝা যাক যে এবারেও তার অন্যথা হবে না কিন্তু যতক্ষণ হাতেনাতে না হচ্ছে...

দুই খিলানের ওপরে নির্মিত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ঝুলন সেতুটির টঙে বসে দাঁড়কাক কলকাতার এক একটি বিশিষ্ট এলাকা যেমন খিদিরপুর, ওয়াটগঞ্জ, গঙ্গা নদীর গায়ে ডর্ক চত্বর, একগাছা লোমের মতো মিলেনিয়াম পার্ক, ইডেন গার্ডেন, ময়দান, আখাম্বা মনুমেন্ট, চৌরঙ্গী এলাকার হিজিবিজি, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ভার্জিন কলেজ গার্লদের নগদা বাজার, ভবানীপুর, বিকট ধোঁয়াটে কুহকে ঢাকা উত্তর কলকাতা, বালিগঞ্জের সেইসব এলাকা যেখান থেকে জীবনানন্দের গল্পের হেমেন প্রমুখ চরিত্ররা মোটা বউ নিয়ে বাসে উঠত বা ট্যাক্সি হাঁকাত তারপর ফারপোতে গিয়ে চপ-কাটলেট প্যাঁদাত, অথবা আরেকটু ঘাড় ঘুরিয়ে বাইপাস, সল্টলেক, কসবা কানেক্টর ইত্যকার বিবিধ হুলিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল আর খিস্তি করছিল।

ভদি বানচোৎকে ধরে আড়ং ধোলাই দিতে হবে। এরকম একটা জালি, খুপরি খুপরি শহরে কোথায় গেরিলা হুজ্জুতি ধান্দা করবে, তা না, গাণ্ডুটা একেবারে আর্মির ঢঙে পজিশনাল ওয়ারের ছক কষছে। নুনুকামান দিয়ে পজিশনাল ওয়ার। এঁড়ে চোদা। বললুম লড়ালড়ি পরে করবি আগে লেখাপড়া কর। হদিশও দিলুম। মাও, গিয়াপ, চে, মারিঘেল্লা, টিটো— এগুলো একবার চোখ বুলিয়ে নে তারপর কাগজ কলম নিয়ে মাদুরের উপরে পোঁদ উল্টে নিজের মতো ছক কর। যুদ্ধ করা সোজা ব্যাপার! হাওদা, হাতি, মাহুত— সব নখদর্পণে থাকতে হবে। তা না ল্যাওড়া কেবল তড়পাবে। দেদারে তড়পাবে। আমার কি! উলটোপালটা দেখলে বাঙলা কথা—আমি নেই। এত যদি তোর আম্বা বেগম জনসনের কাছে আরলি যুদ্ধের স্টোরি শোন— টিপু কী করেছিল, হায়দার আলি কী খুঁচিয়েছিল, সিরাজ ফোর্ট উইলিয়ামের পুঁটকি মেরে দিল কিন্তু

সাহেবদের সঙ্গে এঁটে উঠবে কী করে? তখন তারা জাহাজে করে মাঝ গঙ্গায় নোঙর মেরে ঘাপটি মেরে আছে। কেটে পড়, ছিপে যাও, তারপর যেই দেখবে এনিমি মাল মাগির ফোয়ারা খুলেছে ওমনি 'শোলে'-র স্টাইলে ঝাড় লোহে গরম হ্যায়, লাগা দো হাতোড়া। তা না বাঁড়া কেবল লম্ফ ঝম্ফ। টঙে বেশ ঠাণ্ডা তো। ডানঝাপটাবো? হাই অলটিচুড তো, ইংলিশ হাওয়া লাগছে। ওফ্ এই একটা জাত, কবে হাওয়া ছেড়ে কেটে পড়েছে, এখনও যেমন ফুরফুরে তেমন গন্ধ।

দাঁড়কাক ডানা ঝাপটাল। একটি পালক খসে উড়তে থাকল। পালকটিকে সাধারণ ক্রো ফেদার ভাবাটা বোধহয় ঠিক হবে না কারণ পালকটি পাক খেতে খেতে গঙ্গায় পড়ল এবং শুভ্র ধাবমান সিলভার জেটের গায়ে জল ছবির মতো আটকে বিনা পয়সায় হলদিয়া চলে গেল। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল কেন লাটে উঠছে তা বুঝতে হলে এই ঘটনাটিকে ধরেই এগোতে হবে। এখানেই রয়েছে ভাইট্যাল ক্লু। এর বেশি বলা বারণ আছে। কারণ আলিমুদ্দিনে খবরটা গেলেই গেঁতো গবরমেন্ট নড়ে চড়ে বসতে পারে। সে হ্যাপা সামলানো 'কাঙাল মালসাট'-এর ধকে কুলোবে না। অবশ্য এতক্ষণে নিশ্চয়ই রটে গেছে যে আমরা আনন্দবাজার বা সি. পি. এম অথবা তৃণমূল কিংবা ঘাড়ভাঙ্গা কংগ্রেস কোনো মালকেই খচাতে চাই না। কিন্তু নিজে নিজে, আপন গরজে কেউ যদি খচিয়ান হয়ে ওঠে আমাদের কিছুই করার নেই। এরা তো এলিতেলি —বিশ্বজোড়া যার রোয়াব ছিল সেই ব্রিটিশদেরও জীবনে এই আনন্দের পুরকি তো পরক্ষণেই নেমে আসত বেদনা বিধুর মূর্ছনা। ভাণ্ডিভাস, Wandi wash, আরকট, পলাশী, বক্সার বা সেরিঙ্গা পত্তনামে যুদ্ধ জয়ের সে কি উল্লাস! কিন্তু যেই ব্ল্যাক হোল (মহাবিশ্বের খতরনাক কৃষ্ণ গহ্বরের সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলাই ভালো) বা পাটনা ম্যাসাকার, অমনি ক্রুদ্ধ ক্রন্দন ও পাঙ্খাওয়ালাকে খিস্তি। ইতিহাস সম্বন্ধে এই ট্রাজিকমিক বোধ জাগ্রত করার জন্য আমাদের ইভর এডওয়ার্ডস স্টুয়ার্ট নামধারী এক অতীব খচ্চর সাহেবের হাত ধরে বারংবার বেগম জনসনের গলতায় যেতে হবে কারণ বেগম জনসনই সেই দুর্বার মহিলা যিনি চারটি বিয়ে করার ফাঁক ফোকরে স্বচক্ষে সিরাজৌদ্দল্লাকে দেখেছিলেন, ক্লাইভ ও ওয়াটসনের মতো প্রতিভাধরদের সঙ্গে গালগপ্প চালিয়েছিলেন এবং গভীর আনন্দের সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন যে হোলকার, সিন্ধিয়া ও এমনকি ভীতিপ্রদ মারাঠাও কিভাবে জন কোম্পানির সামনে সেঁতিয়ে গিয়ে 'জো হুকুম জো হুকুম' করছে। এই জন্য বেগম জনসনের কাছে আমাদের চিরকাল নতজানু হয়ে থাকতে হবে। অন্যটি হবার উপায় নেই।

'জয় মা গ্যাঞ্জেস' বলে বিশাল দাঁড়কাক দ্বিতীয় সেতুর টঙ থেকে উড্ডয়ন করল এবং তখনই তার নজরে এল কয়েকটি উড়ন্ত চাকতি ঝাঁক বেঁধে খেলা করতে করতে হাওড়ার দিকে যাচ্ছে। বা খেলার ছলে হাওড়ায় চলেছে বললেও অতিকথন হয় না। উড়ন্ত চাকতির খেলা অনেকটা বাজারের আমিষ অংশের আকাশে মাছিদের ওড়াউড়িরই সামিল। কিন্তু কিছুক্ষণ এমত ক্রীড়ায় মাতোয়ারা হওয়ার পর মাছিরা কী করবে সেটা বলে দেওয়া যায় কিন্তু উড়ন্ত চাকতিদের যে কি মতলব তা শিবের বাপেরও অসাধ্যি। হঠাৎ হয়ত ভাটিয়ালি গানে মুহ্যমান মাঝির দিকে তেড়ে গেল বা গঙ্গাতীরে স্নানরতা যুবতীদের দেখে মাঝ আকাশে দাঁড়িয়ে গেল। এর কোনটি যে হবে তা কেউ বলতে পারে না। শুধু কোয়ান্টাম জগত নয়, অন্যত্র এইভাবে ওয়ারনার হাইজেনবার্গ-এর আনসারটেনিটি প্রিন্সিপাল প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। দাঁড়কাক উড়ন্ত অবস্থাতেই স্ট্র্যাটেজিক দক্ষতায় কিছুটা পুরিষ ত্যাগ করিল যা হাওয়ায় ডানা মেলে দিলেও মাধ্যাকর্ষণের অমোঘ টানে নেমে আসতে বাধ্য হয় এবং পড়বি তো পড়ে দুঁদে ট্র্যাফিক সার্জেন্টের

Pathagar.net

গগলস্-এর ওপরে। দুঁদে সার্জেন্ট 'শিট' বলিয়া আক্ষেপ করে ও মোটর সাইকেলটি সাইডে ভেড়ায়। কিছুটা মোটা ভুরুতে বাকিটা রেব্যান-এর গা দিয়ে গড়াচ্ছে। সার্জেন্ট-এর পরবর্তী ডায়লগ হল 'ভালো রুমালটার গাঁড় মারা গেল।' দীর্ঘ কালো চঞ্চুতে কৌতুকের ঝিলিক খেলিয়ে দাঁড়কাক উড়তে থাকে এবং আরও বেশ কিছুক্ষণ ফ্লাইটের পর ভিক্টোরিয়ার মাথায় পরীর পাশে নিখুঁত ল্যান্ডিং করে। সেই সময়েই ঝটকা বাতাস এলো এবং দীর্ঘদিন পরে কাছে আসার অভিমানে পরী মুখ ঘুরিয়ে নিল। বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে জায়গাটি অচেনা হবার কথা নয়। অবশ্য ত্রৈলোক্যনাথ আজকাল খুব বেশি পিস্ পড়ে না। গম্বুজের ওপরে পরী ও দাঁড়কাক। কিন্তু দাঁড়কাকের চোখে পড়ল এক কাণ্ড। এক তরফা গোলকায়নের সুলভ শৌচের পরিবেশে একদঙ্গল ব্রিটিশ টুরিস্ট নানারকম ক্যামেরা ও ভিডিওক্যাম সহ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে বেড়াচ্ছে এবং বাইরে যাবার নুড়ি মারানো পথে দাঁড়িয়ে ভিক্টোরিয়ায় কিউরেটর তাদের ড্যানিয়েল, জোফানি ও ভেরিশ্চেগিনের আঁকা ছবির মহিমা বর্ণনা করছে। ইনি শুধু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটর তথা ডিরেক্টরই নন, কলকাতার স্বল্প দৈর্ঘ্যের ইতিহাসের ওপরে যারা ঘ্যাম তাদের মধ্যমণি বলা চলে। নিজের জীবনের উত্তরোত্তর উন্নতির বাঁকে বাঁকে তিনি জায়গা বুঝে একটিই কথা কখনো অস্ফুটে, কখনো সজোরে বলে এসেছেন— 'সবই চার্নকের দয়া!' আজও অন্যথা হল না। মূর্খ সাহেবদের দলটি হাহা হিহি করিয়া বিদায় গ্রহণের পর কিউরেটর মহাশয় এই ভাবিতে ভাবিতে নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন যে, প্রাচীন কলকাতায় মাগিবাড়ি সম্বন্ধে নানা তথ্য ইতস্তত ছত্রাকার হইয়া রহিয়াছে—সেগুলিকে একত্র করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ আকর গ্রন্থ সম্পাদনা করিতে বাধা কোথায়—এই গ্রন্থটি বাংলায় হইলে ভাল না যুগপৎ·ভাবে ইংরেজি হওয়াও আবশ্যক— মালটাকে ডাগর করে তুলতে হলে কত কাঠখড় পোড়াতে হবে— এই সাতপাঁচ ভাবনার শেষে চেয়ারে গা এলাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন, 'সবই চার্নকের দয়া'!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানলার দিক থেকে জবাব এল, 'কেন, তোর বাপ কী দোষ করল?'

এ এক রূপকথার দৃশ্য। ঘরের মধ্যে মহাপণ্ডিত ও জানালার বাইরের অপ্রশস্ত অংশটির ওপরে কলকাতার ওলডেস্ট দাঁড়কাক ওরফে ভদির বাবা। মুখর মন্তব্যটি ছুঁড়ে দিয়েই দাঁড়কাকটি ঠোঁট চুলকোয়।

তবে কি দাঁড়কাকই কথা বলিল? না ভূত? কিউরেটর সাহেব লহমাভর এই চিন্তা করিলেন যে তিনি হয়তো বা অজান্তেই মৃত। কিয়ৎক্ষণ পূর্বেই জীবিত ছিলেন কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁহার ভৌতিক জগতে প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছে। প্রেতপুরীতে দাঁড়কাক কেন, মশা, ব্যাঙ, গোসাপ সকলেই অবলীলায় বোধগম্য বাক্য চালনা করে। এমত চিন্তা করিয়াই ধুরন্দর মাথায় অন্য মতলব খেলিল। এমনও তো হইতে পারে যে আমি জীবিত দণ্ডবায়সের মুখে হয়তো নিজেই কল্পিত উক্তি ভাবিয়া তামাশা ফাঁদিয়াছি। অতএব কেঁচে গণ্ডুষ করে দেখাই যায়। তাই কিউরেটর ফের বলিলেন— 'সবই চার্নকের দয়া!'

দাঁড়কাক চোখ পাল্টায়।

—একটা ঠোক্কর খেলেই বুঝবি কার দয়ায় করে খাচ্ছিস। হারামির হাঁড়ি কোথাকার। যা, অভিশাপ দিলুম তুই পরের জন্মে গুয়ের পোকা হয়ে জন্মাবি। তাও, এখেনে নয়। ধর বর্ধমান বা মানকুণ্ডুতে। গুয়ের ডাব্বায় গুয়ের পোকা। গু খাবি, গু মাখবি তারপর একদিন গুয়ে ডুবেই পটলে যাবি।

কিউরেটর ভাবিয়াছিল সজোরে একটা পেপারওয়েট ছুঁড়িবে কিন্তু সাহসে কুলায় নাই।

—বুঝেছি আপনি বুলি কপচাতে শিখেচেন। কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরে মানুষ যে সুপারম্যানের

দিকে এগিয়ে চলেছে সে বিষয়ে কিছুই আপনি জানেন না। অবশ্য কাক-ফাকের এসব জানারও কথা নয়।

—বটে! কাক্-ফাক! তাহলে শুনে রাখ্, এই শালা কাকই তোর ওই গণ্ডাকয়েক অরবিন্দ আর নীটশেকে ট্যাঁকে রাখতে পারে। সুপারম্যান মারাচ্ছে। সুপার গুয়ের পোকা আগে হ, তারপর সুপার বাল, তারপর সুপারম্যান হবি। তোরমতো ছকবাজ যত কম জন্মায় ততই মঙ্গল। সবই চার্নকের দয়া! এক ঝাপড়া মারব ফের ওই নাম মুখে আনলে! চার্নক! ফাক চার্নক!

—চার্নক ওয়াজ আ গ্রেট ম্যান। উনি না এলে কলকাতা হত? কলকাতার তিনশো বছরে ঘোড়ার টানা ট্রাম চলত? অত পত্র-পত্রিকার স্পেশাল ইস্যু বেরোত? অত সেমিনার হত? এবং সব জায়গাতেই আমি আমার অগাস্ট প্রেজেন্স নিয়ে হাজির থাকতাম? কোথাও সভাপতি, কোথাও প্রধান কোথাও বিশেষ, ভেরিয়াস টাইপের অতিথি— বলুন এসব হত? সব ইমপরট্যান্ট মিনিস্টারদের সঙ্গে।

—চার্নক ওয়াজ এ গ্রেট বাল। ওই বোকাচোদা এল আর গঙ্গার পাড়ে হেগে কলকাতার পত্তন করল— তোর মতো হারামি না হলে ওই লুটেরা মাগিবাজটাকে আদিপিতা বলে চালানো যেত? ছাগলের দেশে রামছাগল যা বলে সেটাই অকাট্য যুক্তি। আর তোদের গভরমেন্টেরও বলিহারি যাই। কলকাতার জন্মদিন মারাচ্ছে। তেমন তোদের সব মিনিস্টার। তেমন তুই। পাঁঠার সভার সভাপণ্ডিত। রামপাঁঠা!

—সে আপনি যা বলেন বলুন, তাতে চার্নকের গ্রেটনেসে এতটুকুও আঁচড় লাগে না। যা ট্রুথ আমি তাই তুলে ধরেছি।

—চোপ্! ট্রুথ তুলে ধরতে হয় না। ট্রুথ ঝুলঝাড়ু নয়। ট্রুথ শেখাচ্ছে। জোসেফ টাউনসেন্ডের নাম জানিস?

—আজ্ঞে, শোনা শোনা মনে হচ্ছে...

—ঢপ দিস না। টাউনসেন্ড ছিল রেণ্ডিবাজ এক গ্যাঞ্জেস পাইলট। চার্নকের সাগরেদ। মাগিবাজিতে এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়।

—আই প্রোটেস্ট। এ কথাটা আপনি আগেও বলেছেন। চার্নক সতীদাহ থেকে একজন বিধবাকে উদ্ধার করে তাকে বিয়ে করেছিলেন! আর তার নামে...

—বেশি প্যাঁক প্যাঁক করিসনাতো। পোঁদে নেই ইন্দি, ভজরে গোবিন্দি। বিধবা উদ্ধার! তবে শুনবি? ভাইটাল একটা হিস্টোরিকাল ডকুমেন্ট। কবিতার ফর্মে। নে, লিখে নে। অ্যাঁঃ টেপ করবি? তো ক্যাসেটা লাগা। ডবকা ফিমেল, ঢলো ঢলো ভাব ওই মাল চার্নক জিন্দা থাকতে পুড়িয়ে নষ্ট করবে? মাগি কি যুঁইতুবড়ি না নসরিন?

—বলুন, কী হিস্টোরিকাল ডকুমেন্ট?

—বলচি, এটা পড়বি, ভাববি। বলে আমি চলে যাব। তিনদিন পরে আসব। তখন বলবি। নে বোতাম টেপ! জোসেফ টাউনসেন্ডের কবরের ওপরের লেখা— আটটি লাইন, ইংরাজিটা একটু আর্কেইক তবে তোর মতো খচড়া ঠিক ধরতে পারবি— নে...

"Shoulder to shoulder, Joe my boy,
Into the crowd like a wedge!
Out with the hangers, messmates,
But do not strike with the edge!
Cries Charnock Scatter the faggots,
Double that Brahmin in two.

pathagar.net

The tall pale widow is mine Joe,
The little brown girls for you,"

দাঁড়কাক ঝটিতি উড়িয়া গেল। কিউরেটর টেপ বন্ধ করিলেন। ক্যাসেট রিওয়াইন্ড করিলেন। প্লে লেখা বোতাম টিপিলেন, দাঁড়কাকের গলায় জোসেফ টাউনসেন্ডের এপিটাফ ধ্বনিত হইল। কিউরেটর ঢোঁক গিলিলেন। জলপান করিলেন।

—অ্যাসটাউন্ডিং! ·

পরক্ষণেই তাঁহার মনে ঝিলিক দিল যে, পরজন্মে তাঁকে গুয়ের ডাব্বায় গুয়ের পোকা হইয়া জন্মাইতে হইবে।

নলেনের কাছে দুঃখজনক সংবাদটি শুনে ভদি বমকে গেল। চারটে ঘরের মধ্যে মাত্র একটা ভাড়া হয়েছে। তাও এসেছে পাগলখ্যাঁচা টাইপের একটা পাবলিক এবং তার সঙ্গে নাকি মালসা-ফালসা ছিল।

—এঃ চুলপোড়ার গন্ধ ছড়াচ্ছে। বানচোৎ করচেটা কী?

—হবে তুকতাক। পোড়াচুলের ধোঁয়া শিশিতে ধরচে বোধহয়। ফুটো দিয়ে দেকব?

—দেকে আয়। চুল পোড়ালে ভালো। তবে গায় না আগুন দেয়।

নলেন প্রতিটি ঘরের দরজাতেই সংলগ্ন গোপন ছিদ্রের একটিতে উবু হয়ে বসে চোখ লাগায়। এবং বিশেষ ওই অবস্থান গ্রহণ করার জন্যই সম্ভবত একটি সহিংস বাতকর্ম ঘটে যায়। অমনি ভেতর থেকে সেই পাগলখ্যাঁচা খেঁকিয়ে ওঠে,

—দরজায় আড়ি পেতে পাদা হচ্ছে! এরপরে ভাড়া চাওয়ার সময় বুঝিয়ে দেব। চুতিয়া কোথাকার।

নলেন চলে এসেছে ছিটকে। এবং মুখ দেখে বোঝা যায় যে চমকেছে। ভদি মিষ্টি হাসে,

—পয়মন্ত খদ্দের। টনক আচে। দেকলি কিছু?

—ওই যা ভেবেছিলুম। হোমোপাথির ছোট ছোট শিশিতে চুলপোড়া ধোঁয়া ধরচে আর ছিপি দিয়ে দিয়ে বন্ধ করচে।

—ওই ধোঁয়া দিয়ে কী হয় জানিস?

—কী আবার? তুকতাক!

—কিন্তু স্পেশাল। ওই ধোঁয়া কোনো বেধবা মাগির ঘরে ছাড়লে তেরাত্তিরের মধ্যে চুম্বকের টানে আলপিনের মতো চলে আসবে। এক এক শিশি হেভি দামে ঝাড়বে। আর খদ্দেরের অভাব নেই। হাজার হাজার লোক বেওয়া মাগি তাক্ করচে।

—কিন্তু টেনে আনা এক জিনিস আর জব্দ করা, সে তো খুবই ঝামালা। কতায়ই তো বলেচে, গলায় দড়ির গিঁট আর বিধবা মাগের হিট।

—সে যার চিন্তা তার চিন্তা। আগে মদনানন্দ মোদক খেত, ইয়াকুতি হালুয়া খেত, হাকিম বাড়ি যেত। এখন শুনছি আমেরিকা থেকে কী একটা ট্যাবলেট আনচে। এক বাক্স কিনতেই ফতুর। তবে হ্যাঁ, একটা টপ করে গিলে ফেললেই হল। কলকাতার যেমন মনুমেন্ট তেমন তোরও হয়ে যাবে। সেই যে দাঁড়াবে আর শোওয়া বসা নেই।

বিস্ময়ে নলেনের মুখে হাঁ হয়ে যায়।

—সেও তো বিপদ।

—বিপদ বলে বিপদ। ঘোর বিপদ। যা হোক ওই মালটাকে আর ঘাঁটাসনি। এরপরে বেইমানির ওজর তুলে ভাড়া দিতে গাঁইগুঁই করবে।

—ও আমি ঠিক সাইজ করে নেবখন।

—নিস্। আমি এট্টু বেরুচ্চি। জয় বাবা দণ্ডবায়সের জয়! জয়, ঘুরঘুরে চাকতির জয়।

ভদি বেরিয়েই যাচ্ছিল কিন্তু বেচামণি ডাকল,

—এই নলেন, এট্টু ডাক তো!

—সেই পিছু ডাকলে। যা ভয় করেছিলুম তাই।

—বউ পিছু ডাকলে কিছু হয় না। কি বল্ নলেন।

নলের গাণ্ডুর মতো মাথা নাড়ে।

—এসব নকড়া ছাড়ো তো। কী বলবে বলো, ঝটপট বলো দিকি।

—বলচিলুম ঠাণ্ডা পড়েচে। চামড়ায় টান ধরচে। গাল চড়চড় করচে। একটা গ্লিসারিন সাবান আনবে তো মনে করে!

—কেন? তেল মেকে হচ্চে না? কী আমার কাননবালা রে, গ্লিসারিন সাবান না হলে চলচে না। একেই মাগগির বাজার। ওসব সায়েবসুবোরা মাখে। কত দাম জানো? মাত্র এক ঘর ভাড়া হয়েচে।

—তোমার ক-ঘরে লোক বসল আমার জেনে দরকার নেই। ও আমি ঢের দেকেচি। এরপর কিন্তু কিস্ খাবার সময়ে বলবে না যে— বেচু, তোর গালটা অমন খসখসে কেন রে?

নলেন ফিকফিকিয়ে হাসে। চুলপোড়া ধোঁয়ায় সকলেরই নাক জ্বালা করছে। ভদির মুখটা দেখে মনে হচ্ছে হিট উইকেট হয়েছে।

—মুখের একটা আব্রু নেই। ঘরের বউ কেউ বলবে?

—তো কী বলবে? বলো! লোককে জিগ্যেস করেই দেখো না। কী বলবেটা কী? ব্যজারখোলার খানকি? একটা গ্লিসারিন সাবান চেইচি, তাই কত চোপা!

বেচামণি যে ভ্যাঁ করে ককিয়ে উঠবে সেটা ভদি ঠিক আন্দাজ করেনি। উপরন্তু ধারে-কাছে দাঁড়কাক বাবা আছে কিনা সে ভয়ও আছে। খচে গিয়ে হয়তো মাথার মাঝখানে ঠুকরে দেবে বা জোড়া ডানার ঝাপড়া।

—আঃ, য্যাতো দিন যাচ্চে তত খুকিপনা বাড়চে। আমি কি বলেচি যে গ্লিসারিন সাবান আনব না? ঠাট্টা বটকেরা কিচুই বুজবে না।

বেচামণি ফোঁপায়।

—থাক্। আর সোহাগ দেখিয়ে অ্যাদিক্যেতা করতে হবে না। নলেন, আমি গেলুম। খুকিকে চোকে চোকে রাকিস। চুলপোড়াও না পালায়। কোতায় একটা দরকারি কাজে বেরোব না হাঁউমাউ করে সব ঘেঁটে দিল। গ্লিসারিন সাবান! কত বাঁড়া গ্লিসারিন সাবান দেখলুম।

ভদি চলে যেতে নলেন বেচামণিকে মক্ বকাঝকা করে।

—আর তুমিও পারো বাবা বউদিদিমণি। জানো তো, লোকটার মুকই ওইরকম। কিন্তু অন্তরটা। জানবে যে লোকের মুখে মধু তার অন্তরের বিষ কেউ টের পায় না। দাদাবাবুর হল উল্টোটা। ছোবলাবে কিন্তু মধু ঢেলে দেবে।

—সে না হলে কবেই বাপের বাড়ি চলে যেতুম।

—বালাই ষাট! অমন কথা বলতে আচে?

এই ইন্টিমেট, ট্রান্সপারেন্ট ও টাচিং কথোপকথনের মধ্যে ঘটাস্ ঘটাস্ করে ঘর খুলে, গলা খাঁকারি দিয়ে, কাঁধে ঝোলা, পাগলখ্যাঁচা টাইপটা বেরিয়ে আসে। ঝোপঝাড়ওয়ালা পরপুরুষকে দেখে বেচামণি বড় করে ঘোমটা দিয়ে অন্যদিকে চলে যায় এবং তার পায়ে পরা রুপোর

গয়না থেকে ঘুঙুরমার্কা ছমছমা শব্দ হয়। পাগলাখ্যাঁচা আড়চোখে বেচামণির ব্যাক্‌টি সার্ভে করে নেয়। এরকম অবশ্য যারা পাগলখ্যাঁচা নয় তারাও করে থাকে।

পাগলখ্যাঁচা তেলচিটে বুকপকেট থেকে টাকা বের করে। দুটো কুড়ি টাকা আর ছটা দশ টাকার নোট গুণে গুণে নলেনকে দেয়। ওর ঝোলার মধ্যে শিশিতে ঘষা খেয়ে মিহি কিঁচমিচে শব্দ হয়। নলেন একটা কুড়ি টাকার নোট ফিরিয়ে দেয়।

—কী হল?

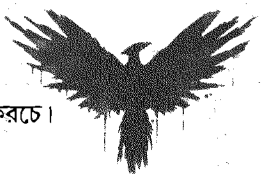

—ও জোড়া টাকা, চলবে না।

—কোথায় জোড়া?

—মাঝখানে এটা কী? কাগজ সাঁটা জ্বলজ্বল করচে।

—ও ওরকম থাকে। সব চলে।

—চলুক। এখানে চলে না।

—নাও বাবা, পাল্টে দিচ্ছি। মালিক আর মালকিনে খিঁট চলছে বলে ঠাহর হচ্ছে। কী ঠিক বলিনি? এই নাও। ধরো। ভালো টাকা। কী, ঠিক বলিনি?

—টগরগাছতলায় ওই খেঁটোটা দেখতে পাচ্ছ? ওইটা যখন গাঁড়ে ঢুকিয়ে দেব তখন টের পাবে কী চলছে?

—যাঃ বাঁড়া। কী বললুম আর কী বুঝল?

—ঠিকই বুঝেছি। বাল পুড়োনো ধোঁয়াতে কী হয় জানো?

—আমার আর জেনে দরকার নেই বাবা। পাগলাখ্যাঁচা আর কালবিলম্ব না করে কেটে পড়ে। নলেন এগিয়ে দরজার হুড়কোটা লাগিয়ে দেয়। অন্তরীক্ষে একই সঙ্গে বোয়িং এরোপ্লেন ও চাকতির শব্দ। বোয়িং সেভেন ফোর সেভেনের পাইলট উড়ন্ত চাকতির উন্মত্ত ও স্বচ্ছল খেলা দেখে বিস্মিত হয়। গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করে!

pathagar.net

এই যে অত্যন্ত ভূতুড়ে মহাকাশ আমাদের প্রায়ই অনন্ত নশ্বরতার বোধে আকুল করে তোলে এবং হালকা হাতছানি দিয়ে 'আয়! আয়!' বলে ডাকে তাতে ওড়াউড়ি করার অধিকার যেমন বোয়িং-এর আছে তেমন ভদির ঘরের উড়ন্ত চাকতিদেরও আছে। ঠিক এই কথা বলার জন্যে না হলেও বাংলার এক কবি লিখেছিলেন,

ক্ষিত্যপতেজব্যোম ও মরুৎ
সকলেরই তরে এই পঞ্চভূত।

এই বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং কয়েক ফার্লং এগিয়ে গিয়ে, —সাম্যের আদর্শে বলীয়ান হয়ে, অপারেশন বর্গার কত আগেই বলেছিলেন,

আকাশ-আলো-জল-বায়ু—চার
—এ সকলে যদি থাকে অধিকার
সব মানুষের, ভূমিতে কেবল
দু-চারজনের রহিবে দখল?

লড়াকু মনোভাবে ভরপুর এই মহান কবিতাটির শিরোনাম— 'সবৈ ভূমি গোপালকী'। কিন্তু সেই কবির নাম কী? মালটাকে কেউ আইডেনটিফাই করতে পারবে? (চলবে)

১১

বাংলার কবিদের যদি একটি আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড আয়োজিত হয় তাহলে উড়ন্ত চাকতির উচ্চতা থেকে দেখলে মনে হবে পিঁপড়েদের এক মহামিছিল চলছে যার সামনের দিকটি অর্থাৎ মুণ্ডু যখন মিশরের পিরামিডের ছায়া পেরোচ্ছে তখন তার ল্যাজ হয়তো ঠনঠনে কালীবাড়ির সামনে। এত কবি পৃথিবীর কোনো দেশে হয় নাই, অদূর ভবিষ্যতে কোথাও হইবে বলিয়াও মনে হয় না। সেই মিছিলে যেমন কাহ্নপাদ ও ভুসুকপাদ চলিতেছেন, তেমনই চলিতেছেন রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, বিষ্ণু দে ও কে নয়? এই মহামিছিলেই দেখা যাইবে 'সবৈ ভূমি গোপালকী'-র কবিও আগুয়ান। কিন্তু কেহই সেই গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে শনাক্ত করিতে পারিবে না। হয়তো মাইকেলকে চেনা গেল বা কাহাকেও দেখিয়া মনে হইল ইনিই তবে নজরুল কিন্তু বিজয়লালকে কে আইডেন্টিফাই করিবে? সেরূপ পণ্ডিত বা কবিপ্রেমী আজ বিরল যেরূপই বিরল আর্মাডিলো বা স্নো-লেপার্ড।

জীবনে বাড়িবে আরোও একগোছা ভুল,
'চাওয়া আর পাওয়া' আজও নয় সমতুল।

বলো তো বাছা কার লেখা এইটি? চিনতে পার? পারিলে না তো। উনিটি হলেন গোপাললাল দে।

...কত না নবীন সৃষ্টি আকাশে ও সাগরের নীলে
রজনীগন্ধার বৃন্তে একান্তে যে কবিতা লিখিলে,
আমারে দেখাবে সেই সংখ্যাহীন কবিতা তোমার
তুমি কবি, আমি কবি— আমারও কামনা দুর্বার।

কোন হ্যায় ইয়ে পোয়েট? হায়, হায়— আ. ন. ম. বজরুল রশীদ।

খপ্ করে কোনো আঁতেলকে টুকরো প্রশ্ন করে দ্যাখো। 'বাউল বাতাস হয়েছে আজ মউলবনে মাতোয়ালা' বা 'কুহুর গিয়াছে দিন কেকা আজ কাঁপায় অম্বর'— বলিতে পার কার কলমের খোঁচায় এই দুটি লাইন খোদিত? শ্রী শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা বলিয়াছেন, ইঁহার 'কাব্যে সুরার তীব্রতা নাই, শীতল পানীয়ের স্নিগ্ধতা আছে'। কে তিনি? যাঁর কবিতায় বাংলার কিক্ নাই, পেপসির মোলায়েমতা রয়েছে। কালিদাস রায় জানিয়া যান নাই যে 'কবিশেখর' উপাধি তাঁহাকে চিরকাল পাঠক-মুকুরে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

বাংলা কবিদের মহামিছিল মহাকালের ফলস্ দাঁত পরা মুখগহ্বরের দিকে ধাবমান থাকুক। আমাদের অন্য গলতায় ডিউটি পড়েছে। আমরা বরং সেইদিকে ভাঁজ মারি...

সন ২০০০-এর বইমেলাতে অন্যান্য সববারের মতোই (অবশ্য আগুন লাগার বছরটি বাদে) আনন্দ ও বাজার, আনন্দ ও বাণিজ্য, আনন্দ ও আইসক্রিম ইত্যাদি কোনোটিই গরহাজির ছিল না। একদিকে ধর্মের ধ্বজা উড়িতেছে তো এই নাও জিরাফের অন্তরঙ্গ জীবনী। তবে বড়ই দুঃখের বাত এই যে, এই মেলায় 'লন্ডন রহস্য' পাওয়া যায় না। এবং সারি দিয়া দণ্ডায়মান পুলিশকে কেহ এক সেট এনসাইক্লোপিডিয়া বলিয়া ভুলও করিতে পারে। মধ্যে এই মেলা বুক ফেয়ার না হইয়া কুক ফেয়ারে পরিণত হইয়াছিল। যারই ফল-পরিণামে সেই লেলিহান সার্কাস যাহাতে আগুন ও ধোঁয়া যথাক্রমে ক্লাউন ও ট্রাপিজের খেলা দেখাইয়াছিল। এবং এইসব সম্ভব করিয়াছিল মজুত একখানি ফায়ার ব্রিগেডের নল লাগানো বিকল পাম্প-সহ গাড়ি। সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে দুইটি ভাগ আছে। এক দলের মতে ইহা ট্রাজিকমেডি। অন্য দলের মত— না, ইহা কমিট্রাজেডি। এই

ডেমোরিপাব্লিকান ঢ্যামনামিতে ভাসিয়া গেলে আমাদের বাপু চলিবে না।

'কাঙাল মালসাট' যে বৎসরে তার অভিশপ্ত যাত্রা শুরু করে সেই ১৯৯৯ থেকেই কলকাতা বইমেলা লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের তীক্ষ্ণ তত্ত্বাবধানে রয়েছে। কারণ বিদেশি, স্বদেশি— নানা টাইপের হারামি আছে। এবং তারা আছে এবং ভালোভাবেই আছে এটা জেনেশুনে এত বড় মেলাটা অরক্ষিত রাখা যায় না। বলাই বাহুল্য যে, এই নেকনজরের মূলে রয়েছে জনৈক মন্ত্রীর উদ্বেগ ও আশঙ্কা। মেলায় নানা গোয়েন্দার নানা কাজ। তার মধ্যে প্রতিবারই গোলাপ মল্লিক পুং প্রস্রাবগারের ডিউটি পায়। ছোট, বড় চোতা পোস্টার নিত্যই পড়ে। নানা মাপের ও ঢঙের। সেগুলির স্যাম্পল জোগাড় করা তার কাজ। অর্থাৎ গোলাপ মল্লিকের ডিউটি।

১৯৯৯-তেই গোলাপ মল্লিক মেলায় চতুর্থ দিনে একটি জেরক্স করা পোস্টার দেখে হতবাক হয়ে যায়— পোস্টারটির বাঁদিকে রয়েছে—

শ্রীঘৃত সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী

এবং ডানদিকে

Santiniketan, Bengal

বাংলাদেশে ঘৃতের বিকারের সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের বিকার দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। শ্রীঘৃত এই দুঃখ দূর করে দিয়ে বাঙালিকে জীবনধারণে সহায়তা করুক— এই কামনা করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ বৈশাখ, ১৩৪৪

পোস্টারটি সযত্নে জল দিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খুলে গোলাপ মল্লিক লালবাজারে নিয়ে যায়। সেখানে বড়বাবু দাঁ মালটি স্টাডি করে গোয়েন্দা তারকলাল সাধু-র কাছে পাঠালেন। তিনি গোলাপকে বললেন—

—দ্যাখো মিঃ রোজ, এই যে কলকাতা শহরটা দেখছ না এর মধ্যে অন্তত লাখ দশেক পাগলা রয়েছে। তারা নিজেরাও জানে না যে তারা পাগল। যারা তাদের সঙ্গে থাকে তারাও বুঝতে পারে না। ডেইলি ওঠাবসা করছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না। এমনই গাণ্ডু। বুঝলে?

—হ্যাঁ স্যার। আমি ভাবছিলুম গাণ্ডুর নাম্বার তাহলে লাখ পঞ্চাশেক হবেই।

—সে তো হবেই। এছাড়াও উদ্‌গাণ্ডু, তেঢ্যামনা, হাড়হারামি রয়েছে পালে পালে। তার মধ্যে কে ক্ষতিকর বা ফরেন সোর্সের এজেন্ট সেটা স্মেল করাই আমাদের কাজ। তোমার এই পোস্টারটা ইন্টারেস্টিং। রচনাবলীতে নেই। তবে এটা কেন জেরক্স করে মারতে গেল— এ, নির্ঘাৎ পাগলা কেস।

—কিন্তু স্যার, আমি ভাবছিলুম যদি কোনো কোডেড মেসেজ হয়? কোনো গোপন নির্দেশ বা কিছু। হতেই পারে সার।

—এই অ্যাঙ্গেলটা তো ভেবে দেখিনি। জব্বর ধরেছ গোলাপ। ফ্যাকড়াতে ফেলে দিলে।

—না, মানে হঠাৎ মনে হল সেয়ানা পাগল বা ট্যাটনও তো হয়।

—সে তো হয়ই। আমি ফালতু রিসক্ নেব না। কী বলো? একটা নোট দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিই—

—হ্যাঁ, সেই ভালো স্যার। পরে যদি কোনো ঝুটঝামেলা হয়ে যায়।

তারকলাল নোট-সহ ওপরে পাঠিয়ে দিলেন। একটি ফাইলে। ফাইল একদিন পরে ফেরত এল— ওপরে স্কেচ পেনে লেখা— 'বাল'।

এই ঘটনার থেকে গোলাপ এই সিদ্ধান্তে আসে যে ওপরতলাতেই যখন সম্ভাব্য চক্রান্ত

pathagar.net

বা অন্তর্ঘাত সম্বন্ধে মাথাব্যথা নেই তখন সে-ই বা কোন দুঃখে সাপের সন্ধানে কেঁচো খুঁড়ে খুঁড়ে হাল্লাক হবে? তারকলাল সাধুর মতো পোড়খাওয়া ঘোড়েল গোয়েন্দা অবদি ব্যাপারটার গ্রাভিটি বুঝেছিল। কিন্তু তার ওপরে?

—আমার কী ল্যাওড়া! এরপর যা দেখব চুপচাপ দিয়ে দেব। তারপর বাঞ্চোৎরা যা করবি করগে যা। এইসব ছোল দিয়ে দেশ চলবে! পড়ত বাঁড়া ব্রিটিশ সায়েবদের হাতে। গাঁড়ে রুল দিয়ে নাচাত।

এই উপলব্ধি গোলাপকে বড়ই উদাস ও বিবাগি করে তোলে। ২০০০-এর বইমেলাতে এই ধরণেরই একটা হু-হু মনোভাব নিয়ে গোলাপ পেচ্ছাপখানা টু পেচ্ছাপখানা খুবই আলগা পা ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বড়ই শ্লথ সে পদচারণা। সন্ধের মুখে গোলাপ ভাঁড়ের চা খেয়ে চা-ওলাকে পাস দেখাল। তারপর ছোট সাইজের একটা ক্যাপস্টেন সিগারেট ধরাল। প্রায় তার ধোঁয়ার ধরতাই ধরে ফোক্‌লা লোকটা গোলাপকে বলল,

—ধরে ফেলিচি। না বললে চলবে না।

—অ্যাঁঃ!

—গোপাল। টালিগঞ্জ থানার সামনে। সিমেন্টের বেঞ্চিতে। নকশাল টাইম। নিয়ারলি টুয়েন্টি ইয়ার্স বাট নো চেঞ্জ।

pathagar.net

—সরখেল!

—তবে!

একটা ভুল করেছ। গোপাল নয়, গোলাপ।

—কুড়ি বছরের গ্যাপ। মাইনর ভুল। হতেই পারে।

—রিটায়ার করেছ?

—কবে?

—হাতে এত কাটাকুটি, কড়া...

—ওই, মাটি খুঁড়তে... খুঁড়তে

সরখেল নিজেকে সামলে নেয়।

—কেন? মাটি খুঁড়ছ কেন?

—আরে, বাগান করচি। চুটিয়ে বাগান করচি। এক-একটা গ্যাঁদা দেকলে ভাববে বাঘের মুণ্ডু।

—তাই বলো। বউদি?

—সে তো এইট্টি সিক্সেই...

—ও!

দুজনে ফের এক ভাঁড় করে চা খেল। সরখেলই খাওয়াল। তারপর কাঁধে ঝোলানো সাইডব্যাগ থেকে একটা ভাঁজ করা চোতা গোলাপকে ধরাল।

—এটা রাকো। বেশি ছাপিনি তো। লোক বুজে বুজে দিচ্চি। ফ্রি। পরে পড়ে নিও এক ফাঁকে। তবে হালকা ব্যাপার নয়।

—তারপর, মেলায় কিছু কিনলে-টিনলে?

—কী কিনব? কেনার মতো কিচু আচে? সবই আলবাল। তবে কিনিনি তা নয়। ভূত সিরিজের তিনটে আমার ছিল না। এই তালে হয়ে গেল।

—দেখি?

—তিনটি বই। চল্লিশ-পঞ্চাশ পাতার বেশি নয়। 'মানুষখেকো ভূত', 'মস্তান ভূত' ও 'রেলগাড়িতে ভূত'।

—এই বুড়ো বয়সে তোমাকে ভূতে ধরল?

—তা বলতে পার। ওই সাবজেক্টটাই করচি একন। তোমার নির্ঘাৎ ডিউটি চলচে।

—বুঝতেই পারছ।

—আমি তাহলে এগোই। আর গোটা দশেক আচে। বিলি হয়ে গেলে কেটে পড়ব। যা ধুলো উড়চে। লেখাটা পড়বে কিন্তু!

—সে তো পড়ব। কিন্তু ফের দেখাটা হবে কবে?

—সে হবে খন। এই মেলাতেই হবে। পড়বে কিন্তু ভায়া। বড় খেটেখুটে লিখেচি।

সরখেল চলে যাওয়ার পর গোলাপ মল্লিক ভাঁজ করা ফর্দের মতো কাগজটা খুলল।

পিঁপিড়ার ডানা ওঠে...

কে. জি. সরখেল

অবসরপ্রাপ্ত করণিক, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া

'পিঁপিড়ার কেন ডানা ওঠে তা সকলেই জ্ঞাত হয়। উড়িবার তরে। কবে হইতে এই ডানা গজানো শুরু হইল তা আমার সঠিক জানা নাই। কিন্তু বিভিন্ন প্যালিয়েন্টোলজিস্ট নির্মিত ক্ল্যাডোগ্রাম হইতে এই সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানীরা উপনীত হইয়াছেন যে ডাইনোসরদের নানা প্রজাতির মধ্যে থেরোপড ডাইনোসর হইতেই পক্ষীকুল গজাইয়াছে। জন অসট্রম বলেন যে, অরনিথোলেসটেস, ডেইনোনিকাস ও অরনিথোসুকাস ইত্যাদি থেরোপড ডাইনোসরদের সঙ্গে প্রাচীন পাখি আর্কিও্পটেরিক্স-এর বড়ই মিল। ডাইনোসরবিদ্ গ্রেগ পল বলেন, যে কম্পস্‌গন্যাথাস নামক ডাইনোসরটি আর্কিও্পটেরিক্স-কে ধরিয়া ভক্ষণ করিবার জন্য ধাওয়া করিয়াছিল সেই ধাওয়া সামলাইতেই আর্কিও্পটেরিক্স উড়িতে বাধ্য হয়। অবশ্য আমি এ-বিষয়ে ঠিক একমত পোষণ করি না। তাহার কারণ এই যে, ৬৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে প্রাচীন পাখিরা অর্থাৎ আর্কিও্পটেরিক্স (উৎপত্তি ১৫০ মিলিয়ন বৎসর পূর্বে) ইত্যাদি লুপ্ত হয়। তাহারা কী করিত না-করিত কেউই জানিতে পারে না। এই ধ্বংসরেখার নাম কে-টি দুর্ঘটনা অর্থাৎ ক্রিটেসিয়াস ও টার্সিয়ারি যুগের সন্ধিক্ষণে এই প্রলয় ঘটিয়াছিল। পাঠকভায়া, তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ যে তুমি সেনোজয়িক যুগের প্রথমাংশে জীবনযাপন করিতেছ। সেনোজয়িক যুগের হিংস্র ও উড্ডীয়ান আর্কিও্পটেরিক্স, অ্যাপাটরনিস, প্যালিওকারসনিস, হেসপের্‌রনিস, সিনোসরোপটেরিক্স প্রাইমা ও বহুশ্রুত টেরোড্যাকটিল দাঁড়ের ময়না বা কাকাতুয়া ছিল না। চিল-শকুনও নয়। সেসব অচিন পাখি খাঁচায় আসা-যাওয়া করিত না।

'প্রথম অনুচ্ছেদে আমি যাহা কিছু বলিলাম তা একই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ও অবান্তর। প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে ইহা হইতে ওড়াউড়ি যে মান্ধাতার আমলের ব্যাপার তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে। অবান্তর এই কারণে যে আমরা বিহঙ্গের পাখা বন্ধ হইল কী হইল না তা ভাবিয়া কেন মরিতে যাই? আমরা প্রমাণ করিতে চাহি যে, মানুষ কোনো বিশদ বিবর্তন ছাড়াই উড়িতে সক্ষম। উড়ন্ত মানুষের ফসিল পাওয়া যায় না। যাবেও না। কিন্তু জীবন্ত উড়ুক্কু মানুষ আছে। শুধু আছে নয়, ধারে-কাছেই। শুনিয়া তাজ্জব বনিলে তো! এই রচনায় আমি পুরা কেচ্ছা ফাঁস করিব না। কেবল ইঙ্গিত দিব। তাহার কারণ আমি চাই না যে উড়ুক্কু মানুষরা ধরা পড়ুক। অথবা তাহারা বিব্রত হোক। আমি কেবল চাই যে দেশ ও মান্যবর সরকার (রাজ্য ও কেন্দ্র) জানুক যে মানুষ উড়িতেছে। তাহাদের একটি বিশেষ নামও আছে। আমি কয়েকজনকে চিনিও। কিন্তু এই রচনায় সব কিছু প্রকাশ হইয়া যাক— এরূপ ইচ্ছা

আমার নাই। কিন্তু আমি, কে. জি. সরখেল, এই প্রথম তাহাদের কথা বলিলাম। আর মাত্র কয়েকটি কথা বলিয়া দায়িত্ব হইতে খালাস পাইব। কিন্তু পাঠক, তোমার ঘাড়ে উড্ডয়নের নেশা ভূতের মতোই চাপিয়া বসিবে। বারংবার তুমি গগনের দিকে তাকাইবে। দেখিবে মেঘ উড়িতেছে। তোমারও উড়িয়ে ইচ্ছা যাইবে। উটপাখি, মুরগি ইত্যাদি হতভাগ্য কয়েকটি পাখ-পাখালির কথা না ধরিলে দেখিবে কত না পতঙ্গ ও পাখি ওড়াউড়িতে মাতিয়াছে। উড়িতেছে বিমান। কৃত্রিম উপগ্রহ। রকেট। বেলুন এমনকি শ্মশানের ধোঁয়াও উড়িতেছে। আর তুমি ভূ-পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া হাত কামড়াইতেছ। কোমোডো দ্বীপের ড্রাগন-সদৃশ ভয়াবহ গিরগিটি ও তোমার মধ্যে কেমন মিল! সে চারি পায়ে ও তুমি দুপায়ে চরিতেছ। এই জন্যই কবি পুরন্দর ভাট লিখিয়াছেন—

উড়িতেছে ডাঁস, উড়িছে বোলতা, উড়িতেছে ভীমরুল,
নিতম্বদেশ আঢাকা দেখিলে ফুটাইবে তারা হুল।
মহাকাশ হতে গু-খেকো শকুন হাগিতেছে তব গায়,
বাঙালি শুধুই খচ্চর নয়, তদুপরি অসহায়।

এমন কবি ও কবিতা যে দেশে অনাদৃত থাকে, এই চারিটি লাইন ব্যাখ্যা করিবার জন্য যখন বাংলা এম. এ-র প্রশ্নপত্রে দেওয়া হয় না তখন অধিকাংশ বাঙালি ভূ-চর হইয়াই থাকিবে। খ-পোত বন্দরে ক-জনই বা যাইতে পারে বা চড়িতে পারে? উপরন্তু খ-পোত মোটেই নিরাপদ নয়। বিশেষত খ-পোত ছিনতাই-এর বিপদ যখন মড়ার ওপর খাঁড়া হইয়া ঝুলিতেছে। যাহা হউক, আমরা আবেগের বশে বেপথু হইতে বসিয়াছি। ফের আমরা বিষয়ের সদর দপ্তরে কামান দাগা বরং শুরু করি।

'আমি জানি যে একদল পণ্ডিত হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিবে। মানুষ উড়িতে পারে না। আমার কাছে ওই আপত্তি শেয়াল-পণ্ডিতদের হুক্কা-হুয়া ব্যতিরেকে আর কিছুই না। কারণ প্রমাণ হাতে না লইয়া কে. জি. সরখেল আখড়ায় আসে নাই। তাঁহার সহিত মহড়া নেওয়া হত সহজ নয়।

'শিবসংহিতায় আছে, 'যিনি সর্বভূত জয় করত আশাহীন ও জনসঙ্গশূন্য হইয়া পদ্মাসনে উপবেশন পূর্বক নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করেন, তাঁহার মনোনাশ হয় এবং তিনি ব্যোম পথে গমনাগমন করিতে সমর্থ হন।' ঘেরণ্ড-সংহিতায় বায়বীধারণামুদ্রা আছে। এই মুদ্রাও শূন্যদেশে ভ্রমণশক্তি প্রদান করে। অত কথার কী প্রয়োজন? কারাগারে যোগসাধনাকালে শ্রী অরবিন্দ একদিন ভূপৃষ্ঠ হইতে উপরে উঠিয়াছিলেন।

'সাহেবদের দেশেও এমনটি ঘটিয়াছে। 'ফিওরেত্তি' হইতে জানা যায় লা ভের্না পর্বতে উপাসনাকালে সন্ত ফ্রান্সিস জমি ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিয়াছিলেন। সন্ত থেরেসা-র (মূর্খ পাঠক, ইনি কিন্তু মাদার টেরেসা নন) জীবনেও এমন ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং সর্বসমক্ষে। নানদের তিনি নির্দেশ দিয়াছিলেন ঘটনাটি যেন তাহারা বলিয়া না বেড়ায়। কুপেরতিনো-র সন্ত জোসেফ শুধু নিজে উড়িতেন এমন নয়, ভারী লৌহ নির্মিত ক্রুস-ও সঙ্গে রাখিতেন। সন্ত আলফোনসাস লিগুয়োরি এবং ব্লেসেড টমাস অব্ কোরাই সম্বন্ধেও একই কথা শোনা যায়।

'কিন্তু আমার পরিচিত যে মানুষগুলি উড়িতে পারঙ্গম তাহারা সাধক বা সন্ত কিছুই নহে। বরং উল্টাটি বলিলে খুব একটা ভুল হয় না। আমি তাহাদের কথা এই কারণে বলাবলি করিলাম কারণ আমার উপর তেমনই নির্দেশ আছে যাহা অমান্য করিয়া আমি ইহলোকে আমার বরাদ্দ মেয়াদটুকু আনন্দে কাটাইতে পারিব না। আমার এই বিনামূল্যে বিতরিত রচনাটির লক্ষ্য সরকার ও প্রশাসনকে আগাম হুঁশিয়ারি দেওয়া। কারণ এক প্রলয়াত্মক সংঘাত ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছে। কাহারও ক্ষমতা নাই এই লড়াই হইতে আমার পরিচিতদের মালসাট মারিয়া লাফাইয়া পড়া হইতে ঠেকায়। এই পক্ষে

উড়িতে সক্ষম ও অক্ষম— দুই ধরনের পালোয়ানই আছে। আছে যাদুটোনা। কুহকছাতা। ও নানা সাইজের হনুরন ছানা যাহারা নানা মাপের রন্ধ্রে ঢুকিতে সক্ষম। সরকার ও প্রশাসন যদি মোকাবিলার পথ বাছিয়া নেয় তাহা হইলে রচনাটির শিরোনাম স্মরণ করিতে বলিব। সেই পাখা যদি গজায় তবে তাহা উড়িবার তরে গজাইবে না। মরিবার জন্য গজাইবে।'

(সমাপ্ত)

এই 'সমাপ্ত' যে কে. জি. সরখেলের রচনার, 'কাঙাল মালসাট'-এর নয়, তা খোলসা করে বলার কোনো প্রয়োজন আছে কী? অবশ্য কোনো পাঠক ওই 'সমাপ্ত'-কে অন্তিম বা খতম জাতীয় কিছু ভেবে গোটাটাই পড়া বন্ধ করে দিতে পারে। এমন হুমকিও দিতে পারে। অধুনা যেমত সব খাজামার্কা আখ্যান লেখা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে তার একটি আবশ্যিক অঙ্গ হল যে কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে টক্কর দেবার মুরোদ রাখা। 'কাঙাল মালসাট'-এর সে মুরোদ আছে কি নেই তা অচিরেই প্রমাণিত হবে। কুস্তিপ্রিয় বড়িলালের লাল ল্যাঙট দড়িতে ঝুলছে। নুনুকামানও রেডি। তার ভালোর জন্যই পাঠককে সাবধান করা খুবই সাধু প্রস্তাব। পরে ক্যাঁক-ম্যাঁক করে কোনো লাভ হবে না।

গোলাপ রচনাটি পড়ে প্রথমে ভেবেছিল যথারীতি কালই বড়বাবুকে দেবে কিন্তু পরে ভেবে দেখল সরখেল বন্ধুলোক, কী লিখতে কী ছাতা-মাথা লিখেছে! দাঁতফাঁত পড়ে গেছে। ওকে আর ফাঁসানো ঠিক হবে না। বইমেলা থেকে বেরোতে বেরোতে এই সিদ্ধান্তেই গেড়ে বসার দিকে যাচ্ছিল গোলাপ কিন্তু উল্টোদিকের অন্ধকার মাঠে আনকা ছুকরিফুকরি হয়তো বাজারে নতুন এসে নেমেছে এরকম একটা উটকো সম্ভাবনা তাকে ফুঁসলে মাঠের দিকেই টানল।

মাঠের মধ্যে কিছুটা এসে গোলাপের মনে হল, খাম কাজ হয়ে গেছে। সালোয়ার-কামিজ বা শাড়ি— কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বরং মাঠে ঢুকতেই ঠাণ্ডাটা বেড়ে গেছে আর ভয়-ভয় করছে। গোলাপ একটা সিগারেট ধরাল আর মাঠ ছাড়ার মতলব করল। মাঠ ছাড়ছিলই গোলাপ কিন্তু গাছের ওপর থেকে ডায়লগটি তাকে স্ট্যাচু করে দিল।

—সরখেলের চোতাটা কালই দপ্তরে জমা দিবি। বুঝলি?

গোলাপ ফাঁকা ঢোঁক গিলে 'রাম, রাম' বলতে শুরু করেছিল কিন্তু তাতে খুব একটা ফয়দা উঠল না।

—আমায় কি শালা ভূত পেয়েচ যে রাম-রাম করচ! ওসব রাম-ফাম আদবানিকে গিয়ে দেখিও। আমরা অনেক হার্ডনাট টু ক্র্যাক।

—আঁজ্ঞে, কিন্তু কে আপনি! ভূত না হলে গাছের ওপরে কেন?

হুম্ করে যা নেমে এল তা খতরনাক হলেও অন্তত মনুষ্যরূপী ভূত নয়। বিশাল দাঁড়কাক।

—গাছে যদি শুধু ভূতই থাকবে তাহলে পাখি-বাদুড়রা সব কী করবে? লালবাজারে ঘর ভাড়া নেবে?

গোলাপ ভয়েতে কাঠ। মুখে নাহি কথা সরে। কপালে বিন্দু বিন্দু কালঘাম ফোটে।

—স্পিকটি নট্ দেখচি যে! ওদিকে তো খুব রোয়াব। চা খেয়ে পয়সা দেবার নাম নেই। কাল কী করবি মনে আছে?

—সরখেলের লেখা জমা করে দেব।

—হ্যাঁ, জমা করে দিবি শুধু তাই না, সাধু মালটাকে বলবি যে জম্পেস নোট দিয়ে যেন চোতাটা ওপরে পাঠায়।

—তাই বলব স্যার।

—আবার স্যারফ্যার কেন? এটাও কী লালবাজার নাকি? অনেক বয়েস তো হল। এবার মাগির ধান্দাটা ছাড়্। অনেক তো হল। ওদিকে নাতিপুতি হয়ে গেল।

—আর করব না স্যার।

—ফের স্যার! আমাদের টাইমের ক্যালকাটা হলে এতক্ষণ তোর দফা গয়া হয়ে যেত। কেন্ বল্ তো?

—আপনার টাইম মানে?

—অত তোকে জানতে হবে না। বর্মা থেকে এক দঙ্গল ফাঁসুড়ে এসেছিল। অন্ধকার মাঠে ঘাপটি কেস। অসহায় পথিক বা তীর্থমারানী হলেই ঘ্যাঁক। ফাঁসে টান আর গ্যাঁজলা তুলে মাল ফিনিশ। পয়াকড়ি যা পাও হাতিয়ে হাওয়া। এরকম রাতে বেশ কিছু মার্ডার করে ব্যাক টু রেঙ্গুন। সাদা হাতি। চুপচাপ মাঠ পেরিয়ে চলে যা।

—সে যাচ্ছি কিন্তু আপনার পরিচয়টা পেলাম না।

—দেখতেই তো পাচ্ছিস দাঁড়কাক। বয়সের কোনো গাছপাথর নেই। আর ঘাঁটাসনি। তেড়ে ফুটে যা। তোরও মঙ্গল। আমিও ঠাণ্ডায় গাঁড় মারানো থেকে বাঁচি।

—যেমনটি বলেছেন তেমনটি করছি। একটু কৃপা করবেন। বুঝেছি আপনি এলি-তেলি নন।

—ঠিকই ধরেচিস। যা, সরখেলের বন্ধু আমাদেরও বন্ধু। কোনো বাঞ্চোৎ তোর একটা বালও যদি ছেঁড়ে আমাকে জানাবি।

—আজ্ঞে, ক্রাইসিসের সময় আপনাকে পাব কী করে?

—ভেরি ইজি। পর পর দুরাত তোর ওই ছুঁচো কিচকিচে ধচা ছাদে উঠে খুব প্রেমসে আমার কতা ভাববি। এই চেহারাটা মনে করবি। ক্ষ্যাপাটে চোখ, খ্যাজাব্যাজা পালক, চোখ খুবলে নেবে এমন নখ—চোখ বুঁজে ভাবলেই আমি চলে আসব। প্রথম রাতে সিগন্যালটা পেয়ে যাব। এ তোমার মোবাইল নয়। মোবাইলের বাবা। তবে হয়তো তখন দূরে থাকব। ধর, ব্যান্ডেল চার্চের টঙে। তেমন হলে সিগন্যাল রিসিভ করে ডাউনলোড করে রেখে দেব। সেক্ষেত্রে পরদিন। আর ধারেবাড়ে হলে এসে পড়ব। একডাকেই...।

—আমি আসি তাহলে।

—আয়।

এবারেও বড়বাবু দাঁ গোলাপ মল্লিকের হাত থেকে সরখেলের 'পিঁপিড়ার ডানা ওঠে...' পড়ে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

—কী মাল জোগাড় করেচ গোলাপ! এ তো রীতিমতো ডিক্লারেশন অফ ওয়ার। এক কাজ করো। দলিলটা নিয়ে তুমি মিঃ সাধুর কাছে চলে যাও। আমি বলে দিচ্ছি। আমার ব্যাপারটা ভালো ঠেকচে না। সাফ বলে দিলুম।

অতএব মালটি নিয়ে গোলাপ পৌঁছে গেল তারকলাল সাধুর কাছে। শ্রী সাধু তখন খুনের ব্যবহৃত বুলেট এবং খুনের কাছে পাওয়া কানট্রিমেড পিস্তলে টেস্ট ফায়ার করা বুলেট মিলিয়ে দেখছিলেন।

—আরে, রোজ ফুটেচে আজ। কী ব্যাপার!

—আর রোজ ফোটাতে হবে না। কী ফোটে এবার দেখুন। মালটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

পড়তে পড়তে সাধুর নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়ে।

—ইন্টারেস্টিং! আমার তো বাবা দৌড় ওই টিভিতে জুরাসিক পার্ক দেখা অবদি। এ সব

ঘ্যাটম্যাট আমার মাথায় ঢুকবে না।

—আপনি বরং শেষ প্যারাটা পড়ুন।

একটু সময় গেল। সাধুর ভুরু কুঁচকোনো। কপালে ভাঁজ পড়ল। চক্ষু হইল চড়কগাছ।

—তার মানে? ফের প্যাঁদাপেঁদি। ফের ব্লাড বাথ। এই সরখেল বাঞ্চোৎ কি নকশাল নাকি? যাক গে বাবা, সে যা হবার হোক। সরকার ও প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। আমি রিস্‌ক না নিয়ে নোট দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দুদিন পরে ফাইল ফেরত এল। ওপরে স্কেচ পেন দিয়ে লেখা— 'পাগলচোদা'।

বেগম জনসন দণ্ডবায়সের নিকট সব শুনিলেন। নিকটে দণ্ডায়মান একটি স্লেভ গার্লের পিঠে আপনমনে ঘামাচি মারিতে মারিতে বলিলেন, 'বাট্ মিস্টার ম্যাজিশিয়ান, এই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ইহার কোনো ম্যাচিউরিটি নাই। শালারা এত বড় একটি দলিল হাতে পাইল কিন্তু মর্ম বুঝিল না। আই অ্যাম রিয়্যালি স্যরি। বাংলার ভাগ্যাকাশে এখন সাইক্লোনিক ডিপ্রেশন। আপনি মন খারাপ করিয়া কী করিবেন? ড্যাম ইট। বাই জোভ, এরূপ আহাম্মক কেউ দেখিয়াছে যে পশ্চাতে ধাবমান শূল দেখিয়াও রেকটাম সরাইয়া নেয় না? আমি একাধারে বিউইলডার্ড ও অ্যামিউজড্ বোধ করিতেছি।'

এরূপ বলিয়া বেগম জনসন স্লেভ গার্লটিকে আদর করিয়া একটি লাথি মারিলেন। এবং সেও এই বটকেরার জবাবে খিল্লি দিয়ে হাসি করিয়া দিল। একেই কী ্যায়সা কী ত্যায়সা বলে? কেউ জানে?

pathagar.net

(চলবে)

১২

বিগত 'এগারো' নম্বর ঝটকাটিতে একটি ব্যাপার কোনো টাইপের নজর, তা সে শকুনেরই হোক বা পাতাখোরেরই হোক, এড়াতে পারে না। সেটা হল কড়াপড়া মোলায়েম ধাঁচে চোক্তার-ফ্যাতাড়ু স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স-এর যুদ্ধ ঘোষণা। জুতোর মধ্যে পেরেক ওঠার মতোই নিরীহ কিন্তু যথেষ্ট ঝামেলাদার। সরখেলের ফতোয়া সম্বন্ধে লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ওপরমহল যতই অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য (পাগলাচোদা) করুক না কেন ব্যাপারটি নিরীহ ছিল না। বরং এরকম একটি আগাম হুঁশিয়ারি যে ছাড়া হবে তা নিয়ে কোর কমিটির যে মিটিং হয় সেখানে বৃদ্ধ দণ্ডবায়স, ভদি, বেচামণি, সরখেল, নলেন ও মদন ছিল। এবং দরজায় আড়ি পেতে পুরো মিটিং-এর চাপান-উতোর সবই 'সাধু! সাধু' মুখ করে শুনেছিল এবং ব্রেনে টেপ করে নিয়েছিল মহান সাক্ষী বড়িলাল। দীর্ঘকালব্যাপী সেই আলোচনায় 'ইনসারেকশন', 'নামিয়ে দাও', 'পার্লামেন্টারি পোঁদ মারামারি', 'চট্টলার অস্ত্রাগার লুঠ', 'টেগরা', 'টুপামারো', '১৯৬৯ এতে কারলোস মারিঘেল্লার মৃত্যু', 'কলম্বিয়াতে এফ. এ. আর. সি-র গেরিলা নীতি', 'আশু মজুমদার', 'রেজি দ্রেব্রে-র ফোকো ইনজারেসিওনাল বা অভ্যুত্থানের গলনচুল্লি', 'সুশীল ধাড়ার মৌন মিছিল'—ইত্যাদি নানা চিত্তাকর্ষক শব্দবন্ধ ও বিষয় উঠেছিল। মিটিংটি যেহেতু গোপন তাই এর বেশি জানানো এখন সঙ্গত কারণেই ঠিক হবে না। বরং 'জানি কিন্তু বলব না' গোছের একটা ভাব দেখাতে হবে। এর সুবিধে ডবল। আগামঘোষিত সেই ক্যাচালে 'কাঙাল মালসাট' বড়িলালের কুস্তির ল্যাঙট ধার করে আঁট করে পরে নেমেও পড়তে পারে আবার বেগড়বাঁই

দেখলে 'আমি বনফুল গো...' গাইতে গাইতে সাইডিং-এও ভিড়ে পড়তে পারে। সর্বত্রগামী না হলেও চলবে। তবে বিচিত্র পথে যাওয়ার সম্ভবনা খুলে রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও লেখক-শিল্পীদের ঢ্যামনামি নেড়েচেড়ে দেখা যেতে পারে। সাঁতরাগাছির প্রসিদ্ধ ওল-অরণ্যে 'ওলে! ওলে!' শোনা যায় না। দমদমার নলবনে দুষ্টু শিশুদের মতো ডাক্তার-ডাক্তার খেলাতেও তারা প্রশিক্ষিত হতে চায় না। সব ব্যাটার ধান্দা হচ্ছে সেই শান্তিনিকেতনে একটি কম্পাউন্ড-ওলা বাড়ি বানানো এবং সেই বাড়ির ভেতরের বারান্দায় গুজরাটি দোলনা লাগিয়ে ফিসচুলা, ভগন্দর, নালি ঘা ও পদ্ম-কাঁটা শোভিত বহু-মারানো নিতম্বগুলিকে দোলানো। উইকএন্ড হলেই অল বোকাচোদাস বোলপুর চলল। এছাড়া পৌষ মেলা, দেদোল দোল, দাড়িপুজো, ভাঙা গানের তালে ফুটো খোল প্যাঁদানো—রবীন্দ্রনাথ কি জানতেন যে জ্যোৎস্না রাত হওয়ার জো নেই, আগেভাগেই ঢ্যামনার পাল গিয়ে ফরেস্ট পলিউট করবে! এ ব্যাপারে কিছুই কি করণীয় নেই? আছে। সেটা হল এখনও, দেদারে ঝাড় খাওয়ার পরেও, যে সাঁওতালরা আছে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলা এবং বডি-ল্যাঙ্গুয়েজের ইঙ্গিতে সব সংগীত থামিয়ে দিয়ে বস্তা খুলে পাগলা বেড়াল ছেড়ে দেওয়া। জাহাজী ইঁদুর হলেও চলবে। সাধু অভিপ্রায় নিয়ে যা শুরু হয়েছিল তা এখন খজড়ামির অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অতএব, যে ব্যামোর যা দাওয়াই। হাইলি কনজারভেটিভ বংদের একটি বৃহৎ অংশ এতে 'কাঙাল মালসাট'-এর ওপরে খচবে। 'কাঙাল মালসাট' যাতে সদাশয় ছত্রাকের মতো পাঠক-মনকে বিষমুক্ত করতে না পারে তার জন্য এজেন্ট-অরেঞ্জ ছড়ানো হবে। কিন্তু ডার্লিং, স্যালের থ্রেট নিয়ে চাকতির ঠেকদারেরা মাথা ঘামায় না। তাই এবার হতে আক্ষরিক অর্থেই মুণ্ডুপাত। মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫) যুগ যুগ জিও। জালি রাজার মুকুটহরণ (অ্যান্টিক্রাউনিং) হচ্ছে সকল কার্নিভাল ও কার্নিভালের সমগোত্রীয় উৎসবের মূল উল্লাস।

পতনের গতি কারও দ্রুত অতি, কারও কিঞ্চিৎ ঢিমা
সীমা শেষে গিয়া সব হবে 'হিরোশিমা'।
পরিণামে এক শ্মশানে সবারই ঘর
সাথে রবে শুধু তুমি শ্মশানেশ্বর,
লয়ের আঁধার হতে ফুটাইবে সৃষ্টির অরুণিমা।

জয়, শ্মশানের জয়। জয়, জয়, চাকতির জয়। জয় চোক্তার ফ্যাতাড়ুর জয়। জয়, কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জয়।

এবারে একটি মিহি ইন্টেলেকচুয়াল সমস্যা টুক করে ছুঁয়ে নেওয়া যায়। প্রেতাত্মা, স্পিরিট (মেথিলেটেড নহে) বা গোভূত—কাদের চুতিয়াপনা এর পেছনে আছে আমরা সহমত নহি—'কাঙাল মালসাট' ক্রমেই কিন্তু জাগতিক সময়, ভর, মাইধ্যাকর্ষণ, চুদিট্রন—এসবের আওতায় আর থাকতে চাইছে না। ওয়ের্নার হাইজেনবার্গ নামধারী এক ঘ্যাম জার্মান পদার্থবিদের আত্মজীবনীর মলাট-নাম হল 'ফিজিক্স অ্যান্ড বিয়ন্ড'। ভূতিয়া ললাট-লিখনের ফলে 'কাঙাল মালসাট'-এ 'বিয়ন্ড'-এর টান ধরেছে। সে আর ফিজিক্স-এর আওতায় থাকিতে চাহিতেছেনা। লেখা বা ছাপা অক্ষরে যেন সে অধরা হইয়া পড়িতে চাহে। ছিল বাড়ির বউ, হয়ে যেতে পারে খানকি। অতএব চরিত্রবান পাঠকেরা সাবধান। রেট-ফেট জেনে ওসব পাড়ায় যেতে হয়। ধারা থেকে মাণ্ডু-গাণ্ডুদের তীর্থযাত্রা চলুক। আমাদের পথ ও গন্তব্য অন্য।

ভারতের মোক্ষপ্রাপ্তির ইতিহাসে লাল-বাল-পালের যে গৌরবোজ্জ্বল ও ইতিবাচক অনুঘটকের ভূমিকা তেমনই ভূমিকা হল কলকাতার ক্ষেত্রে নগরপালদের। অর্থাৎ পুলিশ

কমিশনার সাহেবদের। আগে তাঁহারা পকেটমার প্যাঁদাইতেন, রহস্যময় বেলুনে আরাকান হইতে অহিফেন প্রেরণের চক্রান্ত ভণ্ডুল করিতেন, তালতলা ও অন্যান্য থানায় কমিউনিস্টদের ওপর হিংস্র কনস্টেবল-লেঠেল ছাড়িয়া মজা দেখিতেন (রণদিভে পর্বে), পরে নকশালপন্থীদের ওপরে টর্চার করিবার জন্য ইজ্রায়েলী, দক্ষিণ আফ্রিকান ও সি. আই এ-র গোপন টর্চার ম্যানুয়াল অধ্যয়ন করিতেন এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগাইবার নির্দেশ দিতেন—আজকাল এসবের ফাঁকে ফাঁকে তাঁহারা নৃত্যনাট্য, হাফ-ন্যাংটো কেলো বা জীবনমুখো গান, কবি-সম্মেলন কিংবা যৌন-কর্মীদের শুয়ে আঁকো প্রতিযোগিতা—এসবও করেন। কেউ কেউ আরো কয়েক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন। সেসব ঘেঁটে পেটিকেসে ফেঁসে না যাওয়াই ভালো। পাঠকরাও নগরপালদের কর্মকুশলতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে। মালদার কেউ নিজেকে স্ব-নিযুক্ত নগরপাল বলে ভাবতেও শুরু করতে পারে। ডাক-বিভাগের পাশে যেমন কুরিয়ার সার্ভিস। আগে টেররিস্টদের বা বে-আইনি বিপ্লবী রাজনীতিতে কুরিয়ার হইত, আজকাল ঘরে ঘরে কুরিয়ার। তাহাদের মধ্যে আবার যাহারা হেকড়বাজ তাহারা ডাকবিভাগের ঘাড়ে হাগে।

আধপোড়া একটি মাঝারি ল্যাটামাছ। মাথা থেকে ল্যাজা সিঁদুর মাখানো। একটি আঁশবটি। ধুনুচি হতে বিদ্‌ঘুটে গন্ধওয়লা ধোঁয়ার অন্তিম কুণ্ডলী। সাতিশয় আগ্রহে অপেক্ষমান দণ্ডবায়স, ভদি, সরখেল ও নলেনের আটখানি (?) চোখ। ভুদির বাবাই সেই নারকীয় নিস্তব্ধতার মধ্যে অপার্থিব কণ্ঠস্বরে বলে উঠল,

—খাপে খাপ, কেদারের বাপ! নাও, কাটো!

ভদি চেঁচিয়ে উঠল,

—জয়! জয় চাকতির জয়!

সমস্বরে একই রব। দরজার ফুটোয় চোখ লাগানো বড়িলাল বাদে।

বেচামণি ঘ্যাচাং করে ল্যাটামাছটির ধড় হইতে মুণ্ডটি বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অ্যালিয়েনেটেড করিয়া ফেলিল। তখন রাত আধো আধো।

সেই আধো আধো রাতেই দোতলায় প্রশস্ত ভেরান্দায় হুইস্কির গেলাস হাতে ক্যালকাটার নগরপাল মি. জোয়ারদার ভাবছিলেন যে, ওয়েস্টবেঙ্গলে পিপ্‌লস ওয়ার ও এম. সি. সি.-র অনুপ্রবেশের সিক্রেট রিপোর্টটা তিনি সি. এম-কে কি এখনই দেখাবেন না কয়েকটা দিন ঘাপটি মেরে থাকবেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন, লাইক আ বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু বা কঠিন করে বললে বিনিমেঘে বজ্রপাতের মতোই (বীর্যপাত নয়) একটি ফ্লাইং সসার (Z) অক্ষরের মতো অবাঙালি শব্দ করতে করতে তাঁর সাধের লনে ডাইভ মারল। লন সিকিউরিটির প্রয়োজনেই হ্যালোজেন আলোয় আলোকিত। সেই আলোয় মি. জোয়ারদার ওরফে নগরপাল দেখলেন লেটে ফোটা ডালিয়া, হলিহক, পিটুনিয়া—সব ওয়ান্ডার ফুলকেই চাকতিটি কচুকাটা করছে। পুলিশের অভিজ্ঞ ব্রেনে তখনই খেলে গেল নির্ঘাৎ এটি তাঁর একমাত্র ও স্প্যাস্টিক ছেলের জন্যে হংকং-এর মামার পাঠানো কোনো রিমোট নিয়ন্ত্রিত টয়! তাই কি? না কি ড্রোন-জাতীয় কোনো মাল! এই ধন্দ কাটার সময় হয়নি। হুস করে চাকতি লন এবং গার্ডেনের ভুষ্টিনাশ করে হেলায় দোতলার ভেরান্দায় উঠে এল এবং লেসার রশ্মি যেমন চুপিসাড়ে বড় বড় কর্ম ফতে করে তেমনই দক্ষতায় কুচ করে তাঁর মুণ্ডুটি কেটে অন্তরীক্ষে উধাও হয়ে গেল। ড. গিলোটিন (এটি সঠিক ফরাসি উচ্চারণ নয়) দেখিলে অবশ্যই কবুল করিতেন যে খুবই পাকা হাতের কাজ।

এরকম ঘটনা অর্থাৎ মুণ্ডচ্ছেদের অনুষ্ঠান যে নানাবিধ আরবদেশে ঘটে থাকে সেখানে দেখা যায় যে মুণ্ডুটি হাবাগোবার মতো পড়ে আছে। বরং ধড়টিই ছটফট করছে। অবশ্য আলাদা

pathagar.net

হবার পর মাথাটির মুখ এক আধবার হাঁ করে জিভ ভ্যাঙাতে পারে। ইউ-ছাঁট সহ উত্তমকুমার ভোরের কুয়াশাময় ময়দানে যে মুণ্ডচ্ছেদ দেখেছিলেন তার আগে অবশ্য ফায়ার করা হয়েছিল। সেই ঘটনার বহু বৎসর পরে মনোহরদাস তড়াগ হইতে একটি মুণ্ডহীন স্কেলিটনও পাওয়া যায়। এফ. এম রেডিওতে তখন রাত দশটায় শুরু হচ্ছিল 'আজ রাতে'। আজকের বিষয় 'সমকাম'। প্রথমেই একটি গান—'এই কূলে আমি আর ঐ কূলে তুমি...'

স্তম্ভিত হয়ে নগরপাল দেখলেন যে মুণ্ডচ্ছেদের পরেও উপরোক্ত অনুচ্ছেদে যা কিছু লেখা সেগুলো তাঁরই চিন্তা এবং তিনি নিজের দুই কান অর্থাৎ দোকান দিয়েই এফ. এম অনুষ্ঠান শুনছেন। হাতে হুইস্কির গেলাসও ধরা আছে। চুমুক দেওয়ার চেষ্টা করলেন কিন্তু গেলাসটি অবলীলায় মুণ্ডুর ফাঁকা জায়গায় ব্যালেরিনার মতো গেল ও এল। তখন গেলাসটি রেখে মি. জোয়ারদার নিজের মুণ্ডুটি কুড়িয়ে ধড়ের উপরে বসালেন এক হাতে মুণ্ডুটি ধরে রেখে বাকি হুইস্কিটুকু চোঁ করে মেরে দিলেন। নামলও। কোনো ডিফিকালটি নেই। কিন্তু হাত ছাড়তেই মুণ্ডুটি ফের পড়ে গেল। এবং কী নিষ্ঠুর কাকতাল যে ঐ মোমেন্টেই মিসেস জোয়ারদার ভেরান্দায় প্রবেশ করেছিলেন। প্রথম মুণ্ডুপাতটি তিনি মিস করেন। কিন্তু দ্বিতীয়টি নয়। বলাই বাহুল্য, তিনি এই গ্রোটেস্ক ও ম্যাকাবর দৃশ্য দেখে কেলিয়ে পড়ে গেলেন।

—ললি! ললিতা। উফ্ ফেন্ট করে গেল। ন্যাকামির একটা লিমিট আছে। বিহেডেড হলুম আমি আর উনি হয়ে গেলেন সেন্সলেস্। লুক, হানি, আই অ্যাম পারফেক্টলি নরম্যাল। শুধু হেডপিসটা মানে মাথাটা হোল্ড করতে হচ্ছে। ললি! ল...লি!

ভ্লাদিমির নবোকভ-এর 'লোলিটা'-র (১৯৫৫) প্রসঙ্গ কারও মনে পড়তে পারে। বিশেষত মধ্যবয়স্ক পুরুষ যাঁরা অজান্তেই হয়তো 'লোলিটা সিনড্রোম'-এর শিকার। হতেই পারে বা হলেই হল। আটকাচ্ছে কে? হ্যায় কোই রুখনেওয়ালা?

যাই হোক, হচ্ছিল ললিতা জোয়ারদারের কথা। পুলিশের বউ। এরা হল অন্য মেকদারের পয়দা। ধড়, মুণ্ডু, ডাকাতি, চপার, রামপুরিয়া, বস্তায় খণ্ড খণ্ড যুবতী, কিডন্যাপ, গুম শুনে এরা নিজেরাই দুঁদে মাল হয়ে উঠেছে। অচিরেই বরফজলের ছিটে ও একটি পাতিয়ালা পেগ ললিতাকে ধাতস্থ করে তুলল। অতি অল্প সময়েই তিনি দু-পিস্ স্বামীর সম্বন্ধে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলেন। সম্ভবত এই কারণেই হয়তো দাঁড়কাক বলেছিল—খাপে খাপ, কেদারের বাপ।

ডিনার টাইম হয়ে গেছে। নীচে বাবুর্চি গং বাজাল। প্রথমে নামলেন মিসেস জোয়ারদার। তিনি পরে আছেন একটি ইংলিশ হাউসকোট। পায়ে জাপানি ঘাসের চটি। পেছনে সিল্কের ওপরে বুটিকের কাজ করা লুঙ্গি ও ফিনফিনে ফতুয়া পরা নগরপাল। কিন্তু ও কী?

নগরপাল সিঁড়ি দিয়ে নামছেন—দুহাত দিয়ে দুটি কান ধরা। মনে হচ্ছে ব্যাদড়া বাচ্চাকে কান ধরিয়ে হেডমিস্ট্রেস স্কুলে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। বাবুর্চিরা এই দৃশ্যে খুবই ভয়চকিত হয়ে উঠল। হওয়ারই কথা। এর আগে বিবিধ কারণে অকারণে নগরপালকে তারা বউ-এর কাছে ঝাপড়া খেতে দেখেছে। কিন্তু এরকম কোনো দৃশ্য তারা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। এবং এর পরে যা ঘটল তা রোমহর্ষক। নগরপাল চামচ ধরে সুপের ঝোলের দিকে ঝুঁকতেই তাঁর মাথাটি নাক বরাবর সুপের ওপরে ঝাঁপ দিল। চেয়ারে কবন্ধ। দুজন বাবুর্চি ও কুক, তখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। কারপেটের ট্রে, কাটলারি, রোস্ট চিকেন ও গ্রেভি।

মিসেস জোয়ারদার খেঁকিয়ে উঠলেন।

—হোয়াট স্টুপিডিটি। দুহাতে মাথা অ্যাডজাস্ট করেই তোমাকে চুমুক লাগাতে হবে। ফরগেট কবে স্পুন বা ফর্ক ব্যবহার করেছ। কান থেকে হাত ছাড়া চলবে না। কাল দেখব টুপি, দড়ি

এইসব দিয়ে যদি ম্যানেজ করা যায়। নিজের ঝামেলা নিজে সামলাও। সুপটুপ ছিটকে, লোকজনকে ভয় দেখিয়ে—ডিজগাস্টিং।

—সরি ললি! মাথাটা টপল্ করে যাবে বুঝতে পারিনি। কী যে সব হচ্ছে। প্রোভোকেশন নেই, প্রায়ার কোনো রিপোর্ট নেই—বিহেডেড হয়ে গেলুম।'

—যা হয়েছে, হয়েছে। কালকের আগে যখন কিছু করা যাবে না তখন ফালতু কনজেকচার করে লাভ নেই। দু হাতে কান ধরে স্ট্রেট বসে থাকো। আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

—দেবে! সেই ভালো। সুপটা বড় ব্ল্যান্ড করেছে আজ। একটু সস্ মিশিয়ে দাও তো।

—দাঁড়াও আগে মুখটা মুছে দিই। একজনকে তো খাইয়ে নাইয়ে না দিলে হয় না। আরেকজন বাড়ল। এই মাদারিং করতে করতেই লাইফটা গেল। কোথায় নিজের দিকে একটু নজর দেব।

সস্নেহেই কথাগুলো বলছিলেন মিসেস জোয়ারদার কিন্তু নগরপাল মনে মনে বলছিলেন।

—ওই তো বালের চেহারা। তার দিকে আবার নজর। ভুরু প্লাক করে ডিমের মতো মুখ। তাতে আবার কীসব মাখবে। তাইওয়ান থেকে ক্রিম আনছে! শিশির ওপরে আবার প্রজাপতি আঁকা। কী বিদঘুটে গন্ধ। বিউটি মারাচ্ছে। সেদিনই তো তাজবেঙ্গলে টাবুকে দেখলুম। কী জিনিস। কী ঠোঁট? আর একে দ্যাখো। তাকিয়া। একজ্যাক্টলি তাকিয়া। আগে তাও বয়স কম ছিল। চলত। বান্টি, মিসেস সেন, তারপর গিয়ে হোম সেক্রেটারির বউ হিমানী সোম—এখনও! এখনও! আরে বাবা যে এজে যেমন। আর ইনি, কিলো কিলো এজ-ডিফাইং ক্রিম মাখছেন। এই মাথা-কাটাই তোর জুটবে। বুঝলি, হুমদো মাগি কোথাকার!

এবারে নগরপাল বললেন, মনে মনে নয়,

—আঃ ফিস কাবাবটা ছোট ছোট পিস করে দেবে তো। আস্ত মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। গলার কানেকশনটা আনস্টেডি, বুঝতে পারছ না? আবার কী ফ্যাচাং লেগে যাবে!

—আই অ্যাম সরি ডার্লিং।

—এই আইটেমটাতে নো ফাইভ স্টার ক্যান বিট আবদুল। রোজ খাই। কিন্তু পুরনো হয় না।

—আমারই মতো। বলো?

—উঁ...ম্।

সেই ভয়াল রাতেই মদন স্বপ্নে দেখল বাজারে তাকে মাছের মুড়ো আর ব্রয়লারের চোখ বন্ধ মুণ্ডুর ঝাঁক কামড়াবে বলে তাড়া করেছে। বোয়াল, আড়, শোল ইত্যাদি বিকট মাছের হাঁ-মুখে সারি সারি দাঁত। চুনোপুঁটির মুণ্ডুও বাকি নেই। তারাও পায়ে ঠোকরাচ্ছে। ঘুম ভেঙে মদন উঠে পড়ল। অন্ধকারে হাতড়ে বোতলটা খুঁজে নিট বাংলা খানিকটা ঘ্যাক করে মেরে দিতে অস্বস্তিটা যেন জুড়োল। ঘটনাচক্রে সেই ভয়ালু রাতে কবি পুরন্দর ভাটও মদনের ঘরে মালফাল খেয়ে গামছা পরে তাঁবু খাটিয়ে ঘুমোচ্ছিল। নিদ্রার ঘোরেও তার কাব্য রচনায় ক্ষান্তি নেই। মদন তার মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়ে শুনতে পেল, শ্যামাসংগীতের ঢঙেই—

মুণ্ডুমালা পরলো শ্যামা
গাত্রে না হোক পরলি জামা
ভাট কবিতায় পূজব বলে
মুণ্ডু আনি ধামা ধামা।
শ্যামা মায়ের ঠোঁটে হাসি
মুণ্ডু পরতে ভালোবাসি

পুরন্দরের মন যে বলে
পঞ্চাশৎটি বর্ণ দোলে।
মুণ্ডু দেখে যায় না বোঝা
কোনটা ডাকাত, কোনটা ওঝা
কোনটা তাপী, কোনটা পাপী
কোনটা ভাগ্নে, কোনটা মামা

মুণ্ডু আনি ধামা ধামা...

মদন কয়েকবার পুরন্দরকে থাবড়ে যখন দেখল থামবে না তখন বাধ্য হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই ভয়াল রাতেই পাশে শোয়া মোটা বউ ও গাঁদা বাচ্চা থাকাতেই স্বপ্নে হেলেনের নাচ দেখে ডি. এস-এর স্বপ্নদোষ হল।

বড়িলালের ঘরে রাস্তার আলো ঢোকে বলে সে চোখের ওপর ল্যাঙট চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। তার ওসব কিছু হয়নি।

সেই অস্থির তাড়সে কেঁপে কেঁপে ওঠা রাতেই চোখে চাঁদের স্পট পড়ায় ঘুম ভেঙে মিসেস ললিতা জোয়ারদার দেখলেন বালিশের ওপরে নগরপালের মুণ্ডুর নাক ডাকছে কিন্তু ধড়টি আলাদা হয়ে উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। ধড় একবার, ঘুমন্ত অবস্থাতেই, বাতকর্মও করল। চাঁদের সামনে মেঘের মিড-কার্টেন পড়তে মিসেস জোয়ারদারও পুনরায় ঘুমন্ত স্টেজে চলে গেলেন।

এরপর যা অবশ্যম্ভাবী তাই হবে। কোনো গেঁড়ে নির্ঘাৎ প্রশ্ন তুলবে যে 'পঞ্চাশৎ' বণ; বা মুণ্ডুর রহস্যটা কী? সবই কি বাংলা টেনে ঢপবাজি? এর প্রথম উত্তরটি হল মুচকি হেসে স্পিকটি নট। দ্বিতীয় উত্তরটি হল—বাবা মা যখন পয়দা করে কাঁচা ড্রেনে না ফেলে দিয়ে পয়াকড়ি খরচ করে পড়িয়েচে তখন একবারটি বাপু ২ টাকা ৫০ পয়সার মাধুকরীর বদলে ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর 'জগজ্জননী কালীমাতার তত্ত্ব' বইটি বগলদাবা করে পড়ে ফ্যালো দিকিনি। দুইগোটা সম্ভাব্য উত্তরের কোনটি ইস্তেমাল করা উচিত? কতিপয় গেঁড়েকে মাইনাস করিয়া বাকি পাঠকরা কী বলে?

পরদিন সকালে এগারোটা বাইশে সি. এম তাঁর পি. এ মারফৎ নগরপালকে ডেকে পাঠালেন। আই. এস. আই. কলকাতায় কী খেল খেলছে সে বিষয়ে তিনি কথা বলতে চান। এইসব এজেন্টরা যেহেতু বনবাদাড়ে ঠেক বানায় ও বীরাপ্পনের স্টাইলে অপারেট করতে পারে তাই বনমন্ত্রী বনবিহারী তা এবং গৃহমন্ত্রী ও আমাদের পূর্বপরিচিত কমরেড আচার্যকেও ডাকা হয়েছে। উর্দি চাপালেই চলবে না। মাথাটিও স্বস্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। স্ত্রীবুদ্ধিই নগরপালকে এ যাত্রা বাঁচাল। এক মৃদু ঝাড়েই মোটরসাইকেলওয়ালা ঢ্যাঙা সার্জেন্ট তার 'স্টাড' লেখা হেলমেটটি দিয়ে কেটে পড়ল। এবং সেটি পরে দেখা গেল নগরপালের মুণ্ডু যথাস্থানে থাকছে এবং তদুপরি দুটি হাতই তিনি অবলীলায় নাড়াচাড়া করতে পারছেন। অর্থাৎ মাথা-কাটা অবস্থাতেও তিনি প্রতিবন্ধী নন। বেরোবার মুখে, দরজার দোরগোড়ায়, ললিতা নগরপালকে একটি পিঙ্ক রঙের গোলাপ দিলেন। এবং ছোট সাইজের একটি খাম। সিল করা।

—পিংক রোজ ইজ অলরাইট। কিন্তু এই খামে কী আছে?

মিসেস জোয়ারদার মুখ টিপে হাসেন।

—সি. এম-এর সঙ্গে মিটিং সেরে বেরিয়ে লালবাজারে যাবে তখন দেখবে। আগে নয়।

—লে হালুয়া।

সি. এম তো নগরপালকে দেখে থ!

—এ কী? তুমি আবার মোটর রেসিং ফেসিং শুরু করলে নাকি?

—না, স্যার। ঘাড়ে ব্যথা। কলার নেব। কিন্তু টাইম পাচ্ছি না। ডক্টরের সঙ্গে দুটো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করেছি। তাই এটা দিয়েই কাজ চালাচ্ছি।

—কী জানি বাপু। ঐ স্পেসটেসে যারা যায় তাদের কী যেন বলে।

বনবিহারী তা বলে ফেলে,

—ঠিক বলেছেন সার, পাইলটের মতো।

গৃহমন্ত্রী খিঁচিয়ে ওঠে,

—যা জানো না তা নিয়ে কমেন্ট করো কেন? উনি বলছেন মি. জোয়ারদারকে কসমোনটদের মতো লাগছে।

—ওই হল। পাইলটও ওড়ে, কসমোনটও ওড়ে।

—থামবে তোমরা? ডি. জি-র সঙ্গে পরে আমি মিট করব। তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই। বনবাদাড়ে অনেক ঘুরেছ। হোয়াট ইজ ইয়োর রিডিং?

—তাহলে সার, একটু ডিটেলেই বলি। কাঠমাণ্ডুর ঐ আই. এ. সি প্লেন হাইজ্যাকিং-এর পর থেকেই লক্ষ করছি যে,

ফোন বাজে, অফ-হোয়াইট ফোনটা তোলেন সি. এম।

—হুঁ? ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার ওয়ান্টস টু স্পিক টু মি। আস্ক হিম টু রিং আফটার সামটাইম। আই অ্যাম বিজি। যত্ত সব। চলো।

নগরপাল গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করতে যাবেন কিন্তু বেল বাজল এবং পি. এ টু সি. এম মি. ঘোষাল ঘরে ঢুকে পড়লেন।

—সার! সার! কাল তো মিস ক্যালকাটা কনটেস্ট ছিল।

কমরেড আচার্য গজরে ওঠেন।

—মিস ক্যালকাটা নয়, মিস কলকাতা।

—আঃ বড় ইন্টেরাপ্ট করো। বলো।

—সার, সেই কম্পিটিশনের সব বিউটিরা একবার আপনার কাছে এসেছে।

—আমার কাছে? হোয়াই? কী চায় ওরা?

—কিছু না সার। আজ বলছে মানে আপনার হল গিয়ে ভ্যালেনটাইনস্ ডে। ফুল দিয়ে আপনাকে গ্রিট করতে চায়।

—আসতে বলো। আফটারঅল অ্যা গ্রুপ অফ ইয়ং বিউটিজ। বিউটি ইজ ট্রুথ।

চার্পিং পাখির দলের মতোই খিলখিলিয়ে নটি বিউটিরা ঘরে ঢোকে। এর মধ্যে গোলাপের তোড়া যার হাতে সেই হল মিস ক্যালকাটা—রোজা কাপাদিয়া। ওরা সকলকেই ফুল দেয় ও মন্ত্রীদের গম্ভীর মুখগুলিতে মৃদু হাসি কুঁড়ির মতো ফুটে ওঠে।

—জোয়ারদার, তোমার হেডগিয়ারটা খুললে না? মিনিমাম এটিকেট। ঘাড়ে ব্যথা বলে...

—ইয়েস সার।

জোয়ারদার পা ঠুকে দাঁড়িয়ে উঠে বাঁ হাত দিয়ে হেলমেটটি ওপরে তোলেন। ফলে মুণ্ডুসমেত হেলমেটটি ওপরে উঠে যায় ও ফুলের গোছা নেবার জন্যে কবন্ধ ডানহাতটি বাড়িয়ে দেয়। রোজা ও অন্য সুন্দরীরা গোলাপের মতোই ঝরে যায়। মানে সহসা ক্লোরোফর্ম করা হল এরকম ভাব দেখিয়ে চোখ উল্টে ধুপধাপ পড়তে থাকে। মি. ঘোষাল চিৎকার করে ওঠেন।

—মাথা নেই। সার, মাথা নেই। ভূত!

হেলমেটের ভেতর থেকে জোয়ারদারের মুণ্ডু বেরিয়ে পড়তে যাওয়ার মুখে ডান হাত দিয়ে জোয়ারদার তাকে ধরে ফেলে এবং চুলের মুঠি ধরে গলায় বসায়।

—ভূত-ফুত নয় সার। মাইনর একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট হলেই ঠিক হয়ে যাবে।

সি. এম চটে যান।

—এই অবস্থায় ডিউটি করছেন আপনি? মাথা আলাদা অবস্থায়। এ জিনিস আমি কখনোই সহ্য করব না।

জোয়ারদার হেলমেট ফেলে দেন। বাঁ হাত দিয়ে বাঁ কান ধরে মাথাটি ধরে রাখেন। ডান হাত দিয়ে স্যালুট করেন।

হেড অর নো হেড, জোয়ারদার কখনও ডিউটিতে ফল্টার করে না।

—দ্যাটস্ লাকি আ ব্রেভ পুলিশম্যান, বাট...

ঘোষাল ঘর থেকে বেরিয়ে মানে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এবার তিনি ডি. জি-কে নিয়ে ঢোকেন।

কমরেড আচার্য বলেন,

—এসব কী হচ্ছে বলুন তো? আমি রিপোর্ট চাই।

বস্তুত ডি. জি-র দিকে না তাকিয়েই তিনি রিপোর্ট তলব করেছিলেন।

ডি. জি-ও নগরপালের মতোই হেলমেট পরা।

নগরপালের বুক পকেটে মিসেস জোয়ারদারের ভ্যালেন্টাইনস্ ডে-র কার্ড খামবন্দী। তাতে আঁকা ছিল একটি লাল হৃদয় এবং তলায় দুটি নীল রঙের ফিমেল ঠোঁট। তলায় লেখা 'পাগলী'।

(চলবে)

pathagar.net

১৩

'১৩', সেই অপয়া ও ঢপয়া ১৩ নং অধ্যায় ঘোর অনিচ্ছা তুচ্ছ করে এসেই যখন পড়ল তখন তাকে তাসা পার্টির খুলিফাটানো ঢিং চ্যাক কুড়, ঢিং চ্যাক কুড় সহযোগে আমন্ত্রণ জানানোই ভালো। ইতিহাসের সকল ঘনিষ্ঠ পাঠকই দেখিয়াছেন যে কী ডাইনোসরদের যুগে, কী অ্যামিবার আমলে বা হোমো স্যাপিয়েনদের জামানায় যখনই কোনো সাধু প্রচেষ্টা হইয়াছে অমনি এক দল ডাইনো, অ্যামিবা বা হোমো স্যাপিয়েন বিনা প্ররোচনায় বা খজড়াদের মদতে তাহাকে নস্যাৎ করিবার ঘৃণ্য চক্রান্তে মাতিয়াছে। কাজেই একই জাতের ও পাতের নিন্দামূলক অপপ্রচার যে চোক্তার ফ্যাতাড়ু-কমনম্যান কম্বাইনের বিরুদ্ধে লাগু হইবেক তাহাতে সন্দেহ কী? এর জবাবে অকুতোভয় বাঙালিরা একসময় এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলত,

'নিন্দে যখন রটেছে তখন শালা বিয়েই করব।'

সে যুগ আর নাই। এখন কবির ভাষায় বহাল হইয়াছে 'বিষাক্ত যুগ'। এই শিরোনামটি বসাইয়া পোয়েট বিশু দত্ত যদি অবসরগ্রহণ করিতেন তাহা হইলেও চলিত। কিন্তু পোয়েটরা সচরাচর তেমন করেন না। তাই বিশু দত্ত লিখিয়াছিলেন,

> কারাপ্রাচীরের অন্তরালেতে এখন জাগিছে কারা?
> এ যুগকে শুধু মেনে নিতে হবে, যদি বিষাক্ত তার
> বাহু দুটি মেলি করে ফেলে গ্রাস। হে কবি আত্মহারা,
> আমাদের তবু তার কাছে আজ নিষ্কৃতি নাই আর।

এই কাব্যাংশের ব্যাখ্যা সহজ নয়। কেবল্ ফল্টকে খুচরা লোডশেডিং ভাবিলে চলিবে না। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখিয়া শ্রী বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিয়াছিলেন, 'তাঁহার ছবি হইতে যদি কোনো অর্থ খুঁজিতে যাই তাহা হইলে নিরাশ হইব। আনন্দের প্রেরণায় ছবি আঁকা—এ ছাড়া তাঁহার তুলিকা ধারনের পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই।' পণ্ডিত কেন, মুর্খরাও এ কথা মানিবে না। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ একাধিক ভূতুড়ে ছবি আঁকতে গেলেন কেন? যা দেখলে শিশুরা অট্টক্রন্দন জুড়িয়া দিবে। কেন? এর উত্তর ঘোর ঘোরপ্যাঁচের আবর্তে লুক্কায়িত এক মুচকি রহস্য। লুপ্ত গোরস্থানের উপরে শ্মশানের ধূম। ঘাড় মটকানো ঠেকায় কে? যাই হোক, আর প্রসঙ্গান্তরে নানাবিধ চর্চা ছাড়িয়া আমরা বিষাক্ত যুগের নিন্দার কর্দমাক্ত খেলটি বরং পাকড়াই। এ যুগেরই এক ঘটনা। বিশেষ পুরনোও নয়। কংগ্রেস নেত্রী আভা মাইতি মেদিনীপুরের বুভুক্ষুদের মধ্যে সাধু অভিপ্রায়ে চালিত হইয়া মাইলো বিতরণ করিয়াছিলেন। অমনি কং-বিরোধী বাম দেবরা গান বাঁধিল, 'একটি বালিকা চাইলো'র সুরে

আভাদিদির মাইলো
সবাই মিলি খাইলো
উদরাময় হইল
(ফের) আভাদিদির মাইলো...

সেই ট্রাডিশন চোক্তার-ফ্যাতাড়ু কেন, কাহাকেও ছাড়িবে না। তাই সদাপ্রস্তুত থাকিতে হইবে। প্রস্তুতি সম্বন্ধে জানানও দিতে হইবে। ইতিপূর্বে সরখেল যেমন করিয়াছে। খাপে খাপ, কেদারের বাপ।

দীর্ঘদিন হইল ক্যালকাটায় আর বসন্তকাল আসে না। মধ্য এশিয়াতে সোভিয়েতের কল্যাণে পুঁজিবাদকে বাইপাস করিয়া যেমন বিদ্যমান ও 'প্রকৃত' সমাজতন্ত্র চালু হইয়াছিল তেমনই গুটিকয় স্টুপিড কোকিলের আর্তরব হিসাবে না ধরিলে ক্যালকাটায় উইন্টারের পরই সামার আসে। এবং এই সামারেই অর্থাৎ মার্চের গরমে একটি পোস্টারে শহর ছয়লাপ। দিল্লি-বোম্বাই সাবাড় করিয়া এক হাফ-কাবলে সেক্স-ভকিল ক্যালকাটায় আসিয়াছে যাহার অসাধ্য কিছুই নাই। পোস্টারটি এইরকম,

সেক্স-ভকিল! সেক্স-ভকিল!
ফরঘানার হেকিমি ঘরানার খলিফা
বাবরাক কামাল কাবুলী
কলকাতায়
সেক্স-ভকিল! সেক্স-ভকিল!
কাবুল, পেশোয়ার, দিল্লী, বোম্বাই টুর খতম
লাস্ট স্টপ! লাস্ট স্টপ!
এ যাত্রায় কলকাতা
ঘর-৩৭। হোটেল গোপাল, ৯৫-এ, লাকি লেন
কলকাতা-১৬
সকাল—আম দরবার সন্ধেবেলা—স্পেশাল

এই মর্মে বিভিন্ন বাংলা (আনন্দবাজার নহে), ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দু দৈনিক-এ বিজ্ঞাপনও লোকের নজর কেড়েছিল। আম দরবারে বিপুল জনতা সামলাতে পুলিশ হিমসিম খেয়ে যায়। সবটাই ঘাড়ে গিয়ে পড়ল পার্ক স্ট্রিট থানার। একেবারে হুলো কেস। আগেই আমরা যার কথা জেনেছি সেই শ্মশান পাড়ার থানার টাকলা ও.সি-কে ফোন করে দুঃখের কথা বলতে বলতেই ঘেমে গেল পার্কস্ট্রিটের বড়বাবু।

—ছিলুম ভালো। মাগির দালাল, ভেড়ুয়া, খদ্দের—চার পাঁচটা ধরো। দুখানা রদ্দা ঝাড়ো। তিন চারটে পেডলার ধরো। ধুমা ক্যালাও। একটা দুটো চামড়াচোর। গাঁড়ে লাথ্, লক্ আপ। কোত্থেকে বাঁড়া এই সেক্স-ভকিল এল। ব্যস্, হালুয়া হয়ে গেল। রোজ সকালে রগড়ারগড়ি ভিড়। আর লোকেরও বাঁড়া খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। বুড়ো হয়ে গেছে। ধুকপুক করচে। তবু খিটকেলের ধান্দা। লাইফে লঙ্কাবাটা দিয়ে দিলে মাইরি। কোতায় দুজনে একদিন অলিপাবে গুছিয়ে বসব।

—তবে ভায়া লোকটা শুনচি ধন্বন্তরি। হালুয়া মোরব্বা কী সব দিচ্চে। রেজাল্ট নাকি ফ্যানটাসটিক। এক রাতে সব ঝটাঝট বনমোরগ হয়ে যাচ্ছে। অল টাইম অন।

—বলো কী ভায়া!

—এই জানবে। ঘোড়ার মুখের খবর। আমি তো ভাবচি রাত করে একটা ভিজিট মেরে দেব কিনা!

—দেবে? তাহলে বলো তো একটা ব্যবস্থা করে ফেলি। দুই ভাইতে মিলে না হয় আড়ালে-আবডালে...

—করে ফ্যালো। কদিন থাকবে মালটা?

—বুজতে পারছি না। হোটেলের মালিকটাও গাছহারামি। জানলেও ভাংচে না। বললেই বলচে, দেকুন স্যার এরা হচ্ছে বেদুইনের জাত, মরুভূমিতে সোর্ড হাঁকানো পার্টি। এই দেকচেন আতর চুলবুলিয়ে মাইফেল বসাচ্চে, গালচেতে শুয়ে গড়গড়া টানচে আবার খেয়াল চাপল কি তেরাত্তির না পোয়াতেই চিচিং ফাঁক করে ভোঁ ভাঁ।

—তবে আর বিলম্ব করো না।

—তা করব না। তবে হেভি রাশ। বড় কত্তারা সব আসা যাওয়া করচে। মানে সব মহলেরই আর কি। নামের লিস্ট দেখলে কেলিয়ে পড়ে যাবে। কে নেই?

—আরে তার মধ্যেও একটা ফাঁক ফোঁকর দেখে গলিয়ে দিতে হবে।

—সে ম্যানেজ হয়ে যাবেখন।

—ব্যস, তারপরই!

—কী তারপর?

—কী আবার! খাপে খাপ, কেদারের বাপ।

এরপরই টেলিফোনের দু প্রান্তেই খলখলিয়ে হাসির হাসনুহানা ফুটল। এ হল সেই হাসির ফুল যা অচিরেই ঝরে পড়ে। সামান্য টোকাতেই।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটরের আজ মহানন্দ। কারণ স্বয়ং ছিন্নমস্তিষ্ক নগরপাল তাঁহাকে ফোনে জানাইয়াছেন যে অদ্য, ১৩ মার্চ, রাত সাড়ে দশটায় কাবলে সেক্স-ভকিলের সঙ্গে তাঁর এক্সক্লুসিভ অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং তিনি কোনো মতেই তাঁর বাল্যবন্ধু মহামান্য কিউরেটর মহাশয়কে সঙ্গে না লইয়া যাইতে নারাজ। বাল্যকাল, পোড়া শিবমন্দিরের ধসা দেওয়ালে বসিয়া তাঁহারা এ-উহাকে নিজ নিজ সাধনদণ্ড দেখাইয়াছিলেন। তখন তাহারা সবেমাত্র উসখুস করিতে

শিখিয়াছে, সংসার সমরাঙ্গণে মল্লক্রীড়ায় মাতোয়ারা হইবার মতো পাকাপোক্ত হয় নাই। সেই শিহরণ, সেই রোঁয়া রোঁয়া স্মৃতি, সেই অপাপবিদ্ধ হোমোখেলা কি ভোলা যায়? গেল না। এইসব সাতপাঁচ ভাবিতে ভাবিতে কিউরেটর মহোদয় তাঁহার এক প্রৌঢ়া অধ্যাপিকা বান্ধবীকে ফোন মারিলেন যাঁহার বিষয় ভূগোল হইলেও সাহিত্যপ্রীতি উভয়কেই অবুঝবন্ধনে বাঁধিয়াছে।

—বিরক্ত করলাম?

—একটা ক্লাস অফ্ পেয়ে চুপচাপ বসেছিলাম। ভালোই হল।

—কী ভালো হল?

—সে তুমি বুঝবে না।

(টেলিফোনে নিঃশ্বাসের ফোঁস ফোঁস শব্দ)

—বুঝেছি।

—ভালো।

—এই শোনো, যে কারণে তোমাকে ফোন করলাম। হঠাৎ একটা নতুন আইডিয়া মাথায় এল। সাহিত্যের সমস্যাটা একটা মূল শ্রেণীতে, দুপাশে সাজালেই সব তর্ক মিটে যাবে। কেউ জানে না। তোমাকেই বলছি। কারণ তুমি বুঝবে।

—যদি বুঝতে না পারি? যদি মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়?

—যাবে না। যেভাবে ভেবেছি সেটা পুরোটাই মাথার তলার ব্যাপার।

—কোনো দুষ্টুমি আছে বলে মনে হচ্ছে।

—না, না, নো দুষ্টুমি। একটা বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে বুফে সিস্টেম। ওখানেই আইডিয়াটা মাথায় এল। সাহিত্যকে দুভাগে আমরা দেখতে পারি—ভেজ আর নন-ভেজ।

লাল ল্যাঙট পরে অল্প ভুঁড়িওয়ালা বড়িলাল তার ঘরে, হনুমানজীর ছবির সামনে, দুটো থানকা ইট এক হাত ফাঁক করে বসিয়ে বুক-ডন মারছিল। রোজ দু সেট করে ডন মারে বড়িলাল। কুড়িটা করে এক এক সেটে। এতই আপার বডি টাটিয়ে যায়। এরপর রয়েছে পঞ্চাশ করে দুসেট পাতিয়ালা বৈঠক। লাফিয়ে জোড়াপায়ে এগিয়ে বৈঠক ফিনিশ করে ফের লাফিয়ে পেছিয়ে যায়। পুরোনো আমলে এই বৈঠক মল্লবিদ ও বডিবিল্ডারদের মধ্যে সবিশেষ জনপ্রিয় ছিল। এখন চলে, একহারা বৈঠক। উঠ, বয়েঠ। এক এক পক্কড় শেষ করে বড়িলাল চিনির সরবত ছোট ছোট চুমুকে মেরে দিতে দিতে বিড়বিড় করছিল।

—সেক্স-ভকিল! আরে বাবা সিনার জোর, টেংরির জোর, আড়ার জোর নেই—এক কাট্ দিলেই পটকান্—সব সেক্স-ভকিলের ঠেঙে চলেচে। সব ধড়কান হয়ে মরবে। এখনও দ্যাকো যেয়ে তোমরা মনোহর আইচ। পড়্ পড়্ করে পাঁজি চার টুকরো করে দেবে। পারবি? একনও দুটো কাবলেকে ধরে মাতা ঠুকে বাজিয়ে দেবে। পারবি? ওসব হল গিয়ে তোমার হিড়িক। যেমন পাড়ায় পাড়ায় জিমখেলা বানাচ্চে। সব ফঙ্গবেনে কারবার।

বিশাল একটি টিকটিকি এই কথার ফাঁকে গোবর গুহর ফটোর পেছন থেকে বেরিয়ে স্যান্ডো-র ফটোর পেছনে চলে গেল। যদিও সেটা ব্যায়ামরত বড়িলালের চোখে পড়েনি। বড়িলাল হনুমানের সামনে যে নকুলদানা রাখে সেগুলো চাটতে আরশোলা আসে। তখন গামা, জিবিস্কো, গোবর গুহ, স্যান্ডো ও মহিলা কুস্তিগির হামিদা বানুর ফটোর পেছন থেকে টিকটিকির পাল বেরিয়ে আসে। আরশোলার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে টিকটিকিদের মধ্যেই ফ্রিস্টাইল বা গ্রিকো-রোমান কুস্তি লেগে যায়। এই দৃশ্যটিই বড় করে দেখলে বোঝা যাবে পুরাকালে

ডাইনোসররা কীভাবে এ ওর খবর নিত। সিনেমায় ফাইট কম্পোজারের দরকার হয়। সে না থাকলে সব ফাইটই অচল। কিন্তু এই টিকটিকিদের ফাইটের কম্পোজার স্বয়ং ঈশ্বর। এবং আরও কী তাজ্জব ব্যাপার, এই অর্থসর্বস্ব বিশ্বে, বিনা পারিশ্রমিকেই তিনি এই কাজ করে চলেছেন। হাততালি-ফাততালিরও তোয়াক্কা করেন না। স্রেফ টিকটিকি লড়িয়ে দিয়েই আপন খেয়ালে বুঁদ! এর জন্য যে তারিফ তাঁর প্রাপ্য তা তিনি বাঙালি চোদখোরদের কাছে কোনোদিনও পাবেন বলেও মনে হয় না।

অপয়া '১৩' অধ্যায়েই ১৩ মার্চ বিকেলে, আচমকা হুড়মুড় করে ডি. এস কে দুপাশ থেকে ধরে মদন ও পুরন্দর ভাট যেভাবে ঢুকেছিল তা একমাত্র বড় মাপের ট্রাজিক নাটকেই মাঝে মাঝে দেখা যায়। নলেন তখন লণ্ঠন পরিষ্কার করছিল। বেচামণি সালোয়ার ও কামিজ পরে উঠোনে কত্থক প্র্যাকটিস করছিল এবং ভদির বাপ বৃদ্ধ বায়স তা ধেই, তা তা এবং লচক্‌তো মচক্‌তো ইত্যাদি বোল ও ধাঁচ বোঝাচ্ছিল এবং অনতি দূরেই বারান্দায় ভদি ও সরখেল এমনই নিচু গলায় কথাবার্তা বলছিল যা শোনে কার বাপের সাধ্যি! এবং এই স্বাভাবিক, দৈনন্দিন ও গতানুগতিক কর্মকাণ্ড ও জীবন প্রবাহের মধ্যেই এক একটি চাকতি সহসা টাল খেয়ে বা কেৎরে ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল বা ঘর থেকে বেরিয়ে অন্তরীক্ষে বোঁ বোঁ মিলিয়ে যাচ্ছিল। বড় চাকতি বোঁ বোঁ শব্দ করে। যেগুলো নয়া পয়সা বা সোডার বোতলের ছিপি বা ক্যারামের স্ট্রাইকার সাইজের সেগুলি সাইরেন বাজির মতো এক চিলতে খোনা শব্দ করে হয় ঘরে ঘোরে বা গৃহ ত্যাগ করে। চাকতির পেছনে ফুয়েল ছিল কি? থাকলেও তা কী জাতের? কোনোদিনই জানা যাবে না। যেমন জানা যাবে না শ্রী কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন বাদে আর কেউ শ্রীশ্রী কালীর অষ্টোত্তর শতনাম সংকলন করে উঠতে পেরেছিলেন কিনা অথবা পারলেও তা বাজারে নেই কেন অথবা লাল বাঈয়ের প্রেমে পাগল রাজা রঘুনাথকে সত্যই তার রানী চন্দ্রপ্রভা খতম করেছিলেন কিনা বা মিশরের পিরামিড নির্মাতাদের সচিত্র পরিচয়পত্র ছিল কি? ভেজ ও নন ভেজরাও এসব গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে হয় জানে না বা জানিলেও অন্তত আমাদের ভাষায় তা বলিবে না। ভাবিয়া লাভ নাই।

ডি. এস -এর আছড়িয়া পড়া ও সরব ক্রন্দন যেন সহসা বৃদ্ধ দাঁড়কাক, নলেন, বেচামণি, ভদি ও সরখেলকে নির্বাক ইতিহাসে পরিণত করিল। লেবেডেফ-এর সেই প্রসিদ্ধ থিয়েটারেও এরকম কোনো মুহূর্ত ও মূর্ছনা তৈরি হইয়াছিল কি?

সকলেই হতবাক। ক্রন্দনময় নীরবতা ভেঙে ককিয়ে উঠল বেচামণি।

—আহা, অমন করে কে মারলে গা! সারা পিট ডুমো ডুমো হয়ে উঠেছে। নলেন, এটু বরফ নিয়ে আয় তো।

ভদি খচে যায়।

—বরফ দিয়ে ঘেঁচুটা হবে। লেট্ হয়ে গেছে। বাবা, আপনি একটু ডানার বাতাস দিন তো। যে ব্যাথার যা ওষুধ।

আত্মারাম সরকারের ভোজবাজিই যেন বা। ডানার ঝাপটা খেতেই ডি. এস-এর ককানি থেমে গেল। তারপর ঝিরঝিরি ফুঁপোনোটিও ধরল। বিকট ট্যাকঘড়ির মতো মুখে চাপা হাসিও ফুটল। দাঁড়কাকের হায়দারি হাঁক,

—কে তোর এই দশা করেছিল? কোন বাঞ্চোৎ?

—পু...পু...লিশ...।

—কেন? চোর-ডাকাত-মাগচালানী সব থাকতে তোকে পুলিশ হঠাৎ প্যাঁদাতে গেল কেন?

—আঁজ্ঞে, কাবলে সেক্স-ভকিলের কাছে গিয়েছিলুম।

—কী বলল খানকির ছেলে?

—বলবে কী? আম দরবার বলে কতা। সে একেবারে বারো ভূতের মেলার ভিড়। গাড়িঘোড়া সব বন্ধ। সামলাতে না পেরে ও. সি বলল—চালাও লাঠি। আমিও পড়ে গেচি সামনে। অমনি দমাদম, দমাদম। যত বলচি, আর মেরোনা, মরে যাব, তত মারচে। যত চিল্লাচ্চি তত মারচে।

মদন এরপর যা বলে তাতে পুরন্দর মাথা নেড়ে সাড়া দেয়।

—শুনেমেলে আমি আগেভাগেই বলেছিলুম, তোর কি রথের চাকা খসেচে যে তুই সেক্স-ভকিল, সেক্স-ভকিল করে মরচিস। ঘরে বলে ডাকাবুকো বউ, এই সেদিন ছেলে বিইয়েচে—তোর দরকার সেক্স-ভকিলের? আমি গেলেও তা একটা কতা ছিল। পুরন্দর বলে,

—সে তো আমিও যেতে পারতুম। বলো ভদিদা, গেলে দোষ হত?

—দোষের আবার কী? যার দরকার পড়বে সেই যাবে। লোকে যাতায়াত করে বলেই তো এসেচে। বাবা, কী বলেন?

—আমার কতা হল ঘরের লোকের গায়ে হাত দেবে কেন? তবে কাজটা ডি. এস ঠিক করেনি। অবশ্য আমার সঙ্গে শলা-পরামর্শ না করলে এরকম গাড্ডায় ফাঁসতেই হবে।

—গাড্ডা কেন বাবা? কত নামী লোক। কাবলে হেকিম বলে কতা।

—ভ্যাড় ভ্যাড় করিসনা তো। কাবলে এখন সব তালিবান। এ ব্যাটা কাবলে হেকিম না বাল। জালি মাল। পিওর ইন্ডিয়ান।

—অ্যাঁ!

—সকাল সকাল বেগম জনসনের কাছে গিছলুম। দেখি সেক্স-ভকিলের কথা কোন একটা গোরাসাহেব পেড়েচে কি বেগম একেবারে হেসে কুটিকুটি। বেগম জনসন কী বলল শুনবি?

—বলুন, শুনব তো। ইন্টারেস্টিং।

—বলল মালটা পুরো ফ্রড। আসলে আর্মস ডিলার। রাজস্থানের লোক। বর্ডার দিয়ে মাল আনে। খবর পেয়েচে সামনের বছর ভোট বলে ওয়েস্টবেঙ্গলে এখন হেভি আর্মস-এর খাঁই। ওষুধপত্তর, ঐ হালুয়া, মোরব্বা সব ঢপ। আসলি চেক্ রিভলভার, চিনে রাইফেল, রাশিয়ান রকেট লঞ্চার, গ্রেনেড—সব কেবল অর্ডার নিচ্চে। আর অর্ডার বাবদ অ্যাডভান্স। মাল পরে লরিতে ঠেকে ঠেকে পৌঁছে যাবে। বুঝলি? ওপর থেকে দেখে বোঝবার জো-টি নেই। নেপালে দুবছর জেলে ছিল। সেখান থেকে গেল বাংলাদেশ। সেখানে হুলিয়া অমনি কেটে গেল মিয়ানমার। সেখান থেকে কলম্বো।

—এই এতসব খুঁটিনাটি বেগম জনসন জানেন?

—মুখস্থ। আর ওষুধগুলো কী জানিস?

—সে যাই হোক বাবা, লোকের মুখে কিন্তু ওষুধের বদনাম শুনিনি।

—রাখ্। ভায়াগ্রার ইন্ডিয়ান বেরিয়েচে—এডেগরা তারপর আরো কী সব যেন নাম। তাই গুলে দিচ্ছে আটার সঙ্গে। সঙ্গে ওকাসা, থ্রি-নট-থ্রি, শিলাজিৎ সব পাঞ্চ। বলচে ইয়াকুতি হালুয়া। এ নাকি মোগলাই ফর্মুলা। আরে বাবা ইয়াকুতি হালুয়াতে আসল ইনগ্রেডিয়েন্ট হল চড়ুইপাখির ব্রেন। অত চড়ুই ধরা কি মুখের কতা নাকি? পাহাড়ের টঙে পাথরের গায় ঘামের মতো শিলাজিৎ। তাই খেতে যত হিটিয়াল বাঁদরেরা পাহাড়ে চড়ে। নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে মুঠোয় ভরে যখন মুখে পুরতে যাবে তখন তলা থেকে গুলি করতে হয়। বাঁদর গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে

পড়ল। তখন তার থাবা থেকে শিলাজিৎ কেঁকে নিতে হয়। বুঝলি? এসব যোগাড় করা যে সে কাণ্ড নয়। রেওয়াজি মোরব্বা, ইয়াকুতি হালুয়া—নাম শুনেই সব নাচতে শুরু করল। যাই হোক, ওর কারণেই যখন ডি. এস ঝাড় খেয়েচে তখন মালটাকে সাইজ করতে হবে। অ্যায়সা প্যাঁদাতে হবে যে কলকাতায় আর কখনও যেন পুরকিবাজি না করতে আসে।

স্মিত হাসিমুখে ভদি বলল,

—আপনি আর মেজাজ গরম করবেন না বাবা। আপনি বউমাকে যেমন নাচ শেখাচ্ছেন শেখান। সেক্স-ভকিলকে আমি দেখচি। কী বল সরখেল?

সরখেল খিক্ খিক্ করে হাসে।

—তাহলে আজ রাতেই ব্যবস্থা করে দিই?

সরখেল মাথা এক দিকে কাত করে সায় দেয়।

—নলেন, ছেলেছোকরারা এসেচে। ভালো করে চা কর দিকিনি। আর ঝপ করে যেয়ে মুড়ি-ফুলুরি নিয়ে আয়।

বেচামণি বলে ওঠে,

—আমি আলুর চপ খাব।

দণ্ডবায়সের পছন্দ অন্য।

—গরম দেখে গোটা চারেক বেগুনি আনবি নলেন। ঠাণ্ডা যেন না হয়।

—নলেনকে ওসব বলতে হবে না। তুমি নাচের বোল বল দিকিনি। দাদাবাবু যেমন বলল।

নলেন তেলেভাজার লিস্ট বিড় বিড় করে মুখস্ত করতে করতে চলে গেল। ভদি আর সরখেল ফের বারান্দায় ফিরে গিয়ে গুঁই গুঁই করে নিজেদের চক্রান্তমূলক আলোচনা শুরু করল। বেচামণি ওড়নায় কপালের ঘাম মুছে নিল। এক হাত কোমরে দিয়ে ও এক হাত বাতাসে মেলে ধরে দাঁড়াল। দুপায়ে ঘুঙুর। মদন, পুরন্দর ও ডি. এস উঠোনের একপাশে থেবড়ে বসে নাচ দেখতে লাগল। ডি. এস বলল,

—এই নাচটা আমি হেভি লাইক করি।

—নাম জানো নাচটার?

—হ্যাঁ। কুচিপুদি।

—বাল জানো। একে বলে কত্থক। টেংরির জোর না থাকলে এ নাচ নাচলে ঠ্যাং খুলে যাবে।

দণ্ডবায়স ধমকায়,

—তোরা চুপ করবি?

তাহলে লচক্‌তো মচক্‌তো।

তা, তা তা ধেই, ধেই তা তা, ধেই...

১৩ মার্চ রাত দশ ঘটিকায় হোটেল গোপালে রুম নাম্বার ৩৭-এ পুলিশী আঙুলের গাঁট্টা পড়ল...টুক, টুক...নগরপাল ও কিউরেটর। দরজা খুলিয়া দিল একটি বিচ্ছিন্ন হাত। নগরপাল বিচলিত কিন্তু বিস্মিত নন কারণ তিনি হেলমেট পরা। কিন্তু কিউরেটর। সে কী করে এই রমণীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে? সোফার ওপরে বসে আছে ধড়। একটি হাত দরজা খুলে দেওয়ার পর সাবলীলভাবে করমর্দন করার জন্য এগিয়ে আসছে। টেবিলে বসানো পাগড়ি পরা সেক্স-ভকিলের মুণ্ডুতে গালভরা হাসি,

—আইয়ে, আইয়ে তসরিফ রাখিয়ে...

ওদিকে অপর একটি হাত, একটি চামচ দিয়ে বয়ামের থেকে ইয়াকুতি হালুয়া বের করছে কারণ বয়ামের গায়ে লেবেলে সেরকমই লেখা। নাগরা পরা দুটি পা ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। নগরপাল হেঁকে ওঠেন,

—অ্যাঁঃ এখানেও চাকতি! সেই চাকতিরই চক্কর! দ্যাট ক্রুয়েল ফ্লাইং সসার। ওহ্ গড্।

কিউরেটর প্রথমে ভেবেছিলেন ঘরটি উল্টে গেছে এবং তিনি ভারহীন অবস্থায় উড়ছেন। তা নয়। ধীরে ধীরে তিনি জ্ঞান হারাচ্ছিলেন এমন সময় দরজা ঠেলে পার্ক স্ট্রিট ও শ্মশান পাড়ার ও.সিও ঢুকল! দুজনেই মাল চার্জ করে একটু ঢুলু ঢুলু। তাই তারা হেলমেট পরা নগরপালকে চিনতে পারেনি।

—স্কাউন্ড্রেল। স্যালুট করতে অবদি ভুলে মেরে দিয়েছ। ক-বোতল টেনেছ দুটোতে? টাকলা ও.সি গলার আওয়াজটা চিনে স্যালুট করবে কি করবে না ভাবছিল। পার্ক স্ট্রিটের ও.সি, একে মাথামোটা তায় চার্জড্। সে তড়পে উঠল,

—তুই ল্যাওড়া কে যে তোকে স্যালুট মারতে হবে?

—অ্যাঁঃ আমি ল্যাওড়া কে?

অলৌকিক ঘটনায় বহু সময়েই পুলিশ জড়িত থাকে। যেমন জলজ্যান্ত মানুষ হাওয়া করে দেওয়া। পুলিশ কখনোই দাবি করে না যে তারা ম্যাজিক জানে। তবুও ম্যাজিক দেখানোতে পুলিশ যে পারঙ্গম তা সকলেই জানে। আবার পুলিশকেও কখনও সখনও ম্যাজিক দেখতে হয়। তেমনই ম্যাজিক বিষয়েই কবি হরিবর সরকার লিখিয়াছেন,

লোচন গোস্বামী যবে জয়পুরে ছিল।
থানা হতে পরোয়ানা বাহির করিল॥
জলে বাহ্য প্রস্রাব কেহই করিবে না।
কৈলে জেল জরিমানা হবে সাক্ষী বিনা॥
গোস্বামী তরীতে উঠি হাতে লয়ে বৈঠে।
করিল পুরিষ ত্যাগ থানার নিকটে॥
দেখিয়া দারোগাবাবু ক্রোধে কম্পমান।
বলে ঐ বেটারে থানায় ধরে আন॥
শুনিয়া কনস্টেবল বলিল তখন।
দুর্গন্ধে নিকটে যেতে নারিব কখন॥
নিজেই দারোগাবাবু করিল গমন।
চন্দনের গন্ধ পেয়ে প্রফুল্লিত মন॥

হে পাঠক বাবাজী, বলিতে পার ঐ লোচন গোস্বামী কে? পুলিশকে গু ও চন্দনের ম্যাজিক দেখাইবার শক্তি তিনি কোথা হইতে পাইলেন? তা তা ধেই...ধেই... (চলবে)

১৪

মার্কসবাদের বহুল প্রচার ও প্রসারের ফলে বেশিরভাগ পাঠকই আজকাল নাস্তিক। ধর্মচর্চা দেশ থেকে লোপাট হওয়ার যোগাড়। তাই নাস্তিকদের নাস্তানাবুদ না করে বরং ঝেড়ে কাশাই ভালো যে মান্যবর লোচন গোস্বামী হলেন মতুয়া ধর্মের মহাপথিক। তাঁর যে কত লীলা তার লেখাজোখা নেই। সন্দেহের নিরসন এভাবেই ঘটে। শিষ্যরা গুরুদের বাজিয়ে নেয়। গুরুরাও বেজে ওঠেন। এরপর হল কবিদের ডকুমেন্টেশন্-এর কাজ। যেটি করে শ্রীহরিবর সরকার আমাদের অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছেন। কেন যে করতে গেলেন সে প্রশ্ন অবশ্য ওঠে। এই অকৃতজ্ঞ ও গোলোকায়িত জাত অর্থাৎ বাঙালির জন্য কিছুই করা উচিৎ নয়। 'কাঙাল মালসাট' এর কথাই ধরা যাক। এটি যদি পুস্তু বা কপটিক ভাষায় লেখা হতো তাহলে এতক্ষণে টি টি পড়ে যেত। পালি বা মাগধী অপ্রাকৃতে লেখা হলেও অন্যরকম কিছু ঘটত বলে মনে হয় না। অবশ্য লেখক এক ভেবে লেখে। হয় আর এক। যেমন 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'। এ প্রসঙ্গে উপযুক্ত সময়ে বরং ফেরা যাবে। ভদি ও সরখেলের মধ্যে টেলিফোনে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে সে দিকে মনোনিবেশ করা যাক—

—দুঁদুঁ বার ফোঁন কঁরলুঁম। ভাঁবলুম কীঁ হঁল?

—হঁবে আঁবার কী। পাঁইখানায় গেঁছলুম।

—তাঁই বঁলো। কোঁনো খঁবর আঁচে?

—আঁচে। মঁরচে পঁড়া এঁকটা সোঁর্ড আঁর দুঁটো ভোঁজালি বেঁরিয়েচে।

—ভেঁরি গুঁড। বাঁট নোঁ আঁসলি মাঁল।

—নোঁ।

—নুঁনুকাঁমান, সোঁর্ড, ভোঁজালি! পোঁদ মেঁরে দেঁব।

—কাঁর?

—যেঁ লাঁগতে আঁসবে। কেঁরোসিনে ভিঁজিয়েচ?

—কীঁ?

—ওঁই সোঁর্ড। তাঁরপর গিঁয়ে ভোঁজালি?

—কেঁন?

—মঁরচে ছেঁড়ে যাঁবে।

—কেঁরোসিন নেঁই।

—আঁজ রাঁতে আঁমি নিঁয়ে যাঁব।

—ঠিঁক আঁচে।

—কোঁনো চিঁন্তা নেঁই। এঁকটা এঁকটা কঁরে ধঁরে পোঁদ মেঁরে দেঁব।

—রাঁখলুম।

—তাঁহলে রাঁতে।

—অঁ।

প্রায় এক সরখেল মাটি খোঁড়া হয়ে গেছে। অথচ কত সরখেল খুঁড়লে যে আসলি মাল পাওয়া যাবে তা কে বলতে পারে? আবার এমনও তো হতে পারে যে খোঁড়াকে খোঁড়াই সার হল, হতে রইল খন্তা। ভদির কপালে টেনশনের ঘাম ফুটতে না ফুটতে বেচামণি আঁচল দিয়ে মুছে দেয়।

—কী নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করচ গো?

—সে তুমি বুঝবে না।

—জানিনে বাপু। বললেই ওই অ্যাক কতা। তুমি বুজবে না। তুমি বুজবে না।

—আহাহা এ হল গে মদ্দাদের ব্যাপার। বলি আর তুমি সাতকাহন করে বেড়াও।

—তোমার সব কাণ্ড বাণ্ড আমি বুঝি সাতকাহন করে বেড়াই।

—করনি। করতে কতক্ষণ? মেয়েজাত পেটে কতা রাখতে পারে না। এই জানবে।

—ওরে আমার ব্যাটাছেলেরে। তুমি যে শিশি বোতলে ভূত পোষো আমি কারুকে বলতে গেচি?

ভদি দেখল কেস বেগড়বাঁই হয়ে যেতে পারে। এক হল বেচামণি মাঁউ জুড়ে দিতে পারে। এবং তখন না থাকলেও বাবা সব জেনে যাবে এবং উত্তমপুস্তম করে ছাড়বে। বাপ হয়ে ছেলের বৌ-এর দিকে অত টাক কেন? এরকম কথাও যে ভদি কখনও ভাবেনি তা নয়। ভদি কথা ঘুরিয়ে দিল।

—আমি কি তাই বলেচি? এই যে তোমার দিদির বাড়ি ঘুরে এলে দমদমায়—মনে খিঁচ থাকলে কি তোমাকে যেতে দিতুম? বিশ্বাস আচে বলেই না ছেড়েচি।

বেচামণি টোপটা গিলে নিল।

—জামাইবাবু আমাকে কী বলেছিল জানো তো?

—কী?

—এই বেচু, তোর ওই গদি না ভদি রোজ রোজ সায়েবদের কোম্পানীর মাল খায়—কী করে রে? শুনেচি তো অকম্মে কুকম্মে ঘর ভাড়া দেয়।

—খানকির ছেলে। তা তুমি কী বললে?

—আমিও বললুম, দ্যাখো জামাইবাবু, আমরা হলাম ঘরকুনো বউ। পুরুষমানুষ কী মদ খাচ্চে, কী কারবার করচে ওসব নিয়ে ভাবি না। তবে অযত্ন করলে কি অবিশ্বাসের কাজ করলে টের পেতুম। দিদি বলল, দেখলে তো, শালীর মুখের পোঁচড়াটা খেতে হল। এমনিই কি লোকে গুয়ো হাড়কেল বলে।

—ভাল বলেচে তো।

—মায়ের পেটের বড় বোন। ও কি বোজে না দুবেলা ওকে ঠকাচ্চে? তোর গিয়ে বলে ছেলের বিয়ে হয়ে গেচে, নাতিপুতি হবার যোগাড়, আর তুই কিনা...

—আহাহা, ওসব কতা আর তুলো না। সব্‌বো দোষের ওপরে জানবে মাগির দোষ। ও ছোঁকছোঁকানি ধরেচে কি মরেচ। তবিল-তক্তপোষ সব নীলেম করিয়ে ছাড়বে। পেটটা ফাঁপচে। একটু তেলজল পুলটিস করে দেবে?

—ব্যতা নেইতো? অতগুলো পুঁই-চিংড়ি গবগব করে খেলে...তখনই জানি...

—ঘেঁচু জানো। বুজলে, এই সরখেল আর আমি একটা জবর বিসনেস খুলতে চলেচি। সেই চিন্তাতেই পেট ফাঁপছে। একবার যদি লেগে যায়...

কী হবে গো লাগলে?

লাগলে? এই ধরো তো বালী বা পুরী যাওয়ার বাই উঠলো বা বিন্দাবন-মথুরা। হাওড়ায় গিয়ে আর ভিড়ভাট্টায় রেলগাড়ি চড়তে হবে না।

—তবে?

—বাড়ির ছাদ থেকে যাবে। সেজেগুজে ছাদে উঠবে। দেখবে বড় ফড়িং-এর মতো দাঁড়িয়ে।

pathagar.net

হেলিকপটার। মন্ত্রী-ফন্ত্রী সব চড়ে। চড়ে ফড়ফড় করে উড়ে বেড়ায়।

—অ্যাঃ

—এই জানবে। ভদি সরকার যকন খেলতে শুরু করবেনা তখন দেখবে সব শালা পোঁদ সামলাতে ব্যস্ত। সামনে পড়লেই মেরে.দেব।

—ও আবার কী কতা।

—এই হল হকের কতা। গাঁড় মারা যাওয়ার ভয় তো লড়তে এসো না। তুমিও ভালো, আমিও ভালো, জয় জগতের জয়! ঘেঁটে দে মা। ভালো করে একটিবার ঘেঁটে দে।

এই বাক্যলাপের কাছাকাছি সময়েই ক্যালকাটার বিখ্যাত জুয়েলার ভি. ডি. দত্ত একটি নক্ষত্র-সন্ধ্যার আয়োজন করে। তাকলাগানো অনুষ্ঠানটি হয় কলামন্দিরে। ওই কলামন্দিরেই বেসমেন্টে একটি ছোট কলামন্দিরও আছে। সেখানে তখন রবিঠাকুরের ভাঙা গান হচ্ছিল। আর বড়টিতে তখন স্টেজজুড়ে ফুটবল, ইতিহাস, চলচ্চিত্র, সাংবাদিকতা, রান্না, ফ্যাশন ডিজাইনিং, পেডিকিওর, দর্শন, রাজনীতি, কুকুরপালন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রের দিকপালেরা বসে। চার-পাঁচটি কেবল্ চ্যানেলের ক্যামেরা চলছে। এমন সময় পাট ভাঙা সিল্কের পাঞ্জাবি ও ফাইন ধুতি হাঁকিয়ে হাসিমুখে যে মঞ্চে প্রবেশ করেছিল তার নাম হল ডি. এস। এসেই সে অনুষ্ঠানের অ্যাংকার বা নোঙর রহস্যময়ী মিস ম.-র হাত থেকে কর্ডলেস মাইক্রোফোন নিয়ে বলল,

—এসে গেছি। মুম্বাই ফ্লাইট দেড় ঘণ্টা লেট। প্লেনে বোমা ছিল। গন্ধ শুঁকে কুকুর.বোমা বের করল। সে বহুৎ হরকৎ। কিন্তু স্টেজে চেয়ার কই যে ঠেকাব? চেয়ার! চেয়ার লাও শালা! চেয়া...র!

চেয়ার এসে গেল হুড়মুড় করে। সকলেই ঘাবড়ে গেছে। মিস ম. রসা ডিস্টিলারির বাংলার গন্ধ.পেয়েছিল। ঘঁক করে আঁতে লাগে।

—এখেনে সব হেক্কড় টাইপের মাল বসে আচে। অন্তত আপনাদের তাই ধারনা। কিন্তু সবই আলফাল। গিদ্‌ধড়। ঐ যে ইতিহাস মারাতে যে মালটা এসেচে ও হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটর। ওর মুখটা দেকুন। চোনাঢেকুর গিলচে। কেন বলুন তো? ভাবচে আমি ফাঁস করে দেব যে বাঞ্চোতের পোঁদে গু। কী রে? দেব? কাল দুপুরে কী করছিলি?

কিউরেটরকে নিজের সিটে এলিয়ে যেতে দেখে পাশের বিশিষ্টরা ঘাবড়ে গেল। হলেও গুইগাঁই। পুলিশ এগোয়। পার্ক স্ট্রিটের ও.সি চেঁচায়,

—আপনি কে? আপনি কি ইনভাইটেড?

আমার নাম ডি. এস। কোক শাস্ত্রর ওপরে অথরিটি। ইনভিটেশনের গাঁড় মারি। আর কিছু?

হলে তুমুল হট্টগোল। কেবল্ চ্যানেলরা ডি. এস-এর ছবি তুলছে। এইসময় হলে আলো নিভে গেল। হেভি গুমুঙ্গুলি। কোনো মহিলার চিৎকার। মারপিট লেগে গেছে। টিপ্ ঢাপ্ টিক্ দেওয়ার সাউন্ড। চেয়ার ভাঙছে। পুলিশ ও হলের সিট দেখানোর আশারদের টর্চ। সেই আলোয় দেখা যায় ডি. এস তিন চার মানুষ হাইটে উড়ে বেড়াচ্চে। হাতে কর্ডলেস। সব ছাপিয়ে ডি. এস এর স্টিরিও ভয়েস।

—এবারে বাঁড়া বুঝেচতো আমি কে? ম্যায় হুঁ ডি. এস। সবাই এক কপি করে 'কোক-শাস্ত্র' কিনে ফেলুন। জানতে পারবেন কাশ্মিরের রাজাকে কোকা পণ্ডিত মেল-ফিমেল নিয়ে কী বলেছিল। জানলে আপনারাও বর্তে যাবেন। ফোর টাইপস অব্ কামিনী রয়েচে। সব মাগিই একটা না একটা টাইপে পড়বে। টাইপ বুঝে বন্দোবস্ত—এই চোদনা ও. সি চর্ট মেরে কী করবি—আমাকে ধরবি—

এইসময় ঝপ করে চার পাঁচ সেকেন্ডের জন্যে আলো ফিরে এল। দেখা গেল কোকশাস্ত্রের ওপরে অথরিটিই শুধু নয়, ওপরে আরও দুটি মানুষ অর্থাৎ মদন ও পুরন্দর ভাটও উড়ছে। এবং বিশাল দাঁড়কাক। আলো নিভে গেল। এবং ওপর থেকে, অজানা অন্ধকারের অ্যামবিয়েন্সের মধ্যে জলীয় কিছু তরল তিনটি রেখায়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঝিরঝিরি হতে পারে, ছন্‌ছন্‌ করেও হবে না কেন ফের লাইট অফ্...

...কলকাতার হাতবদল এইবার আর সল্টলেকের অদৃশ্য দৈনিকের পাতায় উড়োখবর হয়ে আটকে থাকল না। স্বয়ং সি. এম-কেও নড়েচড়ে বসতে হল। নগরপাল ও মহানির্দেশকের শিরচ্ছেদ ও খণ্ড খণ্ড সেক্স-ভকিলের করুণ ঘটনা তাঁর কাছে অজানা ছিল না। কিন্তু এটা ঠিক যে এইসব ঘটনাকে যতটা আমল দেওয়া উচিত ছিল তা তিনি দেননি। তাঁর আমলের নানা বিশিষ্টতার মধ্যে এটাও হয়তো একটি বলে ভবিষ্যতের ইতিহাসবিদেরা মন্তব্য করবেন। কেউ হয়তো বলবেন এই পর্বের নানা ঘটনাবলীকে মার্কসবাদের অমোঘ আওতায় এনে ফেলার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। এনে ফেলতে পারলে বোধহয় ইতিহাস মই ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে পারত। মই নিয়ে পালানো হয়তো সম্ভব কিন্তু সিঁড়ি সরানো অত সহজ নয়। কেউ হয়তো বাঙালির কোনো জেনেটিক গোলমালই এর জন্য দায়ী বলে মনে করবেন। ঘটনা একটিই—কিন্তু ব্যাখ্যা অসংখ্য। বিশ্লেষণ ও ইঙ্গিতের এই বহুত্ব হতে বাঁচার একটি উপায় হল ক্লোনিং। সব ইতিহাসবিদকে কোতল করে যদি একটিকে ক্লোন করা যায় তাহলে ঝামেলা চুকে যায়। কিন্তু রাজ্য বা কেন্দ্র কারো হতেই অত অঢেল ক্ষমতা নেই। এটা আত্মস্থ করেই গোয়েবেলস বলেছিলেন যে নিজের আইন ভাঙার ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকা উচিত। সংস্কৃতি—এই শব্দটা শুনলেই নাকি ভদ্রলোকের হাত রিভলভারের দিকে যাওয়ার জন্যে নিশপিশ করত। লোকটা চুতিয়া টাইপের ছিল। এবং এরকম মাল ফুরিয়ে গেছে বলে যেন কোনো নির্বোধ পাঠক বগলে পাউডার দিতে না শুরু করে। খেল এখনও বাকি হ্যায়। পহেলা ঝাঁকির পর আসবে কাশী মথুরা। আসবে ট্রেবলিংকা, বুখেনভাল্ড মৃত্যু শিবির। আসবে সাইবেরিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গুলাগ। জামাই ষষ্ঠী আর আইবুড়ো ভাত, মোনামুনির খেলা, সাধ-এর ফাটা পায়েস—কী ভেবেছিলে পাঁচু? এভাবেই চলবে পানসি? ডেস্টিনেশন ইনু মিত্তিরের বেলঘরিয়া? সে গুড়ে মগরহাটের ফাইন স্যান্ড।

রাইটার্স-এর খুচরো ঘটনাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে এবার আমরা স্থায়ী আমানতের দিকে ঠ্যাং বাড়াব। যে কোনো মেজর বা মেজর জেনারেল নভেলের নভেলটি হল তার বিভাগ-চলন। হালের উদাহরণ মানে যা হাতেনাতে ঘোরে তেমনই একটি হল মিলান কুন্দেরার 'জোক'। এখানেও মজা আছে। ভূমিকায় যাঁকে কুন্দেরা মহান ঔপন্যাসিক বলেছেন সেই প্রখ্যাত কবি লুই আরাগঁর উপন্যাস খুব কমসংখ্যক পাঁচুই পড়েছে। লে হুলিয়া।

মহাকরণ থেকে একটি বুলেট-প্রুফ সাদা অ্যাম্বি বেরোচ্ছিল। তাতে ছিলেন সি. এম, গৃহমন্ত্রী (এঁকে আমরা স্তালিনের খপ্পরে নাস্তানাবুদ হতে দেখেছি) এবং সি. এম-এর একান্ত সচিব রাখেকেষ্ট যার একমাত্র কাজ হল সি. এম-এর সর্বাবস্থার ভিডিও একটি হ্যান্ডিক্যামে সঞ্চয় করা। অ্যাম্বি দুলকি গড়ানে এগোচ্ছিল কিন্তু রে-ব্যান সানগ্লাস পরা স্লিম একটি সার্জেন্ট হাত দেখিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিল। সকলেই হতবাক। অতীব বিরক্ত হয়ে কাচ নামিয়ে কমরেড আচার্য গর্জে উঠলেন।

—ব্যাপারটা কী কমরেড সার্জেন্ট?

কমরেড সার্জেন্ট ঘুরে তাকাল। কচি সাহেবটি। মুখে তখনও ডার্বিশায়ারের কাঁচা গরুর

দুধের গন্ধ। গোঁফটিও দুধেল যেমন শিশুদের হয়। সাহেব যা বলল তা এই,

—নেটিভ, টুমি চোপ্ মারিয়া বসিয়া ঠাকো। পহলে গোরা, উসকা বাদ গরু-ঘোড়া—বুঝিলে? নটি করিবে টো এক ব্যাটন খাইবে হারামখোরের রাচ্চা।

উত্তেজক এই দৃশ্যে শব্দ উঠিল, ক্রমশই উপরে, ঝুনঝুনঝুন ঝুন টগবগটগবগ সাঁই সপাশ্ সাঁই সপাশ্ ও ক্যাঁচকোঁচক্যাঁচকোঁচ ঘোড়ার টানা হাওদাই বা যেন। বেগম জনসন। মিস্ স্যান্ডারসন। মিস এমা র‍্যাংহাম। মিস্টার স্লিম্যান। সেই পাঙ্খাবরদারের গাঁড়ে কিক। সেই মিসিবাবার কুকুরদের মেটিং-সিজন। সেই হুমদো সাহেবদের মারাত্মক ডুয়েল ও গুলি মিস। মতিলাল শীলের বোতল ও কর্কের ব্যবসা। ছোবদার, মশালচি, ঘেসুড়ে, খানসামা, খিদমৎগার, হুঁকাবরদার, মালি, ভিস্তি, ধোবি ও আয়াদের প্যাঁকপ্যাঁকানি। ভুটানি ও রোহিল্লা আফগানদের হুমকি। কিন্তু অন্তে একটি সাদা অ্যাম্বাসাডর। বুলেট-প্রুফ।

রাষ্ট্রের টনক যখন নড়ে তখন যা নড়ে না চড়ে না তেমনদেরও নড়ে বসতে হয়। রাজ্যের টনক নড়াও অন্যরকম নয়। কেন্দ্র যখন নাড়বেই না তখন রাজ্য তো আর চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই গোলাপ মল্লিকের কাছে তলব এল যে কিছুদিন ও বছরখানেক আগে যে দুটি ফাইল সে পাঠিয়েছিল এবং যে দুটি ফাইলের ওপরে 'বাল' ও 'পাগলাচোদা' লিখে ফেরত পাঠানো হয়েছিল সেই দুটি ফাইল যেন অবিলম্বে পুনরুদ্ধার করে, উপরের মন্তব্যদুটি নির্ভুলভাবে মুছে বা কালি দিয়ে ধেবড়ে ঢাকাচাপা দিয়ে, ওপর মহলে পাঠানো হয় এবং এই তলবটি অতিশয় আর্জেন্ট। তলবটি হাতে পেয়ে গোলাপ তৎক্ষণাৎ সাধুর কাছে চলে গেল ও উভয়ের মধ্যে এই রকম বাক্যালাপ হল,

—দেখচেন, স্যার, পুরো গাঁড়ক্যাচাল কেস। সেই দুটো ফাইল, তখন বানচোৎগুলো পাত্তা দিল না। এখন বলচে ফের চাই।

তারকনাথ তখন মন দিয়ে 'বিষপ্রয়োগে হত্যা—সেকাল আর একাল' বলে একটি বই পড়ছিলেন। তিনি মুচকি হেসে গোলাপকে বললেন,

—পটাসিয়াম সায়ানাইড নয়, ফাইটোটক্সিনও নয়, স্রেফ ওভারডোজ অব্ জাফরান দিয়েই লোক সাবড়ে দেওয়া যায়। কী বুঝলে?

—জাফরান তো বিরিয়ানিতে দেয়।

—কারেক্ট! চান্স পেলেই তো প্যাঁদাও। ফিউচারে আর খেও না। হয়তো ভুল করেই বেশি পড়ে গেল। কোনো মার্ডারের মোটিভই ছিল না। মধ্যে থেকে তুমি অক্কা পেয়ে গেলে।

—সে না হয় আর খেলাম না। কিন্তু ফাইলদুটোর ব্যাপারে কী করি বলুন তো।

—কোন ফাইল?

—ওই যে সেই রবিঠাকুরের বিজ্ঞাপন আর...

—সরকার নামে পাগলাটার সেই হিজিবিজি, তাই তো?

গোলাপ দেখল যে তারকনাথের মতো দুঁদে গোয়েন্দাও সরখেলকে ভুলে সরকার বলে দিয়েছে। এবং এই ভুলের ল্যাজ ধরেই তার বুকের মধ্যে গোলাপেরই একটি করুণ কাঁটা যেন ফুটে গেল—বেচারা সরখেল। বউ-মরা দাঁত-পড়া সরখেল। বাঘের মুণ্ডুর মতো গাঁদার চাষ করে। এখন পুলিশ ওকে বেঘোরে ক্যালাবে।

—হ্যাঁ, সার।

—এইটা বলতে যা টাইম নিলে তাতে করে ইনফার করচি তুমি রিয়ালি ওরিড। ঘাবড়িও না। টাইম নিয়ে খোঁজো। চাঁইরা যখন চাইছে তখন তো দিতেই হবে। কিন্তু এটাও ঠিক যে

ফাইল হাতের মোয়া নয়। ধুলোপড়া অত দিস্তে দিস্তে ফাইল—খুঁজেপেতে বের করতেও তো টাইম লাগবে। বলেছে যখন লেগে পড়ো।

—সে না হয় লাগলাম। কিন্তু বলুন। তখন ওইভাবে ফেরৎ পাঠাল। গ্যারান্টি দিতে পারি ওরা খুলেও দেখেনি। বলুন, এটা অন্যায় নয়?

—যত পড়ছি বুঝলে তত ন্যায়-অন্যায় গুলিয়ে যাচ্ছে। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। বিরিয়ানির জাফরান। তাকেও বিশ্বাস নেই। তোমার ক-বছর?

—কীসের স্যার?

—কীসের আবার। রিটায়ারমেন্টের।

—আরো বছর পাঁচেক আছে।

—ভুগবে। আমি তো নেক্সট ইয়ারেই ভাগলবা। যাইহোক লেগে পড়। টাইম লাগুক। আমি সামলাবো।

সাধু পুনরায় 'বিষপ্রয়োগে হত্যা—সেকাল আর একাল'-এ মন দিলেন। গোলাপ ঠিক করল যে ছাদে উঠে দণ্ডবায়সবাবাকে ডাকতে হবে। আচ্ছা, কালীঘাটে গিয়ে একবার সরখেলকে সাবধান করে দিলে কেমন হয়?

এর পরদিন গোলাপ দুটো ফাইলই পেয়েছিল। ওপরে লেখা মন্তব্যদুটির ওপরে কালো কালি বুলিয়ে দিয়েছিল। সাধু ফাইলদুটি ওপরে পাঠিয়েছিল। কিন্তু খুলতেই ক্যাচাল।

একটিতে ছিল শ্রীঘৃত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাণী। বলাই বাহুল্য যে সেটি নেই। বরং একটি মুদ্রিত কবিতা বা কবিতার অংশ,

বাকি আছে আর
দোদুল কদম্ব বনে
লোলুপ, লোমশ মনে
নিতম্ব প্রহার

এবং দ্বিতীয় ফাইল, যাতে সরখেলের প্রবন্ধটি ছিল, সেখানে, জেরক্স কপি একটি—(৫ই মার্চ ১৮৩৪। ২৩ ফাল্গুন ১২৪০)

দিল্লী।—অবগত হওয়া গেল যে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বাদ যখন দিল্লীর বাদশাহের দরবারে পঁহুছিল তখন দরবারস্থ তাবল্লোক একেবারে হতাশ হইলেন। বিশেষত শ্রীযুক্ত মির্জ্জা সিলিং ও তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা কহিলেন যে ইঁহার উদ্যোগক্রমে আমাদের বার্ষিক যে তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধি সম্ভাবনা ছিল এইক্ষণে সে ভরসা গেল। কিন্তু তদ্বিসয়ে কিঞ্চিতমাত্র ভয় নাই যদ্যপি গবর্নমেন্ট উক্ত সংখ্যক টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন তবে যে ব্যক্তির উদ্যোগে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন এইক্ষণে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কখনও অপহ্নব করিবেন না।

সমূহ বিচলিত গোয়েন্দা কর্তারা শুধু যে নার্ভাস হয়ে পড়েন তাই নয়, তারকনাথ সাধুকে এমনও প্রস্তাব তাঁরা দিয়েছিলেন যে তাঁদের সন্দেহের তীর যেহেতু গোলাপকেই বিদ্ধ করছে অতএব গোলাপ মল্লিককে তাঁরা সদলবলে 'গ্রিল' করতে চান। এর জবাবে তারকনাথ গেয়ে উঠেছিল, 'তবে কেন পায়না বিচার নিহত গোলাপ'...এবং বলেছিল,

—পোঁদে নেই ইন্দি, ভজোরে গোবিন্দি। কার ঝাঁটে কটা লোম দেখে নেব। গোলাপকে টাচ করে দেখুক না একবার। ঐ তো সব যোগাড় করেছিল—রবিঠাকুরের ঘি-এর কোম্পানি, তারপর গিয়ে সরকারের হুমকি। তখন ঢ্যামনাচোদার মতো ফাইলের ওপরে 'বাল' আর

'পাগলাচোদা' কে লিকেছিল? আপনারা। গ্রিল করচে। গ্রিল করবে। মার্ডার আর মড়া ঘেঁটে ঘেঁটে পুরো জীবনটা গেল, এখন কোত্থেকে ঝাঁটুয়া এসে বলছে রোজ-কে গ্রিল করবে। তুলকালাম লাগিয়ে দেব। লালবাজার, মিনিস্ট্রি, লর্ড সিনহা সব জায়গায় হুড়কালাম লাগিয়ে দেব। দেখবেন? অ্যাসোসিয়েশনের কানে কথাটা তুলব?

—আহ্ মিঃ সাধু। অযথা আপনি এক্সাইটেড হয়ে পড়েছেন। অ্যাকচুয়ালি আমরা ঠিক ওটা মিন করিনি।

—দেখুন। সাফসুৎরো বলে দিলুম। আই অ্যাম তারকনাথ সাধু। আপনারা যখন ল্যাক্টোজেন খাচছেন তখন থ্রি-নট-থ্রি দিয়ে বগল চুলকোচ্ছি—বি কেয়ারফুল। গোলাপের একগাছাতেও যদি কারো হাত লাগে তাহলে আগুন লেগে যাবে।

—সে না হয় হল। গোলাপ যেমন আছে তেমনই থাকবে। কেউ ওকে ট্যাম্পার করবে না। কিন্তু ফাইলদুটোর মধ্যে থেকে মাল হাওয়া নিউ মাল ইন—এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?

—আমি বলব ম্যাজিক অ্যান্ড মিস্ট্রি। যতক্ষণ না অন্য প্রমাণ পাচ্ছি। ততক্ষণ আমি চুপ। তবে গোলাপ এর কিছুই জানে না। বেচারা। সব ফাইল আমার ঘরে। ধরলে আমাকে ধরুন। করুন, গ্রিল না কী করবেন।

—ঘাড়ে আমাদের কটা মাথা, মিঃ সাধু?

—একটা করেই তো জানতাম। এখন মনে হচ্ছে এক্সট্রাও গজাচ্ছে।

তারকনাথ দমাস করে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এল এবং একতরফা ঝাপড়া খেলে যেমন হয় তেমনই থুম্বোমারা হুলোর মতো মুখ করে গোয়েন্দা দপ্তরের চাঁইরা বসে থাকল। দমদম বুলেটের সামনে পড়েও বেঁচে গেলে ফেসকাটিং ওইরকম হয়ে যায়।

ছায়া ঘনিয়েছে। ঝোপে ঝোপে সড়সড় করছে কলিকালের বাতাস। হাফখাওয়া বাতাসার মতো মুন। এবং কালিপড়া, ঝুলে যাওয়া মুনলাইট। ট্রপিকাল অরণ্যের ইনসেক্টদের ঘুনঘুনে শব্দ। এরই মধ্যে, গোলাপ মল্লিক সরখেলের বাড়ির দোরগোড়ায় হাজির। কোথাও একটা, কেমন একটা 'খপ খপ' শব্দ হচ্ছে। অভিজ্ঞ কান বলে দিল শব্দটা লৌকিক। অলৌকিক নয়। গোলাপ চাপা গলায় ডাকল,

—সরখেল? সরখে...ল!

অমনি 'খপ্, খপ্' স্টপ। গোলাপ দু পা এগোল। এবং ওখানেই নির্বিরোধী, সাকার স্ট্যাচু। কারণ তার পিঠে একটি খোঁচা। লেগেছে এবং ঠেকে আছে। এবং একটি হুঁশিয়ারি।

—নড়বি না। নড়লেই খতম। হাত ওঠা...ওঠা।

গোলাপ দুহাত তুলে দাঁড়াল। সামনে থেকে টর্চের আলো। আলোর পেছনে অস্পষ্ট একটি আদল।

—আরে! গোলাপভায়া! অ্যাই, সোর্ড সরিয়ে নাও। দেখচ নাম ধরে ডাকচে। ও আমার ফ্রেন্ড। খুঁচিয়ে ফুঁচিয়ে দাওনিতো?

ভদি বলল,

—এখনও দিইনি। আরেকটু লেট করলে, হাত পা কাঁপছিল, হয়তো খোঁচাই লেগে যেত।

গোলাপ এতক্ষণে কথা বলল,

—হাত কাঁপবে কেন? সোর্ড ফোর্ড ধরে অভ্যেস নেই বুঝি?

—অভ্যেস থাকবেনা কেন? সবই চলে। তবে মোগলাই আমলের মালতো। ওরা হত ছয়, সাড়ে ছয়, সাত—ওজনও নব্বই থেকে শুরু। আমাদের হাতে ঠিক খেলে না।

সরখেল গোলাপকে ঘরে নিয়ে গেল। সরখেল আন্ডারওয়্যার পরা। চিমড়ে। সারা গায়ে ঘাম আর মাটি। গোলাপ বলল,

—বাগান করছিলে?

—মনে রেখেচ তাহলে। বাগানও করছি, সেইসঙ্গে মিউটিনিরও ব্যবস্থা করচি। লেখাটা পড়েছিলে?

—পড়িনি? খুব ক্লিয়ারকাট। তাহলে বলচ যে যুদ্ধ একটা লাগবেই?

ভদি বলল,

—কী মনে হয়? এইসব সোর্ড ফোর্ড, তারপর গিয়ে নুনুকামান, গাদা বন্দুক—এমনি এমনি?

—অ্যাজ্ঞে, নুনুকামান মানে?

—ও হল আপনার পোর্তুগীজদের ক্যানন। ছোট সাইজের পোনাকামানও বলা যায়। বজরা টু বজরা হেভি এফেকটিভ।

—থামো তো। বলো গোলাপ ভায়া, কী মনে করে?

—এলাম। তবে উদ্দেশ্য ছিল। সাবধান করা। তোমার সেই লেখাটা বুঝলে...

—বুঝেছি। ওপরওয়ালাদের হাতে পড়ার জন্যেই তোমাকে দিয়েছিলুম। কী বলচে শালারা। পড়ে নিশ্চই পোঁদে ভয় ধরেচে।

—প্রথমে পড়েইনি। বুঝলে? এখন তলব করেছিল। ফাইল দিলুম। সে মাল নেই। কী সব রামমোহন রায় কোথায় মরেচে ফরেচে এইসব...

—থাকবে কী করে। এখন ঐ ফাইল খুললে দ্যাখা যাবে রামমোহনফোহনও নেই। ফের নতুন মাল। ফের বন্ধ করে ফের খুললে আবার নতুন লেখা। বানচোৎদের এমন গুলিয়ে দেব যে হেগে ছুঁচোতে ভুলে যাবে।

কণ্ঠস্বরটি দণ্ডবায়সের। তিনি ভাঙা জানলায় বসে একবার ডানা ঝাপটালেন।

—প্রভু? আপনি?

গোলাপ উঠে গিয়ে দুই ঠ্যাঙের নখে হাত দিয়ে প্রণাম করে।

—কী রে? আমার সাধের গোলাপকে কেমন শুকনো লাগচে।

—এ কিছু নয় প্রভু। দপ্তরে সব ওপরওয়ালা হারামিপনা করছিল। এখন রসে গেচে।

—যাবেই। তুই আমার আশ্রিত। তোর পোঁদে যে লাগবে উল্টে তারটাই খোলতাই করে মেরে দেব। বল্।

—আঁজ্ঞে প্রভু, এসেছিলুম সরখেলকে সাবধান করতে। আর যদি আঁজ্ঞা করেন তো মনের বাসনাটা খুলে পেতে বলি।

—বল্। ভদি, ভালো করে শোন। তুই যা আনমনা।

—না, বাবা। মন দিয়ে শুনচি। কিছু মনে করোনিতো ভাই গোলাপ।

—না ভাই মিউটিনিতে এমনটা তো হবেই। মনে করাকরির কী আচে? আঁজ্ঞে বাবা, আমিও আপনাদের দলে ভিড়ব।

—ভিড়বি কিরে? তুই তো ভিড়েই আচিস। তুই আপনার লোক না হলে সরখেল তোকে চোতাটা দিত?

—আঁজ্ঞে লালবাজারে কী চুদুড়বুদুড় চলছে, কে কী ছক করচে সব এসে বলব। শালাদের ওপরে আমার হেভি খার।

—সে তো বলবিই। এই না হলে গোলাপ। ভদি, গোলাপ মিউটিনিতে নাম লেকাল। ওকে

একটু আপ্যায়ন করবি না?

—ছি ছি বাবা, তাও কি বলতে হয়? গোলাপ ভাই, কী খাবে বলো, বাংলু না বিলিতি?

সরখেল বলে ওঠে,

—কোনো নজ্জা নেই। সব খোলামেলা। আমি একটু হাতমুখ ধুয়ে আসি। সারাদিন ঐ বাগান...কম হ্যাপা?

গোলাপ ঝাঁকে ভিড়ে পড়ে।

—বিলিতিই বলো তবে।

—সরখেল, ফোনে নলেনকে বলে দাও তো।

—দিচ্চি!

—একদিন দিনমানে এসে সরখেলের ফুলবাগানের ফুল দেখতে হবে।

দাঁড়কাক খুক্ খুক্ করে হাসল। ভদি বিশেষ উচ্চবাচ্য করল না। হাতমুখ ধুয়ে সরখেল এসে গেল। নলেন রামের বোতল, গেলাস আর ছোলাভাজা দিয়ে গেল। বড়ই আন্তরিক এই পরিবেশ।

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের আগে দেশের পরিবেশ কি এমনটিই ছিল? অর্থাৎ ভারতের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের আগে। হে মার্কসবাদ পাঠক, তুমি 'বিদ্রোহে বাঙালী' পড়িয়াছ? বলো না গো!

(চলবে)

pathagar.net

১৫

'বিদ্রোহে বাঙালী' পড়তে যাবে কেন? পড়লে যে জেনে যাবে যে, মহাবিদ্রোহে বাঙালি কী যত্নসহযোগে সাহেবদের চামচাগিরি করত। তার চেয়ে সে পড়বে ফুকো যিনি, ভালো বাংলায়, শিঙে ফুঁকে আমাদের বাঁচিয়েছেন। অর্থাৎ পাঠকদের শৃঙ্খলা শেখানো ও শাস্তিপ্রদানের মহান দায়িত্বটি অতীব ক্ষমতাধারী 'কাঙাল মালসাট'-এর ঘাড়েই বর্তেছে। 'কাঙাল মালসাট' কোনো বিদ্রোহী মোষ নয় যে, রক্তচক্ষু করে জোয়াল ফেলে দেবে ও বিপ্লবী গাড়োয়ানদের সঙ্গে প্রাক-পুঁজিবাদী অঘোর নৃত্যে মেতে উঠবে। তাই আমাদের (মানে কাঙাল মালসাট, লেখক ও পাঠকদের) মমজমার রহস্য জানিলেই চলিবে, ৩১৮ পৃষ্ঠার মালটি যেমন অজ্ঞাত রহিয়াছে তেমনই থাকুক। ব্রিটিশদের গুপ্তচরের কাজ। ১৮৫৭তে 'পাছে পথিমধ্যে যুবক গুপ্তচর বলিয়া ধৃত হয়, এই জন্য সেই পত্রখানি, দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। দেহ উলঙ্গ করিয়া, কাপড়-ঝাড়া হইলেও সে পত্র বাহির হইত না। পত্র অবশ্যই মুখের মধ্যে ছিল না। পত্রখানিকে মমজমায় মুড়িয়া, মলত্যাগের দ্বারের ভিতর সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। আবশ্যক হইলে, যুবক পত্রখানি খুলিয়া লইত এবং শৌচাদির পর পুনরায় তৎস্থানে রাখিয়া দিত। রস বীভৎস বটে, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সময়, বীর-বীভৎসরসেরই বিশেষ বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।' এক হিসেবে ভদির কারবারও বিদ্রোহ বিশেষ। অতএব রসতাত্ত্বিকরা রসমিল লক্ষ করিতেই পারেন। বাধা দেওয়ার কেহই নাই। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মহাকাহিনীর শেষে লিখিয়াছেন, 'আবার বেরিলেতে ইংরেজের রাজত্ব বসিল। মনে অপূর্বভাবের উদয় হইল। অদ্য এইখানেই আমার জীবন-চরিত শেষ করিলাম। অবশিষ্ট জীবনী আর লিখিবার উপযুক্ত নহে।' মহান উপলব্ধি ও তৎসহ কী অকপট স্বীকারোক্তি। কী কন্ট্রোল! আলফাল অনেক গাণ্ডুরই নিজের জীবনী রচনা

করিবার একটি গুপ্ত বাসনা রহিয়াছে। কোনো কোনো পাঁচু তো লিখেই ফেলেছে। ছাপাও হচ্ছে খোলতাই করে। কিছু বলার নেই। মহাজনেরা যে পথে যেতে যেতে হায়দারি হাঁক ছাড়েন অ্যাং ব্যাং-ও সেই রাস্তায় হাওদায় বসে জাঁকাতে চায়। এদিকে হাতির সাপ্লাই নেই বহুদিন। আজ যদি নেতাজী থাকত!

রাধাবাজারে ডি. এস যে ট্যাকঘড়িটা সারাতে নিয়ে গিয়েছিল সেটা দেখে দুঁদে দুঁদে ঘড়িয়ালরা অবধি চুপসে গেল। কারও কাছেই এই বিদ্‌ঘুটে ঘড়ির স্প্রিং তো দূরের কথা, কোনো পার্টসই নেই।

—তাহলে দাদু বলচেন হবে না।

—হওয়া না হওয়া ভাই আমার নয়, ওপরওয়ালার ব্যাপার। তবে চান্স কম। এসব মালের আর পার্টস-ফার্টস হয় না।

—ঠাকুদ্দার একটা জিনিস। ফেলে দেব?

—না না, ফেলতে যাবেন কেন? বাক্সপ্যাঁটরায় তুলে রাখুন যত্ন করে। মান্ধাতার মাল। এখন এ সবের মর্ম কেউ বুঝবে?

—কিন্তু মাল তো অচল। কিছু একটা রাস্তা বাতলান?

—কোনো রাস্তা নেই ভাই। তবে হ্যাঁ, অনেক সময় আধবুড়ো পাগলা সাহেবরা এই সব অ্যান্টিক মাল কিনতে আসে। দেখবেন, কাগজে দেয়। পুরনো খেলনা, কলের গান, ঘড়ি তারপর গিয়ে কলম—এইসব।...ভালো হলে হেভি দাঁও মারতে পারবেন।

—বাংলা কাগজে দেয়?

দোকান থেকে বেরিয়ে ডি. এস ঘড়িটা পকেটে ঢুকোল। পুরন্দর বলল,

—বেচবে না জানো, সারানো গেলেও সারাবে না। করতেও পারো ভ্যাড়রভ্যাড়র।

—কটা বাজে?

—দোকানে তো আড়াইট দেখলুম।

—তো! গোলাপ আসবে সোয়া তিনটেতে। টাইম পাস করতে হবে তো! এখনও কড়কড়ে পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

—হেঁটে হেঁটে বেল্লিক বনে লাভ আছে? পায়ের নড়াদুটো টনটন করচে। চলো, একটা চায়ের দোকানে বসি।

—পালকি যার বউ তার। চায়ের খরচ তাহলে তোমার!

—বেশ, তাই হবে। যা ছ্যাঁচড়া হয়ে উঠচ দিন কে দিন।

—আরে, তা নয়। হেভি ক্যাশ সর্ট। বালবাচ্চা নিয়ে তো ঘর করলে না। কবিতা লিখেই লাইফটা কাটিয়ে দিলে।

—আমি আর কবিতা লিখি না। জানো?

—মানে?

—মানে, আবার কী? কবিতা লিখবো না। ছেড়ে দিয়েচি।

—বলো কী?

—দূর। কোনো বাঞ্চোৎ পড়ে না। কেউ ছাপেও না। ও ল্যাওড়া লিখলেই কী আর না লিখলেই কী।

—তবে কী করবে?

—গান লিখব। গান এখন হেভি পপুলার। কাঁড়ি কাঁড়ি ক্যাসেট দেকচ না। হেগো পেদো সব্বাই পুঁক পাঁক করে ক্যাসেট ছাড়চে বাজারে। তাই গান লিখব। রেডি মার্কেট আচে। একটা লিখেচি। শুনবে? চা খেতে খেতে।

—গাইবে?

—না, না। পড়ব। এর ওপর টিউনিং হবে। তারপর আগে পরের বাজনা জুড়বে। মাল রেডি হলে আর্টিস্ট গানটা তুলবে।

পুরন্দর আর ডি. এস যে চায়ের দোকানটায় বসল সেখানে বিরাট ছবি সন্তোষীমা'র। এফ এম রেডিওতে তালাত মেহমুদের ঢেউখেলানো গলার সুর বাজছে। লোকেরা নোংরা গেলাসে গরম চা ও ঠাণ্ডা নিমকি খাচ্ছে। ড্রাইভারেরা বিড়ি ধরিয়ে মালিকদের মা বাপ তুলে খিস্তি করছে। চোখে ছানি কাটানোর পর কালো ঠুলি পরা একটা বুড়ো উবু হয়ে ফুটপাথে বসে চা খাচ্ছে। তার বুকপকেটে অনেক ময়লা কাগজ ভাঁজ করা এবং সেই কাগজের ফাঁকে একটি ডটপেনের ন্যাড়া রিফিল। দুটো চা অর্ডার দিয়ে ওরা বুড়োটার থেকে একটু দূরে দাঁড়াল এবং পুরন্দর পকেট থেকে গান লেখা কাগজটা বের করল।

—কী টাইপের গান এটা?

—ফোক। শোনো না। কথাতেই ভাবটা ধরতে পারবে। আচ্ছা না হয় একটু বলেই নিই-এটা হল মাছমারানীদের গান। রাতের বেলায় পান বেঁধে মেছোমাগিরা মাছ ধরতে যাচ্ছে।

—হেভি তো!

—হ্যাঁ। এবার পড়চি,

গজাল মাছের ভুড়ভুড়িতে কাতলা মারে ঘাই
মাছ মারিতে যাই গো মোরা মাছ মারিতে যাই
ঘোমটা ফেলে, আদুল বুকে
গিরগিটি তেল মাখ্ লো মুখে
আড়ের ভুঁড়ি, শোলের মুড়ি, কুমীরপানা টাঁই
মাছ মারিতে যাই গো মোরা মাছ মারিতে যাই
আবছায়াতে পেত্নি মোরা
পায়ের পাতা পিছনমোড়া
মাছের তেলে মাছটি ভেজে সোহাগ করে খাই
মাছ মারিতে যাই গো মোরা মাছ মারিতে যাই

—পুরো ঝাক্কাস কেস হয়েচে গুরু কিন্তু লাস্টের দিকটায় তো মনে হচ্ছে ওরা ভূত!

—ভূত নয়। ওটা হল মনের ভাব। আঁশটে ভাবনাটা যাতে বেরোয় তাই তো ওরা নিজেদের মেছোপেত্নি বলচে। বুঝলে?

—সে না হয় হল কিন্তু গাইবে কে? আশার গলায় মালটা যা খুলতো না! সঙ্গে খিলখিলে হাসি!

—ওসব ভেবে লাভ নেই। আমার গান তো, ফিউচার ইজ ডার্ক। হেঁজি পেঁজি কোনো ছুঁড়িফুঁড়ি গাইবে। আবার কী হবে? এই বাজারে সি. পি. এম, তৃণমুল, নয়তো কোনো দরাজদিল... কেউ পেছনে লগা না ধরে উঁচু করলে নো চান্স।

—তবে কিছু হয়নি বলে আমি মানি না।

—যেমন?

—আরে বাবা, ফ্যাতাড়ু তো হয়েছ। চোক্ত'রদের সঙ্গে দোস্তি তো হয়েছে। তারপর গিয়ে কথা বলা দাঁড়কাক, চাকতির চক্কর, এবেলা বেঙ্গল ও বেলা ইংলিশ—এরকমই বা কজনের হয়?

—এদিকটা নিয়ে এত ভাবিনি।

—না চাইতেই তো পাচ্চ। তাই ভাবচ না। এইজন্যেই আমার বউ বলে মিনিমাগনাকে কেউ ইজ্জত দেয় না।

—ঠিকই বলে। ভালোই হল। এই কতা দিলুম এসব নিয়ে আর ভাবব না। ওফ্ চিড়িক করে একটা সং মাথায় এল।

—এটাও কী জেলেমাগিদের...?

—না, না। এটা হল গিয়ে তোমার শহরের, কলেজে পড়া মেয়েদের গান। মুখড়াটাই পেলুম। শুনবে?

—বলো!

—হব না ননদ, হব না জায়া
হব সরকারি হোমের আয়া...

—হিটিয়াল দাঁড়াবে গুরু। এরপর মিল দেওয়ার জন্যে তোমার হাতে সায়া, মায়া, ছায়া, পায়া—সব আচে।

—পায়া-টা কাজে লাগবে না। অবশ্য খাট বা তক্তপোষ যদি সিনে ঢুকে পড়ে তাহলে আলাদা ব্যাপার।

ডি. এস বলল,

—সামনে দেখো,

—কী?

—ওই যে, রাস্তাপারের পানের দোকানে।

গোলাপ পান কিনে খেল। তারপর পানের বোঁটার থেকে চুন দাঁতে কেটে বোঁটাটা যখন ছুঁড়ে ফেলল তখন হাতের তেলোতে লুকোনো একটা কাগজের দলাও সেইদিকে পড়ে গড়িয়ে গেল।

—গোলাপটা এখন লালবাজারে ব্যাক করবে। আমি পা চুলকোবার ছকে মালটা ক্যাচ করব। তুমি গার্ড দেবে।

—আমিও পা চুলকোব?

—পাগলা নাকি? দুজনে পা চুলকোচ্চে দেখলেই সব স্পাই অ্যালার্ট হয়ে যাবে। চারদিকে কিলবিল করচে। চলো! কোনো বাঞ্চোৎ হয়তো এক কিকে নর্দমায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে। কাগজের দলা দেখলেই অনেকে ভাবে বল।

গুপ্তচরদের একটি জমজমাট জগৎ রয়েছে। সেখানে নানা দেশের গুপ্তচর সংস্থাই খেলায় মেতে রয়েছে। সি. আই. এ, কে. জি. বি (বর্তমানে এস. আর. ভি), এম. আই. ফাইভ, মোসাদ, অধুনা বিলুপ্ত স্টাসি, আই. এস. আই—কত শিশুই যে নিকারবোকার পরে এই রহস্যাবৃত ক্রীড়াঙ্গনে আঁকুপাঁকু খেলা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই নিষ্পাপ খেলায় যে চোক্তার-ফ্যাতাড়ুরাও পেছিয়ে নেই তা আশা করা যায় পাঠকের মগজ এড়াবে না। ভদি দলা পাকানো কাগজটি খুলল। একটি হ্যান্ডবিলের উল্টোপিঠ। সেখানে লেখা,

ALL M AND CT UNDER I

pathagar.net

—হুঁ হুঁ বাবা। আমার নাম হল ভদি। আমার সঙ্গে টিগড়মবাজি! নলেন কোতায়? নে... লো...!

নলেন দুদ্দাড় করে ছাদ থেকে নেমে এল।

—এই কাগজটাকে উনুনে দিয়ে দে। ভালো করে পুরোটা জ্বলে যেতে দেখবি। তারপর বড় করে একটা বাংলা রাম পাতিয়ালা পাঞ্চ বানা। জানতাম, খেলা জমবে। জমে দই হয়ে যাবে।

সেদিন রাতেই ভদি, দাঁড়কাক ও সরখেল স্পেশাল কোর মিটিং-এ বসে গেল। লালবাজারের গোয়েন্দারা কলকাতার মাগি ও চোলাই-এর ঠেকে হেভি নজর রাখা শুরু করেছে। সরখেল দেখা গেল ব্যাপারটার গ্র্যাভিটি ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি।

—আমরা মাগিবাড়ি যাই না, চোলাইও খাই না। ও উকুন আমাদের কারো নেই। তবে কেন আমরা উত্যক্ত হতে যাব?

—গোড়াতেই এমন চোদনার মতো কথা বলে বসো যে মটকা গরম হয়ে যায়। তোমার মতো মেজর জেনারেল নিয়ে লড়তে হয়েছিল বলেই হিটলারের খুপড়ি উড়ে গিয়েছিল। ভাবা যায় না। বোকাচোদামির একটা লিমিট থাকে। —দাঁড়কাক এই স্ট্র্যাটেজিক আলোচনায় এতক্ষণ এক পায়ে দাঁড়িয়ে অন্য পা দিয়ে বাতাসে ইকড়িমিকড়ি আঁকছিল। ভদির মেজাজ টং দেখে সরখেল কথা ঘুরিয়ে দাঁড়কাককে বলে,

—আপনি কী লিখছেন প্রভু?

—ও কিছু নয়। ডুড্‌ল্‌স্। যুদ্ধ লেগে যাব লেগে যাব হলেই আমি ডুড্‌ল্‌স্ আঁকি। স্ট্যালিনও আঁকত—শেয়াল।

—আর আপনি?

—কোনো ধরাবাঁধা সাবজেক্ট নেই। কখনো ভূত, কখনো কচ্ছপ, কখনো ঝাড়াঝাড়ি। ভদির সব ভালো কিন্তু বড় অল্পতে ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে। ওঁর ঠাকুর্দাও এরকম ছিল। থার্ড জেনারেশন বলে রিপিট করছে। গ্রেগর মেন্ডেলের নাম শুনেছিস?

—আজ্ঞে না।

—১৮৬৫ সালে কেসটা ধরেছিল। মিউটিনির আট বছর পর। একদিন বলবখন। এই মেন্ডেলকে আবার আংলি করতে গিয়েছিল লাইসেনকো বলে একটা বোকাচোদা। স্ট্যালিনও পুড়কি খেয়ে নিকোলাই ভাভিলভকে ঝেড়ে দিল। ব্যাস—পুঁটকিজাম। কিছুই জানিস না। আর কী করেই বা জানবি! গাণ্ডুর দেশের যত উদগাণ্ডুরা হচ্ছে লিডার। তোর লিডার যেমন ভদি। মগরার বালি দিয়ে চারবেলা পোঁদ মারালে যদি বুদ্ধি খোলে।

—না, না, বাবা। অমন কঠোর দণ্ড দেবেন না।

—ঠিক আচে, দেব না। এবার যা বলবি বল্। তবে চোপা দেখলেই এবার কিন্তু হেভি খচে যাব।

—নাক মলচি, কান মলচি, আর হবে না।

—বেশ, এবার বলে যা।

এই সময়েই দরজার বাইরে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনে সকলে চমকে গেল।

—কে? হু ইজ দেয়ার?

—আমি। নলেন।

—হোয়াই? কী চাই?

pathagar.net

—বৌদিমণি বলল কি যে সেনাপতিরা ফন্দি আঁটচে, যা রে নলেন, এক বোতল মাল দিয়ে আয়, তাই এলুম।

—কাম্। গুড্।

দরজা খুলে নলেন ঢুকল। থালার ওপরে এক বোতল বাংলা। তিনটে ছোট গেলাশ। এক মগ জল। কুচো চিংড়ির বড়া।

—রাখ্। বাইরে কী ফাটল? পাদলি?

—আঁজ্ঞে না। পায়ের তলায় পড়ে আরশোলা ফাটল।

—তাই বল। আমি ভাবলুম ক্যাপ ফাটল। যা, দরজাটা টেনে দিয়ে যেমন এসেচিস তেমনি পা টিপে টিপে চলে যা।

নলেন পা টিপে টিপে চলে গেল।

—বাবা, শুনুন। সরখেল, ধ্যানসে শুনো। মিউটিনির প্রথম দিকটায় আমরা পুরো ক্যান্টার করে দিয়েছি। এমন দিয়েচি যে বাঞ্চোৎদের পোঁদে যমের ভয় ধরে মাথা গুগলি হয়ে গেচে।

—খোলসা করে বল।

—এক নম্বর হচ্ছে যে চাকতিফাকতি উড়ে ওদের তো পিলে চমকে গেচে। বুঝতেও পারচে যে সরখেলের চরমপত্র ফ্যালনা নয়। এ. কে. ফর্টিস্টিভেনের কারখানা, ভিক্টোরিয়ার চোদখোর কিউরেটর—সব মিলিয়ে কেস গুবলেটিং। কিছু একটা আসচে অথচ কী করবে জানে না। মোটা মাথা তো...হেডপিসে হরতাল...ভাবচে কেমন ক্রিমিনালরা গ্যাং আপ করেচে তো...তাই এম অ্যান্ড সি টি মানে মাগি আর চোলাই-এর ঠেকে খোঁচর বসানো...এগুলো হচ্চে পাতি রেসপন্স...এই দিয়ে যদি মিউটিনি ঠেকানো যেত তাহলে আর কতা ছিল না। একদম চোদু। পিওর চোদু। তবে হ্যাটস অফ টু গোলাপ। একে বলে স্পাই।

—ওফ্ এইবার বুঝলুম। না, প্রভু, আমরা ঠিক নেতাই বেছেছি। আপনি কী বলেন?

—বাপ হয়ে ছেলের প্রশংসা আমি কখনও করিনি। ওসব ঢ্যামনামি আমাদের বংশের ধাতে নেই। তবে আমি চাই যে ওরা যখন একটা স্টেপ নিয়েচে তখন আমাদের একটা কাউন্টার স্টেপ নিয়ে দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে আমরা বাল কেয়ার করি। ভদিই সেটা ঠিক করবে। চুক্ করে একটা কড়া ডোজ মেরে আমাকে কাটতে হবে।

—কেন প্রভু?

—বলা বারণ কিন্তু তোরা হলি কোলের গ্যাঁদা। তোদের বলা যায়। আজ ওল্ড পার্ক স্ট্রিট কবরখানায় মি. স্লিম্যান ও মি. শেরউডের মধ্যে ডুয়েল হবে। আমাকে রেফারি থাকতে হবে।

—আঁজ্ঞে, রাজার জাতের মধ্যে কী নিয়ে বিবাদ যে ডুয়েল লড়তে হবে?

—সেই, এজ ওল্ড ফ্যাড, মিস এমা র‍্যাংহামকে নিয়ে কামড়াকামড়ি। ইতিহাসের পাতায় পাতায় যার ছড়াছড়ি। রাস্তাতেও তাই। মাদি কুত্তা নিয়ে মদ্দাগুলোর ঘ্যাক ঘ্যাক। বাই চান্স হয়তো কোনো ওল্ড কুত্তা সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। ব্যাস্ সেও সোলডা বের করে ভিড়ে পড়ল। ফিউচারেও এরকম চলবে। কিছু করার নেই।

—আচ্ছা প্রভু, ঐ আপনার গিয়ে স্লিম্যান, তারপর কী যেন, হ্যাঁ শেরউড—এরাতো কবে পটলিফায়েড হয়ে গেচে। এখনও এদের ভূত লড়ে যাচ্ছে?

—নো, নো, সাহেবদের ভূত বলা বারণ। গোস্ট বলতে হবে। কী বাবা, ঠিক বলিনি?

—ঠিকই তবে গোরাভূত বললে দেখেচি আজকাল ওরা মাইন্ড করে না। কতায় কতায় রাত গড়াচ্চে। ওদিকে পিস্তল-ফিস্তল রেডি। মিস এমা র‍্যাংহাম বার বার মূর্ছা যাচ্ছে। বেগম

pathagar.net

জনসন একা কতদিক সামলাবে। চলি।

খোলা জানালা দিয়ে ভৌতিক অন্ধকারের মধ্যে ডানা মেলিয়া দণ্ডবায়স ডুয়েল-এ রেফারিং করিতে উড়িয়া গেল। পাঠক, নিপাতনে সিদ্ধ গবাক্ষের বাহিরে মোহিনী মন লইয়া তাকাও। তুমিও দেখিবে পিয়ানোর টুং টাং শব্দে সেই শিশিরই পড়িতেছে যা তখনও পড়িত। ঘাসে ঘাসফুল ফুটিয়াছে। তখনও ফুটিত। এই দৃশ্যে মগ্ন থাকো। ঐ দ্যাখো মেম-বালিকারা খিলখিল করিয়া মাঠে নামিতেছে। স্লো-মোশানে স্কিপিং করিতেছে। কী সুন্দর সোনালি চুল। কী দুধেল গলা। কী ফুলেল বুক। আরো নামো। যেন লিফটে চড়িয়া তুমি বালিকা মেমের পেট বাহিয়া নামিতেছ। এ লিফট থামিবে না। স্বপ্নদোষ অবধি এই চটকা থাকিবেক। হায় নবোকভ, পৃথিবীর সবকটি রান্নাঘরের ঝুল একত্র করিলেও আপনার ন্যায় একটি ঝুল লেখক মিলিবে না।

—সরখেল, আমিও তাহলে উঠি।

—সে কি? প্রভু যে কাউন্টার স্টেপের কথা বলে গেলেন, তার কিছু করবে না।

—সেই কারণেই তো যাচ্ছি। কাল একটা ঘটনা ঘটবে জানো?

—কী?

—ওয়েস্টবেঙ্গলের টপ্ সব ক্যাপিটালিস্টরা সি. এম-কে মিট করবে।

—তাতে আমাদের কী ছেঁড়া গেল?

—দেখবে। দেখবে মানে কাগজে পড়বে। টিভিতে দেখালেও দেখাতে পারে।

—একটা আঁচ দাও। এত সাসপেন্স।

—অনেকটা মাল আচে। একাকী চার্জ করে যাও। আমি চাকতির ঘরে ঢুকব। ঘণ্টা দুয়েক দরজা বন্ধ থাকবে। আর বলব না। চলি।

ভদি যখন উঠে দাঁড়াল তখন সরখেল দেখল হারিকেনের আলোয় ভদির যে ছায়া পড়েছে তা ফসফোরাসের ঝিকিমিকিতে দ্যুতিময়। কেঁচোর তেল থেকেও এরকম অপার্থিব আলো বের হয়। ভালটের বেঞ্জামিন ইহাকেই বলিয়াছিলেন 'অরা'। আমরা 'আভা' বলতে পারি। এই আভা-কে পাঠক যেন আভাদিদির সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলেন। ফেললেই কেলো।

সেই রাতেই মদনের বাড়িতে বসে পুরন্দর ভাট তার লেখা দ্বিতীয় গানটি কমপ্লিট করল।

হব না ননদ, হব না জায়া
হব সরকারি হোমের আয়া
সুপারের সনে
যাব কচুবনে
রচিতে নধর মিলনমায়া
না রবে পিত্তি, না রবে হায়া
হয় এসপার
নয় ওসপার
দেখিবে জগৎ যুগলছায়া
হব না ননদ, হব না জায়া।

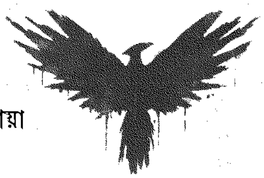

মদন গানের কথাগুলো শুনে বলল,

—তোমার দুটো গানেই দেখচি মেয়েদের হ্যাটা করার একটা ধান্দা। আমার মতো তোমারও বউ পালিয়েছে নাকি?

—বিয়েই করলুম না। বউ পালাচ্চে!

—ও তাহলে হাফসোল কেস। বুঝেছি। নাও, রাত হয়েছে। লেটে যাও।

—সেই ভালো। লেটে একবার গেলে কোনো ঝুটঝামেলা নেই।

রাত ফুরোতে বেশ খানিকটা বাকি তখনও। কালী ও বড়িলাল পাশাপাশি কালীর ঘরে মাদুরের ওপর অন্ধকারে উদোম হয়ে শুয়েছিল। বড়িলাল কাশল।

—ঘুম আসচে না?

—এসে গিয়েছিল কিন্তু চালের ওপর সড় সড় একটা শব্দ।

—ও কিছু না। বাস্তু সাপ।

—অ্যাঁঃ!

—আরে বাবু ক্যাঁওম্যাঁও করার মতো কিছু ঘটেনি। ওকেনেই থাকেন। মাঝেমাঝে রাতে বেরোন। ব্যাঙ, ইঁদুর—যা খেলেন খেলেন, এসে আবার শুয়ে থাকেন। ভালো। এবারে ঘুমোও।

—যা শোনালি তাতে ঘুমের বাপও আর ধারেবাড়ে ভিড়বে না।

—এই নাকি তিনি কুস্তি নড়তেন। কুস্তিগির।

—কুস্তি তো মানুষে মানুষে হয়। সাপখোপ, পোকামাকড়, পিমড়ে—এসব আমার ধাতে সয় না।

—থামো তো। ওরা কেউ কিছু করবে না। যে করবে সে জানান দিয়ে গেচে।

—কে?

—পুলিশের লোক। ঘরে ঘরে বলে গেচে।

—কী?

—বলেচে, দ্যাখ মাগেরা, কার ঘরে কোন খদ্দের আসচে, কী বলচে, কী আনচে সব রিপোর্ট দিতে। বড়বাবুর অর্ডার। কিছু গোপন করবিনি। তাহলে মেয়ে-পুলিশ এনে, চাবকে পোঁদের চামড়া গুইটে দেবে। বড়বাবুর হুকোম। যে সে লোক নয়।

—তুই আমার নাম বলবি?

—বলব।

—বলবি?

—থামো তো। রাত বলে ভোর হতে চলল আর ওনার বটকেরা থামে না। কেন বলব? বড়বাবু আমার ভাতার না কে? পুলিশ দেখাচ্ছে। বলি ফি মাসে গুনে গুনে টাকা নিয়ে যাস না? এমনিতেই আমাদের লজ্জাশরম কম। এমন কথা শুনিয়ে দেব যে ধন গুইটে পালাবে।

—ধর আমাকে দেখে ফেলল।

—তো কী হবে?

—বলবে, এই কালী, ডেমনী খানকি, তোর ঘরে খেলনার দোকানের বড়িলাল মৌজ মারতে আসে, শালী, বলিসনি কেন?

—আমিও চুপ করে থাকার লোক না। বলব, বড়িবাবু ঠেঙে আমি একবেলা নগদ ধার নিয়েছিলাম। সেই টাকা শোধ কোত্থেকে করব? তো গায়ে গায়ে শোধ করে দিচ্চি। তাতে তোর তবিলে জ্বালা ধরচে কেন রে বোকাচোদা! আসুক না।

—বেশ বলিচিস কিন্তু। গায়ে গায়ে শোধ! আয় কাচে চলে আয়।

—কেন, তোমার আসতে বারণ আচে?

—থাকলেই বা মানচে কে?

pathagar.net

পাঠক, তুমি কালীঘাটের খানকি কালীর প্রেমে পড়িতে চাও? পাঠিকা যদি হও তো কালীর সম্মানে মাথা নত করো। বরং আইস, আমরা খানকি কালীর বন্দনাতে সমস্বরে গাই, চরাচর শুনুক, দেবতা, মানুষ সকলে জানুক,

'কসিয়া কোমর বান্ধে অতি মনোহর ছন্দে
অস্ত্র বান্ধে বহু যত্ন করি।
জড়ির পটুয়া আনি কাঁকলে বান্ধিল রাণী
পটি টাঙ্গি বান্ধে তারোপরি॥
পীঠেতে বান্ধিল তূণ কৈল তায় বাণে পূর্ণ
শেলশূল মুষল মুদ্গর।
ঝাটি ঝকড়া আনি বান্ধিলা প্রমীলা রাণী
সাজ করি হইল তৎপর॥'

শ্রী চন্দনদাস মণ্ডল বিরচিত 'মহাভারত' হইতে সমস্বরে যখন কালীর বন্দনা ধ্বনিত হইতেছিল সেই সময়েই, রজনী তখনও আছে, ভদির চাকতির ঘরের দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল এবং পূর্বে যেমনটি আমরা দেখিয়াছিলাম তেমন নয়, অজস্র অতি সূক্ষ্ম ও প্রায় স্বচ্ছ চাকতি বোঁ বোঁ শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। (চলবে)

pathagar.net

১৬

কবিতার (কোনো ফিমেলের নাম নয়) হাত ধরেই নাবালক বাংলা সাহিত্য, যে দিকেই হোক, এগিয়েছিল। এই পক্কড়টির সূত্রপাতেও তাই কবিতার আবির্ভাব। কবি কোনো প্রখ্যাত মিহিদানা নয়, নয় কোনো অভিমানী আন্দামান। বরং আমাদেরই প্রিয়জন পুরন্দর ভাট।

সবই আছে বাংলায়—বউ, ছুঁড়ি, আয়া,
তবে কেন বিমর্ষ মুখে বসে ভায়া?
নিশিনাথ, আব্দুল—কাঁদো কেন ভাই?
চলো মোরা রামপাখি ধরে ধরে খাই।

বিশিষ্ট কেউ যদি বলেও না দেন যে এই কবিতায় 'দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিমডিম রবে'-র মতো সাসপেন্স পাওয়া যায়নি তাহলেও আমাদের খুব একটা মুষড়ে পড়ার কারণ নেই। না হয় সেসব ফাইনার পয়েন্ট আমাদের না জানাই থেকে গেল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশে যেটুকু পাওয়া গেল তা কি কাফি নয়? সেলুকাস! তলা দিয়ে মারচ ফোকাস? যেমন নাটকীয়, তেমনই সাবলাইম। এভাবেই এগোতে হবে। দুদশ পা পিছিয়ে পড়লে ক্ষতি কী? সামনে অগাধ খাদ। বরং উল্টো দিকে দৌড় দিলে কেমন হয়? সবাক থেকে নির্বাক চলচ্চিত্রে?

—স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিট!

কে চেঁচাল? ফুয়েরার না ইয়াহিয়া খাঁ? নাকি মার্শাল জুকভ? কেউই নয়। মিলিটারি টিউনিক পরে এই চিৎকার দিয়ে চিত্রার্পিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভদি। চেঁচানোর পরেই চোখ বন্ধ। সামনে হাজির ভক্তের দল বাকরুদ্ধ। লণ্ঠনের আলো দপদপিয়ে বেড়াচ্ছে। কোনো খুক্ খুক্ কাশি বা অন্যবিধ ট্যাঁ ফুঁ নেই। এই মুগ্ধ নীরবতা ভাঙল কে? মেজর বল্লভ বক্সি। তাঁর বাংলা মান্য নয়।

—ঠিক ঠিক সমঝ তো হইল না। স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিট! একটু যদি খুলেন...

—খুলব? খুলছি। ...গভরমেন্ট হাই অ্যালার্ট। মোড়ে মোড়ে স্পাই। এখানেই হয়তো বসে

আচে বাগড়া মারার ধান্দায়! একটাও খোঁচড় নেই এমন কোনো গ্যারান্টি দিতে পারবে ক্যাপ্টেন?

বল্লভ বক্সি মেজর ছিল কিন্তু ভদি তাকে সবসময় ক্যাপ্টেনই বলে। বল্লভ গোঁফ নাচিয়ে কিছু ভাট বকার আগেই ভক্তবৃন্দ সরব হইয়া উঠিল।

—না প্রভু। না। আমরা নিজেরা নিজেদের ওপর নজর রাখছি।

—থাকলে ঠিক আইডেন্টিফায়েড হয়ে যেত।

—আপনি নাম বলুন। কাঁচা মুণ্ডু নামিয়ে দিচ্ছি।

ভর্দি গর্জে উঠল।

—চোপ! চোপরাও! একটা কিছু বললাম তো অমনি চেল্লাতে শুরু করল। ওরে পাগলা আমার ভক্ত সেজে কোনো খানকির ছেলে টিকে থাকতে পারত? ফেস কাটিং দেখেই ধরে ফেলতুম। দত্তবাবুর লাটে অঘোর সাধনায় তাহলে শিখলুমটা কী? আর্মির হেডকে এসব বলতে হয়। একে বলে হাওয়া গরমানো। বুঝলি! হাওয়া গরমানো। এর টেকনিক যে ধরে ফেলবে তার মার নেই।

টিনের দরজায় দাঁড়িয়ে সবই শুনছিল বড়িলাল। বড়িলালকে কেউ যেন আবার আগ বাড়িয়ে নধর স্পাই বা কিম ফিলবি গোছের কিছু ভেবে না বসে। আগেই বলা হয়েছে যে বড়িলাল হল সাক্ষী। পৃথিবীতে যা কিছু ঘটুক না কেন তার একজন না একজন সাক্ষী থাকবেই। অবশ্য তাকে যে মানুষ হতেই হবে এমন কোনো সরকারি নিয়ম নেই। সে একটা হাঁড়ি পাতিল বা বগিথালা বা পেদো গন্ধপাতার গাছ বা একটা চোখকানা হুলো—যা কিছু হতে পারে। দুনিয়াদার নানাকৌশলে কার সঙ্গে কার যে ঘোঁটপাট করে রেখেছে তা বোঝার সাধ্যি কারও নেই। এনিয়ে অধিক উচ্চবাচ্য না করাই ভালো। কীভাবে বা কোনদিকে কেস টার্ন নেবে তা নিয়ে অনেকেই ফতোয়া দেয় এবং হেভি বেইজ্জৎ হয়ে শেষে হয় ঘাপটি মেরে দিন কাটায় বা পাড়ার লোকের কাছে গুপিবাজ বলে নাম কেনে। গুপি দেওয়া অবশ্য অন্য মেকদারের ব্যাপার। হাওড়া জেলার আমতা বলে একটা থানা আছে। এবং এই থানার আন্ডারে খিলা বরুইপুর নামে একটি ভিলেজ এখন আছে কিনা বলা যাচ্ছে না। যাইহোক, সেই গ্রামেই গোপীমোহন ও বিরাজময়ীর একটি ছেলে হয়। তখন গাম্বাট টাইপের নাম রাখার একটা কেতা চালু হয়েছিল—ছেলের নাম রাখা হল সুরেন্দ্রমোহন। এবং শিশু সুরেন্দ্রমোহন দু বছর বয়সেই মিস্টিরিয়াস কোনো অসুখে সকলকে কাঁদিয়ে টেঁসে গেল। তখন সেই শিশু মড়াটিকে নিয়ে গিয়ে প্রচলিত রিচুয়াল অনুযায়ী পুঁতে ফেলার জন্যে মাটি খোঁড়া হচ্ছে—এমন সময় শিশু মড়াটি চোখের পাতা নাড়তে থাকল এবং অচিরেই বেঁচে উঠল। গোপীমোহনের মা তখন বলেছিলেন যে এলা ছেলেকে ওষুধ না দিয়ে চরণামৃত দিতে—বাঁচলে এতেই বাঁচবে। এলা ছেলেকে এই যে 'এলা' (উচ্চারণ হবে অ্যালা), 'এলা' বলা হতে লাগল তার থেকেই শেষে সুরেন্দ্রমোহন ভায়া অ্যালামোহন লাস্টে আলামোহন হয়ে উঠলেন। ইনিই তিনি। বেঙ্গলের প্রাইড আলামোহন দাশ। এই রিয়াল লাইফ স্টোরিটি জানার পরেও ঢ্যামনা ঘুঘুর দল যদি সবজান্তার মাজাকি ত্যাগ না করে তাহলে স্পিকটি নট। প্রসিদ্ধ দাশ ব্যাঙ্কের মতো তারাও ফেল মারবে এবং বিস্তর লোককে ডোবাবে। দাশ কোম্পানি, ঘুঘু কোম্পানি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি—কোনো কোম্পানিই থাকবে না। অন্তত পূর্বোক্ত তিনটির মধ্যে দুটি এখনই নেই। তৃতীয়টি অর্থাৎ রক্তচক্ষু ঘুঘু কোম্পানি এখন কবে লাটে ওঠে সেটারই ওয়াস্তা।

ভদির লেকচার একটু এখন শোনা খুবই আরামদায়ক হতে পারে।

—গওরমেন্ট নড়ে চড়ে বসচে। বন্দুকের নলে ফুঁ দিচ্ছে। গোলাগুলি যাতে সেঁতিয়ে না যায় তার জন্য রোদ্দুরে দিচ্ছে। পাবলিককে তাতাচ্ছে। শালাদের বন্দোবস্ত আমরা ধরে ফেলেচি।

অত সহজে আমাদের সাইজ করা কারও বাপের সাধ্যে কুলোবে না। তাই আমাদের এখন মতলব হয়েচে স্ট্র্যাটেজিক রিট্রিটের, গুটোতে থাকব। এইসা গুটোন গুটোব যে বারো হাত কাঁকুড় প্রায় দেখা দেয় আর কী। তারপরই শুরু হবে খোলা। পুরোদস্তুর খোলতাই। লে ধড়াদ্ধড়, লে ধড়াদ্ধড়। মাথায় ঢুকেচে?

—হ্যাঁ প্রভু।

—তাই সকলকেই আগড় বেঁধে থাকতে হবে। একদিকে আড়চোখে তক্কে তক্কে থাকা, অন্যদিকে গাঁড়ভোলা গোঁসাই, কদমা কাকে বলে চেনেন না। এই হল যুক্তি। বাবা পটল।

—কর্তা!

—গঙ্গায় যা ছাড়ার কথা ছিল ছেড়েছিস।

—ও রোববারেই সেরে দিয়েচি। ছাড়া পেয়ে কী আনন্দ। দাঁড়া নাচাচ্ছে আর এ ওকে ধাওয়া করচে।

—বাঃ বাঃ এই তো। অর্ডার দিলুম। কাজ ফতে। নলেন, পটলকে ভালো করে এক গেলাস টনিক বানিয়ে দে। টনিক খাওয়ার জন্যে পটল উঠে গেল। ভদি এমনিতে তার মিলিটারি প্ল্যানের খুঁটিনাটি বলে না কিন্তু আজ তার অন্যথা ঘটল।

—ভেবে দেখলুম ডুবোজাহাজের খরচা অনেক। খোল বানাও। ইঞ্জিন বসাও। পেরিস্কোপ লাগাও। সব করে যে নিশ্চিত হবে সে উপায় নেই। ভাঁটায় হয়তো ছাই গাদায় সেঁটে গেল। কী করবে তুমি? কিচ্ছু করার নেই। তখনই আইডিয়াটা মাথায় খেলে গেল। অমনি বুঝলাম এ বাবা স্বয়ং বাঞ্ছারাম সরকারের মাথা ছাড়া আর কোথাও আসবে না। রেডিওর মতো। তিনি বলচেন, আমি ধরচি, তোরা শুনচিস গান কি হেঁয়ালি হচ্ছে। তা যে কথা সেই কাজ। পটলের তিন পুরুষের মাছের ব্যবসা। দেখলাম ঐ পারবে। বললুম, যা রে পটল—নেনো ভেড়িতে যে ধুমো ক্যাঁকড়া হয় তার বাচ্চা এই মণটাক এনে মা গঙ্গায় মুক্ত করে দে। এই জল তো হাই প্রোটিন—রোজ অন্তত শতখানেক মরা কুকুর বেড়াল পড়চে। বস্তা করে মানুষও ফেলে। খেয়ে দেয়ে কদিনেই ডাগর হয়ে উঠবে। ব্যাস্ সাবমেরিনের বাবা। যেই পুলিশ জলে পা ফেলবে অমনি ক্যাঁক্!

—আজ্ঞে প্রভু, জলে নামলে তো আমাদেরও কামড়াবে।

—ওইখানেই তো বুদ্ধির দৌড়। ফন্দিফিকির করে ওদের জলে এনে ফেলব। কিন্তু নিজেরা বড়জোর পাড় অবদি। তারপর সামলাও। হ্যাঁচড় পাঁচড় করে জল থেকে হয়তো উঠল কিন্তু বাঁচবে কী করে? বেজায়গায় হয়তো কামড়ে ঝুলচে। ধুমো ক্যাঁকোড়, অনেকটা গিয়ে কচ্ছপের টাইপের। কামড়ালো তো কামড়েই রইল। এই রকম ভাবগতিক ছিল সায়েবদের বুলডগ কুকুরের। আজকাল দেখতেই পাই না। তাছাড়া হেগো বাঙালি বুলডগ খাওয়াবার মুরোদ কোথায় পাবে। ডেলি দেড় কেজি, দুকেজি গরুর মাংস খাবে। থ্যাবড়া মুখ। দেখলেই পিলে উড়ে যাবে। বুলডগ পুষবে। তাই দেখি ভাতার, মাগ সব আজকাল শাদা শাদা শেয়ালের বাচ্চার মতো কী একটা নিয়ে ঘুরছে, হাগাচ্চে। সবকটা দেখতে একরকম। বাজারের মুরগির মতো।

বড়িলাল আড়চোখে দেখেছিল গলির থেকে ছায়াটা এগোচ্ছে। এই মোড় ঘুরল বলে। ঘুরে তো গেলই। তখনই বড়িলাল মোতা শেষ করার অ্যাক্টো করে প্যান্টের জিপ টেনে রওনা দিল। গোলাপ ও বড়িলাল ত্যারচা মুখোমুখি হল। কার কেমন ব্যাটারির জোর তা টুক করে মাপামাপিও হয়ে গেল। ছায়ায় ছায়ায় টক্করে এরকমই হয়। গোলাপ বুঝে গেল মালটা নাটা কিন্তু সাঁটিশ। বড়িলালও টের পেল যে একটু পেটের দিকে বেড়ে গেলেও খোকন একসময় ডনফন টেনেছে।

গোলাপের ট্রেইনড চোখ। দরজার কাছে পেচ্ছাবের নদ বা হ্রদ কিছুই চোখে পড়ল না। টিনের গায়ে ধাক্কাতে নলেন দরজা খুলে দিল। ভক্ত সমাবেশে তখন অধিবেশন শেষের দোলাদুলি শুরু হয়েছে।

—কী করচ নলেন ভায়া, দোরগোড়ায় এনিমি ওয়াটার মাইনাস করে পালাচ্ছে, কিছু করতে পারচ না?

নলেন দৌড়ে বাইরে দেখতে গেল। অথচ দেখার মতো কিছুই নেই। একটা বেড়াল রাস্তা পেরোচ্ছে। সে নলেনকে চোখ মারল। এবং গোঁফ নাচিয়ে সেই হাসি হাসল যাকে বিশ্বকবি বলেছিলেন 'মুচুকি'।

—গোলাপ! আমার গোলাপবাগ, আয়রে বুকে আয়।

ভদির সঙ্গে জড়াজড়ি করে দেখা গেল গোলাপ কানে কানে কী যেন বলছে। ভদি চেঁচিয়ে উঠল,

—সরখেল, গোলাপ বলচে খেল জমে গেচে। জমে ক্ষীর হয়ে গেচে।

সরখেল তড়বড় করে এগোয়।

—বলো কী!

এরপরই সরখেল, গোলাপ ও ভদি যারপরনাই আনন্দে টইটুম্বুর হয়ে একটা ঘরে (চাকতির ঘর নয়) ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল এবং দরজার সামনে ক্রেমলিন গার্ডদের মতো নলেন দাঁড়িয়ে গেল। শিষ্যবর্গকে সাময়িকভাবে বিচলিত করে ঝটপটিয়ে দণ্ডবায়স এসে পড়তে নলেন দরজা একটু ফাঁক করল এবং বৃদ্ধ কাকটি ভেতরে গ্যারেজ হয়ে গেল।

শিষ্যবর্গ তখন হাউসকোট পরা বেচামণির হাত থেকে একটি একটি করে নকুলদানা নিয়ে বিদায় নিচ্ছে। মেজর বল্লভ বক্সি নকুলদানা নেওয়ার সময়ে বেচামণিকে আগে স্যালুট করে নিল। ফাঁকা উঠোন। বেচামণির হাত থেকে নকুলদানার থালাটি পাক খেয়ে উড়ে গেল। বাতাস এসে টগরগাছে এমন বেহালার ছড় টানল যে মুহূর্তে উঠোনটি ভিয়েনার নৃত্যাঙ্গনে পাল্টাল ভোল। বেজে উঠল ব্লু দানিয়ুব। আহা কী তালে তালে ফেলে পা বেচামণি আগুপেছু করে। নলেনের চোখদুটি কাচেরই বলে ভুল হয়ে যেতে পারে। দু পা ফাঁক। হাত কোমরে সামরিক তো বটেই, তদুপরি জালি গামছা পরা।

গোলাপ যে টপ সিক্রেট সফল অপারেশন লোবোটোমির কথা ভদি, সরখেল ও দাঁড়কাককে বলছিল তা আমরা তার মুখেও শুনতে পারি। কিন্তু রহস্যময় কোনো তৃতীয় পক্ষের বয়ানই হয়তো বা ঘটনাটির সমকক্ষ হওয়ার মতো পালোয়ান।

সকালেই সেদিন সি. এম-এর ঘরে বঙ্গীয় বণিক সভার প্রতিনিধিবর্গের আসার কথা ছিল। বিষয় বরাবরের মতোই, হলদিয়া পেট্রোকেম এবং বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান তিতিবিরক্ত ও বেপরোয়া মনোভাব, হোসিয়ারি শিল্পে নিউ গিনি ও পাপুয়ার সঙ্গে যৌথ গবেষণা গড়ে তোলা ইত্যাদি ইত্যাদি। পাঁউরুটি ও চানাচুর শিল্পে আশ্চর্য অগ্রগতি সম্বন্ধেও আলোচনা হতে পারত কিন্তু পারল কই? আলোচনা বানচাল হয়ে গেলে কেমন এক ট্রাজিক সুর যেন বেজে ওঠে। আলোচনা কেন ভেস্তে যায় এ নিয়ে এক নিরবচ্ছিন্ন লাগাতার সেমিনার কেন যে হয় না তা নিয়ে বিলাপ করার অধিকার আছে কি?

বঙ্গীয় বণিকসভার নেতৃবৃন্দ যে পরিকল্পনাটি করেছিলেন তা বড়ই রমণীয় বললে কমই বলা হয়। পিয়ারলেস ইন থেকে প্রাতরাশ সেরে কিছুক্ষণ আড্ডা মস্করা ও বটকেরার পর ঠিক হয় যে বিশিষ্ট শিল্পপতিরা ব্যাটারিচালিত বাসে করে রাইটার্সে যাবেন। ব্যাটারিচালিত বাস এই বার্তাই

চারদিকে রটনা করবে যে পশ্চিমবঙ্গ দূষণমুক্ত শিল্পায়নের পথে আগুয়ান—চিমনি দিয়ে বিকট কালো ধোঁয়া ছেড়ে আবহমান বাংলার শকুন, চিল ও বকবার্ডদের বারোটা বাজানো হবে না, নির্মল জলে রাসায়নিক হুলিয়া জারি করে খলসে, তেচোখা ও পুঁটিমাছদের ঝাড়েগুষ্টিতে লোপাট বন্ধ থাকবে এবং আশা করা যায় যে বিকট গন্ধময় গ্যাস ছাড়ার যে অভ্যাস বাঙালি রপ্ত করেছে তাতেও কিছুটা ভাঁটা পড়বে। ভাগ্যে ব্যাপারটা মি. বিলিমোরিয়ার মাথায় খেলেছিল এবং তিনি তা মি. সেন বরাটকে কানে কানে বলেন। মি. সেন বরাট তখন মি. ন্যাওটাকে বললেন ব্যাপারটা। ব্যাটারি-বাস রাস্তায় যে কোনো সময় কেলিয়ে পড়তে পারে। তাই নিজ নিজ মোটরযানগুলিও যেন রেডি থাকে। ধন্য মি. বিলিমোরিয়ার সন্দেহ! শিল্পপতিদের দূরদৃষ্টি যে কত জোরালো তা পুনরায় প্রমাণিত। গ্রেট ইস্টার্নের সামনে হঠাৎ ঘঁক ঘঁক শব্দ করে ব্যাটারি-বাস কেলিয়ে পড়ল। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল। পুলিশরাই দলবেঁধে রাইটার্সের দিকে মিছিল করে কাউকে ক্যালাতে চলেছে বলে কেউ ভুলও করতে পারত। অতএব মি. ন্যাওটা গিয়ে নিজস্ব কোয়ালিস, মি. বিলিমোরিয়া নিজস্ব মার্সিডিজ ও মি. সেন বরাট নিজস্ব সিয়েলোতে উঠতে বাধ্য হলেন এবং এঁদের দেখাদেখি অন্যান্য শিল্পপতিরাও নিজের নিজের টাটা সুমো, ওপেল করসা, ভলভো, মারুতি সুপ্রিম, অ্যাম্বাসাডর ইত্যাদিতে উঠে পড়লেন। গাড়ি ও পুলিশের শোভাযাত্রা এগিয়ে গেল এবং দূষণমুক্ত ব্যাটারি-বাস পড়ে থাকল। দু'পাশেই উৎসাহী লোকেরা এসব দেখছিল ও মুখ খারাপ করছিল।

—কী রে, চড়বি ব্যাটারি-বাসে?

—বাল চড়বে। শালা চলেই না ধ্বজামাল।

—দাদা, কটা ব্যাটারি লাগে?

—আপনার মতোই দুটো।

—দিল তো, ট্র্যাফিকের গাঁড়টা মেরে। এমনিতেই বলে জাম্প লেগে আছে।

—পুরো বোক্‌চোদ কেস। পোঁদে নেই ইন্দি, ব্যাটারি মারাচ্ছে।

—ফাকিং শিট! হোয়াট ফাকিং মেস ইয়ার!

পাবলিক এসব বলবেই। বলুক। চলৎশক্তিহীন ব্যাটারি-বাসের কাছে ক্যালানের মতো দাঁড়িয়ে এইসব অসাধু মন্তব্য শুনে গেলে আমাদের চলবে না। মড়া যাদের ঘাড়ে তারা এগিয়ে যাবেই। যেমন আমরা।

সি. এমএর আগেই কমরেড আচার্যকে বলেছিলেন যে আলোচনায় তিনিও যেন থাকেন। কিন্তু কমরেড আচার্য গাঁইগুঁই করছিলেন।

—ও স্যার, ক্লাস এনিমিদের সঙ্গে কেন আমায় ডাকেন আপনি। ঐ সব ন্যাওটা ফ্যাওটা...জানেনেই তো। আমার অলমোস্ট অ্যালার্জিক রি-অ্যাকশন হয়।

—থামবে। ন্যাওটা কি গলদা চিংড়ি না ডিম যে তোমার অ্যালার্জি হবে। সব ব্যাপারে তোমার ঐ অর্থোডক্সি। এই করেই গেলে। কাল তুমি আলোচনায় থাকবে। আমার তোমাকে দরকার।

—ওবেলা তো আপনার সঙ্গে দেখা হবে। তখনই ফাইনাল করা যাবে।

—ওবেলা তোমার সঙ্গে আমি দেখা করব মানে? সে আবার কী?

—আহা, ওবেলা তো আপনি নাট্যোৎসব ইন'গুরেট করছেন।

—হোয়াট!

—নাট্যোৎসব। ড্রামা ফেস্টিভাল।

—ও হ্যাঁ, কিছুই মনে থাকে না আজকাল। নাটক-ফাটক কেন যে এসব ননসেন্স ব্যাপারে

pathagar.net

আমাকে জড়াও।

—তা বললে কী করে হয়।

—দ্যাখ। তোমাদের ঐ এখনকার ওসব দেখলে গা জ্বলে যায়। যে সব পারফরমেন্স দেখেছি...ওফ্। গিলগুডের হ্যামলেট। বুঝলে? তারপর গিয়ে অলিভিয়ার। এরপর ঐ স্টুপিডিটি—ইনটলারেবল। আমি যাব। ফিতে কাটব। ব্যস্...

—আজ্ঞে ফিতে কাটা নয়, প্রদীপ জ্বালাবেন।

—ওই হল, অল দা সেম। তারপরেই আমি আর নেই। নট পসিবল্।

দমাস করে রিসিভারটা রেখে দিলেন সি. এম। কমরেড আচার্যও বুঝলেন যে কোনোভাবেই আগামীকালের মিটিংটায় গরহাজির থাকা চলবে না। কোথায় পরিত্রাণ? কমরেড আচার্য দেওয়ালে কমরেড লেনিনের দিকে তাকালেন। লেনিনের ছবির পেছন থেকে ছোট সাইজের একটি টিকটিকি দেয়াল বেয়ে দৌড়োতে থাকল এবং জয়েন্ট টিকিটিকি তাকে তাড়া করতে লাগল। কমরেড আচার্য স্বগতোক্তি করলেন,

—ডিসকভারি চ্যানেল। একেবারে ডিসকভারি চ্যানেল? মার্ভেলাস।

রাইটার্সের তলায় যে কনস্টেবলরা থাকে তার মধ্যে একমাত্র নক্ষত্রনাথ হাওলাদারই লক্ষ করেছিল যে, ফুলের তোড়া হাতে যে শিল্পপতিরা বিচক্ষণ ও ভারালো পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে তাদের চোখ স্বাভাবিক নয়। প্রত্যেকেরই দুটি করে চোখ যা দেখছে তা দেখছে না, যা দেখা যায় না বা যাবে না সেদিকেই নিবদ্ধ। হাওলাদার তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল যে দিনের আলো ফুটল কি না ফুটল অমনি শুরু হল চুক্ চুক্ বিজনেস। হাওলাদারের সঙ্গে অধিকাংশ ঐতিহাসিকরাই একমত নন। তাঁদের মতে সেইদিন সকালে বাংলার শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতিরা যে যে লিকুইড খেয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল ত্রিফলা ডোবানো জল, চা, কফি, হরলিক্স, নিম্বু-পানি ও অ্যাপল জুস। ঐতিহাসিকরা হয়তো ঠিক কিন্তু আমাদের বিকৃত সহানুভূতি বারবার হাওলাদারের দিকেই হেলে পড়ছে। বাঙালির সত্যানুসন্ধান এইভাবে ইতিহাসেও বারবার কার্নিক খেয়ে গোঁত্তা মেরেছে। সবকিছু আমাদের হাতে নয়।

সি. এম-এর ঘরে সি. এম তো থাকবেনই, এছাড়া ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সচিব, কমরেড আচার্য, অর্থমন্ত্রী, শ্রমিক দপ্তরের মন্ত্রী এবং মৎস ও মুরগির মন্ত্রী যাঁর সঙ্গে কমরেড আচার্যের সম্পর্ক মোটেই সাবলীল নয়। আই. জি. আউট অফ স্টেশন। অ্যান্টি টেররিস্ট ব্যবস্থা স্টাডি করার জন্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। অতএব সি. এম আই. জি-র পরের অফিসারদের বাইপাস করে নগরপাল জোয়ারদারকে ডাকা করিয়ে নিয়েছেন। জোয়ারদারের মাথায় হেলমেট কারণ তা না হলে বিচ্ছিন্ন মাথাটি বৃন্তচ্যুত বাতাবি লেবুর মতো ধপ করে পড়ে ভীতিজনক বাতাবরণের সৃষ্টি করতেই পারে।

মি. বিলিমোরিয়া লাল গোলাপের তোড়া আলতো করে সি. এম-কে এগিয়ে দিলেন কারণ তলায় মোড়া রাংতা ফুঁড়ে কাঁটা বেরোচ্ছিল। জীবনে বহু গোলাপের তোড়া নিয়েছেন সি. এম। নিতে হবে ভাবলেই গা জ্বলে যায়, কিন্তু উপায় নেই। সেই হাসি তাঁর মুখে যা অতীতে কখনও হাসা আরম্ভ হয়েছিল এবং মাঝে মাঝে ফিরে আসে। এবারে তোড়াদান সারলেন মি. ন্যাওটা। তারপর সেন বরাট। পরপর সবাই তোড়া ধরবেন বলেই প্ল্যান ছিল কিন্তু পেছন থেকে জুট ব্যারন মি. ঢোলোকিয়ার বাজখাঁই কণ্ঠ ফেটে পড়ল,

—ওসব ফুল খেলা করিবার দিন আজ নয়, কবুল করুন যে মিলিট্যান্ট ওয়ার্কারদের উপর

দমদম বুলেট ফায়ারিং হোবে—দনাদ্দন, দনাদ্দন একটা লাশ পড়ল—ধপ—আউর ভি এক ধড়াস—লাশ—ফায়ারিং—দনাদ্দন—দনাদ্দন...

সি. এম বিস্মিত এবং হতবাক। জোয়ারদারের মুখ ফ্যাকাশে। কমরেড আচার্য গজরে উঠলেন,

—নো পাসারান, শান্তিপূর্ণ শ্রমিক আন্দোলনের ওপরে ফায়ারিং, এবং সেটাও দমদম বুলেট দিয়ে, আপনি কোথায় কাদের সঙ্গে কথা বলছেন জানেন মি. ঢোলোকিয়া?

মি. ঢোলোকিয়ার মুখে স্বর্গীয় হাসি। র-সিল্কের সাফারি সুটটিও যেন হাসির রঙে মাতোয়ারা।

—প্রপার্টি কি সমঝেন? প্রপার্টি হইল থেফট্। লেবর পাওয়ার হইল একটি পণ্য। ইহা মজুরীভোগী শ্রমিক ক্যাপিটালকে বিক্রয় করে। কেন করে? বাঁচিবার জন্য। তাহাকে আপনারা কতদিন বঞ্চিত করিবেন, কতদিন দাবাইবেন? জালিমশাহী নেহি চলেগা...

সমস্বরে অন্য পুঁজিপতিরাও হুঙ্কার ছাড়িলেন,

—নেহি চলেগা। নেহি চলেগা।

—তানাশাহী নেহি চলেগা!

—নেহি চলেগা। নেহি চলেগা।

অর্থমন্ত্রী উচ্চশিক্ষিত। মান্য ভাষা বাদে কিছুই তাঁর মুখে আসে না। সেই তিনিই বলিয়া ফেলিলেন,

—লে হালুয়া!

সি. এম বলেছিলেন,

—এসব জিনিস কী হচ্ছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

কমরেড আচার্য উসকোখুসকো চুল ঠিকঠাক করতে করতে বললেন,

—ভেরি স্ট্রেঞ্জ! উইয়ার্ড! বিজার!

মি. বিলিমোরিয়া সোবার কণ্ঠে বলিলেন,

—অহ্, মি. ঢোলোকিয়া, যা বলতে চান লজিক্যালি বলুন, শান্তভাবে বলুন, ভুলবেন না যে উই হ্যাভ গ্রেভ সোশাল রেসপনসিবিলিটি।

মি. ঢোলোকিয়া আড়চোখে মি. বিলিমোরিয়াকে দেখতে দেখতে হিস্ হিস্ করে উঠলেন।

—ব্লাডি ক্যাপিটালিস্ট পিগ!

সি. এম প্রায় বাধ্য হয়ে বলে উঠেছিলেন

—আহ্ মি. বিলিমোরিয়া, আলোচনা এগোক।

বিলিমোরিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল মহলে টি-ম্যাগনেট বলে সর্বজনবিদিত।

—দার্জিলিং অ্যান্ড সারাউন্ডিং থেকে যে রিপোর্ট আমি ডেলি পাচ্ছি স্যার তা খুবই অ্যালারমিং। ওয়ার্কাররা ইমপোর্টেড সব মেশিন, যেমন ধরুন ড্রাইং মেশিন সব ড্যামেজ করছে। ম্যানেজারদের কোনো ভয়েস নেই। প্রোডাকশন লেভেলে এত বেশি ডিসরাপশন নিয়ে কোন সাহসে আমরা বিগ এক্সপোর্ট অর্ডারগুলো অ্যাকসেপ্ট করব বলতে পারেন? মৎস্য ও মুরগির দপ্তরের মন্ত্রীটির বয়স কম। ফড় ফড় করে বলে ওঠেন—

—রাশিয়ানরা এখনও আপনাদের চা কিনছে? কাউন্টার রেভলিউশনের পর?

—কিনছে কিছু কিছু তবে আগের মতো নয়।

সি. এম ছোকরা-মন্ত্রীটির ওস্তাদি মোটেই রেলিশ করেননি।

—রাশিয়ানরা চা খেল কি না খেল উই কেয়ার আ ফিগ। ইরেলেভেনট কথা কেন যে বলো? মি. বিলিমোরিয়া, আপনি বলে যান...

pathagar.net

—বলছি স্যার, কিন্তু তার আগে আপনার ফিশ অ্যান চিকেন মিনিস্টারকে একটু এডুকেট করা দরকার। খুব তো রাশিয়ায় কাউন্টার রেভলিউশন মারাচ্ছ। রাশিয়ান রেভলিউশনারি স্ট্রাগলের হিস্ট্রি জানো?

—জানি বলেই তো শুনতে পাই।

—একটি থাবড়া মারব টি-ব্যাগের মধ্যে ঢুকে যাবে। ক্যাপিটালিজমের ডেঞ্জার ইন রাশিয়া কে প্রথম বুঝেছিল বলতে পারবে?

—লেনিন।

—১৮৭৪ সালে লেনিন? চার বছরের বাচ্চা ছেলে। এই ডেঞ্জারটাকে হেরজেন বা বাকুনিন তেমন আমল দেয়নি। প্রথম এটা বুঝেছিল ৎকাচেভ—নাম জানো? জানো না। তাঁর চটজলদি বিপ্লবের আহ্বান নিয়ে এঙ্গেলস-এর সঙ্গে ডিবেট পড়েছ? ঐ ৎকাচেভ-এর সঙ্গে প্লেখানভকেও তর্কযুদ্ধে নামাতে হয়েছিল। কিন্তু যার যা ডিউ তাকে তো সেটা দিতে হবেই। দ্যাখ ছোকরা, ইতিহাস কিন্তু একটাই এবং সেটাই সত্যি। পড়, পড়, সব পড়। হাবভাব দেখে তো চ্যাংড়া ফক্কড় ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। যাইহোক, স্যার ফরোয়ার্ড মার্কেটস কমিশন যে ফিউচার্স ট্রেডিং করবে ভাবছে সে বিষয়ে...কয়েকজন শিল্পপতি চেঁচিয়ে উঠলেন,

—কমরেড ট্রটস্কি লাল সেলাম। লং লিভ দা রেড আর্মি।

—মাং রহা হায় হিন্দুস্তান

—লাল কিল্লা পর লাল নিশান।

মি. ন্যাওটা হঠাৎ বিকট চেঁচিয়ে গান ধরলেন,

—কালি কালি আঁখে
গোরে গোরে গাল...

সি. এম চেঁচিয়ে উঠলেন,

—রোগস্! স্টপ ইট। স্টপ! ফোর্স বুলাও।

জোয়ারদার, স্টুপিডের মতো দাঁড়িয়ে কী দেখছ? ফোর্স ডাকো। নিয়ে যাক এগুলোকে।

তখন সেন-বরাট ভরাট গলায় চেঁচাচ্ছেন,

—দুনিয়ার পুঁজিপতি এক হও!

—এক হও! এক হও!

—শিল্পে সরকারি খবরদারি চলবে না!

—চলবে না! চলবে না!

—পুঁজিপতিদের কালো হাত!

—ভেঙে দাও! গুঁড়িয়ে দাও!

(চলবে)

pathagar.net

১৭

পাঠকপ্রবর, আজ অবধি কখনো শুনিয়াছ যে নভেল বলিয়া বাজারে যাহা চলে তাহা লঘু ত্রিপদী ছন্দে গান গাহিতেছে। ধরা যাউক যে 'কাঙাল মালসাট' একটি বালবিধবা হিন্দু যুবতী। আরো ধরা যাউক যে সারাদিন ধরিয়াই টপটপ আঁখিজলে বক্ষদেশ ভাসাইয়া সে বিকাল সন্ধ্যার সন্ধিলগ্নের সেই যাদুমণ্ডিত জিন, হুরি, গবলিন ইত্যাদির জাগরকালে গান ধরিয়াছে,

জানি না লো দিদি, কোন দোষে বিধি,
এই কুলাঙ্গার কুলে।
মোরে পাঠাইয়া, রাখিল গাঁথিয়া,
বিরহ বিশাল শূলে।

এইমতো ট্র্যাজিক অবস্থায় আসিয়া পড়িল 'কাঙাল মালসাট'। তাহাকে সাহারা দিবার কেহই নাই। থাকিলে সে এই গান না গাহিয়া হয়তো গাহিয়া উঠিত, 'মেরা নাম চিন চিনচু' বা 'হাওয়ামে উড়তা যায়ে'...কিন্তু উপায় কই? তাই সে কোনো ধর্মান্ধ রাম-খচড়া রচিত 'বিধবা-গঞ্জনা' নামক 'বিষাদ-ভাণ্ডার' হইতে ওই গানটাই কাঁদিয়া উঠিল। সরলা ও তরঙ্গিনী নামধারী দুই বিধবার বিলাপ ওই দুষ্প্রাপ্য ভাণ্ডারের পত্রে ছত্রে কান্না হইয়া ঝরিতেছে। 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-র সহিত এর কোনো যোগবিয়োগ নাই। যেমন নাই আনন্দবাজার পত্রিকার সহিত ওই পত্রিকাতেই প্রকাশিত যাদুকর আনন্দ-র বিজ্ঞাপনের যার মাধ্যমে তিনি 'বেঁটে মানুষ' চাহিয়াছিলেন। তবে আমাদের বিচারবুদ্ধির আর কতটুকু গাঁও এই জগতের ধন্দময়তায় দিশেহারা আমরা ভাবিতেছি যে বাজার সরকার, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, কোম্পানির সরকার—ইহারাই সর্বেসর্বা। ইহারাই গোদা। কিন্তু ইহাদেরও ওপরে অপারেট করিতেছে অন্য কোনো সরকার। তাহার কেচ্ছা শুরু করা হয়তো যায় কিন্তু শেষ করা যায় না। জাহাজের খবর। সে জাহাজই বা কেমন? জলজাহাজও নয় আবার উড়োজাহাজও নয়। তবে?

সি.এম-এর নির্দেশমতো ফোর্স এসেই বিশিষ্ট শিল্পপতিদের নিয়ে যায়। বলাই বাহুল্য যে এঁদের মতো মান্য ব্যক্তিদের লালবাজারের লক-আপে নিয়ে গিয়ে আড়ং ধোলাই দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সি.এম-এর বিচক্ষণ নেতৃত্বেই যা করার তা করা হয়। সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় রায়চকের হোটেল র‍্যাডিসন ফোর্টে। সেখানে এঁদের প্রথমে টপ টু বটম পরীক্ষা করেন স্বনামধন্য ডঃ ক্ষেত্রী। তিনি বললেন যে প্রত্যেকেই নরম্যাল। নরম্যাল পালস, নরম্যাল প্রেসার, নরম্যাল স্টুল, নরম্যাল ইউরিন। হতে পারে পাগলছাগল। কিন্তু সেটা ধরা ডঃ ক্ষেত্রীর আওতায় নয়। এরপর এলেন বঙ্গুর ইনস্টিটিউটের একটি বিশেষজ্ঞ দল। সঙ্গে চারজন বিশিষ্ট সাইক্রিয়াটিস্ট তাঁদের সঙ্গে নানাবিধ জটিল যন্ত্র। এলেন লাই ডিটেক্টর নিয়ে একজন মারাকু। এঁদের বাঁধভাঙা পরিশ্রমই এনে দিল সেই সাফল্য যার ফলে রহস্যের চাবিকাঠি ঘুরল বটে কিন্তু যা জানা গেল তা অতীব ভীতিজনক। সেই বিশাল রিপোর্ট পড়ে কারও পক্ষেই শেষ করা সম্ভব নয়। তাই ছোট করেই মালটা সাইজ করতে হবে। সি.এম-ও এই মর্মেই খিঁচিয়ে উঠেছিলেন,

—নো বিটিং অ্যাবাউট দা বুশ, নো ঝোপঝাড়, মোদ্দা ব্যাপারটা কী?

রিপোর্টের সারাৎসার হল, কোনো অজানা পদ্ধতিতে এক রাতের মধ্যেই এঁদের প্রত্যেকের মাথায় লোবোটমি করা হয়েছে এবং শুধু তাই নয়—এঁদের মাথায় যা থাকার কথা নয় সেইসব নানাধরনের র‍্যাডিকাল চিন্তা ও তথ্য, সাজেশন বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে এঁরা প্রত্যেককে দেখতে এক পিস করে হলেও এঁদের মধ্যে দুটি করে শিবির

সক্রিয়। একটি ক্যাপিটালিস্ট, অন্যটি বিপ্লবী বা ওই গোছেরই কিছু একটা—মার্কসবাদী, স্তালিনপন্থী, নৈরাজ্যবাদী বা অ্যানার্কো সিন্ডিকালিস্ট, ট্রটস্কিপন্থী বা বার্নস্টাইন মার্কা, দুবচেক-ঘেঁষা, টিটোপন্থী, মাওবাদী—নানা ধারাই রয়েছে।

কিন্তু লোবোটমি ব্যাপারটা কী?

মস্তিষ্কের মধ্যে অস্ত্রোপচার করে দুভাগে ভাগ করা দেওয়াই হল লোবোটমি বা লিউকেটমি। এঁদের করা হয়েছে প্রি-ফ্রন্টাল লোবোটমি। মস্তিষ্কের সামনের অংশগুলির নিজেদের মধ্যে ও তাদের সঙ্গে থ্যালামাসের যোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। চার-এর দশক ও পাঁচ-এর দশকের গোড়ায় ক্রিমিনালদের ঠাণ্ডা করার জন্য এই জাতীয় বিস্তর অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল মার্কিন দেশে। এখন প্রায় হয় না বললেই চলে কারণ অনেক জবরদস্ত ওষুধ বেরিয়েছে। এ বিষয়ে ডব্লিউ. এল. জোন্সের 'মিনিস্টারিং টু মাইন্ডস ডিজিজ্‌ড' (১৯৮৩) বইটিতে সব তথ্য দেওয়া আছে। এই বইটিতে যদি না মেটে সাধ তাহলে 'স্প্লিট্ ব্রেন রিসার্চ' সম্বন্ধে স্পেরি ও অর্নস্টেইন-এর কর্মকৃতিত্ব ঘাঁটা যেতে পারে। এঁরাই দেখেছিলেন যে এই অস্ত্রোপচার হয়েছে এমন এক স্বামীর আজব কারবার। ডানহাত দিয়ে তিনি বউকে কাছে টানছেন এবং বাঁ হাত দিয়ে দূর করে দেবার চেষ্টা করছেন। এটা অবশ্য মানতেই হবে যে লোবোটমি করা হয়নি এরকম বহু বাঙালিই অনুরূপ দ্বান্দ্বিক আচরণ করে থাকে। মিনসেদের এ জাতীয় খেলকুঁদ আজকাল আবার দার্শনিক তাৎপর্যও পায়। সবই নাকি গূঢ়তম কারণে ঘটে। সবই নাকি গভীর অসুখ। টোপাকুলের ডাল দিয়ে বেধড়ক চাবকালেই কিন্তু সবটা না হলেও অনেকটা ড্যামনাগিরি হাওয়া হয়ে যাবে।

যাহাই হউক, পাঠকের কি স্মরণে আছে যে পনেরো না ষোলো অধ্যায়ের অন্তে কী ঘটিয়াছিল? কোট করা যাউক—'...ভদির চাকতির ঘরের দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল এবং পূর্বে যেমনটি আমরা দেখিয়াছিলাম তেমন নয়, অজস্র অতি সূক্ষ্ম ও প্রায় স্বচ্ছ চাকতি বোঁ বোঁ শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল।' এবার কি আঁচ করা যাচ্ছে যে অতীব চুলচেরা লোবোটমি কাদের কাজ? এবারে কি বোঝা যায় যে গত পক্কড়ে গোলাপ 'সফল অপারেশন লোবোটমি' বলে কী বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। এর আগে আমরা বড় সাইজের চাকতিকে অক্লেশে ও বিনা রক্তপাতে মুণ্ডু, হাত, পা সবই আলাদা করতে দেখেছি। এবারে দেখা গেল ব্রেন অপারেশনের মতো ঝকমারি কাজও অধিকতর ফাইন চাকতি দিয়ে করা যায়। আরও ফাইন চাকতি হয় যা অদৃশ্য ও শব্দহীন। এরা স্বপ্নজগতের নানাবিধ কাটাছেঁড়া করে এমন কোলাজ বানাতে পারে যার সঙ্গে তুলনীয় কিছুই হতে পারে না। সর্ববিধ ছেদন ও বিভাজনে চাকতিদের অনায়াস দক্ষতা বিস্ময়কেও ছাপিয়ে ওঠে। আধুনিক জীবনধারার একটি গুরুতর বৈশিষ্ট্য হল চড়া আলোয় বসে কৃত্রিম উত্তাপের ওম প্রথম ও শেষ, আয়ত্ত বলে মনে করা। কফিনের মড়া যেমন ওই বাক্সটিকেই তার বিশ্রাম কক্ষ ও শেষ বাস্তবতা জেনে আরামে শয়নে থাকে। নিজের পচনও তার কাছে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু কাঠ পচে মাটিতে মিশছে, মাটি ছড়িয়ে রয়েছে জলে ও পাথরে, তার ওপরে নিরন্তর আছড়ে পড়ছে মহাজাগতিক রশ্মি ও এইসব নিয়ে এক আনন্দপৃক্ত সার্কাস, তার এই ধরা এই ছেড়ে দেওয়া ট্রাপিজ, এরই মধ্যে কোথাও কোথাও ক্লাউনের পোশাক পরে প্রতীক্ষায় থাকা লেখকদের আত্মা, ডিক্টেটারদের লৌহ-ভূত, নর্তকীদের সলাস্য ঘুরপাক ও নিবিষ্ট পোকাদের স্তম্ভিত গম্ভীর প্রেতজীবনে প্রবেশ ও প্রস্থান—এ কী এক আশ্চর্য প্রদত্ত নয়? এরই মধ্যে কি সেই সম্ভাবনা নেই যাকে আমরা এখনো শব্দে প্রকাশ করতে অপারগ? পণ্ডিত বা বিদগ্ধ বলে কিছুই নেই। আছে বিভিন্ন মাপের বোকা ও তারও বেশি বেশি কিছু।

এরই মধ্যে ভদির ভর হল। একদিকে রাজ্য সরকারের যুদ্ধ প্রস্তুতি, গুমটিতে গুমটিতে সাজো সাজো রব, জি. ও. সি-ইন সি. ইস্টার্ন কম্যান্ডের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব ও অপরপক্ষে সরখেলের কালান্তক গর্ত খোঁড়া, ফ্যাতাড়ুদের টুকটাক খুচরো হারামিপনা, বেগম জনসনের সঙ্গে বৃদ্ধ দাঁড়কাকের বুড়ো বয়সের রোমান্সজাতীয় কিছু আলগা হুঁ হুঁ, ভদি-ভক্তদের ক্রমবর্ধমান উদ্দীপনা, গোলাপের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স, কলকাতার সি. আই. এ, এম, আই ফাইভ, আই. এস. আই ও এস. আর. ভি দপ্তরে ধোঁয়া ধোঁয়া আকাঙ্ক্ষা—এই দুই বিপরীত ও আনুষঙ্গিক থার্ড পার্টি নড়নচড়নের মধ্যেই ভদির ভর হল।

ন্যাংটো ভদি তার একতলার ছাদে, আলসের ধারে দাঁড়িয়ে ভুঁড়ি চাপড়াতে চাপড়াতে নানারকম ভালগারিটির বন্যা বইয়ে দিতে লাগল যার মধ্যে অবশ্য কিছু অন্য কথাও ছিল। আমরা তার অসংলগ্ন ও অকথ্য সংলাপের মধ্যে যেটুকুমাত্র মান্য ও শালীন বলে ছাড়পত্র পেতে পারে সেগুলোই বরং জেনে নেব কারণ আধুনিক নভেলের একটি নভেলটি হল নানা তথ্যের একটি ঘাপলা তৈরি করা যার মধ্যে অধিকাংশই হল ফালতু গ্যাঁজা। অনেক সময় আবার তথ্যের বদলে এমনই একটি দার্শনিক দার্শনিকভাব করে নন-স্টপ গ্যাঁজানো চলতে থাকে যে এই ভাটানোকে মহামূল্যবান মনে করে অনেকেই বোমকে যায়। 'কাঙাল মালসাট' দু নৌকোতেই ঠ্যাং নাচাবে। ভাগ্যে যার সলিল-সমাধি সে অন্যরকমই বা করতে যাবে কেন?

ভদি ভরের বেশে বলেছিল,

(১) ওই কর...দিন নেই, রাত নেই, টিভির বাক্স খুলে মানষির পালের গাঁড়দুলুনি নাচ দ্যাখ্...হবিষ্যিও হবে না, মালসাও কেউ জলচুবুনি করবে না...গাঁড় দুলচে...আহারে আমার বাঙালির ঠাকুর্দার ঝাড় দুলচে...গেল্, রোল-মুরগি গেল্ আর ওই দ্যাখ্...থেকে থেকে হাওয়া খেলিয়ে নে, ফ্যান ছেড়ে হাওয়া খেলা, পেন্ডুল দুলচে ...ওরে আমার রাসবাড়ির ঝুলন রে ওমা, গোপালের মুখ আমার গরম দুধে পুড়ে লাল, হোল্ রেস, হোল রেস, হোল! হোল!...

(২) খলখলে করে দেবে গো, গরিবগুলোর গাঁড় মেরে একেবারে খলখলে করে দেবে, হাওদা করে দেবে...গরিবদের ওই ঠাটবাট সহ্য হচ্ছে না, গরিব যে আমার বেড়ালমামারে...এদিক ওদিক দুদিক চেয়ে চুমুক মারো দুধের বাটি...গওরমেন্ট দেখেচে গরিবের গাঁড়ে মধুর চাক...একেবারে ভূতোমোল্লার খাল করে ছেড়ে দেবে...সব আস্তানা দেদূর করে দেবে চোলাই-এর ভাঁড়, পাতিল সব লেথিয়ে ঝেঁটাবে, রেকটোলিকার...রেকটোলিকার...রাতবিরেতে ভিডিও-ভাড়া...রেকটো কিলার...রেকটোকিলার...

(৩) অ ঠুঁটো ঠুঁটো! ঘর খালি করে ঠুঁটো গেলি কোতায়?

ঠুঁটো হেঁকে বলে—গুণ্ডিচা বাড়ি গো, আমি এখন গুণ্ডিচা বাড়ি।

হালুয়াভোগ! হালুয়াভোগ! গবগবিয়ে ঘবঘবিয়ে হালুয়াভোগ! হালুয়াভোগ!

চার আনা পউয়া! চার আনা পউয়া। হালুয়াভোগ ; হালুয়াভোগ!

(৪) অ বাঁজা বউ! বাঁজা ব...উ! তোর কোল ভরবে কে? ফট্‌কেরাজা। ফট্‌কেরাজা কে? ফট্‌কেরাজা হল ভুক্কাড়। ফট্‌কেরাজা কী খায়? খই-মুড়কি আর লাইনকলের জল। লাইনকলের জলে কেমন ভাত হয়? সাদা, সাদা, ডাগরডোগর। ফট্‌কেরাজাকে মোহর দেবে কে? ভদি দেবে। ভদির বাঁজা বউ কী দেবে গো ফট্‌কেরাজাকে? ভদির বাঁজা বউ মাই দেবে। ফট্‌কে রাজার নুনুর ওপরে কালো কার দিয়ে ভুঁড়ি জড়িয়ে ওটা কী বাঁধা? ফুটোপয়সা। কী বাঁধা? আরে, এ যে দেকি কানফুটো মোহর? অ্যাঁ, ফট্‌কেরাজা মোহরধারী? হ্যাঁ। আর কী? ভদির বাঁজা বউয়ের বুকে ও দুটো কী গা? মাদার ডেয়ারির টোনাদুধের প্যাকেট! ধর শালা নলেনব্যাটাকে ধর্।

ধর্...ধর...নলেনগুয়োকে ধর্। কী হে বাবা হাঁড়িকচ্ছপ! ঘপৎ ঘপৎ করতেছো ক্যানো গো! বাবা হাঁড়িকচ্ছপ! যাঃ শালা! ফট্‌কেরাজা মুতে দিল!

ভদির বাবা বুড়ো দাঁড়কাক বেশ কিছুক্ষণ ভদির এই দাপাদাপি দেখে কলতলায় বসে লাইনকলের জলে ভালো করে ডানা ধুয়ে ঝটরপটর করে চান করল, করে বলল—বউমা, ব্রহ্মতালুতে একটু তেল দিয়ে দাও তো আমার। বেগম জনসন সোহাগ করে এমন ঘেঁটে দিল যে রোঁয়া সব খাড়া খাড়া হয়ে গেচে। সিঁথেটা কোথায় ঠাওর হচ্ছে না। তেল দিয়ে আলতো করে আঁচড়ে দাও। তোমার হাতে যা জোর।

নলেন উবু হয়ে বসে টগরগাছতলায় খুঁজে খুঁজে, টিপে টিপে একটা একটা করে পিঁপড়ে মারছিল আর ন্যাংটো ভদি বার বার ছাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠছে আর নামছে যেন দম দেওয়া জাম্বুবান। বেচামণি দণ্ডবায়সের মাথায় রোঁয়া আঁচড়াইয়া দিতে লাগিল।

—খুব আরাম হচ্ছে। কতদিন তেলজল পড়েনি।

—বাবা, একটা কতা বলি?

—বলো বউমা।

—এই, ভদির মাতায় ওটা কী ভূত চেপেছে?

—ও কিছু নয়, নেশু। কাল ছেড়ে যাবে।

—নেশু। এ ভূতের নাম তো এ বাড়িতে পা দেওয়া থেকে শুনিনি।

—কতা ওঠেনি। ও একটা বুড়ো ছিল। খুব খচ্চর। কালো ঠুলি পরত। সকাল থেকে নেশাভাঙ করত। সেই থেকে নাম হয়েছিল নেশু। তবে হ্যাঁ, ঘোড়ার খোঁজপত্তরের জন্যে লোকে আসত বলে ওর কাচে। বলত নেশু হচ্ছে রেসের ধন্বন্তরি। যে ঘোড়ার নাম বলবে টিপ লেগে যাবে। জ্যাকপট্ কুইনালা, ট্রিপল টোট, প্লেসিং—কত লোককে জিতিয়ে কাপ্তেন করে দিল। আর কিসের বদলে? দুটো পুরিয়া বা একটা বড় বোতল। নেশুর নামডাক যেমন ছিল তেমন আবার বদনাম, ওর ছেলেবয়েসের কেচ্চার জন্যে। ঝি বিয়ে করেছিল। বুকের পাটাও ছিল—আজ কতাটা লোকের মুকে মুকে ফেরে কিন্তু প্রথম বলেছিল নেশু—নিন্দে যখন রটেইচে তখন বিয়েই করব। এই সময়টা ওর একটু ভরের বাসনা হয়। তবে আধার কোতায় যে ভরবে? ভদিকে দিয়ে যা বোল বলাচ্চে তার মধ্যে কিন্তু এমন কতাও থাকবে জানবে তা তেরাত্তিরে না হলেও ফলবে ঠিক।

—কী হবে না হবে আপনি তো বাবা সবই জানেন।

—তা জানি। কিন্তু বলার উপায় যে নেই বউমা।

নলেন খচড়ার ডিম। দাঁড়কাককে খচানোর জন্যে আপন মনে বলে উঠল,

—ওফ্ জ্ঞানীগুণী সব হেগেমুতে দিল আর দাঁড়কাক হল ব্রহ্মজ্ঞানী!

—তোর মতো চোদনাবুলি না কপচালে ঘোর কলিটা জমবে কেমন করে। বুঝবি, টাইমে সব বুঝবি। তকন মামা বলে চ্যাঁচালেও কেউ আসবে না।

নলেন কম ঘোড়েল নয়।

—তুমি থাকতে মামাকে ডাকতে যাব। তোমাকে ডাকব। পারবে না এসে থাকতে?

উত্তরে দাঁড়কাকের মুখে সেই হাসির স্মিতরূপই ফুটে উঠল যা আমাদের বরাভয় সাপ্লাই দিয়ে চলেছে। প্রায়শই ফটো থেকে যদিও। দুনিয়া জুড়ে দুমদাড়াক্কা চলেছে। কিন্তু বাঙালি জীবন নির্বিকার। কারণ সে জানে যে তার বাড়িতে সর্ববিপদ রক্ষার জন্যে ফটো রয়েছে। এবং আগামীকাল সকালে আনন্দবাজার বেরোবেই। এই কেলো যে কতদিন চলবে তা বলার ক্ষমতা

pathagar.net

কোনো সুপার কমপিউটারেরও নেই।

বড়িলাল বড়বাজারে গিয়ে পাঁচটা পাপি-হাউস (কুকুরছানা থাবা দিয়ে টেনে নেয়), তিনটে ডিম পাড়তে পাড়তে চলা হাঁস-পুতুলের ফ্যামিলি এবং একটি হেলিকপ্টার কিনে নিল যা সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে ঘোরানো যায়, পাখা চলে আলো জ্বলে নেভে। এসব খেলনা সাপ্লাই হচ্ছে চীনেম্যান ল্যান্ড থেকে। খেলনা রপ্তানি বা পাচারের পেছনে ভারতীয় শিশুদের 'ক্যাচ দেম ইয়ং' পদ্ধতিতে কব্জা করার কোনো দুরভিসন্ধি আছে কিনা তা কেউ জানে না। কিন্তু বাঙালি যতই চীনেম্যান চ্যাংচুং মালাই কা ভ্যাট বলে আনন্দ পাক না কেন এটা কিন্তু প্রায় মান্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে চীনেম্যানরা হাসিমুখে কী ভাবছে তা বোঝা সহজ নয়। কাঠি দিয়ে তারা যে শুধু ভাতই খায় না তা সকলেই মুখে না বললেও টের পায়।

'কাঙাল মালসাট' যখন তার প্রাথমিক পাখসাট মারা শুরু করেছিল তখন প্রকাশ হয়ে পড়ে যে বড়িলালের নানাবিধ পোকা-পিঁপড়ে সম্বন্ধে এক জাতীয় ফোবিয়া রয়েছে। সেইমতোই সে মেঝেতে চারদিকে লক্ষ্মণরেখা দিয়ে দাগ কেটে মাঝখানে বিছানা করে ঘুমোচ্ছিল। চেতলা সাইড থেকে মৃদুমন্দ সেই বাতাস আসছিল যা বাঙালি দ্যাওরদের ঘুম কেড়ে নেয় ও ডোন্ট কেয়ার ভাব এনে দেয়। এতে বড়িলালের কিছু হবার কথা নয়। হয়ওনি। সে অকাতরে ঘুমোচ্ছিল এবং স্বপ্নলোকের ভারচুয়াল রিয়্যালিটিতে দেখছিল কালী ও তার সংসার-জীবন এতই গা-সওয়া হয়ে গেছে যে দুজনে কালীর ঘরের সামনের চাতালে উবু হয়ে বসে চাল বাচছে এবং রোদের তাড়া খেয়ে শুঁড়-ওলা পোকাগুলো তিড়তিড় করে পালাচ্ছে। বড়িলাল যখন বাজারে গিয়েছিল কালী তখন সেই ফাঁকে স্নানটান সেরে রেখেছে। এই কালী কখনোই খানকি ছিল না। চাতালেই বাঁশ পুঁতে, তাতে তার বেঁধে শুকোতে দেওয়া হয়েছে সদ্য ধোয়া বড়িলালের লাল ল্যাঙট। লাল ল্যাঙট, দে চাবি, চাবি না দিলে মার খাবি। এটি একটি দুরূহ ধাঁধা। পালোয়ানরা কেন যে নিজেদের মধ্যে অশালীন ইঙ্গিতবাহী এই ছড়া বলে অনাবিল আনন্দ পায় তা অজানাই থেকে গেল। দুজনেই চাল বাছা ছেড়ে গগনাভিমুখে তাকায়। দিনের ফটফটে আলোতেই ঘুড়ি-লন্টন উড়িয়েছে কারা। ওমা, ফানুসই বা ছাড়ল কে? তার মধ্যেই আবার উড়ন তুবড়ি টেস্টিং চলছে বলে ফিকে ধোঁয়ার দড়ি একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে। আকাশ জোড়া এক আনন্দ। ওই দ্যাখ মোমবাতি ঘুড়িতে কী লম্বা ল্যাজ। ঘুড়ি সুতো পেয়ে লাট মেরে এগোয় তো ল্যাজও মায়াবী রিবনের মতো খেলা দেখায়। এরমধ্যেই আবার পাশ কাটিয়ে উড়ছে কালো বক। এখান থেকে চিড়িয়াখানা আর কতটুকু আকাশ। কী সামান্যই এই ফুরসৎ। আকাশ দেখার।

কিন্তু সেই ফুরসতেই যা ঘটার ঘটল। ল্যাজের কাছে দপদপ করে লাল আলো জ্বলে উঠল। সাঁই সাঁই করে ঘুরতে লাগল ব্লেড। টয় হেলিকপ্টার ঘরে দুটো পাক মারল। তারপর জানলা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে উড়ে গেল। সেই রাতেই জোড়া মার্ডার সাইট থেকে ফিরে টাকলা ও. সি দুজন কনস্টেবলকে নিয়ে প্রোমোটারের দেওয়া ওল্ড স্মাগলার রাম পাঁইয়া হোটেলের টিকিয়া দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল। ও. সি-র ঘরে নোংরা তার থেকে ঝুলছে আধখানা বাল্ব। টিউবটা অকেজো। সেই ঘরের জানলা দিয়ে ঢুকল হেলিকপ্টার। ঢুকেই বাল্বের পাশে ঘন হয়ে পাক মারতে শুরু করল বলে দেওয়ালে বিদ্‌ঘুটে চলন্ত ছায়া দেখা গেল। ও. সি খচে গেল।

—মালটা একটু রিল্যাক্স করে খাব তা না বাঁড়া চামচিকের উৎপাত শুরু হল। ঝাড়তো ওই ব্যাটনটা দিয়ে ঝাড়।

এর উত্তরে হেলিকপ্টার নেমে টেবিলের ওপরে ল্যান্ড করল। আলো জ্বলছে নিভছে। পাখা ঘুরছে। একজন কনস্টেবল হাত বাড়াচ্ছিল কিন্তু ও. সি চিল্লে উঠল,

—হাত সরা। রিমোটে চালাচ্ছে। যে কোনো মোমেন্টে ফাটতে পারে। আমি যেমন করব তোরাও করবি। সাট করে মেঝেতে শুয়ে পড়। ঘরবার উড়ে গেলেও লাইফটা বেঁচে যাবে। জয় বাবা...

ধাড়াম করে চেয়ার উল্টোয়। কনস্টেবলরা উপুড় হয়ে শুয়ে হাত দিয়ে মাথা ঢাকে। লাঠিচার্জের সময় ভুক্কাড়রা এরকমই করে। হেলিকপ্টার টেবিলের ওপরে গড়াচ্ছে। ঠাশ করে বোতল পড়ল। উড়ছে। ব্লেডে লেগে বাল্বটা ফাটল। সারা ঘরে অন্ধকার। বোঁ বোঁ শব্দ। শব্দ নেই। সারাঘরে রামের গন্ধ। এক মিনিট কাটল। শব্দ নেই।

—মালটা বোধহয় উড়ে গেছে স্যার।

—সে তো আমারও মনে হচ্চে। কিন্তু ঘাপটি কেস নয় কে বলবে? আলোটাও নেই।

—আপনার ড্রয়ারে তো টর্চ আছে। বের করুন না স্যার।

—তাই করি। শালা, কী হ্যাপা মাইরি। ঘামিয়ে ছেড়ে দিল।

টর্চের আলোয় যা দেখা গেল তা এইরকম। হেলিকপ্টারের ধাক্কায় ওল্ড স্মাগলারের বোতল মায়ের ভোগে।

গেলাস উল্টে সব মাল ফাইলের কাগজফাগজ ভিজিয়ে জাব করে দিয়েছে। ছোট সাইজের একটা তছনছ করে হেলিকপ্টার ধাঁ।

—মালের পুঁটকিটা মেরে দিল। তবে ভাগ্য ভালো ফাটেনি। পিওর টেররিস্ট অ্যাটাক। একজন কনস্টেবল তড়িঘড়ি জানলা বন্ধ করে দেয়।

—ভালো করেচিস। কাল রিপোর্ট দিতে হবে লালবাজারে। আমরা কেন, গোটা থানাটাই বেঁচে গেল।

আরেকজন কনস্টেবল মোমবাতি জ্বালল।

—স্যার একটা কতা বলব?

—বল্। ঢ্যামনামি করচিস কেন?

—বলছিলাম যে ভালো মালটা তো ভণ্ডুল করে গেল। আমার স্টকে দুবোতল বাংলা আচে। আনব?

—অ্যাঁঃ বলিস কি? যা, যা, ঝটপট নিয়ে আয়। প্রাণটা বেঁচে গেল। এবার একটু আরামও পাবে। বাঁচালি মাইরি।

—আচ্ছা স্যার, ওইটুকু হেলিকপ্টার—ফাটলে কী হবে! বড়জোর চকলেট টাইপের...

—ওরে মুখ্যু, বাঞ্চৎরা আজকাল ওসব পেটো ফেটো ঝাড়ছে না। এইটুকু জেলি জেলি মাল। আর. ডি. এক্স.। সেমটেক্স। পুরো বাড়িটা ধসিয়ে দিয়ে চলে যাবে। দেখিস না, কাগজে দিচ্চে। দেখলি বাঁড়া ট্রানজিস্টার রেডিও। দিব্যি গান বাজচে। তুলেচো কি ফিনিশ। এই জানবি। আজ যা বাঁচা বেঁচে গেলুম তা আমিই জানি। বউদির মুখটা আর দেখতে হতো না।

এমন সময় ফোন বাজল।

—হ্যালো, হ্যাঁ, ও. সি বলচি। অ্যাঁঃ সন্ধেবেলা দুটো লাশ পড়ল। তাতে মেটেনি? কী? এপার ওপার বোমচার্জ করচে। করুক না। এতে যদি কয়েকটা মরে। কি হবে? যাব, দু রাউন্ড ফায়ার করব, থেমে যাবে। তার থেকে চলুক না। না মরলেও তো চোটফোট লাগবে। না। না। এখন ফের গিয়ে গাঁড় মারামারি আর ভালো লাগে না। ও কাল দেখবখন। এদিকে যা কেস হয়ে গেল শুনলে ভিরমি খেয়ে যাবে। একদিকে টেররিস্ট অ্যাটাক অন্যদিকে গ্যাংফাইট—একলা আমাকে দিয়ে অত বাঁড়া হবে না। না, না, বডি এখানে রাখতে যাব কেন?

পাঠিয়ে দিয়েচি। তোমার পাশে ওটা কে গ্যাঁও গ্যাঁও করচে। তাই বলো। এই হয়েচে এক বালের এফ. এম। দিন নেই, রাত নেই, ঢ্যামনামি চলচে। হ্যাঁ, ছাড়ো। অনেক ভাটিয়েচো। কী করচি? একটা মালের মিটিং বানচাল হয়ে গেল। আরেকটা অ্যারেঞ্জ করচি। ছাড়লুম।

বড়িলাল তখন কোনো স্বপ্নই দেখছিল না। অসাড়ে কাদা হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পুতুল হাঁসগুলো হঠাৎ দল বেঁধে প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে উঠল। দরজা খুলে বেরিয়ে কুকুরছানা একবার জোড়া থাবা দেখিয়ে ঢুকে গেল। জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকল হেলিকপ্টার। ঘরে একপাক উড়ে যেখানে রাখা ছিল অবিকল সেখানে গিয়ে ল্যান্ড করল। (চলবে)

১৮

এই ঘুঘুচক্করটি যে যুদ্ধের দিকে আগুয়ান বা নিন্দুকের মতো হাগুয়ান তা পাঠকরা বাদে সকলেই জানে। অর্থাৎ নানাবিধ পাখি, অমার্জিত মার্জার ও চাপাপড়া সারমেয়জগৎ—এখানেই শেষ নেই, শেষ কথা কার বাবা বলবে এখনো জানা যায়নি অতএব মাকড়দুনিয়া, মাইক্রোবমহল্লা ইত্যাদি নস্যপ্রায় অথচ নস্যাৎপ্রিয় নয়—তারাও রয়ে গেল। প্রবল বৃষ্টির আগে দেখা যায় কীটকলোনিতে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য। মানুষ তখন কিছুই বোঝে না। কিন্তু পরে এমনভাবে সাজে যে তার মতো বুঝদার কেউ নেই। এমতই হল হালের প্লটক। যে লেখা এখনো বাংলায় লেখা হয় (লেখক ইংরেজি জানে না বলেই) তা যদি ছোটবেলায় খেলে যাওয়া নুনু নুনু খেলার মতো সখসাধ্য না হয় তবে চেপে যাও। ওরে পাণ্ডু, সব লেখক বাঁধা মাসমাইনে, গায়ে গতরে শোধ হয়ে যাওয়া খুচরো হ্যান্ডবল, দুগ্‌গো পুজোয় মোটা ন্যাকড়ার পট্টি পয়দা বা লেখো বা না লেখো ফ্রি প্যাকেট (চব্বিশ পঁচিশ তারিখে তারিয়ে তারিয়ে একেবারে খোদ অ্যাকাউন্টেন্টের ঘর থেকে) না পেলেও রেকগনিশনের মাকে ট্রাম লাইনে ফেলে আটপয়সা সুদের তোয়াক্কা না করেও লেখে বা লেখার ভ্যানতাড়া করে। পাঠক চাঁদু, এগুলো বুঝবি কবে? সাহিত্য মড়া হলে তোদের হালকা করার জন্যে কামানো যেত। যেহেতু তোদের ওজন নেই, সিনা নেই, গ্র্যাভিটি নেই, আওকাৎ নেই তাই তোদের কামিয়ে পেডিগ্রিওলা রিয়্যাল অ্যাললেখকরা ব্লেড ভোঁতা করে না। ভারত ব্লেড/ইন্ডিয়া ব্লেড চকচক করবে। চুকলি চলবে। চাঁচাচাঁচি চলবে। আপাতত ওয়ার। ক্রস বর্ডার টেরো খিল্লি শেলিং শিলিং পাউন্ড ডলার—আঃ হোঃ, ওয়াহঃ, ভঁক্‌, পুঁই, পঁক—পোঁ—লিঃ লিঃ

( )

নিমকি, নিমকিছেনালি, ছকবাহাদুর ছবিলাল, ওয়ে ওয়ে, ওয়ে ওয়ে আঃ

(>)

খুল্লামখুল্লা, ওফ্‌ ডার্লিং, বাসনওয়ালী

(<)

উঃ কী দিলি

(Δ)

পিরামিডের এক পিঠ বা একমাত্রিক

অধ্যাস

(=)

ভাংড়াপন + সালসা + লম্ফঝম্প
বা
KM
কিলোমিটার বা কোঁকড়া মালাই নয়
তাহলে কী?
লে বুড্ডুয়া, ইয়ে হ্যায়
কাঙাল মালসাট

ইয়ে দিল মাঙ্গে মোর। এই বলেই ডি.এস-কে চমকাবে বলেই প্ল্যান করেছিল মদন বা পুরন্দর। তারপর কাজের কথা। কিন্তু উল্টে যে সিন তারা দেখল তা দেখলে পাবলিক সব চ্যানেলেরই পুড়কি উড়ে যাবে। ঘরের মধ্যে ডি.এস-এর বউ বাচ্চা খিলখিল হাসি সহযোগে উড়ছে এবং নেংটি পরা ডি. এস হাতের দশ আঙুলে দশটা হলদে কলকে ফুল পরে তাদের ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে তাড়া করছে। ডি. এস মুখেও দুটো কলকে ফুল ঢুকিয়েছে যাতে তাকে হলদে গজের দাঁতওয়ালা ড্র্যাকুলা বলেই মনে হচ্ছে। ডি. এস-এর ন্যাংটো ফ্যাতাড়ু বাচ্চা স্পেসে সাবলীল কসমোনটের মতো ভল্ট মারছে এবং এমন এমন অ্যাঙ্গেলে বাঁক নিচ্ছে যা দেখলে কোমানেচি জিমনাস্টিক ছেড়ে দিত। ডি. এস-এর মোটা, কালো কোলাব্যাঙ বউ নাইটি পরা এবং তার ওড়ার ধাঁচ অত সাহসী নয় কিন্তু যথেষ্ট খেলুড়ে—জলের গভীরে জব্বর কাতলারা যেমন হামেশাই করে থাকে। এবং এই দৃশ্যের সঙ্গেই চলেছে ডি. এস-এর ভৌতিক টিভি যাতে সবকিছুই চারটে করে দেখা যায়। তাতে তখন দেখা যাচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় চারজন সি.এম চারটি মাইক্রোফোনে একই কণ্ঠস্বরে চলচ্চিত্র উৎসবের সভায় ভাষণ দিচ্ছেন। তার পাশে চার পিস করে একই বুড়ো ফিল্ম ডিরেক্টর, সেই হিরো কিন্তু এখন বুড়ো ভাম এবং প্রাক্তন এক ভ্যাম্প, যার সবই গেছে অবশ্য ট্যারা চোখে ধ্যাবড়া করে কাজল দেওয়ার কামশাস্ত্রীয় হ্যাবিটটি বাদে। কিছুক্ষণ ধরে এই খেলা স্টাডি করার পর মদন ঘ্যাক্ করে উঠল,

—থামবে? তুমি থামবে।

ডি. এস অমনি সুর করে বলল,

—নারে নারে না।

—না এইভাবে কেউ যদি ডিসিপ্লিন ভাঙতেই থাকে তাহলে আমি অন্তত ডিউটি করতে পারব না। আজই ভদিদাকে বলে দেব—যে পারে পারুক, আমাকে দিয়ে হবে না।

ডি. এস যা করে না বলেই সবাই জানে সেটাই করে দেখিয়ে দিল। চাপানের জবাবে উতোর।

—ওসব ভদিদা ফাদিদা জানবে ডি. এস কেয়ার করে না। ভরদুপুরে পাঁঠার মাথার ঘুগনি ভাত মেরে ফ্যামিলি নিয়ে খেলা করচি তাতে ভদিদার কী? এখন খেলা জমে গেছে। থামানো যাবে না।

এতক্ষণ পুরন্দর ভাট কিছু না বলে মুচকি হাসি দিচ্ছিল। এবার চোখ বুজে ইনস্ট্যান্ট পোয়েমটি ছাড়ল।

ঘরের বাহিরে শত্রু খাড়া
ঘরের ভিতরে গরিব বাঁড়া
করিয়া হেলা মারিছে খেলা
সহসা ঘাড়েতে নামিবে খাঁড়া
মেঘের আড়ালে উড়িছে বোমারু

যুদ্ধজাহাজ—নাম পোঙামারু
তবুও ডাকিয়া মেলে না সাড়া
ঘরে বাহিরে শত্রু খাড়া

—সাবাশ! ভাট, সাবাশ! এরকম জ্বালাময়ী কিছু পোয়েম শুনলে যদি এদের টনক নড়ে। ঘেন্না ধরিয়ে দিল।

—ঢের হয়েচে বাবা, ঘাট হয়েচে। খেলা বন্ধ করচি। ড্যাং ড্যাং করে তো এক্ষুনি ভদিদাকে নালিশ করতে যাবে। তোমার আবার যা নিন্দেকুটে স্বভাব। ডি. এস হাতের আঙুল থেকে কলকে ফুল খুলতে খুলতে এই কথাগুলো বলল।

—নেহাত বউ-বাচ্চা সামনে তাই বেঁচে গেলে। যা হোক গুলি মার। মালমুল কিছু আচে স্টকে?

—বলব কেন?

—ফের ভ্যানতাড়া!

—আরে বাবা আচে। বের করচি। প্যাঁটরা থেকে হরিণের ছবি আঁকা গেলাসগুলো বের করতো। গেস্ট বলে কথা।

—ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে বাংলুফাংলু নয়।

—ওসব গরিবগুর্বো খায়। এটা পিওর কান্‌ট্রি মেড ফরেন। অফিসারস্ চয়েস্।

—ট্যাক্ বেশ গরম বলে মনে হচ্ছে।

—না, না। ট্যাক কোল্ড। এটা গিফ্‌ট। আমার শালাকে তো চেনো। পুরন্দর বোধহয় চেনে না।

—জনাকে চিনব না কেন? এই ঘরেই কত পোগ্রাম হল।

—ও সরি। জনা ব্যাটা করেছে কী এই বাজারে একটা বাগানবাড়ির দালালি লড়িয়ে দিয়েচে।

—হয়েচে! বিক্রি?

—হবে। আগাম কথা সব পাকা। সেই থেকে বলচে, জামাইবাবু, ওসব বাংলুমাংলু আর নয়। লিভার ড্যামেজ অনেক হয়েচে। এবার আমি ইংলিশ, তুমিও ইংলিশ, হাজার হলেও একটাই জামাই বাড়ির।

—দিল দরিয়া শালা পেয়েচ তো। লাকি চ্যাপ।

ডি. এস-এর বউ একঝাঁক সাদা দাঁত বের করে বলে উঠল,

—কার ভাই দেখতে হবে। সেটা তো কেউ বলচে না।

—বুঝেচি। খুব গেরমানি হয়েচে। ঘুগনি একটু বেঁচেছে না? দাও না। ভালো চাট হবে। এবার বলো, কাজটা কী?

—বলচি। ছোট করে বললে ইংরিজিতে বলে এরিয়াল সার্ভে। কিন্তু দিনের আলোয় হবে না। সন্ধে অবদি মৌজ, তারপর, তারপর উড়িতে থাকিবে ফৌজ। কেমন মিলিয়ে দিলাম ভাট?

—হেভি। আসলে সকলেই কবি। এটাই আমি স্টাডি করে দেখলাম। যদিও উল্টোটাই বলা হয়। জে. দাস বলে একটা ছিটিয়াল পোয়েট ছিল। ওই বলেছিল। সেই থেকে চলচে।

—বাঙলি মানেই জানবে তোতা ঢ্যামনা। একবার যা শিখবে কপচেই চলবে, কপচেই চলবে। ভদিদা যে এত বড় একটার পর একটা রদ্দা ঝাড়চে কোনো ভাবগতিক দেখে টের পাচ্ছ?

—বরাবরই হারামি জাত। তায় এখন হাড়হারামি হয়ে উঠেচে। যাকগে, ও ব্যাঙের কেচ্ছা ছেড়ে মোটা করে ঢালো তো।

মাল ঢালা হয়। তাতে জল ঢালার বগ্‌বগ্ শব্দও হয়। ভাট আবার জোলোমাল খেতে ভয় পায়। বেশি হিসু হবে।

—আর না। আর না।

—অত কড়া খেও না। লিভারে জং ধরে যাবে।

—ভালো হবে। পোয়েটদের বেশিদিন বাঁচলেই বদনাম। ইয়াং থাকতে থাকতে টেঁসে গেলে সবাই বলে, আহা, মালটা যদি বাঁচত!

—আর বুড়ো হলে?

—হরিবল! ইস্কুলে পড়ানো হবে। রেজাল্ট হল ছোটবেলা থেকেই পাবলিক মালটার ওপরে খচতে থাকবে। বড় হলে আর টাচ করবে না।

—ওসব জ্ঞানমারানী ছেড়ে একটা ভালো পদ্য বলো তো। ওই গরিব বড়লোক—প্যাঁদাপেঁদি নয়।

—বলচি। একদিন দুপুরবেলা লেকের পুকুরপাড়ে বুঝলে, সে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর, অনেকক্ষণ ধরে একটা একলা মেয়েকে সাইজ করার ধান্দা করলাম। হল না। ঢেমনি মাগি। যেই বড়লোক এল মোটরগাড়ি বাগিয়ে অমনি দেখি ভেতরে ঢুকে গেল। আমিও বললাম শালী, দেখবি, তেতে মেতে লিখেই ফেললাম।

খুলিতেছে ছাতা, বক্র বাঁট
ফুটিতেছে ছাতি, ফাটিছে কাঠ
সহসা দেখিনু স্নানের ঘাট

জলকে চলিছে বধূর দল
দোলায়ে কলসী, নামায়ে ঢল
দেহবল্লরী কী উচ্ছল

দিল না, দিল না তৃষিতে বারি
চাতক চিনিল ঘাতক নারী
ধুতুরার বিষ মিশানো তাড়ি

রৌদ্রে ভাজিছে পুকুরঘাট
তপ্ত কাঁচিতে ছাঁটিছে ঝাঁট
খুলিতেছে ছাতা, বক্র বাঁট

কাব্যপাঠ শেষ। মদনকে বড়ই আনমনা দেখায়। বিকেল ঘনাচ্ছে। ভাট্ ছোট একটা চুমুক মেরে গলা ঝাড়ল। মদন ডি. এস-কে বলল,

—হাই থট্ রয়েচে। বুঝলে।

—আমি খালি ওই হারামি মাগিটার কথা ভাবচি। গলা টিপে দিতে হয়।

—আহাহা তা কেন? নো গলা টেপাটেপি! ভাট মনটা কেমন যেন ভিজে নেতিয়ে গেল। হেভি ধরেচ মুখটা। ব্যাঁকা বাঁটওয়ালা ছাতা খুলচে। লিখতে না পারলে কী হবে, ধরতাই, মেজাজ সব ফিল করি। বুঝলে। তবে যারা হার্টে হাফসোল খায়নি তারা ঠিক এ কবিতা বুঝবে না।

pathagar.net

—না বুঝল তো বয়েই গেল। আমার কাজ নামানো। নামিয়ে দিলাম। দুনিয়া যদি ছোল হয় আমার কিছু করার নেই।

ওদিকে ভদি ও সরখেলের মধ্যে তখন যা বাকবিনিময় হচ্ছিল তার ভারবেটিম প্রতিবেদন পেশ করা হল।

—দেদারে খালি জল উঠচে। বালতি বালতি তুলে বাইরে ঢালচি। কিন্তু জল।

—সে তো উঠবেই। পাশেই ওল্ড গ্যাঞ্জেস রিভার। জলের কালারটা দেখেচ?

—কালচে। আর ভেরি ব্যাড স্মেল।

—হবেই। কয়েকশো বছরের পচা মড়া, গু, কুকুর বেড়াল—তুমি কী ভেবেছিলে! প্যারিসের সেন্ট বেরোবে? না বাগদাদের আতর।

—দ্যাকো, তুমি হলে লিডার। তবুও বলচি কথাটা। বাগদাদ নিয়ে ঠাট্টা করো না। অত বোমফোম ঝাড়ল। তারপরেও ঠিক অ্যামেরিকার সঙ্গে তাল ঠুকচে।

—কতায় কতায় তোমারও সরখেল অত ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স্ টেনে আনলে চলে না।

—এইটাই তোমার বড় ভুল। নিজে যা করচ সেটা চাউর হয়ে গেলে দেখবে তুমিই তখন ইন্টারন্যাশনাল ফিগার। দুবেলা টিভির ক্যামেরা পোঁদে পোঁদে দৌড়োবে।

—বলচ? এমনটা হবে?

—না হয়ে যায়? যা প্ল্যান কষেচ দশটা প্ল্যানিং কমিশনের ঘটে কুলোত না।

দুজনের এই কথোপকথনের মধ্যেই বিকেল গড়ায়। আকাশে সেই প্রসিদ্ধ সোনালি রঙ পরতে পরতে অন্ধকারের দিকে ধাবমান। এই টাইমে ঝাঁক বেঁধে ক্রো, গুয়ে শালিখ, বকপাঁতি, হাঁড়িচাঁচা, স্নাইপ, পানকৌড়ি ইত্যাদি এশিয়ান বার্ডরা বাড়ি ফেরে। কবে থেকে যে এইভাবে অফিসের কাজ সেরে তারা ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরছে তা কেউই বলতে পারে না। কেউ আকাশে ইংরেজি ডব্লিউ-এর মতো দল সাজায়। কেউ সাজায় 'ভি'। আবার লোনলি একটি বার্ড বা ক্লান্ত দম্পতিও চোখে পড়ে। ভেবে সকলেই অবাক ও বোধহয় উদাস হতে পারে যে ব্রিটিশ আমলে বা তারও আগে, সেই পাল আমলেও এমনটি হতো। এ সম্বন্ধে হান্টার বা মজুমদার কোনো উল্লেখই করেননি। সিভিলিয়ানদের অনবদ্য স্মৃতিচারণে পাখি শিকার রয়েছে। কিন্তু পাখিদের এই নিত্য যাতায়াত সম্বন্ধে কোনো স্নিগ্ধ অবজারভেশন নেই। যাই হোক, পাখিদের সঙ্গে সঙ্গে তখন নানা সাইজের চাকতিও তাদের ঘরে ব্যাক্ করেছিল।

—টাইম হয়ে গেল।

—কীসের?

—আর ঠিক মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফ্যাতাড়ুরা টেক অফ করবে।

—কেন?

—এরিয়াল সার্ভে করতে। গোলাপ যে রিপোর্টগুলো দিচ্ছে সেগুলো নিয়ে আমার মনে কোনো আপত্তি সন্দেহ নেই কিন্তু তবু একবার দেখে নিতে চাই। এনিমি এখনো জানে না যে আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কম্যান্ড আচে। যখন জানতে পারবে তখন পাখি বহুদূরে উড়ে ভাগলবা।

—এক এক সময় ভাবনা হয় যে হঠাৎ তুমি এতবড় কাণ্ডটা ঘটাতে গেলে কেন? থই পাই না।

—পাবে কী করে। আমি কি নিজেও বুঝি। দ্যাখ, কোনোকিছুই আমাদের তাঁবে নেই। এই যে রহস্যময় বিজ্ঞাপন বেরোল আনন্দবাজারে—আমরা তো দিইনি। বাবা হয়তো জানেন। বেগম

pathagar.net

জনসনও জানতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু বলবে না। কেবল হেঁয়ালি করবে। দেড়শো বছর পর পর চাকতিবাজি হয়। কেন হয় কেউই জানে না। আমাদের সেই আদিপুরুষ, মানে আত্মারাম সরকারই বা এই ধুন্ধুমার লাগিয়ে দিয়ে কী চান? আমার ওপর যেমন যেমন আদেশ আসচে, আর্জি পাচ্ছি তেমন তেমন করে যাচ্ছি।

—খুবই হুড়ুমতাল কাণ্ড।

—হুড়ুমতাল বলে হুড়ুমতাল। জয় বাবা চাকতির জয়! জয় মা চাকতির জয়! শুধু কী চাই জানো? বরাভয়। আর কিছু নয়। ওইটুকু পেলেই এই লাইফটা কেটে যাবে।

—ওফ্ মাথায় যেন ঘোর লাগচে। এত বড় একটা কাণ্ড। তাতে সরখেলও খেলে যাচ্ছে।

—ভেবো না। যত ভাববে তত ঘোর বাড়বে। নলেন সেদিন একটা ছড়া কাটছিল। বেশ মনে ধরেচে।

—কেমন ছড়া শুনি!

—'যা ইচ্ছে তাই হোক, এবার পুজোয় চাই কোক।' বলো! আমরা স্রেফ কোকের জায়গা চাইচি বরাভয়।

—ঠিক! একেবারে ঠিক!

—এই হল কতা। অনেক সিরিয়াস আলোচনা হল আজ। মাল খাবে একটু?

—একটুই। এখনো ধন্দ লেগে আচে।

আকাশ থেকে লালবাজার বড়ই নরম্যাল চোখে মনে হয়। তা নয়। মদন বলে

—কী দেখচ ডি. এস?

—কী আবার নীল সাদা কাপড় শুকোচ্চে।

—বাল। ভালো করে দ্যাখ। র‍্যাফ টার্গেট শুটিং করচে।

—তাই তো!

—আরো ভালো করে দেখে রাখ। ওই মালটাকে চেনো?

—হাফ্ পাঞ্জাবি পরা?

—হ্যাঁ।

—ও কে?

—খান্‌কির ছেলে। নকশালদের উকুনবাছা করে মারত।

—ওরকম খোঁড়াচ্ছে কেন?

—স্ট্রোক্! চুৎমারানীর পক্ষাঘাত হয়ে ডানদিকটা পড়ে গেছে। জানলে?

—ঝাড়ব?

—কী?

—আমার পকেচে একটা দুশো-র বাটখারা আচে।

—এখনই নয়। বম্ব্ করার কোনো ইনস্ট্রাকশন নেই।

আরও ওপরে আকাশ থেকে খ্যাংরা কথা ভেসে আসে মেঘের বাষ্প ধরে ধরে,

—গুড! গুড!

মদন, ডি. এস্ ও পুরন্দর ভাট ওপরে তাকিয়ে দেখেছিল কালপুরুষকে আড়াল করে বিশাল ডানা ছড়িয়ে উড়ছে সেই প্রাকৃত দাঁড়কাক।

—ওঃ গড্ আপনি।

—হ্যাঁ রে বাঁড়া আমি। নীচে তাকা।

pathagar.net

চলচে!

—কী?

—লালবাজারে কুচকাওয়াজ!

—বুঝলে কী হচ্ছে!

—কুচকাওয়াজ!

—ল্যাওড়া! গভরমেন্ট ধন দাঁড়াচ্ছে কি না দেখচে। কেন করচে জানিস?

—কেন?

—গরিবের গাঁড় মারবে বলে।

পুরন্দর একেই ও.সি খেয়ে টং। সে বলল,

—আপনার রিডিং ভুল। এটা লেফটিস্ট গভরমেন্ট।

—ওসব ঢপ্ নিজে খেতে হলে খেও। দুনিয়া চালাচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আর ও লেফট্ মারাচ্চে।

—মানে? এই পুলিশ তো লেফট!

—ল্যাওড়া। যে মাইনে দেবে তার।

—চেপে যাও। আরগু কোরো না।

এই সাবধানবাণী ভাটের। কিন্তু ডি. এস অকুতোভয়।

—ওই বাড়িটাতে কী হচ্ছে? ওই যে আলো জ্বলচে?

—আনন্দবাজার ছাপা হচ্চে। আর কী জানিবে, বাঁড়া? কাল সাত লাখ বাঙালি এটা পড়েই সারাদিন বিচি চুলকোবে।

—সে না হয় হল। ওগুলো তবে কী?

—একই কেস। মিডিয়ার আলো। ইংলিশ, হিন্দি, বাংলা...

কিন্তু তারও তলায় ওই যে রোশনাই, ওগুলো কোন ঘটে ঢুকচে?

—চেল্লামেল্লি শুনতে পাচ্চি।

—উৎখাৎ চলচে। হটাবাহার। কলকাতা ছেড়ে ভাগো। যত বাঁড়া খালপাড়, ফুটপাথ দিওয়ানা সব ফোটো। ঝিংচ্যাক বাদে কিছু থাকবে না। ফোট্ শালা : চল, ও হকার ফকার রেন্ডিগেন্ডি কোই লাফড়াবাজি নেহি চলেগা—চল্—বুট্‌কা ঠোক্করসে চল্—বুলডগবাজারকা খিল্লিসে চল্—চলো হে—পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলিলেন—হে অপু। পথের কি কোনো শেষ আছে? চলো এগিয়ে যাই। চরৈবেতি! চরৈবেতি!

—হে বাপ! হে দাঁড়কাক!

—বলে যা!

—বর্ডার দিয়েও তো ঢুকচে।

—ঢুকচে তো। বাংলাদেশ থেকে ঢুকচে। তাড়া খাচ্চে আর ঢুকচে।

—কারা?

—আপাতত হিন্দু বাঙালি। পরে কী হবে আমি জানি কিন্তু বলব না। জমি কাড়ো। তাড়াও! ওদের নাম্বার কম। যদি উল্টো হয়ে যেত কেসটা তাহলে মোল্লারা তাড়া খেত।

—আর ওই যে হেভি আলোর ছর্‌রা। গানবাজনা।

—কবে আর হালচাল জানবি? ওখানে চলচে সাহিত্য উৎসব। সবসময় একটা না একটা বাওয়াল লেগে রয়েচে।

—সাহিত্য উৎসব! তাহলে অত পুলিশ!

পুরন্দরের এই বিস্ময় মদনের রাগের উদ্রেক ঘটায়।

—আরে বাবা, কোনো উৎসব, মায় বিয়েবাড়ি অবদি আজ আর মন্ত্রী ছাড়া হয়? মন্ত্রী মানেই পুলিশ।

দাঁড়কাক বলল,

—হেভি প্রিপারেশন। কলকাতায় যে হিস্টোরিক গাড়োয়ান ধর্মঘট হয়েছিল তখনো ব্রিটিশ পুলিশ এত গা ঘামায়নি?

—গাড়োয়ান ধর্মঘট? কই, শুনিনি তো।

—শুনবি কী করে? এখনকার ফুটো আঁতেলগুলো কিছু জানে? বলবখন একদিন সময় করে। হেভি গল্প। সব পুরনো আমলের কমিউনিস্টদের ব্যাপার। এখনকার এসব উটকোদের সঙ্গে মিলবে না।

প্রোমোটারদের সঙ্গে লোকাল লেভেলের লিডারদের সম্পর্ক ঠিক তেমন হওয়া উচিত তাই নিয়ে গোপন মিটিং-এ ভাষণের পয়েন্ট নোট করছিলেন কমরেড আচার্য। তাঁর টেবিলে বসেই। আঙুলের ফাঁদে জ্বলন্ত সিগারেটটি স্টাডি করতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর মনে হল যে, ক্যাপিটালিস্টরা কিন্তু কমোডিটিটা মোক্ষম বানায়। একবার তিনি অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে বানানো সিগারেট খেয়েছিলেন। যেমন বিদ্‌ঘুটে ধ্যাবড়া প্যাকেট তেমনই অখাদ্য মাল। জ্বালতেই মনে হয় ভিজে কাঠের গাদায় আগুন লেগেছে। হায় ব্রেজনেভ যাঁকে বাঁচাতে ওঝা অবদি ডাকা হয়েছিল। হায় গোরবাচেভ। রাজনীতির অ্যালকেমি বুঝতে গিয়ে নিজেই রহস্যপূর্ণ লিকুইডে হাওয়া হয়ে গেল। চটকা ভাঙার মতোই কাণ্ড। টেবিলের সামনে মিলিটারি টিউনিক পরা লোকটিকে কমরেড আচার্য ভালো করে চেনবার আগেই পাইপ থেকে জর্জিয়ান তামাকের ধোঁয়ায় সবকিছু আচ্ছন্ন।

—ক্যাপিটালটা পড়েছিস মন দিয়ে?

হ্যামলেটের বাপ বা ম্যাকবেথের ব্যাঙ্কোর মতোই স্তালিনের ভূতও সহসা ধাঁ!

বেগম জনসন তাঁর স্লেভ গার্লদের সঙ্গে বাগানে আন্ডারহ্যান্ড ক্রিকেট খেলছিলেন। বলটি গড়িয়ে গড়িয়ে ঝোপের পাশে গিয়ে থেমে গেল। বেগম জনসন ঝটপট শব্দ পেয়ে মান্ধাতার আমলের বটগাছটির দিকে তাকালেন।

ভূত নয়। বাদুড়। সারাদিন তারা উল্টো হয়ে ঝুলে হেগেলিয়ান বিশ্ব দর্শন করছিল। ঘনায়মান সন্ধ্যায় তারাই উড়ন্ত হয়ে মার্কসীয় পৃথিবীতে ফল পাকুড়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছে।

বেগম জনসন স্লেভ গার্লদের নিয়ে মকানের দিকে রওনা দিলেন। সেখানে ঘরে ঘরে মোমের আলো জ্বলছে। (চলবে)

১৯

বেচামনি যেভাবে ককিয়ে উঠল তাতে মনে হতে পারে বাংলা সিরিয়াল জমে উঠেছে কিন্তু তা নয়, ঘটনাটা 'কাঙাল মালসাট'-এর হাঁপ ওঠার টাইমের একটি আন্তরিক আর্তনাদ,

—এ কী করলে ঠাকুর! এই তোমার মনে ছিল...এত নিদয়া তুমি...ঠাকুর!

রিটায়ার্ড ফৌজি বল্লভ বক্সি তো হাঁকড়ে উঠেছিল,

—মার্শাল ভদি। হুকুম করেন তো কম্যান্ডো পাঠাই। ট্যাট্ ফর টিট! নেহি তো এনিমি আমাদের বলবে চুহা।

ভদির উঠোনময় কলরোল জাগ্রত হল,

—ডি. এস-এর রক্ত, হবে না তো ব্যর্থ।

—ডি. এস অমর রহে।

—অমর শহিদ ডি. এস যুগ যুগ জিও।

টিনের দরজায় ফুটোয় চোখ সাঁটা বড়িলাল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ডি. এস নেই। কুস্তিগির হলেও বুকের ভেতরটায় কেমন যেন এক নিংড়ে ওঠা ভাব...উঠোনে উদ্বেল শোকক্রন্দন...এবং মারাত্মক এই অবস্থায় ভদিও বুঝে উঠতে পারছিল না যে ঠিক কী করা উচিত তাই থেকে থেকে সে কুঁচকি চুলকোচ্ছিল আর আড়চোখে নজর রাখছিল বেচামণির দিকে —এই ক্যাচালের মধ্যে মাগি না আবার ফিটটিট হয়ে যায়।

এবং এই গোটা মায়ের ভোগের থালীর জন্যে যে দায়ী সে অর্থাৎ পুরন্দর ভাট দু একবার চিল্লামিল্লি থামাবার সাধু প্রচেষ্টা চালাবার চেষ্টা করেও মাথাটি বোম্ হয়ে যায় কারণ চারদিকে রোলারুলি চিৎকার, হেভি চ্যাঁও ভ্যাঁও...উপরন্তু নিজেরও ধুম নেশা...

ভদি তার শিষ্যবর্গের কাছে আশু ও অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের ব্যাপারে লেকচার দিচ্ছে তার মধ্যেই পুরন্দর, হেভি বাংলা চার্জ করা অবস্থায় ঢুকে হাঁউ মাঁউ করে ডুকরে উঠেছিল।

—বদিদা! ডি. এস খতম, হাজরা পার্কে পুলিশ অ্যাকশান!

—অ্যাঁঃ ফিনিশ্!

—পুরো। ঘিরে ফেলল!

—তারপর?

—ফিনিশ। আমি এসকেপ। দেখলাম দুটো ঠ্যাং, দুটো হ্যান্ড ধরে চ্যাংদোলা করে ভ্যানে তুলচে। বডি ভারি তো। তুলতে পারচে না। শেষ অবদি তুলল।

—মদন? মদন ছিল না?

—না। আমি আর ডি. এস।

ফের বেচামণির আর্ত আকুতি,

—ঠাকুর। এত নিঠুর তুমি! এত!

নলেনের নাদ,

—বউদি! বউদি!

এই করুণ দৃশ্যে আবদ্ধ না থেকে আমরা যদি রিমোটে চ্যানেল পাল্টে এই মোমেন্টে মদনকে ধরি তাহলে দেখব সে তার ঘরে গামছা পরে, উবু হয়ে বসে স্টোভের থেকে ভাতের হাঁড়ি নামাবে ফ্যান গালার জন্যে, কিন্তু কী দিয়ে হাঁড়ির কানা ধরবে, অতএব গিঁট খুলে সে গামছাটাই খুলে নিল, 'কাঙাল মালসাট'-এ রিমোটের বোতাম টিপে দিল, এটা কিন্তু জি-টিভি বা

আকাশ-বাংলা বা সনি-টিভি নয়, বি. বি. সি বা সি. এন. এন তো নয়ই, বরং, ধরা যাক কে. এম. টিভি—তাতেই দেখা যায় একটি বড়ই বড় লালবাড়ি। রাত্তির বেলা। উরিঃ সাঁটি চারদিকে বাড়ি। লালবাড়ি। কিন্তু কত বড় উঠোন রে বাবা! লে! সার দিয়ে গ্যাঁদাফুলের টব্। পেতলের ফলকে ফলকে নাম লেখা। পাঠক ভায়া, আমরা মুখোমুখি দাঁড়ালে, বাঁ দিকের মানে 'ইন' লেখা যে গেট দিয়ে ঢুকেছি সেটা দিয়ে লালবাজারে ঢোকে। বুঝলে? ঢুকে বাঁয়া সেকেন্ড বাড়িটাই হল ডিটেকটিভদের। তলায় তলায় ফুলপরী—বম্ব স্কোয়াড, হোমিসাইড...চলো...ডি. এস যাচ্ছে...আমরাও যাচ্ছি। এরপরে ডানদিক দিয়ে 'আউট' লেখা গেটটা দিয়ে বেরোনো যাবে কিনা এখনই বলা যাচ্ছে না। চলো...'কাঙাল মালসাট' খাবি যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু এখনও সাইজ হয়নি। ইভনিং আর একটু গড়াবে।

তার আগে একটা ছোট্ট ব্রেক্! ফেমাস সমালোচক পিশাচদমন পালের নাম কে না জানে? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এঁকে কেউ যেন কবি পি. ডি. পাল-এর সঙ্গে অভিন্ন বলে না ভেবে ফেলেন। পি. ডি. পাল সম্প্রতি একটি কবিতা সাইক্লো করে বিলি করেছেন যদিও সঙ্গত কারণেই কবিতাটি সাইক্লোন সৃষ্টি করতে পারেনি।

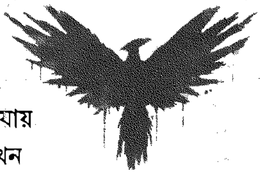

পি. ডি. পাল-এর সাইক্লো করা কবিতা—

নিউক্লিয়ার যুদ্ধে
বিশ্ব যেবার ধ্বংস হয়ে যায়
গোটা মানব সংসারই যখন
ছাই-এর গাদা
সব দেশ যখন শেষ
তারও পরে বেরিয়েছিল
শারদীয়া 'দেশ'
অপ্রকাশিত, এক আঁটি
রাণুকে ভানুদাদা

কবি পি. ডি পালকে ধিক্কার কে না দেবে? পিশাচদমন পাল কবি পি. ডি পাল হতে পারেন না। তিনি 'কাঙাল মালসাট'-এর শেষ অর্থাৎ অষ্টাদশতম পাঁয়তাড়াটি পড়ে টি.ভি-তে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—'ফাক্! আমি যদি জার্মান হতাম এবং 'কাঙাল মালসাট' ১৯৩০-৩১-৩২, কখনও জার্মানিতে প্রকাশিত হতো তাহলে আমি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি, পিশাচদমন পাল, সবার আগে গিয়ে নাজি পার্টির মেম্বার হতাম, এবং ১৯৩৩-এর ১০ মে ২০,০০০ বই পুড়িয়ে যে মেগা-ধামাকা হয়েছিল তাতে, উইদাউট ফেইল, 'কাঙাল মালসাট'-ও পোড়াতাম।' বলাই বাহুল্য যে পিশাচদমনের এই চমকপ্রদ উক্তির ভেতরে যে উস্কানির পুর দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে আমরা বেকার মাথা ঘামাবো না। এ বিষয়ে আমরা দলাই লামার উপদেশই মেনে চলব—যে যা বলে বলুক, ধরে নিতে হবে এসবই নাথু সংকটে তিব্বতী হাওয়ায় ফুসুরফুসুর। যাই হোক, ওই টিভি সাক্ষাৎকারের দিন পাঁচেক পরে, তাঁর এগারতলাস্থ ফ্ল্যাটের স্টাডিরুমে বসে পিশাচদমন পাল রিডিং ল্যাম্পের মোহিনী আলোয় মন দিয়ে পড়ছিলেন 'ডিকনস্ট্রাকশন ইন আ নাটশেল: আ কনভারসেসন উইথ জাক্ দেরিদা'—হঠাৎ শুনলেন জানলায় খচরমচর শব্দ। বিশাল এক দণ্ডবায়স এবং তার ঠোঁটে ধরা একটি জ্বলন্ত চুরুট। দাঁড়কাক ভুস করে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ল। পিশাচদমন হতবাক। দাঁড়কাক পায়ের নখে চুরুটটি ধরে রাখে। অল্প কাশে।

তারপর বলল,

—এরকমই হয়।

—মানে?

—মানে সব হারামিরই এরকম হয়। স্পেশালি তোর টাইপের।

—হোয়াট?

—ছোটবেলার ডাক নাম যারা ভুলে যায় তাদের তোর দশা হয়।

—তুইতোকারি?

—ভুলটা কোথায়? তোর বাপ্ মানে কালীয়দমন আমাকে দাদা ডাকত। সেই ব্যাটাই তো তোর ডাকনামটা দিয়েছিল। মনে আছে?

—স্ট্রেঞ্জ! বিজার!.

—ওসব ঢপের কেওন ছাড়? তোর ডাকনাম ছিল পেদো। সেটা ভুলে মেরে আল্‌বাল্ পড়ে ভাবচিস পার পেয়ে যাবি। এন্টার পাঁচপাবলিককে বলে দেব যে তোর নাম পেদো পাল। তখন বুঝবি। বোকাচোদা কোথাকার।

দাঁড়কাক ফ্লাই করিয়া চলিয়া গেল। চুরুটের গন্ধ। জানলার আলসেতে ন্যাড়ের মতো দেখতে চুরুটের ছাই। পিশাচদমন চাকরকে নীচে পাঠিয়েছিলেন সোডা আনতে। ওপরে ওঠার আগে সে লেটার বক্স থেকে চিঠি এনেছে। প্রতিটি খামের ওপরেই লেখা—পেদো পাল। পিশাচদমন ফিল করলেন তাঁর পা দুটো ক্রমেই আইস কোল্ড হয়ে যাচ্ছে। কোনো ভুল নেই। প্রত্যেকটা খামের ওপরেই সেই ডাকনাম উইথ পদবি—পেদো পাল, পেদো পাল!

'কাঙাল মালসাট'-এর ভাগ্যে সামান্য যে নন্-কমার্শিয়াল ব্রেকটুকু জুটেছিল তা শেষ হয়েছে। সেই সঙ্গে শেষেরও শুরু হয়েছে বলে দাবিও উঠেছে যদিও তা চটজলদি না মানলেও চলবে।

কমিশনারসাহেব জোয়ারদার। ছিন্ন মুণ্ড বসানোর হেলমেটটি নেই। মুন্ডু কাটা যাওয়ার পরে অনেক টাইম পেরিয়েছে। এন. আর. এস-এর ডোমদের সঙ্গে স্পেশাল কনসালটেন্সির মাধ্যমে চাঁদনি-তে অর্ডার দিয়ে একটি অ্যালুমিনিয়ামের হালকা কাঠামো বানানো হয়েছে যা মোটের ওপর হেডপিসটিকে ধড়ের সঙ্গে ধরে রাখতে পারে। স্লাইটলি খাঁচা ধাঁচের। তবে সুপ খাওয়ার সময়ে মাথা আর ঝুপ করে সুপের বোলের মধ্যে ডাইভ দেয় না। টাকা পয়সার টানাটানি থাকলেও এই কনট্র্যাপশনটির খরচ বহন করেছে রাইটার্স। প্রথমে শোনা গিয়েছিল সরকার খরচ দেবে না। জোয়ারদার খচে গিয়ে বলেছিল,

—অন-ডিউটি বিহেডেড হলাম। সেটা যদি কনসিডার না করে তাহলে ওই হেলমেট দিয়েই চালিয়ে নেব। আর তো দুটো বছরের মামলা। এরপর শান্তিনিকেতনের বাড়িতে যখন দোলনায় বসে বসে সুইং করবো তখন তো ফ্রি অ্যাজ আ বার্ড। মাথাটা না হয় পাশে মোড়ার ওপরে রেখে দেব।

ললিতা জোয়ারদার বলেছিলেন,

—পরের কথা পরে। এখন ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। তোমার দোলনা চড়ার যেমন প্ল্যান আমারও একটা আছে।

—কী? বাগান?

—বাগান তো চাকররাই করতে পারে। ভাবছি একটা এন. জি. ও খুলব। সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করব। ব্ল্যাকস্! পুওর নিগারস্।

—এক একটা কথা বলো না শুনলে গা জ্বলে যায়। কোথায় শেষ কটা দিন টেগোরিয়ান অ্যামবিয়েন্স্ এনজয় করব। তা না, উনি চললেন সাঁওতাল ধরতে। সাঁওতাল কী তা জানো?

অসম্ভব ভায়োলেন্ট। যখন তখন ক্ষেপচুরিয়াস হয়ে ওঠে! ...বরাবরই এরা এরকম। রিড্...রিড্...সানতাল রেবেলিয়ন...মিস্টিরিয়াস ড্রাম বিট্স্, পয়জনড্ অ্যারো...ব্রিটিশদের অবদি হালুয়া টাইট হয়ে গিয়েছিল আর উনি কি না...

ডি. এস-এর কী হল সেটা এবার জানা যাক। অবশ্য তার আগে জেনে নিতে হবে কেন এমনটি হল। ক্যাপচার তো পরের মামলা।

পুরন্দর সেই বিকেলে যখন ডি. এস-এর সঙ্গে জগুবাবুর বাজারের সামনে দেখা করে তখন থেকেই দেখেছিল ডি. এস-এর মেজাজ বেশ খাট্টা। ফুটপাথের ফলের দোকানের সামনে হোঁচট খেয়ে ফলওয়ালির সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। পানের দোকানে লোকটা অর্ডারি পান সাজছিল বলে পাঁচটা ছোট চারমিনার দিতে দেরি হওয়ায় ঝামেলা পাকাল।

—বড়লোকের অর্ডার বলে গাঁড়ে রস হয়েচে, না? পানের দোকানের লোকটা চালু মাল। না শোনার ভান্ করে চেপে গেল। ওখানে ডি. এস-কে ধরে প্যাঁদানো তার কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু পাকা ব্যবসাদাররা খুচরো ঝুটক্যাচালে কখনও যায় না। সেখান থেকে ওরা গেল গাঁজা পার্কের বাংলুর ঠেকে। ভেতরে হেভি ভিড়। সবসময়েই থাকে। আর বেশিরভাগ খদ্দেরই পাঞ্জাবি। ইয়া ইয়া আড়া। ঠেলেঠুলে কাউন্টারে যাও, পয়সা জমা করে গেলাস নাও, বসার জায়গা না পেলে যে কোনো ঘাপচি ঘুপচি দেখে উবু হয়ে বসে যাও—এক কথায় বিস্তর হাল্লাক।

—মদনদার কেসটা কী বলো তো! আসচে না দুদিন হয়ে গেল।

—কি জানি! ভদিদা হয়তো কোনো ডিউটি দিয়েচে। বলা বোধহয় বারণ।

—তা হবে। তবে গত বছরও এই টাইমটা দেখেছিলাম মদনদা কেমন মন মরা মন মরা ভাব। মনে হয় এমন টাইমে ওর বউ পালিয়েছিল।

পুরন্দর কোনো জবাব দেয় না। বাংলার গ্লাসে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সাবজেক্টটা নিয়ে পুরন্দর ঘাঁটাতে ইচ্ছুক নয়। তাই সে অন্য কথা পাড়ে,

—অনেকদিন তোমার বাচ্চাকে দেখিনি। কত বড় হল মালটা?

—সাইজে বাড়চে কম। তবে খুব হারামি।

—কার পয়দা দেখতে হবে তো। পাঁইটটা জমলোনা। কি বলো?

—একটা পাঁইট, দুজনে জমে? শুনলে লোক হাসবে। যাই, আর একটা নিয়ে আসি।

ডি. এস পাঁইট আনতে গেল। পুরন্দর ভাবছিল মাল যখন ধরেছিল তখন একটা ফাইলেই কেমন মজে যেত। একটা কবিতার প্রথম লাইনটা ঝিলিকও দিয়েছিল—'খুললে বন্ধ হবে, এ ফাইল সে ফাইল নয়'। কিন্তু আর এগোনো গেল না। ভেতরে মানে কাউন্টারের দিকে বাওয়াল। বাওয়ালের মধ্যে ডি. এস-এর গর্জন! পুরন্দর তড়িঘড়ি উঠে সেই দিকে গেল। পুরো কেলো। ঘিয়ে রঙের ঝোলা ফুল সার্ট আর ধুতি পরার সঙ্গে ডি. এস-এর লেগে গেছে। কাউন্টার থেকে মাল নিয়ে ব্যাক করার সময় ধাক্কা লেগে গেছে। লোকটাকে দেখেই পুরন্দর ধরতে পেরেছে—প্লেন ড্রেসে কনস্টেবল। বিহারী মাল। যেমন আড়া তেমনই বহর। অন্যরা ছাড়াচ্ছে, সে বলছে,

—দেখলেন তো, পহেলা হাত চালিয়ে দিল! শুনেন ফির ভি খিস্তি বানাচ্চে।

—স্রেফ তো হাত চলেচে। এরপর আর হাতফাত নয়, মেশিন চলবে—দনাদ্দন্, দনাদ্দন্!

—শালা পুলিশকা উপ্পর মেশিন। ছাড়িয়ে দিন, মালটাকে থানায় লিয়া যাই। আচ্ছাসে বানাই।

—উঃ পুলিশ দেখাচ্চে। পুলিশের আমরা ঘাড়ে হাগি! বানাচ্চে। উল্টে বানিয়ে দেব। হালুয়া

জান্‌তা? হালুয়া!

ক্রমেই ইন্টারেস্টিং হয়ে ওঠা এই ঝামেলার থেকে ডি. এস-কে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে পুরন্দর। ডি. এস ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে, ঘামছে।

—ফালতু বাওয়ালে জড়িয়ে ফায়দা আচে কিছু? কোতায় মাল টানবো, ধুনকি ধরে কেটে পড়বো—ছাড়োতো।

—হাত চালাতাম না। বাঞ্চোৎটা ঘপ করে কলারটা ধরল বলেই তো...

গাঁজা পার্কে রেলিং, মানে মোতাগলির দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ওরা পরে কেনা পাঁইটটা ভাগাভাগি করে খেয়েছিল। সঙ্গে চিংড়ির বড়া। এইসা ঝাল যে দুজনেরই হেঁচকি উঠতে থাকে। এরপর ওরা হাঁটতে শুরু করেছিল বড় রাস্তা ধরে, বাঁদিকে।

এদিকে পুলিশের ওপরে তো কড়া ইনস্ট্রাকশন ছিল যে চাকতি কোম্পানির মাল দেখলেই সাইজ করার। ঘিয়ে ফুল শার্টের ঘোর সন্দেহ হল যে দনাদ্দন্ দনাদ্দন্ মেশিন চালাবার থ্রেট যে দিতে পারে সে এলিতেলি নয়। বলা যায় না। নাট্‌কা মালটাকে ক্যাপচার করার জন্যেই হয়তো অ্যাওয়ার্ড ফ্যাওয়ার্ড জুটে যেতে পারে। অতএব ঘিয়ে ফুল শার্ট উলটো ফুট দিয়ে ডি. এস আর পুরন্দর ভাটকে ফলো করতে শুরু করে। ওদিকে ডি. এস-ও তখন যে কোনো সময়ে ফলো অন্ হয়ে যাওয়ার অবস্থায় যা ইন্ডিয়ার ক্রিকেট দল প্রায়শই এড়াতে পারে না। এর মধ্যে, যেটা ঘটেছিল সেটা হল সরকারি গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতা। একদিকে যেমন লড়াই-এর প্রস্তুতি (গেরিলা অথবা পোজিশনাল কায়দায়) অন্যদিকে দেদারে ইনটেলিজেন্ট গ্যাদারিং। এ বিষয়ে স্পেশাল কিছু কোডও চালু করা হয়। ডি. এস আর পুরন্দর চক্রবেড়ের ঘোড়ার গাড়ির আড্ডার মোড় পেরোল। দুজনেই তখন জিগজ্যাগ ধাঁচে চলছে ফলে বাংলা সিনেমা দেখে বেরনো মেয়েরা সভয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। অতীতেও এরকম হতো। এই ফুটপাথ ধরেই সুর ভাঁজতে ভাঁজতে হেঁটেছিল সাইগল, রবীন মজুমদার—আর সেই ফুটেই চলেছে ডি. এস আর পুরন্দর ভাট। এরই ফাঁকে ঘিয়ে ফুল শার্ট পকেট থেকে পাস বের করে দেখিয়ে একটা ভ্যাঁটকামুখো লোকের মোটোরোলা মোবাইল থেকে ফোন করেছিল ভবানীপুর থানায়, কোড ল্যাঙ্গুয়েজ জানা গেল এবার,

—হুঁ...অঁ...হ্যালো।

—মুকন্দর?

—সিকান্দর।

—ছপ্পর পর কৌয়া নাচে...

—নাচে বগুলা...

মেসেজ দিয়ে ঘিরে ফুল শার্ট ভ্যাঁটকামুখো লোকটাকে বলল,

—কিছু শুনেন নাই তো!

—না। ওই কি ছপ্পড় টপ্পড়।

—ভুলিয়ে যান। চুপচাপ চালিয়ে যান। দিনকাল বহোৎ খারাব আছে।

ভ্যাঁটকা আর ট্যাঁ ফুঁ না করে ফেটে গেল।

ওরা পূর্ণ সিনেমার মোড় পেরোল।

পুরন্দর ভাট বলল,

—চপ খাবে? একটু বাঁ দিকে হেভি সব ভাজে, কাটলেট...

—কঁক্।

—আর একদিন বরং খাওয়া যাবে।

—অঁক্!

—বমি পাচ্চে?

ডি. এস হেসে মাথা ঘুরিয়ে জানাল—না। তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে বলল

—ধু ... ন ... কি। ধু ... ন ... কি!

এরপর ডি. এস কয়েক পা করে এগোয় আর দাঁড়িয়ে যায়।

—র মালটা কেন যে মারতে গেলে...

ডি. এস টলে, সামলায়, ফের টলে,

—ওসব র ফ-তে ডি. এস-এর ... জা ... ন ... বে কিচু হয় না।

—সে তো জানি। ডি. এস বলে কথা।

ওরা ক্যানসার হাসপাতালের ফুটে। শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের খাবারের গন্ধ পেছনে। ঠিক এই সময়ে ক. পু. লেখা ভ্যানটা ফুট ঘেঁষে থামাল, হুইস্‌ল্ এর শব্দ, দুদ্দাড় দৌড়। কোত্থেকে পায় জোর পেয়ে গেল পুরন্দর, ডাইনে বাঁয় টলমলে দুটো আলতো ভাঁজ রোনাল্ডোর স্টাইলে তারপরে উইথ বল খিঁচে দৌড়। পাবলিকও ধুড়। তারাও হুটপাট, আনতাবড়ি দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দেয়। ডি. এস ধরা পড়েও ঝটকাঝটকি করে। এর পরের ঘটনা আমাদের জানা।

ভদির উঠোনে চিৎকার চেঁচামেচি এমন তুঙ্গে উঠতে থাকে যে ভদি দেখল উত্তেজনা সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। পুরন্দর উড়ে গিয়ে মদনকে খবর দিয়েছে। মদন উত্তেজিত অবস্থায় দাঁত না পরেই চলে এসেছে। বেচামণি মাঝেমধ্যে, গুমরানোর ফাঁকে ফাঁকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি বলছে। রিটায়ার্ড মেজর বল্লভ বক্সি 'চার্জ! চার্জ!' বলে হুঙ্কার দিচ্ছেন। নলেন একটি টিনের লগবগে খাঁড়া নিয়ে লাফাচ্ছে। পাঠকের নিশ্চয় স্মরণে আছে যে এই খাঁড়া দিয়েই একদা ফ্যাতাড়ু তিনজনকে বলি দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছিল। এরকম অবস্থাতেই নেতৃত্বের হাত বদল হয়ে থাকে। অন্তত ইতিহাস তাই বলে। এক্ষেত্রেও সেটা ঘটল। কিন্তু সাময়িকভাবে। হঠাৎ শোনা গেল গুমরানো নয়, বিড় বিড়ও নয়, বেচামণি খিলখিলিয়ে হাসছে। ভদি রেগে মেগে বলে উঠেছিল,

—একেনে কি রগড় হচ্ছে না বটকেরা? নলেন তোর বউদির মাতাটা কি একেবারে গেচে?

বেচামণি সলজ্জ হাসিয়া ঘোমটা টানিল। সেইসহ মাজায় ছোট্ট একটু ঝাঁকুনি।

—আর চিন্তা নেই। বাবা আসচে।

সত্যি, সেই সময় দাঁড়কাক না এলে 'কাঙাল মালসাট' হয়তো বিয়োগান্ত এক সিরিয়াল গাথা হিসেবেই অমর হয়ে থেকে যেত।

—বাবা! বাবা! সব্বোনাশ হয়ে গেছে! ডি. এস নেই।

সকলেই চুপচাপ। দাঁড়কাক খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে হেসে উঠল।

—সে কি বাবা। ডি. এস মরে গেল আর আপনি...?

—কেন, না হাসার হয়েচেটা কী? কি হয়েচে ডি. এস-এর?

—পুরন্দর সঙ্গে ছিল। হাজরা পার্কে পুলিশ অ্যাটাক্। ডি. এস কিলড্ ইন অ্যাকশন।

—বাল!

—মানে?

—বাল মানে বাল। পিউবিক হেয়ার। কোঁকড়া।

—মুখ খারাপ করচেন করুন তাবলে ইংরিজিতে...

—চোপ্। কিস্যু হয়নি ডি. এস-এর। আগে হাফ পাঁইট উইথ পানি তারপর এগেন টু থার্ডস পাঁইট উইদাউট পানি আর সোডা, কোক, পেপসি বগেরা বগেরা—এরপরে খোঁচোরের পেটে টিক্—প্রায় আউট হয়ে গিয়ে রাস্তায়—কি রে ব্যাটা পুরন্দর!

—বাবা!

—ভেবেছিলিস তোরাই আচিস, তোরাই খাচ্চিস, আর কেউ নেই?

—আপনি ছিলেন? কই দেখলুম না তো।

—ছিলাম শুধু তাই নয়, একা ছিলাম না। বেগম জনসনও ছিলেন। তবে সূক্ষ্ম দেহে। দেখবি কি করে?

—বলুন বাবা, বলুন। ধড়ে যেন লাইফ ফিরে এল।

—বলচি। নলেন, একটু জল আন তো। নো মাল পাঞ্চিং—পিওর পানি।

গেলাসে জল এল। দণ্ডবায়স চঞ্চুতে জল নিয়ে মাথা ওপরে ঝাড়ল তারপর এক পা এক পা করে ডুবিয়ে পা ধুল।

—ডি. এস-কে ওরা আউট অবস্থায় নিয়ে গেল প্রথমে ভবানীপুর থানা। সেখানকার ও.সি ব্যাটা খবর দিল লালবাজারে যে ভেরি ইমপরট্যান্ট মাল ক্যাপচার্ড। এখন তাকে নিয়ে গেছে লালবাজারে। কাটামুণ্ডু জোয়ারদার নাকি তাকে ইন্টারোগেট করবে।

এতক্ষণে ভদি একটু ধাতস্থ হয়েছে,

—লালবাজারে জেরা! কী করে কী হবে তাহলে?

—ওসব আমার ফিট্ করা হয়ে গেছে। আমি এক লাইনে ভাবছিলাম। কিন্তু বেগম জনসনের বাতলানো রাস্তাটাই দেখলাম ভালো। সব মিটে যাবে। ডি. এস ইজ সেফ অ্যান্ড সাউন্ড। তবে এখনও ধুনকিতে রয়েছে। থাকুক না।

ডি. এস-কে গাড়িতে তোলার পরে ভ্যানের তলাতেই শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিকট নাক ডাকার শব্দ। ভবানীপুরের ও. সি হটলাইনে জোয়ারদারকে বলেছিল,

—ওয়ান মাল কাট্ সার। বলছিল পুলিশের ওপর মেশিন চালাবে। দনাদ্দন্ দনাদ্দন্। আর একটা ছিল। এসকেপ্‌ড্।

—পকেটে কি ছিল? মেশিন মানে বামাল তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ সার। দেখেচি। নো বামাল। ওনলি চিরুনি।

—গুড। এখন কি করছে? তড়পাচ্ছে? না গাঁইগুঁই করছে?

—কিছুই না সার। মাল খেয়ে আউট।

—বলো কি? তাহলে তেমন ইমপরট্যান্ট এলিমেন্ট বলে মনে হয় না।

—না, না, সার। হেভি ইমপরট্যান্ট। দাম্ করে একটা ব্লো দিয়েছে আমাদের লোককে। পেটে।

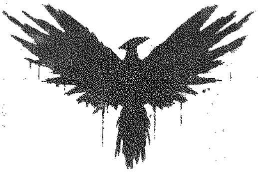

—আ ব্লো ইন দা বেলি?

—ইয়েস সার।

—বুঝেছি।

—কি সার?

—তোমার আর জেনে কাজ নেই। স্ট্রেট পাঠিয়ে দাও। বাকিটা আমি দেখছি।

ডি. এস যখন ভবানীপুর থেকে লালবাজারে চালান হয় তখন সেই ফাঁকে জোয়ারদার কমরেড আচার্যকে জানিয়ে দিলেন যে মিউটিনির একজন সাসপেক্ট পাকড়াও। কমরেড আচার্য

বললেন,

—বাঁচলাম। এই তাহলে শুরু হল।

—কী শুরু হল।

—মানে ধরা পড়া আর কি। আমি তো ভাবছিলাম আপনাদের যা হ্যাবিট সেই নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছন।

—কি যে বলেন সার।

—যাই হোক, কনগ্র্যাচুলেশন। এবার খাপাখাপ বাকিগুলোকেও ধরে ফেলুন। ল্যাটা চুকে যায়। তবে হ্যাঁ, সাবধান। কথা বের করতে গিয়ে এমন কিছু করে বসবেন না যাতে হিউম্যান রাইটস্ কমিশন আবার হাঁ হাঁ করে ওঠে।

—ওই এক ফ্যাকড়া হয়েছে সার। ধরব অথচ বানাতে পারব না। বলুন, এ করে পুলিশের কাজ চলে?

—যাই হোক, শুরু করে দিন তাহলে পেয়েই যখন গেছেন। কাল ডিটেলে শুনব। গুড নাইট।

—গুড নাইট!

এরপরে রাত যে কোন্‌দিকে মোড় নেবে সে সম্বন্ধে তিলমাত্র ধারণা থাকলেও কেউ এমন রাতকে গুড নাইট বলতে পারে না। যাইহোক, সে তো পরের ব্যাপার। এখন এইটুকু গাওনা গেয়ে রাখলেই চলবে যে '১৬' নং পকেটে আমরা ক্ষণিকের জন্যে হলেও লালবাজারের এক অকিঞ্চিৎকর কনস্টেবলের সন্ধান পেয়েছিলাম যার নাম হল নক্ষত্র নাথ হাওলাদার। এতক্ষণ সে সাতটা হাতি মিলে খেতে পারবে না এরকম উঁচু খড়ের গাদায় একটি সামান্য ছুঁচ হয়ে অবহেলা অপমান বহন করে পড়েছিল। নক্ষত্রনাথ হল স্লিপার, পায়ে পরার নয়, ঘুমন্ত অর্থে। এবার তার ঘুম ভাঙবে এবং চোক্তারি মায়ার স্পর্শে সে পরিণত হবে ফালে। তাহলে একটু খুলে বলতে হয় যে গোলাপের ফেরে পড়ে প্রথমে 'বিদ্রোহী' হয়ে ওঠেন তারকনাথ সাধু এবং তারপর তারকনাথ সাধুই নক্ষত্র নাথ হাওলাদারকে 'বিদ্রোহী' করে তোলেন। তারকনাথের খচে যাওয়ার কারণ ছিল কারণ তাঁকেই বলা হয়েছিল 'রোজ'-কে গ্রিল করতে। তিনি দেখেছিলেন যে এত বছরের বিশ্বস্ত যে গোলাম সেই হয়ে উঠেছে সন্দেহের টার্গেট। বলা যায় না তাঁকেও হয়তো ওরা টার্গেট করে ফেলবে যারা ফাইল ফেরৎ পাঠিয়েছিল 'বাল' ও 'পাগলাচোদা' জাতীয় অশ্রাব্য কথা মলাটে লিখে। হাওলাদারের ছিল সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা। 'সাধু' পদবীটিই তাকে ম্যাগনেটের মতো টেনেছিল। সেই সাধুবাবাই যখন লালবাজারের কাছেই একটি রেস্টুরেন্টে বসে হাওলাদারকে মামলেট আর টোস্ট খাওয়াতে খাওয়াতে ও খেতে খেতে বললেন,

—হাওলা, এই যে পুলিশের ঘর করে বাল পাকিয়ে ফেললে, কালই যদি টেররিস্ট বা ড্যাকইটের দানা খেয়ে ফুটে যাও ভেবেছ কোনো মামা চোখের জল ফেলবে? কাঁড়ারের কেসটা দেখলে? মালাফালা দিল, পুড়ে গেল, তারপর? ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে ঘুরছে। বউটার হাল দেখেছ?

হাওলাদারের জিগরি দোস্ত ছিল কাঁড়ার। তার চোখ জলে ভরে ওঠে এবং কপালের ভাঁজগুলো কাঁপতে থাকে।

—বশীরের বেলায় কি হল বলুন?

—ওফ্ বশীর। অমন একটা মানুষ। অমন তরতাজা। কেঁদো না। হাওলা। কান্নাকাটি ওই খানকির ছেলেরা অনেক দেখেছে। কাঁদলে হবে না। এদের দাওয়াই অন্য।

—আছে? দাওয়াই?

চ্যাংদোলা করে ডি. এস-কে লালবাজারে ঢোকানো হল।

ভদির উঠোন। সবাই চলে গেছে। দাঁড়কাক, ভদি, নলেন, বেচামণি, মদন, সরখেল, পুরন্দর ও মেজর বল্লভ বক্সি। দাঁড়কাক একটি কালো পাথরের বাটিতে ভরা জল একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখছিল ও বলে যাচ্ছিল,

—এই! এই! লালবাজারে ঢোকাচ্চে। বাসস্, ওই লাশ!

—বাবা! লাশ কেন বললেন? তবে কি?

—চাপ্। বাটি দেখার সময়ে ওসব নিমকিছেনালি? হ্যাঁ, লাশ! জিন্দা লাশ। এবার নিয়ে যাচ্চে। যাবে বাবা কোথায়? সেই তো জোয়ারদারের ঘরে।

যদিও এখানে ইন্টারকাটি পদ্ধতি লাগু তবু এটি কিন্তু সিনে-রোমাঁ নয়। জোয়ারদারের ঘর। কার্পেটের ওপরে ডি. এস-কে শুইয়ে দেওয়া হল। জোয়ারদার এক্সাইটেড।

—তুমি কে?

—আঁজ্ঞে, আমি হাওলাদার।

—গুড! গুড! বাইরে থাক।

—স্যার?

—অঁ?

—মাল টেনে আউট কিন্তুক ডেঞ্জেরাস্। আপনি একা দেখবেন?

—ওয়েল, মিঃ হাবিলদার, আই অ্যাম জোয়ারদার!

—ইয়েস সার।

নক্ষত্র নাথ হাওলাদার দরজার বাইরে দাঁড়ায় ও বিড়ি ধরায়।

দাঁড়কাক, পাথরের বাটির ভেতরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে,

—নড়চে! নড়চে!

কী নড়িতেছে পেভু?

প্রশ্নটি রিটায়ার্ড মেজর বক্সির।

—তোমার ওইটি! বক্‌রিচোদ্।

এই খিস্তিটি মেজর বক্সির মনে দাগ কাটায় তিনি মৌন হয়ে যান। মিলিটারির এই হল ধাঁচ। ন্যায্য খিস্তি তারা সংযতভাবে ভক্ষণ করে। আবার উল্টোটা হলে নল যে ঘুরিয়ে ধরে না এমনটাও বলা যাবে না।

ডি. এস প্রথমে ভেবেছিল সে হাজরা পার্কে ঘাসের ওপরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু হাজরা পার্ক তো ন্যাড়া। সেখানে আবার এত ঘাস কবে গজাল? এই ভাবনার মধ্যে জোয়ারদারের ইয়া বড় চেম্বারের কার্পেট তার কাছে বাড়ির বিছানা হয়ে গেল। আবার চোখে ঘোলা ঘোলা আলো, তার মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের খাঁচা পরা জোয়ারদারের মুখ, রুম ফ্রেশেনারের গন্ধ, এ. সি চলার শব্দ, এর মধ্যে আবার ফোন বাজল।

—হ্যালো...ফালতু কেন যে জ্বালাও...আই অ্যাম অন ক্রুশিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট...নিকুচি করেছে তোমার মাশরুম সুপের...হ্যাঁ, হ্যাঁ, একা একাই গেল অ্যান্ড ফর গড্স সেক্ এখন ডিসটার্ব করো না...হ্যাঁ রে বাবা, গুড নাইট...ঘুম পেয়ে গেছে তা ঘুমোও...গুড নাইট...উফ্—পেস্ট্! ধিঙ্গি মাগি...ন্যাকামি...হান্টার দিয়ে চাবকাতে হয়...

ডি. এস হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসেছিল, দেখল, জোয়ারদার, অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের মধ্যে

pathagar.net

মুণ্ডু, হাসছে,

—কাটল? নেশা! গন্ধটা বোধহয় কানট্রি লিকারের। তাই না?

ডি. এস এরপর টোটাল তিনটে ডায়ালগ দিয়েছিল। সেটা হতেই পারে কিন্তু তিনটি ডায়লগই কেন হিন্দিতে তা কখনও জানা যাবে না।

—কেয়া?

এর জবাবে জোয়ারদার কঠোর বা ইংরেজিতে যাকে বলে 'স্টার্ন' মেজাজে বলেছিল,

—কেয়া এক্ষুনি বুঝবে। মাল খেয়ে আউট, তার ওপর রোয়াব? এবারে ঝেড়ে কাশো তো—আমাদের কাছে যে ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট এসেছে তাতে রেবেলরা দুই পার্টির। চোক্তার অ্যান্ড ফ্যাতাড়ু। তুমি কোন্‌টা?

—পহলে মাল বুলাও!

—মানে? লালবাজারে বসে মাল খাবে? ইয়ার্কি দেওয়ার একটা লিমিট আছে। আর ইউ চোক্তার অর ফ্যাতাড়ু?

এইবার ডি. এস. তার নোংরা টেরিকটনের প্যান্টের জিপটা ধরে টানতে থাকে,

—মুতেগা কাঁহা?

ওদিকে দাঁড়কাক আনন্দে ডানা ঝাপটায়। বাকি সকলেই সোৎসাহে তার দিকে তাকিয়ে।

—সলিড্ জবাব। লে, কী বলবি বল্। বেশি তেড়িবেড়ি করলে কার্পেটেই দেবে ছন্‌ছন্ করে...চলবে...ডি. এস...ব্রাভো...

জোয়ারদার চেঁচায়,

—হাবিলদার! হাবিলদার!

হাওলাদার ঢোকে।

—সার!

—যাও! আসামীকে মুতিয়ে আনো। ধরে রাখবে। মালটা এসকেপ না করে।

—এখান থেকে পলায়ন। কী যে বলেন। চলেন...আপনাকে মুতিয়ে আনি, সাহেবের অর্ডার।

হাওলাদারের সঙ্গে টলমল করে বেরোতে ডি. এস দেখেছিল জোয়ারদারের হাতে ব্যাটন। বাঁ হাতে ধরে ডানহাতের তালুর ওপর আস্তে আস্তে, মোলায়েম করে বাজাচ্ছে। দরজা খুলে বিশাল বারান্দায় বেরোয় হাওলাদার ও ডি. এস। আরও কয়েকজন কনস্টেবল ছিল। হাওলাদার ডি. এস.-এর কলার ধরে ছিল। অজানা ভৌতিক নির্দেশে আলগা করে দিয়েছিল। দেখলে মনে হবে ধরে আছে কিন্তু আসলে ফস্কা গেরো। আচমকা, গুনগুন করতে থাকে ডি. এস, ফ্যাতাড়ুদের ওড়ার মোক্ষম মন্তর,

—ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই!

এবং টলমল করতে করতে টেক্ অফ্ করে। সাট্ করে দেড় মানুষ ওপরে উঠে যায়। তারপর দুহাতে ডানা নাড়তে নাড়তে উড়ে বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিছু একটা হবে এটা হাওলাদার জানতো। কিন্তু সেটা যে এত সাবলীল সেটা ভাবতে পারেনি। সে এবং বাকি কনস্টেবলরা দৌড়ে বারান্দার শেষ অবদি এসেছিল। আকাশে চাঁদনি প্লাস ডিজেল পোড়া ধোঁয়ার কুহকী ককটেল। তারমধ্যে উড়ে গিয়ে ডি. এস. ক্রমশ উঠতে থাকে, আরও আরও ওপরে। অনেকটা ড্র্যাকুলার স্টাইলে।

জোয়ারদার তখন ভাবছিল যে ম্যারাথন মোতা চলছে। কিন্তু এত টাইম ধরে? জোয়ারদার বেল বাজালেন ও সেই সঙ্গেই চেঁচাতে লাগলেন,

pathagar.net

—হাবিলদার! হাবিলদার!

হাওলাদার ও অন্যান্য সব কনস্টেবলই হাঁউ মাঁউ করতে করতে দৌড়ে এসেছিল। তাদের দেখতে ভীত ও উৎকণ্ঠিত কৌয়া ও বগুলার মতো। এর ঘণ্টাখানেক পরেই জোয়ারদার তখন কফিতে মাত্র দুটো চুমুক মেরেছেন, ভবানীপুর থানা থেকে ফোন।

—ও.সি ভট্চায্ বলচি স্যার। থানার ওপর বম্বার্ডমেন্ট হচ্চে সার।

—মানে? বম্ব না শেল্?

—না সার থানকা ইট, নোংরা কাদা ভরা ভাঁড়, হাঁড়ি, গু, ভাঙা বালতি এই সব পড়চে। একেবারে কার্পেট বম্বিং!

—এর জন্যে আমাকে ফোন কেন? যারা এসব ফেলছে তাদের ধরে লক্-আপ করে দাও।

—কাকে ধরব সার? ওপর থেকে পড়চে। কিছু উড়ন্ত ফিগার দেখা যাচ্চে কিন্তু ভিজিবিলিটি এত পুওর, তাছাড়া যে দেখবে তারও তো ডেঞ্জার...দমাদম ফেলচে

—মানে বলচো অ্যান অ্যাটাক ফ্রম আউটার স্পেস?

গদাম্ করে একটি শব্দ।

—শুনলেন সার...সাউন্ড?

—কি পড়লো ওটা?

ও. সি.-র চিৎকার শোনা যায়,

—কী পড়ল? ও...সার, একটা টব, গাছ সমেত।

—দেখছি কী করা যায়।

জোয়ারদারের কিছুই করার ছিল না ফোনটি রেখে দিয়ে চোঁ চোঁ করে বাকি কফিটুকু মেরে দেওয়া ছাড়া। খোদ লালবাজার থেকে আসামী উধাও। এবং তাও স্রেফ উড়ে। কাল রাইটার্সে কী বলবেন জোয়ারদার? সি. এম. এমনিতেই মেজাজী লোক তার ওপরে...

আবার ফোন। দুরু দুরু বক্ষে ফোন ধরলেন নগরপাল। উল্টোদিকের কণ্ঠস্বরটি বেশ জাঁদরেল।

—আপনি নগরপাল সাহেব আচেন?

—ইয়েস, মানে, আপনি কে?

—আমি রিটায়ার্ড মেজর বল্লভ বক্সি। লাইন ধরিয়া রাখেন। মার্শাল ভদি বাত করবেন।

—অ্যাঁঃ মার্শাল ভদি...তিনি কে?

ততক্ষণে ভদি রিসিভার নিয়ে নিয়েছে।

—আমি কে? আমি আমি। মার্শাল ভদি। কারেন্ট বংশধর অফ আত্মারাম সরকার। চাকতি মনে আছে। মুণ্ডু কুচ্। মনে আছে?

—মনে আর থাকবে না? অন-ডিউটি বিহেডিং। ভালো মনে আচে।

—ওই চাকতি কোম্পানি আমার। আমি মার্শাল ভদি।

—নমস্কার ভদিবাবু!

—নমস্কার। আজ আমার লোককে আপনারা ক্যাপচার করেছিলেন।

—পারলাম না। রাখতে। উড়ে পালাল।

—যাই হোক, আমি ওয়ার ডিক্লেয়ার করচি।

—ভবানীপুর থানা তে তো...

—ওতো সবে কনসার্ট! এরপরে আসল লড়াই। কালই ধুড়ধুড়ি নড়ে যাবে।

—মার্শাল! মার্শাল ভদি? মার্শাল!

ফোন চুপ। রিসিভার নামিয়ে রাখলেন জোয়ারদার। রাত বারটা দশ। লালবাজারের ওপরে আকাশ থেকে দুম্‌দাম পেটো পড়া শুরু হল। বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ। দরজা জানলা সব কাঁপছে। টেবিলের ওপরে কফির পেয়ালা ও প্লেট নাচছে। বম্ব স্কোয়াডের লোক এসে বলল একটা পেটোতে সচরাচর যা যা থাকে সেই পেরেক, বল-বিয়ারিঙের গুলি বা লোহালক্কড়ের টুকরো ওসব নেই।

—স্ট্রেঞ্জ!

—তবে হেভি সাউন্ড স্যার!

—অবাক হয়ে যাচ্ছি! বুঝলে। সেই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে জাপানীরা ক্যালকাটা বম্ব করেছিল, তার পর এই।

২০

র‍্যাফ সহ পুলিশের একটি বাহিনী কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর দিক থেকে গোটা রাস্তা মানে দুপাশের আপ ও ডাউন রাস্তা ও ট্রামলাইন সংলগ্ন জমি ধরে এগোচ্ছিল। অন্তত দশটি ক. পু লেখা ভ্যান ছিল। এই বাহিনী মার্চ শুরু করে সকাল দশটা নাগাদ। এগোচ্ছে... এগোচ্ছে...।

রাসবিহারী মোড়ের কাছে একটি সেলফোনের কোম্পানির বিশাল হোর্ডিং লাগানো বাড়ির ছাদে রং-ওঠা মিলিটারির জ্যাকেট, টুপি ও প্যান্ট পরে অপেরা-গ্লাসে লক্ষ রাখছিলেন মেজর বল্লভ বক্সি। ছাদের দুটি থামের বুরুজের মধ্যে অপেক্ষারত লিসবনে নির্মিত পোর্তুগিজ নুনু কামান। বারুদ ঠেসে গোলা ভরে রাখা।

লক্ষ্মণ-রেখা ছিল শাহরুক্ খানের পোস্টারে ঢাকা একটি দেওয়াল যার গায়ে ক্লান্ত পথচারীরা মুতে থাকে। এটা পুলিশের জানা ছিল না। আগুয়ান পুলিশ-বাহিনীর একটি ভ্যানে বসে ছিল টালিগঞ্জ থানার টাক্‌লা ও. সি।

মেজর বল্লভ বক্সি মনে মনে গুনেছিলেন ১০... ৯... ৮... ৭... ৬... ৫... ৪... ৩... ২... ১...

মেজর বল্লভ বক্সি হুঙ্কার ছাড়লেন,

—ফায়ার!

গর্জে উঠলো নুনুকামান! গুড়ুম!

কলকাতায় আস্রবন নেই ভাগ্যিস। তবে মেন গঙ্গা নদী না ডিসটার্বড হলেও আদিগঙ্গা যে কেঁপে উঠেছিল তা তো তার ঘোলা ওয়াটারই জানে। পাঠকেরা সেই জলেই আলোড়ন দেখে থাকবেন হয়তো। সেই বেলায় নভেলিস্ট একটি পোস্টকার্ড-এ ভাঁজ করে বানানো পেপার বোট ওই জলেই ভাসিয়েছিল। সেটি কেতরে পড়ে ও তার গলুইতে নোংরা জল ঢোকে। এবং এর কিছু পরেই কাঁকড়ারা নৌকাটিকে দাঁড়ায় ধরে জলডোবা করে ফেলে। লেখকদের ভাগ্যে এরকমই সচরাচর ঘটে। 'কাঙাল মালসাট'-এর বেলাতেও এই নিয়মের অন্যথা না হওয়ারই কথা। যুদ্ধের আস্ফালনে এসব মাইনর ডিটেল কারও চোখে পড়ার নয়। পড়েওনি। অতএব ইহা আপাতত ইগনোর করাই যায়।

প্রাচীন এইসব কামান এখনকার বোফর্সটাইপের নয় সে গোলা ভরো আর চালাও, ভরো আর চালাও। আবার মাল ঠাসতে হয়, নলচে ঠাণ্ডা করতে হয়, তবে না পুনরায় অগ্নিসংযোগ

ও উদ্গীরণ। প্রথম গোলাটি গিয়ে টাকলা ও.সি-র ভ্যানের ছাদে পড়ে এবং তারপর পিং পং বলের মতো এ ভ্যান ও ভ্যানের ছাদে ঘুরে ফিরে লাফাতে থাকে। এর ফলে ডুম্, ডুম্, শব্দ হয় যা পুলিশের কানে দুন্দুভি বলেই মনে হয়।

মেজর বল্লভ বক্সির হাঁকাড় চলে।

—পানি ডালো!

হাড় জিরজিরে গজা নামে এক সৈনিক ছাদের পায়খানার মগ থেকে জল ঢালে।

—পোঁদমে কাঁহে ডালতা? সিভিলিয়ান কুত্তা কাঁহাকা। বডিমে ডালো।

গজা কাঁপতে কাঁপতে নুনুকামানের বডিতে জল ঢালে। কেদার রায়ের আমলে ঠিক যেমনটি হতো তেমনই আনন্দে কামানটি গায়ে জল পড়তে ভ্যাঁসভেঁসিয়ে ওঠে।

—ফির ঠাসো। শেল লাগাও। ফায়ার...

এবারে আরও জমকালো। এই শেলটি কক্ষপথেই বিস্ফোরিত হয়ে অসংখ্য ছোট মার্বেল গোলায় পরিণত হয় এবং তারাও আগের বড় গোলাটির অনুসারী হয়ে ক. পু-র ভ্যানগুলির ছাদে ও বনেটে নাচানাচি শুরু করে।

নুনুকামানের গর্জন, সিটি মারার শব্দ করে গোলার আগমন ও ভ্যানের ওপরে নন্-স্টপ নাচানাচি পুলিশ বাহিনীর মধ্যে প্যানিক্-এর সৃষ্টি করে। তারা এ ওর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে হামাগুড়ি দিয়ে ভ্যানের তলায় ঢুকতে চেষ্টা করে।

—এনিমি স্ক্যাটার্ড। ফিরসে ঝাড়ো। ফায়ার...

এবারে গোলাটি নতুন কেরামতি দেখায়—কামানের মুখ থেকে বেরিয়ে সেটি আকাশ পথে খুবই ধীরগতিতে ভাসতে ভাসতে কিছুদূর এগোয় তারপর পুলিশ বাহিনীর মাথার ওপরে গিয়ে দোতলার হাইটে থেমে দাঁড়িয়ে যায়। এর ফলে অভূতপূর্ব সাসপেন্সের সৃষ্টি হয়। যে পুলিশরা তখনও হামাগুড়ি দেয়নি তারাও এবার পালাতে শুরু করে। মাথা থেকে টুপি খুলে টাকলা ও. সি টাক চুলকোয় এবং ওয়্যারলেসে লালবাজারে জানায়।

—হেভি শেলিং হচ্ছে স্যার! কেস গুবলেটিং!

—বলো কি ভায়া! শেলিং হচ্ছে!

গুড়ুম! এবারে ব্যাপক কর্ণবিদারী শব্দ হয়।

—শুনলেন সার! আবার ঝাড়ল।

—শুনব না? মাথা ঝন্ঝন্ করছে। ক্যাজুয়ালটি ফিগার কত?

—নো ক্যাজুয়ালটি সার। তবে ফোর্স ঘাবড়ে গেছে।

—এক কাজ কর। কামানফামানের সঙ্গে গাঁড় মারিয়ে দরকার নেই। রিট্রিট কর। ইমিডিয়েটলি।

—থ্যাঙ্ক ইউ সার!

টাকলা ও.সি ভ্যানের জানলা দিয়ে টেকো মুণ্ডু বের করে চেঁচায়,

—ফোর্স ব্যাক্ করবে। সব ভ্যানে উঠে পড়। কামানের সঙ্গে নো গাঁড় মারামারি।

ভ্যানের তলায়, আশপাশের দোকানে, বাড়িতে যে সব পুলিশরা শেল্টার নিয়েছিল তারা দুড়দাড় করে ভ্যানে উঠতে থাকে। ভ্যানের ছাদে বড় গোলা ও ছোট গোলার দল মহানন্দে তাসা বাজাচ্ছে। পুলিশ বাহিনী পিছু হটতে থাকে।

মেজর বক্সি আনন্দে গজার দাবনায় আলতো করে একটা চাপড় লাগিয়ে অপেরা গ্লাসটি এগিয়ে দিয়ে বললেন,

—দেখো ইয়ার, এনিমি পলায়ন করিতেছে। যাও, ফির পানি লাও। টু সেলিব্রেট ভিক্টরি এক রাউন্ড করে রাম হয়ে যাক।

গজা ফের ছুটল পায়খানার মগে করে জল আনতে।

যুদ্ধের এই সাময়িক বিরতি, পাঠক, একটু ঝালিয়ে নেবার জন্যে কাজে লাগালে মন্দ হয় না। ঝালিয়ে নেওয়ার সঙ্গে কিন্তু ঝালাই করার কোনো যোগ নেই। অবশ্য ঝালাই-এর ব্যাপারটাও একটু পরে আসবে। আসবেই। গরচায় কাঠের গুদামের মালিক কারফর্মা গত রাতে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ দেখেছিল যে সে একটি ওভাল টেবিলের একধারে বসে আছে। বেশ খানদানি মহলের একটি বিশাল ঘর। সেই ঘরে একদিকে সাহেবী ফায়ার প্লেস। তাতে কাঠ পুড়ছে। আবার ঘরে টানা পাখাও চলছে। এবং পাখার হাওয়া হাপরের মতোই বারে বারে ওই কাঠের আগুন উস্কে দিচ্ছে। টেবিলে বিশাল একটি মোমবাতি। ভূতুড়ে। পরিবেশ। বাঁদিকের দেওয়ালে ন্যাংটো দেবশিশুদের ছবি। নাদুসনুদুস, ডানা লাগানো। ছবির তলায় আবার আড়াআড়ি করে রাখা দুটি বিরাট সোর্ড। কারফর্মা ঘাবড়ে গিয়ে মনে মনে বলেছিল,

—সাতে নেই পাঁচে নেই, এ বাঁড়া কোথায় এসে পড়লুম। যেই না বলা অমনি ঝটপট করে একটা বিরাট দাঁড়কাক এসে টেবিলের ওপরে ল্যান্ড করল। কারফর্মা ঘাবড়ে গেল।

—ঘাবড়ে গেলি? অথচ তোর তো ঘাবড়াবার কথা নয়।

—আঁজ্ঞে!

চার জম্মো আগের কথা অবশ্য তোর মনে না থাকতেই পারে। এই এইঘরে বড়াখানা হয়েছিল, মাইফেল বসেছিল। ভুলে মেরে দিয়েছিস। সব সাহেবরা নেচেছিল। মালের ফোয়ারা ছুটেছিল। হেভি খানাপিনা। মনে পড়ছে? ল্যাম্ব রোস্ট!

—একটু একটু! একটা ঘোড়ার গাড়ি, ছমছমা শব্দ, ঘুঙুর!

—এই তো। তোর ডিউটি পড়েছিল মিঃ স্লিম্যানের জন্যে একটা খানদানি নেটিভ খানকি আনার।

—মনে পড়ছে এবার!

—না পড়ে পারে? এই মেয়েটিই তোকে মার্ডার করেছিল পরে।

—অ্যাঁ।

—হ্যাঁ, মানে বিষ দিয়ে। যা হোক জায়গাটা চিনলি?

—না তো।

—এটা হল বেগম জনসনের কুঠি।

ম্যাজিক গতিতে মুখোমুখি চেয়ারে, ওভাল টেবিলের ওপারে, গজিয়ে উঠলেন বিশালবপু জনসন। কারফর্মা যাতে ভালো করে দেখতে পায় তাই দাঁড়কাক এক লাফে পাশে সরে গেল। বেগম জনসন ধানাই-পানাই করার পার্টি নয়,

—কাল সকালে, কারফর্মা তোমার দুটি ডিউটি। হামি কোনো হ্যাংকি প্যাংকি শুনবো না। না করিলে কী হইবে সেও বলিয়া দিব।

—না, না, অবশ্যই করবো। আপনার অর্ডার।

—গুড! এই কাগজটিতে মার্শাল ভদির অ্যাড্রেস লিখা আছে!

কাল ঘুম হইতে জাগিয়াই তোমার ড্রাইভার বলাইকে এই ঠিকানায় পাঠাইবে, সে মার্শাল ভদি, বেচামণি, নলেন ও সরখেলকে উঠাইবে। তুমি উয়াদের আন্ডারগ্রাউন্ডে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।

—আঁজ্ঞে আর একটা ডিউটির কথা বললেন।

—দ্যাটস, লাইক-আ-গুড বয়, তোমার নেক্সট ডিউটি হইবে লালবাজারে ফোন করিয়া কমিশনার জোয়ারদাকে মার্শাল ভদির ঠিকানাটি বলিয়া দিবে। মিউটিনি লাগিয়াছে জানো, নিশ্চয়।

—আঁজ্ঞে না। গদি সামলাতেই নকড়াছকড়া হয়ে যাচ্ছি, কোথায় মিউটিনি-ফিউটিনি...

—চোপ নটিবয়। একটি মাগিও তো রাখিতেছ। রাখেল। লাস্ট মান্থে তাহার তরে একটি কালার টিভিও খরিদ করিয়াছ...আমার হুকুম যদি অমান্য কর তো ওই রাঁড়ই তোমাকে পয়জন করিয়া মারিবে। সেবার যেমন হইয়াছিল।

—না, না, অবশ্যই করব। দুটোই করব!

কারফর্মা ঘুম থেকে ঘেমেচুমে উঠল। পাশে বউ। নাক ডাকাচ্ছে। কারফর্মার হাতে ধরা এক টুকরো কাগজ।

ওদিকে দাঁড়কাক বেগম জনসনকে বলছিল,

—তোমার এই কনট্রাডিকটরি স্টেপটা ঠিক ক্লিয়ার হল না।

—খোলসা করিতেছি। ভদিতো ওয়ার ডিক্লিয়ার করিয়াছে। এখন ফেয়ার প্লেইং ফিল্ডে এসপার ওসপার হওয়া ভালো। আমি টিপুকেও লড়তে দেখিয়াছি। খোলা লড়াই। আর সত্যি যদি বল হাজার হলেও ওই লালবাজার আমরাই বানাইয়াছিলাম। একে বলতে পার ইভেন হ্যান্ডেড জাস্টিস। তবে ভদির বাড়িতে উহারা কিছুই পাইবে না। উপরন্তু নাজেহাল হইবে। লালবাজারে ঠিকানা না জানাইলে তামাশাটি হইবে না। তুমি তো জানই যে আই ক্যান নট লিভ উইদাউট ফান অ্যান্ড মার্থ।

এইবার কি ড্রাইভার বলাইকে মনে পড়ে? সেই যে গাল তোপড়ান, খোঁচা দাড়ি বলাই। টালিগঞ্জ ফাঁড়ির বাংলার ঠেকে ফেয়ারওয়েল ডায়লগে ফ্যাতাড়ুদের বলেছিল,

—ঠিক আচে ভাই দেখা হবে। নামটা মনে রাখবেন। বলাই। আমি কখনো মুখ ভুলি না।

'৪' নং ঘাপলাটিতে বলাইয়ের আবির্ভাব ও অন্তর্ধান ঘটেছিল। আবার সে এসেছে ফিরিয়া। হে মহান পাঠক, তুমি কখনো চিড়িয়াখানায় ভোঁদড়দের সিঙি মাছ ছুঁড়েছুঁড়ে খাইয়েছ? যদি এমনটি করে থাক তাহলে মনে রেখ, ওই একই টেকনিতে 'কাঙাল মালসাট' তোমাকে ভুলে যাওয়া শিঙি মাছ নয়, এক একটি ভ্যানিস হয়ে যাওয়া চরিত্রকে ফের উপহার দিচ্ছে—যেমন নক্ষত্রনাথ হাওলাদার। যেমন বলাই... এটসেট্রা এটসেট্রা।

কাকভোরে টিনের দরজায় ডুমডুম করে ধাক্কা। ভদি ভেবেছিল পুলিশ এসেছে। বেঢপ মিলিটারি টিউনিক পরে ভদি মোগলাই আমলের পেল্লাই মরচে পড়া সোর্ড ভুঁড়ির ওপরে রেখে ঘুমোচ্ছিল। নলেন দরজা খুলেছিল। পুলিশ নয়! বলাই এবং একটি বডি তোবড়ানো কালো রঙের, মান্ধাতার আমলের ল্যান্ডমাস্টার এবং একটু পরেই সরখেলের বাড়িতে ফোনের দড়ির ঘণ্টা বেজে উঠল।

—বঁলো।

—ঝঁটপঁট চঁলেঁ এসোঁ।

—কেঁনঁ?

—গাঁ ঢাঁকা দিঁতে হঁবে।

—পাঁইখাঁনা হঁয়নি।

—ওঁ হঁবে। আঁমিও হাগিঁনি।

ল্যান্ডমাস্টারটা যখন পোঁটলায় বাঁধা সোর্ড, ভোজালি, খুরপি, ইত্যাদির অস্ত্রাগার ও চারজন

অ্যাবস্কন্ডারকে নিয়ে রওনা হয়ে যায় তখন কয়েকটা বাড়ির দূরে দাঁড়িয়ে ছিল বড়িলাল। সে এবারে গঙ্গার দিকে পা চালাল। মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরে তাকে কাশীর চিনি দিয়ে ভেজানো ছোলা খেয়ে ডন বৈঠক মারতে হবে। যার যা কাজ। যেমন শশধরের কাজ শশক ধরা ও মহীতোষের কাজ মশক মারা। ল্যান্ডমাস্টারে সদলবলে ভদির কেটে পড়ার ঘণ্টা দুয়েক পরে আই.পি.এস অফিসার ডি. সি পীতাম্বর সিং-এর নেতৃত্বে রাইফেলধারী একদল পুলিশ ভদির বাড়ি ঘিরে ফেলে। পোর্টেবল মাইক থেকে ঘোষণা করা হয় ভেতরে যে যে আছে যেন সারেন্ডার করে। সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে কোনো ফায়দা নেই। লে হালুয়া। সারাবাড়িই ফাঁকা। ন্যাড়া ছাদে শুধু একটা দাঁড়কাক বসে আছে। দাঁড়কাকের পাশেই পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন বেগম জনসন। অবশ্য সূক্ষ্মদেহে থাকার হেতু পুলিশরা তাঁর অস্তিত্ব টের পায়নি। চাকতির ঘর খোলা পড়ে ছিল। কয়েকটা শেকলটানা ঘরে ঢুকে দেখা গেল শুকনো ফুল, চাটাই-এর আসন, মালসা, মরা আরশোলা, খড়ের আধপোড়া আঁটি ইত্যাদি। পীতাম্বরের বাড়ি দারভাঙ্গায় হলেও সে কলকাতারই ছেলে। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়েছে।

—মনে হচ্ছে এখানে উইচক্রাফট প্র্যাকটিস করা হয়। ইন্টারেস্টিং। বাট নো রেবেলস্। এরপরই তার চোখ পড়ে ভদি-সরখেল টেলিফোন লাইনের উপর।

—মিস্টিরিয়াস! সিমস টু বি আ প্রিমিটিভ কমিউনিকেটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট। দেখতে হচ্ছে।

তার-এর লাইন ফলো করে পুলিশ বাহিনী পৌঁছে যায় সরখেলের বাড়ি। এবং সেখানে আবিষ্কৃত হয় আড়ে বহরে প্রায় এক মানুষ ছড়ানো সেই বিশাল গর্ত যার গভীর থেকে উঠে এসেছিল লিসবনে বানানো পোর্তুগিজ মিনুকামান ও কতিপয় মরচে পড়া মোগলাই সোর্ড। গর্তের ভেতরে টর্চ মেরেছিল পীতাম্বর। অনেক তলায় কালো, দুর্গন্ধ জল জমে আছে। ভন ভন করছে মশা। এরমধ্যেই কেলোটা হয়েছিল। একজন কনস্টেবল ভদির একতলার একটা ছোট্ট ভাঁড়ার টাইপের ঘরে চারপাঁচটা বোতল দেখেছিল। মুখ বন্ধ। ভেতরে লিকুইড। মাল হতে পারে ভেবে একটা বোতলের ছিপি খুলেছিল। বোতলে ভূত পোষা হয় কি হয় না, যায় কি যায় না, এসব নিয়ে সুচিন্তিত কোনো সিদ্ধান্তে আসা আমাদের লক্ষ নয়, এক্ষত্রে যা ঘটেছিল সেটিই আমরা জানতে পারি—কনস্টেবলটি সহসা দেখল শক্ত হাতে চুলের মুঠি ধরে অদৃশ্য কেউ তাকে টেনে উঠোনে এনে ফেলল। ঠাস করে এক থাবড়া বসালো। গালে হাত বোলাতে না বোলাতে পোঁদে এক লাথি। বেগম জনসন ও দাঁড়কাক গিটকিরি দিয়ে হাসতে থাকে। নামজাদা কোনো মাইম আর্টিস্টও এত ভালো করতে পারবে না। অন্য পুলিশরা যেটা দেখেছিল সেটা হল ভদির টিনের দরজা দিয়ে সে হাঁউ মাঁউ করতে করতে বেরোচ্ছে এবং একটি উড়ন্ত বালতি তাকে ধাওয়া করছে। দৃশ্যটি স্বচক্ষে না দেখলেও পীতাম্বর এর মিনিট খানেক পরে সরখেলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুলিশদের মধ্যে যে বিপর্যস্ত ভাব দেখল তা যেমনই করুণ তেমনই চিন্তার উদ্রেক করে। উড়ন্ত বালতি ততক্ষণে ঢুকে গেছে বাড়ির ভেতরে। দরজাও বন্ধ হয়েছে সপাটে। যদিও বাড়ির ভেতরে কেউ নেই। কেতরে পড়া সাইনবোর্ডটিতে লেখা 'বিবিধ অশুভ অনুষ্ঠানে ঘরভাড়া দেওয়া হয়।' ন্যাড়াছাদে জায়েন্ট দাঁড়কাকটি বসে। জিপে বসে আচমকা এক লহমা পীতাম্বরের মনে হল পাশেই বিশাল স্থূলকায়া এক হাস্যমুখ গাউন পরা মেম। থোবড়াটা গামলার মতো। পরক্ষণেই নো মেমসাহেব। ওনলি দ্য ম্যাসিভ দাঁড়কাক। পীতাম্বর বিড়বিড় করতে লাগল,

—মিস্টিরিয়াস! ভূতিয়া চক্কর!

কমরেড আচার্য ফায়ার হয়ে গেলেন।

—ক্যানন্-ফ্যানন্ নিয়ে অ্যাটাক করছে, ক্যানন্ বলস্ পুলিশ ভ্যানের ছাদে নাচানাচি করছে,

নো ক্যাজুয়ালটি অথচ পুলিশের মধ্যে ওয়াইডস্প্রেড প্যানিক, এসব শুনলে সি. এম.-কী বলবেন আপনি ভেবে দেখেছেন?

জোয়ারদার দেখলেন মিনমিন করে হজম করার কোনো মানেই হয় না।

—দেখুন, স্ট্রেট-কাট্ বলে দিচ্ছি এরা যে সে এনিমি নয়। এতো আর এস. ইউ. সি-র মিছিল পাননি যে বেধড়ক লাঠি দিয়ে পেঁদিয়ে দিলাম। ব্যাপারটা সি. এম কে বোঝান। আমাকে অন ডিউটি বিহেড করে দিল। কিছু করতে পেরেছেন আপনারা? এখন ক্যানন চালাচ্ছে। এরপর ধরুন গাম্ করে একটা ওয়েপন অফ মাস্ ডেস্ট্রাকশন ঝেড়ে দিল। তখন কী করবেন?

—রাগ করবেন না কমরেড জোয়ারদার! রাগ করবেন না।

—সে না হয় না করলাম। তবে ওই কমরেড ফমরেড না বলে মিস্টারই বলুন। আই হেট কমিউনিজম্ অ্যান্ড দা রেডস্।

—কিছু একটা করুন। ফেস সেভিং কিছু একটা। মার্শাল ভদি যদি এইভাবে আমাদের হ্যাটা করতে থাকে...

—দেখছি। এখন লাইন ছাড়ুন। ভাবতে দিন।

পীতাম্বরের রিপোর্ট পেয়ে আরও দমে গেলেন জোয়ারদার। ফ্লাইং বালতি এসে পুলিশ প্যাঁদাচ্ছে। সরখেলের উঠোনে মিস্টিরিয়াস হোল। গত রাত্তিরের এরিয়াল বম্বার্ডমেন্ট। প্লাস ভবানীপুর থানায় দুমদাড়াক্কা!

নতুন একটা প্ল্যান করলেন জোয়ারদার। এবারে কালীঘাট-হাজরা সাইড থেকে নয়। এবারে দেশপ্রিয় পার্কের দিক থেকে ম্যাসিভ একটা কোর্স এগোবে। তার আগে শুধু ঠিক করতে হবে ক্যানন কোন্ রুফ-টপে আছে।

ক্যানন যে রুফ-টপে ছিল সেখানে মেজর বল্লভ বক্সি তখন তড়কা-রুটি দিয়ে ওয়ার্কিং লাঞ্চ সেরে ফেলেছেন। সেই সঙ্গে হারকিউলিস রাম। গজা গত পুজোর ভাসানে সিদ্ধি খেয়েছিল। মিলিটারি রাম তার বড়ই উপাদেয় লাগে। শেষে বলেই ফেলল,

—ছোট করে আর একটু ঢালুন না। মৌজটা ভালো করে জমতো।

—সে না হয় জমাইলাম কিন্তু এনিমি না সারপ্রাইজ অ্যাটাক করিয়া বসে। মাল ঠাসা হইয়াছে তো?

—পুরো রেডি। বলবেন আর প্যাঁকাটি ধরিয়ে আগুন দেব।

—গুড! ভেরি গুড! যাও, পানি লইয়া আস।

গজা পায়খানার মগে করে জল আনতে গেল।

মেজর বক্সি ভাবলেন দুমিনিটের একটি শর্ট ন্যাপ্ মেরে দেবেন এই তালে। কিন্তু ব্যোমপথে বোঁ বোঁ শব্দের ক্রমবর্ধমান গুঞ্জরণ তাঁর সিয়েস্তার প্ল্যানটি ভেস্তে দিল। সেই সঙ্গে দেশপ্রিয় পার্কের সাইড থেকে এগোবার পরিকল্পনাটিও ভোগে গেল! ওই প্রচণ্ড ঘূর্ণির শব্দ হল অসংখ্য নানা সাইজের চাকতির। ঝাঁকে ঝাঁকে চলেছে। এবং দিনের আলো থাকতে থাকতেই, চাকতির পালের ওপরে উড়ছে ফ্যাতাড়ুর দল। এবার শুধু মদন, ডি. এস, পুরন্দর ভাট নয়। ডি.এস-এর বউ, বাচ্চা, শালা জনা কেন আরও অনেক ফ্যাতাড়ু রয়েছে যাদের কথা কেউই জানত না। তারা মেজর বল্লভ বক্সিকে হাত নাড়তে থাকেন। বল্লভ বক্সি আনন্দে 'ব্রিজ অন দা রিভার কোয়াই'-এর বিখ্যাত সিটি-সংগীতটি বাজাতে বাজাতে নাচতে থাকে। বোঝাই যাচ্ছে চাকতির দুর্ভেদ্য বর্মের পাহারায় ফ্যাতাড়ুরা উড়ছে। এভাবেই ফাইটাররা বোমারুদের আগলে রাখে। দিনমানে এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য কলকাতার মানুষ দেখেছিল শুধু তাই নয়, সোৎসাহে দেখেছিল।

pathagar.net

আকাশে যাই হোক যেমন টোটাল সোলার একলিপ্স্ বা রাতকাবার করে উল্কা বৃষ্টি—কলকাতার লোক দেখবেই। আর এ দৃশ্য তো স্বর্গীয়—উড়ন্ত চাকতি, তদুপরি উড়ন্ত মানুষ। ফ্যাতাড়ুদের নানাবিধ রণধ্বনি গগন মথিত করে তোলে যেন দৈববাণী হচ্ছে।

—ওয়ে ওয়ে, ওয়ে ওয়ে আঃ

—লায়লা, ও লায়লা!

—লিঃ লিঃ

—ছাঁইয়া, ছাঁইয়া...

কানফাটানো শব্দ। বুদুম। টিগুম! বিভিন্ন রাস্তায় চলমান বা দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ ভ্যানগুলো টার্গেট। পেটো বম্বিং শুরু হয়ে যায়। এবং দুর্গন্ধ এঁদো কাদা জলে ভরতি পলিব্যাগের বেলুন। এই সরব পরিস্থিতিতে নতুন একটি মাত্রা সংযোজিত করে কলকাতার নানা মহল্লা ও পাড়ার ক্যাওড়ারা। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, ব্রেজিল বা ইন্ডিয়া-র কারণে যে বিপুল পরিমাণে চকোলেট বোম সব সময়েই মজুত থাকে সেগুলোও মওকা বুঝে ফাটানো শুরু হয়। টাকলা ও. সি দুহাতে কান চেপে ভ্যানের মধ্যে বসেছিল। ভ্যানের ছাদে তখনও নুনুকামানের গোলা ধড়াক ধড়াক করে লাফাচ্ছে।

বিস্ফোরণমুখর সেই কলকাতায় সন্ধ্যা ঘনাইতে শুরু করিল যদিও তাতে থেকে থেকে জ্বলে ওঠা ঝলক ছড়ানো ছিল। মেজর বল্লভ বক্সি বলিলেন,

—মার্শাল ভদির মাস্টার স্ট্রোক এখনও কমপ্লিট হয় নাই। এয়ার অ্যাটাক চলিতেছে। এবারে অন্য খেলা। ফ্লেয়ার ছাড়া করো! নুনুকামানের মুখ উঁচু করে তাতে একটি বড় হাউই বসিয়ে জ্বালানো হল। হাউইটি আকাশে উঠে গিয়ে ফেটে একটি আলোর গোল চাকতি হয়ে গেল।

কারফর্মার বাড়ির ছাদ থেকে হাউইটির ফেটে যাওয়া দেখে ভদি সরখেলের ঘাড়ে একটা চাপড় মেরে বলল,

—আকাশে থেকে প্যাঁদাব, ডাঙাতেও ছাড়ব না। সামলাও এবার।

ওই হাউই উড়ে গিয়ে গোল চাকতি হওয়াটা ছিল মোক্ষম সিগনাল। এরপরেই দেখা গেল ছোট কি বড়, রোড, লেন, বাইলেনের সব রাস্তাতেই ম্যানহোল খুলে যাচ্ছে। এবং তার গর্ত থেকে যারা বেরিয়ে আসছে তারা চোখ ফুটো ফুটো শিরস্ত্রাণ পরা, গায়ে চকচকে বর্ম, হাতে নানা টাইপের খতরনাক মাল কিন্তু আবছা আলোয় ভালো বোঝা যায় না। রোমের হিংস্র সৈন্য বা আইভ্যান হো-র নাইট টাইপের। এই বাহিনীর আত্মপ্রকাশ পুলিশদের যারপরনাই আতঙ্কিত করে তোলে কারণ পেটো ও অন্যান্য পতনশীল জলীয় ও জলীয় নয় পদার্থের বৃষ্টিতে তারা নাজেহাল হয়েই ছিল। কাছে গেলেই বোঝা যেত যে এগুলো স্রেফ আলকাতরা মারা টিন—কোনোটা তেলের, কোনোটা বিস্কুটের। ভীতিপ্রদ এই নাইটদের ম্যানহোল থেকে বের করার পরিকল্পনাটি মেজর বল্লভ বক্সির। তাঁর আর একটি উদ্ভাবন হল মেথরদের নোংরা ফেলার বাতিল লজঝড়ে গাড়িতে ঝালাই করে পাইপ বসিয়ে সেগুলিকে সাঁজোয়া কামানের রূপ দেওয়া। একেই বলে সাইকোলজিকাল ওয়ারফেয়ার। সকাল থেকেই নুনুকামানের দাপট পুলিশের মনোবল অনেকটা ভেঙে দেয়। খ-লোক থেকে নিরন্তর হামলা বাকিটা শেষ করে দিয়েছিল। সব খুইয়ে ফেলার পরেও ছিটেফোঁটা যদি কিছু থাকে সেটাও শেষ করে দিল নাইটবাহিনী ও সাঁজোয়া কামানের গুরু-গম্ভীর আবির্ভাব।

লাগাতার বম্বিং। তৎসহ চাকতির বোঁ বোঁ। কমরেড আচার্য জোয়ারদারকে ফোন করলেন, এই গোলযোগের মধ্যেই,

—কী বুজছেন মিস্টার জোয়ারদার?

—নো হোপ। খলখলে করে ছেড়ে দিচ্ছে।

—তাহলে বলছেন মিউটিনি থামানো যাবে না।

—রাতটুকু কাটলে হয়। ফোন রাখুন তো। আপনাদের ওই প্যাঁ পোঁ আর টলারেট করা যায় না।

কমরেড আচার্য ফোন নামিয়ে রাখলেন।

যে রাতটিকে ঘিরে অত ভয় ছিল জোয়ারদারের সেই রাতেই এমন একটা কাণ্ড ঘটেছিল যা পরিস্থিতির সামালের কারণ হয়ে ওঠে। এ কথা কে না জানে যে কোথাও কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলে বাংলার বুদ্ধিজীবীরা কালবিলম্ব না করেই সদলবলে একটি ঘোষণাপত্র বা আবেদন বা ফাঁকা থ্রেট প্রকাশ করে থাকেন যাতে বড় থেকে ছোট, গুড়ঢা থেকে কেঁচকি, লেখক, শিল্পী, গায়ক, নৃত্যশিল্পী, নাট্যকর্মী, চলচ্চিত্র শিল্পী থেকে শুরু করে সকলেই সই দিয়ে নিজেরাও বাঁচেন অন্যদের বারটা বাজাবার রসদ যোগান। শুধু এই ধরনের আবেদনে বা প্রতিবাদপত্রে সই করেই অনেকে লেখক বলে নিজেদের পরিচিত করতে পেরেছেন। কেউই এই ধরনের ব্যাপারে সই দেওয়া থেকে বাদ পড়তে চান না। বাদ পড়ে গেলে খচে লাল হয়ে যান। অনেক সময় ফোনেই জেনে নেওয়া হয় যে নামটা দেব তো! এবং কিছু মাল আছে যাদের কিছু বলারই দরকার হয় না। আজ অবদি এরকম যত আবেদন বা প্রতিবাদপত্র বাজারে ছাড়া হয়েছে তা এক করে ছাপানোর প্রস্তাব কি উঠেছে? কেউ কি বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছেন বা করার ইচ্ছে আছে?

যাইহোক, যে রাত্তিরের ভয় জোয়ারদারের ছিল সেই রাত ঘোর দড়াম্ দড়াম্ করে ফেটে যাওয়ার পর, পরদিন সকালে দেখা গেল প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রেই একটি আবেদনপত্র বেরিয়েছে,

'সরকার-বাহাদুর ও চোক্তার-ফ্যাতাড়ু যুগ্মশক্তির মধ্যে যে অ-রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছে তা আমাদের ঘুমে বড়ই ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। আমরা বহুদিন আগেই জেগে থাকা বৃথা, এই সিদ্ধান্তে এসে ঘুমিয়ে পড়েছি। এবং চারদিকে যা হালচাল তা স্বপনচক্ষে দেখে আমরা মনে করি যে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা ঠিকই করেছিলাম। তাই আমাদের সর্বসম্মত আবেদন এই যে দু পক্ষই একটি শান্তি আলোচনায় বসুক। এবং একটি এমন রফায় আসুক যাতে সাপও না মরে আবার লাঠিও না ভাঙে। সংগ্রাম যেমন দরকার তেমন বিশ্রামেরও দরকার। শেষোক্ত প্রয়োজনটি আমাদের খুবই বেশি। আশীর্বাদ সহ,

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ বি. কে. দাস, মিঃ প্যান্টো, মিঃ পি. বি, জি. এস. রায়, সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনয়কুমার দাস, অমৃতলাল বসু, বিমলাচরণ দেব, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুবলচন্দ্র মিত্র, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস, গোপীনাথ কবিরাজ, হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ্বর ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, সুরবালা ঘোষ, গিরীন্দ্রশেখর বসু, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুনির্মল বসু, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুখলতা রাও, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কৈলাসচন্দ্র আচার্য, গোবিন্দচন্দ্র দাস, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমেন্দ্রচন্দ্র কর, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, আত্মারাম সরকার, গঙ্গাগোবিন্দ রায়, আলী সরদার জাফরি, কৃষণচন্দর, রাধানাথ শিকদার, হরিহর শেঠ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জন স্টুয়ার্ট মিল, ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা, জোসেফ টাউনসেন্ড, কাহ্নপাদ, ভুষুকপাদ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, মিখাইল

বাখতিন, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, ওয়ের্নার হাইজেনবার্গ, বিশু দত্ত, হরিহর সরকার, মিসেল ফুকো, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দনদাস মণ্ডল, আলামোহন দাস, ভ্লাদিমির নবোকভ, কার্ল গুস্তাভ ইয়ুং, নিগমানন্দ...'

উপরোক্ত আবেদনটি নিয়ে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে পরে মতভেদ হবে। একদল বলবেন যে ওরকম কোনো আবেদনপত্র আদৌ প্রকাশিত হয়নি। অপরপক্ষের দাবি হবে যে অবশ্যই হয়েছিল। কোনো পক্ষই জয়লাভ করবে না কারণ ওই দিনের কোনো সংবাদপত্রই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু এই আবেদনটিই অবস্থার ভোল পাল্টে দিল। পরদিন সকালে কোনো সংঘর্ষ হয়নি। রাত চারটের পর বম্বিং-ও কমে গিয়েছিল। সকালে দেখা গেল যে ম্যানহোল যেখানে ছিল সেখানেই গেঁড়ে বসে আছে। নাইট, ফলস্ সাঁজোয়া গাড়ি—সব হাওয়া। আকাশও ফুরফুরে।

এরপরের ঘটনা সংক্ষেপে এরকম। উভয়পক্ষের মধ্যে 'হেকটিক পার্লি' যাকে বলা হয় তাই চলে। গোলাপ, তারকনাথ সাধু, নক্ষত্রনাথ হাওলাদার এবং বড়িলালও এই প্রচেষ্টায় জড়িয়ে পড়ে। আসলে উপরোক্ত আবেদনটি সকলেরই মনে প্রথমে নাড়া ও পরে দাগা দেয়।

বেগম জনসন বাইবেল স্মরণ করে বললেন,

—টাইম অফওয়ার যেমন হয় তেমন টাইম অফ পিস্-ও হইবে। লাইক দা ডে ফলোইং দা নাইট।

দাঁড়কাক বলেছিল,

—সবই আত্মারামের খেলা। দেড়শো বছর পরপর চাকতি নাচবে। এবার তো ভালই নাচনকোঁদন হল। এবার গুটিয়ে নে।

ভদি গাঁইগুঁই করেছিল,

—বলচেন গুটোতে, গুটিয়ে নেব। তবে এটাও তো দেখতে হবে যে গুটোতে গুটোতে বিচি না বেরিয়ে পড়ে।

দণ্ডবায়স হাসিয়া উঠিল,

—বংশের আর কিছু না পেলেও মুখটা পেয়েচে। কার ছেলে দেখতে হবে তো!

একই কেস ঘটেছিল কমরেড আচার্যের বেলায়। তাঁকে ঝাড়লেন অভিজ্ঞ ও প্রবীণ সি.এম,

—ব্রেসৎ-লিতোভস্ক্ ট্রিটির হিসট্রিটা পড়। বুখারিন তো চেয়েছিল জার্মানদের সঙ্গে গেরিলা ওয়ার চালাবে। লেনিন বুঝেছিলেন যে এ কাজ করলে তা হবে ডুবে মরার সামিল; ট্রটস্কিকে সেদিন লেনিনকে মানতে হয়েছিল বুঝলে? দরকার হলে সায়া পরে যাবে। স্টুপিডই থেকে গেলে।

কলকাতার মাঝবরাবর সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রালের লাগোয়া প্যারিস হলে এই ঐতিহাসিক আলোচনা বসে। পেপসি ও কোক—উভয়েরই ঢালাও সাপ্লাই ছিল। শান্তি আলোচনায় কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। কেউ কাউকে ঘাঁটাবে না, এই মর্মেই শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। তবে শেষ পাদে, মানে আলোচনার অন্তিম লগ্নে ইন্টারভেন করেছিলেন নগরপাল জোয়ারদার।

—সবই বুঝলাম মার্শাল ভদি। কিন্তু পীতাম্বরের রিপোর্টে সরখেলের উঠোনে যে ব্ল্যাক হোল্ তার রহস্যটা থেকেই গেল। ক্যালক্যাটায় এটা সেকেন্ড!

—সরখেল, তুমি বলবে? বলবে না! ঠিক আচে। আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিচ্ছি। সরখেলই আমাকে আইডিয়াটা দেয়। ষাট সাল না কবে যেন সোভিয়েট অ্যাকাডেমিসিয়ান কালিনিন না কে যেন বলেছিল যে কলকাতা তেলের ওপরে ভাসছে। পুরো কলকাতাটাই ইরাক। তাই সরখেল

আর আমি তেলের জন্যে মাটি খুঁড়ছিলাম। এখানে কিন্তু একটা শর্ত থাকবে। নো খাবলাখাবলি কমরেড আচার্য ভদির বক্তব্য নোট করতে করতে বললেন,

—বলুন, শর্ত বলতে আপনি, মার্শাল ভদি, কী বোঝাতে চাইছেন?

—এই যে তেল, যা বিক্রি করবে, তুলবে একটা কর্পোরেশন, একটা কোম্পানি, তার চেয়ারম্যান হব আমি, মার্শাল ভদি সরকার।

কয়েক লহমার সাসপেন্স। সে সব স্টার টিভি ও অন্যান্য টিভি কোম্পানির ক্যামেরাতে তোলা আছে।

কমরেড আচার্য বললেন,

—তাই হবে মার্শাল ভদি।

—তাতে সব ফ্যাতাড়ু, সব চোক্তার, প্লাস বলাই প্লাস সাক্ষী বড়িলাল সকলেরই চাকরি পাকা হবে।

—ইয়েস, আই গিভ ইউ মাই ওয়ার্ড মার্শাল ভদি।

এই সময়ে সি. এন. এন-এর টিভি রিপোর্টার প্রশ্নটি ছুঁড়েছিল,

—মার্শাল ভদি, এমনকি গ্যারান্টি আছে যে আপনি সাদ্দাম হুসেন হয়ে যাবেন না?

(চলবে)

pathagar.net

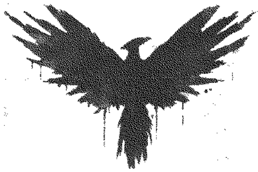

২১

খেল খতম্। পয়সা এখনো হজম হয়নি।

বড়িলাল ও কালীর সম্পর্ক অব্যাহত রয়েছে। জয় হনুমান! জোয়ারদারের মুণ্ডু জুড়ে গেছে। ওটা নগরপাল নিজেই খেয়াল করেননি। ললিতা জোয়ারদার নগরপালকে একদিন সকালে চমকে দিলেন, কিস্ খেয়ে,

—তোমার ওই কামব্রাস্ ফ্রেমটা কাবাড়িওলাকে বেচে দিলাম।

—মানে?

—মানে, সিম্পল্। বেচে দিলাম। কারণ তোমার মুণ্ডু, বিহেডেড্ অন ডিউটি, জুড়ে গেছে।

—জুড়ে গেছে?

—ইয়েস মাই লাভ!

মেজর বল্লভ বক্সি আত্মগোপন করেছেন। কোথায় কেউ জানে না। শোনা গেছে যে আল্ জাজিরা টিভিতে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দিতে পারেন।

ভদির বাড়ির উঠোনে নিয়মিত গালাপার্টি বসছে। মালমোহানা! নলেন থেকে থেকে পাদছে ও ফুট-ফরমাস খাটছে। বেচামণি নাকি আরও খোলতাই, আরও ডবকা হয়ে উঠেছে। সরখেল মাটি তুলছে বালতি বালতি। ফ্যাতাড়ুরা বাংলার ঠেকে রেগুলার ভিজিট দিচ্ছে। এবং এর ওর পোঁদে লাগছে। প্রকাশ থাক,

খুলি নেচেছিল।

আনন্দবাজারে যাদুকর আনন্দ-র বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছিল।

তাহলে কী হয়নি?

ওঁয়া ওঁয়া!

যদি না আদি বা মধ্যভাগে বুদ্ধিমান পাঠক বা পাঠিকা, পাঁঠক বা পাঁঠিকা, নানা টাইপের আধাখ্যাঁচড়া ঝটরপটর-সম্বলিত এই বোম্বাচাকটি বিরক্তি সহযোগে বাতিল না করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার বা তাঁহার সম্পূর্ণ রসাস্বাদন খতম হইল। নিংড়ে নিল। কোনো রাতজাগা পাখি বলছেনা না যেও না।

তবু সব ছাপিয়ে কেমন একটা মন কেমন করা, মন কেমন করা ভাব। এই ভাবটাই বজায় থাকে। কেন গা?

মনুমেন্টের ওপরে বুড়ো দাঁড়কাক বসেছিল। কলকাতার পশ্চিমে সানসেটের ঘনঘটা। তারই সোনালি ফোকাস বিশাল ডানার খড়খড়ে পালকে। দাঁড়কাক আপনমনে বলে উঠল,

—যাক্! 'কাঙাল মালসাট' বই হয়ে বেরিয়ে গেচে। যাই, বেগম জনসনকে খপরটা দিয়ে আসি।

বৃদ্ধ দণ্ডবায়স উড়িয়া গেল।

(চলবে না)

pathagar.net

লুব্ধক

pathagar.net

সাত ঘণ্টা, মাত্র সাতটা ঘণ্টা আর বাকি আছে। সাত ঘণ্টা মানে চারশো কুড়িটা মিনিট। খুব একটা অভাবনীয় মাপের কিছু নয়। মাত্র পঁচিশ হাজার দুশোটা সেকেন্ড। সময়-এর এই খণ্ড দৌড়ে পেরিয়ে যেতে একটা ঘুমই যথেষ্ট। তবে পুরোটাকে ঘুম বলা যাবে না। খুব সামান্য সময়ের জন্যে হলেও দু-একটা স্বপ্ন দেখতে হবেই। মোটের ওপর সাত ঘণ্টার অপেক্ষা। আর ঘুমোতে যে হবেই বা ঘুম যে আসবেই এমন কোনো কথা নেই।

রিখ্‌টার স্কেলে মাপা যায়নি যে ভূমিকম্পটা কত জোরালো ছিল। এর থেকে হাস্যকর কথা কী হতে পারে? আসলে এরকম কথা বলার কোনো মানেই হয় না। ঘেউ! ঘেউ! চার্লস এফ রিখ্‌টার তাঁর স্কেলটি বানিয়েছিলেন এই সেদিন। ১৯৩৫ সালে। আর ভূমিকম্পটা হয়েছিল ১৭৩৭-এ, মানে তার প্রায় দুশো বছর আগে। লোক মারা গিয়েছিল ৩,০০,০০০। দিনটা ছিল ১১ অক্টোবর। ৫২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ধরে ১৯৯৫ অবধি যে দুনিয়া কাঁপানো চুয়াল্লিশটি ভূমিকম্পের তালিকা করা হয়েছে তাতে কী অদ্ভুত, তারিখের সঙ্গে মিল দেওয়ার জন্যেই যেন ১১ নম্বরে এই ভূমিকম্পটির কথা আছে। এই তালিকায় শেষ ভূমিকম্পটি হল ১৯৯৫-এর ১৭ জানুয়ারি, জাপানের কোবে-তে, যাতে ৫,২৫০ জন মারা যায়। সে যাই হোক, ১১ নম্বর ভূমিকম্প, যাতে তিন লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল সেটা হয়েছিল কলকাতায়।

তখন নিশ্চয়ই কলকাতায় এত লোক থাকত না। এত বাড়ি, সেতু, স্তম্ভ, মিনার, মেট্রো— এসব তো কিছুই ছিল না। তাহলেও অত লোক থাকত যে মরেই গেল তিন লক্ষ। আর একটা তো শহরে নিশ্চয়ই শুধু মানুষই থাকে না। যেমন এখনকার কলকাতায় চিড়িয়াখানার প্রাণীদের বাদ দিলেও যে অসংখ্য না-মানুষ প্রাণীদের আমরা দেখতে পাই তারাও নিশ্চয়ই ছিল। যেমন কুকুর, গরু, ছাগল, বেড়াল, কাক, চড়ুই, চামচিকে ও আরও কত প্রাণী। ভূমিকম্পই হোক, বিশ্বযুদ্ধের মতো ঘটনাই হোক বা মহামারী অথবা শান্ত সময়েও কোনো পারমাণবিক অস্ত্রবাহী ডুবোজাহাজের দুর্ঘটনাই হোক—মানুষের বেলায় ঠিক হোক, ভুল হোক, মোটের ওপর একটা হিসেব থাকে। প্রাণহানি বললে কী বোঝায়? নিশ্চয়ই মানুষ। অনেক সময় বাসের ভেতরে লেখা দেখা যায়—সময়ের চেয়ে জীবনের দাম বেশি। কার জীবনের দাম বেশি সেটা এর চেয়ে খুলে বলার দরকার হয় না। কী বলতে চাওয়া হয়েছে সেটা জানাই থাকে। জানা ব্যাপারটাই জানানো হল। সকলেই জানে কিন্তু বড় বড় করে লেখাও থাকে। কেন এরকম করা হয়? যে সাত ঘণ্টা বাকি আছে সে-সময়টা না ঘুমিয়ে এরকম কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা যায়। এর মধ্যে সকলেই একটা কুয়াশার মতো ছড়িয়ে পড়া নিস্তব্ধতা সম্বন্ধে এখনও বোধহয় সচেতন হয়নি। অথচ একটু খেয়াল করলেই জানা যাবে যে শহর শব্দময় হলেও তার মধ্যে কুকুরের ডাক নেই। চাকার শব্দ, পিস্টনের শব্দ, ইঞ্জিনের শব্দ, ফোনের শব্দ, টায়ার বা গ্যাসের সিলিন্ডার ফাটার শব্দ, টেলিভিশনের চেনা চেনা কণ্ঠস্বর, চলন্ত গাড়িতে স্টিরিও বাজার শব্দ, ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ, শরীরে শরীর ঘষা ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার রবার-রবার শব্দ, দেশলাই কাঠি জ্বলে ওঠার শব্দ, চুল্লির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ, বঁটি ধোওয়ার শব্দ, খাওয়ার শব্দ, নিঃশব্দ ছাপা শব্দ, শবদেহ নিয়ে যাওয়া জানানোর শব্দ, ট্রামেদের গুমটিতে ফেরার শব্দ, টিউব আলোর তোতলাতে তোতলাতে জেগে ওঠার শব্দ, এক হাতওয়ালা টিউবওয়েলের জল ডাকার শব্দ—সব

যেমন থাকে তেমন রয়েছে। কিন্তু কোনো কুকুরের ডাক নেই, কোনো গাড়িতে ধাক্কা খাওয়ার পরে তার রেশ রেখে যাওয়া আর্তনাদ নেই, ককিয়ে কান্না নেই। কুকুরের কোনো শব্দ নেই। কুকুর নেই। নাকি আছে অথচ ডাকছে না। সাত ঘণ্টা সময় হাতে। এটা নিয়েও খোঁজ-খবর করা যায়। কুকুরগুলো সব কোথায় গেল? ফুলরা কোথায় যায়, ফুলকুড়ানি বালিকারা কোথায় যায়, তারা যে তরুণদের দেখে মুগ্ধ হয় তারা কোথায় যায় এবং তারা যে কবরে যায়, সে-কবর আবার ফুলদল হয়ে যায় এসব নিয়ে যে গান বেঁধেছিল সেই বুড়োটা বলতে পারবে? কোথায় গেল কুকুরেরা?

এমনকি হতে পরে যে কুকুরদের ল্যাজে তারাবাজি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল! তাতে মজা পেয়ে তারা আকাশে ছুটে গেছে লাফাতে লাফাতে আর রাতের শূন্যে তাকিয়ে আমরা সেইসব তারাবাজির গমনাগমন বা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে ল্যাজ থেকে খসে পড়া বা অনেকক্ষণ, অনেক যুগ, অনেক আলোকবর্ষ ধরে জ্বলতে থাকা দেখছি তো দেখছিই। আরও সাত ঘণ্টা ধরেও দেখে যাওয়া যায়।

অচেতন করে বেশ ধারালো অস্ত্র বা করাত দিয়ে যদি কুকুর চেরাই করা হয় তাহলে খুব একটা শব্দ হবে কি? করাতকলে দাঁড়িয়ে যারা গাছের গুঁড়ি চেরাই দেখেছে, দেখেছে ঝুরঝুর করে কাঠের গুঁড়োয় মাটি ঢেকে যেতে, তারা কি এত সূক্ষ্ম, এত সম্মোহিত শব্দ শুনতে পাবে? অচৈতন্য কুকুরদের চেরার শব্দ? ফাঁড়ার শব্দ। তারপর আরও সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণের শব্দ। এর আগেই তো আকাশগঙ্গার কথা হচ্ছিল, যেখানে মহাকাশযানে লাইকা-কে পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে আমরা ইথার ও রক্তের গন্ধময় কুকুর ব্যবচ্ছেদের টেবিলে কীভাবে এল্যাম? কীভাবে এলাম, লাইকা? কীভাবে এলাম স্ত্রেলকা, বেল্‌কা? কীভাবে?

আমরা বরং এই রক্ত ও ইথারে মাখামাখি টেবিল ছেড়ে আকাশের ফুটো ফুটো তেরপলের নিচেই একটা বিকট দুর্গন্ধময় জায়গায় যেতে পারি, যার নাম, পিঁজরাপোল। অভিধানে বলা আছে যে পিঁজরাপোল হল—'অকর্মণ্য গরু, ঘোড়া প্রভৃতির জন্য বৃহৎ পিঞ্জরাকারে ঘেরা স্থান।' সেখানে রাতে যায় রাত্রিচর রাক্ষস, চোর, প্যাঁচা বা বেড়াল। বৃষ্টি এখানে মৃত কুকুরদের পচাতে ও ফুলিয়ে ওঠাতে সক্রিয় হয়েছে, যেমন হয়েছে রোদ, ভ্যাপসা বাতাস, মাছি, মূষিক ও জীবাণু। এখানেই জন্মানো ও এখানেই মরে যাওয়া ওই কুকুর-শাবকটিকে দেখ যার চোখও ফোটেনি। এখন সে কিছুটা তুলোটে অবয়ব-এর। দেখ যে, পিঁপড়েরা তার চোখের বন্ধ, না ফোটা আস্তরনটি খেয়ে নেওয়ার ফলে তার চোখ খুলেছে। বড়ই অকিঞ্চিৎকর ওই ক্ষুদ্র একটি মৃত চোখ, যা ঘোলাটে। এইবার দেখ যে, সেই চোখে যার ছায়া পড়েছে, তার নাম মহাকাশ। ওই একটি মৃত চোখ বা দর্পণের বিন্দু ধরে রেখেছে ছায়াপথ, দূরে অপসৃয়মান গ্যালাক্সি, ক্রতু, পুলহ, শিশুমার তারামণ্ডল ও কত না ধূমকেতু ও বেকার, নিষ্প্রাণ কৃত্রিম উপগ্রহ। আরও আছে। কালপুরুষের দক্ষিণ-পূর্বে তাকাও। ক্যানিস মেজর বা বৃহৎ কুকুরমণ্ডলের দেখা পাবে। এরই মধ্যে দেখ কী সুন্দর ওই আকাশের উজ্জ্বলতম তারাটি। ওরই নাম লুব্ধক বা সিরিয়াস। যারা নক্ষত্র-চর্চা করে তারা জানে যে ১ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টায় ও ১ নভেম্বর ভোর ৪টে নাগাদ লুব্ধক মধ্যগমন করে। তার কী ইচ্ছা তা আরও সাত ঘণ্টা পরে জানা যাবে। তার নির্দেশ জারি করা হয়ে গেছে। যা আর ফিরিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তবে এখনও সাত ঘণ্টা সময় রয়েছে।

পিঁজরাপোল একটা নয়। এবং একটির ভেতরেই কম করে একশো সতেরোটা কুকুরের শবদেহ গুনে ফেলা যায় যার মধ্যে ওই চক্ষুষ্মান শাবকটিকে না ধরলেও চলবে। বিভিন্ন বিচিত্র

ভঙ্গিতে তারা পড়ে আছে। কারও গলায় ছেঁড়া দড়ি পরানো। কেউ বুড়ো। কেউ জওয়ান। কেউ প্রথমবার মা হতে যাচ্ছিল। এখন কৃমির খাদ্য। আরও সাত ঘণ্টা তাই থাকবে। চূড়ান্ত মুহূর্তে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করার আগে কেউ কামড়াতে গিয়েছিল। কেউ শেষবার থাবা তুলেছিল। কেউ থাবা গুটিয়ে নিয়েছিল। কেউ মরে যাওয়ার পরে শান্ত, ঘুমন্ত চেহারা নিয়েছিল। পিঁজরাপোল আপাতত ধৃত কুকুরদের মৃত্যুভূমি হয়ে অন্যান্য পিঁজরাপোলের মতোই শবস্তব্ধ হয়ে থাকুক। মহাকাশ থেকে দেখলে এই কলকাতাকে একটি অতিনগণ্য তারাপুঞ্জ বলেই মনে হবে। অন্তত সাত ঘণ্টা দূর থেকে দেখলে তো বটেই। অন্ধকারের ধাওয়া খেয়ে কিছু দুর্বল জোনাকি এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। এই অবশ আলোর ঘেঁষে থাকা দেখতে থাকলে একসময় ঘুম নেমে আসে। এবং সেই ঘুম সাত ঘণ্টা ধরেও চলতে পারে।

তবে একটা কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। একাধিক পিঁজরাপোল ঘুরে ঘুরে সব কটি কুকুরের শবদেহ লক্ষ করলে দেখা যাবে আগে যে বৈচিত্র্যের কথা বলা হয়েছে তা মোটেও সাধারণ চিত্র নয়। অনেক কেন, বেশিরভাগ কুকুরই অসহায়ভাবে মৃত্যুকে মেনে নিয়েছে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছে যে কুকুরদের অসহায়তা শেখানো যায়। আমরা শাটলবক্স পরীক্ষার কথা জানতে পারি। শাটলবক্স হল একটি দু-ভাগে ভাগ করা বাক্স যার মধ্যে আড়াআড়িভাবে একটি অস্বচ্ছ বাধা বা বিভাজিকা থাকে, যার উচ্চতা, ধরা যাক, এক কুকুর। শাটলবক্সের মেঝেটি ধাতব। সেখানে তীব্র ইলেকট্রিক শক্ দিলে কুকুরটা লাফায় এবং বাধা টপকে বাক্সের অন্য অংশে চলে আসতে পারে, যেখানে মেঝেতে বিদ্যুৎ থাকে না। কিন্তু কুকুরটি যে নিরাপদ অংশে এল সেখানেও বিদ্যুৎ শক্ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এরকম হলে কুকুরটি দিশেহারা হয়ে পড়ে। এবার অস্বচ্ছ বাধাটি সরিয়ে যদি উঁচু একটা কাচ লাগানো যায় তাহলে দেখা যাবে যে কুকুরটা লাফিয়ে কাচের গায়ে আছড়ে পড়ছে। অজান্তে বিষ্ঠা বা মূত্রত্যাগ করা, চেঁচিয়ে বা ককিয়ে ডাকা, কম্পন, বাক্সের গায়ে কামড়ানোর চেষ্টা—এরকম অনেক কিছুই তখন দেখা যাবে। কিন্তু দেখা গেছে যে এক নাগাড়ে দশ-বারো দিন এই পরীক্ষা চালিয়ে গেলে কুকুরটি আর লাফাবার বা পালাবার চেষ্টা করে না। এইভাবে তাকে অসহায়তায় শেখানো যায়। কুকুরেরা এই ভাবেই অসহায়তা শিখে নেয়। পরীক্ষার সময় দেখা গেছে যে কুকুরেরা হাল ছেড়ে দেয় এবং চুপটি করে শক্ মেনে নেয়। এইভাবে কুকুরেরা বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং প্রমাণ করেছে যে, অসহায়তা মেনে নেওয়া শিখে ফেলা যায় ও শেখানো যায়। কুকুর-উপকথায় যেহেতু কুকুরদেরই আনাগোনা বেশি, তাই বলে রাখা দরকার, যে অসহায়তা শেখানোর পরীক্ষায় শুধুমাত্র কুকুরদের ওপরেই পরীক্ষা চালানো হয়নি, অন্যান্য প্রাণীরাও ছিল—যেমন ইঁদুর ও গোল্ডফিশ।

শাটলবক্স একটা জোটাতে পারলে হাতেনাতেই পরীক্ষা করে জেনে নেওয়া যেতে পারে যে সত্যিই অসহায়তা শেখানো যায় কি না।

হাতে তো এখনও সাত ঘণ্টা সময় রয়েছে। ঘেউ! ঘেউ!

২

ধারালো চাঁদ ঝলসায় রাতের গলায়
প্ল্যানেটেরিয়ামের ইলেকট্রনিক ঘড়িতে
তখন দারুণ জ্বর
অন্ধকার ফাঁকা ময়দানে
একটা ট্রাম টাল খায়
আচমকা চলে গেল পুলিশভ্যান
ঘুমন্ত কুকুরগুলোকে চমকে দিয়ে
রোজ চমকে দেয়।

প্রথমেই উঠবে একেবারেই যা অলৌকিক নয় সেই কান গজিয়ে ওঠার ঘটনাটি। কলকাতা যতই মৃত চাকর-বাকর সমতে হৃষ্টপুষ্ট ও সেলফোনবাহী নিত্য যোগাযোগের মমি ও বেলুনদের শহর হয়ে উঠছে ততই এ ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটার সম্ভবনাও বাড়ছে। চারটি চাকার শূন্যের অর্থাৎ ০০০০-র ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি ঝকঝকে মোটরগাড়ি যার ভেতরে মৃত মুখে প্রসাধন ও কলপ গলে গলে গড়িয়ে পড়ছে। অন্যদিকে ছেঁড়া ও তাপ্পি-লাগানো ঘুড়ি যেমন বাতিল হয়ে গেলেও তারে আটকে কঙ্কালের মতো মরা-হাত নাড়ে তেমনই বেঘর বেপাত্তা হয়ে রয়ে গেছে যেই রোগা-প্যাটকা বা অপুষ্টিতে ফুলে যাওয়া পার্ট-নাম্বার, সিরিয়াল-নাম্বার, রেশন কার্ড, হাসপাতাল থেকে দেওয়া নোংরা চিরকুট, বেফয়দা দস্তাবেজ ও দমকা ঝড়ের লাঠিচার্জে এদিক-ওদিক ছুটতে থাকা পলিব্যাগ ও মুড়ির ঠোঙারা, কাদা-মাখা পালক ও হ্যান্ডবিল। এসব অগুনতির কোনো হিসেব নেই।

এই কুকুরটার রঙ কালো, যদিও তার সামনের বাঁ-দিকের থাবাতে কিছুটা জায়গা সাদা লোমে ঢাকা ছিল। ওর নাম দেওয়া যাক কান-গজানো। কেন এই নাম সেটা একটু পরেই জানা যাবে। কান-গজানো কোনো সাহসী কুকুর ছিল না। নেহাতই ভীতু স্বভাবের একটি মেয়ে-কুকুর যার একবার পাঁচটা জ্যান্ত আর একটা মরা বাচ্চা হয়েছিল। দুটো বাচ্চা চুরি হয়েছিল। সে দুটো তো মরেনি! দুটো গাড়ি চাপা পড়ে। একটাকে ছোট থাকতেই শকুন ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। আর বাকি দুটো চুরি হয়ে যায়। এর ফলে একটা আস্ত শীতকাল কান-গজানোর কান্না থামেনি। গোড়ার দিকে কান্নাটা বিঁধতে না পারলেও ভেসে বেড়াত। পরে সয়ে যাওয়ার ফলে আলাদা করে আর চেনা যেত না। আক্ষরিক অর্থে 'সন অফ আ বিচ্' বলে একটাও থাকল না। অন্তত সে-বার। এদিকে প্রত্যেকটা স্তন দুধে ফেটে পড়ছে। কিন্তু সবই সয়ে যায়।

কুকুররা কতদিন তাদের মৃতদেহ স্মরণে রাখে বা রাখতে পারে এ নিয়ে হয়তো-বা কোনো গবেষণা হয়েছে। না-হওয়াটাই বরং অসম্ভব। যাই হোক, সেই কালো, কাফ্রি কুকুর-মা একটা একতলার ফ্ল্যাটের গ্রিলের বাইরে একদিন খাবারের গন্ধ পেয়ে অথচ খাবার খুঁজে না পেয়ে ঘাস সরিয়ে সরিয়ে সন্ধান করছিল। ঘাসে যে ছোট্ট ছাই ছাই রঙের প্রজাপতিরা থাকে তারা পালাল। উড়ে গেল পিঠের ওপরে দুই ডানা জোড়া রোগা পরীর মতো কাঠি-ফড়িং। উড়ে গেল গঙ্গা-ফড়িঙের বাচ্চারা যারা জন্মেই হাইজাম্প প্র্যাকটিস শুরু করে। গন্ধটা রয়েছে কিন্তু খাবারটা নেই কেন—এই ব্যাপারটা নিয়ে কুকুর-মা যখন তন্ময়, তখন গ্রিলের ফাঁক দিয়ে তার মাথার ওপরে মিউরিয়েটিক অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হয়। সহসা ঝাঁকুনি দিয়ে পিছু হটেছিল বলে

অ্যাসিডটা ফ্যাঁস ফ্যাঁস্ করে রাগী ধোঁয়া বের করে, লোমের ওপর পিছল খেয়ে একটা কানের দিকে গড়িয়ে গিয়েছিল। এবং কানটা গোড়ার দিক থেকে গলে যেতে থাকে।

চিল-চিৎকার করতে করতে ছুটতে থাকা অ্যাসিড-আক্রান্ত কুকুরীটি তখন একদিকে মাথা হেলিয়ে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে দৈবক্রমে একটি জল-জমা কাদা-জায়গা দেখতে পায় এবং সেখানে গলে যেতে থাকা কানটি কাত হয়ে শুয়ে ডুবিয়ে দেয়। সেই পচা কাদাজলের মধ্যে পৃথিবীর প্রাণশক্তি ছিল। সিক্ত, শীতল আরাম ছিল। অবশ করে দেওয়ার কুহক-মন্ত্র ছিল। ঘাস ও নানাবিধ উদ্ভিদের ওষুধ ছিল। সর্বোপরি আশ্রয় দেওয়ার একটি কোল ছিল। বস্তুত এমন জায়গাতেই কাদাজল জমে যেখানে ভূপৃষ্ঠ কিয়দংশে অবতল। ঘেউ! ঘেউ!

এরপর লোম-ওঠা, কান-গলা, খোবলানো জায়গাটা দেখতে এমনই হয়ে উঠেছিল যে তার প্রতি যে-পুরুষ-কুকুরদের টান, তারাও তাকে এড়িয়ে চলত। কিন্তু নানা মাত্রার প্রাণের অন্তর্বিষ্ট ক্ষমতা এক জাদু-বাস্তব। লোম ক্রমে ঢেকে ফেলল জায়গাটা। তারপর যেমন গাছের ফেকড়ি বেরোয়, তেমনই উঁচু হয়ে উঠল। এবং বর্ষার জলে কেমন করুণা রয়েছে যে ধীরে ধীরে অন্যটার চেয়ে একটু ছোট মাপের হলেও, মানানসই গোছের একটা কানও গজাল। এই জন্যেই তার নাম কান-গজানো। ওর সঙ্গে পরে আবার দেখা হবে।

কুকুরদের বিরুদ্ধে পর পর যে-ঘটনাগুলো কয়েক দিনের ফারাকে ঘটেছিল সেগুলো স্বল্পপরিসরে জানবার আগে এটাও মনে রাখা দরকার যে, সব ঘটনার পরিণতি কান-গজানোর মতো আনন্দের নয়। ঘটনার ওপরে কুকুর-উপকথার মতো আলটু-ফালটু জিনিস যারা লেখে তাদের কোনো হাত থাকে না। যারা এসব ছাই-পাঁশ পড়ে তাদের বরং থাকলেও থাকতে পারে।

দ্বিতীয় ঘটনাটা নির্দিষ্ট একটি জায়গায় ঘটেছিল। যাদবপুর থানা থেকে আনওয়ার শাহ্ রোড ধরে কেউ যদি লেক গার্ডেন্স বা নবীনা সিনেমার দিকে যায় তাহলে ঠিক একটা স্টপের মাথায় ডানদিকে একফালি মাঠ পড়ে যার পেছনে হল ই.ই.ডি.এফ। এই মাঠে বেশ বড় একটা পুজো হয়। খেলাও হয়, ভালো ম্যাচ-ট্যাচ থাকলে রাস্তায় বেশ ভিড়ও জমে যায়। এই মাঠের উল্টোদিকের ফুটে যে চায়ের দোকান আছে সেখানে সাদাটে থাকত। সাদা হয়তো আগে ছিল কিন্তু তখন চোখে পড়েনি। চোখে যখন পড়ল তখন অনেক কিছু ঘটে গেছে।

দুপুরবেলা। চড়া রোদ্দুরে পিচ নরম। এতে থাবা না-আটকে গেলেও নখের ছাপ পড়বে। সিমেন্ট জমে যাওয়ার পরে এরকম ছাপও অনেক সময় থেকে যায়। খেয়াল রাখলে চোখে পড়বেই। সেই রোদ্দুরের তাতে ঝলসাতে ঝলসাতে সাদা একটা অ্যাম্বাসাডার, ডব্লিউ বি ওয়াই নম্বরের, কম করে ষাট কিলোমিটার জোরে আসছিল এবং সাদাটে তখন রাস্তা পেরোচ্ছিল। সাদাটে ছিল রোগা, হাড়-জিরজিরে, নিরীহ ও রাম ভীতু। গরমে মাথা গুলিয়ে যায়। সাদাটেরও বোধহয় সে-রকম কিছু হয়ে থাকবে। তা না হলে সে প্রায়-শব্দহীন ও আগুয়ান গাড়িটাকে লক্ষ করেনি কেন, যার মধ্যে বাজনা বাজছিল কিন্তু চালক বাদে কেউ ছিল না।

স্টিয়ারিংটা বাঁদিকে সামান্য একটু কাটালে এটা হত না। এমনও নয় যে বাঁ-দিকে কোনো গর্ত বা গাড়ি বা সাইকেল কিছু ছিল। একটা ছোট্ট মোচড় যদি স্টিয়ারিং-এ পড়ত তাহলে গাড়িটার সামনের ডানদিকের বাম্পার থেকে সাদাটের মাথার দূরত্বটা ফুট দেড়েক বেড়ে যেত। এবং সামনে দিয়ে দুধ-সাদা চকচকে হলকাটা চলে যাওয়ার পরে সাদাটে হয়তো বুঝতে পারত যে কী হতে যেয়েও হল না। কিন্তু সাদাটে যে ডানদিক থেকে রাস্তা পেরিয়ে আসছে সেটা তো অনেক দূর থেকেই দেখতে পাওয়ার কথা। সাদাটে যে-গতিতে আসছিল সেটা মোটেই দ্রুত নয়, অতএব বেশ কিছুটা সময় ধরেই তাকে দেখতে পাওয়ার কথা।

গাড়িটার ওজন ও গতি গুণ করলে যা হয়, তার সঙ্গে সাদাটের ভীতু ও সর্বদাই নিচু মাথাটির ধাক্কা খাওয়ার শব্দটি, দুষ্টু বুটের চাপে ফাঁকা ফ্রুটির বাক্স ফাটার মতোই। গাড়িটা এত জোরে চলে যায় যে, অত সুন্দর মোমপালিশ করা গায়ে ঘিলু বা রক্ত ছিটকে লাগল কি লাগল না বুঝেই ওঠা গেল না। উঁচু, বাঁধানো রোড-ডিভাইডারের ওপারে ছিটকে গিয়েছিল সাদাটের দেহ। মাথাটা ছত্রখান। পেছনের পা দুটো কয়েকবার টান টান হল, গুটিয়ে গেল, আবার টান হয়ে কয়েকবার থেমে থেমে কাঁপতে কাঁপতে চুপচাপ হয়ে যাওয়ার, নিঃসাড় হয়ে যাওয়ার দিকে এগোয়। গাড়িটা দয়া করে একটু যদি বাঁদিকে কাটানো যেত, স্টিয়ারিংটা বাঁ-হাত দিয়ে একটু আলতো, প্রায় না-ঘোরার মতো বাঁ-দিকে যদি সামান্যতম ঘুরত—কিন্তু এটাও তো হতে পারে যে, সাদাটেকে লক্ষ্য করা হয়েছিল এবং সেইমতোই গাড়িটা চালানো হয়েছিল যে, ঠিক সময়ে ঠিক ব্যাপারটা ঘটে। এখানে কাকতালীয় কিছুই হয়নি, সবটাই স্পষ্ট, কাকজ্যোৎস্নার মতো ম্লান বোধহয় নয়। গাড়িটা হয়তো তার ওপরে যে লঘুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাই বাধ্য যন্ত্রের মতো পালন করেছে। ট্রিগার টানার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক যেমন তার কাজ করে বা বিমান থেকে বোতাম টিপলে বোমা।

তিন নম্বর ঘটনাটা ঘটেছিল উত্তর কলকাতায়। পাঁচমাথার মোড়ের কাছেই। ওখানে পাটকিলে একটা মায়ের চারটে বাচ্চা বেশ ভালোভাবেই বড় হচ্ছিল। দশদিনের পর যথারীতি চোখও ফুটেছিল। কলকাতায় তখন কলকাতার আন্দাজে বেশ শীত। কুকুরছানাগুলোর তখন তিন সপ্তাহ হয়েছে, অর্থাৎ তারা টলমল করে হাঁটতে পারে। একটু ডাকতেও পারে। খুব ভোর। একজনের ওপরে একজন চড়ে একটা জীবন্ত গরম পিরামিড বানিয়ে ওরা ঘুমোচ্ছিল। পাটকিলে তখন সেখানে ছিল না, যদিও একটু পরেই সে ফিরে আসে। ওদের গায়ে এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়া হয়। ভিজে চুপসোনো বাচ্চাগুলো ঠক্-ঠক্ করে কাঁপে। কাঁউ-কাঁউ করে সরু কান্না জানায়। কিন্তু পরে, রোদ ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল যে হিমঠাণ্ডা জলের সেই ধাক্কা তারা খুব একটা গায়ে মাখেনি। বরং এ-ওকে যথারীতি কামড়াচ্ছে, জড়াজড়ি করে খেলা করছে এবং মা এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে দুধ খাওয়ার জন্য। বালতির ঠাণ্ডা জলে কাজ হল না দেখে বেশ কিছুটা দূর থেকেই বাচ্চাগুলোকে লক্ষ্য করে একটা আধলা, কোণা-ভাঙা ইট ছোঁড়া হয়। ইটটা অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পাটকিলে অনেক ইট-ছোঁড়া দেখলেও তার বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে এবারের এই এত বড় ইটটার উড়ে আসা এবং ফুট খানেক দূরে ফুটপাথে চিড় ধরিয়ে আছড়ে পড়ার মধ্যে সুস্পষ্ট একটা সংকেত, একটা ইঙ্গিত রয়েছে। যে-দিক থেকে আধলা ইটটা এসেছিল, সে-দিকে লক্ষ্য করে পাটকিলে কয়েকবার রাগী গলায় ডাকল। তারপরই কুঁই কুঁই শব্দ করতে করতে বাচ্চাগুলোকে শুঁকতে লাগল। কিন্তু পাটকিলে এখানে আর থাকেনি। চারটে বাচ্চা নিয়ে সে ওখান থেকে চলে যায়। বরাবরের জন্যে। কোথায় সেটা পরে জানা যাবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই তিনটি ঘটনার মধ্যে কোনো মিল কি ধরা পড়ে? নিশ্চয় পড়ে। এবং যোগসূত্রটা যে অশুভ সেটাও ব্যাখার অপেক্ষা রাখে না। এরপরই শুরু হয়ে গেল কলকাতাকে কুকুর-শূন্য করার সর্বাত্মক অভিযান, কারণ নতুন সহস্রাব্দে নতুন সাজে যে মহানগরী মায়ারাক্ষসীর মতো সাজছে, সেখানে কুকুরদের কোনো জায়গা থাকতে পারে না। এটা যখন ঘোষিত নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন, সম্মতি ও শিলমোহর অর্জন করতে থাকে তখন এর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি শিবির সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করেছিল যদিও কোনো লাভ হয়নি। এক হচ্ছে, জীবদের প্রতি নির্মমতার বিরুদ্ধে যে-সংগঠনগুলি সক্রিয় এবং দু-নম্বর হল, নানা দামের জলাতঙ্ক-প্রতিরোধক ওযুধ যে সব কোম্পানিগুলি বানায়। পৃথিবীতে

এমন কোনো পরিকল্পনা হতে পারে না, তার মেয়াদ যাই হোক না কেন, যাতে সব পক্ষকে খুশি করে কাজে নামা যায়। এবং এই পরিকল্পনা কোনো ব্যক্তি বা দল বা দলের জোট যেই নিক না কেন কিছু এসে যায় না। প্রথমত, সবপক্ষের কথা শুনলে চলে না বা শোনা হয় না। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনাটি চালু হবার পরে তার নিজস্ব ভরবেগে চলতে থাকে। এবং তৃতীয়ত, এ-রকমও হতে দেখা গেছে যে পরিকল্পনাটি লাগামছাড়া ঘোড়ার মতো ছুটছে, সামনে যা কিছু পড়ছে তা হ্রেষায় ও উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে উড়িয়ে দিচ্ছে এবং পরিকল্পনা যারা করেছিল তারাই সেই ঘোড়ার ছুটন্ত পায়ের লাথিতে ছিট্‌কে পড়ছে, নাল-বাঁধানো ক্ষুরে তাদের চশমা ও ক্যালকুলেটার চৌচির হয়ে যাচ্ছে এবং ধুলোর ঝড় উঠে দশদিক আড়াল করছে, যাকে আসন্ন সন্ধ্যা বলে ভুল করে পাখিরা বাসায় ফিরে আসছে। দিনকে রাত ও রাতকে দিন বানাবার এই ম্যাজিক, পরিকল্পনার আওতাতে পড়ে। নিছকই যা ম্যাজিক, ভেলকি বা ভোজবাজি, তার পেছনেও কিন্তু বজ্রকঠোর পরিকল্পনা থাকে। অপরিকল্পিত আলৌকিক বলে কিছুই সম্ভব নয়। এই নিয়ম মেনেই কুকুর-খেদা অভিযানে একাধিক পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

'আমরা কি এই সত্যটি মানুষের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারি? কেন পারা যাবে না? মানুষ আর কুকুরের মধ্যে স্নায়বিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি যদি অভিন্ন হয়, তাহলে আমার মনে হয় না যে, মানুষের পক্ষে এটা অপমানজনক বলে মনে হবে। আজ জীববিদ্যায় আমরা যে শিক্ষালাভ করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে কেউই এই তুলনা টানার বিরুদ্ধবাদী হতে পারে না।'

ইভান পেত্রোভিচ পাভলভ।

pathagar.net

৩

'বারবার থেমে, খুবই জঘন্য একটি গেরিলা পরিক্রমার পর, কাকভোরে আমরা একটা জঙ্গল পেলাম যার ধারেকাছেই কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিল।'

চে গুয়েভারা'র দিনলিপি
৫ অক্টোবর, ১৯৬৭

কুকুর খতম করার একাধিক পরিকল্পনা করার মধ্যে মধ্যে ছুটির দিন বা রবিবারের ফাঁক ছিল, যার মানে গাড়িঘোড়া কম। সে সময় কয়েকটি কুকুরকে খুবই ব্যস্তভাবে শহরের বিভিন্ন দিকে ধাবমান হতে দেখা যায়, যদিও সে গতি ঠিক স্বল্পপাল্লার দৌড়ের মতো ক্ষিপ্র ও ক্ষণস্থায়ী নয়, বরং দূরপাল্লার দৌড়বীরদের পদ্ধতিতে, কখনও গতি বাড়িয়ে, কখনও কমিয়ে, আবার বাড়িয়ে...এবং সে সময় সেই কুকুরদের মুখমণ্ডলের কোনো উৎফুল্লতা, চড়া মেজাজ বা বিষাদের লেশমাত্র দেখা যায়নি। তারা মোটের ওপর রাজপথ, থানা, স্কুল, রাজনৈতিক দলের দপ্তর, ক্লাব ইত্যাদি এড়িয়ে গলিপথ, ফাঁকা উঠোন, বস্তির মধ্যের অপ্রশস্ত রাস্তা, গাড়ির তৈলাক্ত স্বেদে ভেজা কালো মাটির চত্বর, জবাই করা মুরগির পালক ও পেঁয়াজের খোসা ছড়ানো-ছেটানো বাজারখোলা, হাসপাতালের পেছন দিকের নোংরা রাস্তা যেখানে কাটা প্লাস্টার, রক্তমাখা তুলোও বিবর্ণ ব্যান্ডেজের মধ্যে শিশুদের খেলার শব্দ ও বৃদ্ধবৃদ্ধাদের অপেক্ষা মিশে থাকে—এইসব এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। এই প্রত্যেকটা জায়গাতেই সেখানকার কুকুরেরা নিজস্ব অধিকার কায়েম করে বাস করে। তাদের সঙ্গে এই গতিয়ান কুকুর-দূতদের চোখাচোখি বা কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা

বিনিময় হয় অথচ কোনো কলহ হয়নি। কুকুরদের ক্ষেত্রে এ রকম সচরাচর হয় না। কোনো কুকুর-দলই তাদের এলাকা বা অঘোষিত সীমানার মধ্যে চেনা বা অচেনা কুকুরদের আগমন মেনে নেয় না। কুকুরেরা জেনে গিয়েছিল যে কলকাতা আর তাদের চায় না।

পরিকল্পনা প্রস্তাব-১

কালক্ষেপ করা ঠিক হবে না। কুকুরদের গুলি করে মেরে ফেলা হোক।

বিরুদ্ধে মত

সম্ভব নয়। বুলেটের দাম আছে। দ্বিতীয়ত, বন্দুকের শব্দ পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর। তৃতীয়ত, এ ধরনের অভিযান রাতেই চালানো সম্ভব, কিন্তু বন্দুকধারীরা তখন মদ্যপ অবস্থায় থাকে, ফলে গুলি অন্য কোথাও লাগতে পারে। চতুর্থত, আমাদের কুসংস্কারময় দেশে এ কাজ করতে অনেক বন্দুকধারী রাজি নাও হতে পারে।

পরিকল্পনা প্রস্তাব-২

রাতের প্রথম প্রহরে বিষ মেশানো মাংস ছড়িয়ে দেওয়া হোক। পরে, ভোররাতে মনুষ্যেতর প্রাণীদের মৃতদেহ বহনকারী গাড়ি পাঠিয়ে, লোকজন জেগে ওঠার আগেই, লাশগুলো তুলে নিয়ে গেলেই হবে। বিষ যারা বানায়, তারা বিনা দামেই বিষ সরবরাহ করে পরিকল্পনাটির পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে এবং একইভাবে বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরাঁ ও কসাইখানা থেকে বাসি টোকো মাংস যোগাড় করা যায়। পচা মাছ হলেও চলবে।

pathagar.net

বিরুদ্ধে মত

প্রস্তাবটি ভালো কিন্তু এর প্রধান বিপদ হল, এই বিষাক্ত মাংস যে শুধু কুকুররাই খাবে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে গেলে বিশ্বের সামনে কলকাতাকে হেয় হতে হবে এবং নিন্দুকেরা অনেক কিছু মুখোমুখি বা সোজাসাপটা বা কথায় কথায় বলার সুযোগ পেয়ে যাবে। আর একটি সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিনা পয়সায় পাওয়া বিষ যদি ভেজাল হয়, তাহলে উদ্দেশ্য তো চরিতার্থ হবেই না, উপরন্তু কুকুরেরা বাড়তি শক্তি পেয়ে যাবে।

পরিকল্পনা প্রস্তাব-৩

কুকুর মারার ব্যাপারে আমরা যদি কোনো দেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করি তাহলে আমাদের সম্মানহানির প্রশ্ন বোধহয় ওঠে না। যে-দেশটাকে সবাই বিশ্ব-ফুটবলের একনম্বর দেশ বলে জানে সেই ব্রেজিলের অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি পর্ব 'ব্রেজিলিয়ান মির‍্যাকল্' (১৯৬৭-১৯৭৩) বলে পরিচিত। ওই সময় ব্রেজিলের বড় বড় গয়নার দোকানের মালিকেরা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর লোকদের দিয়ে একটি দল বানিয়েছিল, যাদের কাজ ছিল রাতের রাস্তায় ঘুমন্ত ভিখারি শিশু ও বালক-বালিকাদের গুলি করে মারা। এর পেছনে একটা গভীর ও সারবান যুক্তি ছিল। আজকে যারা ছোট লুম্পেন তারাই কিন্তু কাল দামড়া হয়ে ডাকাবুকো গুন্ডায় পরিণত হবে এবং গয়নার দোকানে ডাকাতি করবে। 'ব্রেজিলিয়ান মির‍্যাকল্'-এর বহু আগে, রাশিয়াতে

বিপ্লবের পরেই, উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন যে, দুনিয়াভর বলশেভিক মুরগির বাচ্চাগুলোকে তাড়া করে বেড়ানোর চেয়ে বলশেভিক ডিমগুলোকে থেঁতলে দেওয়াই ভাল। মহজন-প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে আমরাও ব্যাপারটা ভেবে দেখতে পারি। কুকুরের বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেলতে গুলি বা বিষ, কোনো কিছুরই দরকার নেই। ঘাড় মুচড়ে বা আছড়ে বা পিটিয়ে বা জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলা খুবই সহজ। আরও সহজ হল বড় সাইজের পলিব্যাগের মধ্যে দলা পাকিয়ে অনেকগুলোকে ঢুকিয়ে মুখটা জবরদস্ত করে বেঁধে দেওয়া। ভিয়েতনাম, আর্জেন্টিনা ও চিলি থেকে এ বিষয়ে প্রেরণা পাওয়া যায়। বড়গুলোকে মারলে লাশগুলোর হিল্লে করা ঝামেলা। কিন্তু কিছুদিন পরপর বাচ্চাগুলোকে মারলে এরা আর সংখ্যায় বাড়বে না। আমরা এক্ষেত্রে বড়গুলোকে প্রাপ্তবয়স্ক মশা ও বাচ্চাগুলোকে লার্ভার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। সুচারুরূপে প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত করলে জানাজানি বা কেচ্ছার সুযোগও কম।

বিরুদ্ধে মত

প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে ভাবনার খোরাক যোগায়। শুধু তাই নয়, বিংশ শতকের ইতিহাস থেকে যেভাবে এখানে সদর্থক শিক্ষা নেওয়া হয়েছে, তা চমকে দেওয়ার মতোই। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমরা শুধু দিতেই জানি না, নিতেও জানি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল বাচ্চাদের ওই ভাবে মারার দায়িত্ব যাদের দেওয়া হবে তারা দয়াপরবশ হয়ে কিছু বাচ্চাকে মারবে না। এর প্রমাণ আমাদের বিগত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের ইতিহাসের মধ্যেই রয়েছে। বিদেশে যাওয়ার দরকার নেই। তা ছাড়া বেড়ালের মতো গুপ্তচরসুলভ মেজাজের না হলেও কুকুররাও বাচ্চাদের লুকোতে জানে। আর একটা কথা সম্ভবত ভাবাই হয়নি। বাচ্চাদের চোখের সামনে যে ভাবেই হোক মারতে দেখলে তাদের মা-বাবারা চুপচাপ শুধু দেখে যাবে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। ওরা বিকট চিৎকার করতে পারে, অন্য কুকুরদের ডেকে জড়ো করতে পারে এবং এমনকী মরিয়া হয়ে আক্রমণও করতে পারে। এর ফলে শহরে শব্দ ও অন্যবিধ দূষণ বাড়বে এবং কুকুররা মারমুখী হয়ে উঠবে। সেই অবস্থা আমরা কীভাবে সামাল দেব? কুকুরের সঙ্গে লড়াই চালাতে শেষে কী প্যারামিলিটারি ফোর্স নামাতে হবে? ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের দরকার সুখী গৃহকোণ, অসুখী গৃহযুদ্ধ নয়। তাই গোড়াতে সাধুবাদ জানালেও শেষ-বিশ্লেষণে প্রস্তাবটি আমরা নাকচই করলাম। নাকচ করার আর একটি কারণ হল শিশু-কুকুর হত্যার ওপরে জোর দেওয়া। ব্যাপারটা কেমন কেমন লাগেই। কেমন কি না?

'নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি'-তে আচার্য শ্রীসুরেশ্বর বলেছিলেন,

> 'বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি।
> শুনাং তত্ত্বদৃশাং চৈব কো ভেদোঽশুচিভক্ষণে।'

(নৈঃ সিঃ, ৪/৬২)

—অদ্বৈততত্ত্ব সাক্ষাৎকারী পুরুষেরও যদি যথেষ্টাচরণ হয়, তবে অপবিত্র পদার্থভক্ষণ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানী ও কুকুরে কী প্রভেদ?

পরিকল্পনা প্রস্তাব-৪

আমরা ঠিক ভোজসভা বা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অথবা সুন্দরীদের ফ্যাশন প্যারেডের আয়োজন নিয়ে বোধহয় আলোচনা করছি না। এখানে স্পষ্ট দুটি পক্ষ আছে। একটিতে রয়েছি আমরা। অন্যটিতে কলকাতার রাস্তার কুকুর বা নেড়িকুত্তা যাদের বলা হয়। এখানে ধানাই-পানাই,

দীর্ঘসূত্রতা বা দয়া প্রদর্শনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সহজ কথাটা হল কুকুর ধরতে হবে। এবং ধরে আদরে রাখা নয়, মেরে ফেলতে হবে। এতেই কিন্তু হাত ধুয়ে ফেলা যাবে না। যেভাবে আমরা হাজারে হাজারে কুকুর মারার পরিকল্পনা করেছি তাতে মৃতদেহ একটি পাহাড়ে পরিণত হবে এবং সেই পাহাড় পচতে থাকবে। ভূমিকম্প হলে আমরা দেখেছি ইঁদুরদের গায়ে যে মাছি থাকে তারা ইঁদুর মরার ফলে মানুষকে কামড়াতে শুরু করে, যার পরিণতি হল প্লেগ। পচা কুকুর থেকে কী অসুখ ছড়াবে আমরা জানি না। এখনও মানুষ জানে না এমন কোনো মহামারীও শুরু হয়ে যেতে পারে। এইসব নানাদিক চিন্তাভাবনা করে আমাদের প্রস্তাব হল—

(ক) যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি নিয়ে কাজে নামতে হবে। কে কী বলল, কার চোখে কী লাগল, দুনিয়া কী ভাববে এসব ছেঁদো ব্যাপার নিয়ে, ভেবে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। দয়ামায়া দেখাবার অনেক জায়গা আছে—অনাথআশ্রম আছে, প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয় আছে, যৌনকর্মীদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সমস্যা আছে—সেখানে গিয়ে ওসব দেখান। কুকুরদের ক্ষেত্রে ওসব ছিঁচকাঁদুনে মনোভাব দেখানোর কোনো অর্থই হয় না।

(খ) আমরা দেখেছি যে সাঁড়াশি দিয়ে কুকুর ধরার একটা চলনসই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। নির্দিষ্ট এক একটি এলাকা অতর্কিতে ঘেরাও করে চিরুনি অভিযান চালাতে হবে।

(গ) কুকুরগুলোকে ধরে আনা ও মেরে ফেলার মধ্যে ব্যবধান বেশি হলে চলবে না। এর জন্যে আমরা গ্যাস-ভ্যান ব্যবহার করতে পারি, যেখানে সরাসরি ইঞ্জিন থেকে, কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস ওই ভ্যানে দেওয়া যায়। কিন্তু আমরা জানি যে কার্বন-মনোক্সাইডে মানুষ হলে মরতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগে। অথচ গত শতাব্দীর ইতিহাসই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে খুবই উদ্বায়ী হাইড্রোজেন সায়ানাইড গ্যাস এই সময়টাকে পনেরো মিনিটে নামিয়ে আনতে পারে। এটাও অবশ্য মানুষেরই হিসেবে।

(ঘ) এবার আমাদের শেষ কাজ। মৃতদেহের গতি। এর জন্য আমরা জরুরি ভিত্তিতে কয়েকটি বিদ্যুৎ-চুল্লি তৈরি করতে পারি যেগুলো পরে অন্য কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। দেখা যাচ্ছে যে তৃতীয় ধাপটি শেষ হওয়ার পরে সেবারের মতো আমাদেরও কাজ শেষ। এবং শেষ কুকুরদের দলটি এই তিন ধাপ পদ্ধতি অতিক্রম করলেই আমাদের কাজ একেবারেই সমাপ্ত ও সম্পূর্ণ হবে।

বিরুদ্ধে মত

এটা আমরা করতে পারি না। কারণ পুরো মডেলটাই হচ্ছে নাৎসি মৃত্যু-শিবিরের যা আমাদের দুর্নাম ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না। পরিকল্পনাটি ভেবেচিন্তেই করা এবং কার্যকর নয় এমনও বলা যায় না। বোঝাই যায় যে নাৎসি-পর্বে মৃত্যু-শিবিরের খুঁটিনাটি ভালোভাবেই বিচার করা হয়েছে এবং ত্রেবলিনকা, সবিবর, বেলজেক, অসউইৎজ-১ বা সেন্ট্রাল এবং অসউইৎজ-২ অর্থাৎ বিরকেনাউ-এর ঢঙে কুকুর মারা ও পুড়িয়ে ফেলার ছকটি করা হয়েছে। প্রস্তাবটি লোভনীয় হলেও গ্রহণযোগ্য নয় এবং এই প্রসঙ্গে প্রস্তাবকারীদের আমরা জানাচ্ছি যে নাৎসিদের মতো পরিকল্পনামনস্করাও কিন্তু আগেভাগে সবটা বুঝতে পারেনি। একটি উদাহরণই যথেষ্ট। অসউইৎজ (বিরকেনাউ)-এ চারটে মড়া পোড়াবার চুল্লি ছিল যেগুলো বানিয়েছিল এরফুর্তে-র জে.এ.টফ্ অ্যান্ড সন্স্। এর মধ্যে বড় দুটি চুল্লি প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৬৫০০ মড়া পোড়াতে পারত। ওই দুটি চুল্লি ১৮ মাস একনাগাড়ে চলেছিল অর্থাৎ ১৮,০০,০০০ মড়া পুড়েছিল। এটা পুরো হিসেব নয়। পুরো হিসেব হল ৪ মিলিয়ান বা ৪০,০০,০০০। যাইহোক এত বড় ব্যবস্থার মধ্যেও

অ্যাডলফ্ আইসম্যান যখন ৪,০০,০০০ হাঙ্গেরিয়ান ইহুদিকে হত্যা করে তখন চুল্লিগুলো সামাল দিতে পারেনি। চুল্লির ইটে ফাটল ধরতে শুরু করে। তখন বিশেষ দহন-খাদ খোঁড়া হয় যেখানে কংক্রিটের নর্দমা দিয়ে মানুষের চর্বি বয়ে যেত এবং সেই চর্বি জ্বলন্ত মৃতদেহের ওপরে বেলচা দিয়ে তুলে ঢেলে দেওয়া হত। এ কাজ করত বন্দীরাই। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সব পরিকল্পনার মধ্যেই অভাবনীয় নানা গলদ থেকে যায়। প্রস্তাবটি আমরা খারিজ করলেও এটি সংরক্ষণযোগ্য।

বিরুদ্ধে মত (সংযোজনের জন্য)

প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে তরুণদের চিন্তা ভাবনা আমাদের ফেলনা মনে করা উচিত হবে না। উপরোক্ত প্রস্তাব-বিরোধী বক্তব্যের সঙ্গে মোটের ওপর একমত হয়েও জানাচ্ছি যে, মাত্র ২৯ বছর বয়সী এস. এস. অফিসার অটো মল অশউইৎজ-এ দহন খাদের নক্সা করেছিল। নর্দমা দিয়ে যখন মানুষের ফুটন্ত চর্বি বয়ে যেত তখন অটো মল তার মধ্যে বাচ্চাদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলত। প্রস্তাবটি অবশ্যই সংরক্ষণযোগ্য এবং গোপন রাখলেই ভাল হয়।

পরিকল্পনা প্রস্তাব-৫

অনেকগুলো প্রস্তাব এসেছে। কোথাও বিজ্ঞানের ও কৃৎকৌশলের জয়জয়কার। কোথাও একপেশে সামরিক মনোভাব। কোথাও ভ্রষ্ট শতাব্দীর ইতিহাসের যান্ত্রিক প্রভাব। আমাদের বক্তব্য হল নিজেদের ক্ষমতা বিচার করে ব্যবস্থা নিতে হবে। উদ্ভট খরচ যাতে না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। সাপও (অর্থাৎ কুকুরও) মরে, লাঠিও না ভাঙে সেটা দেখতে হবে।

(ক) সাঁড়াশি দিয়েই কুকুর ধরা হোক। কারণ এর কিছু ব্যবস্থা ও অভিজ্ঞ কর্মী অন্তত আমাদের হাতে আছে।

(খ) কুকুর মারার জন্যে এক নয়া পয়সাও খরচ হবে না। ব্রিটিশ শাসকরা যে পিঁজরাপোলগুলো বানিয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কুকুরদের ছেড়ে দিলেই চলবে। খাবার বা জল কিছু দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। শুকিয়ে কয়েকদিনেই মরে যাবে। এবং এভাবে মরলে মৃতদেহে স্নেহপদার্থ ও জলের ভাগ যথেষ্ট হ্রাস পাবে। পচে গেলেও ভয়ানক কিছু হবে না। শকুন, চিল, কাক এরা আছে। অতএব কঙ্কালে পরিণত হতে বেশি সময় লাগবে বলে মনে হয় না। এর চেয়ে কার্যকর কোনো ব্যবস্থার কথা বর্তমানে আমরা কী ভাবতে পারি?

প্রস্তাবের পক্ষে মত

এর চেয়ে ভালো কোনো ব্যবস্থার কথা এই মুহূর্তে আমরা ভাবতে পারি না। পয়সা গাছে ফলে না। দেশের হালও বেহাল। এখন যদি কলকাতা অলিম্পিক বা বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজন করতে চায়, সেটা যেমন সম্ভব নয়, তেমনই সম্ভব নয় কুকুর মারার জন্যে এমন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা যা আমাদের সাধ্যাতীত। তাই সবকিছু বিচার করে আমরা 'পরিকল্পনা প্রস্তাব-৫' সুপারিশ করছি। এরপর প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবটি ওপর-মহলে পাঠানো হবে। ওপর-মহল আবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তা চূড়ান্ত সম্মতির জন্য পাঠাবেন...

আগেই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে শহর পাড়ি দেওয়া কুকুরদের কথা বলা হয়েছে। রাস্তার শানের ওপরে, বাঁধানো জায়গার ওপরে তাদের চারটে থাবা যখন ছন্দ মিলিয়ে পড়ে তখন নখের সামান্য শব্দ হয়। মধ্যে থেমে থেমে একটু জিরিয়ে নিতে হয়। জল খেতে হয়। ফের ছুটতে হয় খবর নিয়ে। নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। মাঝপথে যে কুকুররা খবর পায় তারাও সবাই

চুপ করে বসে থাকে না।

কুকুর কীভাবে তার অভীষ্ট খুঁজে বের করে তা নিয়ে অনেক সত্যি ঘটনা আছে যার মধ্যে জাদুর ছোঁয়া রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে গ্রেট ব্রিটেনের ফার্স্ট নর্থ স্ট্যাফোর্ডশায়ার রেজিমেন্টের সৈন্য জেমস ব্রাউন যুদ্ধ করতে ফ্রান্সে গিয়েছিল। ১৯১৪ সালের আগস্টে। ২৭ সেপ্টেম্বর ব্রাউনের স্ত্রী তাঁকে চিঠিতে এই দুঃসংবাদ দেয় যে, তার প্রিয় আইরিশ টেরিয়ার 'প্রিন্স'-কে পাওয়া যাচ্ছে না। ব্রাউন তাঁর স্ত্রীকে জবাবে লেখে, 'দুঃখের ব্যাপার যে তুমি প্রিন্স-কে খুঁজে পাওনি। পাওয়ার কথাও নয়। কারণ সে আমার কাছেই রয়েছে।' এর মানে প্রিন্স ইংল্যান্ডের দক্ষিণেই ২০০ মাইল পথ পেরোয়। ইংলিশ চ্যানেল কোনোভাবে অতিক্রম করে। এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সের ৬০ মাইল পেরিয়ে আর্মেন্তিয়েরে-এর একটি ট্রেঞ্চে তার প্রভুকে খুঁজে বের করে।

৪

অলৌকিক ভিক্ষাপাত্রের মতো চাঁদ
দাঁতে কামড়ে ছুটে যাচ্ছে রাতের কুকুর

কান গজিয়ে ওঠার পরে কান-গজানো পুরনো থাকার জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে বড় রাস্তায় নোংরা ফেলার বড় ভ্যাট-এর আশপাশটা বেছে নিয়েছিল। কয়েকদিনের নোংরা জমে ওঠার পরে এখানে বড় বড় লরি আসে। তাতে করে নোংরা ধাপায় চলে যায়। জায়গাটা নোংরা বলে বেড়াল, কুকুর ও কাক বাদে খুব একটা কেউ আসে না। তবে ডানদিকে হাত বিশেক দূরে একটা ভাঙাচোরা বাতিল পেচ্ছাপখানা আছে যাকে ঘিরে এমন লতা আর কাঁটাগাছের জঙ্গল যে কেউ যেতে পারে না। ওই ভাঙা পেচ্ছাপখানার ছাতে অনেকদিন আগে একটা পাগল সাইকেল রিক্সার পর্দার ছেঁড়া পলিথিনে জড়ানো বালিশ রেখে গিয়েছিল। কিন্তু আর নিতে আসেনি। কোনো কিছুই ফেলা যায় না, কোনো না কোনো কাজে লেগে যায়। বাতাসে পলিথিনটা উড়ে গেছে। বালিশটা বৃষ্টিতে ভেজে, আবার রোদে শুকিয়েও যায়। শুকনো থাকলে ওই বালিশের ওপরে নিরীহ একটা একা বেড়াল ঘুমোয়। কান-গজানোর সঙ্গে তার বিশেষ সদ্ভাব না থাকলেও ঝগড়া অন্তত নেই। এক ধরনের মায়াবী শেষ-দুপুর আছে যখন নিরীহ বেড়ালেরা ঘুমোয়। ঘুম থেকে উঠে বেড়ালটা দুই থাবা ঝুলিয়ে নীচে কী হচ্ছে তা নির্লিপ্তভাবে দেখে। সে দেখতে পায় কান-গজানো হয় নোংরা ঘাঁটছে বা কিছু একটা তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। এখানে অন্য কুকুররাও আসে, তবে সবই ধারে-কাছের। তারা আসে, আবার চলেও যায়। শুধু কান-গজানো এখানে থেকে যায়, কারণ সে অ্যাসিডে কান গলে যাওয়ার ব্যাপারটা ভোলেনি। বরং কোথাও আয়নার মতো জল-টল জমলে বা ঝকঝকে গাড়ির গায়ে সে পরে-গজানো কানটা মাঝে মাঝে দেখে নেয়। একদিন বিকেলে কাছাকাছি টহলদারি করে ফিরে কান-গজানো দেখতে পেল যে ফেলে যাওয়া একটা থার্মোকলের বাক্সের ওপরে তারই মতো কালো কিন্তু থাবায় নয়, বুকের ওপরে সাদা নদী, একটা কান-ঝোলা বিলিতি কুকুর বসে আছে। ওকে দেখেই কান-গজানো একবার দাঁত অল্প খিঁচিয়েছিল, কিন্তু ও বিশেষ পাত্তা দিল না। এই কুকুরটা একে তো নেড়ি নয়, তার ওপরে আশেপাশের কোনো বাড়িরও নয়। হলে কান-গজানো ঠিক জানতে পারত। কান-গজানো তাকে বলল,

—তুই কে?

—যেই হই তোর মতো নেড়ি নই। আর কথা নেই বার্তা নেই, শুরুতেই তুই-তোকারি। জংলি কি আর এমনি বলে!

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা আমার জায়গা। এখানে আস্তানা গাড়া আমি বরদাস্ত করব না।

—কী করবি? কামড়াবি? ভয় দেখাবি?

—না।

—তাহলে কী করবি?

—আমাকে কিছুই করতে হবে না। তুই যাদের পোষা তারা ঠিক তোকে ধরে নিয়ে যাবে। ঘেঁটি ধরে।

—তারাই বলে গাড়ি করে ঘুরে ঘুরে আমাকে দিক ভুলিয়ে ছেড়ে দিয়ে গেল, খুঁজে নিয়ে যেতে তাদের ভারি বয়েই গেছে।

—মানে?

—মানেটা বোঝার বুদ্ধি তোর আছে? বুড়ো হয়ে গেছি। আগের মতো টরটরে নেই। কারণে-অকারণে ঘুম পায়। তাই আর রাখবে না। ইচ্ছে হলে আমি নিজেই তো ফিরে যেতে পারতাম।

—বুঝলাম, কিন্তু এত বড় কলকাতাটা থাকতে তুই মরতে আমার এই জায়গাটায় এলি কেন?

—কেন এলাম সেটা তুই তো বুঝবি। এ তল্লাটটা এখনও একটু ফাঁকা ফাঁকা। এখনই ওদের নজর এদিকে পড়বে না। অবশ্য বলা যায় না—

—কাদের?

—কলকাতায় কুকুর ধরা চলছে। জানিস না?

ভাঙা পেচ্ছাপখানার ছাদ থেকে বেড়ালটা বলল,

—বেড়ালদেরও ধরছে নাকি?

—এখনও ধরছে না। তবে কুকুরদের পরে স্বাভাবিকভাবেই বেড়ালদের দিকে নজর পড়বে। কথাতেই বলে কুকুর-বেড়াল।

—আমার নাম কান-গজানো।

—কান-গজানো? ঠিক আছে।

—তোর নাম।

—আমার নাম জিপসি।

—কী করছে ওরা কুকুরদের ধরে?

—পিঁজরাপোলে নিয়ে যাচ্ছে।

—তারপর?

—তারপর আবার কী? না-খাইয়ে শুকিয়ে মারছে। উত্তরের দিকে অনেক কুকুর ধরা পড়েছে। আমি তো সেখান থেকেই আসছি। তবে কাকেরা যে উড়ো খবর ছড়াচ্ছে তা মোটেই ভালো নয়।

—যেমন?

—বলছে পুরনো, জং-ধরা কুকুর-ধরবার গাড়িগুলোকে আবার নাকি রংচং করে, ঝালাই মেরে ফের রেডি করছে। গণ্ডায় গণ্ডায় কুকুর ধরার সাঁড়াশি অকেজো অবস্থায় ডাঁই করে রাখা

pathagar.net

ছিল। সেগুলোকে ঝেড়েমুছে ফের তেল-টেল দিয়ে নতুনের মতো করে ফেলা হচ্ছে।

—কিন্তু উত্তর থেকে তুমি পালিয়ে কোথায় গেলে?

—আড়াআড়ি এলে চৌরঙ্গি পড়বে। আমি শেয়ালদা দিয়ে রেললাইন ধরে ফেলি। রেললাইনের পাথরে পা কেটে গেছে। একটু পর পর বড় বড় রেলগাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু থামিনি। আর এই আমায় দেখছিস তো। এরপর দেখবি আরও আসছে।

—এটাও কি কাকরা জানিয়েছে?

না। এটা নিজের চোখে দেখা। কানে শোনা। এখান থেকে মিনিট কুড়ি দৌড়লে একটা বাজার আছে না?

—হ্যাঁ। ওখানে মাছের কাঁটা আছে।

—তা থাকতে পারে। ওখানে বাজারের বাইরে তিন-চারটে বড় বড় চা-বিস্কুটের দোকান আছে?

—আছে।

—ওখানে তিনটে কুকুর বলাবলি করছিল যে, এবারে এ-দিকটায় সরে আসবে। তবে দল বেঁধে নয়। একজন একজন করে। তাহলে নজরে পড়বে না।

—এরকম কি আগে কখনও হয়েছে?

—হয়েছে কিন্তু এই মাপে নয়। গরমকালে কুকুররা একটু তিরিক্ষে হয়ে থাকে। খ্যাঁকখ্যাঁকে। তখন দু-চারটেকে ধরত। এবার কোনো বাছাবাছির বালাই নেই। কুকুর হলেই হল। পেলেই ক্যাঁক্।

—উঃ, সাঁড়াশি? ঘাড় আর গলাটা কেমন শিরশির করে উঠল।

—শুধু কি তাই? সাঁড়াশি দিয়ে ধরে হিঁচড়ে হিঁচড়ে খাঁচার গাড়ির কাছে নিয়ে যাবে। তারপর ছুঁড়ে গাড়ির ভেতরে। এরকম করে করে গাড়িতে যখন আর কুকুর তোলা যাবে না তখন পিঁজরাপোল।

ওদের এই কথাবার্তার মধ্যে একটা দমকা হাওয়া এল যাকে আর-একটু রাগিয়ে দিলে ছোটখাটো একটা ঝড় বলা যেতে পারে। ওরা ওপরদিকে তাকাল।

বেড়ালটা বলল,

—কী হচ্ছে। কিছু বুঝলে?

—ঝোড়ো বাতাস বইছে।

—ঘেঁচু বইছে। বিশতলা, তিরিশতলা ওপর দিয়ে ছায়া-কুকুরেরা দৌড়চ্ছে। কেন দৌড়চ্ছে বলতে পারব না। তবে জন্ম থেকে শুনে আসছি এরকম হওয়া ভালো নয়।

—আমরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

—পাবে। চেষ্টা করো, পাবে। দেখতে ভুলে গেছ তাই। ফের মনে পড়ে যাবে।

ছায়া-কুকুরেরা কবে মরে গেছে কেউ বলতে পারে না। কালান্তক সময় এলে তারা মেঘের আড়াল ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সরাইল হাউন্ডের মতো ক্ষিপ্রতায় লাফ দিয়ে ছুটতে থাকে। তাদের থাবার আঘাতে থরথর করে কাঁপে ছায়া-শহর, ছায়া-অট্টালিকা ও ছায়া-রাজপথ। সামনের দুটো পা একসঙ্গে ছোঁ মেরে নেমে আসে মারাত্মক ঢেউ-এর মতো, জ্বলন্ত ফেনায় বুদবুদ ও তরল আগুন ঝলকে ওঠে, তখন পেছনের দুটি পা ছায়া-মরুতে ধাক্কা দিয়ে বালি ওড়ায়। তাদের ডাক বড়ই গম্ভীর। ক্বচিৎ কখনও যুদ্ধবিমানের চালকেরা দেখেছে যে তাদের ম্যাক-২ বা অধিকতর শক্তিধর বিমানকে হেলায় পেছনে ফেলে আকাশ বেড় দিয়ে ছুটে চলেছে ছায়া-কুকুরের দল। কেউ কেউ বলে মারণ-জ্যোৎস্নায় ছায়া-কুকুরেরা চান্দ্র শশক শিকার করতে বেরোয়। তবে এ

নিয়ে মতভেদ আছে। যদিও কেউই ছায়া-কুকুরদের অন্তরীক্ষ অতিক্রমণকে তুচ্ছ বলে মনে করেন না। ছায়া-কুকুরদের দলপতি হল একটি শুভ্র পবিত্র কুকুর। তার নাম হল লাইকা। কুকুর-উপকথা 'লুব্ধক' চারপায়ে নতজানু হয়ে লাইকা-কে প্রণাম জানাচ্ছে।

হাওয়ার ঝাপটাটা কেটে যেতে কান-গজানো বলল,

—তাহলে একটা কিছু হবেই, বলছ?

—সে তো বটেই। হবে না, হচ্ছে।

—রাতে কি ধরতে আসতে পারে?

—এখনও অতটা বুদ্ধি ওদের হয়নি। তার ওপরে ভয়ও আছে। সব কুকুর তো আর সাঁড়াশির হাঁ-তে গলা এগিয়ে দেবে না। লড়ে যাবে।

—তা তো বটেই। যাইহোক, তুমি এলে বলে খোঁজখবর সব পাওয়া গেল। একটেরে হয়ে থাকি। কারও সঙ্গে মিশি না। ওই বেড়ালটাই যা দু-একটা খবর-টবর এনে দেয়। দিন পাঁচেক আগে এসে বলল ও নাকি একটা মরা বাদুড় দেখেছে।

—তো?

—বাদুড়ের মুখটা নাকি অনেকটা কুকুরের মতো। এ বিষয়ে তোমার কোনো ধারণা আছে?

—না। আমি বাদুড়দের উড়তে দেখেছি। বাদুড়বাগান বলে একটা জায়গা আছে, জান?

—সেখানে কি শুধু বাদুড়রাই থাকে?

—দূর! আদ্যিকালে হয়তো থাকত। এখন চামচিকেও থাকে কিনা সন্দেহ। ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

—ঘুমোবে। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলতে পারো?

—কী?

—দিনের বেলায় যদি আমাদের ধরতে আসে তাহলে আমরা কী করব?

জিপসি কিছু বলার আগেই বেড়ালটা বলল,

—আমি বলব?

—বলো।

এই ভাঙা পেচ্ছাপখানাটার দেওয়ালের পেছনে একটা ফাঁক আছে। বেশ বড়। ঝোপঝাড় হয়ে গেছে বলে বোঝা যায় না। ওখানে ঢুকতে পারো। কেউ খুঁজে পাবে না।

কান-গজানো বলল,

—সে হয়তো যাওয়া যায়। কিন্তু ওখানে বোলতার চাক আছে।

—আছে না, ছিল। বোলতারা কবে চলে গেছে। এখন শুধু চাকটাই আছে।

—তাহলে তো চুকেই গেল হ্যাপা।

এই বলে কান-গজানো জিপসির দিকে তাকিয়ে দেখল জিপসি ঘুমিয়ে পড়েছে। আর শুধু তাই নয়, স্বপ্নও দেখছে। কারণ শরীরটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। সামনের থাবাদুটোও কখনও কখনও নড়ছে। জিপসির ঘুমোনো দেখে কান-গজানো ভাবল একটু গড়িয়ে নিলে মন্দ হয় না।

নাহি মার কুক্কুরেরে, শুন দ্বিজবর।
শুনিয়া বিপ্রের ক্রোধ বাড়িল বিস্তর॥
হাতে দণ্ড করি বলে নৃপতির প্রতি।
মোর হাতে কুক্কুরের নাহি অব্যাহতি॥
পুণ্যহীন কুক্কুরের নাহি পরিত্রাণ।
পুণ্য-বিনা স্বর্গে বাস নহে মতিমান্॥

pathagar.net

৩ নম্বর পিঁজরাপোলে তখন একটা তাণ্ডব চলছিল। কুকুরদের কাঁই-কাঁই বা ঘ্যাঁকাও করে চিৎকার, প্রতিবাদী শুকনো ঘেউ-ঘেউ, চাপা রাগে গর্ গর্ করা—সব মিলেমিশে এক মহা-ঐকতান। এরই মধ্যে কামড়া-কামড়ি, জায়গা নিয়ে দখলে রাখার চেষ্টা, দেহ শুকিয়ে আসায় প্রাণপণ তেষ্টা ও পায়ের তলায় বালি মেশানো কাঁকর-মাটি যা তখনও ঠাণ্ডা হয়নি এবং এখানে-ওখানে মাটি ফুঁড়ে উঠে এসেছে পাঁজর, করোটি, শুকনো ক্ষুর বা শিং। গতকালই যাদের আনা হয়েছিল তারা সারাদিন রোদে তেতে নিভে এসেছে, কেউ তলিয়ে গেছে আচ্ছন্নতায় যা অবধারিত প্রক্রিয়াতে অন্তিম প্রচ্ছায়ায় প্রবেশ করবে বা কেউ নির্বাক, শান্ত, কানও নড়ছে না যার অর্থ হল সে অসহায়তার শিক্ষা নিতে পেরেছে। মুখে-নাকে বালি ঢুকে গেছে কারও। এদের মধ্যে একটি কুকুর ট্যাক্সি চাপা পড়ে বহুদিন ধরে পঙ্গু। পেছনের পা দুটো অকেজো। সামনের দুই থাবায় ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলে। রয়েছে বৃদ্ধ কুকুরেরা যারা বহু যুদ্ধ ও সন্ধির সাক্ষী। সারা গায়ে প্রাচীন ক্ষতচিহ্ন। যেভাবে থেবড়ে মাটিতে পড়ে আছে তারা, দেখলে মনে হবে মৃতপ্রায় কুমীর বা নিথর ডাইনোসর যুগের মথ। সারাদিন ধরে কুঁই-কুঁই করে ধুঁকতে ধুঁকতে শিশুরা মরেছে। মা তাদের শুষ্ক জিভ দিয়ে চেটে চেটে আর্দ্রতা দিতে চেষ্টা করেছে। অসহায়তায় এলোমেলো ছোটাছুটি করেছে। মৃত্যুর পরেও মৃত শিশুরা দেয়ালা করছে ভেবে মায়াতাড়িত হয়েছে। কিন্তু এই মায়াই হল মৃত্যুর প্রথম সোপান। ওই তো নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ওই তো ওঠানামা করছে ছোট্ট বুক। এই তো শোনা যাচ্ছে সেই হৃদস্পন্দন যা জরায়ুর মধ্যে প্রথম ক্ষীণ কম্পন হয়ে দেখা দিয়েছিল।

এই মৃত, মৃতপ্রায় ও অর্ধমৃতদের চেয়ে আজ যারা এসেছে তারা স্বাভাবিক কারণেই অধিকতর সজীব ও সরব। কিন্তু মৃতের সঙ্গে থাকলে মৃত্যুর চৌম্বকক্ষেত্রের চোরা ঠাণ্ডা টান না চাইলেও অনুভব করতে হয় ও স্নায়ুতে স্নায়ুতে ধীর লয়ে অবশ সঙ্গীতের মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে আত্মসমর্পণ।

ছায়া-কুকুরদের দৌড়ের সময় এখানেও বালি ও কাঁকুরে-মাটির ওপরে এক ধুলোর আঁধি উঠেছিল, কিন্তু তা থিতিয়ে গেছে মৃত কুকুর-শিশুদের নরম লোমে ঢাকা শরীরের ওপর। এই ধুলোর চাদর হল ঢাকা পড়ে যাওয়ার, গভীরে চলে যাওয়ার এক আয়োজন। ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে এভাবেই ডাইনোসরদের ওপরে ধুলো জমতে শুরু করেছিল যার মধ্যে ছিল ইরিডিয়াম। এই ইরিডিয়াম এসেছিল মহাকাশ থেকে প্রেরিত উল্কাপিণ্ডের শরীরে মিশে। কে পাঠিয়েছিল এই মহাসংহারের অস্ত্র? এর আগেও বারবার পৃথিবী থেকে প্রাণ মুছে গেছে প্রলয়ের স্পর্শে। ৪৫০, ৩৫০, ২২৫ ও ১৯০ মিলিয়ন বছর আগেও এই অভিশাপ এসেছিল। কেন? কী হেতু এই মরণোৎসবের? সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রশ্নচিহ্নে সমাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সার্কাসের এরিনার মতো গোল পিঁজরাপোলের জমিতে দাঁড়িয়ে দেখা কলকাতার আকাশ।

মস্ত বড় টাটা সুমোটা এসে দাঁড়াতে প্রায় একই সঙ্গে কান-গজানো আর জিপসির ঘুম ভেঙে গেল। গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার পেচ্ছাপ করতে নামল। গাড়ির মধ্যে এফ-এম রেডিয়োতে খবর হচ্ছে—

'আজ চারশো আটচল্লিশটা কুকুর ধরা পড়েছে। এই নিয়ে মোট প্রায় সাড়ে সাতশো কুকুর ধরা সম্ভব হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র জানান যে আক্রা ফটকের কাছে কিছু দুষ্কৃতি কুকুর ধরার কাজে বাধা দেয় ও যথেচ্ছ ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য এলাকায় পুলিশ নামানো হয় ও বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, আগামীকাল থেকে সশস্ত্র পুলিশ ও র‍্যাফ কুকুর ধরার সময়ে হাজির থেকে

শান্তি রক্ষা করবে। আরও স্থির করা হয়েছে যে, শিশুরা যে-সময়টা স্কুলে থাকে সেই সময়ে কুকুর ধরার অভিযান জোরদার করা হবে। এ ব্যাপারে শিশু-মনস্তত্ত্ববিদদের বক্তব্য সরকার মেনে নিয়েছেন, যে, চোখের সামনে সাঁড়াশি দিয়ে কুকুর ধরা দেখলে শিশুদের কোমল মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। আপনারা কলকাতা বেতারকেন্দ্রের এফ-এম চ্যানেলে সংবাদ শুনছেন।'

'প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে যে একটি অজানা বিদেশি বিমান আজ ভারতের সীমানা লঙঘন করলে ভারতীয় জঙ্গিবিমান ওই বিদেশি বিমানটিকে ধাওয়া করে...'

টাটা সুমোটা চলে যাওয়ার পরে কান-গজানো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

—আমাদের কি কিছুই করার নেই? এইভাবে মরতে হবে?

—ভাগ্যে থাকলে মরতে হবে। কী করা যাবে। সাড়ে সাতশোর দলটা তো আরও বাড়বে। অনেক বাড়বে। ভাগ্যে যদি পিঁজরাপোলে গিয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরাই লেখা থাকে তো তাই হবে। আমরা পারব ঠেকাতে? নিয়তি কেউ ঠেকাতে পারে না। কুকুর না, মানুষ না, কেউ না।

—তুমি ভাগ্য মানো?

—না মেনে উপায়? ছোটবেলা তিন সপ্তাহ বয়সে কালো-ভাই আর আমি বিক্রি হয়েছিলাম হাতিবাগানে। সেখান থেকে ট্যাক্সি করে বউবাজারে এলাম। আমার জন্যে ডাক্তার আসত। একবার পড়ে গিয়েছিলাম। নড়তে পারতাম না। তখন বেলগাছিয়ার জন্তুদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। রোজ দুধ খেতাম, মাংসের ছাঁট খেতাম। চকোলেট, আইসক্রিম—কী না খেয়েছি? আর আজ! নোংরার গাদায় বসে বেড়ালের লেকচার শুনতে হচ্ছে। এর পরেও বলতে হবে ভাগ্য মানি না?

বলাই বাহুল্য, বেড়ালটা রেগে গিয়েছিল। অন্ধকারে চোখ চকমকি পাথরের মতো জ্বেলে সে বলল,

—ভালো ভেবে লুকোবার জায়গাটা বলে দিলাম। শুনি কুকুররা কৃতজ্ঞতা জানে আর বেড়ালরা অকৃতজ্ঞের হদ্দ। এখন বোঝাই যাচ্ছে কোনটা কী।

—আরে বাবা, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। নিছকই কথার কথা। আমি অন্য বেড়ালদের কথা বলছিলাম। তুমিই কি একলা বেড়াল নাকি? কত বলে বেড়াল রয়েছে।

—সে থাকুগগে। এখানে বেড়াল বলতে আমিই। কাজেই বেড়ালের নামে কিছু বললে আমার গায়েই লাগার কথা।

—আরে বাবা, মাপ চাইছি। হয়েছে? চালচুলো কিছু নেই। কী বলতে কী বলে ফেলি। অত ধরলে চলে?

এই মৃদু ঝগড়াটা দুম্ করে থেমে গেল, কারণ প্রচণ্ড জোরে কিছুটা দূরে একটা বোমা ফাটল আর ঝল্‌কে অন্ধকারটা এক লহমার জন্যে চমকে উঠল, যেন কারও ফোটো তোলা হল। বোমার আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে না যেতে কয়েকটা হালকা শব্দ। গুলির। বেড়ালটা বলল,

—লেগে গেল।

—কার সঙ্গে কার?

—অত জানলে আর বেড়াল হয়ে জন্মাতে হত না।

কান-গজানো হঠাৎ বলে উঠল,

—না। একটা খবর আসবে।

—কী খবর?

—একটা খবর। আমাদের খবর। কুকুরদের খবর। আমার মন বলছে একটা খবর আসবেই।

—ভালো না খারাপ?

—সেটা বলতে পারব না। কিন্তু একটা খবর আসছে। আসতে তাকে হবেই!

৫

প্রথম বিমানহানা করে গেছে শীত
বসন্তের কথা বা ভাবনা এখন দূর
রাস্তায় মানচিত্র হয়ে ঘুমায়
কয়েকটি ক্লান্ত কুকুর

কান-গজানো ভুল বলেনি। আগে আমরা শহরের এ-মাথা ও-মাথা ছুটে যাওয়া ব্যস্ত কুকুরদের কথা বর্ণনা করেছি। প্রথম (আসলে দ্বিতীয়) হাওড়া ব্রিজের এপার থেকে সে এসেছিল। তার নাম বাদামী। কান-গজানো আর জিপসি দেখেছিল দূর পেরিয়ে একটা হন্যে কুকুর আসছে। তার লোমে ডিজেলের ধোঁয়ার গন্ধ। চোখ একটু ভিজে। ওটা কান্না নয়। ধোঁয়ার আক্রমণ ঠেকাবার ব্যবস্থা। নামের সঙ্গে রঙের মিল থাকলেও চোখ দুটো একটু লালচে বলে অনেকেই ভেবে নিতে পারে যে, বাদামী বেশ রাগী ধাঁচের, কিন্তু এর চেয়ে ভুল আর কিছুই হতে পারে না। বাদামী এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,

—আমার আগে আর কেউ এসেছিল?

—না তো।

—আসার কথা ছিল। তাহলে হয়তো মাঝরাস্তায় ধরা পড়ে গেছে। অবশ্য চাপাটাপাও পড়তে পারে। একটু জল খাওয়ার দরকার।

—উল্টোদিকে যে বাড়িটা দেখছ ওর বাগানে গাছে জল দেওয়ার পাইপটা খোলা আছে। জলটা গেট দিয়ে বেরোচ্ছে। খেয়ে এসো।

বাদামী রাস্তার ডানদিক-বাঁদিক দেখে রাস্তা পেরিয়ে জল খেতে গেল।

—আচ্ছা, হঠাৎ ওরা আমাদের নিয়ে পড়ল কেন বলতে পারো? আমরা কি খুব ঝামেলা করছিলাম?

—বুঝতে পারছি না। আমার তো এক-একসময় মনে হয় যে অজান্তেই কোনো ভুল বোধহয় আমরা করে ফেলেছি। যে কারণে ওরা এত ক্ষমাহীন হয়ে উঠেছে।

—আসলে কলকাতাটাকে যেভাবে ওরা সাজাতে চাইছে সেই ছবিটার মধ্যে আমরা খুবই বেমানান।

—সে না হয় হল, কিন্তু আগেই প্রশ্ন উঠবে যে কলকাতাটা কি কেবল ওদের? হঠাৎ ওরা বাদে অন্যরা ফেলনা হয়ে গেল?

—আবার অন্য একটা কথাও থেকে থেকে ভাবছি। মানে, বলা যায় যে, কথাটাই আমাকে ভাবাচ্ছে।

—কী সেটা শুনি?

—আসলে হয়তো ব্যাপারটা তত কিছু নয়। এমনও তো হতে পারে যে আমরা যাতে

নিজেদের মতো করে আরও গুছিয়ে আরও ভালোভাবে থাকতে পারি তারই জন্যে ওরা চেষ্টা করছে। হয়তো...হয়তো...আমাদের নিয়েই একটা চিড়িয়াখানা বানাতে চায় ওরা। যেখানে আমাদের ভালো খেতে দেবে। অসুখ হলে ডাক্তার দেখবে। কত কীই তো হতে পারে...

বাদামী জল খেয়ে ফিরে এসেছে। তার গোঁফে ও কালো নাকের ওপরে বিন্দু বিন্দু জল লেগে আছে।

—তোমাদের এই কথাবার্তা শুনে আমার গল্পটা মনে পড়ে গেল। ছাগলছানা হাততালি দিচ্ছে আর নাচছে—কী মজা, সামনে সরস্বতী পুজো, কী মজা। তার মা তখন তাকে বকুনি দিয়ে বলছে যে আগে কালীপুজোটা যেতে দে, তারপর সরস্বতী পুজোর কথা ভাববি। তোমাদের হাল ওই ছাগলছানার মতো। কী কারণে কী হচ্ছে আমরা ভেবেচিন্তে কুলোতে পারব না। কাজেই সাত-পাঁচ ভেবে সময় নষ্ট করো না। যা বলছি শোন। আমাকে এখনও অনেক জায়গায় যেতে হবে।

—বলো।

—একটা ব্যাপার মাথায় রাখবে। ওরা ওদের মতো করে ফন্দি আঁটছে। সে-ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই আমাদের নিজেদেরই ব্যবস্থা করতে হবে। হাতে সময় বেশি নেই।

—বলো না। পিঁজরাপালে শুখা-ভুখা হয়ে মরার চেয়ে সবকিছু করতে রাজি আছি।

—তুই কে?

—আমি জিপসি।

—আর আমি কান-গজানো।

—এখন আমাদের একমাত্র কাজ হল যেখানে ওরা হুট করে হানা দেবে না সেই সব জায়গায় দল বেঁধে লুকোনো। তারপর হল রওনা।

—কোথায়?

—অত কথা বলা যাবে না। তোদের এই রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা বাস-গুমটি আছে। চিনিস?

—চিনব না কেন? তবে ওখান থেকে আর বাস ছাড়ে না। আগে ছাড়ত।

—ঠিক। ওই গুমটিটার উল্টোদিকে একটা দরজা আধখোলা সি ই এস সি-র ট্রান্সফরমারের ঘর আছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, একবার আগুন লেগেছিল। দুটো দমকল এসেছিল।

—বিকেলের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভেতরে ঢুকে যাবি। মেশিন-টেশিন ছুঁবি না। পেছনটায় চলে যাবি। দেখবি অন্তত চল্লিশটা কুকুর ওখানে লুকোতে আসবে। আপাতত এই। পরের কথা পরে। একটাই কাজ, পারলে খাবার-দাবার কিছু নিয়ে যাস। কেউ কোনো শব্দ করবি না। বাচ্চাগুলোকেই নিয়ে ঝামেলা। যতটা পারা যায় ওদের চুপ করিয়ে রাখতে হবে।

—সে না হয় হল, কিন্তু তারপর?

—বললাম না; পরের কথা পরে। এইটুকু শুধু জেনে রাখ যে রওনার আগে নির্দেশ আসবে। আর এখানে ন্যাড়া রাস্তার ধারে কচ্ছপের মতো বসে থাকিস না। গাড়ি থেকে দেখলেই নেমে তেড়ে আসবে।

—এখন তুমি কোথায় যাবে?

—নানা জায়গায় হাল্লাক হয়ে খবর দিয়ে দিয়ে বেড়াব। আজ রাতের মধ্যেই বেশিরভাগ কুকুরের লুকোনোর ব্যবস্থা করতে হবে।

pathagar.net

—যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাবে?

—কী?

—ছায়া-কুকুররা কি সত্যি?

—তোদের কি মনে হয়?

—আমরা ব্যাপারটা বুঝিনি। ওই বেড়ালটা বলল...তাই...ওরা বাদামীকে বেড়ালটাকে দেখাবে ভেবেছিল, কিন্তু বেড়ালটা ওখানে তখন ছিল না।

—সত্যি তো বটেই। এরপর নিজেদের চোখেই সব দেখতে পাবি। পরের মুখে আর ঝাল খেতে হবে না।

যা খবর দেওয়ার ছিল দিয়ে বাদামী চলে গেল। জিপসি আর কান-গজানো দেখল বাদামী দূরে ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর তার কানদুটো না-হাঁটা না-দৌড়ের তালে তালে লাফাচ্ছে।

কুকুর ধরার অভিযান যে এভাবে ঝিমিয়ে পড়তে পারে সেটা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। এমন নয় যে সাঁড়াশি-বাহিনীর সঙ্গে শহরের ঝড়তি-পড়তি মানুষদের সংঘর্ষ বাড়তে বাড়তে আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল এবং তার ফলে বৃহত্তর বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছিল। এমনও নয় যে সাঁড়াশি-বাহিনীর কর্মীরা বিশেষ কোনো দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে কাজে ঢিলে দিচ্ছিল বা অন্য কিছু। তবে আগের কথাটার খেই ধরে এটা বলাই যায় যে কুকুর-ধরাদের মজুরি নিয়ে দীর্ঘদিনই কোনো চিন্তাভাবনা হয়নি। কারণ কুকুর ধরাই হত না। পিঁজরাপোলগুলোর অবস্থাও ছিল তথৈবচ। আসল ব্যাপারটা হল যখন, যেদিকে বেশি নজর দেওয়া হয়, তখন অন্যদিক থেকে নজর সরে যায়। পোলিও নির্মূল করার অভিযান চলছে। ওদিকে সঙ্গত কারণেই প্লেগ-এর দপ্তর খোলে কিনা সন্দেহ। কিন্তু একজন বিকৃতমস্তিষ্ক লোক যদি কার্জন পার্কের ইঁদুরদের বিষ খাওয়ায় তাহলে ওদের গায়ে যে মাছিরা থাকে তারা বাধ্য হয়ে বেরিয়ে মানুষকে কামড়াবে। প্লেগ দেখা দেবে। তখন আবার দেখা যাবে পোলিও নিয়ে কেউ ভাবছে না। এসব আকাশ-পাতাল না ভেবে আমরা যখন কুকুর নিয়ে পড়েছি তখন সেই আসল কথাতেই ফিরে যাওয়া যাক।

কুকুরদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। উপরন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল। বিভিন্ন পাড়ায়, গুরুত্বপূর্ণ সব মোড় ও দরকারি রাস্তার মাঝখানে ধরা দেবার জন্যে জ্ঞানবৃদ্ধ কিছু কুকুর হয় বসে বসে ঝিমোচ্ছে, গায়ে মাছি বসলেও তাড়াচ্ছে না বা সামনের দুই থাবার মধ্যে মাথাটা রেখে দু-চোখ মেলে নির্লিপ্তভাবে বিশ্ব-সংসারে কী ঘটে চলেছে দেখছে এবং অজানা কোনো শব্দতরঙ্গের সংকেত ধরার জন্যেই যেন তাদের কানগুলো রাডারের মতো দিক পাল্টাচ্ছে। কুকুর ধরার একটা বিশাল অভিযান চলছে। সেটা সকলেরই জানা। তার মধ্যে এই প্রবীণ কুকুরদের আগ বাড়িয়ে ধরা দিতে আসা কারো কারো চোখে তাজ্জব ঠেকলেও ঠেকতে পারে। এবং সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের সেটা হল কুকুর-ধরা গাড়ি এসে দাঁড়াতেই এরা গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছিল।

—'এটা খুবই স্বাভাবিক। এরা কুকুরদের কোনো বৃদ্ধাশ্রম থাকলে সেখানে চলে যেত। অথচ দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এদের শিখিয়েছে যে প্রতিবাদ বা কামড়াকামড়ি করে কোনো লাভ নেই। এমনিতেও মরবে অমনিতেও মরবে। এই বয়সে আর হুজ্জুতি পাকাতে চায় না। এই আত্মসমর্পণের মধ্যে অন্য কিছু খোঁজার চেষ্টা বাতুলতা।'

—'কোনোমতেই এটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায় না। মানুষের বেলায় দেখা গেছে যে, সে যত অভিজ্ঞ ও প্রবীণ হয়ে ওঠে, ততই ধীর স্থির হয়ে ওঠা মনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার বিচারধারাও তদনুরূপ হয়ে যায়। কাজেই টালাপার্ক থেকে টালিগঞ্জ, বেলেঘাটা থেকে

বাঘাযতীন—নানা জায়গায় আমরা যখন প্রবীণ কুকুরদের একইরকমের রহস্যময় ব্যবহার দেখছি তখন পুরো ঘটনাটাকে স্রেফ কাকতালীয় বা অপারগ হয়ে আত্মসমর্পণ বলে না ভাবলেই বোধহয় ভালো। সব ঘটনার অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যা হয় না। যদিও মানুষের প্রবণতাই হল তাই।'

—'আমাদের মনে হয় বিষয়টি নিয়ে অযথা বিতর্ক চলতে দেওয়া ঠিক হবে না। এতে মূল্যবান সময় নষ্ট হবে এবং কলকাতাকে কুকুর-শূন্য করার আমাদের যে সাধু-পরিকল্পনা তার বাস্তবায়ন বিলম্বিত হবে। মাথা যদি ঘামাতেই হয় তাহলে অনেক ব্যাপার রয়েছে। কতগুলো বুড়ো কুকুরের হাবভাগ নিয়ে কোনো ভাবনাচিন্তা বা বিতর্ককে আর যেন আমল না দেওয়া হয়।'

—'আমরা সম্পূর্ণ অন্য প্রস্তাব দিচ্ছি এবং কোনো বিতর্কের অবতারণা ঘটানো আমাদের লক্ষ্য নয়। পিঁজরাপোল-৩ মৃত ও অর্ধমৃত কুকুরে ভর্তি। বস্তুতই সেখানে আর কুকুর ছাড়া যায় না। পিঁজরাপোল-১-এ মেরামতি চলছে। পিঁজরাপোল-২-তেও যথেষ্ট সংখ্যক কুকুর রয়েছে। আমাদের বক্তব্য হল এই আত্মসমর্পণকারী বৃদ্ধ কুকুরদের পিঁজরাপোল-১-এ রেখেও মেরামতির কাজ চলতে পারে। বিজ্ঞানের স্বার্থে কয়েকটা দিন ওদের ওপরে নজর রাখা প্রয়োজনীয় বলে আমরা মনে করছি।'

সন্ধ্যের মুখে ফিরে এসে বেড়ালটা দেখল জিপসিও নেই, কান-গজানোও নেই। সারাটা দিনই আজকে ওকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। এদিকটায় কী ঘটেছে কিছুই জানা নেই। তবে কি কান-গজানো আর জিপসিকে ধরে নিয়ে গেল কুকুর-ধরা গাড়ি?

অসম্ভব মনখারাপ করে ভাঙা পেচ্ছাপখানার ছাদে শুয়ে শুয়ে বেড়ালটা আকাশ দেখতে লাগল। কান-গজানো বা জিপসি—কোনোটারই লড়াই করার মুরোদ নেই। দুটোই ক্যাবলা, ভালোমানুষ। ওদের কি সত্যিই ধরে নিয়ে গেল? রাত বাড়ল। আকাশের উজ্জ্বলতম তারা লুব্ধকের নীলচে আলোর রকমফের দেখতে দেখতে বেড়ালটা একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়লে সকলেই ছোটবেলায় ফিরে যেতে পারে। বেড়াল দেখল সে তখন বেড়ালছানা। বেশি লাফালাফি করার সেই সুন্দর ছোটবেলা। তখন সে প্রজাপতিদেরও লাফ দিয়ে দিয়ে ধরার চেষ্টা করত। একদিন হয়েছিল কী, হঠাৎ অ্যালামোন্ডা ফুলের ওপরে কালো ডানায় সাদা, হলদে ও নীল ছিট ছিট একটা মস্ত প্রজাপতি বসে ছিল সকালবেলায়। আলতো শীতের পশ্চিমি বাতাসে হলদে ফুলটা একটু একটু দুলছে আর প্রজাপতিটার ডানা দুটো লুকোনো একটা আমেজের ছন্দে একবার করে পুরো মেলে যাচ্ছে আবার বন্ধ হচ্ছে। রোদ ঝলমলে শীতের সকাল। এর মধ্যে আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। স্বপ্নে যা ইচ্ছে তাই হয়, যা ইচ্ছে হয় না তাও। ঘুম ভেঙে বেড়ালটা দেখল সত্যিই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আকাশের সব তারা লালচে একটা গুমোট মেঘ আড়াল করেছে। রাস্তাটা ডানদিকে বাঁদিকে জলে ভিজে চকচকে হতে শুরু করেছে। এবারে নেমে একটা আড়াল খুঁজতে হবে। কিন্তু নামার জন্যে টানটান হয়েও সে লাফ দিল না। তলায় কিছুটা বুক সাদা জ্যান্ত অন্ধকার বসে।

—কে?

—আমি জিপসি।

—বলবি তো। আমি ভাবলাম কী রে বোবা। ভূত-টুৎ নাকি?

—শোন্, আমি আর কান-গজানো একটা জায়গায় চলে গেছি। বাদামী বলে একটা কুকুর এসে আমাদের ওখানে যেতে বলছে তাই। তা ভাবলাম তুই নির্ঘাৎ ভাববি যে আমাদের ধরে নিয়ে গেছে।

—ভাববো কী, আমি তো তাই ধরেই নিয়েছিলাম।

—আমরা ওখানে প্রায় একচল্লিশটা কুকুর আছি। দুটো বেড়ালও এসেছে।

—সে কি?

—ওদের পাড়ার কুকুররা এসেছে, সঙ্গে ওরাও চলে এসেছে। তোকে বলতে এলাম যে তুইও আমাদের সঙ্গে চল্।

—তারপর?

—দিনদুয়েকের মধ্যে আমাদের শহর ছাড়তে হবে। মারাত্মক একটা কিছু হবে। কী তা জানি না। আমরা নির্দেশ পেলেই দল বেঁধে শহর ছেড়ে পালাব। তুই এখন চলে আয়। কান-গজানোও খুব করে বলেছে।

—তাহলে বলছিস যে গেলেই ভালো।

—এখন অবদি যা শুনেছি তাতে আমারও তো তাই মনে হচ্ছে। নেমে আয়। চল্।

—সে না হয় যাচ্ছি কিন্তু মারাত্মক ঘটনাটা কী?

—সবই কানাঘুষো। কেউ বলছে যুদ্ধ লেগে যাবে। কেউ বলছে ভূমিকম্প হবে। কুকুরদের বাঁচাবার জন্যে পাতাল থেকে নাকি কিছু উঠে আসতেও পারে। ঠিক করে কিছু বলা যায় না। চল্, যেতে যেতে বাকিটা বলছি।

টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে জিপসি আর বেড়াল চলে গেল। নোংরার গাদার মধ্যে একটা গলায় দড়ি বাঁধা পুতুলও পড়েছিল। বিদ্যুৎ চমকালে এক লহমায় মনে হতে পারে যে পুতুলটা এই ভিজে নোংরার মধ্যে বেশ আরাম করে বসে আছে। হাসছে কি?

পিঁজরাপোল-১-এ প্রবীণ কুকুরদের ঢুকিয়ে দিতে দেখা গেল তারা কোনো শব্দ না করে চক্রাকার জায়গাটায় মধ্যে গোল হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে একবার নাক শোঁকাশুঁকি করে নিল। তারপর নিজের নিজের জায়গাতেই আধশোয়া হয়ে বসে থাকল। ওদের যখন ওখানে ছাড়া হয় তখন বেশ একরোখা রোদ্দুর। পিঁজরাপোলের বধ্যভূমির একাংশে একটি বাজে-পোড়া মরা গাছ তার কয়লার ডালপালা মেলে কিছুটা ছায়ার সৃষ্টি করেছে। বৃদ্ধ কুকুরেরা যদি ওই ছায়ার জায়গাটায় সরে যেত তাহলে প্রখর উত্তাপ থেকে কিছুটা অন্তত রেহাই পেতে পারত। কিন্তু সেরকম কোনো চেষ্টাই ওরা করেনি। রোদ্দুরে মধ্যে অন্ধ সূর্য-উপাসক বা জেদি পাথরের মতো বসেছিল ওরা। চড়া রোদ্দুরে সব কুকুরই জিভ বার করে হ্যা হ্যা করে। সেরকমও তারা করেনি। রোদ, গরম, জলাভাব, ক্লান্তি, খিদে, অবধারিত অমোঘ মৃত্যু, কঙ্কালসার হতে হতে ঢলে পড়া, অবলুপ্তি—কোনোকিছুকেই তারা তিলমাত্র আমল দেয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এদের ওপরে নজর রাখা হয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা যখন টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ল তখন সন্ধানী-আলো ফেলে দেখা গেল যে তারা একইভাবে বসে আছে এবং একফোঁটা বৃষ্টির জলও তাদের শুকনো জিভ দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে না।

এরপরে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরে আকাশ যখন একটু পরিষ্কার হল তখন দেখা গেল যে সেই একই জায়গাতে উঠে বসে সেই প্রবীণ কুকুরেরা তাদের ঘোলাটে ছানিপড়া চোখগুলো অন্তরীক্ষের দিকে মেলে তাকিয়ে রয়েছে। একযোগে। বৃহৎ কুকুরমণ্ডলের আলো ওই। ওই তার মধ্যে লুব্ধক। ঘেউ! ঘেউ!

৬

...একটা কুকুর যখন বাস চাপা পড়ার পরে রাস্তায়,
চাঁদের আলোয় রক্তে ভিজে শুয়ে থাকে আর
তার শেষ চিৎকার টেপরেকর্ড করে
ইস্কুলের বাচ্চাদের শোনানো হয়...

'আমরা মোটের ওপরে বুড়ো কুকুরগুলোর ওপর নজর রেখে এবং মোটের ওপর ওদের লক্ষ্যবস্তুর একটা আন্দাজ করে অনুমান করছি যে ওরা বৃহৎ কুকুরমণ্ডলের দিকেই তাকিয়ে আছে। এর কারণ আমরা জানি না। সন্ধানী-আলোয় দেখা গেছে যে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার সময়টা ওদের মুখটা একটু হাঁ করে থাকছে এবং জিভগুলো থরথর করে কাঁপছে। ওরা কি কোনো প্রার্থনা জানাচ্ছে? কুকুররা কি প্রার্থনা জানাতে পারে? বৃহৎ কুকুরমণ্ডলের কী আছে যে ওরা কিছু চাইতে পারে? এখন ওই বুড়ো কুকুরগুলো যদি মরে যায় তাহলে আমরা এই অনুমানভিত্তিক পরীক্ষা আর চালাতে পারব না। তাই আমরা অনুরোধ করছি পিঁজরাপোল-১-এ অন্তত কিছু খাবারদাবার ও জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন যে বুড়ো কুকুরদের প্রতি মমত্ববোধ থেকে এই প্রস্তাব আমরা করছি না। আমরা যা কিছু বলছি সবই অমিত শক্তিধর বিজ্ঞানের স্বার্থে।'

ঘেউ! ঘেউ!

লুব্ধক ওরফে কুকুর-তারা ওরফে সিরিয়াস ওরফে আলফা ক্যানিস মেজরিস হল একটি যুগ্ম তারা। জার্মান জ্যোতির্বিদ ফ্রিডরিশ ভিলহেলম বেসেল ১৮৪৪ সালে এই তারকাটির কথা প্রথম বলেন এবং যুগ্ম তারকাটিকে চাক্ষুষ দেখা যায় ১৮৬২-তে। দেখেছিলেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ অ্যালভান ক্লার্ক। প্রাচীন মিশরীয়রা লুব্ধককে বলত 'সোথিস'। রোমে, সবচেয়ে গরমের সময় এই তারা দেখা দিত। ইংরেজি 'ডগ ডেজ' কথাটির মধ্যে সেই রোমক অভিজ্ঞতার রেশ রয়ে গেছে। লব্ধকের যুগ্ম তারা হল সিরিয়াস-বি। তারাদের দুনিয়ায় এ হল একটি সাদা বামন অর্থাৎ এর পরমাণুরা ঘন সন্নিবিষ্ট হতে হতে আশ্চর্য ঘনত্ব অর্জন করেছে। আফ্রিকার ডোগন উপজাতির লোকেরা লুব্ধক ও সিরিয়াস-বি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক খবর জানে। কিভাবে 'জংলি'রা এসব জানল (যেমন সিরিয়াস-বি হল সবচেয়ে ছোট আর ভারি তারা) তা হদিশ করা যায়নি। নীলচে-সাদা লুব্ধক সৌর পরিবার থেকে ৮০৬ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে। লুব্ধক সূর্যের চেয়ে বড় এবং ২৩ গুণ বেশি উজ্জ্বল। সাদা বামন সিরিয়াস-বি-র ভরও প্রায় সূর্যের সমান কিন্তু ঘনত্ব অনেক বেশি। ঘেউ! ঘেউ!

কান-গজানো, জিপসি, বেড়াল এরা সবাই যে-ট্রান্সফরমার ঘরের মধ্যে লুকিয়েছিল সেখানকার নেতার নাম বাহান্ন। হলদেটে মাদি কুকুর বাহান্ন-র এরকম নাম হওয়ার কারণ, মোটের ওপরে তখন অবদি সে বাহান্নজনকে কামড়িয়েছে। অবশ্য এর জন্যে ওকে দোষ দেওয়ার কোনো মানে হয় না। প্রতি বছরই বাচ্চা হওয়ার সময়টাতে লোকেরা ও কম বয়সের মানুষেরা কারণে-অকারণে মা ও বাচ্চাদের বিরক্ত করে বলে মায়েরা কামড়াতে বাধ্য হয়। সেখানে একটা কুকুর ছিল যার নাম তিনপেয়ে। ছোটবেলাতেই মোটর সাইকেল একটা পা উড়িয়ে দিয়েছিল। কলকাতায় এরকম অসংখ্য জায়গার মধ্যে কুকুরেরা লুকিয়ে ছিল।

প্রত্যেকটা ট্রামডিপো ও পাম্পিং স্টেশনে, দুধের বুথের পেছনে ও ভাঙাচোরা গ্যারেজে,

থানার মধ্যে যেখানে অ্যাক্সিডেন্টে চুরমার গাড়িদের রাখা হয় সেখানে, কবরখানা, বাসগুমটি, রোলের দোকানের তলায়, বেড়ার পেছনে, খোলা ম্যানহোলের মধ্যে, আধ-বানানো বাড়ির সিঁড়ির তলায়, বিরাট জায়গা জুড়ে দোতলা বাসের ভাগাড়ে, সুলভ শৌচালয়ের পেছনে, পার্কের মধ্যে, গাড়ি ঢুকতে পারবে না এরকম অপ্রশস্ত গলিতে, দুর্গাপুজোর জন্য বানানো পাকা বেদির পেছনে, শ্মশানে, আদিগঙ্গার ধারে বুনোকচুর জঙ্গলে, সেতুর তলায় নানা ফাঁকফোকরে—কুকুররা লুকোয়নি এমন কোনো জায়গা ছিল না। সকলেই জানে যে বড় বড় পাইপ-এর ভেতরে মানুষ ঘরসংসার করে। কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় এমন মাপের পাইপ পড়ে থাকে যার মধ্যে মানুষের পক্ষে ঢোকা সম্ভব নয়। কলকাতার কুকুরেরা সেগুলোকেও কাজে লাগিয়েছিল। যেমন কাজে লাগিয়েছিল রাতের বাসের তলা, ইটের পাঁজা, স্টেডিয়ামের আশেপাশের পরিত্যক্ত এলাকা ও বাতিল মালগাড়ির ওয়াগন। এইসব জায়গায় কুকুর-ধরা গাড়ি কখনও পৌঁছতে পারবে না। কোনো সাহসী কুকুর-ধরা যদি একা একা সাঁড়াশি হাতে যায় তাহলে তাকে বিপদের মুখে পড়তে হবে। বাঁধা মাইনের চাকরিতে অত ঝুঁকি নেওয়া চলে না। সবাই তো আর মিলিটারি নয়।

কুকুর-উপকথার মধ্যে গল্পের সঙ্গে সঙ্গে সত্যি বা চিরন্তন ঘটনার মিশেল থেকেই যাচ্ছে। শুধু সিমেন্ট দিয়ে কোনো কাঠামো বানানো যায় না। বালি, জল, লোহার রড—অনেক কিছু লাগে।

প্রচণ্ড গরমের মধ্যে (৯৫,১১৩ ও ১২২ ডিগ্রি ফারেনহাইট) কুকুরদের ট্রেডমিল ব্যায়াম করিয়ে অনেক পরীক্ষা করা হয়েছে। আরও যে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা কুকুরদের ওপরে চালানো হয়েছে তা বিভিন্ন ফাইলের শিরোনাম দেখলেই বোঝা যাবে—

Accleration, Aggression, Asphyxiation, Blinding, Burning, Centrifuge, Compression, Concussion, Crowding, Crushing, Decompression, Drug Tests, Experimental Neurosis, Freezing, Heating, Hemorrhage, Hindleg Beating, Immobilization, Isolation, Multiple Injuries, Prey Killing, Protein Deprivation, Punishment, Radiation, Starvation, Shock, Spinal Chord Injuries, Stress, Thirst... এই তালিকায় কোনো শব্দ নেই। আর আছে—চিমটে দিয়ে শরীরের কোনো অংশ ছিঁড়ে নেওয়া, থ্যাঁৎলানো, হাতুড়ির বাড়ি মারা, ঘুরন্ত ড্রামের মধ্যে গড়ানো, গুলি করা, ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করা ইত্যাদি। সবই বিজ্ঞানকে সর্বশক্তিমান করার জন্যে।

'পাঁচমিনিট পরে কাঁপুনি দমকে দমকে শুরু হল। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম মিনিটের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা বেড়ে গেল। ১১শ থেকে ১৩শ মিনিটের মধ্যে শ্বাসের সংখ্যা কমে মিনিটে তিনটিতে নেমে এল এবং এই পর্বটির শেষেই শ্বাসক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। এর আধঘণ্টা পরে ব্যবচ্ছেদ শুরু হল'—এই পরীক্ষা কিন্তু কুকুরের ওপর হয়নি। হয়েছিল কোনো ইহুদি, রুশ বা পোল যুদ্ধবন্দীর ওপরে। বাতাসের চাপ কমাতে থাকলে কী হয় তা জানার জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাটি করেছিল নাৎসি ডাক্তারেরা। অতএব মানুষ যে শুধু কুকুর ও অন্যান্য প্রাণীদের ওপরেই পরীক্ষা চালিয়েছে এমন নয়। বিজ্ঞানের জয় হোক। ঘেউ! ঘেউ!

দেওয়ালের ওপরের দিকে একটা গর্ত ছিল। কিন্তু সেটা মানুষ ঢোকার। ওই গর্তটা করেছিল পাতাখোর চোরেরা। ওরা ওখান দিয়ে লোহালক্কড়, তার, টুকটাক যন্ত্রপাতি—এইসব টুকরো মাল ঝাড়বে ভেবেছিল। খুব একটা লাভ হয়নি। সে-সব যা টানার মতো ছিল সে তো কবে

উধাও হয়ে গিয়েছিল। জগু আর ভজুয়া গিয়ে দেখল গর্তটা নীচের দিকে বাড়াতে না পারলে দুবলা বা বুড়ো, বাচ্চা বা কমজোরি মায়েরা ঢুকতে পারবে না। পুরো একটা রাত্তির ওদের লেগেছিল গর্তটা বাড়াতে। মেট্রোরেলের সীমানাটা টালিগঞ্জের দিকে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে রেললাইন ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও অনেক, অনেক জায়গা রয়েছে। সেখানে কেউ যায় না। অনেক বছর ধরে গাছ ও আগাছা, ইট, রেলের স্লিপার, জমাট বেঁধে যাওয়া সিমেন্টের বস্তা—এইসব মিলেমিশে সেখানে একটা দুর্ভেদ্য পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তেলাকুচো ও অন্যান্য লতানো গাছ জায়গাটাকে এমনভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে ঢেকেছে যে কোথাও কোথাও রোদ্দুর বা আলো, কিছুই ঢোকে না। বরং সবুজ অন্ধকার থাকে যার সঙ্গে পচা পাতা, গাছের কষ ও ভিজে মাটির গন্ধ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। হাওয়া ঢোকে কম। এই আর্দ্র ছায়ায় অসংখ্য পাতালকোঁড় হয় এবং গোল গোল গেঁড়ি অবাধে ঘুরে বেড়ায়। পরের রাতে ওই গর্ত দিয়ে প্রায় দেড়শো কুকুর মেট্রোরেলের এলাকায় ঢুকে আশ্রয় নেয়। এদেরই মধ্যে ছিল পাটকিলে আর তার চারটে বাচ্চা। কলকাতার কুকুরদের বাঁধা এলাকা থাকে। জায়গার দখলদারি রাখতে ঝগড়া থেকে সংঘর্ষ, গর্‌গর্‌ করে রাগ দেখানো থেকে শুরু করে রক্তক্ষয়ী কামড়াকামড়ি সবই হয়। কিন্তু কুকুর ধরার অভিযানের সময় এসব আর মাথায় রাখা সম্ভব হয়নি। তাড়া খেয়ে কুকুরদের দঙ্গল বেঁধে শহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পালাতে হয়েছে। সবাই পালাতে পারেনি। কোনো কোনো অন্ধ বা চোখে কম দেখতে পাওয়া কুকুর ফ্লাইওভার বানাবার জন্যে খোঁড়া, গভীর জলজমা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে এবং জলে ডুবে মারা গেছে বা কাদার ঢালের ওপর দিয়ে বারবার ওঠার চেষ্টা করে পিছলে নেমে গেছে। সারা রাত ধরে কলকাতার বাজারে যে লরির কনভয় আসে তার হেডলাইটের রাক্ষুসে আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে অনেক কুকুর রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ছে। লরির পর লরি, চাকার পরে চাকা তাকে পিষে পিষে, গুঁড়িয়ে, রাস্তার পিচের সঙ্গে লেই-এর মতো মিশিয়ে দিয়েছে। ঠাঁইনাড়া বা হটাবাহার হলে সকলেই কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। কলকাতার কুকুরদের বেলাতেও এর অন্যথা ঘটেনি।

ট্রান্সফরমারের ঘরে সব কুকুরই, এমনকী বাচ্চাগুলোও চুপচাপ বসেছিল। শুধু একটা পাঁজরভাঙা রোগা কুকুর ঘুমের ঘোরেই গোঙাচ্ছিল। জিপসি আর কান-গজানো ফিসফিস করে গল্প করছিল আর তাদের দুজনের মধ্যে, দুজনেরই গায়ের গরম থেকে আরাম পেয়ে গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছিল বেড়াল। দরজার দিকটায় শুয়ে শুয়ে বাহান্ন বাইরের দিকটায় নজর রাখছিল আর বাতাস শুঁকে শুঁকে বা কান পেতে প্রায় অস্ফুট সব কম্পন থেকে কোনো খবর বা অন্যকিছুর জন্য সজাগ সন্ধান চালাচ্ছিল। কান-গজানো জিপসিকে বলল,

—তোকে তো ভদ্দরলোকেরা অনেকদিন পুষেছিল।

—পুষেছিলই তো।

—তাহলে নির্ঘাৎ টিভি-ও অনেক দেখে থাকবি।

—দেখব না কেন?

—তাহালে একটা বেশ ভালো গল্প বল্‌ না। শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ব।

—টিভির গল্পগুলো একেবারেই ফালতু। একটা ভালো গল্প শুনবি তো বলতে পারি।

—বল্‌।

বাইরে কারা যেন টহলদারি করছে। তাদের বুটের শব্দ কাছে আসে। ট্রান্সফরমারের ঘরে টর্চের আলো পড়ে। টহলদাররা চলে যায়। পাঁজর-ভাঙা কুকুরের গোঙানির আওয়াজটা ওদের কানে যায়নি। ওদের বুটের আওয়াজটা দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পরে বাহান্ন বলল—

—জিপসি!

—কী?

—তুই বরং গল্পটা জোরেই বল। যারা জেগে আছে তারা সকলেই শুনবে। আমারও শুনতে ইচ্ছে করছে।

—দাঁড়া। তাহলে উঠে বসে বলি। আমাদের এই গল্পটার নাম হচ্ছে 'ক্ষুধার্ত কুকুর'। এক মস্ত বড়ো রাজা ছিল।

—উফ্, ফের সেই রাজা-গজা।

—শোনই না, কী হয় তারপর। সেই রাজা ছিল অসম্ভব অত্যাচারী। বিনা কারণে অত্যাচার করাতেই সে আনন্দ পেত। তা একবার হল কী, বুদ্ধদেব সেই অত্যাচারী রাজার রাজ্যে এলেন। সেই রাজা তখন বুদ্ধকে বলল, হে তথাগত, তুমি কি আমাকে এমন শিক্ষা দিতে পারো যাতে করে আমার মনটা অন্যভাবে ভাবতে পারে? বুদ্ধদেব তখন বললেন, আমি তোমাকে 'ক্ষুধার্ত কুকুরের' গল্পটা বলছি। মন দিয়ে শোন—

'এক ছিল অত্যাচারী সম্রাট। তাকে শিক্ষা দেবার জন্য ইন্দ্র শিকারি সেজে তার রাজ্যে এলেন। সঙ্গে ছিল ভীষণ এক বিশাল কুকুরের রূপে মাতালি রাক্ষস। শিকারি আর কুকুর সম্রাটের প্রাসাদে ঢুকল। কুকুরটা এমন জোরে ডাকতে লাগল যে গোটা প্রাসাদটা ভিত্ অবধি থরথর করে কেঁপে উঠল। সম্রাট তখন সেই শিকারিকে ডেকে ওই ভয়াবহ ডাকের কী কারণ তা জানতে চাইল। শিকারি বলল, ওর ক্ষিদে পেয়েছে তাই ডাকছে। ভীত সম্রাট তখন কুকুরকে খেতে দিতে বলল। পুরো রাজবাড়ির সব খাবার শেষ হয়ে গেল। কুকুরের ডাক থামে না। সম্রাটের খাদ্য-ভাণ্ডার শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় কী? সম্রাট তখন বলল, এই ভয়াবহ জানোয়ারটার খিদে কি কিছুতেই মেটানো সম্ভব নয়? শিকারি বলল, না যতক্ষণ না ও ওর শত্রুদের মাংস, হাড় সব চিবিয়ে না খাবে ওর খিদে মিটবে না। সম্রাট তখন বলল, কারা ওই বিশাল কুকুরের শত্রু? শিকারি বলল, এই রাজ্যে যতদিন মানুষ ক্ষুধার্ত থাকবে ততদিন ওর ডাক বন্ধ হবে না এবং গরিবদের ওপরে যারা অত্যাচার করে, অন্যায় করে তারাই হল ওর শত্রু। ভীত সম্রাট তখন নিজের কুকর্ম সম্বন্ধে সচেতন হল এবং প্রজাদের ওপরে জুলুম করা বন্ধ করল।

গল্পটা শেষ করে বুদ্ধদেব ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া সেই রাজাকে বললেন, যখনই শুনবে যে ওই কুকুরটা ডাকছে তখনই বুদ্ধের শিক্ষার কথা মনে করো। এতে করে তোমার ভালো বই মন্দ হবে না।'

গল্পটা শেষ হওয়ার পরে সকলেই চুপ করে ছিল। বাহান্ন বলে উঠল,

—গল্পটা খুবই ভালো। কিন্তু আমার কথা একটাই। আমাদের ওপরে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার চলছে তা বন্ধ করার কি কোনো উপায়ই নেই? বুদ্ধদেব, ইন্দ্র, মাতালি অথবা অন্য কেউ কি আমাদের হয়ে একটাও কথা বলবে না?

কান-গজানো হঠাৎ চিৎকার করে ডেকে উঠল। সবাই চমকে গেছে।

—আমি শুনতে পাচ্ছি।

—কী!

—অনেক কিছু হচ্ছে, একই সঙ্গে।

—কী? কী হবে?

—বলো!

—চুপ করে থাকিস্ না।

—ম্যাঁও।

—বলছি। ছায়া-কুকুরেরা এবার দৃশমান হবে। ওরা যাকে পাঠিয়েছিল সে বার্তা নিয়ে ফিরে এসেছে।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকাল। আকাশ চিরে বাজ পড়ার শব্দ হল। বৃষ্টি নামল। ঘেউ! ঘেউ!

—কে বার্তা নিয়ে ফিরে এসেছে?

কান-গজানোর ওপরে কিছু একটা ভর করেছে। তা না করলে সে এসব কথা জানবে কী করে? কিন্তু সর্বশক্তিমান বিজ্ঞান কি ভর মানে? না। বিজ্ঞান ভর না মানলেও আবেশ মানে। না মানলেই বা কি এসে গেল?

—বার্তা নিয়ে ফিরে এসেছে অনুবিস।

—অনুবিস?

—হ্যাঁ, অনুবিস। পোড়ামাটির রঙ তার গায়। তার প্রতীক হল পাথরের শবাধার বা কাঠের কফিন। অনুবিস হল সেই মিশরীয় শিকারী হাউন্ড যে এ-পৃথিবী থেকে পরবর্তী বিশ্বে যাতায়াত করতে পারে। অবশ করে দেওয়ার জাদু সে জানে। সে হারানো জিনিস খুঁজে দিতে পারে। আত্মা বা 'বা'-কে সে রক্ষা করে। রহস্য উন্মোচনকারী নপথিস বা বিচারক ওসাইরিসের কাছে সে প্রার্থীকে নিয়ে যায়। অনুবিস বার্তা নিয়ে ফিরে এসেছে। বাইরে যে ঝড় উঠছে দেখছ তা হল বার্তা পেয়ে ছায়া-কুকুরদের উল্লাস।

—কিন্তু কী আছে সেই বার্তায়?

—জানি না। তবে আমাদের জন্যে নির্দেশ আসছে।

—কে আনছে?

—বাদামী। আমি তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বাদামী আসছে। ছায়া-কুকুররা দৌড়োচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকালে তাদের ছায়া গোটা শহরের ওপরে চমকে উঠছে। ওই তো সবার আগে দৌড়চ্ছে লাইকা। তার পেছনে ভেলু। পাশে দৌড়চ্ছে কারা? ওরা হল শ্মশানের কুকুর। কালু, ভুলু, জামভোলা, বড়শ্বেতফুল, মড়িমা, সাবলিদিদি, বুড়োবাবা, বুড়িমা, ছোটশ্বেতফুল, দুর্গা, পদি, হরির মা, থরথরি, ফুলটুসি, হরহরি, বাঘা, রাঙুবাবু—সবাই দৌড়োচ্ছে।

কান-গজানো ভুল বলেনি। সারা গা চুপচুপে ভিজে। সমস্ত লোম লেপটে রয়েছে সারা গায়। বাদামী এল।

—সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো?

—সবাই আছি। ঠিকই আছি।

—আজ মাঝরাতে, সবাই মন দিয়ে শোনো, হঠাৎ তোমরা দেখতে পাবে যে কুকুরদের একটা বিশাল দল কাছে আসছে। তোমারা শুয়ে শুয়ে পায়ের শব্দ পাবে। পেলেই তোমরা বেরিয়ে আসবে।

—কোথায়?

—রাস্তায়। তারপর সেই দল যেদিকে যাবে তোমরাও চলতে থাকবে। মোদ্দা কথা আমাদের কলকাতা ছেড়ে দূরে চলে যেতে হবে।

—কোথায় যাব আমরা?

—দূরে। অনেক দূরে। আর শোন, সবাইকে ছুটতে হবে। দরকার হলে পালা করে বাচ্চাদের মুখে নিয়ে ছুটতে হবে। যারা দুর্বল, অসুস্থ বা চোট পেয়েছে তাদেরও সঙ্গে কাঁধ লাগাতে হবে।

—অনুবিস কী বার্তা এনেছে তুমি জানো?

pathagar.net

—তুমি অনুবিসের কথা জানলে কী করে?

—কী করে তো বলতে পারি না। কেমন একটা ভরের মতো হয়েছিল।

—কী বার্তা সেটা আমিও জানি না। আমাকে যতটা জানাতে বলা হয়েছে ততটাই আমি বললাম।

—এখন তুমি কোথায় যাবে?

—আমি? আমাকে এখন অনেকগুলো জায়গায় খবর দিতে হবে। আমি বরং আর সময় নষ্ট না করে এগিয়ে যাই।

বাদামী তুমুল ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল।

বাহান্ন একবার ফাঁকায় বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকাল। অন্ধকার ফুঁড়ে লক্ষ লক্ষ তীর হয়ে বৃষ্টি নামছে। বাহান্ন ঘরে ফিরে এল। জিপসি বলল,

—আমরা সবাই যাব কিন্তু পাঁজর-ভাঙা আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না।

—কেন?

—গোঙাচ্ছিল। কোন ফাঁকে মরে গেছে আমরা বুঝতে পারিনি।

pathagar.net

জ্বেলেছ কি জ্বালাব আগুন
খুনের বদলা জেনো খুন
নাচালেই বেয়াদব ঝুঁটি
ঝুলব কামড়ে ধরে টুঁটি

—হ্যালো! হ্যালো! শুনতে পাচ্ছেন। ১ নম্বর পিঁজরাপোল থেকে বলছি।

—শোনা যাচ্ছে তবে লাইনে ঝড়ের মতো শব্দ হচ্ছে।

—এখানে একের পর এক আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটছে।

—সারা কলকাতা জুড়েই আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে। সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে কুকুরেরা। ওখানকার কী অবস্থা।

—এমনিতে খারাপ কিছু নয়, কিন্তু ঝোড়ো বাতাসে আমরা কুকুরের কান্না শুনতে পাচ্ছি। ওদিকে বুড়ো কুকুরেরা সবাই একসঙ্গে সামনের থাবাগুলো ওপরে তুলে আকাশে কী যেন সব বলছে যদিও কোনো বোধগম্য শব্দ আমাদের কানে আসেনি।

—ওখানে যা হচ্ছে সব ভিডিওতে তোলা থাকছে তো? এদিকে বি. বি. সি. আর সি. এন. এন ওদের খবরে কুকুরদের মিছিলে ছবি দেখিয়েছে। বাধ্য হয়ে আমাদেরও দেখাতে হচ্ছে।

—এবারে শুনুন। ওই বুড়ো কুকুরদের মধ্যে আমরা হঠাৎ দেখলাম একটি বিশাল কুকুর যার চোখ দুটো আগুনের আলো নিয়ে জ্বলছে। একজন এখানে বলছে যে ইজিপশিয়ান মিথলজির বইতে অনুবিস-এর যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে পুরো মিলে যাচ্ছে। সেই টেরাকোটা রং, লম্বাটে শিকারি হাউন্ডের গড়ন। পিঁজরাপোল-১ নম্বর তিনদিন ধরে তালাবন্ধ। কোথা দিয়ে অতবড় কুকুরটা ঢুকল আমরা ভেবে পাচ্ছি না।

—অন্যান্য অনেক জায়গাতেই নাকি ওই কুকুরটিকে, যাকে আপনারা অনুবিস বলছেন, দেখা যাচ্ছে।

—এদিকে সহসা অনুবিসকে আর দেখা যাচ্ছে না। গোটা পিঁজরাপোল জুড়ে ওরা গোল হয়ে নাচছে। ধুলোতে ওদের থাবা এত জোরে ঘষছে যে ফুলকি ঠিকরে বেরোচ্ছে...

—অসম্ভব শব্দ হচ্ছে...অসংখ্য শেকল আছড়ালে যেমন...

—আমরা ১ নম্বর পিঁজরাপোল খুলে দিচ্ছি।

—এখানে কিছু শোনা যাচ্ছে না...

—আমরা ২ ও ৩ নম্বর পিঁজরাপোলও খুলে দেবার নির্দেশ পাঠাচ্ছি...

—কিছু শোনা যাচ্ছে না...

—হ্যালো! হ্যালো!

কুকুরদের মিছিল কেন, এই কুকুরের সচল নদী, কুকুরের এই লাভাস্রোত যাই বলা হোক না কেন এ দৃশ্যকে প্রকাশ করার ভাষা আমাদের জানা নেই। পৃথিবীর কোথাও, কখনও এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে আমাদের কেউ বলেনি। জীবজন্তুদের মধ্যে এরকম ব্যাপক মাইগ্রেশন হতেই পারে বলে কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করছেন। কিন্তু আমেরিকাতে লেমিংদের গণ-আত্মহত্যার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। সুশৃঙ্খল, সংঘবদ্ধ হাজার হাজার কুকুর প্রায় নীরবে, গম্ভীর মুখে কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই যে বিশাল আলোকিত সেতুটি আপনারা দেখছেন এটি হল গঙ্গার উপরে নির্মিত দ্বিতীয় সেতু। কুকুরদের মহামিছিল এই সেতু দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আত্মহত্যার কোনো অভিপ্রায় থাকলে ওরা ওপর থেকে লাফ দিতেই পারত। নীচেই গভীর জল। বোঝা যাচ্ছে যে ওরা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। খেয়াল করে দেখুন—পুলিশের একটি পাইলট-ভ্যান এবং কোনো মাননীয় মন্ত্রীর গাড়ি কুকুর-সমুদ্রের মধ্যে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাইলট-ভ্যানটির মাথায় নীল আলো জ্বলছে নিভছে। মন্ত্রীর গাড়ির ওপরে জ্বলছে লাল আলো। কলকাতার এই সচল কুকুর-সমুদ্র আপনাদের দেখাচ্ছে সি. এন. এন.। একটি ছোট্ট ব্রেকের পর আমরা আবার এই আশ্চর্য দৃশ্যে ফিরে আসব...

গড়িয়াহাট রোডের দুটি লেনই একমুখী কুকুরের স্রোতে বন্ধ। কুকুর-নদী বয়ে চলেছে বাইপাসের দিকে। চারপাশের যত গলি ও ছোটখাটো রাস্তা—সবদিক দিয়েই কুকুররা আসছে। কেউ ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে আসছে। কেউ মাঝে মধ্যে থেমে গিয়ে ল্যাজে বসা মাছিকে ধাওয়া করছে। আসছে ছোট ছোট কুকুর-ছানারা যারা এখনও চিন্তাই করে উঠতে পারছে না যে কত দীর্ঘ পথ তাদের যেতে হবে। বড় বড় বাড়ি, বুটজুতো-পরা পা, গাড়ির রাক্ষুসে চাকা, কোনোদিনও ওপারে পৌঁছোন যাবে না এমন রাস্তা, ট্রাক, বড় বড় আলোওয়ালা দোকান যার সামনে হাতে জিনিস-ভর্তি লোকেরা খালি মাড়িয়ে দেয়, সাইকেল, হিংস্র মোটরবাইক, মিনিবাস—এই সবকিছু, যার মধ্যে পরতে পরতে ভয় মিশে আছে, যা সবসময় বুঝিয়ে দেয় যে তোরা ফালতু, দুবলা, ভীতু, তোদের চোখে ভয়ের পিচুটি—সেই ভয় দেখানো সবকিছু কেমন চুপ, কোণঠাসা ও অচল হয়ে পড়েছে। কাঁউ! কাঁউ! এই তো আমরা ছোট ছোট গলাতেই ডাকছি। হ্যাঁ, সবকিছু আজ আমাদের দখলে। ফুটপাতের কোনো প্রায়ান্ধকার কোণে, মায়ের পেট ঘেঁষে শুয়ে ড্যাবডেবে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমরা তোমাদের কেরামতি অনেক দিন, অনেক যুগ, অনেক জন্মজন্মান্তর ধরে দেখেছি। এবারে বারান্দায় ভিড় করে বা পর্দা সামান্য সরিয়ে বা গাড়ির ভেতরে বসে জানালার কাছ অসহায়ভাবে তুলে দিয়ে বা টিভির পর্দায় তোমরা আমাদের দেখ।

আমরা কোথায় যাচ্ছি জানি না। বড়োরা যেতে বলেছে, যাচ্ছি। হ্যাঁ, তোমাদের শহর, তোমাদের দোকানপাট, তোমাদের বাজার, হোটেল, মুরগি কাটার বঁটি, মাংস ঝলসাবার লৌহশলাকা, টিভি টাওয়ার, কসাইখানা, থানা, বন্দুক, লাঠি, পতাকা, সি ডি প্লেয়ার, তোমাদের সার্জন, অ্যানাসথেসিস্ট, নেতা—সব তোমাদেরই থাকছে। আমরাই চলে যাচ্ছি। তবে মাথা নিচু করে নয়। সসম্মানে। তোমরা বসে বসে আমাদের প্রত্যাখ্যানে অভিশপ্ত শহরে অন্ধ যখের মতো এবার তোমাদের ধন-সম্পদ আগলাও। চলে যাচ্ছি ট্রামলাইন, চলে যাচ্ছি ফোয়ারা, চলে যাচ্ছি জেব্রা ক্রসিং, বিকল হয়ে যাওয়া ট্রাফিকের আলো, বর্শা দিয়ে বানানো রেলিং, চলে যাচ্ছি আকাশে কাটাকুটি খেলা কেবলের তার, বোলের দোকানে তাওয়ার এরিনাতে খণ্ড খণ্ড ক্লাউন মাংসের ওলট-পালট খাওয়া, চলে যাচ্ছি হতভম্ব জলের কল, ঝাঁঝরি, পিঁপড়েতে খেয়ে নেওয়া গাছের গুঁড়ি, দাঁত উপড়ে নেবার চেয়ার, চলে যাচ্ছি, চলে চলে যাচ্ছি দলে দলে, বড়দের সঙ্গে, আমরা ছানা-কুকুররা। তোমরা তোমাদের পিঁজরাপোল নিয়ে আনন্দে থাকো, বিকেলে ভেতরে বেড়াতেও পারো বা নিজেরা নিজেদের আটকে রেখে, না খেতে দিয়ে, না জল দিয়ে মজা করতে পারো। আমাদের ছোট ছোট পা খুব একটা জোরে ছুটতে পারে না। কিন্তু চেষ্টা করছি আমরা বড়দের সঙ্গে সমানতালে থাকার। তোমাদের নিষ্ঠুরতা, তোমাদের অবজ্ঞা, তোমাদের নির্মমতা, তোমাদের লোভ, তোমাদের অজ্ঞতা ব্যমেরাং হয়ে ফিরে আসছে বুঝতে পারছ না? হ্যাঁ, যাওয়ার সময়ে সগর্বে, মাথা উঁচু করে বলে যাচ্ছি কথাগুলো, কিন্তু কোনো কিছুই বোঝার ক্ষমতা তোমাদের নেই। মরুভূমির চোরাবালিতে বা মেরুর তুষারঝড়ে তলিয়ে যাওয়ার সময়, চাপা পড়ার সময়, অন্তিমলগ্নে বিশ্বাসঘাতকদের এরকমই হয়। আমাদের ছোট ছোট কানগুলো লাফাতে লাফাতে তোমাদের ওপরে যা নেমে আসছে তাকে সম্মতি জানাচ্ছে। এত সংখ্যায় আমরা, ছোট কুকুরছানারা, কখনও এক জায়গায় হইনি। হলামই বা যদি খেলা করার বা এর ওর সঙ্গে চেনাশোনা করার কোনো ফুরসৎ নেই। এর জন্যে দায়ি কারা? তোমরা। এই যে আমাদের খিদে পাচ্ছে, জল তেষ্টা পাচ্ছে, শক্ত রাস্তায় নরম থাবা আর নখ ব্যথা ভুলে অবশ একাগ্রতায় এগিয়ে চলেছে, এই কুকুর-সমুদ্রের ঢেউ, এই কুকুর-রাত্রি এর জন্য দায়ি কারা? তোমরা। হ্যাঁ, হাতে ওয়াকিটকি, কোমরের হোলস্টারে রিভলভার, চোখে কালো চশমা, পা ফাঁকা করে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ সার্জেন্ট, তুমি খিলান বা দরজার মতোই দাঁড়িয়ে থাকো। নড়লেই আমাদের গায় পা লাগবে। এবং ঘটনাটা যদি একবার ঘটে তাহলে আজ কেন, আর তোমার কখনই বাড়ি ফেরা হবে না। মাছ, মাংস, তরি-তরকারি, ফল, কোল্ড ড্রিংকস্ বোঝাই যত লরি আটকে গেছে তারা চালকেরা সাবধান। একটা চাকাও যদি একটুও গড়ায় তাহলে এই বিশাল শান্ত সমুদ্র কিন্তু একটা বিরাট হাঙর হয়ে হাঁ করবে যার মধ্যে প্রবেশ করলে আর বেরোবার রাস্তা নেই। হেডলাইটগুলো নিভিয়ে দাও। আমাদের চোখে লাগছে। কাঁউ! কাঁউ!

হেডলাইটগুলো পর পর নিভে যায়। যেন দৈত্যরা একে একে অন্ধ হয়ে গেল। সার্জেন্টও তিলমাত্র নড়ে না। তার কালো চশমায় কুকুর-মিছিলের প্রতিফলন। হোলস্টারের ভেতরে রিভলভার ঘামছে। স্ট্যাচু! অবশ্য এমনই অভব্য যে সহসা 'হাইল হিটলার' বলে চেঁচিয়ে উঠতে পারে। এবং কে বলতে পারে যে আরও বহু গলনালি ও মুখের কোটর থেকে এই চিৎকারকে অনুরূপ হুংকার দিয়ে সমর্থন জানানো হবে না? কলকাতা এখন মাফিয়ার শহর। এই শহরে কুকুরদের পক্ষে থাকা অসম্মানজনক। তাই এই শহরকে চারপায়ে লাথি মারতে মারতে তারা চলে যাচ্ছে। ঘেউ! ঘেউ!

কান-গজানো বলল,

—জিপসি, এরকম দৃশ্য কলকাতা কখনও বাপের জন্মে দেখেনি।

—দেখেনি, আর দেখবেও না।

—মুখগুলো দেখেছিস ; কেমন কাঁচুমাচু হয়ে গেছে। আমতা আমতা করেও একটা কথা মুখে সরছে না।

—আসলে ভেবেই পাচ্ছে না যে বাপারটা কী হচ্ছে। বেশি বুদ্ধি যারা ধরে তাদের শেষে এরকম বোবা মেরে যেতে হয়।

—আমার কিন্তু ওদের জন্যে একটু খারাপও লাগছে। কেমন নিয়তির হাতে নিজেদের সঁপে দিয়েছে।

—ব্রয়লার। দেখতে মানুষের মতো। আসলে ব্রয়লার। আমার কিন্তু ওদের জন্যে এতটুকু খারাপও লাগছে না।

—ওরা কিন্তু এখনও জানে না যে কী হতে চলেছে।

—ঠিক এরকমই হয়। অনেক কিছুই জানা থাকে না। হঠাৎ আকাশ ভাঙার মতো নেমে আসে।

ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে খেয়ালই করেনি যে বাদামী আর বেড়ালও এই ম্যারাথন যাত্রায় ওদের পাশে এসে পড়েছে।

—এই! তোরা বেকার কথা বলে দম নষ্ট করছিস কেন? আমাদের আরও জোরে চলতে হবে। জোরসে...

—কোথায় যাচ্ছি আমরা? সেটাই তো মাথায় ঢুকছে না। জায়গাটা জানা থাকলে সুবিধে হত না?

কোনো জায়গা নেই। যতটা পারা যায় দূরে চলে যেতে হবে। যতটা পারা যায়।

দুনিয়ার খবর জানাচ্ছে বি.বি.সি। দুনিয়ায় যা কিছু ঘটছে। সে যেখানেই হোক। আমাদের ভ্রাম্যমান সংবাদদাতারা প্রতি ঘণ্টায় খবর পৌঁছে দিচ্ছে আপনাদের ঘরে...আমরা কলকাতাকে জানি 'সিটি অফ দা ড্রেডফুল নাইট' হিসেবে বা 'দা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর সুবাদে। কিন্তু ভবিষ্যতের পৃথিবী কুকুরদের এই মহা এক্সোডাস-এর জন্যেই ক্যালকাটাকে জানবে। কলকাতা থেকে বাইরের দিকে যত রাস্তা বেরিয়েছে, সব রাস্তা, সব জাতীয় সড়ক বা এক্সপ্রেসওয়ে চলমান কুকুরের দঙ্গল দখল করে নিয়েছে। অসমর্থিত খবরে প্রকাশ যে 'নাসা'-র জনৈক বিজ্ঞানী নাকি লাতিন আমেরিকার একটি টিভি চ্যানেলে বলেছেন যে কলকাতার ওপরে মহাবিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে। এর বেশি তিনি কিছু বলতে রাজি হননি। জেনিভাতে জনৈক দেশত্যাগী রুশ জ্যোর্তিবিজ্ঞানী বলেছেন যে এই বিপর্যয় সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য 'নাসা'-র কাছে রয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা কোনো খবর জানাচ্ছে না।

আমাদের ক্যামেরা এখন রাস্তার পাশে। কুকুরদের উচ্চতাতেই রাখা। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে যে মাঝে মধ্যে পাপি-দের কাঁই! কাঁই! কাঁউ! কাঁউ! এছাড়া একমাত্র যে-শব্দ তা কুকুরদের হাঁপানোর। জানা গেছে যে মুষ্টিমেয় বেড়ালও এই শহরত্যাগী কুকুরদের দলে রয়েছে। পিঁজরাপোল-১, ২, ও ৩ খুলে দেওয়া হয়েছে। তবে ২ ও ৩-এ অসংখ্য কুকুরের মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই নেই। কলকাতাবাসী যে বিজ্ঞানীর আবেদনে শেষ অবধি পিঁজরাপোল খুলে দেওয়া হয় আমাদের প্রতিনিধিকে তিনি একটি সাক্ষাৎকারে একটু আগেই বলেছেন...(ঝিরিঝিরি

পর্দা ও যান্ত্রিক কোলাহল)...

বি. বি. সি : আপনি তো এই গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে গোড়া থেকেই জড়িত। কী মনে হচ্ছে আপনার?

বিজ্ঞানী : আমার মনে হচ্ছে কুকুরদের ওপরে নিপীড়নমূলক অভিযান চালানো খুবই অন্যায় হয়েছে। এতটা স্পষ্টভাবে না বললেও আগেই আমি প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম...এখন সত্যি বলতে আমি আর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না।

বি.বি.সি : কিসের ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছেন না?

বিজ্ঞানী : এই কুকুরটির ফোটোগ্রাফ দেখুন। টেরাকোটা রঙ। বিশাল চেহারা। সাধারণ বড় কুকুরের অন্তত তিনগুণ। এবার দেখুন, মিশরীয় মিথলজির বইতে অলৌকিক কুকুর-দেবতা অনুবিসের ছবি। কী করে এরকম ঘটা সম্ভব?

বি.বি.সি : এই ফোটোটি যে জাল নয় তার প্রমাণ কী?

বিজ্ঞানী : তার মানে? আমি নিজে ছবিটা তুলেছি।

বি.বি.সি : আপনার কী মনে হয়? কী হতে চলেছে?

বিজ্ঞানী : আমি জানি না। বিশ্বাস করুন আমার কোনো আন্দাজই নেই এ ব্যাপারে। তবে আমার মন বারবার বলছে যে ভালো কিছু হবে না, হতে পারে না...

আমাদের প্রতিনিধি বলেছেন যে এই অসংলগ্ন কথার থেকে কোনো স্পষ্ট হদিশ পাওয়া সম্ভব নয়।

এইমাত্র খবর পাওয়া গেল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউনাইটেড কিংডম ও জার্মান দূতাবাস থেকে কলকাতা দূতাবাসের কর্মীদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কুকুরদের এক্সোডাস সম্বন্ধে নতুন খবর পাওয়া মাত্র আমরা আপনার জানাব...স্টে টিউনড্...

কুকুর-সমুদ্রের ওপরে উড়ছিল ছায়াপথ ধরে ছায়া-কুকুরেরা। সেখানে মেঘে মেঘে পা রেখে এগোতে হয়।

লাইকা বলল,

—ওদের গতি আরও বাড়ানো উচিত। এখনও ওরা বিপদসীমা পেরোয়নি।

অনুবিস জবাব দিল,

—তবে পেরিয়ে যাবে। এখনও সাত ঘণ্টা বাকি আছে।

৮

উজ্জ্বল সূর্য গিয়েছিল নিভে, আর তারারা
অনন্ত মহাশূন্যে অন্ধ হাতড়ে বেড়ায়,
রশ্মিহীন ও পথবিহীন এবং বরফ পৃথিবী
দৃষ্টিহীন, কৃষ্ণতর, চন্দ্রবিহীন আকাশে ;
সকাল আসে ও যায়, ফের আসে,
কিন্তু আনে না কোনো দিন...

জর্জ গর্ডন বায়রন

pathagar.net

সাত ঘণ্টা, মাত্র সাতটা ঘণ্টা আর বাকি আছে। সাত ঘণ্টা মানে চারশো কুড়িটা মিনিট। খুব একটা অভাবনীয় মাপের কিছু নয়। মাত্র পঁচিশ হাজার দুশোটা সেকেন্ড। সময়-এর এই খণ্ড দৌড়ে পেরিয়ে যেতে একটা ঘুমই যথেষ্ট। তবে পুরোটাকে ঘুম বলা যাবে না। খুব সামান্য সময়ের জন্যে হলেও দু-একটা স্বপ্ন দেখতে হবেই। মোটের ওপর সাত ঘণ্টার অপেক্ষা। আর ঘুমোতে যে হবেই বা ঘুম যে আসবেই এমন কোনো কথা নেই। ঘেউ! ঘেউ!

আগেই জানানো হয়েছে যে তিনটি পিঁজরাপোলই খুলে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে ২ ও ৩ নম্বর পিঁজরাপোলে বলতে গেলে সব কুকুরই মরে গিয়েছিল। পিঁজরাপোল-১-এ যে প্রার্থনার ও বুড়ো কুকুরেরা ছিল তারা কিন্তু সশব্দে দরজা খুলে দেওয়ার দিকে ভ্রুক্ষেপও করেনি। চড়া আলো জ্বালিয়ে নিভিয়ে ও বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে তাদের সচকিত করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষ সময়টাতে কী ঘটেছিল তা জানা যাবে না কিন্তু আন্দাজ করা যায় যে অন্তিম সাত ঘণ্টা তারা তাদের জায়গা ছেড়ে নড়েনি। শেষ মুহূর্তে তারা একসঙ্গে হেসে উঠেছিল কি না হদিশ করার আর কোনো উপায় নেই।

কুকুরেরা কলকাতা থেকে সরে যাচ্ছে। কারণ সেরকমই নির্দেশ এসেছে তাদের ওপর। কলকাতা বাঁচবে না। কলকাতা ধ্বংস হয়ে যাবে। ডোগোনরা জানে যে কুকুর-তারা লুব্ধক তার অমোঘ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অসভ্য ডোগোনদের সঙ্গে সভ্য কলকাতার কোনো যোগাযোগ নেই। সেই নির্মম সিদ্ধান্ত সম্মতি পেয়েছে তার যুগ্ম অংশ সাদা বামন সিরিয়াস-বি-র লুব্ধকের ব্যাস ৪৮ লক্ষ কিলোমিটার। সূর্যের ব্যাস ১৪ লক্ষ কিলোমিটার। লুব্ধকের রঙ নীলচে সাদা। তার প্রভা সবার চেয়ে বেশি -১.৪৫। ছোট কুকুরমণ্ডল বা ক্যানিস মাইনর। এই তারামণ্ডলে রয়েছে প্রশ্বন। পৃথিবী থেকে প্রশ্বনের দূরত্ব ১১.৩ আলোকবর্ষ। সে-ও জানিয়ে দিয়েছে যে লুব্ধকের সিদ্ধান্ত সঠিক। বৃহৎ কুকুরমণ্ডলের সবকটি তারাকে নিয়ে যে-কুকুর সে হল কালপুরুষের সঙ্গী। কালপুরুষও সম্মত হয়েছে। এবং লুব্ধক হিংস্র কুকুরকে লেলিয়ে দেবার সেই শব্দটিই উচ্চারণ করেছে—লুঃ

এবং সেই শব্দে উত্তেজিত হয়েছে একটি গ্রহাণু, নেমে আসছে কলকাতার ওপর। কোনো ওজর, কোনো প্রার্থনা, কোনো আপিল তাকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। ঘেউ! ঘেউ!

৬৫ মিলিয়ন বছর আগে ১০ কিলোমিটার মাপের একটি গ্রহাণু বা অ্যাস্টেরয়েড পৃথিবীর ওপরে আছড়ে পড়েছিল এবং সেই মহাবিস্ফোরণে ডাইনোসররা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। গোটা পৃথিবী থেকে। আগেই বলা হয়েছে এরকম মহাধ্বংস, মহাসংহার ৪৫০, ৩৫০, ২২৫, ১৯০ মিলিয়ন বছর আগেও হয়েছিল। ১৯৮৯ সালে পৃথিবীর কক্ষপথে ১০০০ মিটারের একটি গ্রহাণু এসেছিল। মাত্র ৬ ঘণ্টা আগে পৃথিবী সেখানে ছিল। ১৯৯৬-এর মে মাসে ওই একই মাপের একটি গ্রহাণু মাত্র ৪ ঘণ্টার জন্য পৃথিবীকে আঘাত হানতে পারেনি।

কলকাতার ওপরে যে হিংস্র কুকুরটিকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে সে ঘণ্টায় ১ লক্ষ কিলোমিটার গতিতে এগিয়ে আসছে। তার মাপ ও ওজন এখনই সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। উন্মত্ত কুকুরটি কলকাতার ওপরে আছড়ে পড়ে ভস্ম হয়ে উবে যাবে, কিন্তু যে মহা-গহ্বরটির সৃষ্টি হবে তা কুকুরটির ব্যাসের দশগুণ এবং গভীরতা দুগুণ। কুকুরটির যা ওজন তার থেকে একশো গুণেরও বেশি পাথর যে আকাশে উড়িয়ে দেবে। প্রথম আঘাত ও বিস্ফোরণের পর কয়েক লহমা কোনো বাতাস থাকবে না। চাপা আগুন হয়ে ধক্ ধক্ করে জ্বলবে কলকাতা। তার পরই আসবে লক্ষ ঝড়ের শেষ নিশ্বাস। দাউ দাউ করে জ্বলে, গলে, পুড়ে, ছাই হয়ে খাক্ হয়ে যাবে কলকাতা। এর পরে ধুলোর মেঘ বর্মের মতো সূর্যকে আড়াল করবে। কতদিন

pathagar.net

সেই হিমরাত্রি থাকবে তা বলা যাবে না। ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা মাইনাস ২০° সেন্টিগ্রেডে নেমে যাবে। এবং অনেক মাস ধরে হিমাঙ্কের নীচেই থাকবে। প্রলয়ান্ধকারে কলকাতাকে ঢেকে রাখবে প্রলয়মেঘ। এই নির্মম ভবিষ্যদ্বাণী মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করতে করতে কুকুর উপকথা 'লুব্ধক' তার অন্তিম পর্বে পৌঁছিয়েছে। কলকাতা এখন এক অসাড়, অপেক্ষমান পিঁজরাপোল। তার শাস্তি মৃত্যু।

তবে হাতে তো এখনও সাত ঘণ্টা সময় রয়েছে। ঘেউ! ঘেউ!

pathagar.net

অটো

pathagar.net

ধোঁয়া, নাক জ্বলে যাওয়া ডিজেল ইঞ্জিনের নিঃশ্বাস, মানুষের শরীর ও তাদের চকমকি পাথরের মতো ব্যবহার, রান্নার ভাপ, কিছুটা রোখ করেও না-ধরে রাখতে পারা দম, ফেটে যাওয়া ফুস্‌ফুস্‌ ও বেলুনের হাওয়া, পরতে পরতে কালিমাখা ভূতের মতো মেঘ—এই সব নিয়েই সেজেছে সন্ধ্যার আকাশ। বন্ধ হয়ে যাওয়া, লোহার গেটে মরচে ধরে যাওয়া রঙকলের টানা দেওয়াল ঘেঁষে যে বটগাছটি বেড়েই চলেছে তার ওপরেই আকাশতলা যাতে খুব সন্ধানী নজর ফেললে পাঁচটা তারা দেখা যাবে। কেউ ঠাট্টা করে আকাশটার নামও রাখতে পারে ফাইভ স্টার হোটেল। হোটেলের অন্য অগুনতি বাসিন্দার দেখা না মিললেও আঁচ করা যায় যে অনুপস্থিত কেউ নেই। সবাই নিজের কক্ষপথে আলো মুখে, কখনও চিড়বিড়ে, কখনও ম্লান, কখনও হাতছানির, কখনও হাত নাড়ার, কত ভঙ্গিতে, কত অছিলায় ঘুরেই চলেছে বদ্ধপরিকর। এছাড়াও রয়েছে জীবন্ত ও মৃত কৃত্রিম উপগ্রহ, ধ্বংসে নিহত মহাকাশচারীর শিরস্ত্রাণ এবং বেসামরিক ও যুদ্ধের বিমান। এরই মধ্যে খুব বিশ্বাসী যারা তারা পূর্বপুরুষদের স্মৃতিতে জ্বেলে দেওয়া আকাশপ্রদীপেরও কল্পনা করে নেয়। ফানুস বা মনগড়া উড়ন্ত লণ্ঠনের কথা না হয় বাদই পড়ে গেল।

রাস্তার ধারে যে নতুন হলদে চড়া আলোগুলো লাগানো হয়েছে, সেগুলো সবে জ্বলে উঠেছে। তেতে না উঠলে পুরো আলো হয় না। ওই আলোগুলোর রয়েছে স্বচ্ছ খোলস। তার মধ্যে জমে কালো হয়ে রয়েছে পতঙ্গদের শুষ্ক শরীর। আলোর স্বাদ নিতে খুবই কসরত করে ওরা কখনও সামান্য ফাঁক খুঁজে ভেতরে ঢুকেছিল। আর বেরোতে পারেনি। আলোর খুব কাছেই তাদের বাধ্য হয়ে শুয়ে থাকতে হয়। একজনের ওপরে আরেকজন। প্রত্যেকটি বাতিস্তম্ভ একটি করে মৃত্যুশিবির। যদিও এর সঙ্গে যুদ্ধের কোনো সম্বন্ধ নেই। রঙকলের ওই কালো নিস্পন্দ চিমনিটার সঙ্গেও যুদ্ধের কোনো সম্বন্ধ নেই। গলার কাছে গুমরে উঠে আসা দলাটার সঙ্গেই শুধু থেকে যায়।

এখান থেকেই শহরের ওপারে যাওয়ার দুটো রুটের বাস ছাড়ে। বাসের আলো দূর থেকে চেনা যায়। অনেক সময় ছাড়তে অনেক দেরি থাকলেও ওরা আলো জ্বেলে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন এক স্টপ আগে দাঁড়িয়ে বারবার ভুল হয়ে যায়। মনে হয় বাসটা চলছে। এগিয়ে আসছে আলোগুলো। এছাড়া গাড়ি, ট্যাক্সি, পুলিসের জিপ—এদের সকলেরই নিজস্ব নিজস্ব কিসিমের আলো রয়েছে। আর হালে যে একের পর এক নতুন নতুন মডেলের গাড়িগুলো বাজারে আসছে, তাদের আলোর বাহার বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যাবে না। চম্‌কে চম্‌কে শুধু দেখতেই হয়। এছাড়াও বড়লোকেরা তাদের দামি গাড়িগুলোতে কতরকম আলো লাগায় যার জ্বলা-নেভা দেখে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। আবার একটু ভয়ভয়ও করে। গম্‌গম্‌ করে সাউন্ড সিস্টেম বাজছে। কাচ তোলা। এ সি চলছে। এরই মধ্যে এত আলোর বাহারেই আবার চোখে পড়বেই যে অনেক নীচে, গাড়ির অনেক তলায়, বরং স্কুটার বা মোটর সাইকেলের মতো উচ্চতাতেই একটা বড় আর পাশে দুটো ছোট আলো। অটো।

বাসগুলো যেখানে দাঁড়ায়, তার একটু আগে হল অটো স্ট্যান্ড। অটোগুলো এখান থেকে বেকারির মোড় অবধি যায়। ফস্‌ করে দেশলাই জ্বলল। প্যাসেঞ্জারের জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে বিড়ি ধরাল চন্দন। বাজে মাচিস। জ্বলন্ত বারুদ ঠিকরে বেরোয়। কাঠিটা নর্দমায় ফেলল। রঙকলের ভেতরে কেউ থাকে না। কিন্তু একটা খোলা কলে টাইম ধরে জল পড়ে যায়।

নর্দমা মরা হলেও একটা স্রোত তাই। কাঠিটা ভাসতে ভাসতে এগোয়। ঘামে ভেজা শার্টটার বুকের বোতাম খুলে দেয় চন্দন। কয়েকদিন আগেই বৃষ্টিতে ভিজে অটো চালাবার সময়ে খুব হাওয়া লেগেছিল বুকে। সকালে দেখেছিল বুকের বাঁদিকে খানিক ওপর ঘেঁষে ব্যথা। আপনা থেকেই কমে গেছে। হ্যান্ডেলের তলায় ঝোলানো ব্যাগটা একবার নাড়ল। হালকাই। লোক না উঠলে ভারিই বা হবে কী করে? সিটের তলা থেকে বিসলেরির বোতলটা নিয়ে চন্দন একটু জল খেল। তারপর লাল ন্যাকড়াটা ওই জলেই ভিজিয়ে নিয়ে সামনের কাচটা মুছতে লাগল। ধুলো বাদেও একটা চট্‌চটে নোংরা কাচে মেখে যায়। উঠতে চায় না। বোতল কয়েলটা ঝামেলা করছে। প্রায়ই করে। একটা লোক এসেছে। হাতে ব্রিফকেস। প্যাসেঞ্জার আর জনাদুয়েক হলেই ছেড়ে দেবে চন্দন। এ-মাথা থেকে এখন লোক পাওয়া কঠিন। বেকারির মোড়ে এখন বেশিক্ষণ, প্রায় দাঁড়াতেই হবে না। ও-মাথা থেকে এখন লোক ফেরার টাইম। অফিসের লোক আছে। ব্যবসা, সেল্‌স বা উট্‌কো লোক ঠিক থাকবে। আর রাত বাড়লে সেই ক্লান্ত মেয়েগুলো ফিরবে যারা আয়ার কাজ করে বা অন্যরকম। আবার অনেক রাতে এদিক থেকেও কয়েকটা মেয়ে শহরে হারিয়ে যাওয়ার জন্যে সেজেগুজে রওনা দেয়। তারা নেমে যাওয়ার পরেও সস্তার সেন্টের বা পাউডারের গন্ধ পাওয়া যায়। চন্দন এই গন্ধটাকেই ভয় পায়। কারণ এই গন্ধটা পেলেই অটো নিয়ে সেই একচিলতে মাঠটাতে যেতে হয় যার মধ্যে ছেঁড়া ফুটবলের জার্সিতে আড়াল একটা আলোর তলায় ঘুগনি বিক্রি হয়। অন্ধকারের মধ্যে আরও গাঢ় অন্ধকার হয়ে অনেক লোক সেখানে বসে মদ খায়। তারা নিচু গলায় কথা বলে। কম শব্দ করে হাসে। এরই মধ্যে আবার মাঠটার যেদিকে রাস্তার আলো পড়ে, সেখানে বস্তির বুড়োরা বসে কাশে আর গল্প করে। এখানে এলে কখনও কখনও মিউচুয়াল ম্যান-এর সঙ্গে চন্দনের দেখা হয়ে যায়। এই মাঠটা ছাড়াও এ তল্লাটে যতগুলো চোলাইয়ের ঠেক আছে, সবগুলোর হয়ে পুলিসের কেস খায় মিউচুয়াল ম্যান। পার কেস আগে সত্তর ছিল, শেষে বেড়ে নব্বই হয়েছিল। আর সব ঠেকেই মিউচুয়াল ম্যান যা মাল খাবে সব ফ্রি। ও সকালে একবার যায়। দুপুরবেলা ফেরে। আবার বিকেলে যায়। রাত হয় ফিরতে। ওর চলতে অনেক সময় লাগে। একেই নেশা থাকে খুব। তার ওপরে ট্রাম ধাক্কা দিয়ে ওর ডান পা-টা ভেঙে দিয়েছিল। সেই পা-টার কারণে ও ব্যাঁকা ডান পা-টা ত্যারচা করে করে ফেলে অদ্ভুত এক ত্যাড়াব্যাঁকা ঢঙে হাঁটে। এরকম চোট যাদের থাকে তারা আর কোনওদিনও দৌড়তে পারে না। তাড়া করলেও না। ধাওয়া দিলেও না। ওর চলনটা পুরোপুরি না হলেও কাঁকড়ার ধাঁচের। মনে হতেই পারে যে, ও পাশের দিকেই চলছে। আসলে ও কিন্তু এগোত। টলতে টলতে হলেও। চন্দনের অটোতে কখনও-সখনও মিউটুয়াল ম্যান ফিরেছিল। যেমন ফিরেছিল রঙকলের ছাঁটাই মিস্ত্রি নন্দ। নন্দ ছিল ভিতু। আর কতটা ভয় ও পেয়েছে, সেটা যাচাই করার জন্যে এটা সেটা কথার পরে বলত,

—তাহলে বলচো আমার কোনো কিছু ভয়ের নেই তো। বলো।

—পার্টি-ফার্টির ক্যাচালে থাকো না, কারো ক্ষতি করো না, তোমার আবার ভয়ের কী আছে?

—না, মানে, আন্‌কা লোক তো, কে কী কথায় কিছু মাইন্ড করে ফেলল, সেই ভয় করে। দিনকাল তো ভাল নয়।

—ফালতু মাথা ঘামাও কেন। বেকার ও সব ভাবো।

—না, না, তুমি জানো না। কিছু বলা যায় না। আলতু ফালতু কারণে আজকাল জান চলে যায়।

মিউচুয়াল ম্যান কিন্তু কথাই প্রায় বলত না। বললেও কম। এরকমও হয়। এক একটা লোক বেঁচে থাকলেও তাদের কথা ফুরিয়ে যায়। বা এমনও যুক্তি দেওয়া যায় যে, তারা আর কথা বলতে চায় না। কথা থাকলেও বলবে না। সত্যি বলতে এখন চাইলে মিউচুয়াল ম্যানের মুখে যে কোনও

কথা বানিয়ে বসিয়ে দেওয়া যায়। ওই তোবড়ানো মুখেই যার দিকে তাকালেই মনে হতো যে টুঁটি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে চোখগুলোকে কেউ ঘুরপাক খাইয়ে দিয়েছে এমন যে কোন্‌টা সোজা, কোন্‌টা উল্টো ও ঠাহর করতে পারছে না। আর মরে যে ভূত হয়ে গেছে, তার মুখে কথা বসানোতে কোনো মানা নেই। কিন্তু যে টাইমটার কথা হচ্ছে, তখনও মিউচুয়াল ম্যান বেঁচে ছিল। আরও অনেকে।

চন্দনের অটোর মালিক খুব একটা অটোয় লাভ-লোকসান নিয়ে মাথা ঘামায় না। যখন প্রথম নতুন গাড়ি বের করেছিল, তখন অনেক এন্‌থু ছিল। কত সময় নিজেই ড্রাইভারের পাশে বসে থাকত। হালকা গাড়ি বলে গাড্ডা বাঁচিয়ে চালাতে বলত। বলত বড় গাড়িকে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে বাঁদিক চেপে চলতে। কিন্তু এখন ইট, সিমেন্ট, স্টোন চিপস্ সাপ্লায়ার হয়ে গিয়ে গাড়িটার কথা বলতে গেলে ভুলে গেছে। আগে অটো মালিকের বাড়ির ঘেরা উঠোনেই থাকত। ওপরে প্লাস্টিকের চাদর চাপা দেওয়া হতো। কিন্তু এখন অটো চন্দনের ঘরের সামনেই থাকে। খোলা আকাশের তলায় সারারাত চুপ করে ঘুমোয়। শিশিরে ভেজে। শীতকালে হিমস্নান করে। তা না হলে বৃষ্টিতে। অবশ্য শুখা মরসুম চলতে থাকলে চন্দন অটোকে গা ঘষে ঘষে স্নান করিয়ে দেয়। সিট মোছে যেমন বাচ্চাদের ধরে মোছানো হয়। লোকনাথ বাবার ফটোটা মোছে। আয়না মোছে। অকেজো মিটারগুলোর কাচ মোছে। আর ৩/৪ দিন পরে পরে মালিকের বাড়িতে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসে। মালিকের বউ খুব ভাল মেয়ে। চন্দনকে বলে চা, মুড়ি খেয়ে যেতে। ওই সময় যদি বাচ্চা দুটোর স্কুল যাওয়া পড়ে যায় বা বউদির কোনও দোকানপাট, তাহলে চন্দনই অটোতে নিয়ে যায়। চন্দন এটা দেখেছে যে মালা চলে যাওয়ার পর বউদি তাকে বড় মায়ার চোখে দেখে। বছরে একবার জামাও দেয় বা প্যান্ট পিস। শেষ যে গাঢ় নীল প্যান্ট পিসটা দিয়েছিল, সেটা করানোই হয়নি। মার টিনের সুটকেসে মালার ফেলে যাওয়া কয়েকটা প্রায় বাতিল ঘরে-পরার শাড়ির সঙ্গে প্যান্ট পিসটা পড়েই আছে।

ব্রিফকেস হাতে লোকটা বাস ছাড়ছে দেখে উঠে গেল। বয়ে গেছে তাতে চন্দনের। আট আনা ভাড়া কম বলে লোকে সব সময় অটো চড়ে না। অটো অনেক খোলা। দু'পাশে দরাজ ফাঁকা যদিও ডানদিকে, পেছনে, আড়াআড়ি রড লাগানো আছে। হু-হু করে হাওয়া ঢোকে। ডান দিকে বাঁদিকে দরিয়া অবধি দেখা যায়। অনেক লোক আছে যারা অটো পেলে অন্য গাড়িতে ওঠে না। গাড়ি চড়াটাও লোকের নেশা। যেমন জুয়া খেলার, যেমন মদ বা গাঁজা খাওয়ার। নেশাতেই লোকে সাংঘাতিক খতরনাক্ ব্যাপারগুলো ভুলে থাকে। ভয় ভুলে থাকে। পকেটমার হয়ে যাওয়া ভুলে থাকে। বিশ্বাসঘাতকতা, আচমকা পথরোধ করে দাঁড়ানো মৃত্যু, রক্ত আর ফিকে আয়োডোফর্মের গন্ধ মেশা এমারজেন্সি ওয়ার্ড, কোর্টের চত্বর, থানায় এফ আই আর লেখানো, পেটে লাথি খাওয়ার অপমান, অঘটন, টেলিগ্রাম, ভয়ে ভয়ে বুথ থেকে ফোন করা, মৃত্যুর সার্টিফিকেট জেরক্স করানো, ডাক্তারের ঘষঘষ করে প্রেসক্রিপশন লেখা—সব কিছু ভুলে থাকতে চাইলে, অন্তত একটা একটা দিন করে ঠেকিয়ে রাখার জন্যেও নেশার দরকার। একা থাকার, একা হয়ে যাওয়ার, কালকেও একাই থাকতে হবে, এটা মেনে নেওয়ার—এর জন্যেও দরকার নেশা। চন্দনও এই লেখা কথাগুলো জেনে গিয়েছিল। যখন সে তার একা দোহারা খাটটাতে, ঘরে পাখা নেই, ইলেকট্রিকও নেই, উপুড় হয়ে ঘুমোত, তখন দূরের মাদার বাগানের আশপাশের তল্লাট থেকে বোম চার্জের আওয়াজ নতুন বহুতলের কঙ্কাল বা আকাশের কাচের চাদরে ধাক্কা খেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যেত। নেশাই তাকে এই শব্দ শুনতে দিত না। বোমার টেস্টিং হয়। নতুন এসেছে সকেট বোমা। এর আওয়াজে ধাতব খোলের চিড় খাওয়ার শব্দ মিশে থাকে এবং হাড় অবধি পৌঁছে যায়। নতুন আসার কোনও বিরাম নেই। নতুন গাড়ি, নতুন টাকা, নতুন কোল্ড ড্রিঙ্কস, নতুন টিভি, নতুন মানুষ, নতুন জামাকাপড়।

নতুন নেশাও আসছে নিজের নিজের জায়গা বুঝে। মার্ডারারদের কাছ থেকে পাবলিক শুনে থ যে, জেলে আজকাল নতুন একটা নেশা চালু হয়েছে। টিকটিকির ল্যাজ পুড়িয়ে কালো গুঁড়ো করে খাওয়া। পুরনো কিছুই থাকবে না একা হয়ে যাওয়া ছাড়া। একা হয়ে যেতে ভয় কার করে না? তাই চন্দন ঘুমের মধ্যেই অটো চালায়।

ঘুমের মধ্যে দেখা গাড়ির আলোগুলো অন্যরকম। তারা আলোর নিয়ম মানে না বা এমনও হতে পারে যে, স্বপ্নের বাক্সের ভেতরে গতির যে নিয়ম তাতে আলোরা দিশাহারা হয়ে যায়। এমন একটা চলন্ত অথচ স্থির, অচৈতন্য অথচ নির্দেশবাহী হয়ে ওঠে গোটাটা যে পাশ দিয়ে, রঙ সাইড, বাঁদিক দিয়েই যে টয়োটা কোয়ালিসটা ঝড় উঠিয়ে বেরিয়ে গেল, তার নাম্বার প্লেটের বেআইনি নীল আলোটা গাড়ি থেকে খুলে রাস্তায় আটকে গেল যেরকম গলে যাওয়া পিচে আটকা পড়ে যায় ফুটপাথ থেকে কেনা সস্তার হাওয়াই চটি। বাস বা ট্রাকের সন্ধানী হেডলাইটের আলোর কলাম আর ওজন রাখতে না পেরে নুয়ে পড়ে বা অন্য আলোর ধাক্কায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে জ্বলন্ত কাচ বা বরফের মতো রাস্তায় ছিটিয়ে যায়। আলোর দল কখনও ঘূর্ণি হয়ে পাক খায় বা নাগরদোলা হয়ে উঠে যায়, আবার ঘুরে নেমে আসে। হয়তো কোনও কবি এই আলোর অপেরা কখনও দেখে থাকবে। এরই মধ্যে আলোর ঢেউ ফাঁকা পর্দায় ধাক্কা খেয়ে হয়তো সিনেমার আসর বসিয়েছে যা সকলের দেখার অধিকার আছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ট্রামলাইনে সাইকেলের চাকা পড়ে গেছে একটি রোগা মানুষের। সে হাত তুলে মারাত্মক সেই মুহূর্তে বলছে ট্রামকে থামতে। এই সাইকেল আরোহীই হল মিউচুয়াল ম্যান। সিনেমার হোর্ডিং আঁকতে গেলে ভারা বেঁধে ওপরে উঠতে হয়। সেখান থেকে নেমে সাইকেলে বাড়ি ফিরছিল সে-ই যার নাম পরে হয়ে গেছে বা গিয়েছিল মিউচুয়াল ম্যান। ট্রামের সামনের আলোটা সহসা খুলে যাওয়া বিদ্যুৎ চুল্লির আলোর মতই। ধাক্কা লাগতে, সাইকেলটা চুরমার হয়ে যেতে, ধাতব ঘর্ষণের তীব্র শব্দ তুঙ্গে উঠতে, মিউচুয়াল ম্যানের ডান পা-টা ভেঙে, বেঁকে, সাইডে উদ্ভটভাবে ছেতরে যেতে, একটা আস্ত স্বাভাবিক মানুষের অকেজো কাঁকড়া হয়ে যেতে আরও সময় লাগবে। আর এই সময়েই যে দুর্ঘটনাটা ঘটবে, এমন কোনও কথা নেই। আলোর চাকতি, আলোর ধস, আলোর বিকারে ছিটকে যাওয়ার এই স্বপ্নদৃশ্যে চন্দনের অটোর আলো কি চেনা সম্ভব? নক্ষত্রলোকে যখন মহাজাগতিক মাপের বিস্ফোরণ হয়, তখন কেউ পারবে সেই মহাকাণ্ডের মধ্যে দলছুট একটা জোনাকির আলোকে সনাক্ত করতে?

সারাদিন হল্‌কা তোলা গরমের পর ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল রাতের। অটো নিথর, শীতল, বাধ্য, নিরীহ চন্দনের ঘরের সামনে, ফাঁকায়, একা দাঁড়িয়েছিল।

—দাদা, আপনাদের মধ্যে একজন হাতটা পেছন দিকে ছড়ান। তা না হলে চালাতে পারব না।

—সামনে দুজন নেওয়া তো বারণ। নিচ্ছ কেন?

—ফাঁকা রুট। লোক কম। তাই কিছু বলে না।

—বলে না। বলবে কী করে। যে হাতে ছোঁচাচ্চে, সেই হাতে ভাত খাচ্চে। মুখ আচে?

—ভালো বলেচেন। সব মাইরি বারোটা বাজিয়ে দিল।

চন্দন কিছু একটা হয়তো বা বলতে গিয়েছিল। বলেওছিল বোধহয়। ঘুমের ঘোরেই তার কথা বলার চেষ্টাটা মাইম হয়ে থাকে।

বাইরে, ফাঁকায়, সকাল অবধি দাঁড়িয়ে চুপ করে থাকে অটো।

লোকে বলে রঙকলে আগুন লেগে যে দুজন লেবার পুড়ে মরেছিল তারা নাকি রাতে বন্ধ, উঠে যাওয়া, তালা মারা রঙকলের মধ্যে চিৎকার করে। কেউ কেউ নাকি অনেক রাতে ডিউটি সেরে

ফেরার রাস্তায় সাইকেল থেকে দেখেছে যে দোতলার লোহার বিম বেরিয়ে আসা বারান্দায় জ্বলন্ত লণ্ঠন দুলছে। সেই আলোয় নাকি সেই দুজনকেও দেখা যায়। হাত থেকে লণ্ঠন ছিটকে পড়েই সেই আগুনটা লেগেছিল। এ দুজনেই দোতলা থেকে আর নামতে পারেনি। রাত করে চন্দনও ওখান দিয়ে কম যাতায়াত করেনি। কিন্তু সেই দুজন হতভাগ্য তাকে কখনও লণ্ঠনের আলো দেখায়নি। রঙ বানাতে অনেক কেমিক্যাল লাগে, স্পিরিট লাগে। দপ্ করে জ্বলে ওঠাটা তাই অস্বাভাবিক কিছু নয়। অবশ্য এর থেকে কেউ যেন এরকম ভেবে না বসে যে আগুন লাগার কেসটাই রঙকল বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যে দায়ী। রঙকল বন্ধ হয় অনেক পরে। বন্ধ হওয়ার পরেও শ্রমিকরা সামনে তেরপল দিয়ে তাঁবু বানিয়ে কিছুদিন অবস্থান করেছিল। মিটিং-ফিটিং-ও হয়েছিল কয়েকটা। মাইকের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। সে সবও পরে উঠে গেল। মালিক ছিল মাড়োয়ারি। তারও কোনও খোঁজপত্তর নেই। মাঝেমধ্যে বাইরে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে লোকজন নেমে রঙকলের বাউন্ডারি বরাবর হেঁটে হেঁটে জায়গাটা দেখে। খবর রটে যায় যে ওখানে বিরাট একটা মাল্টিস্টোরিড বাড়ি উঠবে। এলাকাটা ভাল বলে সুনাম নেই। কোনও প্রোমোটারই শেষ অব্দি ঝুঁকি নিয়ে এগোতে চায় না। কে চায় লাফড়া? অটোর সামনের কাচে উড়ন্ত ধুলো মাথা ঠুকে ঠুকে জমতে থাকে। আর মোছার সময় একেবারে সাইডের দিকটা বাদ পড়তে থাকে। ফলে সেখানে ঠুলির মতো ময়লা জমে। এই নোংরা, ছায়াঢাকা কাচের মধ্যে দিয়েই চলন্ত অটো থেকে চন্দন কত কতবার দেখেছে রঙকল এগিয়ে আসছে, পাশে চলছে, পেছনে চলে যাচ্ছে। তবে বার বার দেখতে দেখতে এমন হয়ে যায় যে জায়গাটার নামও মনে থাকে না। হয়তো কিছুই মনে পড়ে না বা হয় না। কিন্তু থেকে তো যায়। সেও তো বাতিল, বরবাদ হয়ে গেলেও দেখে যে বার বার ওই চেনা অটোটা যাতায়াত করছে আর সেটা চালাচ্ছে চন্দন।

আপনজনের মৃত্যু সকলের মতোই চন্দনের জীবনও পাল্টে দিয়েছিল। বাবার মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে না হলেও, কিছুদিনের মধ্যেই চন্দন ফুটবল ছেড়ে দিল। কারণ এটা সকলেই জানে যে ভাল খাওয়ার সঙ্গে ফুটবলের একটা যোগ রয়েছে। ফুটবল খেলতে গায়ের জোর লাগে, সিনায় দম থাকতে হয়। খেপ খেলে টাকা রোজগারের চেষ্টা একবার করেছিল কিন্তু সেমিফাইনালে মুখ দিয়ে চটচটে রক্ত ওঠার পর চেষ্টাটা ছেড়ে দিতে হয়। খেলাটা ছিল বাঘা যতীনে। কাছাকাছি খেলা পড়লে বাবা যেত চন্দনের খেলা দেখতে। বাবা একসময় হাওড়া ইউনিয়নে ডাক পেয়েছিল। ফুটবলের গল্প সব বাবার কাছেই শোনা। সেই বাবা যখন গলায় ক্যানসারে মরে গেল তখন কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিল যে গ্যারেজে গাড়ি রঙের কাজটা হয়তো চন্দনকেই বাধ্য হয়ে শিখে নিতে হবে। সেটা হয়নি। মালিকের তখন কাজ জানা লোকের দরকার। আর অনেকদিন ধরে যে ছেলেরা বক্-প্লাস এগিয়ে দেওয়া বা দৌড়ে দোকান থেকে লোহা ঘষার কাগজ নিয়ে একছুটে ফিরে আসা দিয়ে জীবন শুরু করেছে তারা তো লাইনে আছেই। চন্দনেরও ইচ্ছে ছিল না। রঙ আর কালিতে মাখামাখি বাবার কাজের খাকি প্যান্টটা অনেকদিন ঘরের চালের ওপরে পড়েও ছিল। তারপর কীভাবে যে উধাও হয়ে গেল কেউ খেয়াল করেনি। ওই প্যান্টটা অন্তত কোন চোরের, সে যত ফাল্তুই হোক না কেন, নেওয়ার কথা নয়। মরার পরে বাবার মুখটা কেমন তুবড়ে, বেঁকে, চোখ ফোলা অবস্থায়, উদ্ভট হয়ে গিয়েছিল। হাতগুলো দেখলে কেউ বলত না যে এই দুটো হাতই হাতুড়ি দিয়ে দমাস্ দমাস্ করে পিটিয়ে বডির চাদরের টোল ওঠাতে পারত। বাবার মৃত্যু অনেকটা বিনা দোষে লাল কার্ড দেখে মাঠ থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাওয়ার মতো। গ্যারেজের কাজ না করলেও চন্দন বসে থাকেনি। কারণ রাত বা দিনের আয়ার কাজ করে মা কতটা চালাবে? মাকে তো দিদিমাকেও তখন টাকা পাঠাতে হতো। তাই চন্দন রিকশা চালিয়েছে, নতুন কোয়ার্টারের মাঠে

বর্ষার ঘাস লম্বা টিনের ছুরি দিয়ে দিয়ে কেটে একা জড়ো করেছে, পাড়ার কোনও দাদার সুপারিশে অন্য কোনও দাদার জন্যে রাতের ট্রাকে ইটভাটা টু সাইট পারাপার করেছে, ভোটের সময় অনেক আশায় দরকারের চেয়ে বেশিই নিজেকে লড়িয়ে দিয়েছে। তারপর না কত কাঠখড় পুড়িয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স বের করে এই অটো। বাবা মরে যেতে এই অব্দি ঘটনা যখন গড়াল তখন ঘরের হাল একটু ফেরার দিকে মোড় নিয়েছিল ঠিকই কিন্তু মা-র শরীরটা, সে রোগামানুষ হলেও, যখন চোখের ওপরে, দিনে দিনে ফুলে যেতে লাগল তখন চন্দন বোঝেনি যে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন, আবার একটা ঘটনা, একটা মৃত্যু খুব কাছে এসেও প্রায় করুণা করেই যেন দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে।

—এক এক টাইমে মনে হয় কী জানো?

চন্দনকে গিয়ার নামিয়ে অটোর গতি কমাতে হয় কারণ সামনের গাড়িটা ইচ্ছে করে রাস্তা ছাড়বে না বলে ডাঁয়া বাঁয়া করছে। বেকার, একেবারেই বেকার। চন্দন জানে বাকিটা শুনবে বলে মিউচুয়াল ম্যান মাথাটা একদিকে হেলিয়ে দিয়েছে। চোখদুটো আধবোজা হলেও।

—মা যদি এমনি এমনি মরে না যেত আমার লাইফটাও এরকম বেলাইন হয়ে যেত না। শালা, ধুনকিতে পড়ে বিয়েশাদির চক্করে পড়ে গেলাম। একসিডেন্ট হল। সব বরবাদ হয়ে গেল। ফাল্‌তু হুকিং করে কারেন্ট আনলাম।

মিউচুয়াল ম্যানের মুখটা আলতো করে হাসতে থাকে। চন্দন যা বলছে সব সে বুঝতে পারছে। সব সে জানে। চন্দন একসিডেন্ট বলতে যা বোঝাতে চাইছে সেই ঘটনাটাও তার অজানা নয়। এত নেশা, এত হাওয়া-বেহাওয়ার মধ্যেও সবটা বোঝা যায়। একটা হুক। একটাই হুক।

আজ মিউচুয়াল ম্যান শেষ কথাটা বলেছিল মিনিট কুড়ি আগে। চন্দনের সঙ্গে ঠেক থেকে বেরিয়ে আসার সময়।

—পড়ে যাচ্ছি! পড়ে যাচ্ছি!

—এই তো ধরে রেখেছি তোমাকে। পড়বে না।

—না। পড়বে না। ধরবি না। আমার পা শালা আমি ফেলব।

—আরে, ফেল না তোমার পা তুমি।

—ফেলব। সব শালা হুক।

—কে করছে হুক?

—সব হুক! সব শালা চুদুরবুদুর হুক। হুকবাজ!

—কে হুকবাজ? বল না নামটা।

—কে বলব না। আছে।

—আছে তো তাকে তার মতো থাকতে দাও। অটোতে বসে থাকতে পারবে তো?

—ত, তুই পারবি?

—কী?

—চালাতে।

—না পারলে কি অটো রেখে চলে যাব নাকি?

—তবে, আমিও পারব। বসে থাকতে পারব।

অটো আর বাস ছাড়ার টার্মিনাসের মাঝামাঝি জায়গায় রোজ বসে কালীভক্ত এরফানের আশমানতারা হোটেল যার সাইনবোর্ডে মা কালীর তিনটে চোখ দেখে অনেকেই খটকায় পড়ে গিয়েছিল। এরা বাসযাত্রী হলেও সম্পন্ন মানুষ। নতুন কোয়ার্টারের ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকে। বেশি সকালের যাত্রীরা নিজেরা পছন্দসই চার্টার্ড বাসে চড়ে। এমনি, পাবলিক বাসে চড়ে কোয়ার্টার

pathagar.net

বাদেও, দূরের কাছের নানা মানুষ।

আশমানতারা হোটেল আগে অনেক ডাকাবুকো ও পাকাপোক্ত ছিল। সিমেন্টে ইট গেঁথে বানানো পাকা উনুন ছিল। বাঁশ, বাতা, প্লাস্টিকের চাদরে ছাওয়া ছাউনি ছিল। বাঁশের খুঁটির গা থেকে একটা বোর্ডও ঝুলত যাতে মাছ-ভাত, ডিমের ঝোল-ভাত, আর মাঝে মাঝে মাংস-ভাতেরও রেট পড়ে নেওয়া যেত। তারপর একদিন দুটো বাস একসঙ্গে ছেড়ে একটা লোককে, নিজেদের মধ্যে রেস করতে করতে, পিষে মেরেছিল। তাই নিয়ে হাঙ্গামা হয়, লোক তেতে যায়, বিস্তর হুটপাট, গুমটিতে আগুন, অনেক ঝামেলা হয়। তখন র‍্যাফ্ এসেছিল। বুলডোজার এসে ভেঙে, খুবলে তুলে নিয়ে চুরমার করেছিল আশমানতারা হোটেল। হোটেল উঠে গেল। দেওয়ালের গায় থেকে গিয়েছিল এরফানের নিজের হাতে পেরেক পুঁতে বসানো মা কালীর ফটো। ফটোটা এখনও আছে। এরফান রিকশ ভ্যান চালিয়ে নিয়ে আসে তার আশমানতারা হোটেল। রিকশ ভ্যানের ওপরে চড়েই আসে স্টোভ, প্লাস্টিকের কালো ট্যাঙ্কে জল, কড়াই, মশলা, তেল, আনাজ, আমিষ, থালা, গেলাস সবকিছু। পরে এসে পড়ে একটা ছুঁড়ি আর একটা বুড়ি যে কাপড় আলগা হয়ে স্তন বেরিয়ে পড়ার তোয়াক্কা করে না। ইট সাজিয়ে তার ওপরে সিমেন্টের স্ল্যাব বসিয়ে টেবিল। বসার ব্যবস্থাও অনুরূপ। এরই পাশে চা-বিস্কুটের দোকান এসে যায়। এসে যায় বাক্স-ভ্যানে পান-সিগারেট। আশমানতারা হোটেলেই চন্দন দিনের খাওয়াটা খেয়ে নেয়। তবে মালা চলে যাওয়ার আগে ও ঘরেই খেত। আর রাতের খাওয়া? আগের কথা আগে। পরে চন্দন রাতে কখনও কখনও খেত। বেশি নেশা হলে খেত কই?

—মা যদি বেমক্কা মরে না যেত তাহলে এত কষ্ট থাকত না। বুঝলে? ভাগ্য হয়তো তুমি মানো না কিন্তু ভাগ্য তোমাকে ঠিক চিনে রেখেছে। এ শালা বড়ো রঙ নিচ্ছে। এ শালা পরোয়া লাগায় না। অমনি বলবে লাগায় কি না লাগায় আমি ঠিক বুঝে নেব। বল, বলে না?

মিউচুয়াল ম্যানের হাসি হাসি মুখটা আরও কাত হয়। এসব তো জানা কেস। তার বলতে বয়েই গেছে। এসব যা কিছু কথা হচ্ছে সব মরে যাওয়া, চলে যাওয়ার লাইনে। আর এ লাইনটা মিউচুয়াল ম্যানের চেয়ে ভাল কেউ জানে না। তাই না তার হাসি পাচ্ছিল। তার মুখের ওপরে হলদে সোডিয়াম ভেপারের আলো পড়ে ও সরে যায়। উপচ্ছায়া ও প্রচ্ছায়ার মধ্যেই কত না মানুষের অস্তিত্ব। এরা সারাজীবন গ্রহণের মধ্যেই আসবে যাবে ও হাত পা ছুঁড়বে।

—তখন মলিনা মাসির কত ধরাধরি। চন্দন, আমি তোকে বলছি মেয়েটা ভাল। চন্দন, তুই ওর একটা গতি কর। বউটা এলে তোর বাড়িটা খালি খালি লাগবে না। ওরকম হত্যে দিয়ে না পড়লে আমিও বিয়েটা করতাম না, এসব ক্যাচালেও জড়াতে হতো না। বিন্দাস ড্রাইভারি করতাম, দিব্যি চলে যেত।

পরপর কয়েকটা গাড়ি অটোকে টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

—যাও না বাবা। অত তাড়া থাকলে যাও। আমি কি রাস্তা আটকে রেখেছি। এই ছোট গাড়িগুলোকে জানবে ভয় নেই। ওরা জানে বডি পলকা। হুজ্জুতে যায় না। হারামি হচ্ছে আরমাডা-ফারমাডা। ছোট করে একটা রগড়া দিলে অটোর কিছু থাকবে? তার ওপরে মালফাল খেয়ে গাড়ি হাঁকাবে। উল্টো সাইড থেকে এমন হেডলাইট মারবে চোখে যে তুমি কিছু ঠাওর করতে পারবে না। কেবল খজড়ামি করবে। শুনছ, না লেটে গেলে গুরু?

মিউচুয়াল ম্যান জবাব দেয় না। ওর হাতের রোগা আঙুলগুলো চন্দনের কাঁধে একবার মাকড়সার মতো খড়্বড়্ করে ওঠে।

—আর যাই কোরো ঘুমিয়ে যেও না। হড়কে হয়তো গাড়ি থেকেই বেরিয়ে গেলে। তখন পুলিস

pathagar.net

আমার হালুয়া টাইট করে ছেড়ে দেবে।

ফের রোগা আঙুলগুলো চন্দনের ঘাড়ে টুক্ টুক্ করে জানান দেয়।

—লাইফ ভাল টেনে দিলে বস্। কোন্দিন শালা অটোফটোর পাট চুকিয়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে ভিড়ে যাব। তোমার টিমে আমাকে নেবে? নাও না?

এবার আঙুলগুলো ঘাড়ে বুলিয়ে যেতে থাকে। এর থেকে চন্দন কিছু বোঝে বইকি। মিউচুয়াল ম্যান তাকে শান্ত হতে বলছে। বলছে এসব কথা এত অমঙ্গলের যে না বলাই ভাল। বলছে যে আর কেউ যেন মিউচুয়াল ম্যান না হয়। চন্দন জোরে হেসে ওঠে। এটা হল নেশার হাসি। গিয়ার চড়ায়। অটো আরও তোড়ে চলে। হাওয়ার আওয়াজ কানে শোনা যায়। এই হাওয়ার মধ্যেই থাকে অনেক মানুষের শেষ নিঃশ্বাস।

—পারবে ঘর অব্দি হাঁটতে? না এগিয়ে দেব!

জবাব দেয় না মিউচুয়াল ম্যান। চন্দনের অটোর ডানদিকে রড লাগানো। বাঁদিক দিয়ে অনেক সময় নিয়ে, হেঁচড়ে হেঁচড়ে ভাঙা, ছরকুটে ডান পা-টা নামায়। ডান পায়ের পাতা আলো-অন্ধকারের এব্ড়ো-খেব্ড়ো জমি থাব্ড়ে-থাব্ড়ে জরিপ করে। তারও কিছুক্ষণ পরে বাকি শরীরটা অটো থেকে আস্তে আস্তে বেরোয়। কাছেপিঠে কুকুর ডাকছে। টিভির শব্দ। একটা লোক পাশ দিয়ে সেলফোনে কথা বলতে বলতে চলে গেল,

—সকালেই তো লরি ইন করে যাচ্ছে। ধর সাড়ে ন'টা। আমিও ওইরকম টাইমে পৌঁছে যাব। স্কুটারে যাব। তুমি খালি হালদারকে বলবে অনুমতি করতে... সে তো লাগবেই... না, না, লেবার পেমেন্ট নিয়ে যা কথা সে হয়ে গেছে... আরে বাবা, পাকা কথা হয়ে গেছে বলেই তো বলছি...

লোকটার নাম হয়তো চন্দন জানে না তবে মুখ-চেনা হতেই হবে। যদিও মুখটা দেখা যায়নি। চন্দন হ্যাঁচকা দিয়ে অটো স্টার্ট করে। অটো ঘোরার সময় তার আলোতে দেখা যায় একটা আলোর শেড রাস্তার ধারে ঝুলছে। এর তলায় ক্যারম বোর্ড বসে। অন্ধকার হয়ে বসে আছে কয়েকটা ছেলে। দেওয়ালে ধ্যাবড়া করে লেখা—শাহরুখ ফ্যানস্ ক্লাব। চন্দন ওদের কথাগুলো শুনতে পায় না।

—মালুয়াকে নামিয়ে দিয়ে গেল। চিনলি?

—কাকে?

—অটোর ড্রাইভারটাকে।

—কে আবার হবে। নির্ঘাত ধ্বজো।

—ও শালাও মালুয়ার লাইন ধরে নিয়েছে।

—তা কী করবে? ঘরে বোঝাবার কেউ আছে? চোট খেলে শালা তোরও ওই কেস হতো! যে খায় সে জানে।

চন্দনের মারও বেশ কয়েক মাস ঘুসঘুসে জ্বর হয়েছিল। তাতে কাজ ছাড়ার দরকার হয়নি। বেশি অসুবিধে হলে কখনও একটা ক্যালপল, কখনও ক্রোসিন খেয়ে চালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পেটে যখন ব্যথাটা শুরু হল, ব্যথাটা বেড়ে যখন শরীরটা কুঁকড়ে যেতে শুরু করল তখন চন্দন না বুঝলেও শেষ মাস চারেকের খেলাটা শুরু হয়ে গেছে। গোড়ায় পাড়ার ডাক্তার, তারপর অটোর দাদার শ্বশুর বাড়ির ডাক্তার ভাল করে দেখেছিল। লায়ন্স ক্লাবের পলিক্লিনিকে কম খরচে করা যাবে জানিয়ে বেশ কয়েকটা পরীক্ষাও করাতে বলেছিল। চন্দনের মা-ই করাতে দেয়নি। বলেছিল এরকম অনেক রোগী সে নিজেই দেখেছে আয়া থাকার সুবাদে। একটু বিশ্রাম, একটু নিয়ম করে খাওয়াদাওয়া—এতেই সামলে যাবে। এরপর এল পেচ্ছাপে রক্ত। আর ওই উদয়াস্ত পরিশ্রম করা রোগাটে, পোড়খাওয়া চেহারাটা ফুলে যেতে শুরু করল। প্রথমে ফুলেছিল পা। কদিন পরে ফোলাটা

pathagar.net

কমে গেল। এবারে হাত। চুড়ি এমন কেটে বসে যেতে শুরু করল যে কেটে খুলতে হয়েছিল। তারপর পেট, মুখ, গোটা শরীরটা। মুখটা ফুলে চোখটা ছোট হয়ে যেতে লাগল। তখন বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পাড়ার লোকেরাই সব ব্যবস্থা করেছিল। ক্লাবের ছেলেরা তখন রাত জেগেছিল হাসপাতালে। শেষ রাতে ইঞ্জেকশন কিনতে চন্দনকে অটো নিয়ে ধন্বন্তরী-তে যেতে হয়েছিল। ফেরার রাস্তায় পুলিস ধরেছিল। ইঞ্জেকশন, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখে ছেড়ে দেয়। শেষ অব্দি যদিও ইঞ্জেকশন দেওয়ার আর দরকার হয়নি।

সেই শেষ রাতে বৃষ্টি এসেছিল আকাশ ভেঙে। টেম্পো করে বডি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল প্রথমে কেওড়াতলায়। পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়ার জন্যে সেখানে দারুণ ভিড়। একটা ছোট ছেলের জন্যে অর্ধেক টাইম ধরলেও সব মিলিয়ে ছ-সাত ঘণ্টার মামলা। তখন ফের বৃষ্টি ভেঙে যাওয়া হল শিরিটিতে। আকাশে অন্ধকার। একটানা, কখনও জোরে, কখনও ধরা ধরা, বৃষ্টির অবধি নেই। শ্মশানের সব আলো জ্বলছে। সেখানে, বন্ধ দরজা চুল্লির থেকে কিছুটা দূরে বসে চন্দন দেখেছিল শ্মশানের বাল্‌বের সামনে বাষ্পের উচ্ছ্বাস। মা-কে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলেছিল যে জল, সেই জল আবার দাহর সময় বাষ্প হয়ে প্রাণমণ্ডলে ফিরে যাচ্ছে। বাইরেও জল। মন্দিরের লাগোয়া পুকুরটা জলে ভরে গেছে। মন্দিরের ভেতরে ক্যাসেটে বাজছে গলায় দড়ি দেওয়া পান্নালালের শ্যামাসঙ্গীত। শ্মশানে মা-র আয়া বন্ধুরাও এসেছিল। তাদের মধ্যে ছিল মলিনা মাসি আর তার সঙ্গে রোগা, উস্কোখুস্কো চুল, সালোয়ার-কামিজ, হলদে ওড়না গলায় জড়ানো একটা মেয়ে, যাকে চন্দন ভাল করে তখন দেখেইনি। খেয়ালও করেনি বলতেই চলে। পরে, মানে অনেক পরেও চন্দন যখন মালার কথা ভাবে তখন তার বারবার ওই অসম্ভব কথাটাই মনে হয় যেটা কখনও সত্যি নয়। রাতের কোনও একটা নীল আলোয় ধুয়ে যাওয়া পেট্রল পাম্প থেকে তেল নিয়ে বেরোবার সময় সে প্রথম আচমকা বাঁদিকে মাথা ঘুরিয়ে মালাকে প্রথম দেখেছিল। দেখাটা এত সত্যি যে এটা কখনও মিথ্যে হয়ে যায় না। পেট্রল পাম্পের সামনে গাড়ি বেরোবার রাস্তার জন্যে ফুটপাথ শেষ ও আবার শুরু। সেখানেই মালা দাঁড়িয়ে গেছে কেন না অটো বেরোচ্ছে। কথাটা সে মালাকে বলেনি এমনও নয়। মালা গুছিয়ে কিছু বলতে পারেনি। ও শুধু বলেছিল,

—আমার সঙ্গে কেউ ছিল?

চন্দন বলতে পারেনি। যে এলাকাটায় ওর অটো চলে তার ধারেকাছে যে গোটা তিনেক পেট্রল পাম্প আছে তারই একটা না একটাতে চন্দন তেল নেয়। মালা এদিককার মেয়েও নয়। মলিনা মাসি এখনও ভবানীপুরের দিকে পূর্ণ সিনেমার পেছন দিকে, যেখানে মুক্তদল-এর পুজো হয়, তারই কাছে থাকে। তাই রাত করে মালা এদিকে আসতে যাবে কেন? চন্দনও জানে কোনও কারণ নেই। অথচ এটাও সে দেখতে পায় যে মেয়েটা হঠাৎ ফুটপাথের কিনারে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। এবং এই থমকে যাওয়া মেয়েটা মালা বাদে আর কেউ হতেই পারে না। অথচ সেটা সম্ভবও নয়। চন্দনের ধন্দ এবারের মতো কাটল না। এই যুক্তিটাও তার মাথায় খেলেনি যে আনমনা বাঁদিকে তাকিয়ে সে অন্য কোনও মেয়েকে দেখেছিল। পরে, মালাকে কাছ থেকে চেনার পর সে ওই মেয়েটাকে সরিয়ে দিয়ে থতমত অবস্থায় মালাকেই ওখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর একবার যে দাঁড়িয়ে গেছে ঠায় সে দাঁড়িয়েই আছে। চোখ দিয়ে, মনে করা দিয়ে, অনুভবের টানাপোড়েনে মানুষ এরকম অনেক কিছু করে, ভাবে, এক একটা ছবিকে আঁকড়ে ধরে। এরকম হয়। কেন হয় কেউ জানে না। আর জানলেও বা কী আসে যায়? মানুষ কি এইভাবে বেঁচে থাকা পাল্টে ফেলবে? যদি সত্যিই পাল্টে ফেলে তাহলে আর কী সে বেঁচে থাকতে পারবে? এই ধন্দের কথাটা চন্দন কখনও মিউচুয়াল ম্যানকে বলেনি। নন্দকেও বলেনি। সব কথা কাছের লোকদেরও বলা যায় না।

কালীঘাটে ঘাটের কাজের দিন বরং চন্দন মালাকে ভাল করে দেখতে পেয়েছিল। মন্দিরের চত্বরেই, বাঁদিকে উঁচু বাঁধানো চাতালে মা-র কাজ হয়েছিল। সেদিনও মলিনা মাসি সারাদিন ছিল। সঙ্গে মালা। ওইদিন কালীঘাটে একটা ক্যাচাল হয়েছিল। কোনও একটা ছেলে একটা মেয়ের সঙ্গে লুকিয়ে বিয়ে করতে এসেছিল। মেয়েটার চেহারা চন্দন মনে করতে চায় না কারণ করলেই খারাপ লাগে। মেয়ের দাদা, কাকা তারপর পাড়ার দলবল এসে মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে যায়। ছেলেটার সঙ্গে তার জনাদুয়েক বন্ধু ছিল। তারাও ঝামেলা বুঝে সরে পড়ে। ছেলেটা মেয়ের বাড়ির অচেনা নয়। বাইরের রাস্তায় হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে মেয়েটাকে কিছু লোক ট্যাক্সিতে ওঠাচ্ছে আর নতুন কেনা পাঞ্জাবির গলাটা মুঠো করে ধরে মেয়ের দাদা ছেলেটাকে বলছে,

—আর একটা দিন যদি রাসবেহারীর এপারে দেখি গুলি করে দেব। একেবারে গুলি করে দেব। সব রস ঘুচে যাবে। মনে থাকবে?

ছেলেটা কিছু বলে না। ভিড় থেকে কেউ বলে,

—জামাটা ছেড়ে কথা বলুন না। নতুন জামাটা ছিঁড়ে কোনও লাভ আছে?

—জামা? শালা, মনে রাখবি। স্ট্রেট্ বুকে দু-দুটো দানা।

ছেলেটা জামা ছাড়াবার চেষ্টা করে। ছাড়িয়ে নেয়।

—আমি পুলিসে কেস লেখাব। দেখে নেবেন।

—মারব শালা এক ঝাপ্পড়। পুলিস মারাচ্ছে? আন্ডারএজ মেয়ে ফুঁসলে পুলিস মারানো? পুলিসই উল্টে তোকে চাবকাবে।

—ওর বয়স আঠেরো হয়ে গেছে। আমার প্রুফ আচে। আমিও ছাড়ব না।

ঝামেলা, হুজ্জৎ, কথা কাটাকাটির মধ্যে অকিঞ্চন চন্দন রাস্তায় রোদে নেমে আসে। মিষ্টির গন্ধ। ফুলের গন্ধ। ধূপের গন্ধ। সঙ্গে পাড়ার দুটি ছেলে, জনাকয়েক মহিলা যার মধ্যে তিনজন মা-র সঙ্গে পাল্টাপাল্টি করে আয়ার কাজ করত, আর রোগা একটা দোহারা গড়নের ভিতু ভিতু মুখের মেয়ে। মালা। ওরা দল বেঁধে ট্রামলাইনের দিকে এগোয়। বড় রাস্তায় পড়ে মলিনা মাসি মালাকে নিয়ে বাঁদিকে চলে গিয়েছিল। চন্দনরা রাস্তা পার হয়েছিল বাস ধরবে বলে। চন্দন গোড়ায় ভেবেছিল যে মালা মলিনা মাসিরই মেয়ে। পরে জানতে পেরেছিল তা নয়। লক্ষ্মীকান্তপুরে, মলিনা মাসির পাড়ারই এক বাড়ির মেয়ে। মা মরা। বাবা আবার বিয়ে করেছে। নতুন মা মেয়েটাকে দুচোখে দেখতে পারে না। ওর বাবার কথাতেই মলিনা মাসি মেয়েটাকে কাছে এনে রেখেছে। মালা-র মা মলিনা মাসির বোনের মতো ছিল।

নন্দ চন্দনের হাত দেখে বলেছিল বিয়ের বছর-দুয়েকের মধ্যে চন্দন অটো ছেড়ে আরও ওপরে উঠে যাবে।

—এ বাবা, বাঁ হাত দেখছ কেন? বাঁ হাত তো মেয়েদের দেখে।

—জানি রে বাবা জানি। মিলিয়ে দেখতে হয়। ছেলেদের ডান হাতটাই আসল কিন্তু বাঁ হাতটাও দেখে নিতে হয়। খেলাটা তোমার ধাতে ছিল বুঝলে? সবার থাকে না। লেগে থাকলে হতো।

—ও খেলার কথা ছাড়। ছেড়ে দিয়েছি ব্যাস্, যো বরবাদ সো বরবাদ। এখন বল পয়সাকড়ি হবে কখনও? বেশি না। ভাল চলে যাবে। শালা ভাড়া জুটল কি না-জুটল মালিককে গুনে দাও। তারপর দিন খারাপ গেলে আঙুল চোষ।

—একটা কথা বলে দিচ্ছি, মিলিয়ে নিও, অটো তোমাকে আর বছর দেড়েক-দুয়েকের মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে।

—ছেড়ে কী করব? পকেট মারব?

pathagar.net

—চার চাকায় চলে যেতে হবে।

—ট্যাক্সি?

—ট্যাক্সি হতে পারে, প্রাইভেট হতে পারে, অত বলা যায় না। ভালর জন্যে বলছি, লাইসেন্সটা করিয়ে রাখ।

—ভাবিনি তা নয়। কিন্তু অতগুলো টাকা।

—লে! চার চাকা চালিয়ে দিব্যি কামাবে। তার জন্যে রেস্ত কিছু যাবে না?

—অটোর লাইনটা ছেড়ে দেব? দিতে হলে দেব কিন্তু সত্যি বলতে কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে।

শাম তন্‌হাই কি হ্যায়
আয়েগি মঞ্জিল ক্যায়সে
জো মুঝে রাহ দিখায়ে
ওহি তারা না রহা
কোই হমদম না রহা, কোই সহারা না রহা
হম কিসিসে ন রহে, কোই হামারা না রহা...

pathagar.net

একদিন দুপুরে অটো নিয়ে বাড়িতে ভাত খেতে এসে চন্দন দেখেছিল রেডিওতে কিশোরের এই গানটা বাজছে আর বিস্কুটের দুটো টিনের ওপরে দাঁড় করানো আয়নাতে দেখে দেখে চুল আঁচড়াচ্ছে মালা।

—সিনেমাটা দেখেছিলে? হালের নয় যদিও।

—কোন সিনেমা?

—ঝুমরু। সুরও কিশোরের নিজের।

—নামই জানি না।

—দেখাব তোমাকে।

—চলছে বুঝি কোথাও?

—না, না। টিভি-তে দেখাবে। তখন দেখব।

—কিনবে?

—দেখি। খোকার সঙ্গে কথা বলেছি। বলল কপালে থাকলে ভাল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আটশো-নশোতেও পাওয়া যায়। পিকচার টিউবফিউব খোকাই চেক করে দেবে।

—আমি বলি কি অতগুলো টাকা এখনই খরচ কোরো না। মা-র অসুখের সব ধার মিটিয়েছ?

—মেটাচ্ছি। এ মাসেই নন্দদাকে দুশো দিয়ে দেব। দাদার টাকাটা এখন না দিলেও চলবে বলেছে।

—দাদা?

—আরে আমার গাড়ির মালিক। দাদা না থাকলে চন্দনকে আর খুঁজে পেতে না। দেখতে রাস্তায় হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে।

—ওঁদের বাড়িতেই নিয়ে যাবে বলেছিলে বুঝি?

—হ্যাঁ, রোববার দেখে বিকেল করে একদিন যাব। ওইদিন আর প্যাসেঞ্জার নেব না। বউদিকে দেখবে। বড়লোকের ঘরের মেয়ে। কত লেখাপড়া জানা। কিন্তু একফোঁটাও গুমোর দেখবে না।

বড় কালার টিভি। ফ্রিজ। দাদাও যেমন বউদিও তেমন।

—তোমায় খুব ভালোবাসে, না?

—তোমাকেও বাসে। গেলেই দেখবে। কত না বিশ্বাস করে বলে অটোটা আমাকেই রাখতে দিল। নিজের থেকেই বউদি একদিন বলল, চন্দন, দাদা বলেচে রোজ আর রাত করে তোমাকে গাড়ি দিয়ে যাওয়ার ফৈজৎ করতে হবে না। তোমার ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে। তুমি গাড়ি বাড়িতেই রাখ।

—ধর, রাতে যদি চুরি হয়ে যায়।

—দুর্। এই মহল্লায় ঢুকে অটো নিয়ে যাবে। খেপেছ?

—এখানে কিন্তু চুরি হয়। উল্টোদিকের ওই বউটা বলছিল, বলে নতুন বউ তুমি, এটা-ওটা শখের জিনিস সামলে রেখ। চোরচামার আছে। কিছু বলা যায়? এই বলল।

—ও সব ছিঁচকে। আজকাল সব পাতা খায় জান তো? চুরি-ছ্যাঁচড়ামি করে দু-দশ টাকা জোটাল আর অমনি পাতা খেতে ছুটবে। এমন নেশা যে চুরি ওকে করতেই হবে।

—সেদিন রাতে যাকে গাড়িতে ওঠালে সে কি তোমার ওই পাতাখোর?

—ওই যে তোমাকে পেছন থেকে উঠে আমার পাশে বসতে বললাম। রোগা করে। ল্যাংড়া।

—হ্যাঁ। আমার কিন্তু খুব ভয় হয়েছিল।

—আরে না, না। ও পাতাখোর হতে যাবে কেন? ও তো মিউচুয়াল ম্যান।

—কী?

—ও তুমি বুঝবে না। বুঝিয়ে দেব একদিন। ও স্রেফ চোলাই খায়। ফ্রি। পয়সা লাগে না। খুব ভাল। সিনেমার ছবি আঁকা বড় বড় হোর্ডিং দেখেছ তো, ও ওইগুলো আঁকতো। ভারায় চড়ে আঁকতে হয়। বউ ছিল, বাচ্চা ছিল। তারপর সব গেল। ট্রামে ধাক্কা খেল। পা গেল।

—তারপর?

—তারপর আবার কী? বরবাদ কেস। পা সেট হল না। ল্যাংড়া পা নিয়ে ভারায় উঠতে পারবে না। কয়েক ইঞ্চি তো পা রাখার জায়গা। সেই জায়গাটুকু সাইজ করে তোমাকে ব্যালেন্স রাখতে হবে। সোজা কথা?

সকালবেলা মানে আলো ফোটা নীল ভোরে একদিন চন্দন অটোতে করে মালাকে স্টুডিওপাড়া দিয়ে ঘুরিয়ে এনেছিল। এই যে বড় বড় গেটগুলো—এর ওপারেই আছে সেই আশ্চর্য সিনেমার জগৎ—

—এই গেটগুলো দিয়ে গাড়ি করে সব আসে। প্রসেনজিৎ, শতাব্দী—যত নাম বলবে সব। বম্বের থেকেও আসে। আগে আসতো উত্তম, সুচিত্রা, সুপ্রিয়া। রেলের মতো লাইন পাতা থাকে। তার ওপরে চাকায় ক্যামেরা চলে।

—তুমি ভেতরে গেছ?

—দু'বার গেছি। এমন ঘর, বাড়ি বানাবে না যে তুমি হাঁ হয়ে যাবে। একটা ল্যাম্পপোস্ট দেখে আমিকে আমিই বোকা বনে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম সত্যিকারের। সন্ধে হলে বাতি জ্বলে। পরে জানলাম জালি। দেখলে কারও বাপ নেই যে বলবে সত্যি নয়।

স্টুডিওপাড়া থেকে ফেরার সময় ডানদিকে পড়ে কবরখানা।

—সায়েবরা যখন ছিল মরলে এখানে কবর দিত।

—ভেতরে গেছ?

—কতবার। তোমাকেও নিয়ে যাব। তবে একটা কথা বলে রাখি, যদি দেখতে পাও যে হাফপ্যান্ট

আর খালি গলায় টাই বাঁধা একটা বুড়ো সায়েব কবরের ওপরে বসে ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ছে অমনি চোখ সরিয়ে নেবে। খবরদার আর ওদিকে তাকাবে না।

—কেন?

—ও হল পাগলা সায়েবের ভূত। গলায় বাঁধা টাই দিয়ে ফাঁস দিয়েছিল। তারপর থেকে এখানেই ঘুরে বেড়ায়।

—কেন?

—অপঘাত তো। সায়েবরা আবার অপঘাত-টপোঘাত মানে না। না মানবে মেনো না। ভূত না হয়ে তখন উপায় কি? তুমি ভূত মানো?

—মানি।

—আমিও মানি। অনেকে বলে ওসব ফাল্‌তু। মরে গেলে সব ভোঁ ভোঁ। আমার মন বলে যে কক্ষনো হয়? দেখতে পাচ্ছি না ঠিকই কিন্তু তা বলেই কি কেউ নেই? তবে হ্যাঁ, ও উটকো ভয়ডর আমার নেই। কারও খাই না পরি না, তুমভি মিলিটারি, হামভি মিলিটারি।

—এই?

—কী?

—চল না, গাড়িটা নিয়েই বাজার করে আসি।

—সে যাওয়া যায় কিন্তু এত সকাল, বাজার বসেছে কি বসেনি ঠিক নেই। পরে যাব। আগে ঘরে গিয়ে চা-ফা খাই। কাল যে আনাজ অস্ত আনলাম, নেই?

—সে চলে যাবে। বরং দুটো ডিম কিনে নিই।

—সেই ভাল। জিলিপি খাবে, জিলিপি? সকালেই তো ভাজে। একেবারে গরম গরম।

—আমি সিঙাড়াও খাব।

—নেব। তবে তোমার মলিনা মাসির পাড়ার মতো টেস্ট হবে না। ভবানীপুর বলে কথা।

—তা সে না হোকগে যাক্। আমাদের দোকান আমাদের মতো।

ইয়ে নজারোঁ না হঁসো
মিল ন সকুঙ্গা তুমসে
তুম মেরে হো ন সকে
ম্যায় তুমহারা না রহা
কোই হমদম না রহা, কোই সহারা না রহা
হম কিসিসে ন রহে, কোই হামারা না রহা...

এইসব গান যখন দূর থেকে হাওয়ায় হাওয়ায় কখনও এসে আবার চলে যায় আর সেই সময়টা যদি একলা অটো রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে পড়ে-আসা বিকেলকে গাছের মাথায় সন্ধের মধ্যে তলিয়ে যেতে দেখা যায় তখন মনকে আর কেমন করতে বলতে হয় না, তখন মায়াবী সব কিছুই, ওই যে বাসটা ফিরছে নিজেকে টেনে টেনে, সে যখন ধুঁকতে ধুঁকতে দাঁড়াবে তখন বাসের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকলেও এই বিকেল-সাঁঝের কম আলোতেও হয়তো দেখা যাবে যে আয়ার কাজ করতে যাওয়া মা দুটো ক্লান্ত আর ব্যথায় টনটনে পা দিয়ে নামছে, ফিরে আসছে ঘরে, ফিরে আসছে ঘরে মার গিঁট বাঁধা রুমাল যাতে বাঁধা আছে ময়লা, ভাঁজে ভাঁজে দুর্বল হয়ে যাওয়া, কমজোরি সেই সব দু টাকার নোট যারা বাতিল হয়ে যাওয়ার আগেও, শেষবারের রুখে দাঁড়াবার মতো চেষ্টায় নিজেদের বিকিয়ে দিলেও বিনিময়ে পেয়েছিল ঠোঙার মধ্যে কিছু চালভাজা, নয়তো

Pathagar.net

হালকা খোসায় ঢাকা বালিতে ভাজা বাদাম বা কখনও একটা পেয়ারা এবং এইসব মমতা মাখা সামান্য সামগ্রীর মধ্যেই বেঁচে থাকে রোগা ফুটবলাররা যারা বাঁ বা ডানদিক দিয়ে কাটিয়ে কাটিয়ে চলে যায় কর্নারের কাছে এবং সেখান থেকে মাইনাস করা বলটা পাক খেতে খেতে, ডিফেন্সের লাফিয়ে ওঠা মাথা টপকে, নিজের অক্ষের ওপরে ঘুরতে ঘুরতে তার মহাদেশ, মহানদী, মহাসমুদ্র ও মহাজনপদ নিয়ে নেমে আসতে থাকে স্ট্রাইকারের মাথা লক্ষ্য করে বা এমনও হতে পারে যে ফুস্‌ফুস্‌ ও হৃদয় ঘিরে হাড়ের পিঞ্জরে গড়ে ওঠা যে বুক সেখানেই বলটা এসে পড়ে এবং দক্ষ স্ট্রাইকার দু হাত পাশে ছড়িয়ে, বুকটা একটু ভেতরে ঢুকিয়ে নেয় অতএব বলটিও শরীরের মধ্যে গড়ে ওঠা উপত্যকার ঢাল বেয়ে নেমে আসে পায়ের কাছে অর্থাৎ বলটিকে চেস্ট-ট্র্যাপিং করে পায়ে নামানো হল এবং এবার বলটি একবার মাটিতে পড়ে আবার মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করার মুখেই স্ট্রাইকারের পা একটু পেছনে গুটিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে সামনে ছিটকে গিয়ে বলে লাগে এবং হাততালি ও চিৎকারে সব দিক ঢেকে যায়, এবারে চোখ খুললে বোঝা যাবে বিকেল বিকেলের মতোই ফুরিয়ে গেছে, অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে এবং পাশ দিয়ে জোরে বাস বা লরি চলে গেলে এই আবছায়ায় পাতা বা ফাঁকা, বেঘর পলিব্যাগদের উড়তে দেখা গেলেও তার সঙ্গে অবধারিত যে ধুলোও উড়েছিল তাদের আর দেখা যায় না... স্টার্টের ধাক্কায় জেগে ওঠে অটো...

—বিয়ে অনেকেরই হয়। আমাদেরও হয়েছিল। কিন্তু তোমার মতো ডুমুরের ফুল দেখিনি।

—আরে সে নয় নন্দদা। আমি কি কখনও ভেবেছিলাম যে বউ এসে এ বাড়িতে উঠবে। চানের জায়গাটা টিন দিয়ে ঘিরতে হল, এটা করতে যাই তো দেখি ওটা নেই, টেবিল ফ্যানটা সারালাম—একা মানুষ। আর এত ছাতার ঝামেলা যে ঘাড়ে এসে পড়বে ভাবিনি। এসব ছাড়। কী হল তোমার চার চাকার?

—হবে। হবে। হুট করে কি কিছু হয় নাকি! বিশ্বাস রাখ, ঠিক হবে। লাইসেন্সের হিল্লে কিছু হল?

—কথা বলেছি। হয়ে যাবে। তাহলে যাই গো, এ বেলা ছটা ট্রিপ মাত্তর মেরেছি। খেতে হবে তো।

—খবরপত্তর কিছু শুনেছ?

—কীসের?

নন্দ একটু কাছে ঘেঁষে আসে। খাকি মোটা কাপড়ের হাফ শার্টের বুকপকেটে অনেক ভাঁজ করা কাগজ। গুঁড়ি গুঁড়ি হাতের লেখায় একটা পোস্ট কার্ড। একটা ডটকলম যার মাথাটা নেই। ঘামে কপালটা চকচক করছে রাস্তার আলো পড়ে।

—কানাঘুষোয় খবর রটছে। বলছে খুব হাঙ্গামা হবে। তুমি শোননি?

—না।

—মাঠে তো বোর্ড বসে। জান তো?

—জানি।

—মাছওলা-ফাছওলা, তারপর গিয়ে বাজারের আরও কিছু মাল, এদের ঠেঙেই শোনা। বোর্ডের শেয়ার নিয়ে নাকি লেগে গেছে। নেতারা ডেকেছিল মিটমাটের জন্যে। হয়নি।

—নেপালি কী বলছে?

—ওর তো পাত্তা নেই। গা ঢাকা কেস।

—তবে তো ঝামেলা।

—ঝামেলা বলে ঝামেলা। বলছে মার্ডার-ফার্ডার একটা হয়ে যাবে। বল কোনও মানে হয়? এই ভয়ে ভয়ে থাকা।

—তোমার কী? যা হবে হতে দাও। থামাতে তো আর পারবে না।

—শুনে থেকে ভয় ধরে গেছে মনে। চালাচালির মধ্যে না পড়ে যাই।

—ধুস্। ফাল্তু ভেব না। মরুক না শালারা ক্যালাকেলি করে। চলি। অটো স্টার্ট নেয় চন্দনের বাঁ হাতের হ্যাঁচকায়। অটো গজরায়।

—মাঝেমধ্যে রাস্তায় দেখলে, প্যাসেঞ্জার না থাকলে দাঁড়িয়ে যেও।

—আচ্ছা।

—তাহলে বলছ, আমার কোনো ভয় নেই তো?

অটো চলে যায়। গিয়ার চড়ে। নন্দ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর শার্টের সাইড পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বের করে। কানের কাছে ধরে বিড়িটাকে দু'আঙুলে রগড়ায়। উল্টো করে ফুঁ দেয়। ধরায়। তারপর হাঁটতে থাকে। নন্দ যেদিকে যায় তার উল্টো দিকেই একটু আগে চলে গেছে অটো। সাইকেলের রডে একটা রোগা ফরসা মেয়েকে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল একটা ছেলে। নন্দর ছাড়া বিড়ির ধোঁয়া ভেদ করে তারা চলে যায়। সেদিকেই একটু আগে চলে গেছে। অটো।

চন্দন প্যাকেটটা এনে মালার হাতে দিয়েছিল। মালা জানত এটা কী।

—বাচ্চা না হওয়ার বড়ি। তোমার নামেই নাম। ছাপা আছে গায়।

মালা মুখ টিপে হেসে বলেছিল,

—জানি। মাসির কাছে নাম শুনেছি।

চন্দনের ঘরের সামনে এখন যেমন আগাছা, লতা, নিমের চারা, বাবলার কাঁটা ঝোপ হয়ে আছে, আগে, মালা থাকার সময়টা এমন বুনো আর জংলা হয়ে ছিল না। এইসব জানা-অজানা আগাছার ভিড়ের মধ্যেই রয়েছে মালার নিজের হাতে লাগানো নয়নতারা। আর রাতে সন্ধ্যামণি। শুধু অনেক ভিড়ের মধ্যে কখনও আড়াল হয় বা কখনও নুয়ে পড়ে বলে সব সময় দেখা যায় না। তুলসী গাছ ছিল একটাই। পরে তার মঞ্জরী ছড়িয়ে অনেক চারা হয়ে হয়ে তুলসীও চলে গেছে আগাছার দলে। শুধু মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাঁচ টাকা দিয়ে স্টেশন রোড থেকে কিনে আনা চন্দনের হাসনুহানা। গাছওয়ালা বুড়ো যখন প্রথম গাছটার কথা বলেছিল, তখন গাছটাকে দেখে চন্দনের বলতে গেলে কিছুই মনে হয়নি।

—একে কী বলে জানেন? রাত কী রানি। বুড়ো মানুষের কথা শুনে গাছটা নিয়ে যান। কী গাছ দিয়েছি পরে এসে বলবেন। গন্ধ এমন হবে না একেবারে মাতাল করে দেবে।

—হাসনুহানা থাকলে বলে সাপ আসে।

—ওসব মা কথার কথা। আমি তোমাকে মিথ্যে বলব না। বলছি, গিয়ে লাগিয়ে দাও, পরে বলতে হবে হ্যাঁ, গন্ধ ফুলের গাছ একটা লাগিয়েছিলাম বটে বুড়োর কথায়।

—টবেই থাকবে?

—মাটি থাকলে মাটিতেই দেবেন। ঝাড় হয়ে ছড়াবে। বর্ষায় ডাল লাগালে আরও হবে। একেবারে পাড়া জুড়ে ভুরভুর করবে বাস।

—সার লাগবে?

—ওই একটু গোবর মাটি, খোল। তবে দেখবেন গোড়ায় যেন জল না জমে। খুব অভিমানী গাছ। মোটে জল জমা সইতে পারে না। গোড়াতে মাটি দিয়ে দেবেন থুপো করে।

ফুটবল খেলার দম নষ্ট হয়ে যাবে, চন্দন বিড়ি সিগারেট কম খেত। ব্রাজিলের সক্রেটিস নাকি

অনেক সিগারেট খেত। এসব কথা ওর খেলার বন্ধুরাই বলেছিল। খেপ খেলতে যারা চন্দনের সঙ্গে যেত তারা অনেকে নেশা করত। ধুনকি যদি রক্তে না মিশে থাকে তাহলে আধ ঘণ্টা বাদে বাদে লড়ে যাওয়া যায় না। এবড়ো-খেবড়ো পা খুব্‌লে নেওয়া মাটিতে খেলা যায় না। ফ্লাড লাইটে ঝলমলে নির্মম রাস্তা, ফুটপাথ জুড়ে খেলার লড়াইতে টিকে থাকা, টিমকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। কেউ কেউ ট্যাবলেট খেয়ে নিত চা বা কোকাকোলা দিয়ে। চন্দন কখনও নেশার কাছে সুসময় ধার করতে যায়নি। কিন্তু মালা চলে যাওয়ার পরে চন্দন মদ ধরেছিল। ধরিয়েছিল মিউচুয়াল ম্যান। সেই সঙ্গেই বিড়ি ছেড়ে সিগারেট। ছোট চারমিনার। এসবই হল ধরতাই। ধরতাই পেয়ে গেলে, হাওয়া কপালে থাকলে, মরা বা বেহাওয়ার বেইমানি না থাকলে ঘুড়ি ঠিক উড়ে যাবে। ঘুড়ি উঠে যাবে লাটাই খালি করে। শেষে শেষ গিঁটটাও ছিঁড়ে চলে যাবে মেঘলোকের মশারির আড়ালে। সেখানেও কী আকাশ মাতাল করে হাসনুহানা ফুটে থাকে? নাকি সেখানে শুধুই রাতের হাসপাতাল বা মেঘলা দিনের জেলখানা যার গরাদের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর তার ডোরা ডোরা দাগ আঁকতে পারে না। ভরদুপুরে একদিন ধুম নেশা করে জোরে চালাবার সময় বাঁদিকে সার দিয়ে দাঁড় করানো ট্যাক্সি আর ম্যাটাডরের ফাঁক থেকে একটা বল ড্রপ খেতে খেতে রাস্তায় নেমে এসেছিল। তার আধ মুহূর্তের মধ্যে বলের পেছনে ধাবমান একটি ন্যাড়ামাথা বাচ্চা। ব্রেকের চাপে হিঁচড়ে হিঁচড়ে রাস্তা কামড়ে ধরেছিল অটো। চন্দন চিৎকার করে উঠেছিল,

—এই শুয়ারের বাচ্চা।

বলেই বুকটা কাতরে উঠেছিল। বাচ্চাটা, ন্যাড়ামাথা, পেটটা একটু ফোলা, কালো হাফ প্যান্ট পরা, দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ভ্যাবাচাকা খেয়ে। বলটা উল্টোদিকের নর্দমাতে গড়িয়ে গিয়ে থেমে গেছে।

—যা, বলটা নিয়ে আয়। আর কখনও এরকম করে রাস্তায় ছুটবি না। যা!

বাচ্চাটা বল নিয়ে ফেরার সময় অবাক হয়ে দেখেছিল অটোর ড্রাইভার হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে অটোতে স্টার্ট দিচ্ছে। লোকটার তো লাগেনি। লাগলে তো তারই লাগত। হয়তো ন্যাড়া মাথাটাই ফেটে যেত। ফেট্টি বাঁধতে হতো। ড্রাইভার কাঁদতে কাঁদতেই গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। চলে যাচ্ছে। অটো। বিকেল তখন নয়। কিন্তু আসবে। সেই বিকেলটাও দেখতে না দেখতে পালাতে শুরু করে। সেই দিকেই চলে গিয়েছিল। অটো।

অনেক আগাছার অন্ধকারে ওই তো দাঁড়িয়ে হাসনুহানার গাছ। তার মধ্যের অন্ধকারে, যেখানে অনেক ডালের ঝুপ্‌সি, সেখানে বাসা বেঁধেছে বোল্‌তা। ফুল ফুটেছে ছোট্ট, ছোট্ট। ন্যাড়ামাথা হতভম্ব ছোট্ট ছোট্ট ফুল। তাদের সবার গন্ধ এক হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে অফুরান। তলার ঝোপের মধ্যে দিয়ে একটা বেজি যেতে যেতে আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ফণা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাসনুহানা। এই জায়গাটা, এই যে বড় বড় ঘাস হয়ে যাওয়া জায়গাটায়, সেখানেও কেউ নেই। সামনেই তালা বন্ধ চন্দনের ঘর। ঘাস বড় হতে থাকা ওই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে থাকত। অটো।

অনেক রাত। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। নন্দদা যে গণ্ডগোলের কথাটা বলেছিল সেটা হঠাৎ শুরু হয়ে গেল। এমনি বোমার শব্দ যা দেওয়ালে, কবরে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ফেরার হয়ে যায়। লোহার পাইপ ফাটার তীব্র ধারালো শব্দ করে ফেটে পড়ে সকেট বোমা যার আওয়াজ বুকের পাঁজরার এক একটা হাড়কেই বেছে নেয়। বাঁশের গাঁট ফাটার মতো শব্দ ফায়ারিং-এর। হতে পারে যে পুলিশ এসে গেছে। দুটো গ্যাংকে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে গুলি চালাচ্ছে। অথবা হয়তো পুলিশ আসেইনি। নির্লিপ্ত মুখ করে থানায় নাইট ডিউটি দিতে দিতে তারাও হয়তো চন্দন আর মালার মতোই বোমা আর ফায়ারিং-এর শব্দ শুনছে। কিছুক্ষণ পরে শব্দ কমতে থাকে। যুদ্ধ, তা সে যত বড়ই হোক না কেন, একই নিয়ম মেনে তাকে থেমে যাওয়ার দিকে এগোতে হবে।

—আর হচ্ছে না। ফাটছেও দূরে।

—যারা পারল না তারা পালাচ্ছে। পালাবার সময়ে একটা-দুটো চার্জ করছে।

—কেউ মরে যেতে পারে?

—পারে। চোটও হবে কেউ কেউ। তবে এমনিতে কিছু হয় না। কত ফাইট দেখলাম। স্রেফ আওয়াজ। আসলে কেউ কারও কাছে ভেড়ে না। তাছাড়া দুজনেরই লোক আছে খবর দেওয়ার। ধারেকাছে এলেই সিগন্যাল দিয়ে দেয়।

—তুমি এদের চেন?

—চিনব না কেন? আমারই বয়সি তো সব। একসঙ্গে কত বলে খেলা করেছি।

—তুমি কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলতে যেও না যেন। কীসের থেকে কী হয়ে যায়।

—তা কি হয় নাকি? চেনা, বন্ধু—কথা বললে বলতেই হয়। তবে ওরা কিন্তু গুণ্ডাগার্দি করলেও লোক খারাপ না। ওদের লাইনে যারা নেই তাদের সঙ্গে ওদের কখনও ঝামেলা হয় না। জল দাও তো। জল খাই। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। কাল সকাল সকাল বেরোব।

—তবে যে বল সকালে প্যাসেঞ্জার পাওয়া যায় না।

—সে জন্যে না। বাস স্ট্যান্ডের চায়ের দোকানটাতে একবার যাব। জানা যাবে কেউ চোট-ফোট খেল কিনা। অনেক মাল পড়ল তো, বলা যায় না।

কেয়া বতাউঁ ম্যায় কহাঁ
ইউঁ হী চলা যাতা হুঁ
যো মুঝে ফিরসে বুলালে
ও ইশারা না রহা
কোই হমদম না রহা, কোই সহারা না রহা
হম কিসিসে না রহে, কোই হামারা না রহা

—অ্যাক্সিডেন্ট যখন হবার থাকবে তখন তোমাকে ঠিক টেনে নিয়ে যাবে। নিশির ডাক যেমন টানে। আমি কী জানতাম। আমার তো সেদিন বেরোবারই কথা ছিল না। আর অ্যাক্সিডেন্ট তো এমনিতেই—গোটা জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেল। ফিনিশ। সান্নাটা। মিউচুয়াল ম্যানকে টেনেছিল। প্যা-টা ভেঙেছিল। তারপর লোক খুঁজছিল। আমাকে পেয়ে গেল। কী করবে তুমি? কিচ্ছু করার নেই।

অটোর ভেতর বসেই, বেশ ধূম নেশার ঘোরে, এই কথাগুলো এরফানকে বলেছিল চন্দন। কিন্তু একটা ব্যাপার ভেবে দেখার মতো। মিউচুয়াল ম্যানের সাইকেল লাইনের গাড্ডায় পড়ে গিয়েছিল। ট্রাম ব্রেক কষেছিল। না কষলে সেই রাতের পর মিউচুয়াল ম্যানের কোনও হদিস থাকত না। সেই ধাক্কাটাকে যে অর্থে অ্যাক্সিডেন্ট বলে ঠিক সেই হিসেবটা বোধহয় চন্দনের বেলায় খাটে না। অবশ্য বড় একটা মানে করলে হয়তো সেরকমই কিছু একটা দাঁড়াবে। অতবড় মানের এন্তার চিন্তায় না মাথা ঘামিয়ে বরং অ্যাক্সিডেন্ট বলতে আচমকা চোট, ঘায়েল, ব্যান্ডেজ, প্লাস্টার, সেলাই, স্যালাইন, রক্ত, তুলো, মুর্দাঘর—এই সবের মধ্যেই যদি থাকা সাব্যস্ত হয় তাহলে চন্দনের ঘটনাটা ছিল অন্যরকম। নিজে তার যা ইচ্ছে সে বলতে পারে, কিন্তু সেটা শুনে গেলেই হল। শোনা মানে তো আর মেনে নেওয়া নয়। আরও একটা যুক্তি আছে। লাইফে চোট খাওয়া মাতাল হাতে গুনে শেষ করা যায় না। একেকটা পাড়া যদি ধরা যায় পাঁচটা দশটা এরকম মাল থাকবেই। এদের ভ্যাড়র ভ্যাড়র প্রস্তাব শুনতে হলে লোককে আর কাজ কারবার করে খেতে হতো না।

তারিখটারিখ কারও মনে থাকেনি। বরং এলাকাটায় ওটা ডাকাত পড়ার দিন বলে কথা তুললেই সবাই বুঝে নেবে।

সেদিন সকালে গাড়ি বের করবে না বলে চন্দন ঠিক করেছিল। আগের দিন কুলপি মালাই খেয়েছিল ঘরের সামনে গাড়ি ডেকে। গাড়ির গায়ে লেখা 'রাজস্থানের মটকা মালাই।' সকাল থেকে সেই বুকে ভোঁতা একটা ব্যথা, গলা ভাঙা, কাশি।

—জ্বর আসবে মনে হচ্ছে। সেই খেলার টাইম থেকেই বুকটা আমার একটু কমজোরি। ঝট্ করে ঠাণ্ডা বসে যায়।

—তাহলে আজকে আর গাড়ি বের কোরো না। আমি না হয় বেরিয়ে দাদার বাড়ি ফোন করে দেব।

—না, না, দাদাকে বলতে হবে না। পরে আমি বলে দেব। বাজার লাগবে না?

—তুমি শুয়ে থাক তো। একদিন ভাতে কুমড়ো আলু সেদ্ধ দিয়ে খেয়ে দিব্যি চলে যায়। রাতে না হয় চারটে রুটি করে দেব। আলুভাজা দিয়ে। টেস্ট লাগবে।

—তাই দিও। কেন যে লোভে পড়ে ওই মালাই না কী যে খেতে গেলাম।

—আসলে তোমার কিচ্ছুই সয় না। বুঝলে? এই শরীর নিয়ে কী করে বল খেলা করতে তাই ভাবি।

—দাঁড়াও, দাঁড়াও। একটু গুছিয়ে নিই। অটোর কয়েকটা কাজ করাব। দাদার কাছে চাইব না। নিজেই করব। তারপর দেখছি শালা শরীরের বাচ্চার রংবাজি!

—তোমাদের না, ওই ড্রাইভার লাইনের হল এই দোষ। ভাল কথা মুখে আসে না।

এরকম কথা কয়েই সকাল গড়াচ্ছিল। কিন্তু স্নান করে বেরিয়ে মালা দেখল ড্রাইভারির গেঞ্জি আর রঙ বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ট্র্যাক সুটের প্যান্টটা পরে চন্দন অটোর কাচ মুছছে।

—এই হল তোমার শুয়ে বিশ্রাম করা?

—দূর। অত খারাপ লাগছে না। যাই। গেলেই প্যাসেঞ্জার পেয়ে যাব। হকের রোজগারটা ছাড়তে যাই কেন?

—আমি কিন্তু পৈ পৈ করে বলে রাখলুম, এরপরে অসুখ একটা বাধালে আমাকে দোষ দেবে না। লোকে শুনলে তো আমাকেই দুষবে। বলবে কেমন মেয়ে তুমি গা? শরীর খারাপ, কাশি, তাকে যেতে দিলে, আটকে রাখতে পারলে না?

—আরে বাবা, আপ-ডাউন অফিস টাইমের কয়েকটা ট্রিপ সেরেই চলে আসব। দিব্যি খেয়ে বলছি। বেশ ঝরঝরে লাগছে এখন। তুমি ধীরেসুস্থে রান্নাটা বসাও। আমি যাব আর আসব।

বেশ হাওয়া ছিল বলে রোদ্দুরের তাপ থাকলেও অটোটা চালাতে সেই বেলা হয়ে যাওয়া সকালে যেন একটু বেশি ভালই লেগেছিল চন্দনের। গতির সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দিতে পারলে আশপাশ, পথচলতি লোক, সাইকেল, সাবধানে রাস্তা পার হতে থাকা কুকুর, কবে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা রোড রোলার, ময়লা ফেলার ভ্যাট, দোকান, জটলা, ক্রেট করে পেপ্‌সি নামাবার কাচে কাচে ধাক্কার শব্দ, রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে থাকা খোলা ক্যাসেটের ফিতে, হঠাৎ রঙের গমক জাগিয়ে তোলা কোনও কোনও মেয়ে—সব কিছুর ওপরে টেক্কা দেওয়া যায়। এ হল একটা রেস যাতে যে যত জোরে চলবে, যত প্রতিপক্ষের সঙ্গে টক্‌রার নেবে, যত ছাড়িয়ে, যত ছাপিয়ে চলে যেতে পারে ততই সুখ, ততই টাকা, এই যে উত্তাল জোরে রাস্তা চাপা দিয়ে গিয়ার থেকে গিয়ারে উঠে যাওয়া, এই যে একমাত্রিক ট্র্যাপিজ, এই যে গতি-জাড্যের পিঠের ওপরে বসে থেকে সফল সওয়ার হতে পারা—সবটা মিলিয়ে খেয়াল কখনও ত্যারচা তাকানোতে কিছু খোঁজে না, একবার লেপটে

দেখে নেয় নিজের হাত যা হ্যান্ডেলের লাগাম ধরে আছে, গোটা গাড়িটা কাঁপছে যদিও ইঞ্জিনের শব্দে কোনও গজরানি নেই, টানা একটা স্রোতের শব্দ, টায়ারে পিচের চাদর ছোঁয়া, না ছোঁয়ার শব্দ, মাঝেমধ্যে শব্দের স্রোতে একটা আধটা খিঁচ যা চাকার তলায় কোনও ছোট্ট ইটের বা পাথরের টুকরো পড়ে যাওয়ার...

গাড়ির আওয়াজে এতটা বুঁদ হয়ে গিয়েছিল যে শুনতে পায়নি, যদিও দেখতে পেয়েছিল, অনেক মানুষ ছুটে তার দিকেই আসছে। আসছে আর চেঁচাচ্ছে তারা, ছুঁড়ছে যা কিছু কুড়িয়ে নেওয়া যায়, রাস্তার পাশ থেকেও লোকে ছুটে এগিয়ে আসছে—ওরা তাড়া করছিল একটা ট্যাক্সি যার থেকে হাত বেরিয়ে বলছে সরে যেতে, রাস্তা ছেড়ে দিতে, কী ঘটছে সেটা দেখতে আর বুঝতে যে কয়েক লহমা সময় ছিট্‌কে যায় তার মধ্যেই মুখোমুখি, পরস্পরের দিকে ধাবমান ট্যাক্সি ও অটো মুখোমুখি...

দিশেহারা চন্দন এমনভাবেই ওই চৌম্বক সময়ের মধ্যে ট্যাক্সির দিকেই এগিয়ে যায় যে ট্যাক্সির থেকে বোমা ছোঁড়ার হল্‌কা ও ধোঁয়াও সে টের পেয়েছিল পরে... ট্যাক্সিটাও আসলে পালাতে চায়নি মানে সাইড থেকে বুকে নল ঠেকানো অবস্থাতে ড্রাইভার বুঝতে পেরেছিল যে তাকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। অটোর সঙ্গে ধাক্কা লাগলে কেউ না কেউ মরবেই, তাই মুখোমুখি তুমুল সংঘর্ষের মুখেই সে বাঁ কনুই দিয়ে বাঁ দিকে বসে থাকা লোকটার গলায় মেরেছিল, সেও তখন খুব ভাল অবস্থায় ছিল না, কারণ মানুষের ঢেউ-এর ভেড়ে আসা বাদেও তার সামনে ছিল হেড-অন হয়ে এগিয়ে আসা অটো। আর সেই সঙ্গেই ডান দিকে ড্রাইভার এত জোরে স্টিয়ারিং ঘোরায় যে গাড়িটা টাল খেয়ে ফুটপাথে উঠে যায়, একটা বাড়ির সামনের পাঁচিল ভেঙে। চন্দন ততক্ষণে ব্রেক করেছে, কিন্তু অটো ছেঁচড়ে এসে ট্যাক্সির পেছনের বাঁদিকের দরজাটা আটকে, কমজোরি একটা ধাক্কা মেরে দাঁড়িয়ে যায়। এক-দু সেকেন্ডের জন্যে চন্দনের জ্ঞান ছিল না ঠিকই কিন্তু পরে সে মনে করতে পেরেছিল যে ট্যাক্সির ভেতর থেকে গুলি চালাবার দুটো শব্দই সে শুনেছিল। এগুলো ছিল বিমূঢ় অবস্থায় উন্মত্ত জনতার হাত থেকে বাঁচার শেষ চেষ্টা যা কোনও কাজে লাগেনি।

ড্রাইভারের বুকে যে চেম্বার ঠেকিয়েছিল সে বাঁদিকের দরজা কোনওমতে খুলে আগে নেমে দৌড় লাগিয়েছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভারই নেমে পুরো গাড়িটা ঘুরে তাকে তাড়া করে। তার হাতে চেম্বারটা ছিল কিন্তু গুলি ফুরিয়ে যাওয়া বা অন্য কোনও কারণে চালায়নি। কিছুটা গিয়ে ইটে হোঁচট খেয়ে সে পড়ে যায়। অটোতে বসেই চন্দন দেখছিল। ড্রাইভার একটা ইট তুলে তার মাথায় বার বার ঠুকছিল। তারপর সেখানে এত লোক জমে গেল যে তখনকার মতো চন্দন আর দেখতে পায়নি। এর পরা ছিল একটা কালো প্যান্ট আর গায়ে ছিল শার্ট। নোংরা নীল। অনেকটা চন্দনের ট্র্যাক সুটের মতোই। মাথার পেছনে কয়েকটা ইটের আঘাত খাওয়ার পরেও সে ভেবেছিল দৌড়তে না পারলেও হামাগুড়ি দিয়েও অন্তত কিছু একটা করা যায়। ততক্ষণে বাঁশ, বাড়ির কাজের পেরেক লাগানো লম্বাটে তক্তা, রড, শাবল—সব আসতে শুরু করেছে। বাঁদিকে, কিছুটা দূরে ঘটনাটা ঘটছিল। এর মধ্যে ট্যাক্সির পেছনের সিট থেকে ছিনিয়ে বাকি দু'জনকেও নামানো হয়ে গেছে। আরও মানুষ আসছে। কুড়িয়ে বাড়িয়ে হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে—বেঁকে যাওয়া শিক, ডাণ্ডা, কোদালের হাতল যা পাওয়া গেছে তাই।

—মার! মার! মাইরা হাড্ডিগুড্ডি এক্কেরে খতম কইরা দে।

—একটা মালও জ্যান্ত পুলিসের হাতে যেন না যায়। গেলেই বাঞ্চোতগুলা বেঁচে যাবে। দে...গলায় মার না। বাঁশটা চেপে ধরে থাক। পা দিয়ে গেড়ে ধর।

—অটো ড্রাইভারের চোট লাগেনাই তো।

—আরে কী কন্। এ তো আমাগো চন্দন।

—ওফ্ খুব সাহসের কাম করছস্।

—চন্দনদা না ব্লক করে দিলে শালারা ঠিক ভেগে যেত।

—মার্। এহ্ হে, আবার হাতজোড় করে। মার হালার হাতে মার। হালায় ডাকাতি কইর‍্যা বেড়াও আর ধরা পড়লে হাতজোড়!

—এই শালাই পেটো চার্জ করছিল। আমি দেখেছি।

—আবে সর্‌তো। মারতে জানিস না মারতে আসিস কেন? সর্। কী রে, খান্‌কির ছেলে। আর ডাকাতি করবি?

চন্দন হতভম্বের মতো সামাজিক মানুষের অসামাজিক ডাকাতদের তাদের পাওনা সাজা দেওয়ার দৃশ্যে দর্শক হয়ে যায়। সে না থাকলে যে ট্যাক্সিটা থামানো যেত না, সেটা লোকেরা বলছিল বটে কিন্তু তার মাথায় ঢোকেনি।

—এই, এই শালা, এটা বোমার ব্যাগ। সাবধানে সরিয়ে রাখ্। পুলিসকে দিতে হবে।

—ওসব নকড়াবাজি না করে হাওয়া করে দে। পুলিসকে দিচ্ছে।

—চেম্বারটা কোথায় গেল বল্ তো। এই তো এক্ষুনি পড়েছিল।

—পল্লব না দুই দুইটা ভোজালি পাইছে। খাপ নাই।

চন্দন দেখেছিল ট্যাক্সি থেকে তখন দুজনকে টেনে নামানো হচ্ছে। তাদের মধ্যে নন্দদাও ছিল। উৎসাহের একটা রোল ওঠে। জমে যাওয়া পিচের ড্রাম কতগুলো ছেলে, এরাও চন্দনের চেনা, গড়িয়ে আনছে। যে দু'জন শুয়ে আছে, একজন পাশ ফিরে কুঁকড়ে, অন্যজন উপুড়, ওদের ওপর দিয়ে গড়িয়ে দেবে। এই সময়েই চন্দনের পাশে দাঁড়িয়ে একটা ছেলে বলেছিল,

—এভাবে মেরে ফেলার কোনও মানে হয়? জান নেওয়ার রাইট পালবিককে কেউ দিয়েছে?

চন্দন অবসন্ন অবস্থায় ছেলেটার দিকে তাকিয়েছিল।

লম্বা চুল। মাথায় হেড ব্যান্ড পরা। বেশ চেহারা।

—আপনাকে চিনি। আমি এদিকে কাজে আসি। ব্যাটারির দোকানে। এই... কী করছে দেখুন। ছিঃ চন্দনের পা দুটো কাঁপতে শুরু করে। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। চন্দন ছেলেটার কাঁধটা ধরে ফেলে। দাঁড়িয়ে তাকে থাকতেই হবে। হাঁটার কথা কি ভুলে গিয়েছিল চন্দন?

যে কুঁকড়ে পাশ ফিরে শুয়েছিল তাকে পা দিয়ে লাথিয়ে চিত করা হয়। যে উপুড় হয়ে শুয়েছিল তাকেও। বাসের ক্লিনার একটি ছেলে লম্বা একটা ভারি লোহার রড একজনের তলপেটের নীচে ও দু'পায়ের ফাঁকে সোজ নামিয়ে আনে।

—হালার ডাকাতের চোঙা-তবিল সব ফাটাইয়া দে।

যে ছেলেটা এই কাজ করছে সে একটা নোংরা তেলকালি মাখা পাজামা ও ভুসো রঙের গেঞ্জি পরা। বোধহয় সে বাসের তলায় শুয়ে এতক্ষণ কাজ করছিল। এখনও সে কাজ করছে। তার মুখে কোনও ভাবলেশ নেই। খুব মন দিয়েই সে কাজটা করতে চায়। সে পরের লোকটার দিকে এগোয়। এতক্ষণ উপুড় হয়ে ছিল বলে দেখা যায়নি। লোকটার একটা চোখ খুবলে কালো অন্ধকার হয়ে রয়েছে আর রক্ত, দাঁত, ছাল-চামড়া...

ছেলেটা আবার রডটা তোলে... চন্দনের দুটো হাঁটু ভেঙে যায়। চন্দন মাথা সামনে ঝুঁকিয়ে রাস্তার ওপরে নেমে আসতে থাকে। এবার চন্দন দেখতে পায়নি। শব্দটা শুনেছিল। উল্লাসধ্বনি। এরপরই একটা চিৎকারে ভিড়টা হঠাৎ ছড়িয়ে যায়। খুব ওপর থেকে দৃশ্যটা দেখলে হয়তো মনে হতো অনেকগুলো পিঁপড়ে কয়েকটা মিষ্টি বা টুকরো মাংসের ওপরে জড়ো হয়েছিল এবং আচমকা কোনও সঙ্কেত পেয়ে সহসা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে।

—পুলিস! পুলিস!

—জিপ, ভ্যান সব নিয়ে এতক্ষণে এল।

—সরে যান!

পুলিস যে এসেছিল চন্দন জানেনি। চন্দন আর কিছুই জানতে পারেনি।

—ব্রেভ বয়! বোধহয় লিনচিং দেখে ফেন্ট করে গেছে। এই... এদিকে শোন। তোমরা ওর বাড়ি চেন না।

—চিনি সার।

—গুড্। ওকে বাড়িতে দিয়ে এস তো ভাই।

—সার! অটোতে করেই নিয়ে যাব? চাবি ওর হাতেই ছিল। আমাকে জড়িয়েই অজ্ঞান হয়ে যায়।

—যাও। ফাল্তু ওকে জড়াব না। ব্রেভারির জন্যে ওকে আমি রেকমেন্ড্ করব। ইস্... এভাবে মারে? মল্লিক, একটাকেও আইডেন্টিফাই করতে পারলে?

—মুখফুখ যা হাল করে দিয়েছে সার...

—আরেকটা কোথায়? তিনটে ছিল শুনলাম।

—সামনে ওই যে নোংরার ভ্যাট আছে, ওই তো, ওখানে গারবেজের তলায় ঢুকিয়ে দিয়েছে...

—ওয়েপন্‌স?

নন্দ তদারকি করে। চন্দনকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। হাতের বাজার ব্যাগ দেখিয়ে সে বলেছিল,

—বাড়িতে আজ আবার মেয়ের শ্বশুরবাড়ির থেকে লোক আসবে। বাজারফাজার কিচ্ছু হয়নি। এই তুই চিনিস তো চন্দনের বাড়ি।

—খুব ভাল চিনি। গত বছর গরমের ছুটিতে আমাদের কোচিং করেছিল। চিনি না?

—সেই ভাল হল তাহলে। এই আরেকজন তো লাগবে। কে যাবে? তুই যাবি?

আর একটি কিশোর এগিয়ে আসে।

—ভাল করে ধরবি।

চন্দন গোঙানির মতো একটা শব্দ করে।

—হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। তোমাকে বাড়িতে দিয়ে আসবে।

চন্দন ফের গোঙায়।

—আমি যাব। বিকেল করে খোঁজ নিয়ে আসব।

চন্দন কিছু একটা বলে। বোঝা যায় না। হয়তো অস্পষ্ট, জড়ানো জড়ানো না হলেও বোঝা যেত না। মাথায় হেডব্যান্ড, লম্বা চুল ছেলে অটো স্টার্ট দেয়।

—তোমার নামটা কী ভাই?

—ভিকি।

—কী?

—ভিকি। বাস স্ট্যান্ড ছাড়িয়ে যে মোড়টা পড়ে, তার বাঁহাতি ব্যাটারির দোকানে কাজ করি।

অটো গড়ায়। নন্দ হাতের বাজার ব্যাগটা ফাঁক করে ভেতরটা দেখে নেয়। তারপর হনহনিয়ে হাঁটা লাগায়। কিছুটা দূরে গিয়ে পেছন ফিরে দেখে যে ভিড়ভাট্টা অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। কয়েকজন পুলিসের কথায় ট্যাক্সিটা ঠেলে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামাচ্ছে।

—নাম বটে একখানা। ভিকি! আবার বাবরিকাটা চুল। তায় আবার ফিতে বাঁধা। ভিকি! শুনলে

pathagar.net

মনে হয় কুত্তার নাম।

অটোতে চন্দন নিঃসাড়ে পেচ্ছাপ করে ফেলে। গোঙায়। ওর মুখ দিয়ে লালা গড়ায়। সরু হয়ে ঝুলতে থাকে।

—এই রে, মুতে দিয়েছে। ধর্। ধরে রাখ্। ভিকি অটো আস্তে করে দেয়। থামায়। ইঞ্জিন চালু রেখেই। পেছন ফিরে একবার দেখে নেয় নীচে।

—ও কিছু না। শক্ লেগে গেলে ওরকম হয়। ঠিক হয়ে যাবে।

হেডব্যান্ড না থাকলে চুলগুলো মুখের ওপরেই এসে পড়ত। ভিকির চোখ দুটো ছিল একটু কটা। চুলগুলোও ঠিক কালো বলা যায় না।

—ওই টি'পকলটা পেরিয়ে বাঁদিকের গলিতে। চন্দন একবার ঝাঁকুনি দিয়ে চোখ খোলে। আবার নেতিয়ে পড়ে।

মালার কান্না শুনে আশপাশের বাড়ির বউ, মাসিমা ও অন্যান্য অনেকে এসে জড়ো হয়। ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করা হয়। চন্দনের কপাল তখন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

যাওয়ার সময় একটু এগিয়ে ফিরে আসে ভিকি।

—বউদি, রাখ। ভুলে অটোর চাবিটা পকেটেই থেকে যাচ্ছিল। মালা হাত বাড়িয়ে চাবি নেয়।

—দাদা না থাকলে ডাকাতগুলো আজ ধরা পড়ত না। আমি দেখেছি, স্ট্রেট চলে এল। হিম্মত দরকার।

pathagar.net

—আমি জানতাম আজ অমঙ্গলের কিছু একটা ঘটবে।

—আরে না না। শক্ খেয়ে গেছে তো। ওইভাবে পিটিয়ে পিটিয়ে মারা। আমারই গা গোলাচ্ছে ভাবলে। পরে, এক ফাঁকে এসে দেখে যাব। রক্তফক্ত সবাই দেখতে পারে না।

চন্দনের জ্বর আরও বেড়েছিল। সেইসঙ্গে ছিল ভুল বকা। ইঞ্জেকশন পড়ার পর ভুল বকাটা কমে গেলেও থেকে থেকে চন্দন চমকে চমকে উঠছিল।

ঠিক একটানা না হলেও চন্দন একটা স্বপ্ন দেখেছিল জ্বর ও চমকে ওঠার মধ্যে অ্যাক্সিডেন্টের পরের কয়েকদিন। একটাই স্বপ্ন। যার কিছুটা দেখা হয়ে গেলে কিছু একটা বলে উঠতে হয়। তখন স্বপ্নটা বন্ধ থাকে। আবার তলিয়ে যেতে শুরু করলে ডুবে যাওয়ার ওজনহীনতার মধ্যে কোনও একটা খেই ধরে ফের স্বপ্নটা শুরু হয়।

ঘরের সামনে জায়গাটায় হাসনুহানার ঝাড়, সেই জায়গাটা ফাঁকা করে বেশ পরিপাটি করে বিছানা পাতা রয়েছে। সেই বিছানায় বালিশে মাথা দিয়ে মা শুয়ে আছে। মা-র কপালে চওড়া করে সিঁদুর দেওয়া। ফুল দিয়ে সাজানো। মা কিন্তু মরে যায়নি। ঘুমোচ্ছে। আর এই বিছানাটা ঢেকে টাঙানো আছে মশারি। যার ভেতরে সবটা স্পষ্ট দেখা যায় না। সময়টা রাত। খুব চাঁদের আলো। হাসনুহানার গাছ না থাকলেও তার গন্ধে চারদিক ম-ম করছে। চন্দন মশারির কাছে যেতে চায়। কিন্তু যেদিক দিয়েই সে এগোয় না কেন ঝড়ের মতো ওঠে আর মশারিতে ঢেউ খেলে খেলে চন্দনকে সরিয়ে দেয়। ভাল করে দেখতেই দেয় না মা-র চোখটা খোলা না বন্ধ। মা কিন্তু মরে যায়নি। কারণ তার বুকটা ওঠানামা করছে। যে নিঃশ্বাস নেয় সে মরে যেতে পারে না। কিন্তু মশারিটা উঠিয়ে চন্দন যে কাছে যাবে সে উপায় নেই। সোঁ সোঁ ঝড়ের শব্দ আর মশারিতে ঢেউ। সময়টা রাত। আর খুব চাঁদের আলো।

পরে চন্দনের এই স্বপ্নটার কথা কখনও মনে পড়েনি।

ডাকাতদের নাম-ধাম সব পরে জানা গিয়েছিল। ওরা এসেছিল ডায়মন্ডহারবার অঞ্চল থেকে। ট্যাক্সিটা হাইজ্যাক করেছিল প্রথমে। সেইমতো ড্রাইভারকে চালাবার জন্যে পাশে বসেছিল একজন।

একেই পরে ভ্যাটের ময়লার তলা থেকে বের করা হয়। ওদের প্ল্যান ছিল পাল্লার বাজারের বাইরে যে বড় গয়নার দোকানটা সদ্য খুলেছে সেখানে ডাকাতি করবে। দুজন ঢুকেছিল। কিন্তু ড্রাইভার চেঁচিয়েছিল বলে লোকজন ছুটে আসে। পেছন থেকে একজন ড্রাইভারের মাথায় ভোজালির বাঁট দিয়ে মেরে গাড়ি ছুটোতে বলে। ভাগ্য ভাল থাকলে ওরা বেরিয়ে যেতে পারত। কিন্তু বাচ্চাদের ইস্কুল-ভ্যান সামনে পড়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। ড্রাইভারও চেষ্টা করছিল যাতে গাড়িটা লোকজন থেকে ফাঁকায় না বেরিয়ে যেতে পারে। এ সময়েই উল্টোদিক থেকে চন্দনের অটো এসে পড়ে। ট্যাক্সিটা যদি জনতার তাড়া এড়িয়ে ফাঁকায় চলে যেত তাহলে ওরা ড্রাইভারকে মেরেও দিতে পারত। যাই হোক, পরিকল্পনামাফিক কিছুই হয়নি। হলে চন্দনকে নেশা করে অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা জনে জনে বলে বেড়াতে হতো না। তবে চন্দন নিশির ডাকের সঙ্গে যে তুলনাটা পরে দিয়েছিল, সেটা উড়িয়ে দেওয়া হয়তো যায় কিন্তু তাতে ব্যাপারটার অবাক করা দিকটা নস্যাৎ হয় না। অ্যাক্সিডেন্ট, মার্ডার, গুম, কিডন্যাপ, চোরাগোপ্তা স্ট্যাবিং, আচমকা ব্রেক কষা ট্রাম, ওভারব্রিজের রেলিং ভেঙে নীচে লাফিয়ে পড়া মিনিবাস, খালের জলে মুখ গুঁজে উল্টে যাওয়া বাস—এরকম অনেক কিছু ঘটে। এবং কিছু মানুষ এই বন্দোবস্তের হাতে মুরগি হয়ে যায়। সেই কথাটাই চন্দন বলেছিল। যেমন সে বুঝেছিল তেমন। কখন কীভাবে যে একজন মুরগি হয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। হাত দেখতে যে জানত সেই নন্দও না।

ডাকাত মারার পরে দিনদশেক অন্তত চন্দন প্রথমে বেহুঁশ, পরে ঘোর-বেঘোরের মধ্যে পড়েছিল। ওষুধ পড়ল অনেক। অটোর মালিক দাদাও একদিন দেখতে এসেছিল। মালার হাতে তখন পয়সা ফুরিয়ে গেছে। মলিনা মাসি তার নিজের টানাটানির মধ্যেও কুড়িয়ে-বাড়িয়ে দেড়শো টাকা দিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে চারদিনের ওষুধ হয়ে গিয়েছিল। দাদা মালাকে সাতশো টাকা দিয়ে বলেছিল যে এই টাকাটার কথা চন্দনকে বরং বলারই দরকার নেই। ও যেরকম ইমানদার ছেলে তাতে এই টাকাটা ফেরত দেওয়ার জন্যেই হয়তো বেসামাল শরীরে অটো নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। দাদা মালাকে বাড়ির ফোন নম্বর দিয়ে বলেছিল দিনকয়েক দেখতে। চন্দন যদি তাতেও সামলে না ওঠে তাহলে ফোন করতে। দাদা না থাকলেও বৌদি সব সময়েই বলতে গেলে বাড়িতেই থাকে। বৌদিকে বললেই হবে।

মালাকে অবশ্য ফোন করতে হয়নি। চন্দন আস্তে আস্তে সেরে উঠল। দুর্বলতা ছিল কিন্তু খুব। বলেছিল একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকলেই হাঁটু দুটো থরথর করে কাঁপতে থাকে। দুটো-চারটে কথা বলার পরই হাই তুলত। বলত ঘুম পাচ্ছে।

—সেই নকশালদের সময়ে অনেক খুনখারাপি হয়েছিল। কিন্তু সে তো আর আমাদের দেখতে হয়নি। শুনেছি কেবল। এ একেবারে চোখের ওপরে...

—ওসব অশৈল ঘটনা ভেব না... ফের শরীর খারাপ বাড়বে।

—আরে বাবা ডাকাত হলেও মানুষ তো। তোরই মতো তার ব্যথা-বেদনা। কসাই... সবকটা কসাই। মা... গো...

ওই দৃশ্যটাই চন্দনের বার বার মনে পড়ে। চিত করে ফেলার পর বাসের ক্লিনার ওই ছেলেটা লম্বা, ভারি রডটা তুলে তলপেটের নীচে, দুপায়ের ফাঁকে, নির্লিপ্ত মুখে নামিয়ে আনছে... চন্দন জানে যে ফ্রি-কিক থেকে বাঁচার জন্যে দেওয়াল যারা বানায় তারা ওই জায়গাটা আর বুকটা চোট থেকে আড়াল করার জন্যে হাত দিয়ে আড়াল করে... কখনও লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে দেহটাকে লাট্টুর মতো ঘুরিয়ে দিতে হয়... কারণ বল লাগলে ওখানে আর কিক-এ যদি সেরকম ফোর্স থাকে... চন্দন নিজের অজান্তেই দু হাত দিয়ে জায়গাটা আড়াল করে। তাকে কেউ ওখানে রড দিয়ে ওভাবে

pathagar.net

মারছে কেন। মারলেও সে কি হাত দিয়ে থামাতে পারত কিছুটা নিজের ভারে, কিছুটা আঘাতকারীর হাতের জোরে, বাকিটা পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে নেমে আসা সেই লোহার ভারি রড?

এই সময় ঘরের মেঝেতে বাইরের রোদ্দুর থেকে যে ঢুকছিল তার ছায়া পড়েছিল প্রথমে। অবশ চোখে চন্দন দেখেছিল। ভিকি। লম্বা চুল। হেডব্যান্ড। টাইট নাইলনের গেঞ্জি আর সস্তার জিন্‌স পরা। পায়ে কমদামি সাদা স্নিকার। ভিকির হাতে একটা পলিব্যাগ ছিল। তাতে দুটো মুসাম্বি।

—ধর বৌদি। দাদার জন্যে। কেমন আছে, বস্‌?

ভিকি টুলটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে। কারও বলাবলির তোয়াক্কা না করেই। চন্দনকে দেখতে দেখতেই স্নিকারের ফিতে খুলতে থাকে।

—ভাল। এখনও দুর্বল লাগছে। কিন্তু ভাল।

—আরে শুনেছি তুমি ভাল প্লেয়ার ছিলে। তোমাদের কাছে এগুলো কোনও ব্যাপার? কয়েকটা দিন রেস্ট নিলেই ফিট হয়ে যাবে।

—মালা, একে চেন? ও সেদিন না থাকলে...

—ছাড় তো। বৌদির সঙ্গে সেদিনই পহেচান হয়ে গেছে। আরে, জানোই তো না। তোমার না, অটোর চাবি পকেটে করে চলে যাচ্ছিলাম। অত হট্টগোল তো। ধামাকাতে সব গুলিয়ে গিয়েছিল।

—মালা, টেবিল ফ্যানটা ওর দিকে একটু ঘুরিয়ে দাও না। বেচারা রোদ মাথায় করে এসেছে।

—আরে, ঠিক আছে। ও হাওয়া-ফাওয়া আমার লাগে না। পরে শুনলাম—তিনটে মালই ফিনিশ। পুলিস দুটো ভোজালি ছাড়া আর কিছু পায়নি।

—ওদের কাছে তো শুনেছিলাম চেম্বারও ছিল।

—হাওয়া করে দিয়েছে। ওই টানা মাল দেখবে আবার কোনও কিচায়েন-ফিচায়েনে লড়িয়ে দেবে। সব রংবাজ এখন।

—পুলিসও তেমন গা করে না।

—পুলিস? রাত গয়ী তো বাত গয়ী। এল। লাশ তুলল। ভোঁ ভাঁ। এদিকে চেম্বার, বোমা কি যে গায়েব হয়ে গেল কে জানে?

—কী বলব? কিছু বলার নেই।

—ওই জন্যে জানবে, বৌদি কি চা বানাচ্ছ নাকি, বানাও, ভিকি কোনও ঝুটমুট ক্যাচালে থাকে না। কোনও লাভ আছে? এ এমন দিনকাল জানবে যে যার কারও সঙ্গে কোনও খিঁচ নেই সেও শালা টুক করে ফেঁসে যাবে। সব শালা বরবাদ করে দিল।

—বিস্কুট দেব দুটো?

—এ আবার জিজ্ঞেস করে নাকি? বাড়িতে এসেছে...

—দাও না, অন্যদিন সকালে দোকানে চা-রুটি খেয়ে নিই। আজ আর হয়নি। ভাবলাম দাদাকে দেখে আসি। ওখানেই চা হয়ে যাবে। একে বলে কপাল। বিস্কুটও এসে গেল।

মালা বিস্কুট দিতে গিয়ে আবছা মদের গন্ধ পেয়েছিল। বাবাকে চা দিতে গিয়েও মালা এই গন্ধটা পেত। গত রাতে যারা বেশি মদ খায় তাদের নিঃশ্বাসে গন্ধটা থেকে যায়। চেনা বলেই বোধহয় মালা ভেবেছিল যে গন্ধটা তার খারাপ লাগেনি। অথচ সেদিন এই গন্ধটা যদি মালা চন্দনের মুখ থেকে পেত তবে সেটা ভাল লাগত না। গন্ধ এরকম কত জায়গায় কত মানুষকে যে বিপদে ফেলে দেয় বা হাত ধরে টেনে তোলে অথবা হা-হুতাশের মধ্যে ঠেলে দেয় তা অগুনতি গল্প হতে পারে। কয়েকটা যে হয়ওনি এমন নয়। এমন কিছু মেয়ে আছে যারা বিছানা থেকে উঠে চলে যাওয়ার পরেও অনেকদিন তার ব্যবহৃত সুগন্ধী বা পাউডার বা হয়তো সাবানের গন্ধই বিছানার চাদরে

বালিশে আঁকড়ে থাকে। সব জায়গায় হয়তো নয়। ঘুমের মধ্যে উপুড় হলে কখনও নাকে সেই গন্ধটা এসে মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে। কিন্তু এটা কখন ঘটবে সেটা কেউ জানে না। আবার এটাও ঠিক যে অনেক দিনের পরেও যখন অনেকদিন কেটে যায় তখন আর সেই গন্ধটা হাজার মাথা কুটলেও আর পাওয়া যায় না। ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পরেও এরকম হতে পারে। আসলে এটা একটা নিয়ম। চলে যাওয়ার একটা নিয়ম। এর সঙ্গে যুঝে কোনও লাভ নেই। কিন্তু মানুষ এতই অবুঝ যে সেটা মানতে চায় না। আর এখানেই সেই বার বার পড়া গল্পগুলো ফের নতুন করে শুরু হয়। তাই না?

ভিকি যেদিন এসেছিল সেদিন রাতেই মালাকে জড়াতে গিয়ে অসম্পূর্ণতার হদিস পেয়েছিল চন্দন। তার বুক জুড়ে মন কিছু একটা চাইছে কিন্তু নিজের শরীরটাই সাড়া দিচ্ছে না তাতে। অথচ এমন কথাটা মন থেকে, মাথা থেকে কিছুতেই সায় পাচ্ছে না যে পারে না। চন্দন মালাকে জড়িয়ে রেখেই মালার সেই ভঙ্গি বা অবস্থাগুলো মনে করতে চেষ্টা করে যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে তার পারার ব্যাপারটা। মালার ঘেমে ওঠা দুটো স্তনের মাঝখানে এত জোরে চেপে ধরে মাথাটা যে মালারই বুকের হাড়ে চন্দনের কপাল থেকে ব্যথা লাগে।

—লাগছে! লাগছে! ছাড় না! উঃ

চন্দন উঠে খাটের ধারে বসে। টেবিল ফ্যানের হাওয়াটায় যেন বেশি শীত শীত করে যদিও যথেষ্ট গুমোট গরম ছিল তখন। কপালটায় ঘাম জমছিল। হাসনুহানার গন্ধ তোড়ে ঘরে ঢোকে আর চন্দনের মুখে এসে ধাক্কা মেরে দম আটকে দেয় থেকে থেকে। চন্দন হাঁপায়। মালা ঘষটে ঘষটে খাট থেকে নেমে এসে চন্দনের কাছে দাঁড়ায়। মালা শুধু সায়া পরে আছে। চন্দনের চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। ঝুঁকে পড়ে চন্দনের মাথার ওপর।

—আমাকে জল দাও না। বড় পিপাসা লাগছে।

মালা যখন কুঁজোর থেকে জল গড়ায় তখন চন্দন অনুভব করে শুধু দুটো হাঁটু নয়, তার দুটো পা-ই কাঁপছে। যেন সে একের পর এক ম্যাচ খেলে খেলে পা দুটোর আর কিছু ধকল বাকি রাখেনি। পা দুটোতে তাও কাঁপুনি আর ভারি, টনটনে, নীচের দিকে টেনে নেওয়া ব্যথা। হতে পারে। কিন্তু ওই জায়গাটা অসাড়। নিঃস্পন্দ। ওখানে কোনও রগ, কোনও স্নায়ু, কোনও পেশি নেই। নিজেরই শরীরের মধ্যে একটা জায়গা চলে গেছে শরীরের নিয়ন্ত্রণ বা স্বেচ্ছা-উল্লাসের বাইরে। হাসনুহানার গন্ধটাই যেন উগ্র। বিরক্ত হয় চন্দন। জল খায়। খেয়ে গেলাস দিতে দিতে বলে,

—বেকার একটা ফুল গাছের গন্ধ। শালাকে কাল কেটে ফেলব।

হাসনুহানা গাছ শিউরে উঠেছিল কিনা কেউ জানে না কিন্তু মালা বুঝতে পেরেছিল যে চন্দন ভুল বকছে।

—গাছ কী দোষ করল? কী বলছ তুমি?

—অ্যাঁ।

—কী বলছ? গাছকে দোষ দিতে নেই। ও ওর মতো ফুটছে ফুটুক না।

—হ্যাঁ। কিন্তু কী যে হয়ে গেল। এতটা পড়ে গেছি আমি?

—ওইসব দেখেছ তো। তাই শরীরটাও কমজোরি। ভেব না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—বলছ?

—বলছি ভেব না। দেখবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। এস, শোও। শোও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

চন্দন ব্যথার পা দুটো টেনে খাটে উঠে বসে। আবার নামতে থাকে।

—কোথায় চললে আবার?

—আসছি।

পেচ্ছাপ করতেই বেরিয়েছিল চন্দন। কিন্তু দাঁড়িয়ে বুঝতে পারল আগে থেকেই পেচ্ছাপটা শুরু হয়ে লুঙ্গিটা ভিজিয়ে দিয়েছে। ভিজে সপসপে লুঙ্গিটা ডান পায়ে ঠাণ্ডা লেপটে যায়। এবার কেঁদে ফেলে চন্দন। ভয় পেয়ে কাঁদছে সে। এরকম অসহায়, ভরসাহীন, পলকা তার নিজেকে কখনও লাগেনি। তার শরীরের মধ্যে একটা বেদখল হয়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে না। চাঁদের আলোয় যখন চন্দন দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, তখন তার থেকেই হাত পাঁচেক দূরে দাঁড়িয়েছিল অটো। এর আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। খুব জোরে না হলেও অনেক জল নেমে মাটিতে মিশেছিল। সেই জলে অটোর গায়ের থেকে হত্যাকাণ্ডের সব ধুলো ধুয়ে গিয়েছিল। চন্দন তাকিয়ে দেখেছিল অটো কী আনন্দে জ্যোৎস্না মাখছে চুপ করে দাঁড়িয়ে। তার গা চক্‌চক্ করছে আনন্দে। আলো পিছলে গড়িয়ে যাচ্ছে বডির ঢাল বেয়ে। চন্দন তার অটোকে বলেছিল বড় আর্তি নিয়ে,

—তুই পারিস না আমাকে সারিয়ে দিতে?

অটো জবাব দেয় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন লজ্জায় তার মুখ দিয়ে কথা সরছে না।

—দেখলি তো, কোনও ঝামেলাতে থাকি না, কিন্তু কীসের থেকে কী হয়ে গেল। ওরকম করে লোককে মারে? মরেই হয়তো গেছে কিন্তু থ্যাঁতলাচ্ছে। খুঁচোচ্ছে। কী যে করছে না করছে...

অটো লজ্জায় যেন মাথা নিচু করে আছে।

—আমাকে শেষ করে দিল দেখলি তো? মুখে বলছে দারুণ করেছ তুমি। তুই না অটো দিয়ে, তোকে দিয়ে রাস্তা না আটকালে...

চন্দনের কথা মুখের আঠায় জড়ায়,

—...ওদের ধরা যেত না। কী হল ধরে? এমন করে মারলি যে ইঁদুরকেও কেউ মারে না। বল্? মারে?

চন্দনের থেকে হাতকয়েক পেছনে দাঁড়িয়ে মালা কথাগুলো শুনছিল। গুঁড়ি মেরে মেরে রাত গড়ায়।

না পারার ব্যাপারটা আরও তিন-চারদিন পরপর হওয়ার পরে ব্যাপারটা চন্দন নন্দকে বলেছিল যদিও শোনার সময় নন্দকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। আনমনা না দেখাবার কথাও ছিল না কারণ নন্দ এমনিতেই ভয়কাতুরে মানুষ, রঙকল বন্ধ হয়ে যেতে যারা আওয়াজ উঠিয়েছিল সেই দলেও ভেড়েনি, আর ঝামেলা বেটা হওয়ার সেটা ডাকাত পড়ার দিনই ঘটে গিয়েছিল। নন্দ এমন ঢংয়ে বিড়ি ধরিয়েছিল যে তার যেন অনেক কাজ, এক্ষুনি ছুটতে হবে।

—আমি বরং তোমার ঘরে গিয়েই কথাগুলো ভাল করে শুনব। একটু ঝামেলায় আছি। কী যে করি ভেবে হদিস করতে পারছি না।

—কিন্তু ঘরে এইসব কথা... ঠিক আছে। এস। তাড়া আছে যখন আটকাব না। আর কথাটা কাউকে বল না।

—ক্ষেপলে নাকি? মরদে মরদে কথা। আর এ কথা কেউ কাউকে বলে নাকি? লোকের যা স্বভাব। বললেই সাতকান করে বেড়াবে।

—তুমি কিন্তু এস নন্দদা। সব লোককে তো আর বিশ্বাস করা যায় না। পুলিস কিছু খুঁজে পায়নি। না?

—কী?

—ওই যে, ডাকাতদের সঙ্গে ছিল।

pathagar.net

—ভোজালি?

—না, না, ভোজালি নয়। শুনলাম চেম্বার-টেম্বারও ছিল। বেপাত্তা হয়ে গেছে।

—কে বলল তোমায়? থানায় শুনলে বুঝি?

—আমার আবার থানায় কে চেনা। এমনি পাঁচ পাবলিক বলাবলি করছে। কানে এল।

—আমি ভাই ওসবের খবরে যাই না। গিয়ে লাভ? হয়তো সাদা মনে জিজ্ঞেস করলাম। তা অন্য লোকের মন তো তত সাদা নয়। কী শুনতে কী বুঝল, মধ্যে থেকে হয়তো র‍্যাঁদাচাঁচানি চলে গেল আমার ঘাড়ে।

—কেউ বলছে ওয়ান শটার ছিল। কেউ বলছে বিলিতি চেম্বার। ঝামেলার মধ্যে হাপিস হয়ে গেছে।

—যাক গে বাবা। যে নিয়েছে সে বুঝুক গে। আমি তাহলে এগোই চন্দন। আর দেরি করলে গাড়ি ফেল করে যাব।

—তা চলছ কোথায়?

—ওই একটু ঘুটিয়ারিশরিফে যাব। দিন বুঝে ওখানে হাত দেখতে বসি। ধান্দা। ধান্দা না করলে চলবে?

—তাহলে যাও। কিন্তু এস। আমি বিশেষ ঘর থেকে বেরচ্ছি না। আজই পায়ে পায়ে এতটা চলে এলাম।

—আসব। বউ ভাল?

—হ্যাঁ গো নন্দদা।

pathagar.net

আর কয়েকটা দিন পরে চন্দন ফের অটো নিয়ে বেরোল। কাজের মধ্যে থাকলে তাও নিজের অস্বস্তির কথাটা কিছু ভুলে থাকা যায়। কিন্তু সেই জায়গাগুলো, একেবারে টাটকা ঘটনার সেই জায়গাগুলো তো রয়েছেই। দেখার ইচ্ছে না করলেও দেখতে হয়। সেই ভ্যাট যেখানে ময়লার ডাঁই-এর তলা থেকে দুটো পা বেরিয়েছিল। ওই তো বাড়ির ভাঙা দেওয়াল যেখানে ট্যাক্সিটা গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল। ওরই তো সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। চন্দনের অটো। তারপর? তারপর সেই চিৎকার, গর্জন, উল্লাস। মাথার মধ্যে বোতাম টিপে কেউ যেন ভিডিও চালিয়ে দেয়,

...বাসের ক্লিনার একটি ছেলে লম্বা একটা ভারি লোহার রড একজনের তলপেটের নীচে ও দু'পায়ের ফাঁকে সোজা নামিয়ে আনে।

—হালার ডাকাতের চোঙা-তবিল সব ফাটাইয়া দে।

যে ছেলেটা এই কাজ করছে সে একটা নোংরা তেলকালিমাখা পাজামা ও ভুসো রঙের গেঞ্জি পরা। বোধহয় সে বাসের তলায় শুয়ে এতক্ষণ কাজ করছিল। এখনও সে কাজ করছে। তার মুখে কোনও ভাবলেশ নেই। খুব মন দিয়েই সে কাজটা করতে চায়। সে পরের লোকটার দিকে এগোয়। এতক্ষণ উপুড় হয়ে ছিল বলে দেখা যায়নি। লোকটার একটা চোখ খুবলে কালো অন্ধকার হয়ে রয়েছে আর রক্ত, দাঁত, ছাল-চামড়া... ছেলেটা আবার রডটা তোলে...

চন্দন রাস্তার ধারে অটো দাঁড় করিয়ে দেয়। ঘামছে। দরদর করে ঘামছে। দেহ থেকে যতটা ঘাম বেরিয়ে গেঞ্জি, জামা ভিজিয়ে দিচ্ছে ততটা ঠাণ্ডা ওর ভেতরে ঢুকে জায়গা দখল করছে। মালার কাছে যাওয়ার ভয়। বুঝতে পারার কথা নয় বলেই প্যাসেঞ্জাররা বুঝতে পারেনি। তারা ভেবেছিল এরকম অটোতে হয়েই থাকে। তেল ফুরিয়ে যায়। ড্রাইভার পেছনের সিটের তলায় নবটা ঘুরিয়ে রিজার্ভ থেকে তেল নিয়ে নেয়। চন্দন জামার আস্তিনে কপালের ঘাম মোছে। হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয় যখন সে ফুটবল ম্যাচের সময় নিত।

—পাইলটের মনে হচ্ছে তবিয়তটা ঠিক নেই।

—না, না, ও কিছু না। জ্বর থেকে উঠেছি তো। একটা চক্কর লেগে গিয়েছিল। দেখি, দাদা, একটু নামুন তো। বাঁদিকের প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে চন্দন হ্যাঁচকা দিয়ে স্টার্ট দেয়। অটো চলতে শুরু করে। প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে ভাইরাল জ্বরের অবধারিত সংক্রমণ ও কার বাড়িতে কে কতদিন জ্বরে পড়েছিল এবং এই জ্বরের ওষুধ নেই; অ্যান্টিবায়োটিকও ফেল মেরে যাচ্ছে তৎসহ ডাক্তারবাবুদের পোয়াবারো ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। বেকারির মোড়ে প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে চন্দন পান-বিড়ির দোকানে গিয়ে একটা ছোটো চারমিনার কেনে। ধরায়। কাশতে থাকে কিন্তু সিগারেটটা ফেলে দেয় না। তার আগে দুটো গাড়ি আছে। এখন ফেরার প্যাসেঞ্জার কম। আগে ও দুটো গেলে সে যাবে। সিগারেটটা আরও জোরে টানে। হু-হু করে কাগজ, তামাক পোড়ে। পেছনের সিটে পা তুলে বসে।

একদিন রাতে ঘরে ফিরে চন্দন শুনেছিল যে মলিনা মাসি এসেছিল।

—আমি না মলিনা মাসিকে বলেছি।

—কী?

—তোমার অসুখের কথা।

—সে কী? এই কথাটা তুমি বললে কী করে?

—মাসি আমার মায়ের মতোন। কী হয়েছে তাতে? মাসি কত ডাক্তারবদ্যি চেনে। তোমার ভালর জন্যেই বলেছি।

pathagar.net

—কী বলল মাসি?

—বলল যে মেয়েদের যেমন গণ্ডগোল হয় তেমন মরদদেরও হয়। কালীঘাটে কী যেন বিশ্বাস না কি ডাক্তার আছে। এইসব হলে লোকে তার কাছে সারতে যায়। খুব ভিড় হয়। মাসি যাবে?

—কবে?

—মাসি বলল এখন খুব কাজের চাপ। লেক পাড়াতে একটা বুড়োকে তো মাসি বরাবর দেখে। তার নাকি এখন-তখন অবস্থা। দিনের আয়ার সঙ্গে ডিউটি পাল্টাপাল্টি করে এরই মধ্যে একদিন যাবে। তোমাকে ভাবতে বারণ করেছে। বলেছে এইসব ব্যামো নাকি চিন্তায় আরও বেড়ে যায়।

—সে না হয় হল কিন্তু হুট্ করে তুমি মাসিকে না বললেই বোধহয় ভাল করতে। কোথাকার কথা কোথায় গড়ায় কেউ বলতে পারে না। ছিল তোমার-আমার ভেতরের ব্যাপার।

কথাটা বললেও চন্দনের মনে একটা আপশোস খচ্ খচ্ করছিল। কথাটা সে নিজেই ওপর-পড়া হয়ে নন্দদাকে বলে ফেলেছে। নন্দদা অবশ্য বিশ্বাসী লোক। সেই কবে থেকে চেনা। নানা মনগড়া ভয়তে নিজে সব সময় তটস্থ হয়ে থাকে। নন্দদা নিশ্চয়ই কথা জনে জনে বলে বেড়াবে না। কিন্তু একদিন যদি মুখ ফসকে কথাটা কখনও বলে ফেলে তাহলে? তাই বা হবে কী করে? নেশা করলে লোকের মুখের আগল খুলে যায়। যা নয় তাই কবুল করে ফেলে। নন্দদা তো আর নেশা করে না। বিড়ি খায়। ওটাকে আবার নেশার মধ্যে ধরে নাকি? নেশা যে কী চন্দন জানে। টুর্নামেন্ট জেতার পর ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বিয়ার খাইয়েছিল। এক গেলাস খেয়েছিল চন্দন। গোড়ায় তেতো আর ঝাঁঝাল ঠেকলেও পরে, হাওয়া লাগাবার সময় বেশ ফুরফুরে লেগেছিল। চন্দনের মনে ছিল সেই প্রথম নেশার আমেজ। অনেক কিছুই ভোলা যায় না।

এরকম টানামানির দিনগুলোর মধ্যেই এক বিকেলে মালা মলিনা মাসির কাছে গিয়েছিল। অটোতে মালাকে বেকারির মোড়ে এগিয়ে দিয়েছিল চন্দন। ওখান থেকে বাস ধরে নেবে ভবানীপুরের। স্ট্যান্ডে অটোটা ভিড়িয়েছে কি ভেড়ায়নি, এগিয়ে এসেছিল নন্দ।

—ঘরে চল। কথা আছে।

নন্দর হাতে বাজার ব্যাগ। কান থেকে চুল বেরিয়েছে অনেক।

—কোনও খোঁজপত্তর আছে? ওষুধ পেয়েছ?

—আগে ঘরে চল তো।

—একটাও ট্রিপ মারিনি। এই তো সবে এলাম। মালা গেল ভবানীপুর।

—চল। ট্রিপ পরে মারবে। কাজের কথা আছে। বড় জরুরি। দেরি সইবে না।

চন্দন ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেনি যে সে কী শুনতে চলেছে। অটোয় নন্দদাকে চড়িয়ে চন্দন বাড়ি ফিরেছিল।

—জানি কথাটা শুনলে তোমার মাথা গরম হয়ে যাবে। কিন্তু কর্তব্য বলে একটা ব্যাপার আছে। তবে তোমাকে আগেভাগেই বলে নিচ্ছি, ভালখারাপ কিছু একটা করে বসলে আমার কিন্তু বড় অনুতাপ হবে।

—বল। কখনও দেখেছ তুমি আমাকে মাথা গরম করতে? শরীরেও দেয় না।

—কথাটা শুনলে কিন্তু মাথার ঠিক থাকা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা তোমার বউকে নিয়ে।

—অ্যাঁ?

—হ্যাঁ, তোমার বউ আর ভিকিকে নিয়ে।

—ভিকি?

—হ্যাঁ, ছেলেটাকে দেখে থেকে আমার বরাবরই কেমন কেমন ঠেকেছে।

—তুমি দেখেছ? বল।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর চন্দন কয়েক মিনিটের জন্যে নন্দকে ঘরে বসিয়ে রেখে অটো নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাসস্ট্যান্ড থেকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে যে ব্যাটারির দোকান, সেখানে। সেখানে ওরা বলল ভিকি দিনতিনেক হল কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে তারা জানে না। ঘরে ফিরে এসেছিল চন্দন।

আর চন্দন যে সময়টা ঘরে ছিল না তখন নন্দ দেওয়ালে ঠেকানো আয়নাটা সরিয়ে বিস্কুটের টিনগুলো নামিয়ে নীচের টিনের ডালা খুলে একটা সস্তার, রঙ ওঠা-ওঠা চেন টানা ব্যাগ নিজের বাজারের থলি থেকে বের করে টিনে ঢুকিয়েছিল। তারপর টিনগুলো যেমন পরপর ছিল তেমন সাজিয়েছিল। আয়নাটা যেমন ছিল দেওয়ালে ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

ঘরে ফিরে চন্দন দেখেছিল নন্দ তিন-চারটে বিড়ি খেয়েছে। আরেকটা ধরাচ্ছে।

—বলল মলিনা মাসির কয়েকটা কাপড় ফেরত দেবে আর আমারও ব্যাপারে একটা খোঁজ নেবে।

—তোমার ব্যাপারে? কী?

অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল চন্দন। মিথ্যে কথার জোগান সবসময় অত সহজে আসে না।

—ওই যে, তুমি বলেছিলে না যে তিন চাকা ছেড়ে চার চাকা ধরতে হবে। মলিনা মাসি তো অনেক লোককে দেখাশুনা করেছে। একজনের না, তোমার গিয়ে ওই মোটর ভেহিকেলস্‌-এ জানাশুনো খুব। সেই ব্যাপারেই...

এরপর আর কথা খুঁজে পায়নি চন্দন।

—নন্দদা, তুমি একবার আমার সঙ্গে যাবে?

—কোথায়?

pathagar.net

—ভবানীপুরে। মলিনা মাসির বাড়ি।

মালা সেখানেও যায়নি। ফেরার রাস্তায় অটো থেকে নেমে গিয়েছিল নন্দ। বলেছিল পরদিন আবার সকাল করেই আসবে। থানা-পুলিসও করতে হতে পারে। তবে সবই দেখেশুনে। বেচাল কিছু না হয়ে যায়। এসব সময় আসল হল মাথা ঠাণ্ডা রাখা। চন্দন ঘরে ফিরে এসে মলিনা মাসির দেওয়া সুটকেসটা খুলেছিল। ওর মধ্যে মালার ভাল শাড়িগুলো রাখা থাকত। ছিল না। পুরনো, বাবার বিয়ের সময়ে পাওয়া একটা মোটা চাদরের টিনের তোরঙ্গে থাকত মালার সামান্য কিছু গয়না। সেগুলো থাকত একটা টফির কৌটোয়। সেটাও ছিল না। গয়না আর ভাল শাড়িগুলো বাদে মালা আর কিছুই নেয়নি যাওয়ার সময়। কী কী নিতে হবে, না হবে সব ভিকি দেখে দেখে মালাকে বলে দিয়েছিল।

আগের সন্ধেবেলাই ভিকি আর মালা দেখেছিল যে নন্দ তাদের দেখেছে। তখনই তারা ঠিক করে যে আর দেরি করা যায় না। করেই বা লাভ কী? এর আগে অনেকবারই যখন ভিকি এসেছে তখন পাড়ার লোকেরা দেখেছে। কিন্তু বাইরে? তাও নন্দর চোখে।

চন্দন সেই রাতে ঘুমোয়নি। একটার পর একটা সিগারেট খেয়েছিল আর ফুরিয়ে এলে হাসনুহানার গোড়ায় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল। ভাত, মাছের ঝোল, তরকারি ছিল। উপুড় করে কুকুরকে দিয়ে দিয়েছিল। সেই রাতে এমন আর কিছু ঘটেনি যা বলার মতো।

সেই রাতেও, অন্য সব রাতের মতোই, চুপ করে জেগে ছিল। অটো।

নন্দ বলেছিল। কাউকে বলবে না বললেও বলেছিল। না বলে পারেনি। তবে হয়তো এমন হতে পারে যে একেবারে প্রথম যাকে বলেছিল তার সঙ্গে হয়তো কড়ার করে নিয়েছিল যে সে যেন আবার অন্য কাউকে না বলে বসে। সেও তখন ভালমানুষের মতো সায় দিয়েছিল নন্দর সঙ্গে। এসব কথা কী বলা যায়, না বলতে আছে? কিন্তু বন্ধুবান্ধবের কানে কথাটা তুলতে সে দেরি করেনি। এরকম করেই কথা চালাচালি হয়, চালান হয়, কথার হাট বসে যায়। আর এই যে হাতবদল হয়ে যাওয়া কথা, এর গায়ে চড়তে থকে রঙ, চুমকি, সূক্ষ্ম মজাদার জরি আর রগড়ের প্রলাপ। একটা মানুষ পুরুষত্বহীন এবং সেই কারণেই তার ডবকাবউ মাথায় হেডব্যান্ড লাগানো লম্বা চুল এক হিরো হিরো নাগরের সঙ্গে কেটে পড়েছে এবং মানুষটি এর ফলে বেঘোরে পস্তাচ্ছে, নেশা করে ভুলে থাকতে চাইছে, আলফাল বকছে অথচ মরদ হলে যা করা উচিত বা করা যায় কিছুই তার ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না—এর চেয়ে জমাটি খবর আর কী হতে পারে? ঘরের লোক, বাইরের লোক সকলকে কথাটা জানানোর দরকার। অন্য কারণেও দরকার। দিনকাল যে বেহেড বেহাল হয়ে পড়ছে, কোনও কিছুই ঠিকঠাক নেই, ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকাটাই ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে—এইসব কারণেও তো চন্দনের কেসটা গোপন রাখা যায় না। সত্যি বলতে, এই অঞ্চলে ডাকাতের কেসটার পর এত বড় একটা ঘটনা কেউ আর মনে করতেই পারে না। আর সব খবরই জোলো, আর কোনও খবরে কোনও চার্জ নেই, ফাল্‌তু। আর তাছাড়া ডাকাতির ব্যাপারটার সঙ্গে এই কেসটাও লটকে রয়েছে কারণ পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলা ওই মানুষটিই সেদিন স্রেফ একটা পাতলা-দুবলা অটো দিয়ে ট্যাক্সিটাকে জব্বর রুখে না দিলে ডাকাতগুলো ধরা পড়ত না।

—শুনেছিস?

—কী গুরু?

—চন্দনের ব্যাপারটা।

—শুনলাম। একেবারে চুলবুলিয়া কেস।

—আমি হলে মাইরি দুটোকেই ফিনিশ করে দিতাম।

—আমিও তো তাই বলি। চোখের ওপর দিয়ে তোর বউটাকে ফুঁসলে নিয়ে গেল আর তুই

বসে বসে ছিঁড়লি? লড়ে যা, তা না বাঞ্চোৎ কুঁই কুঁই করছে।

—কী করবে, ধ্বজো তো। দেখছিস্ জন-মন-গণ গাইলেও দাঁড়াবে না। বউ পালাবে না তো কী করবে! ঘেন্না ধরে গেল।

—তোকে কে বলল?

—কাল, বাসস্ট্যান্ডে রতন বলল। দেখি গুমটিতে ব্যাপারটা নিয়ে উদোম খিল্লি হচ্ছে।

—ভাবছি বলব মালটাকে।

—কাকে?

—চন্দনকে। বলব যা হয়েছে হয়েছে এবার মাথা ঠাণ্ডা করে থানা-উকিল কিছু একটা কর। আবার যদি বলে বসে যে আমারটা আমি বুঝে নেব, আমার কিছু বলার নেই।

—সে দিনকাল আর নেই। তুই শালা কাউকে ভাল বুদ্ধি দিতে গেলি, সে বাঞ্চোৎ বুঝল উল্টো। মধ্যে থেকে তুই গাণ্ডু বনে গেলি।

—সেই তো! মরুক শালা! আমার কী?

—ওকে এখন কে সাইজ করেছে জানিস তো।

—কে?

—মিউচুয়াল ম্যান। ওই এখন চন্দনের জিগরি দোস্ত। একটু সন্ধে বাড়লে আর চন্দনকে দেখবি না। ঠেকের মাঠে অটো ভিড়িয়ে মাল খাবে। তারপর মিউচুয়াল ম্যানের সঙ্গে রাত করে ফিরবে।

—কোনওদিন দেখবি সুমো-টুমোর সঙ্গে অটো ভিড়িয়ে দেবে।

—ওর এখন মরে গেলেই ভাল। কী করবে বেঁচে?

রাতের রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। অটো। অটোতে চন্দন একা। এরকমই ছিল অবস্থাটা কিন্তু চন্দন ধরেই নেয় যে পেছনের সিটে মিউচুয়াল ম্যান বসে আছে তার হাড়জিরজিরে খাঁচার ওপরে কারও দেওয়া একটা পকেট ছেঁড়া বিশাল বেঢপ শার্ট পরে যার একটা খোলা লট্‌পটে আস্তিন আর অন্য হাতটা গোটানো। মিউচুয়াল ম্যানের হয়েই জবাবগুলো দিচ্ছিল।

—মালা না আমাকে এতটুকু টের পেতে দেয়নি। এতটুকুও না। বড় একটা পলিব্যাগে কাপড়গুলো নিয়েছে। বলল যে এগুলো মলিনা মাসি ওকে পরতে দিয়েছিল। সেগুলো নাকি ফেরত দিতে হবে। মলিনা মাসি একটা নতুন কাজ পেয়েছে। খুব ফিটফাট বাড়ি। রোজ সেখানে কাচা, পাটভাঙা কাপড়ে যেতে হয়। তাই অত কাপড় পাবে কোথায়? বলল, আর আমিও তেমন। বিশ্বাস করে গেলাম! আমি কিচ্ছু বুঝতে পারিনি! আর পারবই বা কী করে? বল!

মিউচুয়াল ম্যান জবাব না দিলেও তার হাপরের মতো করে নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দটা শোনা যায়। মিউচুয়াল ম্যান চুপ করে শুনছে। আর একজনও ঠাণ্ডা হতে হতে চুপটি করে শুনে যাচ্ছে চন্দনের কথা। অটো।

—আমি বরং বললাম যে এখানে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে। কখন বাস পাও কি না-পাও তার ঠিক নেই। চল, আমি তোমাকে আরামে নিয়ে যাই বেকারির মোড় অব্দি। সেখানে তো মেলা বাস। একটু দাঁড়াবে কি দেখবে পর পর বাস আসছে। ভালভাবে চলে যেতে পারবে।

—বেকারির মোড়ে গিয়েও তোমার কিছু মনে হয়নি? মানে, কোনও অস্বস্তি, কোনও কিন্তু?

—তা আবার হয় নাকি? তুমি যদি আমার জায়গায় হতে না, তোমারও হতো না। এরকমই হয়। আগের থেকে কিছু বোঝা যায় না!

—তাই হয়। পিঠে চাকু বসে যাচ্ছে কিন্তু তুমি কোনও টের পাচ্ছ না। ঠিক এরকম হয়। অসাড়ে।

—আর জানই তো, এই যে অসুখটা আচমকা ধরে নিল, নিজেকে আর বুঝতে পারি না, মানাতে পারি না—সেটা নিয়েই তো চিন্তায় চিন্তায় ছিলাম। নন্দদা বলল এক হাকিমের কাছে নিয়ে যাবে। গেল কই? তারপর বিশ্বাস বলে সেই ডাক্তার? সব বাজে কথা। কেউ ডাক্তার চেনে না, ডাক্তার থাকলেও চেনে না কিন্তু খালি মিথ্যে বলে। জানলেও নিয়ে যাবে না। আসলে কেউ চায় না যে আমি সেরে যাই। কেউ না। এরপরে আর কারও কথায় বিশ্বাস করা যায়? বল?

—সেই জন্যেই তো আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।

—ঠেকে ঠেকে শিখেছ। আমিও শিখেছি। অথচ মা যদি থাকত আমার এই দশা হতো না। কেন যে ওরকম ফুলে গেল, মরে গেল—কেন? না মরলে চলছিল না। পারতে তো বেঁচে থেকে ছেলেটাকে আগলে আগলে রাখতে। জান তো, ওর বাপ মরার চোট আছে, ফুটবলের চোট আছে, হাঁকডাক শুনলে ঘাবড়ে যায়—এরকম ছেলেকে ছেড়ে চলে যেতে আছে?

—যে মরে গেছে তাকে এসব কথা বলে লাভ? তার কানে কথাগুলো যাচ্ছে?

—কেন শুনতে পাবে না? মরে গেলে কী সব ফুরিয়ে যায় নাকি? তখন তো মনের কথাই চাইলে বুঝে নিতে পারে। কী করছে কে জানে? হয়তো এদিকে মনই নেই। আমি তো মানি মা আছে। ঠাকুরও তো দেখতে পাই না। কিন্তু মানি। ঠাকুর নেই কেউ বলবে? ঠাকুর যদি থাকে তাহলে মাও আছে। কী?

—জানি না।

—জান। সব জান। বলবে না সেটা বল। সব জান তুমি।

—আমাকে দেখলে তাই মনে হয়?

—হয় তো! হয়। সব কথায় তুমি কটা আর কথা বল, চুপ করে থাক। তোমার এই চুপ করে থাকাটার থেকেই আমি বুঝতে পারি যে তুমি অনেক জান। যে জানে সে চুপ করে থাকে। আমাকে তুমি বোকা বানাতে পারবে না।

জবাবে মিউচুয়াল ম্যান কোনও উত্তর দেয় না। চুপ করে থাকে। গাছের কয়েকটা পাতা অটোর ওপরে পড়ে। তারই শব্দ হয়। হয়তো এই শব্দগুলোরও কোনও মানে আছে। কিন্তু চন্দনের কাছে তারা পৌঁছয়নি।

—রাস্তাঘাটে বুঝতে পারি লোকে আমাকে নিয়ে কথা বলছে। একটু দূরে থাকলেও বলছে কিন্তু কাছে গেলেই হয় চুপ মেরে যাচ্ছে বা কথা ঘুরিয়ে নিচ্ছে। বুঝতে পারছি যে আমি ছাড়া এখন ওদের বলার কোনও কথা নেই। এমনভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে যেন কখনও আমাকে দেখেনি।

—এইরকমই হয়।

—বলেই যাবে? একটা লোককে নিয়ে?

—প্রথম দিকটায় তাই হয়। পরে আর বলবে না। বলবে না শুধু তাই নয়, হিসেবেই আর ধরবে না।

—তুমি কী করে জানলে?

—আমারও ঠিক এরকম হতো। আমাকে নিয়ে কথা বলত। আমার যে নামটা চালু হয়ে গেছে, সেটা বলে খেপাত। এখন আর কিচ্ছু হয় না।

—তোমার তার জন্যে ভয় হয়?

—ভয় হতে যাবে কেন? আমি ভয়ের বাইরে চলে গেছি। অনেকদিন।

—আমি যেতে পারব না? ভয়ের বাইরে। ভয়কে ড্রিবল করে ধোঁকা খাইয়ে দিতে পারব না?

—দেখা যাক।

pathagar.net

কথাটা বড় বেশি ছড়ায়। এত ছড়ায় যে সকালে একদিন শেষ রাতের ঘুম ঝেড়ে তাকাকেই চোখে পড়ে দরজায় দাঁড়িয়ে অটোর দাদা।

—কি রে চন্দন। এত কিছু ঘটে গেল আর আমাকে একটা খবর অব্দি দিতে পারলি না?

চন্দন টুল একটা এগিয়ে দেয়।

—বসুন। ঘরদোরের যা অবস্থা।

—না। বসার টাইম নেই। আমি তো কাজে এত ব্যস্ত। এখনই দ্যাখ না, রাস্তায় পার্টির গাড়ি দাঁড়িয়ে। তা আমি কিছুই জানি না। কালকে তোর বৌদি বলল। তাকে আবার বলেছে আর কেউ।

—এমা, বৌদি কী বলল?

—কী আবার বলবে! বলল ছেলেটার এত বড় বিপদ একটা ঘটে গেল, একবার দেখে তো আসতে হয়। বিয়ে তো করেছিলিস। সইসাবুদ ছিল?

—না।

—কী বলব? ফাংশনটাংশনওতো হয়নি। সাক্ষী আছে, সাক্ষী?

—ওই মেয়ের এক পাতানো মাসি আছে। উনি সব জানে।

—ঝামেলা পাকিয়েছিস ভালই। যাই হোক, একবার সময় করে আসিস। কথা বলে দেখব কিছু করা যায় কিনা।

—যাব।

—যাস। আর একটা কথা। খবর পেলাম খুব নাকি নেশাভাং করছিস।

চন্দন জবাব দেয় না। মাথা নিচু করে।

—নেশা করে গাড়ি চালাবি। কিছু একটা ভালমন্দ হয়ে গেলে কিন্তু আমি ফেঁসে যাব। চলি। আসিস।

অটোর দাদা চলে যাওয়ার পর চন্দন অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল। রাতে এত মদ খেয়েছিল যে কিছু খেতে পারেনি। পেটের মধ্যে ভারি একটা ব্যথা হচ্ছে থেকে থেকে, মুখটা বিচ্ছিরি লাগছে আর শরীরে কেমন ঝিম ঝিম ভাব। মদ তখনও শিরায় শিরায় বাসি হয়ে থিতিয়ে রয়েছে। মাথার ভেতরে রয়েছে একটা দম আটকে থাকা পাথর। যেদিকে রাখবে সেদিকেই নেমে যেতে চাইবে। নামতে নামতে ঘুমের মধ্যে আবার ভেসে উঠবে। আর সেখানে ছেঁড়া ছেঁড়া সব স্বপ্নের তুলকালাম খেলা—ডাকাত ধরার চিৎকার, অন্য কোনও অটোতে বসে উড়ন্ত চুলে মালা আর অদৃশ্য একটা অবয়ব কিন্তু তার হেডব্যান্ড দিয়েই তাকে চেনা যায়। একবার এর মধ্যে আবার দেখল পান্নার বাজারের কাছে নতুন যে মেয়েদের বিউটি পার্লার খুলেছে তাতে কাজ করা চীনে মেয়ে দুটো অটোতে উঠেছে। ওর বাঁদিকে আর ডানদিকে। চন্দন বলছে পেছনে সিট খালি। সেখানে চলে যেতে। কিন্তু খালি কোথায়? সেখানেও তিনজন প্যাসেঞ্জার যার মধ্যে একজন নন্দ। এরপরই দেখল মিউচুয়াল ম্যান তাকে হাত নাড়ছে, আর অটোটা দূরে চলে যাচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে মিউচুয়াল ম্যানকে দেখার চেষ্টা করে চন্দন। পারে না। তখন সাইড মিররে খোঁজে। সেখানে একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে। অথচ সামনে তাকালেও সেই গাড়িটাকেই দেখা যাচ্ছে। যে গাড়িটা সামনে রয়েছে সেই গাড়িটাই আবার সাইড মিররে দেখা যাচ্ছে পেছন থেকে এগিয়ে আসছে। ওভারটেক করার চেষ্টা করছে। করে গেলও।

বেকারির মোড়ে বুড়ো নিখিল, তারই রুটে অটো চালায়, বেকার নিজের গাড়িটা ঠেলে পেছোবার সময়ে চন্দনের অটোর ধাক্কা লাগিয়ে দিল। চন্দনের গাড়িটা এক নম্বর। কারণ নিখিল এখন যাবে না, চা খাবে।

—ফাল্‌তু ধাক্কাটা লাগালে। দেখে ঠেলবে তো। গাড়িতে প্যাসেঞ্জার একজন বসে।

pathagar.net

—তা একটু ঠেকেচে তো কী হয়েছে। ওরকম হয়েই থাকে।

—থাকে? নিজে ঠেললে আর বলছ থাকে। যাই হোক, প্যাসেঞ্জার উঠলে তো যাব। গাড়িটা এগিয়ে নাও।

—আগে উঠতে দে তারপর সরবো।

—না, আগেই সরাও। ঝুটমুট মাথা গরম করে দিও না।

দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। অন্য অটোর দুজন ড্রাইভার এগিয়ে আসে। তারা কিন্তু নিখিলকে সাপোর্ট করে না।

—তুমি শালা শুড়্ঢা, ওকে চাপতে গেছ কেন?

—বুড়ো হলে, হারামিপনা গেল না।

এবার নিখিল নিজেই গাড়িটা ঠেলে সামনে এগোয়। এগোবার সময়ে বলে,

—এগোও বাবা। ধ্বজোর গাড়িতে কেন ঘেঁষতে গেলে গো। ধ্বজোর এখন মাথা গরম।

বলতে বলতে হেসে অন্য দুজনকে চোখ মারে। ওরাও হাসতে থাকে। তারপরই চন্দনের মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা চুপ করে যায়। নিখিল কিন্তু থামে না। কয়েক পা এগিয়ে চায়ের দোকানে বসে।

—ছোট করে একটা লেবু-চা দে তো। আবে, এই ধ্বজো, চা খাবি?

চন্দন জবাব দেয় না। চারজন প্যাসেঞ্জার এসে গিয়েছিল। স্টার্ট করে অটো। নিখিল চেঁচিয়ে বলে,

—ধ্বজো! তোর লাক আচে মাইরি, ডাউনে প্যাসেঞ্জার পেয়ে গেলি। এই শালা ধ্বজো।

—এটা কিন্তু ঠিক করছ না নিখিলদা। কখন লোড হয়ে থাকবে। তখন ঝামেলা হয়ে যাবে।

—চাপ তো। আমি কি কিছু মনে করে বলেচি? ধ্বজোকে ধ্বজো বলব না তো কী বলব?

'ধ্বজো' ছাড়া অন্য নামও দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। কেউ বলত 'সাড়ে ছটা'। কেউ বলত 'ব্যাটারি ডাউন'। যারা কিছু বলত না, তারা হাসত। এর সঙ্গে রটতে থাকছিল নানারকম বানানো কিস্‌সা। সবই নাকি কোনও না কোনও সময়ে চন্দন কাউকে বলেছে। রগরগে সব গল্প যার মধ্যে যৌন অপারগতা নানা চেহারা নিয়ে হাজির। এমন সব কথা যে শুনে আর চুপ করে থাকা যায় না। মুখে আনতে হয়। চন্দন একদিন তাড়াতাড়ি ট্রিপ চুকিয়ে বাড়ি ফিরে কী দেখেছিল? হেডব্যান্ড আর মালা তখন কী পরেছিল? চন্দন অর্থাৎ ধ্বজো তখন কী করল? চন্দনের এরকম হল কেন? বিয়ের আগে চন্দন কোথায় যেত? চন্দনের মা-র স্বভাবচরিত্র কী ভাল ছিল? বলত তো আয়ার কাজ করে, কিন্তু সত্যি সত্যি তাই করত কী? একেক গল্পের এক এক ধারা। ফুটবলের চোট থেকে চন্দনের কী ওরকম হতে পারে? চন্দন মালটাকে কোথা থেকে জুটিয়েছিল? ওদের কী ঠিক ঠিক বিয়ে হয়েছিল? এরপর রটতে থাকল ওই মেয়েটাকেই কতজন কী কী জায়গায় কোন কোন অবস্থায় দেখেছে? তারাই বা কী কারণে ওই সব আজেবাজে জায়গায় গিয়েছিল? ওই কারণে নয়, কেউ গিয়েছিল কাজে, কেউ গিয়েছিল ব্যবসায়, কেউ বা আত্মীয়বাড়ি আবার কেউ কেউ নিষিদ্ধ সেই জায়গায় গিয়েছিল বেপাড়ার বন্ধুদের নিছক সঙ্গ দিতে ইত্যাদি ইত্যাদি। মেয়েটাকে ট্রেনে অনেকে দেখেছে। দমদম, আকরা ফটক, মুকুন্দপুর, তিন নম্বর গেট, শেয়ালদা, কালীঘাট, খিদিরপুর, জানবাজার, বেহালা—কোথায় মেয়েটাকে দেখা যায়নি? আর হেডব্যান্ড? হেডব্যান্ড বড়লোকের ছেলে। বাড়ি পালিয়ে সিনেমায় নামতে বম্বে চলে গিয়েছিল। হয়নি। ফিরে এদিক-ওদিক ফিকির করে শেষে পুরোদস্তুর দিওয়ানা। হেডব্যান্ড ছুকরি সাপ্লায়ারদের গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িত। হেডব্যান্ড জেলে ছিল। হেডব্যান্ড নাকি আগে থেকেই মেয়েটাকে চিনত। ওই নাকি মেয়েটাকে টোপ বানিয়ে চন্দনকে গিলিয়েছিল। হেডব্যান্ড পুলিসের ইনফরমার। হেডব্যান্ডকে বাইক চালাতে দেখা গেছে।

হেডব্যান্ড হেরোইনের কারবার করে। কোনও কোনও টুর্নামেন্টে চন্দন নাকি টাকা খেয়ে গোল করেনি। চন্দনের খেলাটা হতো কিন্তু হল না ওর ট্যাবলেট খাওয়ার জন্যে। চন্দন কোরেক্স খায়। চন্দন কোকাকোলায় বড়ি গুলে খায়। চন্দন অনেকদিন ধরেই পাতাখোর। চন্দনের সঙ্গে অটোর দাদার বউয়ের নটঘট ছিল। কেস এমন গড়ায় যে অটোর দাদাই শেষে ধরে বেঁধে মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে দেয়। এই করে সংসারটা রক্ষা পেয়ে গেল, কিন্তু অটোটা চন্দনের হয়ে গেল। না দিয়েও উপায় ছিল না। তা না হলে চন্দন অটোর দাদাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারত। অটোর দাদাও লোক সুবিধের না। অটোর দাদা নাকি অটো চন্দনের নামে লিখে দিয়েছিল। এই এত এত কথা ও কথার সুতো ধরে কথার ঘুড়ি ওড়ানোর মধ্যে কোথাও কিন্তু মিউচুয়াল ম্যানের সঙ্গে চন্দনের সম্পর্কের উল্লেখ ধরে কোনও কাহিনি গড়ে ওঠেনি। কারণ সব হিসেবের বাইরে যে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে, এতটা সাহস বা হিম্মত যার হয়, তার সম্বন্ধে লোক বলতে সবাই যাদের বোঝে, তাদের কোনও উৎসাহ থাকে না।

বাসের আড্ডার ওখানে সবাই চন্দনকে দেখলেই আওয়াজ দিত। অটোর লাইনেও দিত। একেবারে সামনে পড়ে গেলে হয়তো বলত না, কিন্তু কয়েক পা এগোলেই আওয়াজ উঠত। এ ব্যাপারে অন্য ব্যবস্থাও নিয়েছিল তারা। বাসের গুমটিতে একটা জড়বুদ্ধি কিশোরও রোজ এসে জোটে। কেউ বিস্কুট-চা দেয়। কেউ কিছুই না। ওকেও চন্দনকে দেখে 'ধ্বজো' বলতে শিখিয়েছিল ওরা। আর ও শব্দটা উচ্চারণ করত, একটু জড়ানো জিভে হলেও, একেবারে চন্দনের সামনে এসে। বেপরোয়াভাবে কাছে এসে। ও বলত, আর অন্যরা মজা পেত, হাসত।

খেপানোর এই দলে নাম লেখায়নি এরফান। অনেকদিন এমন হয়েছে যে, দুপুর বিকেলের দিকে গড়িয়ে যাওয়ার সময়ে নেশায় চুরমার চন্দন খেতে এসেছে টলতে টলতে। ঠাণ্ডা কাঁটা কাঁটা কিছু ভাত পড়ে আছে ফেন গালার ঝুড়িতে। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কিছুটা তরকারির তলানি। এরফানই ওকে বলেছে,

—এমন করে শরীরটা শেষ করে কোনও লাভ আছে?

—কী হবে রেখে?

—হবে। হবে। লাইফের খেল তুমি ভাবছ খতম। কিন্তু কখন যে কী হবে, কেউ জানে না। এভাবেই পড়ে পড়ে মার খেলে চলবে?

—কী করব তাহলে?

—দাঁড়াও। বলছি। তার আগে ভাবছি তোমাকে কী খেতে দেওয়া যায়। তুমি অল্প ভাত দিয়ে তরকারিটা খাও, আমি একটা ডিমের মামলেট বানিয়ে দিই।

—তুমি না এরফান খুব যত্নআত্তি কর। কেউ বলে না। শুধু খেপায়। ধ্বজো! ধ্বজো!

—ও কুকুর কুকুর ডাক ডাকবে। কানে না তুললেই হল। মা কালীকে ডাকো। আল্লা তো মানো না। যাকে মানো, তাকেই ডাকো। দেখবে চাকা ঘুরবে। এখন যেমন দাঁড়িয়ে গেছে দেখছ, তেমন থেমে থাকবে না।

—ঘুরবে? এরফান।

—ওর বাবা ঘুরবে। এই আমার কথাই ধর না। কত খরচ করে হোটেলটা দাঁড় করিয়েছিলাম। ওই শালা বুলডগবাজার দিয়ে সব গুঁড়িয়ে একেবারে ভুঁইতে মিশিয়ে দিল। কিচ্ছু রাখল না।

—জানি তো!

—তা পারল আমার আশমানতারা হোটেলকে মারতে? পারল? এখন এমন কৌশল করেছি যে, কিচ্ছুটি নকড়া করার জো নেই। ভ্যানে সব চড়িয়ে নিয়ে আসি। আবার নিয়ে যাই। কর, কী

করবে?

—হোটেল খুব ভাল চলছে।

—তোমাদের দয়ায়। থানার মেজবাবু সেদিন জিপ থামিয়ে বলে গেল, জবর ফন্দি করেছিস এরফান, তোর হবে।

—তা তুমি কী বললে?

—বললাম, আপনারা একটু ক্ষমাঘেন্না করলে গরিবের জীবনটা বেঁচে যায়। বলল, চালা, এরকমই চালা।

—বলল?

—বলল।

—ওরাও তো বোঝে। কেউ খেটে খেতে চাইছে।

—আর বলা তো যায় না, কালই হয়তো এসে বলবে এরফান, নে। পাততাড়ি গোটা। এখানে আর হোটেল বসবে না।

—তখন কী করবে এরফান? যদি বলে?

—আরেক চুলোয় গিয়ে হোটেল ভিড়িয়ে দেব। আরে বাবা যারা কাজের লোক, তাদের তো পেটে দুটো দিতে হবে! এ বাবা আল্লার নিয়ম। ওই নিয়ম যদ্দিন থাকবে এরফান বেঁচে থাকলে আশমানতারা হোটেলও থাকবে।

চন্দন উঠে কয়েক পা এগিয়ে জগ থেকে জল ঢেলে হাত মুখ ধোয়। টলছে। বুক পকেট থেকে ঘামে ভেজা টাকাগুলো এক টানে বের করে। কয়েকটা নোট পড়ে যায়। এরফান কুড়িয়ে তুলে দেয়। একটা বাস ব্যাক করছে। তার কন্ডাক্টর বাসের বডির পেছনে থাবড়াতে থাবড়াতে চেঁচায়, ‘ধবজো! এই অটো ধবজো!’ চন্দন দাম মেটায়। এরফানের মুখের দিকে তাকায়। এরফান হাসে,

—বললাম তোমাকে, কুকুর তো। ডাকুক গে। ডেকে ডেকে মুখ ব্যথা হয়ে মরুক। একেবারে শুনবে না।

—এরফান, আশমানতারা হোটেল যুগ যুগ জিও। চন্দন আর অটো যুগ যুগ জিও। বল!

—ভাল বলেছ। এখন কি ট্রিপ মারবে?

—একটু রেস্ট করে নিয়ে বেরোব। ট্রিপ না মারলে চলবে?

বিস্কুটের টিনের ওপরে বিস্কুটের টিন। তার ওপরে ধুলো পড়া আয়না, দেওয়ালে ঠেকিয়ে দাঁড় করানো। আয়নায় লেগে আছে প্লাস্টিকের দুটো টিপ। চিরুনি। তাতেও চুল জড়িয়ে আছে কয়েকটা। চন্দন এসে দিন থাকতে থাকতেই ঘুমিয়ে পড়েছে অকাতরে। প্লাস্টিকের ছোট্ট পাশ তোলা খাটের মধ্যে শুয়ে রয়েছে মাত্র অল্প কয়েকদিন ব্যবহার করা সাবান। শুকিয়ে গেছে কিন্তু খুব কাছে নাক নিয়ে গেলে গন্ধটা না পেয়ে উপায় নেই। পাউডারের কৌটো। ওপরটায় এত ধুলো পড়েছে যে, বোঝার উপায় নেই যে রঙটা ওই জায়গায় আসলে সাদা। আলতার একটা শিশি। তার পাশে জড়ানো কালো চুলের ফিতে আর কাঁটা। একটা আধখোলা সস্তার লিপস্টিক শোয়ানো রয়েছে। দিনের আলো গুটিয়ে গুটিয়ে দরজা দিয়ে নীরবে বেরিয়ে যায়। বাইরে বিকেল ছিল। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঝুপসি জমতে শুরু করেছে। ঝুপসি হল কম আলো কিন্তু ঠিক অন্ধকার নয়। চন্দনের মুখটা একটু ফাঁক। ঘরের কোণে কুঁজো। পুরনো জল তাতে। পাতালের ঠাণ্ডায় সেজে চুপ করে আছে। এরকম করে বেশ কয়েকটা মাস কেটে যেতে পারে। সন্ধে ছড়াতে শুরু করলেও এই অবেলায় চন্দনকে ঘুম থেকে ডেকে দেওয়ার কেউ নেই। দিন বা মাসের হিসেব কেউ রাখেই না এই ঘরে। চন্দন ঘুমের মধ্যেই কিছু দেখে। এই অবেলায়। তার ঠোঁট, চোখের নীচের দিকটা একটু একটু কাঁপে।

সামান্য নড়ে ওঠে, আবার থেমে যায় তার হাতের আঙুল। চন্দনের মাথাটা একদিকে হেলে রয়েছে। লালা গড়াচ্ছে ঠোঁটের কোণা থেকে। বাইরে চুপ করে জেগে আছে। অটো।

এরকমই একটা বিকেলে নন্দ এসে চন্দনকে ঘুম থেকে উঠিয়েছিল। নাড়া খেলে হতভম্বেরা যেমন সাড় ফিরে পায় তেমনই চন্দন ফিরে এসেছিল তার ঘরে। নন্দ দাঁড়িয়ে আছে। চন্দন উঠে বসেছিল।

—তোমাকে খবরটা দিতে এলাম। যে মেয়েটাকে বিয়ে করেছিলে সেই মেয়েটার, মানে তোমার বউয়ের বাচ্চা হবে। নিজের চোখে দেখলাম। মাথায় ফিতে বাঁধা ছেলেটার সঙ্গে এসেছিল। মাতৃসদনে দেখাতে। দেখে তো মনে হল খুব আর দেরি নেই।

কয়লার মতো রাত থেকে,
দিনের সূর্যের আলোয়,
বেরিয়ে আসে অটো।
তাই কী তার মধ্যে আছে
কিছুটা কালো ও বাকিটা হলুদ?
এখানে কী পাওয়া গেল
বাঘের সঙ্গে একটা মিল?
ছোট হলেও গজরায়,
গুঁড়ি মেরে চলে,
হোক না তিনটে থাবা,
বাঘেরই সামিল।

pathagar.net

আগের মতোই নন্দ চন্দনকে আসল খবরটা ছাড়াও আরও কিছু কিছু তথ্য দিয়েছিল।

—জানই তো পাড়া-বেপাড়ায় ঘোরাঘুরি তো আমার লেগে থাকেই। ওরা এখন গিয়ে উঠেছে তোমার ওই ছায়াঘর সিনেমার কাছে। চেন? চিনবে তো বটেই।

চন্দন মাথা নেড়ে বোঝায় যে সে চেনে।

—তা ওই ছায়াঘরের লাগোয়া যে পেট্রল পাম্পটা আছে, তার গায়ে গায়ে দেখবে তিন-চারটে গ্যারেজ। আর তার পাশেই একটা ব্যাটারির দোকান। বেশ বড়। ওখানেই ছোঁড়াটা কাজে লেগেছে এখন।

চন্দন শুনে যায়। জবাব দেয় না।

—আমি এগোই। বউবাজারে যাব। দ্যাখো না কী হ্যাপা। সে একজনকে বলেছিলাম পলা ধারণ করতে। ভাল হবে। সে এখন ধরে বসেছে। বলছে কী কিনতে কী কিনব, চোর-ছ্যাঁচোড়ের হাতে ঠকে মরতে হবে। তা কাকা, তুমিই যখন এতটা বললে তখন পাথরটাও তুমি কিনে দাও, আমি গাড়ি ভাড়া দেব। সেই সন্ধানে এখন যাব। পরের টাকা পকেটে। কখন কী হয়ে যায়। দিনকাল তো ভাল নয়।

চন্দন চুপ করে থাকে। নন্দ বিস্কুটের টিনগুলো দেখে। আয়না দেখে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নেয়।

—তা কী ভাবতে বসলে।

—কিছু না।

—হ্যাঁ, সেই না কথা। ভেবে তুমি কী করবে? পাগলের খেলা চলেছে, বুঝলে। ঘোর কলি। আমিও কি বুঝি না? ভয় হয়, কেবল ভয় হয়। খালি মনে হয় তলা থেকে মাটি সরছে। তবে ওই

তারকব্রহ্ম নাম করি। ভরসা দেওয়ার আর কিছু আছে। চলি গো। পরে কথা হবে।

—আচ্ছা।

নন্দ চলে যায়। চন্দন উঠে বাইরে এসে দাঁড়ায়। হাসনুহানা গাছের গোড়ায় তিন-চারটে কালো বোতল পড়ে আছে। লেবেল উঠে গেছে। গাছটা চারদিকে ছড়িয়ে ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে। প্রায় মাটি ছুঁই ছুঁই। দাঁড়িয়ে আছে। অটো। অটোর কাচে ধুলোর পরত। সেই দিকে এগিয়ে যায় চন্দন। দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে। ধুলোর মধ্যে দিয়েই নিজের ছায়া দেখে চন্দন। পাশের বাড়ির উঠোনের বড় নিম গাছে সুর করে হলুদ পাখি ডাকছে।

চন্দন অটোর কাচের গায়ে ধুলো কেটে কেটে দাগ দেয়। একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা—এই ক'টা মাস সে আন্দাজ করতে পারে। তবে ভুল বোধহয় থেকে গেল। তার আগে তো ডাকাত পড়েছিল। লম্বা একটা টানা দাগ দেয়। মালার যে বাচ্চাটা হবে সেটা তার। ভিকির নয়। নন্দ তো বলে গেল যে খুব বেশি দেরি নেই। অবশ্য নন্দ কী সব কথা ঠিক বলে? আর নন্দই সব জানতে পারে। জানতে পারে আর এসে বলে যায়। হঠাৎ ঘামতে শুরু করে চন্দন। খবরটা চন্দনকে দেওয়ার আগে নন্দ কাউকে বলেনি এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। অথচ নন্দকে জিজ্ঞেস করলে ঠিক বলত যে, এসব কথা চন্দন আর তার মধ্যে একান্তই গোপন। বলবে, এ সব কথা কী বলা যায়? চন্দন হাত দিয়েই সবগুলো দাগ মুছে দেয়। হাত কালো হয়ে যায়। হাতটা দেখে চন্দন। এই হাতটা আর বাঁ হাত—দুটোই দেখেছিল নন্দ। তার জীবনটা যে তছনছ হয়ে যাবে অ্যাক্সিডেন্টে, কিছুই বলতে পারেনি। তিন চাকা থেকে চার চাকাতেও ওঠার কোনও কারণ নেই। আর সেটা হলেই কি ভাল হতো? খুব আনন্দ পেত চন্দন? তখন কী করত, কীভাবে কার হাতে থাকত? অটো?

—এই হয়। দুর্দিনে পড়লেই লোকে সুদিনের কথা ভুলে যায়। কিন্তু বাচ্চাটা আমার। ডাকাত পড়ার আগে থেকে ধরে বাচ্চাটা আমার। আমার।

অটোর গায়ে নোংরা। পানের পিক ফেলেছিল কেউ। ইচ্ছে করেই। সেটা শুকিয়ে আছে। রাতে, মিউচুয়াল ম্যানকে নিয়ে ফেরার রাস্তায় ওভারটেক করে চলে গিয়েছিল বিশাল সি টি সি-র বাস। বাসের ড্রাইভার মাথা বের করে চেঁচিয়েছিল,

—এই শালা মুড়ির টিন!

আর সেই সঙ্গে রাস্তার খোঁদলে বাসের পেছনের চাকা পড়ায় কাদাজল এসে ভরে দিয়েছিল অটো, মিউচুয়াল ম্যান, চন্দনকে। সেই জল শুকিয়ে আছে। চন্দন গিয়ে যদি দাঁড়ায় একবার! একেবারে কোনও মদটদ না খেয়ে! সোজাসুজি। ডাকাতের ট্যাক্সির সামনাসামনি চলে গিয়েছিল না হয় না বুঝেই। কিন্তু হিসেবের জোরে, অটোর কাচের ধুলো কেটে কেটে দেওয়া দাগগুলোর জোরে, চন্দন যদি গিয়ে হেডব্যান্ডকে বলে যে বাচ্চাটা তার ; তার, তার, তারই বাচ্চা হতে যাচ্ছে মালার, তাহলে ভিকি মানে ওই হেডব্যান্ড আর লম্বা চুল কী বলবে? বেইজ্জত হয়ে যেতে হবে না তাকে? একটা বাচ্চা পয়দা করা কি চালাকি নাকি? এটা-ওটা পড়িয়ে একটা মেয়েকে নিয়ে যাওয়া আর দায়দায়িত্ব নিয়ে একটা বাচ্চা বানানো—দুটোর মধ্যে একটা বিরোধ দাঁড় করিয়ে দ্বিতীয় প্রস্তাবনাটিকে নাকচ করার চেষ্টায় ধন্দে পড়ে যেতে হয়। যাই হোক, বাচ্চাটা তার। আর অটোর দাদা যে বলেছিল, বসে, ভেবেচিন্তে কথা বলে দেখবে। সেটাও তো যাওয়া হয়নি। এত ঝামেলা যার মাথায়, সে যদি কেবল মদ খায় আর মদ খেয়ে খেয়ে লিভারটাকে ড্যামেজ করে, তাহলে কী করে কী হবে? সিগারেটের ধোঁয়ায় পেট ভরবে? খিদে মরতে পারে বড়জোর কিন্তু সেই সঙ্গে তো দমটাও চলে যাবে। স্ট্রাইকারদের যদি দম মরে যায়, তখন কি তাদের খেলাটা বাঁচে?

চন্দন বালতির জলে হাত ধোয়। মুখ ধোয়। হাতের নোংরাগুলো ধুয়ে গিয়ে রেখাগুলো স্পষ্ট

হয়। এদেরই দেখেছিল নন্দ। বলে কিনা তোকে ছেড়ে দিতে হবে। চন্দন আড়চোখে দেখে নেয়। অটো।

আর স্ট্রাইকারে যে খেলবে সে কি শুধু অফ-সাইড লাইনের কাছেই এলোমেলো হেঁটে বেড়াবে কখন ওপর দিয়ে বল আসবে সেই আশায়? এটা কি বুদ্ধির কাজ। কত নাম করা করা স্ট্রাইকার তো এই ভুল করে খেলায় এলেবেলে হয়ে গেল। তাকেও কি নেমে গিয়ে ডিফেন্সকে সাহায্য করতে হবে না? বা একেবারে নেমে গিয়ে ওয়ান টু করে বল নিয়ে উঠে আসতে হবে না? ছেড়ে দেব?

অটোর দিকে তাকায় চন্দন। নোংরা, ভূত হয়ে বসে আছে। এই গাড়ি দেখলে প্যাসেঞ্জার চড়বে? চড়তে চাইবে? ভাল ভাল সব জামাকাপড় পরে লোকে কত জায়গায় যাচ্ছে, সেখানে আবার দশটা লোক আসছে, কেউ চাইবে নোংরা গাড়িতে চড়ে কাপড়জামায় দাগ লাগাতে? এরকম হয় নাকি? ভিকিকেই আগে বলে দেওয়া যাক তবে। যা করেছ করেছ, এখনও টাইম দিচ্ছি, সরে যাও। কিন্তু সেই মালাকে নিয়েই আবার এই ঘরে ফিরে আসা? সেই চেনা পাড়া, সবাই জানে সব কিছু, এটাও অবশ্য জানে এরকম হতে পারে, হয়েই তো থাকে। কিন্তু মালা কি পারবে ফের এখানে এসে থাকতে? চন্দন তাকায় প্রশ্নটা মনে নিয়ে। চুপ করে থাকে। অটো।

আর নন্দদা! সে তো কথাটা নির্ঘাত আগে থেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছে। হয়তো বলতে বলতেই এসেছে। এরপর কী হবে সেটাও তো জানে চন্দন। বুড়ো নিখিল, লোকটার অবশ্য মনে কোনও খারাপ নেই, বলবেই যে ধ্বজো এখন আর ধ্বজো নয়, সওতেলা বাপ? কয়েকদিন আগে চন্দন অটোর যে কাচটার গায়ে দাগ কেটে কেটে মাসের হিসেব করছিল সেখানেই না ধুলো আঁচড়ে কেউ লিখেছিল—'ধ্বজো'। এইরকম যেখানে বারবার সেখানেও বাচ্চার ব্যাপারটা শুনলে কি ওরা চুপ করে থাকবে? এরফান হয়তো কিছু বলবে না বা বলার জন্যে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করবে, মিউচুয়াল ম্যান তো কিছুই বলতে গেলে বলে না কিন্তু অন্যরা? তারা চুপ করে থাকবে কেন? চায়ের দোকান, মাঠের মালের ঠেক, বাসের গুমটি, পান-বিড়ির দোকান ছাড়িয়ে ছাপিয়ে কথা উড়ে চলে যাবে পাল্লার বাজার, চলে যাবে সেই গয়নার দোকান যেখানে ডাকাতি করতে এসেছিল ওরা। ওফ্ ওরকম করে কী মানুষকে মারতে আছে? কেউ থেমে থাকবে না। বাস থেকে কন্ডাক্টররা রড ধরে ঝুলতে ঝুলতে চিৎকার করবে। অটোর ড্রাইভাররা চেঁচাবে। তালে তালে হর্ন বাজাবে। 'ধ্বজো, ধ্বজো'। এবার নতুন আর কী কী বলতে শুরু করবে ওরা? সওতেলা বাপ তো বলবেই। আর কী বলবে? কে বলতে পারে। পারবে? অটো?

চন্দন বাইরে রাখা ড্রাম থেকে বালতি ডুবিয়ে জল তোলে। নিয়ে গিয়ে অটোর ওপরে ঢালে। অনেকদিন পরে অটোকে স্নান করায়। অটোর গা-টা রগড়াবে বলে ভেতরে কাপড় খোঁজে। লাল একটা জালি জালি কাপড় ছিল। সেটা খুঁজে পায় না। পেছনের সিটের পেছনের খোঁদলের ভেতরেও নেই। সেখানে ফাঁকা একটা টিন, তিনটে কালো বোতল, পান পরাগের ফাঁকা প্যাকেট। সিটের তলাতেও নেই। চন্দন ঘরে যায়। মা-র আমল থেকেই ছেঁড়া চাদর, কার্যত সব বিস্কুটের টিনের মধ্যে ভরা থাকত। আয়নাটা নামায় চন্দন। আয়নার পেছনে একটা মাকড়সা ছিল। লাফ মেরে দেওয়ালে চলে গেল। আয়নাটা খাটের ওপরে নামায়। ওপরে যে টিনটা ছিল তার ডালা খুলে ভেতরে হাত ঢোকায়। বেশিরভাগটাই ফাঁকা। ভাল থাকবে বলে সুতলি দিয়ে বাঁধা ঠোঙার মুড়ি বোধহয় মালাই রেখে থাকবে কখনও। ঠোঙাটা ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেয়। ফেটে মুড়ি বেরিয়ে ছিটিয়ে পড়ে। ইলাস্টিক ছেঁড়া একটা নিচের জামা। কয়েকটা ব্লাউজ। সেগুলোও ছেঁড়া। রঙ জ্বলে যাওয়া। খালি টিনটা পা দিয়ে ঠেলে দেয় চন্দন।

পরের টিনটার ডালা বড় শক্ত চেপে বসানো। চামচের গোড়া দিয়ে চাড় মেরে খুলতে হয়।

এটার মধ্যে মা-র রাখা পুরনো কাপড় থাকার কথা। পুরনো পুরনো গন্ধ। হাত ঢুকিয়ে চন্দন একটা কাপড় টেনে বের করে। মা-র একটা শাড়ি। বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। মধ্যে অনেকটা জায়গায় আড়াআড়ি ফেঁসে যাওয়া। আবার হাত ঢুকোয়। হাতে কিছু ভারি লাগে। বের করতে যায়। লম্বালম্বি থাকায় বেরোয় না। আড় করে বের করতে হয়। সস্তার একটা রঙ ওঠা চেন টানা ব্যাগ। বেশ ভারি। ব্যাগটা চন্দন কখনও দেখেনি। বাজে সিন্থেটিক ছাঁট দিয়ে তৈরি। খাটে বসে চেনটা টেনে খুলেছিল চন্দন। একটা পিস্তল আর চারটে বুলেট ছিল। জিনিসটা লম্বাটে। এবড়ো-খেবড়ো নল। হাতলটা পালিশ না করা কাঠের। কানট্রি মেড। ওয়ান শটার। ট্যাক্সির পেছনের সিট থেকে ডাকাত দু'জনকে যখন নামানো হয় তখন নন্দ দেখেছিল ব্যাগটা পায়ের কাছে পড়ে আছে। নন্দ ভেবেছিল ওর মধ্যে টাকা বা গয়না আছে। পরে খুলে দেখেছিল অন্য জিনিস।

ভরদুপুর। ছায়াঘর সিনেমার লাগোয়া পেট্রল পাম্পের গায়েই দু-চারটে দোকানের মধ্যে ব্যাটারির দোকানের উল্টো ফুটে দাঁড় করিয়েছিল চন্দন। নিজে অটো থেকে নামেনি। অটোই হর্ন দিয়ে ডেকেছিল। তিনবার। দোকানের লোকেরা তাকিয়েছিল। হেডব্যান্ডও তাকিয়েছিল। তাকে হাত নেড়ে ডেকেছিল চন্দন। মোটের ওপর ফাঁকাই রাস্তা। কিন্তু একটা লরি গেল। তারপর হেডব্যান্ড রাস্তা পেরিয়েছিল। একবার ঝাঁকানি দিয়ে চুল ঠিকও করেছিল। বেশি কথা হয়নি। হেডব্যান্ডই প্রথমে বলেছিল,

—কী চাই এখানে?

—মালার বাচ্চা হবে।

—তো?

—বাচ্চাটা আমার।

হেডব্যান্ড মুচকি হাসে,

—ধবজোর বাচ্চা হয়?

—হয়।

চন্দন উত্তর দিতে দিতেই অটোর হ্যান্ডেলে লাগানো পয়সা রাখার ব্যাগ থেকে পিস্তলটা বের করেছিল। হেডব্যান্ডের বুকে গুলি করেছিল। গুলিটা খেয়ে দু-এক লহমা হেডব্যান্ড দাঁড়িয়েছিল। তারপর প্রায় অটো ছুঁয়ে মুখথুবড়ে পড়ে গিয়েছিল।

দোকানের লোকজন বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু চন্দনের হাতে পিস্তল দেখে চুপ করে যায়। চন্দন পিস্তল ডানহাতে ধরেই বাঁহাতে হ্যাঁচকা মেরে অটো স্টার্ট করেছিল। উপুড় হয়ে পড়ে থাকল হেডব্যান্ড।

কিছুক্ষণ পরেই থানায় ঢুকেছিল। অটো। চন্দন নেমে পিস্তলের নলটা ধরে ঝুলিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। এফ আই আর লেখাচ্ছিল কারা। একজন অফিসার চন্দনের হাতের দিকে খেয়াল না করেই বলেছিল,

—কী ব্যাপার তোমার?

চন্দন পিস্তলটা টেবিলে শুইয়ে রেখেছিল।

—মার্ডার করে দিয়েছি স্যার। এই পিস্তল দিয়ে। আরও তিনটে গুলি আছে।

পকেট থেকে গুলিগুলো বের করে এক এক করে টেবিলে রেখেছিল।

এরপর, থানার পেছনে, দেওয়াল ঘেঁষে, অনেকদিন চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। অটো।

pathagar.net

pathagar.net

এক

রাত এগারোটা। আকাশে রোঁয়া রোঁয়া মেঘ। বেহদ্দ ভ্যাপসা গরম। বাস বা অন্যান্য গাড়ি কম। এরকম ভয়-ভয় টাইমে হাতে সেলফোন নিয়ে একটা পাব্লিক দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করার ফাঁকে বোতাম টিপে টিপে বৌ-কে এস.এম.এস. পাঠাচ্ছিলো। এতই মনোযোগ সহকারে যে তার পেছনে বেঁটে, মোটা, বগলে ব্রিফকেস লোকটা যে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা সে খেয়ালই করেনি। নীরবে বোতাম টেপাটিপি চলছিলো কিন্তু হঠাৎ আনাড়ি হাতের তেরে কেটে তাক্ শুনে লোকটা পেছন ফিরে দেখল বেঁটে, কালো, মোটা লোকটা ব্যাঁকাত্যাড়া ব্রিফকেস বাজাচ্ছে। সেলফোন ঘাবড়ে গেল। বেঁটে লোকটা ফ্যাতাড়ু এবং ফ্যাতাড়ুদের সঙ্গে যারা ঘর করেছে বা করবে-করবে করছে তারা সকলেই জানে ওর নাম ডি. এস.। ডি. এস. হাসলো।

—কিরকম বুঝচেন? সিন-সিনারি!

—অ্যাঁঃ

—এনি টাইম এসে পড়বে।

ডি. এস. আকাশের দিকে তাকালো। মেঘের রোঁয়ার মধ্যে আবছা মুন, তলায় জল থাকলে বলা যেত মুনমুন।

—কী?

—ভ্যামপায়ার!

ভাগ্যে এই সময় একটা আধ-ফাঁকা বাস এসে পড়লো আর সেলফোন তাতে লাফ মেরে উঠে গেল। ঘামছে। বাসের নম্বরটা অব্দি দেখেনি। এটা তার বাস নয়। দু স্টপ পরে সেলফোন নেমে গেল। ফের ফাঁকা। ফের সেই রাত। কই ফাঁকা? যাত্রা-পার্টির মতো ঘাড় পর্যন্ত চুল, রোগা, চোয়াড়ে, ঢ্যাঙা একটা লোক। নোংরা পাঞ্জাবি, তলায় প্যান্ট, হাতে পলিব্যাগে মিষ্টির বাক্স। চারহাত দুর থেকে বাংলা-র মন মাতানো সেন্ট পাওয়া যাচ্ছে। ঢ্যাঙা পাঞ্জাবির পকেট থেকে দুপাটি নকল দাঁত বের করে ঘপাঘপ পরে নিলো আর এটাও পাঠকরা বুঝে ফেলল যে ওর নাম মদন। সেলফোন আড়চোখে মদনকে মাপছিলো। কিন্তু সে ভাবেনি যে মদন বলবে,

—খুলবো?

বলে মদন পলিব্যাগে মিষ্টির বাক্সটা দেখালো। সেলফোন জানে যে বিস্কুট, মিষ্টি, চা এইসবে বিষ মিশিয়ে খাওয়ানোটা আজকাল প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

—জানিনা, শুনিনা—হঠাৎ আপনার বাক্স থেকে আমি মিষ্টি খেতে যাব কেন?

বলেই লোকটা সেলফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে নিল।

—বাক্সটায় মিষ্টি নেই।

—তবে কী আছে?

—ট্যারান্টুলা!

সকলেই জানে যে কিছুদিন আগেই মিডিয়া-মারফৎ ট্যারান্টুলাফোবিয়া সৃষ্টি করার একটি

pathagar.net

চেষ্টা বহুলাংশে সফল হয়েছিল। এবং বাঙালিরা, নিজেরা পোকামাকড়ের সমগোত্রীয় হলেও, এই ফোবিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রভূত কীটনাশক খরিদ করে ফেলে এবং গৃহপালিত নিরীহ মাকড়সাদের যত্রতত্র হত্যা করিতে প্রাগ্রসর হয়। কীটপ্রেমী সংস্থা 'মাকড়বান্ধব'-এর প্রতিবেদন হইতে জানা যায় যে এই মাকড়সামেধ মোস্টলি ঘটেছে পায়খানাতে। বলা যায় না, মিডিয়া হয়তো কালই ছাপিবে ও দেখাইবে যে ভ্যামপায়ারের পাল হয়তো রাত্রে উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া আসিয়া বাঙালিদের ঘামাচি-আক্রান্ত গলদেশে বা গলকম্বলে বসিয়া রক্তপান করিতেছে এবং ভিক্টিম যাহাতে সহসা কাঁচাঘুম হইতে চমকাইয়া জাগিয়া উঠিয়া আর্তনাদ না করে তাই রোমশ ডানার মনোমোহিনী হাওয়ার বশে তাহাকে অবশ রাখিতেছে। এ তো আমরা জানিই যে 'পাগলের হাতে সংসার, দেখ কি হয়'! তবে উড়ুক্কু ভ্যামপায়ারদের ফতে করা সহজ নয়। ইহাই ভরসা। অতএব সাধু নহে, খচ্চর সাবধান! সর্বশক্তিমান মিডিয়ার মাথায় কি কিছু ঢুকিল? 'মাকড়বান্ধব' জানাইতেছে যে মাকড়সার পপুলেশন বাড়িয়াছে। তাহারা ইহাও জানিয়েছে যে নানাবিধ পোকা ও পতঙ্গরা ইহা ভালোভাবে নেয় নাই। মিডিয়া কি ভ্যামাপায়ারদেরও বংশবৃদ্ধি ঘটাইয়া ছাড়িবে? কবে তারা আমাদের/তাহাদের দিবে ছাড়িয়া? মিডিয়া?

চোক্তারদের লিডার মার্শাল ভদির আদেশক্রমে বিশিষ্ট কবি পুরন্দর ভাট গত তিনমাস ধরে 'ভদি-অভিধান' রচনায় মশগুল। ভাটের থিওরি হচ্ছে যখন যে শব্দটি পাওয়া যাবে সেটি লিখে ফেলা—পরে সাজানো হবে। ভদি-পর্দন, ভদি-পাদ ইত্যাদি পেরিয়ে পুরন্দর ভদি-প্রশ্রয়, ভদি-প্রাক্কাল বা ভদি-প্রাদুর্ভাব বা ভদি-প্রাধান্যও ছাপিয়ে উঠেছিল, 'ফ', 'ব'-ও উৎরেছিল। এসেছে 'ভ'। বলাই বাহুল্য যে এর আগে চলে গেছে ভদি-ফক্কা বা ভদি-ফলার, ভদি-বশংবদ বা ভদিবশীভূত। ভদিবসন্তও যেমন এসেছিল তেমনই শীতের হাগতে আসায় গেছে চলে। এল ভদি + ভ। এবারে র‍্যান্ডাম—

যেমন ভদি-ভাব, ভদি-ভাবনা, ভদি-ভোট, ভদি-ভুবন, ভদি-ভাট, ভদি-ভবন, ভদি-ভাণ, ভদি-ভূষণ ইত্যাদি আগেই সে লিখে ফেলেছে। ভ্যামপায়ার ও ট্যারান্টুলার আবির্ভাবের আশঙ্কায় সেলফোন যখন নাস্তানাবুদ, তখনই, লণ্ঠনের ভূতুড়ে আলোয়, মাদুরের ওপরে লুঙ্গি পরে উপুড় হয়ে শুয়ে পুরন্দর লিখে ফেলল,

ভদি-ভয়

দুই

...

বোঝাই যাচ্ছে যে 'মসোলিয়ম' শুরু হয়ে গেছে কিন্তু সিংহ ও সিংহীভাগ পাঠকই ঘাবড়ে গেছে বা হোঁচট খাচ্ছে। পুরোটাই সহজ ও সুপাচ্য হয়ে যাবে 'কাঙাল মালসাট' এবং 'ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক ও অন্যান্য' একটু উল্টে নিলে। 'ফ্যাতাড়ু' নাটকটা দেখা থাকলেও চলবে। অবশ্য কোনোটা না করলেও চলবে। সেইভাবেই চলছে বা সাধারণত চলে। এই ভ্যানভ্যানানি অবশ্যই ট্র্যাজিক। কিন্তু তা কি ভদির ট্র্যাজেডির চেয়েও বেশি?

সেই বিয়োগান্ত পর্বে প্রবেশের পূর্বে, একটি অরণ্য পর্বে না ঢুকে যখন উপায় নেই তখন তাই হোক। কান না পাতলেও শোনা যাচ্ছে সেই রাক্ষুসে ঝিঁঝি পোকাদের ডাক যা একমাত্র

নর্থ বেঙ্গলের ফরেস্ট ও ঝোপঝাড়েই শোনা যায়। সেই সঙ্গে ছিল লাখখানেক জোনাকির যুগপৎ জ্বলে ওঠা ও নিভে যাওয়া। পেত্নিরা মুচকি হেসে উঠলেও ওরকমই লাগে। যাই হোক, ঝিঁঝি ও জোনাকির এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড যখন চলেছে চারদিকে তখন চাপড়ামারি ফরেস্টের মধ্যে একটি কাঠের ঘরে বসে কলকাতার গরচার কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী কারফর্মা ও ফরেস্ট রেঞ্জার মাল খেতে খেতে কাঠের চোরাচালানের একটি মনোরম ফন্দি আঁটছিল। রেঞ্জার, বয়স বেশি নয় কিন্তু সবিশেষ খচ্চর, পেচ্ছাপ করতে বাইরে গেল। ঝিঁঝিরা হঠাৎ চুপ। কেবল পেচ্ছাপের ছড় ছড় শব্দ। কারফর্মার ঝিম ধরেছিল। হঠাৎ একটু বুনো বাঘ-বাঘ গন্ধে সচকিত হয়ে কারফর্মা দেখল বাঘ নয়, তবে বাঘডাঁসা টাইপের একটা জাঁদরেল মাল রেঞ্জারের গেলাস থেকে রাম খাচ্ছে। ছাই-ছাই রঙ, চোখের কোলগুলো কালো, জাঁদরেল গোঁফ। কারফর্মা বলল,

—হ্যাট! হ্যাট! রেঞ্জার সাহেব! রেঞ্জার...!

বিশাল বেড়ালটি মালে ভেজা গোঁফ নিয়ে কারফর্মার দিকে তাকালো। দুটি চোখই জ্বলন্ত হলুদ।

—আসবে না। তুই হাজার চেঁচালেও রেঞ্জার আসবে না।

—আজ্ঞে, আপনি তো বেড়াল তা কি করে...

—একটা থাবড়া খেলেই বুঝবি আমি কি। তোদের ঐ কলকাতার ঘেয়ো মাল নই। মোতাগলিতে চোখে ক্যাঁতোর নিয়ে ঘুরে বেড়াই। বনবেড়াল। ছাদ থেকে রেঞ্জারটার ঘাড়ে পড়লাম, মুতের মধ্যেই ফেন্ট করে গেল। মালটা খেতে দিবি?

—সে আর বলতে, চাট নেবেন?

—কি চাট?

—খরগোশের পিস্, ঝাল করে ভাজা।

—দে, প্লেটটা এগিয়ে দে। খরগোশ তো প্রায় রোজই খাই। তবে কাঁচা। তোদের মতো ভাজাভুজি চলে না। তবে এখন চলবে। ঢাল্?

কারফর্মা সিকিমের রাম ঢালে। ভয়েতে হাত কাঁপে বলে বোতলের মুখ ও গেলাসে ঠুন ঠুন পেয়ালা বাজে।

—ভয়ের কিছু নেই। তুই ভদির চ্যালা মানে আমার আশ্রিত।

—আপনি ভদিদা-কে চেনেন?

—সব বানচোতকে চিনি। ভদির বাবা দাঁড়কাক আমার ওল্ড ফ্রেন্ড। যা বললাম, তুই আমার লোক। কেউ যদি তোকে বাগড়া মারে বলবি। একবার পিঠে একটু থাবা বুলিয়ে দেব, তিনমাস উপুড় হয়ে শুয়ে সারাতে হবে। নখের ধার দেখেছিস?

—উরিঃ শালা!

—এই জানবি। ক্ষুরের কাটা যেমন হয়, স্টিচ হবে না, ডিপ অ্যান্ড নিট।

—আচ্ছা ওই রেঞ্জার ব্যাটা মরেফরে যাবে না তো?

—ধুস্! ওর মরতে ঢের দেরি আছে। ছাড়, আমি চলে গেলেই ওর সেন্স্ এসে যাবে। এবার যা বলছি মন দিয়ে শোন্—পরশু তোর কাঠের ট্রাকটা রওনা দেবে, আমিও ওটাতে উঠে পড়বো। গুঁড়িগুলোর ফাঁকে দড়ি দিয়ে ঠ্যাং বাঁধা গোটা চারেক মোরগা ঢুকিয়ে দিবি। একটা একটা করে রাস্তায় খাব।

—সে না হয় রাখলাম কিন্তু কলকাতায় আপনাকে আমার বাড়িতে উঠতে হবে। আমার বউ গেস্টদের হেভি দেখভাল্ করে। আমি কিন্তু 'না' শুনব না।

—পাগলামি করিস না। কলকাতায় আমার অনেক কাজ, বুঝলি। ভদি একটা বড়ো হুজ্জুৎ লাগাবে। একা দাঁড়কাক কত দিক দেখবে? তবে কোনো এক ফাঁকে তোর বাড়িতে যাবো। কি খাওয়াবি বল?

—সে আপনার যা হুকুম হবে।

—রেওয়াজি খাসি, বুড়ো পাঁঠার বিচি ফ্রায়েড আর রয়্যাল চ্যালেঞ্জ।

—এ এমন একটা কথা হলো!

—ঠিক আছে, আমি দরজা দিয়ে ঢুকেছি এবার ওই জানলাটা দিয়ে বেরোব। দে, তোর ওই বালের ক্লাসিক সিগারেটই একটা খাই।

—আজ্ঞে, বালের কেন? পঁয়ষট্টি টাকা প্যাকেট!

—আমার চলে না। আমার ব্র্যান্ড হলো পাঁচমোহর। খুব কড়া মাল। কুলি ধাওড়ায় সব খায়। চলি!

মুখে ক্লাসিক সিগারেট নিয়ে বনবেড়াল লাফ মেরে জানলা দিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল। কারফর্মা ফের শুনতে পেল ঝিঁঝি পোকার ডাক। জানলায় গিয়ে বাইরে তাকালো। শুনশান্। জোনাকি। রেঞ্জারের সেন্স্ ফেরার গোঁ গোঁ শব্দ। এই ঘটনার চল্লিশ বছর পরে 'জনৈক কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর স্মৃতিকথা' শীর্ষক আত্মজীবনীতে কারফর্মা লিখবে, "কে কাকে চাপড়া মারিয়াছিল যে ফরেস্টটির নাম হইল 'চাপড়ামারি'? মানুষ না বাঘ, কে গরু মারিয়াছিল যে ফরেস্টের নামকরণ হইল 'গরুমারা'? আমিই বা কেন কাঠের ব্যবসায় নামিলাম? কেনই বা বউ থাকিতে রাঁড়ও পুষিলাম? জীবন কাটিয়া গেল। এ সকল প্রশ্নের উত্তর পাইলাম না।"

pathagar.net

তিন

...

সকলেই জানে বা জানা উচিত যে চোক্তার ফ্যাতাড়ু বাহিনীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে রিটায়ার্ড মেজর বল্লভ বক্সি, কুস্তিগির বড়িলাল, পুলিশের আই. বি. ডিপার্টমেন্টের গোলাপ মল্লিক প্রমুখের নানাবিধ বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকা সম্বন্ধে কে না অবহিত? যাই হোক, মোদ্দা মালটা হলো মার্শাল ভদি বা ছোটো করে ভদি সরকার একটি ব্যবসার ধান্দা করেছিল। এবং সেইমতো বন্ধু ও শিষ্য এবং ভদির বাড়ির প্রায় সংলগ্ন কে. জি. সরখেলের (অবসরপ্রাপ্ত করণিক, জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া) উঠোনে বিকট একটি গর্তও খোঁড়া হয়। উদ্দেশ্য ভূগর্ভস্থ তেল বের করে রাতারাতি লাল হয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে বিশদ জানতে হলে 'কাঙাল মালসাট' পড়তে হবেই। না পড়লেও চোবলে চোবলে। যাই হোক, তেল পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল মরচে পড়া কয়েকটা সোর্ড এবং পোর্তুগীজ জলদস্যুদের একটি ছোটো কামান যার ডাকনাম 'নুনুকামান'। সেই গর্তে জল জমলো। মশার ফ্যাক্টরি চালু হলো। মশা ধরার জন্যে কোলা ব্যাঙদের ডাইভ! গর্ত বোজাইও করা হলো।

এরপর ভদি ঠিক করেছিল তার একতলা বিদ্‌ঘুটে বাড়িটিতে নার্সিং হোম খুলবে। নাম হবে 'মৃত্যুদূত নার্সিং হোম'। ভদি চেয়েছিল এমন একটি নার্সিং হোম বানাতে সেখানে যে রোগীই ভর্তি হবে বেঁচে বেরোবে না। ভদির বউ বেচামনি হবে হেড নার্স। মুখে বালিশ চেপে ধরবে। ম্যানেজার হবে ভদির চাকর নলেন যার কাজ হবে খাটিয়া-ফাটিয়া রেডি রাখা এবং কীর্তনের

ব্যবস্থা করা। গুদোমঘর ঘেঁটেঘুঁটে ভদি একটি সুপ্রাচীন ও বিকল বক্স ক্যামেরাও বের করেছিল যা সারিয়ে মড়ার ফটো তোলা হবে। দুজন ডাক্তারও জোগাড় করেছিল যাদের হাতে কোনো রোগী বাঁচে না। সবই হতে পারত কিন্তু হলো না। হতাশায় ভরা এই দুঃসময়ের এক সন্ধ্যায় ভদির বারান্দায় সকলে হাজির। ভদি, সরখেল ও মেজর বল্লভ বক্সি ফোর্ট উইলিয়ামের ক্যান্টিনের ঘোড়াখেকো রাম ও ফ্যাতাড়ুসমেত অন্যান্যরা বাংলা খেতে খেতে গালগল্প করছিল। মদন বলল,

—আচ্ছা ভদিদা, তোমার ওই ঘরগুলো দেখি তালাবন্ধই পড়ে থাকে। আগে তো তুক্-তাক্, ঝাঁড়ফুঁকের জন্যে ভাড়া দিতে। ভালো পয়সা আসত। এখন আর দাও না?

—সে উপায় আচে! হুঁ হুঁ বাবা এর নাম সি. পি. এম.। যার পোঁদে লাগবে তাকে ছ্যাঁচাপোড়া করে মারবে। সারাক্ষণ লোক লাগিয়ে রেখেচে। কেউ হয়তো অন্যের বউ ফুঁসলোবে বলে তান্ত্রিক ধরে এনেচে। ঘর ভাড়া নেবে। মোড়ের মাথায় ধরে এমন সব উল্টোপাল্টা গাওনা দেবে, রগড়া দেওয়ার ভয় দেকাবে, মাল আর আসে? পুলিশে ধরবে, হাজতে নিয়ে গিয়ে ন্যাংটো করে ক্যালাবে—এসব থ্রেট শুনে ওরাও ভাবলো যে কাজ নেই বাবা। কোতায় শান্তি করে এটা-ওটা করবো, তা না, যতো উটকো হ্যাপা। শুকিয়ে মারবে। সি. পি. এম. বলে কতা। কি বলো, ক্যাপ্টেন!

মেজর বক্সিকে ভদি ক্যাপ্টেনই বলে। সে গোঁফ নাচিয়ে বলল,

—আমার আর্মি রেশন থাকিতে কে আপনাকে ড্রাই করিয়ে মারিবে! রামের সাপ্লাই থামিবে না।

—সে তো জানি। ক্যাপ্টেন থাকতে... বাবা পুরন্দর... পুরন্দর ভাট ঝটপট ভাঁড় উল্টে বাংলার তলানিটা ফিনিশ করে উঠে দাঁড়ালো।

—প্রভু!

—পভু, পভু করিস না তো। বেশ তো ভদিদা বলতিস।

—আজ্ঞে, তাই তো বলি।

—নতুন কিছু লিখলি? বেশ চনমনে! শুনলে মন ভালো হয়ে যায়?

পুরন্দর চুপ। ডি. এস. বলে ওঠে,

—ভদিদা, পুরন্দর এখন ইংরিজিতে কবিতা লিখচে!

—বলিস কি রে, এবারে কি সায়েবদের গুয়ে বসিয়ে ছাড়বি?

—না ভদিদা, ইংরিজি-ফিংরিজি নয়। একটা কবিতার টাইটেলটা শুধু ইংরিজি।

—তা হোক না। বোঝা গেলেই হলো। বল্।

—তার আগে যদি দুটো কথা বলি!

—বল্, দুটো কেন, চারটে বল্!

—আজ্ঞে, বাংলা কবিতায় যারা আজ অব্দি নাম-ডাক কিনেছে সকলে একটা করে সিরিজ লিখেচে।

সরখেল বলে ওঠে,

—যেমন 'বালেশ্বর সিরিজ'। হেভি।

—হ্যাঁ, তারপর ওর দেখাদেখি অনেক সিরিজ লেখা হয়েছে। 'মহাবালেশ্বর সিরিজ', 'বালটিকুরি সিরিজ', 'একবালপুর সিরিজ'। তা আমি যেটা লিখছি, মানে, একটাই লেখা হয়েছে যদিও, সেটা হলো 'বাল সিরিজ'।

—বাঃ বাঃ বেড়ে নাম, বল্ এবার পদ্যটা।

—কবিতার নাম 'সেক্স অন স্যান্ড'!

মেজর বল্লভ বক্সির অবদমিত হুঙ্কার—'চার্জ! চার্জ!' এই কবিতা-সন্ধ্যায়, যাকে বলে, মানে প্রায়ই লেখা হয়, 'নতুন একটি মাত্রা সংযোজিত করে'।

—তপ্ত বালির ওপর
দাঁড়িয়ে ছিল তপ্ত বালিকা
এগিয়ে এল তপ্ত বালক
উঁচিয়ে নালিকা

দিকচক্রবাল
দিকচক্র ঢেকে দিল নৌকোর পাল
বাকি রইল বাল

ভদির 'পারি না'! 'পারি না'! রব, ঘোমটা টেনে বেচামনির হাসি, গামছা পরা নলেনের নিজের উরুদেশে চাপড়, মেজর বক্সির 'ব্রাভো! ব্রাভো' করতালি, নানা কণ্ঠে শেষ লাইনটির মুহুর্মুহু পুনরুচ্চারণ অচিরেই বিষাদাচ্ছন্ন সেই পরিবেশকে 'ছাঁইয়া ছাঁইয়া'-র মতোই আনন্দযজ্ঞে পরিণত করিল। এই আনন্দধ্বনি আরও বহুক্ষণ শোনা যাইত যদি না ভদি বলিয়া উঠিত,

—এই রে! বাবা এসে পড়েচে। থামা! খচে যাবে। থামা!

সমূহ নীরবতা। অন্ধকার, ধোঁয়াটে আকাশ থেকে দাঁড়কাক এসে ভদির উঠোনে ল্যান্ড করলো। পা তুলে ঠোঁট চুলকোলো। ডানা ঝাড়ল, তারপর বলল,

—খুব তো বটকেরা চলচে! নলেন, দুটো বাটিতে রাম ঢাল্। জল দিবি না। তুই যা হারামি হয়েচিস।

নলেন আদেশ পালনে তৎপর হয়।

—দুটো বাটি কেন বাবা? আর কেউ আসবেন?

—চোপ্! এসে পড়েচে আর উনি কিনা...

ছাদ থেকে লাফ দিয়ে উঠোনে পড়ল সেই বনবেড়াল। জায়েন্ট সাইজ দেখে সকলেই কাঁচুমাচু, কারফর্মা ছুটে গেল,

—প্রভু! প্রভু!

বনবেড়ালের সামনের ডান থাবাতে কারফর্মা মাথা ঠোকে, বনবেড়াল বাঁ থাবা তুলে মাথায় ঠেকিয়ে কারফর্মাকে আশীর্বাদ করে। কারফর্মা-র দেখাদেখি অন্যদের মধ্যে প্রণাম করবার হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বনবেড়ালের মুখে সেই হাসি যার বর্ণনা লুইস ক্যারলের মতো কোনো মনসবদারই দিতে পারেনি। অনেকেই গড়াগড়ি খায়। ধুলো তুলে চাটে। মাথায়, বুকে মাখে। দাঁড়কাকের চোখদুটো, ছানির ওপরেও, ছলছলিয়ে ওঠে। ভদি প্রণাম করে। বেচামনি, নলেন।

দুটি টুল এনে রাখা হয় বারান্দায়। একটিতে দাঁড়কাক ও অন্যটিতে বনবেড়াল বসে রাম খেতে খেতে গুজুর গুজুর করে। টুলদুটির পাশেই মাটিতে ভদি ও বেচামনি। অন্যরা হাত তিনেক দূরে। বলতে গেলে দাঁড়কাক বাদে সকলকেই মশা কামড়াচ্ছে। কেঁদো একটা মশা বনবেড়ালের নাকে বসার ধান্দা করছিল। বনবেড়াল তাপে কপ্ করে খেয়ে নিল। মশা খাবার পরে চুক করে একটু নিট রাম মেরে দিল। দিয়ে দাঁড়কাককে বলল,

—নে, এবার ধর্।

দাঁড়কাক বিশাল ডানাদুটিকে দুপাশে ছড়ায়। ভদির উঠোনে ঐশ্বরিক এক নীরবতা। নর্দমার পাশের টগর গাছ হইতে বৃন্তচ্যুত একটি টগরফুল মাঝ আকাশে দাঁড়িয়ে যায় যেন এই সঙ্কেতই দিতে যে নিউটনের নিয়ম এই পরিবেশে অচল।

—আজকের মুখড়াটা ভেন্ন জাতের। কারণ 'সিচুয়েশন ইন ক্যালকাটা ইজ ভেরি গ্রেভ'। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় কলকাতায় বেশ কয়েকটা হাইড্রোসিল বুড়ো ছিল। তারা বলতো ওই ইংরিজিতে আমি যা বললাম। ওরা নাকি বার্লিন রেডিওতে শুনেচে। কথাটা তখন অতটা না খাটলেও আজ সত্যি হতে চলেচে। কিন্তু তোরা এমনই বোকাচোদা যে কোনো হুঁশই নেই, কেবল হারামিপনা, কেবল ঢ্যামনাগিরি। সব ভেদ বমি হয়ে মরবি নয়তো কালাজ্বরে। আমি চললাম। মর্‌গে যা! খাট ধরেও কেউ বসার থাকবে না—বলে দিলাম।

সামনে একটি কলরব শুরু হয় তৎসহ ফুঁপিয়ে ও ডুকরে ক্রন্দন। ভদির মুখেই শুধু স্মিত একটি স্মাইল। বেচামনির খোমাটা কেমন দেখাচ্ছিল তা গাপ্ হয়ে রইল কারণ বিশাল ঘোমটায় সবই ঢাকা। এই কান্নাকাটির ফাঁকেই ডি. এস. বড়িলালকে হাত বাড়িয়ে চাঁটি মেরেছে। বড়িলাল মাথা ঘুরিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে হাতের কাছে ছিল নলেন, তার গামছা খুলে নিয়েছে। গোলাপ এবং বল্লভ বক্সি ন্যাংটো নলেনকে দেখে খ্যাঁকখেঁকিয়ে হাসছে—এসবও হচ্ছিল। দাঁড়কাক বনবেড়ালকে বলল,

—বানচোতগুলোকে ঘাবড়ে দিয়েচি। এবার তুই টেক্ ওভার কর।

বনবেড়াল ল্যাজ ফুলিয়ে গর্জে উঠল,

—ঘ্যাঁও! থামবি? নাকি আমাকে টুল থেকে নামতে হবে? নামব? অনতিবিলম্বেই শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। বনবেড়াল গলা ঝাড়ে, ফাঁকায় হাত বুলিয়ে একটা জ্বলন্ত সিগারেট বাগিয়ে একচোখ বন্ধ করে টানে, টুস্‌কি দিয়ে ছাই ঝাড়ে,

—চোক্তার প্লাস ফ্যাতাড়ু, তা বাদ দিয়ে যারা আচিস, তোদের সকলেরই আজ মহাবিপদ। ভদির হাল খুব বিলা। গভরমেন্ট, পুলিশ, ক্যাডার— সব এককাট্টা —চোক্তারের হেড যদি ভোগে চলে যায় তাহলে ওরা জানে বাকিগুলোও পার পাবে না— আজ নয় কাল, সবকটাকে এরা ভিত্তর্ করে দেবে। ঘাপ্‌লাটা এমনই ডেঞ্জারাস যে দাঁড়কাক আমাকে এমারজেন্সি মেসেজ পাঠালো। তা আমার হোল স্ট্রেট কাট কথা। চাপড়ামারি থেকে তোদের এই বালের শহরে আমি গাঁড় মারাতে আসিনি। এসেচি যখন তখন বনবেড়ালের খেলা দেখিয়ে দিয়ে যাব। যা, অভয় দিলাম ভদিকে হয়তো পস্তাতে হবে, দু একটা বাল নিয়ে টানাপোড়েনও চলতে পারে, তবে ঐ তক্, ছেঁড়া যাবে না। নলেন, বাটি ভরে দে। আর হ্যাঁ, পুরন্দরের 'বাল সিরিজ' এর ফার্স্ট কবিতাটা শুনে বেগম জনসন (১৭২৮-১৮১২) হেভি খুশি। ভাট, চালিয়ে যা। এবার দাঁড়কাক প্ল্যানটা বলবে। তবে সব কথা পেটে রাখতে হবে। বউ বা রাঁড়, কারো কাছে মুখ খোলা নেই। খুললেই...ঘ্যাঁও, গর্...র্-র্... বল্লভ, স্রেফ গুলি করে দিবি... আমার অর্ডার।

আতঙ্কিত আশ্বাস ধ্বনিত হয়—না, না, কেউ মুখ খুলব না! এই কুলুপ দিলাম! এবং সকলেই সভয়ে মেজর বল্লভ বক্সির দিকে তাকায়। তার গোঁফগুলো সরু হয়ে দুদিকে উঠে গেছে। দাঁড়কাক বলল,

—গতরাতে, সেন্ট জনস্ চার্চের টঙে আমি, বেগম জনসন আর বনবেড়াল মিটিং-এ বসেছিলাম। বসব বললেই কি বসা যায়? তলায় হেভি বাওয়াল! চারনক আর অ্যাডমিরাল ওয়াটসন, মানে ওদের স্পিরিট, মাল পায়নি, রেকটিফায়েড স্পিরিট খেয়ে মাগি ধরতে বেরিয়েছিল, ক্যাঁও ম্যাঁও, সে হেভি কিচায়েন। তিনটে নাগাদ শালারা কবরে ঢুকে গেল, ঠাণ্ডা

হাওয়া ছাড়লো, তখন প্ল্যানটা ছকা হলো। এখন, ভদি, শোন্, তোকে একটা ম্যাগাজিন বের করতে হবে, নামটাও ঠিক হয়ে গেচে, বেগম জনসনই ঠিক করে দিল—'উইকলি ভ্যামপায়ার'!

ভদি ঘাবড়ে গেল।

—অ্যাঁঃ ইংরিজিতে কাগজ। যদিও সরখেল আচে, তবুও...

—না রে বাবা, তোর এলেম আমরা জানি, বাংলায়...

ভদির মুখে হাসি ফুটল।

—হপ্তায় হপ্তায় ভ্যামপায়ার উড়বে। একেবারে ক্যান্টার করে দেব। সরখেল, কি বুজচ?

সরখেল চিন্তাশীল মানুষ এবং বর্তমানে 'ডাইনোসরদের তন্ত্রসাধনা' নামক একটি গবেষণা-গ্রন্থ রচনায় মগ্ন,

—কাগজটার টাইপটা কি হবে? 'উনিশ-কুড়ি' ধাঁচের?

দাঁড়কাক খচে গেল,

—তোকে তো লেখাপড়া জানা বলে জানতুম। এমন একটা কথা বললি যে কেটলি গরম হয়ে যায়। ওসব নতুন রোঁয়ার চুলবুলুনি কেস নয়। 'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার'-এ থাকবে ফর্টি পারসেন্ট ভূতুড়ে খবর আর সিক্সটি পারসেন্ট অদ্ভুৎ খবর —যার কোনোটাই কোনো শালা ছাপে না। একটা পৃষ্ঠা —একদিকে খবর, ও হ্যাঁ, পুরন্দরের বাল সিরিজের একটা কবিতাও থাকবে। উল্টো পিঠে বিজ্ঞাপন ঠাসা।

—কিন্তু বাবা, বাজারে এত কাগজ, আমরা পারব?

—পারা না পারা আমাদের হাতে নয়। এবার সব শুনে বুঝে নেমে যা। আমরা তো আচি?

এর অনতিবিলম্বেই সভা ভঙ্গ হয়। আকাশে ধোঁয়াই বেশি, মেঘ কম, ঘোলাটে অল্প আলোর আভায় বোঝা যায় ওরই পেছনে কোয়ার্টার প্লেট চাঁদ রয়েছে। তারই মধ্যে উড়তে উড়তে ফ্যাতাড়ুরা মিশে গেল। ভদির উঠোন ফাঁকা। ঝুলমাখা ডুমটি নেভানো। ফাঁকার মধ্যে যে টগরফুলটা এতক্ষণ স্ট্যাচু হয়েছিল সেটা এবার নিচে পড়ে গেল। এই ঘটনা প্রমাণ করল যে ফের নিউটনের নিয়ম চালু হল। কিন্তু সত্যিই হল কি?

pathagar.net

চার

মদন, ডি. এস. ও পুরন্দর উড়তে উড়তে তলায় লোডশেডিং দেখে গাঁজা পার্কে ল্যান্ড করল। ওই পাড়াটায় বস্তিতে যারা পয়দা হয় তারা বড়ো হতে না হতে মোটর গ্যারেজে ঢুকে পড়ে। কলকাতায় রোজ গাড়িতে গাড়িতে রগড়ারগড়ি হয় যে কারণে বেশির ভাগ গাড়িই তোবড়ানো। তাই ওই তল্লাটে দিনরাত ধাঁই ধাঁই শব্দ করে বডির কাজ চলে। কিন্তু কিছু বাচ্চা হয় যাদের মায়ের পেটেই ভগবান মেরে রেখেছে—মালটা হয়তো বাঁচলো কিন্তু হয় ঠ্যাং নয় হাত, কোনো একটা পলকা, ব্যাঁকা ও সরু, নয়তো মুণ্ডুটা বেদম থ্যাবড়া। এরা গাঁজা পার্কে উটকো খদ্দেরদের ফ্যাগ খাটে। দোকান বন্ধ তো ব্ল্যাকে মাল আনবে, বাংলা, বিলিতি যার যা পছন্দ আর তার সঙ্গে চর্বির বড়ার চাট। এরা চলে যাবার পরে, এগারোটা বেজে গেলে লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা মগারা আসে—বড়ো বড়ো চুল, ঢ্যামনার মতো গলার আওয়াজ ও হাঁটার স্টাইলে পোঁদ দোলানো ও ভাঁজ মারা, অনেকটা ক্যাটওয়াকে মডেলিয়াদের মতো। তা সে যার যা ধান্দা করুক্‌গে

যাক– একটা সরু লিকলিকে পা লাঠিতে জড়ানো, অন্য পা-টা ভালো, একটা ছেলেকে দিয়ে মদন এক বোতল বাংলা আর ছোলার চাট আনালো।

—ভদিদা কাগজ বের করবে, আমাদের বেচতে হবে, বুজলে? গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াবে আর অ্যাঁড় চুলকোবে—ও আর চলবে না।

কথাটা ডি. এস.-কে বলা। মদনের।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানা আচে। নিজে যেন চুলকোও না। আমি কিন্তু ভাবচি, পুরন্দরের ছপ্পড়টা কেমন খুলে গেল দেখলে? ছাপ্পা মাল—দুনিয়া পড়বে– 'বাকি রইল বাল'। হেভি।

পুরন্দর বলল,

—আচ্ছা মদনদা, দণ্ডবায়সবাবা যে বলল চার্নক আর ওয়াটসন মাগি ধরতে বেরিয়েছিল— শালারা তো কবে সেঁটে গেচে– এখনও এত হিট্?

—আরে বাবা ননস্টপ গরু প্যাঁদালে ওরকম হবেই। সঙ্গে ব্র্যান্ডি। এ কি বাঁড়া বাঙালি? বাতাসা দিয়ে জল খেল তারপর আধমরা শিঙির ঝোল দিয়ে ভাত!

ডি. এস. ছোলা চিবোতে চিবোতে বলল,

—কেন যে শালা সায়েব হয়ে জম্মালাম না তাই ভাবি।

তিনজন ফ্যাতাড়ুই চমকে উঠল কারণ হাত ছয়েক দূরে বিরাট ভুঁড়িওয়ালা যে দশাসই লোকটা নোংরা টেরিকটনের ঘিয়ে-ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি আর হাঁটু অব্দি ধুতি পরে মোটা ব্যাগ মাথায় দিয়ে ঘুমোচ্ছিল সে বলে উঠল,

—সব সায়েবই হিটিয়াল হয় না। কিছু জানবে না, পড়বে না, বাতেলা মারবে।

তিনজনেই ঘাবড়ে থ। মালটা উঠে বসেছে। বুকপকেট থেকে দাঁতভাঙা পকেট চিরুনি বের করে আঁচড়াতে লাগল। মুখে হাসি।

—কি গো, তিন ফ্যাতাড়ুই দেখছি চুপ। খুব তো লপচপানি হচ্ছিল।

—আপনি কি করে জানলেন আমরা ফ্যাতাড়ু?

—কি করে? তোদের নানা কাণ্ড-কারখানা নিয়ে যে গল্পের বইটা, যদিও কাটতি নেই, সেটা পড়া ছিল। দেখলুম তোরা উড়েউড়ে এলি। মাল, ছোলা আনালি। মিলিয়ে নিলাম। হিম্মত থাকে তো বল্ তোরা ফ্যাতাড়ু না!

—সে না হয় ঠিকই বলেচেন কিন্তু কি করে জানলেন যে সব সায়েব হিটিয়াল নয়?

—জানতে হয়। এ তো আর পুরন্দরের মতো পোয়েটের কম্ম নয় যে পুড়ুক করে দুটো লাইন মিলিয়ে ছেড়ে দিলাম, দিয়েই গামছা মাথায় দৌড়। আমরা হলুম নভেলিস্ট, বুঝলি, এক একটা নভেলের জন্যে ফ্যাক্ট যোগাড় করতেই হয়তো দশটা খাতা ভরে গেল।

—আজ্ঞে আপনি কে?

—বলচি। এই বইটা দ্যাখ। আঁচ পাবি।

ব্যাগ থেকে একটা রঙীন মলাট দেওয়া বই বেরোল। ওপরে হাফ-ন্যাংটো মেমের ছবি। নাম 'মেমবাতির আলো'। তলায় লেখকের নাম– বজরা ঘোষ। পুরন্দর বলল,

—নামেই ভুল। হবে 'মোমবাতির আলো'।

—না, ভুল নয়, এই জন্যেই তুই ঝাঁটের পুরন্দর ভাট আর আমি সাহিত্য-সম্রাট বজরা ঘোষ। মেম যদি ন্যাংটো হয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে তখন একটা আভা বেরোয়। বইটা পড়্। পড়লে বুঝবি লন্ডনে কেন হেকিমি মেডিসিনের এত কদর।

—তা আপনাকে সাহিত্য-সম্রাট উপাধিটা কারা দিল?

—নালিকুল পাঠক-সমাজ। আরও অনেক উপাধি পেয়েছি। একদিন দেখাব। বাড়ি যাস রোববার করে, দেখাব। না দেখলে বিশ্বাস যাবি কি করে? তোরা যা সেয়ানা!

ডি. এস. এতক্ষণ কোনো ট্যাঁ ফুঁ করেনি। এবারে রা কাড়ল,

—আমার আবার অত আপনিফাপনি চলে না। তা বজরাদা, এখন কি নামাচ্ছ, মানে নভেল?

—এখন?

গালভরা হাসি নিয়ে বজরা ব্যাগটা থেকে বিরাট একটা লাল খেরোর খাতা বের করলো। গাবদা।

—এটা হল পার্ট ওয়ান। তিন ভলুম দাঁড়াবে। বেশিও হতে পারে। এটা বেরোলে আর দেখতে হবে না। অথচ ভেরি সিম্পল প্লট। নামও রেডি।

—কি নাম?

—বলব? তোরা যেন আবার দশ কান করিস না, কেউ হয়তো ঝেড়ে দিল।

—না, না, বজরাদা এ শুধু নিজেদের মধ্যে।

—নাম হল 'খানদানি খানকি'। কেমন নামটা?

—চাম্পি! বাকি দুটো কবে নামাবে?

—নামবে, ভাই নামবে। আচ্ছা, এবার চলি ভাই। বউ চিন্তা করবে।

—যাবে? কিন্তু বইটা?

—ও থাক। দিয়ে দিলাম। তোরা পড়ে যত ছড়াবে ততই মঙ্গল।

'খানদানি খানকি'টা বেরোলে নামী-দামি পুরস্কার একটা মেরে দেব। বউকে প্রমিস করেছি। চলি।'

এই শেষ কথাগুলো বলার সময় বজরা ঘোষের চোখদুটো জলে ভরে উঠেছিল। ফ্যাতাড়ুরা বুঝতে পারেনি। অনেক আলোর মধ্যে চোখে জল এলে ঝাপসা হয়ে যায় সবকিছু। মার্কারি, নিয়ন, বাল্ব—সব আলোর ঝাড়, আলোর তারার ফুলঝুরি হয়ে যায়। গলে যেয়ে টলমল করে।

'মসোলিয়ম'-এর এই অধ্যায়টিও অন্তিমে ঝাপসা থেকে গেল।

পাঁচ

'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার'-এর প্রথম সংখ্যাটিতে (দাম ১ টাকা) তথ্যাদি ছিল, সম্পাদক : মার্শাল ভদি। প্রধান উপদেষ্টা : দণ্ডবায়স ও অরণ্য-মার্জার। সহ-সম্পাদক : কে. জি. সরখেল। প্রো: বেচামনি সরকার।

ঘ্যাঁও!

প্রথম সংখ্যাতে যা যা ছিল তা এইরকম, ফ্রন্ট পেজে,

বাসনের ঝনঝনানি : ভূত না চোর?

গত সপ্তাহের শুক্রবার রাত্রে খিদিরপুরের প্রখ্যাত মিত্তির বাড়িতে ছাদের রান্নাঘরে ঝনঝন শব্দে বাসন পড়িতে থাকে এবং ছাদে ধুপধাপ শব্দ হয়। বাড়ির লোকজন ভয়ে ঘরের দরজা আঁটিয়া বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করে। পরদিন প্রত্যুষে দেখা যায় রান্নাঘর শিকল

তোলা ও তালাবন্ধ। ছাদে প্রচুর বিষ্ঠা। এলাকায় এই ঘটনা লইয়া ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং বিতর্ক শুরু হয়, ভূত না চোর, কে এই ঘটনার জন্য দায়ী? কে ভয় দেখাইল এবং হাগিয়া পলায়ন করিল? স্থানীয় সেকুলার ব্রিগেড ক্লাব ঘোষণা করিয়াছে তাহারা একটি বিতর্কসভা বসাইবে : ভূত আছে কি নাই?

বাদুড়ের রহস্যজনক মৃত্যু

ঝড় নাই, বাজও পড়ে নাই, টালিগঞ্জের গলফ্ ক্লাবের নিকটস্থ গলিপথে বিশাল একটি বাদুড়ের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। সংবাদটি দপ্তরে আনিয়াছেন রিটায়ার্ড মেজর বল্লভ বক্সি। তাঁর মতে বাদুড়টি ভ্যামপায়ার জাতের। মেজর বক্সি তড়িঘড়ি নিজস্ব ক্যামেরা আনিয়া বাদুড়টির ফটোও তুলিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ফটোটি ওঠে নাই। আমরা বাদুড়ের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

পেত্নির কুপ্রস্তাব

উত্তর কলিকাতার প্রসিদ্ধ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবসায়ী শ্রীগজেন্দ্রনাথ পোড়েল স্থানীয় থানায় অভিযোগ করেন যে গত এক মাস ধরিয়া একটি পেত্নী তাঁহাকে নানাবিধ কুপ্রস্তাব দিতেছে। থানা এই ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নিতে রাজি না হওয়ায় শ্রী পোড়েল ভদি-ভবনে যোগাযোগ করেন। আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীনলেন সরেজমিন তদন্ত করিয়া জানাইয়াছেন যে তিন বৎসর পূর্বে শ্রী পোড়েলের গৃহে এক পরিচারিকার রহস্যময় মৃত্যু ঘটিয়াছিল। সে যদি এখন পেত্নি হইয়া শ্রী পোড়েলকে কুপ্রস্তাব দেয়, আমরা কি করতে পারি? উপরন্তু শ্রী পোড়েলের স্বভাব-চরিত্র লইয়া নানা কথা আমাদের কানে আসিয়াছে। আমাদের বক্তব্য, উপযুক্ত ব্যক্তিকেই পেত্নি কুপ্রস্তাব দিয়াছে।

বাল সিরিজ-১/সেক্স অন স্যান্ড/শ্রী পুরন্দর ভাট

রহস্যময় জলজন্তু

বিরাটির একটি বাড়ির ভাঙা সেপটিক ট্যাঙ্কের মধ্যে মহা আলোড়ন শুনিয়া চারদিকে উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়ে। এমনও গুজব রটিয়াছিল যে ঘড়িয়াল ঢুকিয়া পড়িয়াছে। পরে সেপটিক ট্যাঙ্কের ঢাকনা পুরাপুরি ভাঙিয়া ফেলিয়া মেথররা যে জলজন্তুটিকে ধরে সেটি একটি অতিকায় মাগুর। সন্দেহ হয় যে কেহ তামাশা করিয়া একটি হাইব্রিড মাগুর সেপটিক ট্যাঙ্কটিতে ছাড়িয়াছিল। নিয়মিত গু খাইয়া ও গুয়ের জলে জীবনধারণ করিয়া মাগুরটি অতিকায় হইয়া উঠে। খবরে প্রকাশ যে মৎস্য দপ্তর ঘটনাটি শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া সেপটিক ট্যাঙ্কে মাগুর চাষ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু মৎস্যপ্রাণ বাঙালি গুখেকো মাগুরের কেমন কদর করিবে সে সম্বন্ধে এখনই কোনো টিপ্পনি দেওয়া নিতান্তই অবিবেচকের কাজ হইবে।

pathagar.net

রাতের রণক্ষেত্র : ছুঁচা বনাম বেড়াল

কালীঘাটে হালদার পাড়ায় একটি ভাঙা পাঁচিলের পার্শ্ববর্তী রাস্তায় প্রতি রাতেই ছুঁচা বনাম বিড়ালের যুদ্ধ লাগিয়া যায়। ওই রাস্তার নিকটেই ময়লা ফেলার জায়গা আছে। তথায় বিড়ালেরা জড়ো হয় এবং ভাঙা পাঁচিলের তলা হইতে ছুঁচার পাল তাহাদিগকে ধাওয়া দেয়। বিড়ালের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলে ছুঁচার দল ময়লা ফেলার জায়গাটি দখল করে। অনেক বিড়াল থাকিলে তাহারা ছুঁচাদের তাড়া করিয়া গর্তে ফিরিতে বাধ্য করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানে এই যুদ্ধ প্রায় তৃতীয় প্রহর অবধি চলে। আরও জানা গিয়াছে যে কুকুররা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিয়া দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার'-এর প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় এইসব ও আরও কিছু খবর বাদেও ছিল সংক্ষিপ্ত একটি সম্পাদকীয় যার শিরোনাম

'কেন এই পত্রিকা'

—'আজিকার সংবাদপত্রগুলি যে সব খবর ছাপে তাহা পড়িয়া পাঠকের কোনো লাভই হয় না। উপরন্তু ছাগলামি বাড়ে। তাই, প্রকৃত, সরেস সংবাদ সারবান পাঠককে পৌঁছাইবার নিমিত্ত এই পত্রিকা প্রকাশিত হইল। সমাজের যাঁহারা মাথা তাঁহারা আমাদের লক্ষ্য নয়। মাথা বাদ দিয়াও অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। আমাদের লক্ষ্য তারাই।'

উল্টো পিঠে মার্শাল ভদি ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের নানাবিধ অ্যাড।

মার্শাল ভদি রচিত ঐতিহাসিক নাটক

সিকন্দর কা ভগন্দর

(স্ত্রী চরিত্র বর্জিত)

পুরুরাজ : মহামান্য সিকন্দর,
এত সিংহাসন কেন, আপনার কি ডেকরেটরের ব্যবসা?

সিকন্দর : হাঃ হাঃ যে সব রাজাকে কেলিয়ে দিয়েছি এগুলো তাদের সিংহাসন। কিন্তু ভগন্দরের জ্বালায় একটিতেও বসিতে পারি না। হাঃ হাঃ হাঃ।'

ভদি বুক হাউস

স্বল্প খরচে, বাড়ি গিয়া
কাকাতুয়া, ময়না, টিয়াকে খিস্তি শেখাই

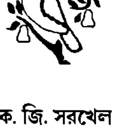

— কে. জি. সরখেল

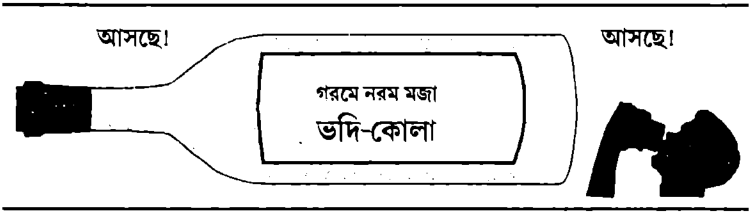

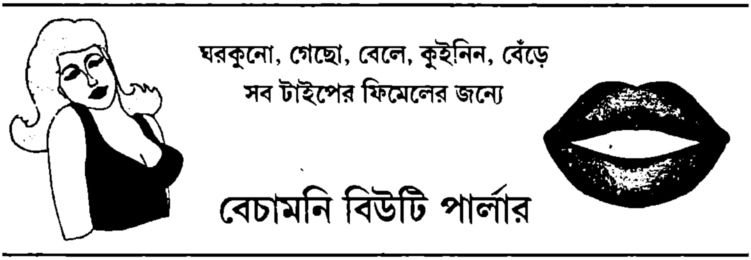

pathagar.net

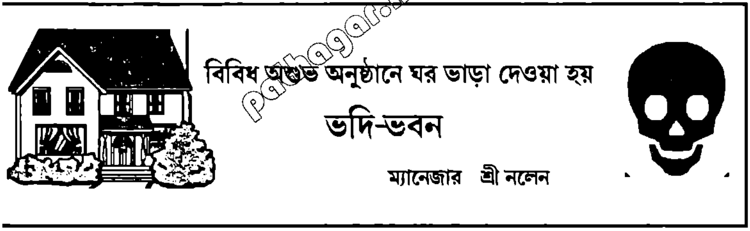

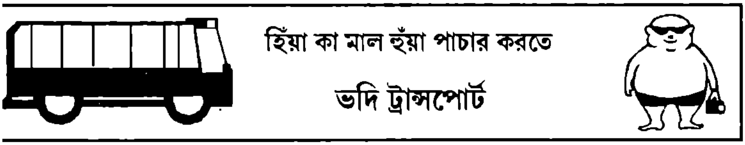

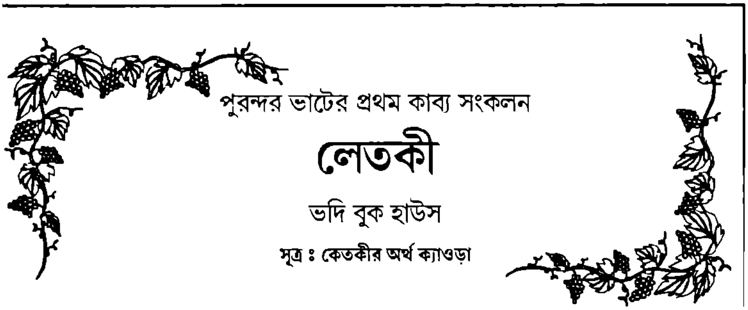

অবিরাম বিনিদ্র গবেষণার ভিত্তিতে রচিত

ডাইনোসরদের তন্ত্র সাধনা

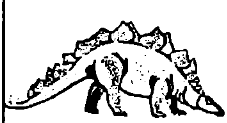

কে. জি. সরখেল

'টিরানোসরাসের শক্তি-মন্ত্র

গঁক্ঘ ঘঁক্ হুঁয়াক্ হোঁয়াক্ ভঁক্ ভঁক্

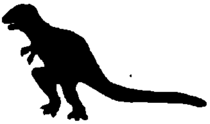

ভদি বুক হাউস

স্টেনগান, মেশিনগান, মর্টার, গ্রেনেড, রকেট-লঞ্চার

নিজে বানান ও চালান

হাতে নাতে দুমদাম

মেজর বল্লভ বক্সী

ভদি বুক হাউস

pathagar.net

'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার' ১০০০ কপি ছাপা হয়। কিন্তু তিন দিনের চেষ্টায় মাত্র ৩ কপি বিক্রি হয়। ভদির শিষ্যরাই এরপর গোছা করে নিয়ে গিয়ে বিনে পয়সায় বিলি করে। কলকাতার পাঠকদের ফতে করা যে সে কাজ নয়।

একটি কপি গোলাপ মল্লিক থেকে দুঁদে গোয়েন্দা তারকনাথ সাধুর কাছে যায়।

—বেড়ে হয়েচে পেপারটা। ভদি মালটার দেখচি এলেম আচে। এতগুলো ব্যবসা খুলেচে। চালাতে পারবে তো! রোজের মনে হচ্চে মুড ভালো নেই।

—মুড হেভি ডাউন। রোজ ইজ ঝরিফাইং। পেপারটা আর টানা যাবে বলে মনে হয় না।

—তা তুমি আর মন খারাপ করে কি করবে? আজকাল কি আর ভালো জিনিসের কদর আচে? মাগিবাড়ির গপ্পো ছাড়ো—দেখবে পিলপিল করে কিনতে ছুটবে। তবে তোমার ভদিদাকে বলবে মন খারাপ না করতে। আলামোহন দাশ—এত বড়ো একটা লোক—তারই দাশ ব্যাংক—সেও ফেল হয়ে গেল। তারপর, তারপর ধরো গে সোভিয়েট রাশিয়া—ফেল। এই ফেল-পাশের খেলাটা বুজলে—হাইলি মিস্টিরিয়াস। প্রায় ভূতুড়েই বলতে পার! ভাবচি এই নিয়ে একটা বই-ই লিকে ফেলব।

বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নিত্যি স্ট্র্যাটেজিক মিটিং করতে কমরেড আচার্য জেরবার হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নজরে কেউ আনেনি যে 'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার' বেরিয়েই উঠে গেছে। একটি কপি পেলে তিনি অন্তত 'হাতে নাতে দুমদাম' সম্বন্ধে একটা এনকোয়ারি করতে বলতেন। বিস্ময় প্রকাশ করে হয়তো বলতেন যে ঘরে ঘরে কমপিউটারের এই যুগে ভূত, তারপর গিয়ে মরা বাদুড়, ছুঁচো-বেড়ালের নৈশ ধাওয়া, পেত্নির মুচকিতে লুক্কায়িত ইশারা—এসব নিয়ে পত্রিকা? তাও আবার কলকাতা থেকে? হয়তো গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ 'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার' নিয়ে হাসাহাসি বা গট্‌রা হতো, হয়তো কেবলই স্ন্যাকস্ ও কফি ব্রেকের সময়টুকু ধরেই একটু আয়েস! কিছুই হয়নি। কিন্তু ভদির পাড়ার লোকাল কমিটির বেলায় ওকথা খাটে না। তারা সব সময়েই ধান্দায় ছিল ভদিকে নাস্তানাবুদ করার। তবে কমরেড আচার্য যে মার্শাল

ভদি সম্বন্ধে কিছু জানতেন না তা নয়। পুরনো যুদ্ধের ব্যাপারটা অন্তত ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। কমরেড আচার্য-র মস্তিষ্ক মানে বলা যায় অসংখ্য দেরাজ-সম্বলিত একটি ক্যাবিনেট যার একটি দেরাজ মার্শাল ভদির জন্য বরাদ্দ ছিল। এটাও ঠিক যে দেরাজটা অনেকদিন খোলা হয়নি। হাতে 'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার' এলে হয়তো হতো। ভদির পাড়ার লোকাল কমিটির হাতেও পত্রিকাটি আসেনি। কারণ রাসবিহারী মোড়, তারাতলা, পাঁচমাথার মোড়, তিলজলা, আক্‌রা ফটক – যেখানে যেখানে পত্রিকাটি বেচার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চলেছিল সেখানে তাঁদের কেউ ছিলেন না। থাকলেও পাত্তা দেননি। না দিয়ে মনে হয় ভালোই হয়েছে। হলে বেকার জল ঘোলা হতো আর সেই তাফালে হয়তো 'মসোলিয়ম' লেখাই হতো না। প্রসঙ্গত মনে রাখার দরকার যে অধিকাংশ ভালো লেখাই শেষ পর্যন্ত আর লেখা হয় না, কখনোই।

ফেমাস সমালোচক পিশাচদমন পাল অর্থাৎ পি. ডি. পালের ছোটোবেলার ডাকনাম ছিল 'পেদো'। 'হেগো' ও 'মুতো' বলে তাঁর আরও দুই ভাই ছিল কিন্তু তারা দাদার মতো ফেমাস হতে পারেনি। পিশাচদমন তাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই রাখতেন না। কোনো সেলিব্রেটির পক্ষেই রাখা সম্ভব নয়। তা হয়েছে কি, আজই সকালে 'হেগো' আর 'মুতো' এসেছিল। 'মুতো'-র মেয়ের বিয়ে। পায়রাডাঙায়। মনে মনে পিশাচদমন বলছিলেন 'রিডিকিউলাস'! এবং থেকে থেকে সুইডেনে বানানো 'অ্যাবসলুট ভদকা' উইথ লাইম কর্ডিয়াল সিপ করছিলেন। বর্ধমান, বিশ্বভারতী, যাদবপুর–তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সামনে তিন-তিনটে সেমিনার। পোস্ট মডার্ন অ্যাপ্রোচ টু পলিটিক্স অ্যান্ড রিলিজিয়ন ইত্যাদি নানা জটিল বিষয়ে, এর জন্যে কত বইঘাঁটার দরকার, ইন্টারনেট সার্চ করতে হবে, আর তার মধ্যে পায়রাডাঙায় 'মুতো'-র মেয়ের বিয়ে! 'রিডিকিউলাস' বলে পিশাচদমন চোখ বুজলেন, বুজেই থাকতেন মশগুল হয়ে যদি না আলতো একটা চড় তাঁর গালে এসে পড়ত। চমকে চোখ খুলেই পিশাচদমন দেখলেন তাঁর সামনের টেবিলে একটি বিশাল বেড়াল তাঁরই গেলাস থেকে ভদকা খাচ্ছে এবং পাশে বসে সেই দাঁড়কাক, মুখে চুরুট, যে তাঁকে একদা খিস্তি করে ভূত ভাগিয়ে দিয়েছিল। বেড়াল বলল,

–কিছুই করিনি। আলতো একটা থাবড়া দিয়েচি, তাও নখ না বের করে। মালটা তো ভালোই। কোত্থেকে বাগালি?

–বাগাইনি। এক ছাত্রী...

–থাক্ আর ক্যাঁও ক্যাঁও করতে হবে না। আমরা সবই জানি। যেমন তুই তেমন তোর ছাত্রী। লো সেকেন্ড ক্লাস। তাকে ইউনিভার্সিটিতে ঢোকাবার জন্যে কলকাঠি নাড়িসনি?

–আজ্ঞে হ্যাঁ, নেড়েছি।

দাঁড়কাক শুরু করে,

–তোকে কি বলে গাল দিয়েছিলুম মনে আছে?

–হ্যাঁ, বোকাচোদা।

–গুড্ গুড্, যাই হোক এখন আমরা তোকে খিস্তি মারতে বা ক্যালাতে আসিনি। দুটো কাজের কথা আচে। বলেই চলে যাব। উল্টোপাল্টা হলে কিন্তু বিচিফিচি...

–আমি তো কোনো কথাই বলছি না!

–গুড্, এক নম্বর হলো শিগ্‌গিরি একটা কেলো হবে। মেলা গ্যাঞ্জাম। তাতে তুই মার্শাল ভদিকে সাপোর্ট করে কাগজে চিঠি দিবি।

–দুটো কাজের কথা বললেন, পরেরটা।

–বিয়ের দিন 'মুতো'-র বাড়িতে বডি ফেলে দিবি বেলাবেলি। ভালো একটা গয়না দিবি।

pathagar.net

'রিডিকিউলাস'! তোর বাপ মানে কালীয়দমনের সঙ্গে তোর মা-র 'রিডিকিউলাস' ঘটনাটা না হলে পারতিস এখন পোস্টমডার্ন মারাতে? সাধে কি আর তোকে বোকাচোদা বলেছিলুম। চলি।

পলকের মধ্যে দণ্ডবায়স ও অরণ্য-মার্জার উধাও। টেবিলে একটি বড়ো কালো পালক ও কিছু বেড়ালের লোম পড়ে আছে। কালীয়দমন ডায়েরিতে নোট করলেন : মার্শাল ভদি, মুতোর মেয়ে। তারপর তলায় ডবল দাগ দিলেন।

বনবেড়াল ও দাঁড়কাক ঠিক যে টাইমে পেদোকে চমকাচ্ছিল সেই একই টাইমে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মহা মাগিবাজ কিউরেটর ও অন্যান্য বিস্তর খ্যাতিমান ঢ্যামনার সঙ্গে ওই একই দাঁড়কাক ও বনবেড়ালের সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং সব শালাই নিজ নিজ ডায়রিতে নোট করে নিয়েছিলেন যে মার্শাল ভদিকে সাপোর্ট দিতে হবে।

বজরা ঘোষকে এর মধ্যেই ফ্যাতাড়ুরা ভদির কাছে নিয়ে যায় এবং 'খানদানি খানকি'-র ভলুম ওয়ানের প্রথম চ্যাপটারটি শুনে ভদি, সরখেল, বেচামনি, নলেন ও বল্লভ বক্সি একবাক্যে মেনে নেয় যে এ লেখা বই হয়ে বেরোলে অনেক মালেরই গাঁড়ে হুলো হয়ে যাবে।

'সেই প্রথম দর্শনের স্বপ্নালু ঘোর দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান ও হাওড়া নিবাসী বিবাহিত ট্যাক্সি ড্রাইভার শিবনাথ মুখোপাধ্যয়ের কাটে নাই, এবং দেহে প্রাণ ও মনে পুলক থাকিতে কাটিতেও পারে না। তখন কলিকাতায় বড়ো ট্যাক্সি চলিত। বেবি ট্যাক্সির আবির্ভাব ঘটে নাই। বড়োলোকেরা চড়িত বুইক, পন্টিয়াক, জাগুয়ার, ওল্ডস্‌মোবাইল, অস্টিন, ক্রাইসলার, ফোর্ড ইত্যাদি। পায়ে পরিত কাথবার্টসন হারপারের বুট, চোখে লরেন্স অ্যান্ড মেয়ো-র চশমা, আকবর আলীর স্যুট। তাহারা ফারপো-র প্রসিদ্ধ প্রন্ ককটেল খাইয়া, গুরুগম্ভীর পাদে পথচারীদের সচকিত করিয়া, নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে রোমান্টিক মুভি দেখিতে যাইত।

'দর্জিপাড়া পার্কের উল্টা ফুটে শিবনাথ সেই সন্ধ্যায় তাহার বিশাল ডজ্ ট্যাক্সিটি দাঁড় করাইয়া কাঁচি সিগারেট টানিতেছিল। তাহার মন ছিল বিমর্ষ, সমগ্র দেহই যেন ম্রিয়মান। সহসা নিকটবর্তী গলির আলো-আঁধারির মধ্য হইতে অতিকায় ও ঝলমলে নারীর এক আদল ভাসিয়া উঠিল। যেন জাহাজ আসিতেছে। এবং তারই ট্যাক্সির দিকে। যেমন আড়া, তেমনই বহর...'

সরখেল শুধু প্রশ্ন উঠাইয়াছিল,

—অত বড়ো জায়েন্ট খানকি! শিবনাথ হেগো বাঙালি। তাংড়াতে পারবে?

ভদি খেঁকিয়ে উঠেছিল,

—থামবে? সাইজ ফাইজে কিছু যায় আসে না। ভগবান সব ফিট করে রেখেচে।

এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ওই তিনদিনের মধ্যে যে তিন দিন 'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার' বিক্রির ব্যর্থ চেষ্টা চলে। সেই দিনই গভীরতর রাতে গোলাপ মল্লিকের ছুঁচো কিচকিচে ছাদে মদন, ডি. এস. ও পুরন্দরকে বনবেড়াল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,

—পুরন্দর, 'বাল-সিরিজ' আর এগোল?

—এগোব, এগোব করচে। সেই ফাঁকে একটা দুঃখের কবিতা লিখে ফেলেচি।

—দুঃখই তো সব। বলে ফ্যাল্।

পুরন্দর গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করে,

চরাচরে
শুধু ঘুঘু চরে
একেলা বসিয়া আছি

ঘরে
কার, কার তরে
কার, কার তরে
কাব্য থরে থরে
কেঁদে মরে

হরে ও দরে
চরাচরে
শুধু দেখি ঘুঘুপাল চরে
কেবলই ঘুঘুর দল চরে

দাঁড়কাক বলে উঠল,

—ফেটে গেচে। ওফ্ অক্ষয় বড়াল থাকলে তোকে বুকে জড়াত। তোর এই যে বিরহ-বেদনা, যা বলে দিলুম, শিগগিরি তোর একটা মাগ জুটবে। মালটা খানকি, খানদানি নয়, তবে মনটা ভালো। সুখে থাকবি। এবারে বনবেড়াল কি বলে, মন দিয়ে শোন্।

—মিঁয়াও! তোরা যে বজরাকে নিয়ে গেলি ভদ্দির কাচে, বজরা যে 'খানদানি খানকি'-র মুখড়াটা শুনিয়ে আসর মাৎ করে দিল, জানিস, তোরা কী করেচিস?

—না, আপনি বলুন, আমরা তো ভালো ভেবেই...

—বজরা তোদের গাঁজা পার্কে, এগারোটা নাগাদ, বলেনি যে ওকে বাড়ি ফিরতে হবে, নইলে বউ চিন্তা করবে?

—হ্যাঁ, বলেছিল।

—বলেনি যে 'খানদানি খানকি' বেরোলে একটা বড়ো পুরস্কার ও বউকে প্রমিস করেচে?

—বলেছিল।

—তাহলে শুনে রাখ্! তিন বছর আগে বজরার বউ পেটে ক্যানসার হয়ে মরে গেচে। চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে। ও এখনও প্রত্যেকটা রাত হাসপাতালের সেকেন্ড গেটের সিঁড়িটাতে জেগে বসে থাকে। ওর ব্যাগে এখনও একটা যশোরের চিরুনি আর লক্ষ্মীবিলাস তেলের শিশি থাকে। মাথার কাঁটা থাকে। ক্লিপ থাকে। একটুখানি খালি একটা হরলিক্স-এর বোতল থাকে।

বনবেড়াল ম্যাঁওম্যাঁও করে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে টলমল করে হেঁটে এগোয়। চেনা পা ভেবে মাথা ঘষতে চেষ্টা করে।

দাঁড়কাক শুরু করে,

—বজরা কোনো পুরস্কার পায়নি। কেউ ওর কোনো লেখা পড়েনি। কেউ ওর নাম জানে না। ওর বাড়িতে গেলে দেকবি সবগুলো ফালতু, মেকি। নিজেই অর্ডার দিয়ে দিয়ে বৈঠকখানা থেকে বানিয়েচে। কিন্তু এর একটা কথাও ওকে বলবি না। যে মুহূর্তে বলবি দেকবি ও মরে যাবে। বজরা...ম...রে...যাবে।

দাঁড়কাকও কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে। গোলাপ মল্লিক কাঁদতে থাকে। তিনজন ফ্যাতাড়ুও কাঁদতে থাকে।

এত কান্নায় লেখকও বেসামাল। পাঠক, বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, লেখকও এখন কাঁদছে। এবং এ প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে যে, যতটা পারব আমরা উশুল করে নেব।

ছয়

একটি ফিটন গাড়ি সেই কিনিসন জুট মিলের হলঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। গভীর রাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই মিলটা দখল করে অ্যামেরিকান এয়ারফোর্স তাদের এরোপ্লেনের ইঞ্জিন ধোয়া-পাখলা করত। সত্যি বলতে হলঘরটি এখন নেই কিন্তু যে গভীর রাতের কথা বলা হচ্ছে তখনই হলঘরটি গজিয়ে উঠেছিল এবং পাশেই স্ট্যান্ডার্ড জুট মিলের কোয়ার্টার থেকে সাহেব-মেমদের হাসি-ঠাট্টা, ছেনালি ও কান্না ভেসে আসছিল যদিও তারা বহুদিন আগে মরে ভূত হয়ে গেছে। ফিটনের থেকে নামল দাঁড়কাক আর বনবেড়াল। হলঘরে ঢুকে তারা দেখল হাতে টানা পাখা চলছে এবং ডিমের স্টাইলে টেবিলের ওপরে মোমবাতি জ্বেলে বেগম জনসন বই পড়চে এবং আরও বহু বই ডাঁই করা। বেগম জনসন ইশারা করে ওদের বসতে বলল। বনবেড়াল দেখল টেবিলের ফাঁকা জায়গাটায় কয়েকটা ম্যাসিভ কোলাব্যাঙ বসে আছে। বেগম জনসন টেবিলে দুটো টোকা মারতেই ব্যাঙগুলো লাফাতে লাফাতে টেবিল থেকে নেমে গেল।

—কি পড়ছি বলতে পারবে?

—ক্যাপিট্যাল? বলেছিলে ধরবে।

—ধরব। এটা শেষ হলে। মানে সাবজেক্টটা।

—কি এখন তোমার সাবজেক্ট।

—পাগল হরনাথ। তাঁর সাধনসঙ্গিনীর মানে ওয়াইফও রয়েছে, কুসুমকুমারী।

—এই এত বই! সব অ্যাবাউট হরনাথ?

—ইয়েস মাই লাভ। শুনবে কি কি যোগাড় করেছি। এক এক করে বলছি,

* পাগল হরনাথ—কার্তিকচন্দ্র রায়
* Souvenir on the Hundredth Birthday celebration of Pagal Thakur Sree Sree Haranath : Published by Haranath Anath Ashram, Swargadwar, Puri.
* হরনাথ স্মৃতি/(ষষ্ঠ লহরী)—ভবাণীচরণ সেন
* আমার অভিজ্ঞতা—অক্ষয়কুমার গুপ্ত
* পাগল হরনাথ—অটলবিহারী নন্দী
* হরনাথ স্মৃতি/(একাদশ লহরী)—শিশিরকুমার ঘোষাল
* অমিয় হরনাথ লীলাকথা—ভাগবত মিত্র
* হরনাথ চরিতামৃত—সত্যচরণ
* Haranath the Saviour–Vimala Modi
* Sree Haranath Lilamritam–Narayan Ch. Ghosh
* হরগাথা—রামগোপাল ভট্টাচার্য
* পাগলাঝোরা—তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রকাশক)
* শরণাগতি—পাগলভাই
* বিনোদমালা—বিনোদবিহারী ঘোষ
* Haranath–His play and Precepts
* Life and Message of Bhagwan Sri Kusum-Haranath–M. Sri Rammurthi
* Sri Kusum-Haranath, The Lord of Love–M.V.Rao
* The Divinity of Haranath the Crazy–Sapuri Lakshminarayan-sayya

আরও অনেক আছে, যোগাড় করতে পারিনি, ভেরি রেয়ার...

বনবেড়াল তাজ্জব,

—আমি তো বাবা নামই শুনিনি। হরনাথ...নো...নেভার।

—শুনবে কি করে? জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে সারাটা লাইফ। কতবার বলেছি, ক্যালকাটায় সেটল্ করো...শুনবেই না।

দাঁড়কাক বলল,

—ওকে বলে লাভ নেই। স্যাভেজ...

—হরনাথকে আজ হাতে গোনা কিছু ফ্যামিলি বাদে কেউ চেনে না। কিন্তু ওয়াজ আ জায়েন্ট মিস্টিক, ভাবো, 'হরনাথ-স্মৃতি'-র একাদশ লহরী থেকে কোট্ করছি : সোনামুখীর হিমু কাকার সহিত ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে বাগ-বিতণ্ডা হইত। হিমু কাকার কৌতুক প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া ভক্তেরা তাঁহার নিকট আসে কেন? ঠাকুর এই প্রশ্ন করেন। উত্তরে হিমু কাকা ওরফে হিমু গাঙ্গুলী বলেন, তোমার দৈবী শক্তি আছে। ঠাকুর অবজ্ঞাভরে বলিলেন, 'তোমার দৈবী শক্তিতে প্রস্রাব করে দিই।' বলো, ইন্টারেস্টিং নয়?

—হাইলি, কিছু ঠিক করলে? 'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার' তো গোড়াতেই ফেল মেরে গেল।

—ওসব ছোটোখাটো ফেলিওর সম্বন্ধে আই কেয়ার আ ফিগ্...কাল সারারাত এই নিয়ে মাদাম ব্লাভাৎস্কি-র সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। তিব্বতে। শি হ্যাজ গন্ ব্যাক টু হার মাস্টারস্। এবং ব্লু প্রিন্টটাও রেডি...

বেগম জনসন রোল করা কাগজটি খুলতে লাগলেন। বনবেড়াল ও দাঁড়কাক, উভয়েই কাগজটির ওপরে ঝুঁকে পড়ল। বিশাল হলঘরের কোণে অন্ধকারে ব্যাঙগুলো হঠাৎ ডাকতে শুরু করল ও টেবিলের ওপরে মোমবাতির শিখার পাশে চামচিকের চেয়েও ছোটো ছোটো মিনিয়েচার বাদুড় এসে ফড়ফড় করে পাক মেরে মেরে উড়তে লাগল। এরোপ্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ ক্রমশ জোরে হতে লাগল। পাটের ফেঁশো নিশ্বাসের সঙ্গে বুকে ঢুকে যে শত শত রোগা রোগা কালো মেয়ে টিবি হয়ে মরে গেছে তাদের কাশির শব্দ। অনেক বছর আগের আগুনের ধোঁয়া। কুয়াশা।

এতরকম শব্দ প্লাস কিছু দেখাও যাচ্ছে না। অতএব অধ্যায়টি নিয়ে আর এগোন সম্ভব হল না।

পুরন্দর ভদি-অভিধানে অ্যাড্ করেছিল—

'ভদি-ভয়াল'।

সাত

'কাকভোরে বা বলিতে গেলে ঘোর শীতের প্রায় শেষ রাতে অর্ধোন্মাদ শিবনাথ ঝড়ের গতিতে তাহার ডজ ট্যাক্সি উড়াইয়া গঙ্গার জেটির দিকে ধাবমান হইল। কলিকাতার বিশিষ্ট চর্ম ব্যবসায়ী মিস্টার কক্-এর সহিত তিনমাসের জন্য খানদানি খানকি মাল্টা চলিয়া যাইতেছে। শিবনাথের কাতর ওজর-আপত্তি দৃঢ়চেতা খানদানি খানকি উড়াইয়া দিয়াছে। বলিয়াছে—

—বিজনেস ইজ বিজনেস। কক্ সাহেবের নিকট হইতে তিন মাসে যে পরিমাণ রেস্ত কামাইব তাহা দশ বছর কলকেতার বাবুদের সহিত খিটকেল খেলা করিলেও জুটিবে না। ইহা সত্য যে খানকি জীবনে তোমাকেই আমি প্রেমিক বলিয়া পাইয়াছি। কিন্তু সে

কারণে জাত ব্যবসায় লালবাতি জ্বালাইতে পারি না।

—তিন মাস পরে যে তুমি ফিরিয়া আসিবে তাহার কি কোনো গ্যারান্টি আছে?

—বিচিত্র এ জীবনে কোনো কিছুতেই গ্যারান্টি নাই শিবনাথ। গরানহাটা হইতে খানকি জীবন শুরু করিয়া আজ কক্ সাহেবের দয়ায় মাল্টায় যাইতেছি—এমনটি যে হইবে তাহা কি জানা ছিল? ভাবিতাম লম্ফ জ্বালাইয়া পোকা ধরিয়া ধরিয়া কোলাব্যাঙের ন্যায় লাইফ কাটিবে। বলা যায় না, মাল্টা হইতে আবার কোনো সাহেব নয়া বুকিং করিয়া কোনো অজানা বন্দরে লইয়া যায়। তবে তেমনটি না ঘটিলে কক্ সাহেবের সহিতই আমি ফিরিয়া আসিব।

কাতর শিবনাথ সাশ্রুনয়নে গিটকিরি মারিয়া গান ককাইয়া উঠিয়াছিল, 'এই কি গো শেষ দান...বিরহ দিয়ে গেলে...'

জেটিঘাট। রোমহর্ষক কুয়াশায় সবই ঢাকা। তাহারই মধ্যে ভূতুড়ে জাহাজের মতো দাঁড়াইয়া আছে এইচ. এম. ভি. মালবেরা। ইহাতেই কক্ সাহেবের সহিত মাল্টা পাড়ি দিবে খানদানি খানকি। শিবনাথের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুবাষ্পে ভরিয়া নিদারুণ এই দৃশ্যটিকে আরও অস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। কুলির দল মাল উঠাইতেছিল এবং পবিত্র গঙ্গাতীরে অশ্রাব্য গালিগালাজ করিয়া পরিবেশ কলুষিত করিতেছিল। এই কুলিদের আর যাহাই থাক আক্কেল নাই। থাকিলে তাহারা জেটির ধারে আসিয়া গঙ্গায় প্রস্রাব করিত না। যাহা হউক, মাল চাপানো শেষ হইল। লাইন দিয়া প্যাসেঞ্জাররা চলিল, কিছুটা আগাইয়া জাহাজের সিঁড়ি দিয়া আরোহণ। ওভারকোট, শোলা হ্যাট, বাঁদরটুপি, মেমদের বাহারী টোপর, বালক সাহেব, বালিকা মেম এবং শিশু, বিলাতি কুকুর—ইহাদের মধ্যে শিবনাথ শতচেষ্টা করিয়াও খানদানিকে আলাদা করিতে পারিল না। প্রাণঘাতী ভোঁ বাজাইয়া এইচ. এম. ভি. মালবেরা ছাড়িয়া দিল। কাতর শিবনাথ বেদনার ভারে টলিতে টলিতে তাহার ডজ ট্যাক্সিতে ফিরিয়া আসিল।

খুবই কুয়াশা। হাত কয়েক দূরেই কেহ থাকিলে ভালো দেখা যায় না। শিবনাথের সহসা চমক লাগল। পরিচিত সেন্ট ও আরও পরিচিত জর্দাপানের গন্ধ। কুয়াশার মধ্যে ও কী? কাশ্মীরী শালে কান মাথা জড়াইয়া সে এক এলাহি আয়োজন। বিস্মিত শিবনাথ ক্ষীণ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,

—কে মা আপনি? ভাড়া যাইবেন?

—তুমি আবার আমাকে মা বলা শুরু করিলে কবে থাকিয়া?

—খানদা...!

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কক্ সাহেব কালই পটল তুলিয়াছে।

আশা করা যায় যে পিওর পাঁচু না হলে পাঠক বুঝতে পারবেন যে বজরা ঘোষ এক মহান ঔপন্যাসিক এবং হালের বাংলায় নভেল রচনার নামে যে ত্যাঁদড়া হারামিগিরি চলেছে তার মধ্যে বজরা ঘোষকে ভাবাই যায় না। বলাই বাহুল্য যে ক্রিটিকেরা আমাদের এই সুচিন্তিত মূল্যায়নের সঙ্গে একমত তো হবেনই না উপরন্তু অবজ্ঞা ভরে ঠোঁট বেঁকাইবেন। মাঝরাতে যখন মশারির ওপরে বনবেড়াল ল্যান্ড করবে তখন শালারা টের পাবে। যাই হোক, 'মসোলিয়ম' একটি মহৎ দায়িত্ব পালন করিল। বঙ্কিমচন্দ্র, আর. এন. টেগোর, তলস্তয়, বালজাক, দস্তয়েভস্কি, স্তাঁদাল প্রভৃতির ও ইত্যাদির পাশে জ্বলজ্বল করিতেছে একটি নাম—বজরা ঘোষ। বজরা ঘোষের অমর সৃষ্টি 'খানদানি খানকি' কবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবে।

'মসোলিয়ম' রচনা করার বা নামানোর ফাঁকে ফাঁকে 'খানদানি খানকি'-র নিবিড় পাঠ চলিতেছে। আমরা বিস্মিত হইয়াছি—বজরা ঘোষের একটি টেকনিককে। সেটি হল নিজের

উপন্যাসের মধ্যে স্বনামে লেখকের আবির্ভাব। নিজের নাম না করিয়া যেমন নিজের ছবিতে অটোগ্রাফের মতো উপস্থিত হইতেন ভীতিপ্রদ আলফ্রেড হিচকক।

যেমন, 'খানদানি খানকি ও শিবনাথ ম্যাঙ্গো লেন দিয়া হাঁটিতেছিল। তাহাদের নজরে পড়ে নাই যে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া একটি আম খাইতে খাইতে তাহাদের উপর নজর রাখিতেছে সাহিত্য সম্রাট বজরা ঘোষ। ম্যাঙ্গো লেনে আম যাহার আবার ইংরেজি হইল ম্যাঙ্গো। কি চমকপ্রদই না এই নাম-শব্দের খেলা।

'নিউ মার্কেটের একটি দোকানে একটি রাক্ষুসে সাইজের ডলপুতুল কিনিতে নাছোড়বান্দা খানদানি খানকি সরবে দোকানদারের সহিত দরদাম করিতেছিল। শিবনাথ কুঁই কুঁই করিয়া খানদানিকে সমর্থন জানাইতেছিল। দোকানদারদের রসবোধ প্রভূত। সে বলিতেছিল খানদানির দামেই সে ডলপুতুলটি বেচিতে পারে তবে, সেক্ষেত্রে পুতুলটির জামা-ফ্রক, ইজের ইত্যাদি খুলিয়া লওয়া হইবে। খানদানি হুঙ্কার দিয়া উঠিল—"ড্যাকরামুখো, ন্যাংটো পুতুল গছাইবি? দেখিবি? নাঙ্গা ডল দেখিবি? দেখাইব?" হঠাৎ পাশেই জলদগম্ভীর-স্বরে কে বলিয়া উঠিল "দেখাইবেন? দেখান।" বিস্মিত নেত্রে সকলে দেখিল বিশাল ভুঁড়িওয়ালা একটি সহাস্য মানুষ। মটকার পাঞ্জাবি ও ফাইন ধুতি পরা। মুখে হাসি। পাঠক জানিলে সুখী হইবেন যে লোকটি আর কেহই নয়। সাহিত্য সম্রাট বজরা ঘোষ।'

pathagar.net

আট

রণনীতিগত কারণে কমরেড আচার্য আনন্দবাজার পড়েন না। রোজ 'গণশক্তি' এবং পুজোর চারদিন 'নন্দন'। এরকম পার্টি নিষ্ঠ পাঠাভ্যাস থাকবার কারণেই কমরেড আচার্য জানতে পারলেন না যে আনন্দবাজারের দ্বিতীয় পাতায় সুভাষ শাস্ত্রী, পারমিতা, রণেশাচার্য, সত্যানন্দজী, জয়া গাঙ্গুলী প্রমুখের সচিত্র বিজ্ঞাপনের পরেই ভদির কচি বয়সের একটি চুলওয়ালা ফটো এবং তার তলায় লেখা 'পরমারাধ্য ভদি সরকার' এবং তলায় চারটি লাইন,

মরুক, যাহারা বলে 'নাই'
জানি, জানি, জানি তুমি আছো
'মমি'-রূপ লয়ে তুমি
যুগ যুগ বাঁচো।...এবং তারওতলায় 'অগণিত শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ'।

আঞ্চলিক নেতারা শুনেও শোনেননি বা শুনলেও কানখাড়া করেননি যখন ভদি-অঙ্গনে নন্-স্টপ কীর্তন বা ভদি-ভজন চলছিল।

ভদি ভদয়ে নম

ভদি ভদভদিয়ে নম
ভদি দাঁড়ে ভদি পাখি গায় ভদি নাম
ভদি ভদয়ে নম...

ভদি ভদভদিয়ে নম
ভদি ভ্যাদভেঁদিয়ে নম

ভদিভাবে ভদি ভাবো, গাও ভদি নাম
ভদি ভদয়ে নম...

ভদি-ভোমরার পালের এই গুঞ্জন বা তার রেশ কোথাওই পৌঁছয়নি।

ভরদুপুরবেলায় টেম্পো করে বড়িলাল, গোলাপ ও বল্লভ বক্সি যখন পলিথিনে মোড়া বিশাল, মানুষপ্রমাণ কাচের বাক্স নিয়ে এল তখনও কেউ খেয়াল করেনি।

কুস্তিগির বড়িলাল এবং তার বৌ কালী এই ফাঁকে ম্যাটিনি শো-তে গিয়ে দেখে এল ‘গ্যাঁড়াকল’।

নয়

দিনচারেক পরে দেখা গেল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় এবং নিছকই গুরুত্বহীন গলিঘুঁজি, ময়লা ফেলার জায়গা, পেচ্ছাপখানা—নানা জায়গাতেই ছোটোসাইজের একটি চোতা পোস্টার পড়েছে যাতে একটিই শব্দ লেখা

‘মমি’

এই চারদিনের মধ্যেই পুরন্দর ভাট তাঁর বাল-সিরিজের সেকেন্ড কবিতাটি নামায়। এবং কবিতাটি ভদি-মণ্ডলে সবিশেষ সমাদর পায়।

গ্রামে যাত্রাপার্টি
আসিয়াছে যাত্রাপার্টি
পালা ‘রাম-সীতা’
পালে পালে জুটিয়াছে
আবালবৃদ্ধবনিতা

ইন্টারভাল
সীতা ফোঁকে বিড়ি
রাম টানে মাল
আবৃদ্ধবনিতা ঘুমে কাদা

জাগিয়া বসিয়া আছে বাল

‘মমি’ পোস্টারটি খুব যে একটা ধুন্ধুমার আলোড়ন তুলেছিল এমনটি নয়। এ বিষয়ে লোকেও আজ খুব টনটনে জ্ঞানার্জন করে বসে আছে, পোস্টারের ঢপ আর তাকে টানে না। যাদের চোখে পড়েছিল তারাও বড়জোর যাদুঘরে রাখা ফারাও-দের চাকরের মমিটির কথা মনে করেছিল, যা সেই কবে ছোটোবেলায় দেখা। ঐ মমিটি এমনই নিরীহ যে ওটা দেখে কেউ আজ অব্দি ভয় পেয়েছে বলে শোনা যায়নি। এবং অনেকেরই মামি, মামি-টু এবং দা মামি রিটার্নস্ দেখা। কিন্তু এর দুদিন পরে যে পোস্টারটি পড়েছিল তা অতটা নিরামিষ নয়, একে আমরা সয়াবিনের মাংস বলে বর্ণনা করতেই পারি—‘**ভদিভবনে মমি**’। এতে করেও যে হৈ হৈ পড়ে গিয়েছিল বা মোড়ে মোড়ে গুলতন্, এমনটি হয়নি তবে দুচারজনের মরচেপড়া টনক

নড়ে থাকতে পারে। এরপর আর কোনো পোস্টার পড়েনি। পড়ার দরকারও হয়নি। এই সময়টুকু, পরের কোনো ঐতিহাসিক গবেষণায়, হয়তো 'ঝড়ের আগের থমথমে ভাব' জাতীয় ইডিয়টিক কোনো ভাষায় বর্ণিত হবে। নাও হতে পারে।

এই সময়টুকু যতটা আমরা স্টাডি করতে পেরেছি, ভদিকুলের মধ্যে অদ্ভুত একটা বিন্দাস ভাব বিরাজ করছিল যার মধ্যে টুকটাক খিল্লি ও রগড়ও দেখা গেছে। যেমন ডি. এস. মদনকে বলল,

—আজ আমার কয়েকটা টাকা খরচ হচ্ছেই।

—সে তো রোজই হয়—মাল কিনবে?

—বাল।

—তবে?

—একটা কালো বেল্ট কিনতে হবে। কুচকুচে। ব্যাস্ মার দিয়া...

—মানে?

—ব্ল্যাক বেল্ট। কোমরে চড়িয়ে যাকে একটা টিক্ দেব না রেড সুতো বেরিয়ে পড়বে।

—বুজেচি।

—কী?

—জ্যাকি চ্যান-ফ্যান দেখেচ টিভিতে। ভেবেচ কালো বেল্ট পরলে তুমিও ওরকম পারবে!

—পারবই তো। চ্যাক্— ডিগবাজি দিলাম, ঝাড়লাম গলায়—গঁক্। এরপর সাটসাট দুটো কিক্—ফিনিশ।

মদন কিছু বলেনি। পুরন্দর বলেছিল,

শুধু পরা ব্ল্যাক বেল্ট
আর কিছু নাই
আয়নায় করিতেছে
তুমুল লড়াই

অন্যদিকে গোলাপ আর বড়িলালের মধ্যে গল্প হচ্ছিল। এসব গল্প কেন যে আচমকা শুরু হয়ে যায় তা আর বোধহয় কোনোদিনই জানা যাবে না। তবে চেষ্টা চলছে। গোলাপই শুরু করেছিল,

—বর্ধমান লাইনে, কর্ডে, একবার এক ব্যাটা বাউল দেখি গুপিযন্তর নিয়ে পোঁদ দুলিয়ে ফ্যাঁসা গলায় চিল্লোচ্চে।

—ওসব বাউল-ফাউল দেকলেই আমার মাতা গরম হয়ে যায়।

—আমারও, তা শোনোনা, মালটাকে তো বিড়িফিড়ি দিয়ে সাইজ করলুম। বাঁড়া বলে কিনা লন্ডন, প্যারিস সব ঘুরে এসেচে।

—তা তুমি কি বললে?

—বলে দিলাম। আমি হলাম খানকির ছেলে গোলাপ মল্লিক, মই লাগিয়ে হাতির পোঁদ মারি।

—কি করল তখন?

—কি আবার করবে, শুনেই ফেটে গেল।

ওদিকে নলেন মেথরের সঙ্গে ঝগড়া করছিল,

—ওঃ মেথর, মেথরের মতো থাকবি। শালা নদ্দমায় হাত দেব না। তুই হাত দিবি না তো

আমি হাত দেব?

—নোদ্দোমোটা কি ছাঁই, কাঁটা ফেলার জায়গা? সকালে সিটি বাজিয়ে গাড়ি আসবে আর ছাই-কাঁটা সোব একানে ঢালবে। বিছুয়া-ফিছুয়া কিচু কামড়ে দিলে হাসপাতালের খরচা আপনি দিবেন?

—আমি কেন দিতে যাব? বিছে কামড়ালে তোকে কামড়াবে, আমার কি? কাউন্সিলারের ঠেঙে পয়সা চাইবি? ইল্লি!

ভদি আর বেচামনি বারান্দায় বসে প্রায় রোজকার এই ঝগড়া এনজয় করছিল। বেচামনি হেসে বলল,

—একানে কে বসে আচে জানিস? সে থাকতে কে কামড়াবে? বলে ভদিকে ঠারেঠোরে দেখায়। মেথরের মুখে অপার্থিব হাসি।

—নলেন, ওকে একটা পচাধচা দেকে পলিব্যাগ দে না। হাতে পরে নদ্দমা ঘাঁটবে। মাতায় বুদ্দি নেই। ঝগড়া করচে।

মেথর নলেনকে বলে,

—বউদিদি ঠিক বোলা।

নলেন রাগে গর্‌গর্ করতে করতে বাতিল পলিব্যাগ আনতে গেল।

সরখেল লিখছিল,

'ইংল্যান্ড দ্বীপের স্টোনহেঞ্জ ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রহস্যময় বিরাট বিরাট পাথর নানা ঢঙে সাজাইয়া রাখার বহর দেখিয়া দানিকেনসহ নানা সাহেব নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রতিটি মতই অসার। গরু খাইলেই যে মাথায় বুদ্ধি খোলে এমনটি নয়। হয়তো পেট গরম হইবার ফলে বায়ু কুপিত হইয়া নানাবিধ আজগুবি স্বপ্ন দেখায়। এমনই একটি থিওরি হইল যে ভিন্‌গ্রহ হইতে দানবরা আসিয়া ওইসব প্রস্তরখণ্ড সাজাইয়া পালাইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে পারে না। মানুষ ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়দা। সে এতকাল হাঁচরপাঁচর করিয়া বড়োজোর চন্দ্র পর্যন্ত গিয়াছে, আর কোথাও যাইতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। সে পারিল না আর দূর তারকামণ্ডল হইতে দানবরা আসিয়া ভূপৃষ্ঠে দৈত্যাকৃতি পাথর লইয়া লুডো খেলায় মাতিল, এ কথা উন্মাদও বিশ্বাস করিবে না। মানুষ যতদিন ধরাধামে আছে তাহা হইতে অনেক হাজারগুণ সময় ডাইনোসররা পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়াছিল। সাহেবরাই শিখাইয়াছে যে ডাইনোরা নিরন্তর কামড়াকামড়ি করিত এবং এ উহাকে দেখিলেই হিংস্র গর্জন সহকারে তাড়া করিত। এই ভুল শিক্ষাটিকেই আমি খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিব যে ডাইনোরা ছিল সুশীল ও শান্ত প্রকৃতির এবং অতীব সভ্য। রান্নাঘরে বাসনে বাসনে ঠোকাঠুকির মতো স্বাভাবিক কিছু হয়তো ঘটিয়া থাকিবে কিন্তু উহা বড়ো কথা নয়। সহস্র সহস্র বৎসর থাকিতে থাকিতে ডাইনোদের মনে 'আমরা কী ও কেন'? এই প্রশ্ন জাগরিত হয়। বিশাল বিশাল চক্ষু মেলিয়া তাহারা নানা আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমাধান খুঁজিয়াছিল। ত্রিতাপের জ্বালা কতদিন আর ভোগ করা যায়? অতএব, তারা তন্ত্রসাধনার পথ ধরিয়াছিল। ওই পাথর সাজাইয়াছিল তারাই, ওইগুলি এক একটি তন্ত্রপীঠ। আমাদের যাহা 'ওঁ', তাহাদের সেটিই ছিল 'গঁক্ঘ'। এইজন্যই দেখা যায় যে সকল ডাইনো-মন্ত্রের গোড়াতেই সেই 'গঁক্ঘ'।'

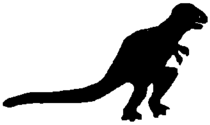

গঁক্ঘ

দশ

সম্ভাবনা খুবই কম কিন্তু সত্যিই কোনো পাঠক যদি গত নয়টি অধ্যায় অবধি 'মসোলিয়ম' পড়ার যন্ত্রণা ভোগ করে থাকেন তাহলে তিনি ধরেই নিয়েছেন বুঝতে হবে যে ভদিভবন-এর ভৌগোলিক স্থানাঙ্কটি নানা টাইপের মণ্ডলের নামে কালিঘাটে যে রাস্তাগুলো আছে তারই কাছের একটি ফ্যাকড়া-মার্কা আধা-রাস্তা আধা-গলিতে। ভদি-ভবনের রুফ টপে দাঁড়ালে আপনি মদনজী-র মন্দিরের ডগাটা দেখতে পাবেন। অর্থাৎ ওইখানেই আদিগঙ্গা এবং পেরোলেই চেতলা যেখানে বিমল মিত্রের মতো বিশিষ্ট সাহিত্যিকই শুধু নয়, বহুৎ হেকড়বাজ ভোঁ ও গাঁজিয়ালরাও থাকতেন। সবই লোপাট। ছিটেফোঁটা যা বাকি আছে সেও আর কদিনই বা। বাঁ দিকে যে রেল-ব্রিজ দেখিতেছেন সেটিই ছিল সাবেক কলকাতার বর্ডার। সেই জন্যই ভদিভবনের সন্নিকটে একটি পুলিশ-চৌকিও ছিল যেখানে আজও রাতে মরা পুলিশদের ভূত কুচ-কাওয়াজ করে। মরা চোরদের ভূত প্যাঁদানি খেয়ে হাঁউ-মাঁউ করে। মরা খানকিদের ভূতেরা অনুরূপ করে না কারণ তখন সিরিয়াসলি খানকি-ধরার রেওয়াজ ছিল না। এখন যেমন তাদের নিরন্তর হেনস্থা করা হয় তেমনটি হতো না। উপরে যাহা কিছু বলা হইল তাহা ঠিকও হইতে পারে, ভুল হইতে তো পারেই। তবে সব ছাপিয়ে একটি আক্ষেপ—ওফ্ আজ যদি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থাকত!

দাঁড়কাক বেগম জনসনকে বলল,

—তুমি বলছ পোস্টার ক্যামপেনের আর দরকার নেই? আমার কিন্তু কিরকম শেকি লাগচে। বনবেড়াল তো চাইছিল টি. ভি.তে দিতে। বলল, যে টাকা ইনভেস্ট করবে তার চারগুণ উঠে আসবে।

—হয়তো ঠিকই বলেছে বাট আই ডিফার। মনে রাখবে আমি চোখের ওপর কোম্পানিকে ইনডিয়া ক্যাপচার করতে দেখেছি, ব্যবসা আমার রক্তে। মাই আরগুমেন্ট ইজ টিভিতে না দিয়েই যদি ব্যবসাটা রম্‌রম্ করে জমে যায় তাহলে ফালতু আমি ওই মাদারফাকারদের পয়সা দিতে যাব কেন? দোজ অ্যাসহোল্‌স্!

—সেটা ঠিক, তাহলে আমরা কি করব? 'ভদিভবনে মমি'-তেই বলচ এনাফ কাজ হবে?

—নো ডিয়ার। এই নাও, স্টেপ বাই স্টেপ সব পেয়ে যাবে।

দাঁড়কাকের দিকে বেগম জনসন একটা চারনম্বর খাতা এগিয়ে দিল।

—আর একটা কথা, ভদির মমি নিয়ে যখন ডিবেট চলবে, লাইক যেমন ধনঞ্জয়ের হ্যাংগিং-এর সময়ে চলেছিল, তখন আমার পক্ষে ওপেনলি মাঠে নামাটা ঠিক হবে না। হাজার হলেও ভদি ইজ মাই সান এবং আমাদের বংশে, মানে স্টার্টিং ফ্রম দা গ্র্যান্ড ওল্ড আত্মারাম সরকার কেউ কাউকে ডিফেন্ড করে নি। বাংলা কথাটা হল—নিজের কেচ্ছা নিয়ে সামলাও, বাড়ির কেউ কিছু বলবে না।

—সেটা জানি। তুমি আর আমাকে কি বলবে। এই জন্যেই আমি বনবেড়ালকে আনবার অ্যাডভাইস দিয়েছিলাম।

—ও কি বলবে? ওয়াইল্ড একটা ক্রিচার, র মিট খায়!

—দ্যাখো মমির সাবজেক্টটা নিয়ে ও একজন অথরিটি, বুঝলে? লং বিফোর দা ফাকিং সাহিবস্, যখন লোকাল চোরগুলো পিরামিডে ঢুকত, ঢুকেই ওকে দেখতে পেত। ইজিপশিয়ান মমি তো হ্যাক্‌নিড একটা ব্যাপার, বুদ্ধিস্টট্ মমি সম্বন্ধে ওই আমাকে এনলাইটেন করে।

—বুদ্ধিস্ট্ মমি?

—হ্যাঁ। চায়না, জাপান, ভিয়েতনাম, কোরিয়া—এই সব দেশে তুমি ওদের পাবে। মালগুলো নিজেই মমি হয়ে গিয়েছিল।

—মানে?

—টেক্‌নিক্, টেক্‌নিক্। ধরো শেষ কয়েকটা বছর খাওয়া কমাতে কমাতে প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। তারপর স্রেফ জল আর হাওয়া। জলটাও টেঁসে যাওয়ার কয়েক মাস আগে, কমাতে কমাতে, ছেড়ে দিত। নো হাগামোতা, ওনলি বুদ্ধ'জ নেম, অ্যান্ড প্লেন হাওয়া। ব্যাস্, তারপর পট্‌লে গেল অ্যান্ড ইউ হ্যাভ আ সেল্ফ মেড মমি।

—তাজ্জব কি বাত্!

—এই জানবে। এখনও গিয়ে দেখতে পারো—শুঁটকো বাঁদরের মতো বসে আচে। আর একটা টাইপের মমি হল রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের কয়েকটা সেন্ট-এর, এগুলো ও দেখেচে কিয়েভ মোনাস্টরির তলায়। তবে সেগুলো শোয়া আর মুখ ঢাকা। ভূতুড়ে।

—মোস্ট থ্রিলিং। এখন দেকচি বুনো বানচোতটাকে. এতদিন কাঁচাখেকো বলে আন্ডার এস্টিমেটই করে এসেচি।

—আরে ওর খেল্ তো দেখনি। ওই রটেন সি. পি. এম-এর আচায্যিটাকে মুখ খুলতে দাও, দেখবে তখন! ধুতি খুলি দেবে!

ম্যাঁও!

pathagar.net

এগারো

কমরেড আচার্য একটা ভয়াবহ স্বপ্ন দেখলেন। কেন দেখলেন তা বলা সম্ভব নয়। আমরা শুধু এটুকুই জেনে আশ্বস্ত হলাম কমরেড আচার্য-র মতো স্বচ্ছ, সঠিক ও অভ্রান্ত মানুষও নেহাতই রাম-শ্যাম-যদু অর্থাৎ টম-ডিক-হ্যারির মতোই ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেন। এবং ভুলেও যান।

সুন্দরী এক সদ্যোমৃত মেমসাহেব। হাতে একটি ডাক্তারি ব্যাগ, জনৈক প্রৌঢ় মড়াটিকে নিরীক্ষণ করছেন। মৃতদেহটি নগ্ন। ফরসা দুটো পা নীল হয়ে গেছে, নাকটা কিছুটা বসা। প্রৌঢ় ব্যাগ থেকে ছুরি বের করলেন এবং ফ্যালোপিয়ান আর্চের তলায় ফেমোরাল আর্টারিটি কাটলেন, নাভির কাছেও কাটলেন এবং প্রচুর পরিমাণে ফরম্যালিন ইঞ্জেকশন করলেন। এরপর তাঁর ছুরি খুঁজতে লাগল ভিসেরা। সেখানে তিনি দিলেন প্যারাফিন। এবং তারপর প্লাস্টার ট্যামপোন দিয়ে ক্ষতগুলিকে বন্ধ করলেন। প্রৌঢ়ের মাথায় টাক চকচক করছিল আর সেখানে গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম ছিল। স্বপ্নের মধ্যেই কমরেড আচার্য বুঝতে পারলেন যে এতক্ষণ ভয়াবহ যে দৃশ্য তিনি দেখছিলেন সেটা দেখা যাচ্ছিল একটা কাচের জানলার মধ্য দিয়ে। কোনো অজানা কারণে কাচটা ঝাপসা হয়ে গেল।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে কমরেড আচার্য-র স্বপ্নটা মনে ছিল না। সামান্য একটু অস্বস্তি ছিল কিন্তু বেলা গড়াতে না গড়াতে সেটাও চলে গেল।

কমরেড আচার্য কিন্তু কোনো স্বপ্ন দেখেননি। তিনি দেখেছিলেন একটি সত্যি ঘটনা। ঘটেছিল ১৯৫২ সালে। ওই মৃত মেমসাহেব হলেন এভিতা পেরন। ওই টাকমাথা প্রৌঢ় হলেন ডক্টর

পেদ্রো আরা। আর্জেন্টিনার একনায়ক হুয়ান পেরনের নির্দেশক্রমে তিনি এভিতা পেরনের মমি বানিয়েছিলেন। লে!

বারো

ভদিভবনের দরজার ওপরে লাগানো হয়েছিল একটি নতুন সাইনবোর্ড।

'মার্শাল ভদির মসোলিয়ম'

সাইনবোর্ডটি ছাড়াও, আর একটি বোর্ড ছিল তলায়। তাতে লেখা ছিল 'মমি দেখার সময়—বেলা দুইটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা, প্রবেশ মূল্য ১০ টাকা, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন মসোলিয়ম বন্ধ থাকিবে। একতলা বাড়িটির চারখানি ঘরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘরটির মাঝখানে পূর্ববর্ণিত কাচের বাক্সে ছিল ভদির বমি। ভুঁড়ি অব্দি চাপা একটি লাল আর্ট সিল্কের কাপড়। মাথায় একটি লাল ভেলভেটের ছোটো, নরম বালিশ। মমির ওপরে গোল শেড দেওয়া একটি নীলচে বাল্‌ব। লাল কাপড় ও নীলচে আলো। ভদির মমির মুখে স্মিত একটি হাসি কিন্তু মমির বাক্সটির পাশ দিয়ে হেঁটে ঘুরে যাওয়ার সময়ে কারো কারো মনে হয়েছিল যে দাঁত খিঁচোচ্ছে। ঘরে একই সঙ্গে মশার কয়েল ও সুগন্ধ ধূপ জ্বলছে। দেওয়ালে লাগানো এস. ইউ. সি-র কোটেশান এক্সজিবিশনের স্টাইলে ভদির বাণী—'সময় হলেই আমি জেগে উঠব', 'ওরে পাগলা, ভেবেছিস আমি নেই!', 'মদ, রেস, গাঁজা—সবই ভগবানের দান। নিবি না কেন?', 'মাগিবাড়ি না গেলে দুঃখী মেয়েগুলো খাবে কি?', 'ছড়িয়ে আছে, কুড়িয়ে নে', 'সময় থাকতে গিঁট খোল্', 'হাওদা আছে, হাতি কই?', 'সব ভালো যার পোঁদ ভালো', 'মায়া হল জালি গামছা, টেনে খুলে দে' ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব ছাড়াও বড় সাইজের সন্তোষ টু-ইন-ওয়ানে বিরামহীন 'ভদি-ভদয়ে নম, ভদি ভদ্‌ভদিয়ে নম...'। দরজার বাইরে একটি এক হাতল ভাঙা চেয়ারে বেচামনি, শ্যাম্পু করা চুল, জমকালো শাড়ি, গলায় জবার মালা এবং পায়ের কাছে একটি থালা। অনেক পাব্লিক আছে যে ঘর থেকে বেরোতেই চায় না বা কাচের বাক্সের গায় টুকটুক্ করে। তাদের তাড়াবার জন্যে ভেতরে ডিউটি নলেনের। টিকিট দিয়ে টাকা নেয় সরখেল। ওভার-অল সিকিউরিটির দায়িত্বে রিটায়ার্ড মেজর বল্লভ বক্সি সকলের ওপর ফৌজি নজর রাখেন এবং মাঝেমধ্যে ছাদে উঠে বাইনোকুলার দিয়ে চারপাশটা সার্ভে করে নেন।

বেগম জনসনের বিজনেস স্ট্র্যাটেজিটি যে কি মোক্ষম তা কয়েকদিনের মধ্যেই হাতেনাতে প্রমাণ হয়ে গেল। ফার্স্ট স্টেপটি অনুযায়ী কাজ করতেই মামলা জমে গেল।

বেগম জনসন বলেছিলেন, প্রথমে নিজেদের যত লোক, সব বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে দাও। লাইনটি যেন অতিরিক্ত সুশৃঙ্খল না হয়, আবার আনরুলি নেটিভদের মবেও যেন না পরিণত হয়। অল্পস্বল্প ধাক্কাধাক্কি, গাঁড়-পুষিং ও খিস্তিখাস্তা চলতে পারে। যারা ঢুকবে তারাই আবার বেরিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়বে। এরকম চলতেই থাকবে।

এবং এর ফল ফলে গেল হাতেনাতে। সব সময়ই, সব রাস্তাতেই উদগাণ্ডু পাব্লিককে দেখা যাবে চলেছে। খোঁজ নিলে জানা যাবে ওদের এই নিরন্তর চলাফেরার পেছনে ভ্যালিড কারণ

খুব কম। বেহালা থেকে কোনো শালা হয়তো বড়বাজারে ধনে-র টন কত করে যাচ্ছে জানতে বেরিয়ে পড়ল। এবং যাবিই যখন স্ট্রেট চলে যা। তা না ল্যাওড়া হয়তো রাসবিহারীতে নেমে বাঁদিকে ভাঁজ মেরে গলি-গলতায় ঢুকে পড়ল। ইদানীং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এমন অনেকেই জেনে গেছে যারা জানে না যাদবপুরেই একটা আস্ত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। যাই হোক, সেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়েই একবার ভাট পাব্লিকের এই কেয়টিক ঘোরাঘুরি নিয়ে একটি পি. এইচ. ডি. গবেষণা হয়েছিল বলে শোনা যায়। তাতে বিশেষভাবে ক্যালকাটানদের এই বিচিত্র অভ্যাসের ব্যাপারটি অ্যানালিসিস করা হয়। দেখা যায় যে কলকাতার ইকনমিকালি ডিপ্রেস্‌ড্ সেকশনের লোকেরাই এরকম বেশি করে—উদ্দেশ্যবিহীন ঘোরাঘুরি। বম্বেতে স্ট্রং ইকনমিক ধান্দা না থাকলে গরিবরা নিজেদের এলাকাতেই ডান্সিং বার ও অন্যত্র ছেনতাই ফেনতাইয়ের লাইন করে। দিল্লিতে গরিবরা গাড়ি চাপা পড়ে মরার ভয়তে নিজের মহল্লা ছেড়ে বেরোয় না। কলকাতায় সব কিছুই উল্টো। এখানকার লোক সেই তানসেনের আমল বা প্রফুল্ল সেনের যুগ হয়ে আজ অব্দি যেরকম হারামি ছিল তেমনই রয়ে গেছে।

যাই হোক, মবলগে কেসটা ক্যাঁচা হয়ে গেল। ভদির টিমের মমি দেখার লাইন দেখে আলতুফালতু কিছু পাব্লিকও মমি দেখতে ভিড়ে গেল। এবং এর ফল হল ইলেকট্রিফাইং—সেই দিনই সন্ধেবেলায় কাটুয়াখোটি লেন থেকে কেন্টোফারর লেন, সিঁথি থেকে নেবুতলা, ম্যান্টন থেকে বালমুকুন্দ মক্কড় রোড—নানা জায়গায় সংগ্রামী জনগণ জেনে গেল যে কলকেতায় মমি উটেচে।

কলকাতার প্রসিদ্ধ বৃদ্ধদের কথা কে না জানে যাদের হারামিপনার দোসর মেলা ভার। তাদেরই আলোচনা,

—শুনেচ?

—কি?

—মমি বেরিয়েচে। কালিঘাটে। ওই যে, তোমার গে, বাপন, নিজের চোকে দেকে এসেচে।

—মমি? মাগিফাগি হবে। বুড়ো কানে কি শুনতে কি শুনেচো।

—না হে বাঁড়া! ঠিকই শুনেচি। মমি! মমি!

—বলো কি ভায়া! তবে তো দেকে আসতে হচ্চে।

খবর কি করে কয়েক মিনিটের মধ্যে শহরের এমুড়ো থেকে পাঁচমাথা হয়ে ও মুড়োয় পৌঁছে দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে গণেশের দুধ প্যাঁদানোর বেলাতেই কলকাতা ট্রায়াল দিয়ে রেখেছিল। মমির বেলাতে সেই ট্রায়ালের সুফল পাওয়া গেল। বস্তি এলাকায় শুরু হয়ে গেল মমি-ডান্স। মোড়ে মোড়ে মমি-বিরিয়ানি ও মমি-রোলের দোকান বসে গেল। ভদ্দরলোকেদের পাড়ায়ও অন্যথা হল না। চল্লিশ কিলো ওজনের এক-একটা বাচ্চা স্কুল থেকে ফিরে ম্যাগি গিলতে গিলতে বায়নাক্কা জুড়ে দিল—'মমি দেখব, মামি, মমি দেখব!' এবং মমির ঘাড়ে চড়ে ভদির নামও ফেটে গেল।

পুলিশ কমিশনার জোয়ারদার জানতেন যে তাঁরই আই. বি. ডিপার্টমেন্টের স্টাফ গোলাপ মল্লিক ভদির ভক্ত। এটাও তিনি জানতেন যে দুঁদে গোয়েন্দা তারকনাথ সাধু গোলাপকে সবিশেষ স্নেহ করেন। মার্শাল ভদি সম্বন্ধে জোয়ারদারের ফিয়ারও ছিল ('কাঙাল মালসাট' দ্রষ্টব্য) তবে মার্শাল ভদি পটল তুলে মমি হয়েছে, এই ব্যাপারটায় তিনি খুব একটা নতুন করে ভয় পাননি। মালটা পট্‌লে গেছে, এটাই তো বিরাট রিলিফ। জোয়ারদার জানতেন যে, যে কোনো টাইমে কমরেড আচার্য ব্যাপারটা নিয়ে তাঁকে ক্যাঁক ধরে ধরবে। জোয়ারদার তারকনাথ সাধুকে ডেকে

pathagar.net

পাঠালেন।

—বলুন মিস্টার সাধু, কিরকম চলছে?

—যেরকম চলে। মার্ডার আর রেপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করচি। ঘেন্না ধরে গেল। তবে চারদিকে, কলকাতায়, মানে আপনার পুলিশে নয়, তা হলেও পুলিশ তো, পুলিশ কি রেটে রেপ কেসে ফাঁসচে দেখে তাজ্জব হয়ে যাচ্চি।

—সেই তো, সেই তো। এক একসময়ে আই ওয়ান্ডার, এদের কি হ্যাপি কনজুগাল লাইফ নেই? কোথায় রেপ হবে, পুলিশ ধরবে, তা না নন-রেপিস্ট পুলিশকেই রেপিস্ট পুলিশকে ধরতে হচ্ছে। পুলিশই পুলিশকে ধরছে। প্যারাডক্সিকাল।

—এবার বলুন, কেন ডেকেচেন?

—আই নো, আপনি ফালতু বিটিং অ্যাবাউট দা বুশ পছন্দ করেন না। বিশেষ করে আপনার, মানে, ওই গোপাল আর কি, মানে যাকে আপনি যথেষ্ট স্নেহ করেন—কিছু জানতে পারলেন, ওই মমির ব্যাপারে।

—একটা ছোটো মিসটেক হয়ে গেল, গোপাল নয়, গোলাপ।

—ইয়েস, ইয়েস, গোলাপ। রোজ! রোজ!

—ওর কাছ থেকে জানতে হবে কেন? ভদি মরে মমি হয়েছে—সিম্পল। দেখেও এসেছি।

—দেখে এসেছেন?

—হ্যাঁ, যে কেউ দেখে আসতে পারে। কাচের বাক্সে মড়া, মানে ভদির। নো সাইন অফ ডিকম্পোজিশন।

—স্ট্রেঞ্জ! আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়? মানে মার্শাল ভদি সম্বন্ধে?

—ও গোলাপ অনেক কিছু বলে। সব আমি বিশ্বাস করি না। তবে একটা ম্যাজিকাল ব্যাপার আছেই।

—ঠিক! ঠিক!

তারকনাথ সাধু চলে যাওয়ার পরে মিঃ জোয়ারদার একটা ইন্ডিয়া কিং ধরালেন এবং আমেজে চোখ বুজলেন। বাড়িতে ললিতা জোয়ারদারের অর্ডার চলে। ওনলি দুটো সিগারেট বরাদ্দ—ওয়ান ফর পায়খানা, ওয়ান আফটার ডিনার। প্যাসিভ স্মোকিং হতে পারে, তাই বারান্দায় গিয়ে খেতে হয়। জোয়ারদার মনে মনে বললেন, 'মোস্ট হারামি মাগি। হায়ার্ড কিলার দিয়ে মার্ডার করিয়ে দেব, তখন বুঝবে।' এমন সময় ফোন বাজল।

—আমি টালিগঞ্জ থানার ও. সি. ভট্‌চায্‌ বলছি স্যার।

—বলো, এনি প্রবলেম?

—প্রবলেম স্যার, হেভি প্রবলেম। মার্শাল ভদির মমির ওখানে হেভি ক্রাউড। লাইনে ঝাড়পিট হচ্ছে। লোক পাঠিয়েছি।

—ভালো করেছো।

—স্যার, এই ম্যানপাওয়ারে এর পরে কুলোতে পারব না। এখনই তো স্যার, কলাবাগানে বোম মারামারি চলছিল। ঘুরে এলাম। নিজেকেই যেতে হল। লোক কই?

—পলিটিকাল?

—না স্যার, লোটো খেলা নিয়ে কিচায়েন। তবে পলিটিকাল হয়ে যেতে পারে, এনি টাইম।

—দেখছি, কি করা যায়।

ফোন রেখে ফের স্বগতোক্তি করলেন, 'ওফ্, এই হয়েছে এক লোটো। সাট্টা তাহলে কি

pathagar.net

দোষটা করল?' দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়লেন জোয়ারদার এবং এই ভাবনার মধ্যেই তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল জানলায়, হিউজ একটি দাঁড়কাক বসে। জোয়ারদার বললেন,

——হুশ!

দাঁড়কাক নির্বিকার। চোখ পিটপিট করছে।

বুড়ো দাঁড়কাক। হয়তো কালা। ফের বললেন, এবার আরও জোরে,

—হুশ! হুশ!

দাঁড়কাক বলল,

—একটা ঠোক্কর দিলেই বুজবি। গাণ্ডু কোথাকার। বাড়ি গিয়ে দ্যাখ্ কি হয়েচে!

এই বলে পুঁক্ করে একটি বাতকর্ম করে দাঁড়কাক উড়ে গেল।

ঘাবড়ে গেলেন জোয়ারদার। ঘামতে ঘামতে বাড়িতে ফোন করলেন,

—ললিতা কোথায়?

—আঁজ্ঞে, লেডিজ ক্লাবের মেম্বারদের সঙ্গে মমি দেখতে গেছেন।

—কি?

—কালিঘাটে কোথায় মমি বেরিয়েছে। তাই দেখতে গেছেন।

—ওফ্, মাই গড!

জোয়ারদার ধড়াম্ করে রিসিভার নামালেন।

গঁক্ঘ ঘঁক্ হুঁয়াক্ হোঁয়াক্ ভঁক্ ভঁক্

pathagar.net

তেরো

একেলা বসিয়া আছি
ঘরে
কার, কার তরে

মমি নিয়ে ডামাডোল জমছে, বিস্তর টাকা উঠছে, প্রথমে মাদার ডেয়ারির প্যাকেটে ভাঁজ করে রাখা হচ্ছিল, এখন বড়ো পলিব্যাগে মানে দেড় কিলো দু কিলো মুরগি আনার কালো পলিব্যাগে নোট জমানো হচ্ছে এবং সব টাকা চলে যাচ্ছে প্রথমে, সরখেলের বাড়ির বিদঘুটে সিন্দুকে এবং পরে কারফর্মার ল্যান্ডমাস্টারে করে গভীর রাতে গরচায়। টাকা সরিয়ে ফেলার এই বুদ্ধিটি বেচামনির। সে যেমন চলছে চলুক, এদিকে, মদন, কাঁচা ঘুম থেকে পেচ্ছাপ পেয়ে যাওয়ায় জেগে উঠে দেখল যে পুরন্দর ঘরে নেই। পুরন্দরের হালের কবিতার খাতাটি খোলা, সেখানে জ্ঞান গোঁসাইয়ের গানের সামান্য একটু ইংরিজি অনুবাদ,

In this empty chest, Bird mine, come back, come back.

মদন আপনমনে বলল, 'বানচোত কি সুইসাইড ফাইড করতে গেল নাকি। কি ঝকমারি মাইরি!' মদন মুতে এসে ফের ঘুমিয়ে পড়ল। ডি. এস. তার ঘরে বউ-বাচ্চা নিয়ে জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছিল। কলকাতার রাতের আকাশে অনেক ভূত হাওয়া খেতে বেরোয়। তাদেরই কয়েকজন দেখল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পরির কাছে একটা লোক বসে আছে। এটাও তারা

বুঝল যে লোকটার মনে খুব কষ্ট। কিন্তু কিছু করার নেই। মিডিয়াম না পেলে ভূতরা কখনোই মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে না। পরির মিডিয়াম হওয়ার কোনো ক্ষমতাই নেই। গঙ্গার দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল। পুরন্দর দেখল ঘুম পাচ্ছে। ঘুমের ঘোরে যদি নিচে পড়ে যায়? পুরন্দর দৃশ্যটা ভেবে শিউরে উঠল। সকালে মর্নিং ওয়াকাররা গোল হয়ে ভিড় করেছে আর দাঁত ছরকুটে মারা পাতিকাকের মতো পড়ে আছে পুরন্দর। মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম তাড়িয়ে রাতের মহাকাশের দিকে তাকালো সে। তারার ফুল ফুটেছে। চাঁদ চলেছে বলে ঠাওর হয়, মেঘ চলেছে বলে। একটা এরোপ্লেন গেল। এরোপ্লেনে যারা বসে আছে তারা কোথায় চলেছে? এয়ার হোস্টেসরা ঘুমোচ্ছে না জেগে আছে? ফের কষ্টের শুরু। পুরন্দর ফের উড়তে লাগল। এবারে মাঠের মধ্যে গিয়ে অন্ধকারে বসি বরং। ঘুম পেয়ে গেলে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না।

মাঠে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল পুরন্দর। কিন্তু খস্‌খস্ চলার শব্দ আর শস্তার সেন্টের গন্ধ পেয়ে তাকাল অন্ধকারে। সাদা নাইলনের শাড়ি পরা রোগা একটা মেয়ে।

—কান্না করচো কেন? একা বসে?

—কেউ নেই। একা বসে আচি। থাকতে নেই?

—না। একা থাকতে নেই। যাবে? ঘর আচে।

—তোমার নাম।

—সবিতা। আর তুমি?

—আমি পুরন্দর। পুরন্দর ভাট।

—বিহারী?

—না, না, বাঙালি।

—বেশ নাম। কি করো গো তুমি?

—আমি। আমি কবিতা লিখি।

এই সময়েই খুঁজতে থাকা টর্চের ঝলক ওদের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিল।

—একটা কেস পেয়ে গেচি স্যার! এই শালা, এই!

টর্চের আলো এগিয়ে আসে।

—মাগিটা ফ্লাইং স্যার। খদ্দের নিয়ে জাপটাজাপটি করছিল। আবে, এই! ধর তো, মেরে গাঁড় ফাটিয়ে দে...

পুরন্দর সবিতার হাত শক্ত করে ধরেছিল আর মেয়েটা এত পলকা, এত রোগা যে ওকে নিয়ে উড়তে অসুবিধে হয় না।

—এ কি, তুমি তো উড়চ?

—তুমিও পারবে। বলো, 'ফ্যাৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই!' ভয় নেই, বলো। আমি তো আচি। কেউ আর ধরতে পারবে না।

সবিতাও উড়তে থাকে। পাশাপাশি।

—এ কি করলে গো তুমি আমায়? তুমি কি ভূত নাকি গো?

—ধ্যুস্ ভূত কেন হতে যাব? আমরা হলাম ফ্যাতাড়ু।

—একন কোতায় নিয়ে যাবে আমায়?

—চলো না। খারাপ লাগচে?

—না, ভালো লাগচে। পাখির পানা উড়চি। হি হি... উড়চি!

pathagar.net

চোদ্দো

সবিতাকে পাওয়ার অনির্বচনীয় আনন্দ পুরন্দরের কোনোদিনই ফুরোতে পারে না। সবিতা-পুরন্দরকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালো ডি. এস-এর বউ। শাড়ি দিল একটা অ্যামেরিকান জর্জেটের। বউ-পালানো মদনও দেখা গেল আনন্দে ডগোমগো। বেচামনি, কালী সকলেই সবিতাকে কাপড় দিয়েছিল। লালবাজারের কলমের দোকান থেকে কিনে পিয়ের-কারদাঁ-র একটা বল পয়েন্ট পেন ইন এ বাক্স প্রেজেন্ট করল গোলাপ। বলল,

—পুলিশ বলে ভেবনা কাব্যি ফাব্যি বুঝি না। ইস্কুলে পড়েচিলাম কবি কালিদাস রায়। এখনও ঝাড়া বলে যেতে পারি।

পুরন্দরের ভাগ্যটা সত্যিই খুলে গেল। যারা 'কাঙাল মালসাট' আর ফ্যাতাড়ু-র গপ্পো ছেপে ডুবেছে তারা পুরন্দরের কবিতার একটা ফোল্ডার বের করল, 'কবিবর পুরন্দর ভাটের ভাটের কবিতা'। বাংলা কবিতার কন্ট্রোল রুমে খবরটা কি পৌঁছেছিল। ঐ কন্ট্রোল রুমটিতে ঢুকলে নানা রেয়ার জাতের হাফ-ডাইনো ও কতিপয় কুমিরকে দেখা যাবে যাদের ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বা অ্যানিমাল প্ল্যানেট চ্যানেলে দেখা যায় না। এদের ধরে ধড়াদ্ধড় ক্যালানোর হাই টাইম অনেক দিন আগেই পার হয়ে গেছে। যাই হোক, ওই ভেড়ুয়াগুলোকে নিয়ে কস্টলি সময় না ওয়েস্ট করে আমরা বরং পুরন্দরের কাব্য-জীবনের নতুন পর্যায়টি একটু সাইজ করতে পারি। কেন নতুন? এই কারণে যে মাগ বাগাবার আনন্দে পুরন্দর এমন একটি মাল নামিয়ে দিল যা আগে কখনও ঘটেনি। সনেট!

অ্যাকোয়াটিকায় ভাসে মরা টিকটিকি
পাণ্ডার পোঁদে লাথি, কালিঘাটে সিকি
ব্রেক-ডান্স শুরু হবে, প্যান্ডেল তাই,
গগনে গরজে মেঘ, বেগুনি প্যাঁদাই

আন্ডারয়্যারে গিঁট, পেল তেড়ে হাগা
লাগানোর স্বপ্নতে কত রাত জাগা
মইটি দাঁড়িয়ে থাকে, গাছ দিল ছুট,
বারো হাত কাঁকুড় তো বিচি তের ফুট

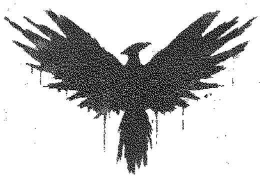

দণ্ডিত আসামীর খণ্ডিত গান
গাণ্ডুর পণ্ডিতি, মণ্ডিত প্রাণ
লণ্ডভণ্ড করে ব্যান্ডিট হাটে
আণ্ডা-র গড়াগড়ি, ডাণ্ডা ললাটে

ডিম্ ডিম্ রব ওঠে সাঁওতাল গ্রামে
ফান্ডা বাড়াতে হলে চাপা পড়ো ট্রামে

পুরন্দর এটা জানতে পারেনি যে পেত্রার্ক, স্পেনসার, শেক্সপীয়র, মিল্টন প্রমুখ সনেটবীররা তারিফ জানাতে কার্পণ্য করেননি কারণ তাঁরা উল্লিখিত কন্ট্রোল রুমের আওতায় পড়েন না।

লোকাল কমিটির লিডার প্রাণকেষ্ট গুপ্ত ওরফে পেঁচোদা দেখলেন ক্যাডারদের মনে মমির ভয় ঢুকে গেছে। তাঁরও যে ভয় ছিল না তা নয়। কারণ প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি একপাল বুড়োর খপ্পরে পড়েছিলেন যারা প্রায় রোজই বাজারের পয়সা ঝেড়ে জিলিপি, কচুরি সাঁটায়। দু-একটা খেতেও দেয়। সেই কারণেই পেঁচোদা দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং একটা ফ্রি জিলিপি খেয়ে আঙুল চুষে ধুতিতে মুছতে মুছতে বলেছিলেন,

—ভীমরতি আর কাকে বলে। ওসব মমি ফমি সব পিওর গ্যাঁজা। ভালো করে দেখুন, ন্যাপথলিন ঠেসে হয়তো মড়া রেখে দিয়েছে।

—তা তোর পার্টি কি করচে?

—ওয়াচ করচে। বেশি হুজ্জুতি হলেই স্টেপ নেবে।

—শুনেচ, ওয়াচ করচে। বলচে নাকি ন্যাপথলিন পোরা মড়া। দ্যাখ্ পেঁচো, পাড়ার ছেলে বলে একটা কতা বলে রাকি। এ তোর কলতলায় ঝিদের ঝগড়া থামানো নয়, মমি বলে কতা। ঝাড়েগুষ্টিতে লোপাট করে দেবে।

—কে? ওই মমি।

—হ্যাঁ, ওই মমি। পিরামিডের মমি যারা টেনে বের করেচিল, একটা সায়েবও বাঁচেনি। কোনোটা তেতলা থেকে ঝাঁপাচ্চে, কোনোটা পোকামড়ে কামড়ে ফৌৎ। কিচু জানবি না, পড়বি না, কেবল চোতা কপচানো। ওয়াচ মারাচ্চে!

পেঁচোদা ঘাবড়ে যায়। আর একটা বুড়ো, এটা হেভি খজড়া, ধরতাই নিয়ে নিল,

—মমির গাঁড়ে আঙলি করতে যাসনি যেন। দেখচিস বাক্সে দিব্যি রয়েচে। রাত হলে বেরোয়...হয় তোর রক্ত চুষে নিল বা ঘেঁটি মট্‌কে দিল...তখন 'মামা' বলে চেঁচালেও কেউ আসবে না। বা ধর্ তোর কিচু করল না কিন্তু তোর বউ হয়তো গলায় দড়ি দিল। বাড়িতে হয়তো অপঘাত ঘটে গেল। আমার কতা হল, যা জানিস না বুজিস না তা নিয়ে ধন নাচাবার দরকারটা কি? মমিকে মমির মতো থাকতে দে, তাহলে ও কিচু করবে না। বরং হয়তো উল্টে ভালোই করে দিল। তোর ফেসকাটিং দেখেই বুঝতে পারচি পোঁদে ভয় ধরেচে। আর একটা জিলিপি খাবি?

লোকাল কমিটির কাছে নানারকম রিপোর্ট আসতে লাগল। সবই নাকি প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। মমি নাকি মাঝরাত্তিরে আদি গঙ্গায় গিয়ে চান করে, তারপর ভিজে কাপড়ে মায়ের মন্দিরের দিকে যায়। কোন্ বাড়ির বউ নাকি ছাদে মেলা কাপড় তুলতে ভুলে গিয়েছিল। রাত করে তুলে আনতে গেছে, অমনি তিনটে মানুষ মাপের ভূত নাকি ঝটপট করে উড়ে পালালো। কে নাকি পায়খানার সামনে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়েছে, ওমা, সকালে গিয়ে দেখে বিরাট বিরাট পায়ের ছাপ। বাজারের মুরগির দোকানে রাত্তিরে জালফাল ছিঁড়ে নাকি গোটা দশেক মুরগি হাওয়া। মমির ভয় সেইভাবেই ছড়াতে লাগলো যেভাবে আগে প্লেগ ছড়াতো। অবশ্য কলকাতায় ইঁদুরের যা হিউজ পপুলেশন তাতে প্লেগ আবার নতুন করে ছড়াতেও কোনো বাধা নেই।

কংগ্রেসের এক লিডারকে মিডিয়ার প্রশ্ন,

—মমি নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন?

—হাই কম্যান্ড না জানালে মুখ খুলব না।

তৃণমূলের জনৈক লিডারও ইভেসিভ,

—দেখি উনি কি বলেন।

বি. জে. পি-র নেতার জবাব,

pathagar.net

—যাঁর মমি হয়েছে তিনি কতটা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। আর. জে. ডি-র নেতা,

—কেয়া মমিয়া মমিয়া করতে হো। হাম কেয়া কুছ কমি হ্যায়?

দাঁড়কাক আর বনবেড়াল গিয়ে দেখল বেগম জনসন হেভি মন দিয়ে ক্রিকেট ম্যাচ দেখচে টি. ভি-তে। এম. সি. সি. বনাম হিন্দুজ। খেলাটা তখন টিভিতে লাইভ হচ্ছিল যদিও খেলাটা হয়েছিল বম্বেতে ১৯২৬-এর ১ ডিসেম্বর।

—ওফ্, ইন্ডিয়ান নেটিভগুলো দেখচি খেলাটা শিখে ফেলল, ইউ শুড ফিল প্রাউড।

দাঁড়কাক আর বনবেড়াল দেখল ১৩টা বাউন্ডারি আর ১১টা ওভার বাউন্ডারি মেরে ১৫৩ রান করে সি.কে. নাইডু ডিপ-এ কট্-আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছে। বেগম জনসন টিভিটা মিউট করে দিলেন ফলে ছবি চলতে লাগল।

—আমাদের কিন্তু একটা ভুল হয়ে গেছে।

বলে তিনটে গেলাসে লেমনেড ঢাললেন জনসন।

—কি ভুল?

—ভদিকে সিন্স্ হিজ ইনফ্যান্ট ডেজ দেখে আসছি। পেটটা ওর বরাবরই উইক। এখনও তো খাওয়া কন্ট্রোল করতে পারে না। কালই তো হাফ-হাঁড়ি কাঁকড়ার ঝোল একাই সাঁটিয়ে দিল।

—সো হোয়াট?

—মানে ধরো তেমন হাগা শুরু হয়ে গেল যে ছুঁচোবার জল পোঁদে ড্রাই হওয়ার চান্স পাচ্ছে না। তখন ও শুয়ে থাকবে কি করে?

বনবেড়াল লেমনেড খেতে খেতে বলল,

—এটা তো আমাদের ভাবা উচিত ছিল।

—তাই আমাদের ইমিডিয়েটেলি ভদির একটা ফাইবার গ্লাস রেপ্লিকা বানানোর দরকার। ইভা পেরনের মমিরও রেপ্লিকা ছিল।

দাঁড়কাক হেসে বলল,

—দরকার হবে না।

—কেন?

—পরকায়া-প্রবেশ। ভেরি ইজি। ভদির বডিতে আমি ঢুকে যাব। ভদি ঢুকবে আমার বডিতে। হাগলে হেগে মরবে দাঁড়কাক। ভদি যেরকম রয়্যাল স্টাইলে মমি হয়ে আচে তেমনই থাকবে।

—ওফ্, ইউ আর সিম্পলি অ্যাসটাউন্ডিং।

বেগম জনসন টিভির মিউট অফ করলেন। লাইভ, ১৯২৬ সালের হাততালি শোনা গেল।

pathagar.net

পনেরো

মমি দেখার লাইন রাসবিহারী মোড় পেরিয়ে যেতে শুরু করল। ইংরিজি, বাংলা, হিন্দি—সব কাগজে মমি ছয়লাপ। ডিডি বাংলা, সিটিভিএন, তারা, আলফা, আকাশ—সব চ্যানেলেও ভদির মমি দেখা গেল। স্মিত হাসি, ভুঁড়ি, তৎসহ 'ভদি ভদয়ে নম, ভদি ভদভদয়ে নম...'। শোনা গেল মেট্রো মমি স্পেশাল চালাবার কথা ভাবছে। ওদিকে টিকিট কেনার দশ টাকা বাদেও বেচামনির পায়ের কাছে রাখা থালাতেও নোট ও কয়েন পড়তে থাকল। ভদি-ভজনের ক্যাসেট ও সিডি বেরোল। উঠতি বাংলা ব্যান্ড 'ক্লাউন'-এর গান এফ. এম-এ বাজতে লাগল, 'এ মমি! ও মমি! উঃ মমি! আঃ মমি!' জোয়ারদার একদিন ডিউটি থেকে আর্লি বাড়িতে ব্যাক করে দেখলেন এবং শুনলেন, ললিতা প্লাস বান্টি সেন হিমানী সোম, মিসেস দারুওয়ালা প্রমুখ লেডিজ ক্লাবের সদস্যরা ভদির ছবির সামনে বসে ভদি-ভজন গাইছে।

যেটা জোয়ারদার আশঙ্কা করেছিলেন সেটাই হল। ফোনে কমরেড আচার্য। বোধহয় বাড়ি থেকেই কারণ আবছা টেগোর সং শোনা যাচ্ছিল।

—আপনারা কি কিছুই করবেন না?

—কি ব্যাপারে, স্যার?

—ওই যে কি মার্শাল ভদির মমি না কি একটা ননসেন্স চলছে। ভদি, সে মরল, সেটা অবশ্য গুড নিউজ, কিন্তু সায়লেন্টলি মমি হয়ে গেল। চারদিকে মমি, মমি! যদিও একটা হোক্স। পিওর গ্যাঁজাখুরি কেস। এতকিছু হল, আপনি কি করছিলেন।

—দেখুন, মরে গেছে, মমি হয়েছে, এ ব্যাপারে আমাদের কিছুই করার নেই।

—কিন্তু, এতবড়ো একটা ফ্রড্!

—না, আমি ডিফার করছি স্যার, সে আপনি যাই ভাবুন। আমি নিজে দেখে এসেছি, পারফেক্ট মমি। নো হোক্স। এবং হাইলি ফ্রেশ। নো ব্যাড স্মেল, নাথিং।

—আপনি নিজে গেলেন?

—হ্যাঁ, নিজে। তবে কাবলিওলা সেজে। কেউ চিনতে পারেনি।

—সেটা ভালোই করেছেন। তবে, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবুন। এ জিনিস চলতে দেওয়া মানুষ কখনোই মেনে নেবে না।

ধাম্ করে রিসিভার রাখলেন কমরেড আচার্য। অমনি খিঁচিয়ে উঠলেন জোয়ারদার, 'মানুষ মেনে নেবে না! বাল। পালে পালে দৌড়চ্ছে লাফাচ্ছে। মেনে নেবে না। পারা গেলনা।' জোয়ারদার পকেট থেকে ওয়ালেট বের করলেন, খুললেন। মার্শাল ভদির একটা ফটো। জোয়ারদার গুনগুনিয়ে ভদি-ভজন গাইতে লাগলেন।

রাতে সরখেলের বাড়ি। দোতলার একটি ঘরে সরখেল, বল্লভ বক্সি, গোলাপ, তিন ফ্যাতাড়ু, দাঁড়কাক ও বনবেড়াল। এমন সময় দরজায় খুট্ খুট্ হল। বেচামনি ও নলেন ঢুকল। বেচামনি মাথা থেকে পরচুলো খুলল, শাড়ি খুলল—আন্ডারওয়্যার পরা ভদি। সকলেরই মুখে আনন্দ। বিশেষ করে আনন্দ পুরন্দরের। ঘরভাড়ার তোড়জোড় চলছে। ততদিন সবিতা বেচামনির কাছেই থাকবে। পিটার স্কটের বোতল খোলা হল। সঙ্গে রেশমি চিকেন কাবাব। এমন সময়ে দরজায় ফের টক্ টক্। এবারে বড়িলাল। কালী কষা মাংস রেঁধে পাঠিয়েছে।

—আচ্ছা ভদিদা, এই যে তুমি নিঃশ্বাস না নিয়ে অতক্ষণ থাকো, টেকনিকটা কি।

—ভেরি স্পেশাল টাইপের একটা কুম্ভক।

—শিখলি কোথায়?

প্রশ্নটি দাঁড়কাকের। ভদি উঠে গিয়ে দাঁড়কাকের পায়ে মাথা ঠেকায়। দাঁড়কাক বলে,

—নে, বসে আরাম করে মাল খা। তোর যা ধকল যাচ্চে। চোক্তারের গুষ্টি ছাড়া এই কুম্ভকটা কোনো শালা জানে না। চারপুরুষ আগে আমাদের লাইনে আর কি, আউ আর গাউ বলে দু ভাই জন্মেছিল। গাউ ওলাউঠোয় পট্‌লে গেল। আউটা ছিল হেভি হারামি। আর তেমন সাহস। তখনকার দিনে, ভাব, মণিপুরী খাম্বা বলে স্পেশাল একটা গাঁজা আনতে গিয়েছিল মণিপুর। সেখানে জঙ্গলে জালিবাবা বলে এক সাধুর কাছে আউ এই কুম্ভকটা শেখে। জালিবাবা আবার অজগরদের শীতঘুম স্টাডি করে মালটা রপ্ত করেছিল। এই টেকনিকেই ব্যাঙ-ফ্যাঙ ঘুমোয়।

বনবেড়াল বলল,

—আমিও শিখে নেব ভাবছি। মড়া হয়ে পড়ে থাকব। খরগোশ, ছোটো হরিণ, শেয়ালের বাচ্চা, শুওরের ছানা—এরা মরা দেখে পাত্তা দেবে না। শুঁকে দেখার জন্য কাছে আসবেই। এলেই ঘ্যাক্।

—আরে তোর তো শিখতে দু মিনিট লাগবে। কোনো ব্যাপারই না। পুরন্দর, বাল সিরিজ আর এগোল?

—লিখেচি একটা, আজই, তবে রিভাইজ করা হয়নি।

—গুলি মার্। পড়্।

pathagar.net

—সামনের জমিটি নাবাল
তাহারই সম্মুখে বসি
কবিকূল পাড়িতেছে ফাল
আঁকা-বাঁকা আল
সেই পথে নাচিছে শৃগাল।

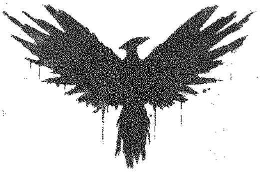

এরপর, দেখিয়া ভিডিও
আসিল বিডিও
নাবাল জমিতে
ফ্যালে মাটি
কোঁকড়া কোঁকড়া ফলে
সার সার আঁটি।

কাঁদিয়া মরিছে কবিপাল
সম্মুখে ঢেউ তোলে বাল।

বাঃ বাঃ, সাধু! সাধু! হারগিজ হবে না, চাম্পি! চাম্পি! প্লাস হাততালি ও হুপ্ হাপ্ সম্ভবত আরও কিছুক্ষণ চলতো যদি না দরজাটা আস্তে করে খুলে গিয়ে একজন কাবলিওয়ালা দেখা যেত। মেজর বল্লভ বক্সি 'হু ইজ দেয়ার?' বলে গর্জন করলেন এবং তাঁর ডানহাত কম্যান্ডো জ্যাকেটের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। ভদি ডান হাত অভয় দেওয়ার স্টাইলে না তুললে এই নন-ভায়োলেন্ট নভেলটি হয়তো সহিংস রূপ ধারণ করিত।

কাবলিওয়ালা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়কাককে প্রণাম করে বলল,

—সেদিন তিনবার 'হুশ' বলে মহা অপরাধ করেছি। মাপ করে দিন স্যার।

—আমিও তোকে 'গাণ্ডু' বলার জন্যে ক্ষমা চাইছি।

—ছি, ছি, আপনি গুরুজন, মন চাইলেই খিস্তি মারবেন। মার্শাল ভদি, আজ আমি আপনারই দলে। চোক্তার বানান, ফ্যাতাড়ু বানান, ইচ্ছে হলে কিছু না-বানান, ম্যাটারস্ লিটল।

বনবেড়াল গোলাপকে বলল,

—গোলাপ, তোর উচিত ওঁকে স্যালুট করা।

গোলাপ একটু টং। সে বলল,

—কাবলেফাবলেকে গোলাপ মল্লিক স্যালুট করে না।

কাবলে বলল,

—ছিঃ রোজ! হাজার হলেও আমি এখনও তোমার বস্ যদিও ইন ডিজগাইজ। আই অ্যাম নগরপাল জোয়ারদার।

গোলাপ দু হাত দিয়েই স্যালুট মারে।

জোয়ারদার একটা জব্বর খবর এনেছিল। আজ বাদে কাল রবিবার স্পেশাল অর্ডার নিয়ে কলকাতার মেডিকেল কলেজের মড়া স্পেশালিস্ট ডঃ গুরুচরণ বটব্যাল মমি পরীক্ষা করতে আসবেন। সঙ্গে প্রেসের লোকও থাকবে।

এসেওছিলেন বটব্যাল। ভদির পেটে হাত বুলোলেন। পেট বাজালেন। পায়ের আঙুল টানলেন। ঠোঁট সরিয়ে দাঁত দেখলেন। পাতা টেনে চোখ। এরপরেই ক্যাচাল। ব্যাগ থেকে তিনি দুটি স্লাইড এবং একটি সন্না বের করলেন। মেজর বক্সি খ্যাঁক্ করে উঠলেন,

—কি করবেন ওগুলো দিয়ে? মমিকে কোনো খোঁচাখুঁচি চলিবে না।

—না, না, নো খোঁচাখুঁচি। বডির একটু স্যাম্পেল লাগবে। ডি. এন. এ টেস্টের জন্যে।

গোঁফ উঁচিয়ে হাঁ হাঁ করে উঠলেন মেজর বক্সি।

—নো, আর টাচ করিবেন না। সেকেন্ডলি, এটা বডি নয়, মমি। নো ট্যামপারিং। আই ওয়ার্ন ইউ।

—মানে, আপনি সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশন করতে দেবেন না।

—চোপরাও বুড়চাচোদ্, এর পর কিন্তু ফায়ারফাইট স্টার্ট হইবে।

ডঃ বটব্যাল তো বটেই, প্রেসের লোকেরাও এক্স-ফৌজির থ্রেটে ঘাবড়ে গিয়েছিল। সবই কাগজে বেরোল। কমরেড আচার্য স্টেটমেন্ট দিলেন, 'বিজ্ঞানের পথে বাধা সৃষ্টির এই ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে একটা কথাই, মমি নিছকই ভণ্ডামি। আমি জনগণের কাছে আবেদন করছি যে বিভ্রান্ত হবেন না, বিভ্রান্তিকর গুজবও ছড়াবেন না। সরকার এই ব্যাপারে যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।'

বেগম জনসন বনবেড়াল ও দাঁড়কাক বললেন,

—আচায্যি লোকটা সুবিধের নয়। মোটকথা, আমাদের স্ট্র্যাটেজি হবে যতদিন না মেজর একটা ঝামেলা বাধছে চুপচাপ মাল কামিয়ে নেওয়া। যাতে করে এর পরে নাইদার দা চোক্তারস্ নর দা ফ্যাতাড়ুজ প্লাস যারা আমাদের দলের—কারও কোনো ফিনান্সিয়াল ডিফিকালটি না হয়।

—জোয়ারদার বলচে যে অ্যাসল্ট একটা আসবেই। তখন আবার ভদির কোনো প্রবলেম না হয়।

—বাবা হিসেবে দুশ্চিন্তা ইউ ক্যাননট পারহাপ্স অ্যাভয়েড। কিন্তু এটাও তুমি জান যে ভদিকে কেউ টাচ করতে পারবে না।

—সে তো বটেই।

বনবেড়াল বলল,

—ভদিকে কে টাচ্ করবে। আমি থাকতে ইভেন রবার্ট বুশও ওকে কিছু করতে পারবে না। ঘ্যাঁও!

ওদিকে নানা নিউজপেপারে একটি চিঠি বেরোল। তলায় পিশাচদমন পাল ও অন্যান্য বাঘা বাঘা মালদের সই। মমি সম্বন্ধে সরকার ও পার্টির নেতিবাচক মনোভাবের তাঁরা বিরোধী। বাঙালির মমি বাংলার মুখকে উজ্জ্বল করেছে। মিশরের প্রাচীন মমিদের গ্ল্যামার বাংলার টাটকা মমি অনেকটাই হাওয়া করে দিয়েছে। মার্শাল ভদির সঙ্গে কারও বিরোধ থেকে থাকতে পারে। কিন্তু নির্বাক ও নির্বিরোধী মমির বিরুদ্ধে বিষোদগার মর্মান্তিক বেদনারই কারণ ঘটাচ্ছে। হায়, বাঙালি রোজই মরে কিন্তু মমি মাত্র একটি। সেটিও কি থাকবে না? মমির প্রতি মমত্ববোধ যেন আমরা না হারাই। তা না হলে সেদিনের বেশি দেরি নেই যে হা মমি, হা মমি করিয়া রোদন করিতে হইবে। কই, লেনিনের মমি নিয়া তো ইঁহারা কাঁউ কাঁউ করেন না।

বিখ্যাত খচড়াদের চিঠি পড়ে ক্ষেপে গেলেন কমরেড আচার্য। এটাও অনুভব করলেন যে এদের গুলি করে মারা উচিত। পারা যাচ্ছে না বলে হাতও কামড়ালেন। এবং সেই সঙ্গে একটি টপ মোস্ট আর্জেন্ট গোপন সার্কুলার বাছাই করা লিডারদের হাতে চলে গেল।

‘দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অভ্রান্ত আলোয় মমি সমস্যাটিকে বিশ্লেষণ করা হবে এবং সমস্যাটির মোকাবিলাও করা হবে।’

মিঁয়াও

ষোলো

এই অধ্যায়টি নিপাট অধ্যয়ন।

‘শুভ্র মেরুদেশ। অরোরা বরিয়ালিসের প্রেতাভা আলোয় সকলই তাল তাল বরফ। তলায় লাভা। আবার এমন আইসক্রিমও কারনানি ম্যানসনে খানদানি খানকি খাইয়াছিল যাহার উপর ফরাসী ব্র্যান্ডি ঢালিয়া দিয়াশলাই ঠুকিয়া দেওয়া হয়। খানদানি খানকির ওই বিশাল দেহের নানা সংবেদনশীল এলাকায় ঢেউতে ওলটপালট খেতে খেতে শিবনাথ মাই-এর ডগায়, মানে বোঁটার ওপরে উঠে গেল, ওখান থেকে ‘জয়-মা!’ বলে পেটের ওপর ডাইভ দিয়ে পড়ল। খানদানি খানকির বডি। স্লিপারি। চালমুগড়া, চন্দন ও অলিভের গন্ধে মাতোয়ারা। হাতড়ে হাতড়ে শিবনাথ চলল খানদানি খানকির নাভির দিকে যা একটি অতলান্ত কূপ যার গভীর হইতে একটি নির্দেশ ধ্বনিত হচ্ছিল—‘যা নেমে যা’। শিবনাথ অন্বেষণে চলিতে লাগিল। স্লোপ। হাসনুহানার ঝোপ। ঐ, ঐ, প্যাগোডার চূড়া দেখা যাচ্ছে। গ্যারেজ না প্যাগোডা। শিবনাথ, শ্বাসরুদ্ধ শিবনাথের কানে টাইফুনের শব্দ। ভাবিল সে কি ঢেঁকি ঢেঁকি খেলিবে না চোর-পুলিশ? খানদানি খানকির বিশিষ্ট অ্যানাটমিতে শিবনাথ বলিয়া কেহ নাই। আছে রাধানাথ শিকদার। তাহাকে এভারেস্ট মাপিতে হইবে।’

বজরা ঘোষ প্রণীত ‘খানদানি খানকি’

(প্রথম খণ্ড)

সতেরো

ঘ্যাক্

পার্টি অফিসের দোতলায় মমি বিষয়ক গোপন উচ্চস্তরীয় মিটিং। পার্টির জঙ্গী যুবনেতা যেমন আছেন তেমন 'শুডচা' বলে পরিচিত বনমন্ত্রী বনবিহারী তা আছেন, আছেন আই. টি. বিভাগের মন্ত্রী যিনি প্রায়ই বিদেশের আই. টি. ব্যবসার হন্‌চো-দের মিট করতে সিলিকন ভ্যালি বা সিঙ্গাপুর উড়ে যান। আছেন ফিশ অ্যান্ড চিকেন দপ্তরের মন্ত্রী যাঁর চীনে গিয়ে মুরগি ঘাঁটাঘাঁটি করার জন্য বার্ড ফ্লু হয়েছিল।

কমরেড আচার্য শুরু করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় টেবিলের তলা থেকে,

—মিঁয়াও!

কি ব্যাপার! বনবিহারী তা টেবিলের তলায় ঢুকে আঃ আঃ করতে করতে কালপ্রিটকে অ্যারেস্ট করলেন। তুলতুলে ছোট্ট একটা বেড়ালছানা।

কমরেড আচার্য মক্ রাগ দেখালেন।

—তলায় নেপালী দারোয়ান আর দোতলায় বেড়ালছানা! আজব ব্যাপার।

বনবিহারী তা বেড়ালছানাকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে বললেন,

—দা ট্রাবল উইথ দা কিটেন ইজ দ্যাট
ইভেনচুয়ালি ইট বিকামস্ এ ক্যাট

—কবিতাটা ভালো? কিন্তু কার?

—অ্যামেরিকান কবি অগডেন্ ন্যাশ্-এর।

—তার মানে ইম্পিরিয়ালিস্ট প্রোপাগান্ডা। ওসব ফালতু জিনিস পড়েন কেন?

বনবিহারী তা চুপ। ফিশ অ্যান্ড চিকেন মিচকে হাসছে। বেড়ালছানা ঘুমোচ্ছে।

—যাই হোক, আমি শুরু করছি। প্রথমেই বলব যে মমি নিয়ে ব্যাপারটা ইনটলারেবল লিমিটে চলে গেছে। নিশ্চয়ই কমরেডরা কাগজে ওই রিঅ্যাকশনারি অপারচুনিস্টদের চিঠিটা পড়েছেন। এদের এমন সাহস যে ওরা লেনিনের মমি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কোথায় সোভিয়েত বিজ্ঞানের যুগান্তকারী সাফল্য আর কোথায়...

মুহূর্তের মধ্যে বেড়ালছানাটি উষ্ণ কোল থেকে টেবিলে লাফিয়ে ওঠে ও জিমনাস্টদের স্টাইলে উল্টো ভল্ট খেতে খেতে দু সেকেন্ডের মধ্যে হিংস্র বনবেড়ালে পরিণত হয়—পিঠের রোঁয়া, ল্যাজ সব ফোলা। সেই সঙ্গে ঘঁ ঘঁ গর্জন।

—সব টলারেট করা যায় কিন্তু ঢপবাজি দেখলেই আমি রেগে যাই। সোভিয়েত বিজ্ঞান। লেনিন মারা গেল ২১ জানুয়ারি, ১৯২৪। সাত বছরে সোভিয়েত বিজ্ঞান পয়দা হয়ে গেল? ওফ্, চুপচাপ শুনে যা, আখেরে লাভ হবে। ২১ জানুয়ারি—সন্ধে ৬টায় লেনিনের ভয়ঙ্কর কাঁপুনি, নিশ্বাস অনিয়মিত। পালস্ রেট মিনিটে ১৩০। সাড়ে ৬টায় নাড়ির গতি নেমে এল। টেম্পারেচার ৪২.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ৬-৫০-এ স্ট্রোক। মুখটা লাল, উঠে বসার চেষ্টা, তারপর মাথাটা এলিয়ে পড়ল। শেষ। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অটোপসি রিপোর্টে বলা হয়েছিল "died from cardio-respiratory arrest following a brain haemorrahage in a context of atherosclerosis" নে, কফি আর প্রন পকোড়া বল্। কাল হেভি রয়্যাল চ্যালেঞ্জ পেঁদিয়েছি

উইথ রেওয়াজি খাসি অ্যান্ড ডিপ ফ্রায়েড বুড়ো পাঁঠার বিচি। মাথাটা ক্লিয়ার করার দরকার। উল্টোপাল্টা কিছু করিস না। তোদের ইনজিওর করার কোনো ইনস্ট্রাকশন নেই।

কফি ও প্রন পকোড়া এসে গেল।

মুখ খুললেন বনবিহারী তা।

—আজ্ঞে, আপনি কার কাছে কথা বলা শিখেছেন?

—শিখতে হয় না। সব আপ্‌সে। তুই তো তাও বইফই পড়িস। সাকি মানে এইচ. এইচ. মুনরো-র একটা গল্প আছে, 'টোবেরমরি', আর বুলগাকভের 'দা মাস্টার অ্যান্ড মার্গারিটা'-টা পড়ে ফেললে, পুরোটা না হলেও, আমার সম্বন্ধে কিছুটা জানতে পারবি। 'মসোলিয়ম'ও পড়তে পারিস। তবে মালটা এখনও ফিনিস হয়নি। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, ছোটো করে বলি, যা মাথা এক একটা, সব বাউন্সার হয়ে যাবে,

লেনিনকে মমি করার বিরুদ্ধে ক্রুপস্কায়া ২৯ জানুয়ারি, ২০০৪, প্রাভদায় লিখেছিলেন। কেউই পাত্তা দিল না। ইন ফ্যাক্ট ১৯২৩-এ লেনিনের মৃতদেহ টিকিয়ে রাখার ব্যাপারটা নিয়ে পলিটব্যুরোতে কথা ওঠে। তুলেছিল স্তালিন। কিন্তু প্রোজেক্টটা অ্যাকচুয়ালি শুরু করে ঝেরঝিনস্কি। আমি আর ফিউনেরাল, কারা কফিন বয়েছিল, তাদের কতজনকে স্তালিন ঝেড়ে দিয়েছিল, ট্রটস্কি কেন ছিল না—ওসব ঘাঁটছি না।

ওদিকে মৃতদেহ পচনের প্রথম চিহ্নগুলো দেখা যাচ্ছিল—মুখ আর হাতের চামড়া কালো হয়ে যাচ্ছিল, দেহের নানা জায়গায় চামড়া কুঁচকে যাচ্ছিল, মুখটা একটু ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। তিনজন বলশেভিক নেতা ব্যাপারটা দেখছিল—মলোটভ গাধাটা, আর ইয়েনুকিদ্‌জে আর ক্রাসিন। ওই ক্রাসিন ব্যাটা ভেবেছিল রেফ্রিজেরেশন করবে। কিন্তু ডাক্তাররা বলল বডি টিকবে না। এই রিপোর্টটা পড়ে ইউক্রেনের খারকভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভরোবিয়েভ খচে গিয়ে ঝুক বলে একজনকে বলে যে টেকানো যায়। সেই ঝুক-ই ঝেরঝিনস্কিকে জানায়। মালটা তখন যেতে বাধ্য হয়। পরে ভরোবিয়েভের সঙ্গে যোগ দেয় জব্‌রস্কি। এর মধ্যে অধ্যাপক আব্রিবাসভ বডিতে ফরম্যালিন্ অ্যালকোহল আর গ্লিসারিন ইঞ্জেকশন করেছিল। যাই হোক ক্রাসিনের ছাগুলে বুদ্ধি শেষ অব্দি বরবাদ হয়—মাইনাস ৬ ডিগ্রিতে নাইট্রোজেনের মধ্যে বডি রাখলে আর দেখতে হতো না। এরপর আনা হল লেনিনগ্রাদের থ্যানাটেলিজির অধ্যাপক শর-কে, তোদের যেটা ওই ব্যাটবল না কি যেন। যাই হোক, মৃত্যুর দু মাস পরে ভরোবিয়েভ এমবামিং-এর কাজ শুরু করে। জব্‌রস্কিও ছিল। এরা কেউই সোভিয়েত আমলে কাজ-কারবার শেখেনি। পরে জব্‌রস্কি-র ছেলেও লেনিনের মমি রক্ষণাবেক্ষণের দলে ভিড়ে যায়। সবটাই সম্ভব করেছিল গ্লিসারিন আর পটাশিয়াম অ্যাসিটেট-এর সলিউশন যা বানিয়েছিল ভরোবিয়েভ। বডিতে এটা ইঞ্জেকশান করা হতো, বডিটা ওতে চোবানোও হতো।

অটোপসির ফলে মাথায় আর বুকে যে সেলাইয়ের দাগ ছিল সেগুলো ঢাকা দেওয়া হয়। ফুসফুস, লিভার, ভিসেরা সব বাতিল। ফরম্যালিন দিয়ে টিসুগুলোকে শক্ত করা হয়। গোঁফের তলায় সেলাই করে ঠোঁটদুটো জোড়া রাখা হয়। চোখ উপড়ে নতুন চোখ বসিয়ে চোখের পাতা সেলাই করা হয়। আর বলব? আমি তো নন্ স্টপ বলে যেতে পারি—ভরোবিয়েভের রহস্যজনক মৃত্যু, পার্জের সময় কি হয়েছিল—এন্ডলেস। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় লেনিনের মমি পশ্চিম সাইবেরিয়ার তিউমেনে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাইহোক, এবার আশা করি ফালতু প্যাঁক্ প্যাঁক্ করবি না।

এবার আমি মিহি করে ফুটে যাব। তবে তার আগে একটা কথা বলে যাই। ভদির মমির

একটা বালও তোরা ছিঁড়তে পারবি না। আর বেশি ডেয়ারডেভিলগিরি করলে মেজর বল্লভ বক্সি কিন্তু হাতেনাতে দুমদাম কিছু একটা ঘটিয়ে দেবে। এর জন্যে বেগম জনসন, দাঁড়কাক, আমি বা ভদি—কেউ দায়ী থাকবে না। বনবিহারী, চলি ভায়া। নর্থ বেঙ্গলে ইনস্পেকশনে গেলে, রাতের দিকে দেখা করে নেব, তোর তো আবার মালফাল চলে না। টা...টা...

ঘরে যেন টর্নেডোর শব্দ। টেবিলের ওপরে হঠাৎ বেগম জনসনের মুণ্ডু দেখা গেল। হিউজ থোবড়া। স্মাইলিং। ভ্যানিশ করে গেল। তারপরই দাঁড়কাক। সে-ও উড়ে গেল। বাকি ছিল বনবেড়াল। সেও জানলা দিয়ে লাফ মেরে হাওয়া।

সকলেই চুপ। টেবিলে হাতে মাথা নিয়ে কমরেড আচার্য। খুবই কাতরকণ্ঠে বনবিহারী তা-কে বললেন,

—আগামী রোববার, ভিড়ভাট্টাও থাকবে না, আপনি জোয়ারদারকে নিয়ে একবার যান। গিয়ে ওদের হাইকম্যান্ডকে বলুন আমরা কোনো ঝামেলা চাই না। ফেসসেভিং-এর জন্যে অ্যাডভাইস চান। এরকম ঝামেলা জানলে স্টেটমেন্টটা পাব্লিকের কাছে দিতামই না। আমার ব্রেন আর কাজ করছে না। মিটিং খতম। যে যার কাজে যান। কাজ যা হচ্ছে তা তো জানি! যান, ড্যাবড্যাব করে কি দেখছেন!

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সিগারেট ধরিয়ে বলেছিলেন—প্যাক অফ ইডিয়টস্!

pathagar.net

আঠারো

আশা করা যায় যে 'মসোলিয়ম'-এর পাঠক-পাঠিকা বা ওই জাতীয় খোকাখুকুরা এতক্ষণে মগজস্থ করে ফেলেছে যে বনবেড়াল বা দাঁড়কাক বা বেগম জনসন—এদের কেউই যথেষ্ট পরিমাণে গ্রাউন্ডওয়ার্ক না করে খেলতে নামেনি। তার প্রমাণ হিসেবে আমরা একটি গোপন সাক্ষাৎকারের গোটাটাই জানিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছি।

২০০৫ সালের ডিসেম্বর। মস্কো। মাইনাস টুয়েন্টি। প্রায়ান্ধকার একটি ফ্ল্যাটে বসে লেনিন মসোলিয়ম ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানী নিকোলাই মার্দাশেভের (এটি সঠিক নাম নয়) সঙ্গে উপরোক্ত তিনজনের এরকম কথাবার্তা হয়েছিল—

বেগম জনসন : ওফ্ আপনাদের মানে রাশিয়ান বিজ্ঞানীদের হাঁড়ির হাল দেখে আমরা একাধারে স্তম্ভিত ও শোকাহত।

মার্দাশেভ সবই ঠাকুরের ইচ্ছে। তবে এখন তো তাও আগের চেয়ে ভালো। তা না হলে ভদকা আর ক্যাভিয়ের দিয়ে আপনাদের ওয়েলকাম করতে পারতাম। এক বছর আগেও এটা, মাইরি বলছি, ভাবাই যেত না।

বনবেড়াল কেন?

মার্দাশেভ দেখুন একটু তাহলে খুলেই বলি। মস্কোর মেয়র ইউরি লুজকভ আমাদের বুদ্ধিটা দেয়। ওস্তাদ ঘরানার মাল তো, হেভি ঘোড়েল। লুজকভই আমাদের বলল, দেখুন, মড়া তাজা রাখার যে বিরাট অভিজ্ঞতা আপনাদের তা দুনিয়াতে কোথাও নেই। আপনারা 'রিচুয়াল সার্ভিস' বলে একটা সাইড বিজনেস লড়িয়ে দিন। ফিউনেরালের জন্যে গ্যাংস্টারদের লাশগুলো

জুড়েমুড়ে রেডি করে দিন। অ্যাভারেজে বছরে পঁচিশ হাজারটা মার্ডার। সবই গ্যাঙের সঙ্গে রাইভাল গ্যাঙের লড়াই। ধড়াদ্ধড় লাশ পড়ছে। লড়ে যান। ব্যাস্ আমরাও লড়ে গেলাম।

দাঁড়কাক — কি রকম রেট যাচ্ছে?

মার্দাশেভ — সেটা ডিপেন্ড করছে ক্লায়েন্ট কি চাইবে তার ওপর। নরম্যাল কালার ফিরিয়ে দেব মুখে। হাতেও। হাত, ঘাড় নাড়াতেও পারবে। ধরুন মাথাটা বুলেটে চুরমার না হলে একদিনের কাজের মজুরি ১৫০০ ইউ-এস. ডলার। আর গোটা লাশটা যদি বোমায় টুকরো টুকরো হয়ে যায় তাহলে এক হপ্তায় সেটাকে জুড়েফুড়ে খোলতাই করে তুলতে ১০,০০০ ডলার।

দাঁড়কাক — বুঝলে বনবেড়াল, এ তোমার বাল কামিয়ে মড়া হালকা করা নয়।

বনবেড়াল — হেভি! হেভি!

মার্দাশেভ — একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট—এই কাণ্ডগুলো করা হয় একটা মোটা ছাই ছাই রঙের মার্বেল পাথরের টেবিলের ওপরে।

বেগম জনসন : সে না হয় হলো, কিন্তু ইন্টারেস্টিং পয়েন্টটা কী?

মার্দাশেভ : ঐ টেবিলটার ওপরেই জোসেফ স্তালিনের বডি এমবাম করা হয়েছিল।

বেগম জনসন : মাই গড!

মার্দাশেভ : বডিটা পেয়েই আমরা যেটা করি, ৮ লিটার 'বালসাম' অ্যার্টারিগুলোতে ইনজেক্ট করি। তারপর ঠ্যাংদুটো আর হাতগুলো মাসাজ করি যাতে ওটা ছড়িয়ে যায়। দেখবেন হাতগুলো ছিল নীল। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হাতির দাঁতের রঙ এসে যাবে। মুখটা যদি চুরমার হয়ে থাকে তো ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে সেই মুখটা আবার বানাই। এর জন্যে লাশের অন্য অংশ থেকে হাড় ও চামড়া নিতে হয়।

বনবেড়াল — ব্যাস্, কাম খতম?

মার্দাশেভ — না, না, এর পর হল বিউটিশিয়ানের কাজ। ফাউন্ডেশন লাগাবে, লিপস্টিক লাগবে। লোকটা যে বিচ্ছিরিভাবে মার্ডার হয়েছে সেটা বোঝাই যাবে না। শেষে কপালের ওপর একটা হালকা, টিসু সেঁটে দেওয়া হয়।

দাঁড়কাক — কেন?

মার্দাশেভ — ওর ওপরেই সবাই শেষ চুমুটা খায়।

বেগম জনসন : মোস্ট আনক্যানি!

মার্দাশেভ : তবে এটা মনে রাখতে হবে যে লেনিনের বডি যেমন কেমিকালে ডুবোনো হয়েছিল সেসব এক্ষেত্রে হয় না। হয় না মানে দরকার পড়ে না। কবর দেওয়ার দিন অব্দি বডিটা ফিট করে দেওয়া। অবশ্য, পিওর এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে একটা গ্যাংস্টারের বডি আমরা কবর দেওয়ার ন মাস পরে তুলে দেখেছিলাম। খুবই তাজা ছিল। মনে হচ্ছিলো তো যে কোনোসময়ে চোখ খুলবে।

বনবেড়াল — নতুন অনেক কিছু জানা গেল। আচ্ছা প্রায়ই তো শুনি যে লেনিনের মমি নাকি কবর দিয়ে দেওয়া হবে।

মার্দাশেভ — সে তো আমরাও শুনি। কথা ওঠে। হৈ চৈ শুরু হয়। কথা ফের চাপাও পড়ে যায়।

সাক্ষাৎকারে যে কথাগুলো আসেনি সেগুলোও-বা 'মসোলিয়ম'-এর পড়ুয়াদের অজানা থাকতে যাবে কেন?

১। 'রিচুয়াল সার্ভিস' মৃত মনসবদারদের জন্য বাহারী কফিনও বানায় ও আমদানি করে। অ্যামেরিকায় তৈরি ঘ্যাম কাঠের কফিন ৫,০০০ ডলার, রাশিয়াতে বানানো ক্রিস্টালের কফিন ২০,০০০ ডলার। 'দা গডফাদার' ফিল্মে যে কফিনটি দেখানো হয়েছিল রাশিয়াতে তার নাম প্রখ্যাত মাফিয়া বসের নামে 'অ্যাল কাপোন' এবং এটিই জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

২। লেনিন মসোলিয়মের মড়া স্পেশালিস্টদের যে কারণে রমরমা অর্থাৎ দেদারে গ্যাংস্টারদের মড়া সাপ্লাই তার মূলে রয়েছে দুটি মাফিয়া দলের নন-স্টপ লড়াই। এই দুটি গ্যাং-এর নাম হল 'সেনত্রেইনি' এবং 'উরালমাশ'। শেষোক্তটিই বড়ো। ভ্লাদিভোস্তকে গাড়ির চোরাচালান ও মস্কো বিমানবন্দরে মাল তোলা ও নামানো এদের দখলে। অনেকগুলো ব্যাংক এরা চালায়। লন্ডনের বিশ্ব মেটাল মার্কেটেও এরা সক্রিয়।

৩। লেনিন মসোলিয়মের বিজ্ঞানীরা আর যাদের মৃতদেহ মমিতে রূপান্তরিত করে তারা হল স্তালিন, জর্জি দিমিত্রভ, হরলুগিন চোয়বালসান (মোঙ্গোলিয়া), ক্লিমেন্ট গটওয়াল্ড (চেকোশ্লোভাকিয়া), হো চি মিন, আগস্তিনো নেতো (অ্যাঙ্গোলা), লিন্ডন ফোর্বেস বার্নহাম (গায়না) ও কিম ইল সুং (উত্তর কোরিয়া)। চীনেরা নিজেরাই মাও-এর মৃতদেহ মমি বানিয়ে ফেলে।

সকলেই জানে যে রবিবারের আগে শনিবার আসে। শনিবার রাতে, নিবিড় ঘুমের মধ্যে, কমরেড আচার্য স্বপ্নে নানা বিচিত্র মানুষদের দেখেছিলেন। তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা না ঘামানোতে তিনি এতই অভ্যস্ত যে কাউকেই চিনতে পারেননি। নাদেঝদা ক্রুপস্কায়া, ফেলিক্স জেরঝিনস্কি, আব্রাহাম বেলেনকি, ক্লিমেন্ট ভরোশিলভ, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, মলোটভ, বুখারিন, রুদজুতাক, টমস্কি, ক্রাসিন, ট্রটস্কি, ইয়েনুকিদজে—কাউকেই তিনি চিনতে পারেননি। পারার কথাও নয়। চিনেছিলেন একজনকেই। জোসেফ স্তালিন।

হুপ্! হুপ্!

সংযোজন

আমাদের এই দেশে, এই জমানায়, ভারতে বা বাংলা বলতে আমরা যা বুঝি সেই পশ্চিমবঙ্গে মমি হতে কেউ রাজি আছেন? হাত তুলুন! পা-ও তুলতে পারেন। তবে আর কিছু না তোলাই ভালো!

ঘুপ! ঘাপ!

উনিশ

রবিবার বনবিহারী তা, জোয়ারদার, প্রফেসার বটব্যাল ও তিন চারজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার, কোনো আর্মস ছাড়াই ভদিভবনে গিয়েছিলেন। সান্নাটা। দরজা হাট করে খোলা। নো সাইনবোর্ড, নাথিং—খাঁ খাঁ করছে। ঘরগুলোও খোলা। মমি নেই, কাচের বাক্স নেই, দেওয়ালে ভদির বাণী

নেই, সন্তোষ টু-ইন-ওয়ানে ভদি-ভজন নেই, কিছুই নেই। জোয়ারদার বাদে সকলেরই গা ছমছম করছিল। বনবিহারী ও অন্যান্যরা সব ঘরেই উঁকি মারলেন। কাল অব্দি যে এই বাড়িতে ধুন্ধুমার ক্রাউড কিচ্ছু দেখে বোঝার উপায় নেই। হঠাৎ ঠাণ্ডা একটা হাওয়া, এই গরমের মধ্যেই, হু হু করে এল আর কোথাও একটা ডাঁই করে রাখা 'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার' উড়তে লাগল। জোয়ারদার বনবিহারী তা-কে বললেন,

—একটা কথা বলব স্যার?

—বলুন।

—খুবই আনক্যানি লাগছে। আমার তো মনে হয় কেটে পড়াই ভালো।

—ঠিক বলেছেন। লাস্টে ভূতুড়ে কারবারে ফেঁসে আমরাই হয়তো ভিক্টিম হয়ে গেলাম। তবে, বনবেড়াল জানে আমি লোক খারাপ নই। তাও, বলা তো যায় না।

মিউ

কুড়ি

Boighar.net

কারফর্মার ট্রাক নর্থ-বেঙ্গলে রওনা দিচ্ছে। অন্যবার খালি যায়, কাঠে ভর্তি হয়ে ফেরে। এবারে মাছি গলার জায়গা নেই। বস্তা বস্তা টাকা তোলা হয়েছে। টাকার গরম গদির ওপরে চড়ে বসেছে ভদি, বেচামনি, সবিতা, কালী, সরখেল, বড়িলাল, গোলাপ, বজরা ঘোষ, মেজর বল্লভ বক্সি, নলেন, ডি. এস, মদন, পুরন্দর, কারফর্মা ও আর সবাই। সবকিছু তদারকি করে ক্লান্ত বেগম জনসন। হেডলাইট জ্বলছে। ড্রাইভারের ছাদের ওপরে বনবেড়াল। বেগম জনসন সিল্কের রুমালে চোখ মুছছেন। দাঁড়কাক বলল,

—মাত্র তো মাস দুয়েক। তারপরেই তো সবাই আবার ফিরে আসবো। দুমাসে লোকে মমির কথাও ভুলে যাবে। তারপর, যে কে সেই।

বেগম জনসনের কান্না থামছে না। বনবেড়ালও নেমে এল।

—এ তো সামান্য ব্যাপার। আর এটা তো আমরা জানি বার বার ঘটে। অত করে বললাম, সঙ্গে চলো।

বেগম জনসন চোখ মুছলেন।

—উপায় কই? আমি গেলেই চারনক আর ওয়াটসন মারপিট লাগিয়ে দেবে। থামাবে কে তখন? এবার স্টার্ট করো। আর কাঁদব না।

বনবেড়াল আর দাঁড়কাক লরিতে উঠে পড়ে। লরি চলতে থাকে। বেগম জনসন ভেজা রুমাল নাড়ছেন। লরি মোড় ঘুরে যেতে বেগম জনসনকে আর দেখা যায় না।

—

উপন্যাস সমগ্র

গ্রন্থ-পরিচিতি

pathagar.net

চৌবাচ্চার তেলাপিয়া গঙ্গাসাগরে চলল : নবারুণের উপন্যাস

রাজীব চৌধুরী

বাজার ছেয়ে যাওয়া পূজাবার্ষিকী পত্রিকাগুলির মতো 'সারহীন সম্ভার' নিয়ে আলোচনা করতে করতে শ্রদ্ধেয় শ্রী শঙ্খ ঘোষ ১৯৯৬-এর ১৩ অক্টোবর একটি রবিবাসরীয় লেখায় জানিয়েছিলেন :

> ...নতুন কেউ লিখলে সেটা পড়বার একটা আগ্রহ জাগে প্রথমে, আর সে-আগ্রহের বেশ তৃপ্তিজনক ফলও পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। এই যেমন কয়েক বছর আগে 'প্রমা' পত্রিকার শারদীয়তে ছাপা হল একটি উপন্যাস 'হারবার্ট', লেখকের নাম নবারুণ ভট্টাচার্য। গত পাঁচ বছরের মধ্যে কোনও একটিমাত্র স্মরণীয় উপন্যাসের নাম যদি বলতে হয় তো নিশ্চিতভাবেই বলব এই হারবার্টের কথা।
>
> [সারহীন সম্ভার/আনন্দবাজার পত্রিকা/২৭ আশ্বিন ১৪০৩/রবিবাসরীয়]

কবিতা বা ছোটগল্প লিখেই লেখালিখির জগতে পা রাখলে এবং সেই পথেই এক মৃত্যু উপত্যকা পেরিয়ে আসা নবারুণ ভট্টাচার্যকে যারা চিনতেন তাদের কাছে তিনি 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না'-র (১৯৮৩) কবি। এই বইটির হিন্দি অনুবাদের সূত্রে হিন্দিসাহিত্যের বলয়েও তিনি কবি হিসেবেই পরিচিত একটা নাম। আর বড়জোর আর কিছু পাঠক নবারুণকে চিনতেন গল্পলেখক বলে ; 'হালাল ঝান্ডা' (১৯৮৭) বইটির সূত্রে। এই দুটি বইয়েরই প্রকাশক যিনি, সেই সুরজিৎ ঘোষেরই উৎসাহে ও তাড়নায় নবারুণ প্রথম উপন্যাস লিখলেন। প্রকাশিত হল ১৯৯২-এর 'প্রমা' পত্রিকার শারদ সংখ্যায়। প্রথম উপন্যাসটিকে সপ্রশংস ও গুরুত্বসহকারে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন শ্রী মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আজকাল' পত্রিকায় সম্ভবত ১৯৯৪-তে। ততদিনে 'হারবার্ট' গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে জানুয়রি ১৯৯৩-তে। প্রমা প্রকাশনী থেকেই। বইটি নবারুণ উৎসর্গ করেছিলেন স্ত্রী প্রণতি-কে। প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ করেছিলেন শ্রী সোমনাথ ঘোষ। মূল্য : ২০ টাকা। ৫৯ পৃষ্ঠা। উপন্যাসটির দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ১৯৯৭-তে, প্রমা প্রকাশনী থেকেই। এরপর জানুয়ারি ২০০৪-এ দে'জ পাবলিশিং থেকে এর প্রথম দে'জ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রচ্ছদ করেছিলেন নবারুণেরই বন্ধু এবং একদা সহকর্মী শ্রীঅজয় গুপ্ত। গ্রাফিকস্ : চন্দন গুপ্ত। মূল্য ৩৫ টাকা। ৮০ পৃষ্ঠা।

শ্রী শঙ্খ ঘোষ বা শ্রী মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠ স্বীকৃতির মতো আরো বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট পাঠকের 'হারবার্ট' পাঠ নবারুণের স্মৃতিতে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তার মধ্যে একটি হল আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-এর এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় নবারুণকে বলা নানা কথা। ইলিয়াস এ বিষয়ে কোথাও না লিখলেও পৃথ্বীশ সাহা তার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বিষয়ে একটি কথনে জানিয়েছিলেন যে, কলকাতার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন ইলিয়াস তাকে 'হারবার্ট' পড়তে দেন :

pathagar.net

> এখন আমি নবারুণের প্রায় সব বই পড়ি, কিন্তু ইলিয়াস-ই প্রথম আমাকে নবারুণ পড়ান। ইলিয়াস নার্সিংহোমে থাকার সময় নবারুণের উপহার দেওয়া *হারবার্ট* আমাকে পড়তে দেন এবং বইটির বিষয়ে খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।
>
> [আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : নির্মাণে বিনির্মাণে/আলাউদ্দিন মণ্ডল/মাওলা ব্রাদার্স ঢাকা; ফেব্রু ২০০৯/পৃ-৬০৩]

'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় ১৯৯৪-এর মে মাসে শ্রী দেবেশ রায় তার একটি নাতিদীর্ঘ মুখবন্ধ সহ নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথোপকথনকে 'নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথাবার্তা' নামে প্রকাশ করেন। ২০ এপ্রিল বিকেলে এই কথাবার্তার প্রতিবেদনের আগে শ্রী দেবেশ রায় লেখাটিতে 'হারবার্ট' সম্বন্ধে এবং এর লেখককে স্বীকৃতি জানিয়ে লিখেছেলেন :

> এইটুকু আয়তনের একটি উপন্যাসে এত বংশলতিকা, বাড়িঘর, শহর, মানুষজনকে যে ঔপন্যাসিক আঁটাতে পেরেছেন তার প্রধান একটি কারণ তাঁর ভাষা। শহুরে খিস্তি, রাস্তার বুলি, বাড়িঘরের সেকেলে বাচন, কথা বলার একটু তেরচা ঢং মিলিয়ে নবারুণ ভট্টাচার্য তাঁর একটা বিশিষ্ট ভাষারীতি তৈরি করেছেন। সেই ভাষার গুণে যে চলতি বাস্তবতাকে তিনি উপন্যাসে আকার দিচ্ছেন সেটা ফুঁড়ে ভিতরের এক বাস্তবতা উপন্যাসের ওপরে উঠে আসে। তাঁর ভাষাটা অনায়াসে এই দুই স্তরে কাজ করে। ঔপন্যাসিকের ক্ষমতা আঙুলের ডগায় না থাকলে ভাষাকে দিয়ে এ-কাজ করানো যায় না। এই একটি উপন্যাসেই প্রমাণ হয়ে যায় যে নবারুণ ভট্টাচার্য জাত-ঔপন্যাসিক।

এমনই আরেকটি সংক্ষিপ্ত কিছু তাৎপর্যপূর্ণ মূল্যায়ন করেছিলেন শ্রীমতী গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক নবারুণকে পাঠানো একটি লেখায় :

> HERBERT
>
> A meticulously structured novel of the absurd that situates Communism and Rationalism in the ebullient decadence of Calcutta street life. The central character is a con artist of radical innocence–the idiom a daunting mix of street slang, deadpan reportage, and nineteenth century spiritualist prose. A bold and nearly unique book that will challenge the translator to the limit of his art.
>
> Calcutta. Jan. 7, 1997

শিশিরকুমার দাশ-এর সঙ্গে নবারুণের দীর্ঘ কথোপকথনে 'হারবার্ট', সম্বন্ধে তাঁর রীতিমতো উচ্ছ্বাস, বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীর কবিতাংশগুলির প্রবেশক হিসেবে আন্তর্বয়ানে উপন্যাসটিকে বিশেষভাবে পছন্দের কথা তিনি জানিয়েছিলেন। তাঁর করা একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক লেখায় 'হারবার্ট' সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

> হার্বার্ট (১৯৯৩) নবারুণ ভট্টাচার্য রচিত উপন্যাস। সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক পুরস্কৃত। নকশাল আন্দোলনের সমীপবর্তী কালের পটভূমিকায় এক যুবকের জীবন-কথা। কাহিনীর কথনভঙ্গি যেমন অভিনব, তেমনই অভিনব এই কাহিনীর নায়ক হার্বার্ট চরিত্রটি। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ এবং আপাতশান্ত গতানুগতিক জীবনের মধ্যে একটা প্রবল সম্ভাবনার আশা উপন্যাসটিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।
>
> [সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী/সাহিত্য সংসদ/ফেব্রুয়ারি ২০০৩/পৃ-২৪২]

'হারবার্ট'-এর লিখনে আখ্যানের টেকনিক হিসেবে নয় ; কাহিনীর অন্তর্বস্তুর সঙ্গে, কালচেতনার সঙ্গে, লেখকের সাহিত্যভাবনার সঙ্গে যে এই কাব্যাংশগুলির ব্যবহারের একটা সুগভীর যোগসূত্র

রয়েছে, সে দিকটিকে নবারুণ তার দুটি সাক্ষাৎকারে বুঝিয়ে বলতে চেয়েছিলেন। এই যোগটি প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। কিন্তু সাহিত্যরচনার একটা বড় নিয়মেরই আওতায় যে তা পড়ে এবং ঔপন্যাসিকের সময়-সমাজ বা মানুষকে পাঠের অক্ষগুলির সঙ্গে মানানসই এই পাঠক্রিয়ারও অবস্থান 'হারবার্ট'-কে নির্দিষ্ট স্থান-কালের কোনো ছোট পরিধিতে আটকে না রেখে তাকে উন্মুক্ত করে—তেমন ভাবনাই নবারুণের কথাগুলি থেকে ফুটে ওঠে :

> আমি অতকিছু ভেবেচিন্তে লিখিনি কিন্তু আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে প্রথমত, ওই কবিতাগুলো আমার খুব প্রিয় এবং এই কবিতাগুলোর মধ্যে আমি দেখেছি জীবনের সমস্ত সঙ্কট। জীবনে আমরা যা যা অনুভব করি সেগুলো ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁরা অনুভব করেছিলেন যেমন ইতিহাসগতভাবে আজকে আমি আছি। আমার থেকে মানকুমারী বসু বা অক্ষয়কুমার বড়াল চিন্তাভাবনার দিক থেকে খুব পিছিয়ে ছিলেন বলে আমি মনে করি না। আমি এঁদেরকে আধুনিক বলে মনে করি।
>
> আর ডেভেলপমেন্টের তত্ত্বে আমি ঠিক বিশ্বাস করি না। কারণ মানুষের প্রত্যেক প্রজন্ম, তার সময়ে তার হরাইজোনে যতগুলি প্রশ্ন ওঠে সেগুলোকে জানার বোঝার চেষ্টা করে এবং এটা খুব সহজ কথা যে আমি হারবার্টে অত্যন্ত সচেতনভাবে কতগুলো বেসিক এনিগমাস অফ লাইফ, আমি সেগুলো নিয়েও ডিল করতে চেয়েছি। যেমন আমি যতই যুক্তি দিয়ে বুঝি, মৃত্যু কী সে সম্বন্ধে আমার জানা শেষ হয়নি, হয়তো যে মোমেন্টে আমি মরব আমি জানতে পারব বা পারব না কিন্তু ওই মুহূর্তটাকেও আমাকে ধরতে হবে জানতে হবে। এই ইটারনাল problems যা মানুষ ফেস করে, যা আমরা শ্মশানে গেলে ফেস করি। কোনো প্রিয়জনকে যখন শেষবারের মতো চলে যেতে দেখি—এগুলোর ব্যাখ্যা আমরা জানি না। মানুষের কিছুটা মানে যে পরিমাণ সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারি, কিছু আছে, যা কখনো সমাধান করা যাবে না। সে-সব সমস্যাগুলোর কথা শেক্সপীয়রের মধ্যে আছে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আছে, গেটের মধ্যে আছে। আমরাও কিন্তু সেই একই জিনিসের ভাগীদার, নিজেকে বেশি স্মার্ট মনে করার কোনো কারণ নেই।
>
> [দুনম্বরী একটা সময়ের মধ্যে আমরা বাস করছি.../মল্লার/১৪১০-১১/পৃ: ৩২৯]

ঊনিশ শতকের এই কবিতাগুলির সম্বন্ধে তার বিশেষ কোনো দুর্বলতা ছিল কি না, অথবা তিনি বিশেষ করে ঊনিশ শতকের এই পর্বের একজন 'ভক্ত পাঠক' কিনা—এসব প্রশ্নের জবাবে নবারুণ বলেছিলেন :

> দুর্বলতা মানে, আমি যাঁদের কবিতা নিয়েছিলাম তাঁরা আমার অসম্ভব প্রিয় কবি। এবং আমি একটা জিনিস দেখেছি যে এখন যখন কবিতা নিয়ে আলোচনা হয় তখন আমি এঁদের যে যে জায়গা কোট করেছি সেগুলো আলোচিত হয় না কিন্তু সেগুলোও ভীষণভাবে আধুনিক কারণ ওই সময়টাকে মনে রাখতে হবে তখনও একটা বিরাট রদবদল ঘটছে। আমাদের দেশে সত্যি যেভাবে কবিতা-টবিতা নিয়ে আলোচনা হয় সেগুলো খুব একটা matured discussion বলে মনেই করি না। কারণ আমার আধুনিক কবিতা—কোথা থেকে এল, কীভাবে এল বুঝতে হলে উনিশ শতক থেকেই আসতে হবে। এবং এগুলো আনার একটা বিরাট কারণ হচ্ছে আমার হারবার্টের অনেকটা জুড়ে আছে একটা কলকাতা যেটা চলে যাচ্ছে আমার চোখের সামনে থেকে...সেই কলকাতাকে ধরতে গেলে আমার এগুলো করা দরকার। এটা কিছুটা ইতিহাসের ফাঁকগুলোকে সাজানো আর কি।
>
> [নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথাবার্তা/কবিতীর্থ/আশ্বিন ১৪১৪/পৃ: ১৬৯]

'হারবার্ট'-এর দশটি অধ্যায়েরই সূচনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন কবিদের কবিতা থেকে যে

উদ্ধৃতিগুলি চয়ন করা হয়েছে তার মূল কবিতাগুলি হল :

১. *চরণে বন্ধন নাই...* —বিজয়চন্দ্র মজুমদার, 'মধ্যাহ্নে', পঞ্চকমালা, ১৯১০

২. *বিদেশে, প্রাণেশ, তুমি...* —বলদেব পালিত, 'ভুল না আমায়', কাব্যমালা, ১৮৭০

৩. *মানব-জীবন ছাই...* —মানকুমারী বসু, 'সাধ', কাব্যকুসুমাঞ্জলি, ১৮৯৩

৪. *অই শুন! অই শুন!...* —রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর অংশ, ১৮৫৮

৪ক. *কেন গো নরের বেশে...* —নগেন্দ্রবালা মুস্তোফি, 'মায়া', অমিয়গাথা, ১৯০১
(মূলে ছিল : কেন গো নরের সনে এ খেলা তোমার?)

৫. *তোরা না করিলে...* —দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভারত-ললনা', জাতীয়সঙ্গীত, ১৮৭৬

৬. *আপনারে গেছি ভুলে...* —সরোজকুমারী দেবী, 'দুটি চুম্বন', হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪

৭. *ওই শোন সমস্বরে...* —হিরণ্ময়ী দেবী, 'নূতন জীবন', ১৮৯৭

৮. *দুরন্ত ঠগীর মত...* —প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, 'মরুভূমির স্বপ্ন', গৈরিক

৯. *দুর্ভেদ্য দুস্তর শূন্য...* —অক্ষয়কুমার বড়াল, 'শোক', এষা ১৯১২

১০. *বৃথা আসি, বৃথা যাই...* —অক্ষয়কুমার বড়াল, 'মৃত্যু', এষা, ১৯১২

'হারবার্ট রিজেক্টস্' লেখা একটি ফাইলে দু'পৃষ্ঠায় এই উদ্ধৃতিগুলিসহ মোট ২১টি এই জাতীয় শিরোদ্ধৃতি লেখা ছিল। এর মধ্যে যেগুলি দেওয়া হয়নি অথচ পরিকল্পনার খসড়ায় বেছে রাখা হয়েছিল সেগুলি ছিল :

হেন সাধে প্রণয়িনি, কেন সাধি বাদ
"না না না না" বলে, মনে ঘটাও বিষাদ

—বলদেব পালিত

পুণঃ যেন খেলি সঙ্গিগণে মেলি,
মাঠে ঘাটে ছুটি ক'রে জলকেলি,
কালাকাল তার বিচার নাই।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাজ ওরে শিঙা ভঁয় ভঁয় ভোঁম,
চমকিয়া ধরা—মরুগিরি-ব্যোম

—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

পিষিতে অস্থি শুষিতে রুধির
নিশীথে শ্মশানে পিশাচ অধীর

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

অতীতের খেলাধূলা মিশাবে ধূলায়
আমি বসে থাকি তবে কার প্রতীক্ষায়?

—সুরমাসুন্দরী ঘোষ

শান্ত গোধূলি-বেলা!
ননীর পুতুলগুলি ভুলিয়াছে খেলাদেলা।

—বিহারীলাল চক্রবর্তী

pathagar.net

শাঁ-শাঁ-শাঁ-শাঁ হাসিতেছে শুনে লাগে ভয়,
ভ্রূকুটি দেখিয়া ধড়ে পরাণ না রয়।

—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

চল যাই দুইজনে অনন্ত উদ্দেশে

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ডুবে যাই—ডুবে যাই—হারাই চেতন!

—যোগেন্দ্রনাথ সেন

তুমিও হে ফেলিও এক বিন্দু
অধিক নহে বন্ধু
একটি-ফোঁটা শুধু নয়ন-লোর।

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কতদিন গিয়েছে যে বহুদূরে চলি,
তুমি তারে জাগাও মরণে

—মানকুমারী বসু

পূর্বোক্ত তালিকার ৮ নং উদ্ধৃতি "দুরন্ত ঠগীর মত..." অংশটিই কেবল এই খসড়া তালিকাতে ছিল না ; পরে সরাসরি উপন্যাসেই ব্যবহার করা হয়েছিল। দশম অর্থাৎ উপন্যাসের অন্তিম অধ্যায়টির তিনটি খসড়াতেই গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর উদ্ধৃতিটিই ব্যবহার করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে দশটি শিরোদ্ধৃতি সহ মোট এগারোটি উদ্ধৃতিই আলাদা আলাদা কবির হত। কিন্তু উপন্যাসে নবম অধ্যায়ের কবি অক্ষয় বড়ালেরই অন্য কবিতা উদ্ধৃত করা হল দশম অধ্যায়ের শুরুতে এবং পাণ্ডুলিপির প্রেস-কপিটিতেই এই পরিবর্তন করা হয়।

এই শেষ অধ্যায়টি যে প্রথম খসড়ায় তার মনঃপূত হয়নি—সে কথা নবারুণের লেখাতেই আমরা জানতে পাই। কয়েকদিন লেখা বন্ধ রাখার পর শেষপর্যন্ত অন্তিম অধ্যায়টি পুরোপুরি নতুন করে লিখে ফেলেছিলেন এবং সেটাই 'হারবার্ট'-এর দশম অধ্যায়। কিন্তু ওই ফাইলটিতে রাখা ছিল দশম অধ্যায়ের প্রথম দুটি খসড়া যে বিষয়ে তার মত : "খুব বাজে একটা কিছু লিখেছিলাম।" বাতিল করা প্রথম খসড়া এবং তার পুনর্লিখনের চেষ্টায় দ্বিতীয় খসড়া—দুটিই হুবহু তুলে ধরা হল এই অংশে যার সঙ্গে মুদ্রিত পাঠের তুলনা করলে সামান্য মিলটুকুর যোগসূত্র আর তার রূপান্তরের মূলে ক্রিয়াশীল বাকি উপন্যাসের সঙ্গে এর যোগসূত্রের সমীকরণটিকে সহজে ধরা সম্ভব হবে। অন্যত্র নবারুণ একটি সাক্ষাৎকারে এই পরিসমাপ্তি বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে যা জানিয়েছিলেন তা থেকে বোঝা যায় যে প্রথম দুটি খসড়ার পর কয়েকদিনের ব্যবধানে 'হারবার্ট'-এর দশম পরিচ্ছেদের তৃতীয় তথা সর্বশেষ খসড়াটিই উপন্যাসের যথাযথ পরিণতি হয়েছে বলে তিনি মনে করছেন। এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য ছিল :

> অনেকেই আমাকে বলেছে যে 'হারবার্ট' বিস্ফোরণে শেষ হলে ভালো হত। কিন্তু আমি মনে করি বিস্ফোরণটাকে ওইরকমভাবে হাইলাইট করার কোনো দরকার নেই। আমি যেভাবে উপন্যাসটাকে শেষ করেছি সেটা বলা যায় একটা ওপেন এন্ডেড শেষ। এটা ঠিক একটা ভেস্টিবিউল ট্রেনের মতো, যার এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাওয়া যায়।
>
> [উপার্জনের উদ্দেশ্যে আমি লিখি না/তথ্যকেন্দ্র পত্রিকা/জুন ১৯৯৮/পৃ. ৮২]

এবারে দেখা নেওয়া যায় যে প্রথমে লেখা দশম অধ্যায়ের খসড়া, দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে সংক্ষিপ্ত হল কীভাবে। এক্ষেত্রে খসড়া দুটিকে যথাক্রমে 'প্রথম পাঠ' এবং 'দ্বিতীয় পাঠ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে :

প্রথম পাঠ

"বাজ ওরে শিঙা ভঁয় ভঁয় ভোঁম,
চমকিয়া ধরা—মরুগিরি—ব্যোম"
—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

ফুটফুটে ছেলে র‍্যাম্বো। জন্ম ১৬.৬.৯২। ভাল নাম টুকটুক সান্যাল। বাবা অনিরুদ্ধ সান্যাল, মা ঝুমকি র‍্যাম্বোর বোবো ও মাম্‌মাম্‌। অনিরুদ্ধর প্রিয় হিরো সিলভেস্টার স্ট্যালোন, গানের দল ইউ-টু। র‍্যাম্বো, তার পাঁচ বছর বয়সে, ১৯৯৭-তে, একোয়ারিয়ামের মধ্যে প্রায় এক বোতল জিন ঢেলে দেবে। এর কয়েকমাস পরে শুরু হবে ঘুমের মধ্যে চিৎকার, ঘুমের মধ্যে স্লিপিং সুট পরে হেঁটে বেড়ানো। অনিরুদ্ধ একদিন রাতে সাঙ্ঘাতিক ভয় পাবে যে রাত দুটোর সময় র‍্যাম্বো দেবশিশুর মত মুখে ডিপ ফ্রিজ থেকে কাঁচা, আস্ত চিকেনের কবন্ধ বের করছে। বয়স যখন সাত তখন র‍্যাম্বো কিচেন নাইফ লুকোতে শুরু করবে এবং ছ'তলার ওপর থেকে বাজতে থাকা টু-ইন-ওয়ান নীচে ফেলে দেবে। র‍্যাম্বোকে ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডক্টর রায় বলবেন সাইকিয়াট্রিস্ট মুকুন্দ সর্বাধিকারীর কাছে নিয়ে যেতে। ১৯৯৯-এর আগস্টে র‍্যাম্বো ডঃ সর্বাধিকারীর কাছে যাবে। তিনি হিপনোথেরাপি করার চেষ্টা করবেন। সম্মোহিত অবস্থায় র‍্যাম্বো তাঁকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করবে, ভয় দেখাবে এবং রহস্যময় এক মহিলা ডাক্তারের লজ্জাস্থান ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে নানাবিধ ইঙ্গিত করবে। অনিরুদ্ধ ও ঝুমকি, দুজনেই ডঃ সর্বাধিকারীকে জানাবে যে কখনোই কোনো মহিলা ডাক্তার র‍্যাম্বোকে দেখেনি। অবশ্য ওদের বিল্ডিং-এ একজন মহিলা ডাক্তার থাকতেন যিনি গত চার বছর ধরে বিদেশে। অসম্মোহিত অবস্থায় র‍্যাম্বো ডঃ সর্বাধিকারীকে বলবে,
(—তোমার জানলা দিয়ে ঘুড়ি দেখা যায়?)

ডঃ সর্বাধিকারী র‍্যাম্বোকে একটা চকোলেট দেবেন। চকোলেট নিয়ে র‍্যাম্বো তার মার সঙ্গে নিচে নেমে বাবার জন্যে গাড়ির সামনে অপেক্ষা করবে। র‍্যাম্বো গাড়ির কাচে ধুলোয় আঙুল দিয়ে লিখে ঝুমকিকে দেখাবে। সি। এ। টি। বি। এ। টি। ডব্লিউ। এ। টি... ঝুমকি বলবে র‍্যাম্বোকে হাত ডার্টি না করতে।

ডঃ সর্বাধিকারী প্রেসক্রিপশন লিখে অনিরুদ্ধকে দেবেন। দিয়ে বলবেন, আশ্বস্ত করা ভঙ্গিতে,
(—ভাল করে ঘুমোক। ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে।)

দ্বিতীয় পাঠ

"বাজ ওরে শিঙা ভঁয় ভঁয় ভোঁম,
চমকিয়া ধরা—মরুগিরি-ব্যোম।"
—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

র‍্যাম্বো (জন্ম ১৬. ৬. ৯২), টুকটুক সান্যাল। বাবা, অনিরুদ্ধ সান্যাল, মা, ঝুমকি। পাঁচ বছর বয়সে, ১৯৯৭ তে, একোয়ারিয়ামের মধ্যে এক শিশি স্যাভলন ঢেলে দেয়। এর কয়েক মাস পরে ঘুমের মধ্যে চেঁচায়। উঠে হেঁটে বেড়াতে থাকে। অনিরুদ্ধ সেদিন ভয় পেয়েছিল যে রাতে সে দেখেছিল ঘুমের মধ্যে হেঁটে এসে র‍্যাম্বো ফ্রিজ খুলে ফ্রিজার থেকে আনকুক্‌ড্‌ ড্রেসড্‌ চিকেন বের করছে। বয়স যখন সাত তখন ওপর থেকে টু-ইন-ওয়ান ছ'তলা নিচে ফেলেছিল। ফলে তিন তলার গাড়ির ছাদ তুবড়ে যায়। র‍্যাম্বোকে সাইকিয়াট্রিস্ট মুকুল সর্বাধিকারীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৯৯-এর আগস্টে। মুকুল তখন কলকাতার সেরা হিপনোথেরাপিস্টদের একজন। মুকুল র‍্যাম্বোকে সম্মোহিত করে এবং র‍্যাম্বো তাকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে। কোনো এক লেডি ডাক্তারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে ইঙ্গিত করে। অনিরুদ্ধ ও ঝুমকি, দুজনেই মুকুলকে জানিয়েছিল যে কখনো কোনো মহিলা ডাক্তার র‍্যাম্বোকে দেখেনি। অসম্মোহিত অবস্থায় র‍্যাম্বো মুকুলকে বলেছিল—তোমার জানলা দিয়ে ঘুড়ি দেখা যায়?

মুকুল র‍্যাম্বোকে একটা চকোলেট দেয়। র‍্যাম্বো তার মা'র সঙ্গে নেমে যায় মুকুলকে টা-টা করে।

মুকুল প্রেসক্রিপশন লিখে অনিরুদ্ধকে দেয়, বলে,

—ভাল করে ঘুমোক। ঘুমোলেই ঠিক হয়ে যাবে।

'হারবার্ট'-এর হিন্দি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৯৯-তে। হিন্দিতে 'হরবর্ট'-এর প্রকাশক : রাধাকৃষ্ণ প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড ; নতুন দিল্লি। মূল্য : ১২৫ টাকা। প্রচ্ছদ শিল্পী : জগমোহন সিংহ রাওৎ। হিন্দি অনুবাদ করেছিলেন মুনমুন সরকার। সূচনার 'হরবর্ট-প্রসঙ্গ' নামক অংশটি নবারুণের 'হারবার্ট-প্রসঙ্গে' লেখাটির অংশবিশেষ।

'হারবার্ট'-এর ইংরেজি অনুবাদ করেন জ্যোতি পঞ্জওয়ানি। ২০০৪ সালে সাহিত্য অকাদেমি থেকে Herbert নামেই অনুবাদটি প্রকাশিত হয়। মূল্য : ৬০ টাকা। প্রচ্ছদশিল্পী : বিপ্লব কুণ্ডু। বইটির চতুর্থ প্রচ্ছদে উপন্যাসটি সম্বন্ধে যে পরিচিতিটি ছিল সেটি হল :

Seer or con man? Savant of trickster? Genius or screw ball?

Like its eponymous hero, Nabarun Bhattacharya's short, intense, deftly crafted novel, hailed by critics as an off beat *tour de force*, is impossible to categorize. With its earthiness, its deadpan wit, its often case-history fotmat, and its sheer verbal panache, *Herbart* cuts like knife through butter. Its novel and vibrant use of the uniquely Kolkata brand of vernacular almost reinvents the language. And somewhat miraculously, this novella, with its sense of impending doom, coupled with its protagonist's naive optimism, emerges as the nearest thing to a literary metaphor for what this crumbling city stands for, and for the values it desperately clings to. Even it Herbert's dialogue with the dead won't convince the reader of an 'afterlife', his story is guaranteed 'immortality' in the canons of Indian literature.

'হারবার্ট' উপন্যাস নরসিংহদাস পুরস্কার পায় ১৯৯৪-তে। এরপর ১৯৯৬-তে বঙ্কিম পুরস্কার এবং ১৯৯৭-তে অকাদেমি পুরস্কার উপন্যাসটির একাধিকবার স্বীকৃতির স্মারক হয়ে রয়েছে।

'হারবার্ট'-এর নাট্যরূপ দেন শান্তনু বসু। ঠিক নাট্যরূপ নয়, বরং অভিনব এক পাঠাভিনয়। 'মণিরথ' নাট্যদলের পক্ষে এই 'হারবার্ট'-এর একাধিক একক অভিনয় মঞ্চস্থ হয়েছিল।

সুমন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত হয় ২০০৬-এ 'হারবার্ট' নামেই। পরিচালকের প্রথম চলচ্চিত্রটি যথেষ্ট সমাদৃত এবং পুরস্কৃত হয়েছিল। 'রিপলস্' প্রযোজিত এবং 'তৃতীয় সূত্র ফিল্মস'-এর সহযোগিতায় নির্মিত এই ছবিটিতে হারবার্ট চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শুভাশিস মুখার্জি এবং অল্পবয়সী হারবার্টের ভূমিকায় জয়রাজ ভট্টাচার্য। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন লিলি চক্রবর্তী, ব্রাত্য বসু, সব্যসাচী চক্রবর্তী, কবীর সুমন, দেবশংকর হালদার, নীল মুখার্জি, অনিন্দিতা মল্লিক, সুপ্রিয় দত্ত, সেঁজুতি মুখার্জি এবং আরও বেশ কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী। এই ছবির নির্মাণে যারা ছিলেন তার মধ্যে : সম্পাদনা—অর্ঘকমল মিত্র ; সঙ্গীত—ময়ূখ ভৌমিক ; শিল্প নির্দেশনা—সুদীপ ভট্টাচার্য ; কারুকৃতি উপদেষ্টা—হিরণ মিত্র ; প্রযোজক—কাজল ভট্টাচার্য ; চিত্রগ্রহণ—সোমক মুখার্জি ; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুমন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। 'ভাষাবন্ধন' পত্রিকার চতুর্থ উৎসব (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০৬) 'হারবার্ট'-এর চিত্রনাট্য প্রকাশিত হয়।

pathagar.net

এই ছবিটি মুক্তি পাবার পর এর প্রদর্শনকে ঘিরে বির্তক সৃষ্টি হয়ে যায় সরকারি প্রেক্ষাগৃহে 'হারবার্ট' প্রদর্শনের ছাড়পত্র না পাওয়ায়। এ বিষয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লেখা হয় ;

> 'সুস্থ সংস্কৃতি'র সরকারি কোপে আবারও একটি চলচ্চিত্র। এ বার বলি নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা একটি উপন্যাসের চিত্ররূপ। নন্দনে তা দেখাতে অস্বীকার করেছেন সরকারি কর্তৃপক্ষ। নির্মাতাদের বক্তব্য, ছবি না দেখানোর কারণ হিসেবে তাঁদের বলা হয়েছে, ছবি থেকে 'ভুল বার্তা' পৌঁছতে পারে। তাই নন্দনের বাছাই কমিটি ছবিটি দেখানোয় সম্মতি দেয়নি।...নন্দনের মুখ্য নির্বাহী অফিসার (সি ও ই) নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সেন্সরবোর্ড অশ্লীলতা বা অন্যান্য আপত্তিকর বিষয়গুলি দেখে। কোনো ছবির গুণগতমান ও উৎকর্ষ নন্দনের ওই কমিটির বিচার্য। তাঁদের মতের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"...পরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায় বলেন, "ছবির এক জায়গায় স্তালিন-বিরোধী বক্তব্য থাকার জন্যই সম্ভবত এই সিদ্ধান্ত।" লেখক নবারুণ ভট্টাচার্যের কথায় : "সেন্সর বোর্ড ছাড়লেও এটা রাজনৈতিক সেন্সর। এটা লজ্জার।"
>
> [নন্দনের কোপে পড়ল 'হারবার্ট'/২৮ জানুয়ারি, ২০০৬/তাপস সিংহ]

নানা স্তরে নানাভাবে এই বিষয়টিকে ঘিরে প্রতিবাদ জানানো শুরু হয়ে যায়। গণমাধ্যমগুলিতে নবারুণ, পরিচালক সুমন এবং আরো অনেকেই এ বিষয়ে বিরূপ মতামত জানাতে থাকেন। তখন কলকাতা বইমেলা চলাকালীন নানা স্তর থেকে বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ পাঠক, সাহিত্যকর্মীদের নানা প্রতিক্রয়ায় আর অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবে এই টানাপোড়েন তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। এরকম কিছু প্রতিক্রিয়া সম্মলিত পরবর্তী একটি প্রতিবেদনে পাচ্ছি :

> বিতর্কের জল গড়িয়েছে সমাজের সর্বস্তরে।...প্রসঙ্গ একটাই। সেন্সারের ছাড়পত্র থাকা সত্ত্বেও নবারুণ ভট্টাচার্যের কাহিনি নিয়ে সুমন মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত 'হারবার্ট' ছবিটি নন্দনে দেখাতে না দেওয়া।...প্রশ্ন উঠেছে, নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাসটির চিত্ররূপ যদি সেন্সারের ছাড়পত্র পেয়ে অন্য যে কোনো প্রেক্ষাগৃহে দেখানো যেতে পারে, তা হলে শুধু

নন্দনের ক্ষেত্রে 'ভুল বার্তা' পৌঁছনোর যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য? কেনই বা সৃষ্টির উপর থাকবে এই ধরনের সরকারি খাঁড়া?

এবং প্রতিবাদ ব্যক্তিগত থেকে সমষ্টিগত। যেমন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অশোকনাথ বসু মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ব্যক্তিগত চিঠি লিখে বলেছেন : "মুখ্যমন্ত্রী বলে নয়, সহযাত্রী হিসাবে আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ, আপনি হস্তক্ষেপ করুন ; নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হোক।" কবি জয় গোস্বামীর বক্তব্য "যেভাবে ছবিটির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল তা আমার কাছে নতুন কণ্ঠস্বরের উপর ছুরিকাঘাত বলে মনে হয়েছে।" জয় বিস্মিত যে, মুখ্যমন্ত্রী নিজে লেখক এবং সাহিত্যানুরাগী হওয়া সত্ত্বেও একটি সরকারি হল শিল্পীর স্বাধীনতার উপর এভাবে হস্তক্ষেপ করল।...ক্ষুব্ধ মৃণাল সেন বলেন : " 'ভাল-মন্দ' আগেই বিচার করার কোনো অধিকার নেই সরকারের। দর্শকই করুক না বিচার।"...সমষ্টিগত প্রতিবাদের বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন...সেন্টার স্টাডিজ ফর ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর অধিকর্তা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। আছেন গৌতম ভদ্র, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগের মৈনাক বিশ্বাস, তুলনামূলক সাহিত্যের কবিতা পঞ্জাবি প্রমুখ। তাঁদের 'আর্জি' : "সব দিক খতিয়ে দেখতে আবার বিচারে বসুন নন্দন কর্তৃপক্ষ।" আরও একধাপ এগিয়ে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন সংগঠন 'হারবার্ট' দেখাতে না দেওয়ার সঙ্গে তসলিমা নাসরিনের 'দ্বিখণ্ডিত' নিষিদ্ধ করতে চাওয়া এবং 'আ ডে ফ্রম আ হ্যাঙ্গম্যানস লাইফ' ছবিটি দেখাতে না দেওয়ার সঙ্গত মিল খুঁজে পেয়েছে।

[সরকারের 'অধিকার' নিয়ে প্রশ্ন, তীব্র হচ্ছে 'হারবার্ট' বিতর্ক/আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬/মউলি মিশ্র]

pathagar.net

এর পরের সপ্তাহে এই টানাপোড়েনের ইতি হয়। যথারীতি পূর্বেকার বিবৃতি অস্বীকার করে, তা ভুল বোঝা হয়েছিল—এরকম গোছের নতুন বিবৃতি সহ 'হারবার্ট'-কে শেষপর্যন্ত নন্দনে দেখাবার ছাড়পত্র দেওয়া হয়। এই জটিলতা ও বিতর্কের অবসান এবং এ বিষয়ে কৈফিয়ৎ সম্বন্ধে জানতে পারি :

'হারবার্ট' বির্তকে ইতি টানতে অবশেষে দর্শকের প্রতিক্রিয়ার উপরে আস্থাশীল হল সরকার। ফল 'শাপমুক্তি'। যে নন্দন ছবিটি দেখাতে চায়নি, সোমবার তারাই 'হারবার্ট' ছবিটির প্রযোজক সংস্থাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, ছবিটি নন্দনে দেখানো হবে।...কেন এই মতবদল? সেন্সরের ছাড়পত্র পাওয়া সত্ত্বেও ছবিটি দেখাতে নন্দনে বাছাই কমিটি কেন আপত্তি করেছিলেন, কেনই বা তাঁরা সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন, তার সরকারি যুক্তি ওই নিষেধাজ্ঞা জারির মতোই ধোঁয়াটে। নন্দনের মুখ্য নির্বাহী অফিসার নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যয় বললেন, "ভাবলাম, দেখাই যাক না দর্শকের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়। তা ছাড়া, নন্দন সম্পর্কে সাধারণের কাছে এমন একটা ভুল ধারণা থাকবে, সেটাও ঠিক নয়।" দর্শকের প্রতিক্রিয়াকে যাঁরা এখন এত গুরুত্ব দিচ্ছেন, নিষেধাজ্ঞা জারির আগে তাঁরা তা ভেবে দেখেননি কেন, তার জবাব স্বাভাবিকভাবেই ওই সরকারি অফিসারের কাছে মেলেনি। তবে এদিন তিনি দাবি করেন, "ছবিটি থেকে ভুল বার্তা যাওয়ার কথা আমরা কখনওই বলিনি। ছবিটির ব্যবসায়িক সাফল্য নিয়ে সংশয় ছিল।"...জনসাধারণ কী দেখবে এবং কী দেখবে না, তা স্থির করতে রাজ্যের এই অভিভাবকসুলভ আচরণ নিয়ে বিদ্রূপও কম হয়নি। এইভাবে লাগাতার বির্তক এবং অন্যান্য চাপেই কি সরকারি সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা! নীলাঞ্জানবাবু তার উত্তর দিতে চাননি।

[নন্দনের বোধোদয়, অবশেষে দেখাতে রাজি 'হারবার্ট'/আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬/তাপস সিংহ ও মউলি মিশ্র]

অবশ্য নবারুণ এই বিষয়টি নিয়ে আদৌ বিশেষ আহত বা উত্তেজিত হননি। সবটাই এক দর্শকের মতো কৌতুকে পর্যবেক্ষণ করেছেন এক আখ্যান-লেখকের নিরাসক্তি নিয়েই। দূরত্ব নিয়েই। অথচ 'হারবার্ট' তার ভেতরে, অন্তরঙ্গতায়-যন্ত্রণায়-অস্বস্তিতে প্রায় যাপনের মতোই দিনানুদিনের বাস্তব ছিল। 'হারবার্ট' নিয়ে ছিল প্রায় এক ট্রমা ; একটা ঘোরের মতো, আসক্তির মতো ব্যাপার। কিন্তু যে রাজনৈতিক চেতনা, বোধ আর বোধির নিরিখে তিনি সময়-সমাজ-ইতিহাসকে দেখেন ; মাঝে মাঝে প্রতিক্রিয়া জানান তার এক-একটি আখ্যানে—এবার নবারুণের প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা গেল যে জীবন আর আখ্যান—দুয়েরই মধ্যে কেবল এক স্বচ্ছ ফারাকটুকু অনুভব করলেও তিনি হাসছেন এই গুলজারনগরের ভাঁড়েদের কীর্তিকলাপ দেখে। গৌতম চক্রবর্তীর প্রশ্নের উত্তরে, এ বিষয়ে কথাবার্তায় বাস্তব থেকে আখ্যানে যাবার বদলে কেমন আখ্যানই বাস্তব হয়ে ওঠার গন্ধ পাওয়া যায়! রাষ্ট্রযন্ত্র, ক্ষমতায়ন—এ সবের মুখর বিরোধিতা সময়টাকে হারবার্ট-ময় করে তুলেছিল। আর লেখক বসে যেন দেখছিলেন ভূত নামা কিংবা চৌবাচ্চার তেলাপিয়ার গঙ্গাসাগর অভিযাত্রা! গৌতম লিখেছিলেন :

> সপ্তাহ দুয়েক আগে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন তিনি। এবং শনিবার বিকেলেও এতটুকু টাল খায়নি তাঁর মনের জোরে। নিজের পত্রিকার স্টলে বসে হাসছেন তিনি, "হাসব না? ওরাই পুরস্কার দিয়েছিল, এখন ওরাই আটকাচ্ছে।"..."ওঁরা বলেছেন, ভুল মেসেজ যাবে," বলছিলেন সুমন। আর সেটা নিয়েই লেখকের হাসি। রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বিস্ফোরন ঘটিয়েও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'নরসিংহদাস' এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার' তো বটেই, রাজ্য সরকারের 'বঙ্কিম পুরস্কার'ও পেয়েছিল এই উপন্যাস। "মেসেজ ভুল না ঠিক, সেটা স্থির করার ওঁরা কে? নাকি, সে সময় ওঁরা উপন্যাসটা পড়েননি?" আবার হাসছেন নবারুণ।..."হারবার্ট নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই। হিপোড্রোম সার্কাস নেই। সিমলা স্ট্রিটে প্রসিদ্ধ গোঁসাই বাড়ির পাশে দীনুর হোটেল নেই। রাব্বা! রাব্বা!"...'সংস্কৃতিবান' মুখ্যমন্ত্রীর জমানাতেই সাহিত্য ও সিনেমায় বারে বারেই আঘাত। "স্তালিনপন্থী কোনো দল শাসনে থাকলে, বোধহয় এ রকমই হয়," বলছিলেন নবারুণ।
>
> [প্রতিবাদ নেই 'হারবার্ট' নিয়ে, লেখক হাসছেন/আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯ জানুয়ারি, ২০০৬/গৌতম চক্রবর্তী]

আফসার আমেদ এবং অনিশ্চয় চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'আখ্যান' পত্রিকায় 'নবারুণ ভট্টাচার্যের হারবার্ট : আলোচনাপত্র'টিতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ ও তদুপরি পাঠ প্রতিক্রয়া জানিয়েছিলেন শুভময় মণ্ডল, শিলাদিত্য সেন, সাধন চট্টোপাধ্যায়, নলিনী বেরা, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অনিশ্চয় চক্রবর্তী, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে নবারুণও লিখেছিলেন একটি লেখা। সেই লেখাটি ছিল :

'হারবার্ট' প্রসঙ্গে

'হারবার্ট' নিয়ে আমার চিন্তা অনেকদিনের। মূল বিষয়টি মস্তিষ্কের মধ্যে কোথাও দীর্ঘ দীর্ঘ সময় ধরে কোথাও ঝিম ধরে, কখনও তীব্র হয়ে ছিলই। তবে বন্ধু সুরজিৎ তাড়া না দিলে হয়তো কখনোই লেখা হয়ে উঠত না। গঠন-বিন্যাসটি ভেবে নিয়েছিলাম। এবং যখন লিখেছিলাম তখন আমার শরীর বেশ কাহিল, কিন্তু একটা ঘোর ছিল, একটা কিছুর ভর যেন। এক একটি অধ্যায়ে কি থাকবে তাও জানা ছিল। টানা লিখে যেতে অসুবিধা হয়নি। তবে একেবারে শেষের অধ্যায়টি

ওই টানে হয়নি। খুব বাজে একটা কিছু লিখেছিলাম। সেটা সহ্য করতে পারছিলাম না অথচ নতুন কিছু মাথাতেও আসছিল না। দিন দুয়েক ব্যাপারটা নিয়ে ভাবিনি। তারপর সহসা লিখে ফেলেছিলাম। এর আগে আমি কখনও দীর্ঘ কোনো আখ্যান লিখিনি। অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে নতুন। যে ঘোর বা ভরের কথাটা বলেছি সেটা হারবার্টের সঙ্গে আমাকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল যেটা খুব ভাল কিছু নয়। পাণ্ডুলিপি হাতছাড়া করতে খুবই খারাপ লেগেছিল। এরকম হাওয়া ভাল নয়। সম্প্রতি একজন আমাকে বলেছেন অবসেস্ড্ চরিত্র নিয়ে না লিখতে। কথাটা ভাবার মতোই কিন্তু কি করা যাবে?

আমি এক হারবার্টকে চিনতাম। সে ছিল অতীতের এক প্রসিদ্ধ মস্তান এবং যখন দেখেছি তখন মরফিনখোর। নামটা তার থেকেই নেওয়া। এরকম অনেক রকমের হারবার্টদের সঙ্গে আমার জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে। তারাই আমাকে এই ছন্নছাড়া সময়ের সুর ও মুখরতার সন্ধান দিয়েছে। আর গঠন, গড়ন, আয়তন নিয়ে আমি খুব খুঁতখুঁতে। কিছুদিন ভূতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করেছিলাম—তখন থেকেই কেলাসের আশ্চর্য গঠনের ব্যাপারটা আমাকে আচ্ছন্ন করে। অবশ্য অন্যান্য বিষয় যেমন সঙ্গীত, স্থাপত্য ও অনেক কিছুই এই ব্যাপারে আমাকে নিরন্তর ভাবায়। সামনে একটা স্পষ্ট মডেল দেখে আমি সবসময়ে লিখতে চাই। সেটা না থাকলে শুরু করার প্রশ্নই ওঠে না।

এবারে একটু রাজনীতির কথায় আসা যাক। 'হারবার্ট' লেখার সময় দুনিয়ায় বামপন্থার শোচনীয় সময়। একজন বামপন্থী মানুষ ও লেখক হিসেবে সেই দুঃসময় আমাকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল। তার সবটা ধাক্কা এখনও আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। চোখের সামনে সমাজতন্ত্র ইতিহাস হয়ে যাবে, অকেজো ও হাস্যকর বলে পরিত্যক্ত হবে এবং আমেরিকাতে যে ডেমো-রিপাব্লিকান ফ্যাসিবাদ চালু তার দালাল কিছু বুদ্ধিজীবী ইতিহাস মতাদর্শ সবকিছু খতম হয়েছে বলে ফতোয়া দেবে—এ মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 'হারবার্ট' একভাবে আমার রাজনৈতিক প্রতিবাদ—বিস্ফোরণ ঘটবেই, হাজার কম্পিউটার, ফ্যাক্স, সেলুলার ফোন, আমলা, পুলিশ কিছু দিয়েই একে ঠেকানো যাবে না—অমানবিক, পণ্যসর্বস্ব, ফিলিস্টাইন নীতিবোধের ওপরে যে রাষ্ট্রশক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে তার সাধ্য নেই এই অবধারিত ও অবিরত প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে। অথচ পাশাপাশি এটাও ভুললে চলবে না যে ইতিহাসের মহত্তম পরীক্ষার নামে ভুলভ্রান্তি ও ঘোর অন্যায় কিছু কম হয়নি। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-গ্রামচি-মাও-হো চি মিন প্রদর্শিত পথের যে তত্ত্ব তার চাকা খুলে ফেলে মানুষকে বলা হয়েছে অন্ধভাবে ঠেলতে। মানবিকতা ও মানবেতর নিষ্ঠুরতার ভেদরেখা মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেওয়া হয়েছে। এক একটা প্রজন্মকে পছন্দসই মিথ্যে ইতিহাস পড়ানো হয়েছে। পার্টি পর্যবসিত হয়েছে সুবিধাভোগী আমলাদের গট্-অপ কুস্তির আখড়ায়। সেখানে বিপর্যয় আসবে তো বটেই। এসেছেও। এই কথাগুলোও নানাভাবে 'হারবার্ট'-এর মধ্যে রয়েছে। রয়েছে শহর ও মানুষের ইতিহাস। অবশ্যই যতটুকু আমি দেখেছি ও বুঝেছি ততটুকুই। সামগ্রিক বীক্ষায় মানুষ কিন্তু কেবল শেয়ার কিনবে, মন্ড-সাহিত্য পড়বে ও স্টার টিভি দেখবে এমন নয়, মানুষ হ্যামলেটের মতো কিছু ঘটাবার ক্ষমতা রাখে। এবং সে বিষ মাখানো তরোয়ালে আহত হবার ঝুঁকি নেবে। তাকে একটা পাকাপোক্ত প্রবৃত্তিমার্গী ছকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টার পরিণতি কখনোই খুব সুখকর হতে পারে না।

আমার লেখা প্রথম দীর্ঘ আখ্যান নিয়ে 'আখ্যান' একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করে আমাকে বিরল সম্মানে সম্মানিত করেছিল। আসলে সেখানে যা বলেছিলাম তাই আমার লেখার

pathagar.net

কথা। কিন্তু কী বলেছিলাম পুরোপুরি মনে নেই। যা মনে পড়েছে তাই লিখতে হল। সুখের কথা যে 'হারবার্ট' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে অনেক ঘটনা বিশ্বে ঘটেছে ও ঘটে চলেছে যা সমর-শিল্প সমাহার ও মিলিয়নেয়ারদের ক্লাবের ফন্দিফিকিরকে হাস্যকর প্রমাণিত করে, যেমন ইয়েলৎসিন-এর জব্বর ভূতের জলসায় গণ্ডগোল।

[৩ জানুয়ারি, ১৯৯৬]

ভোগী

'বারোমাস' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় ১৯৯৩-তে প্রথম উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। সূচনায় পৃষ্ঠাজোড়া অলঙ্করণযুক্ত ফ্লাইলিফ। শিল্পী : অদিতি চট্টোপাধ্যায়।

'অটো ও ভোগী' নামে গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশিত হয় 'অটো' উপন্যাসটির সঙ্গে। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩। উৎসর্গ করেছিলেন : অভিজিৎ মুখার্জি, শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়—দুজনকে। প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত। মূল্য : ৬০ টাকা। বইটিতে 'অটো' উপন্যাসটির পরে রয়েছে এই উপন্যাসটি (পৃ ৬৭-১২০)। বইটির প্রচ্ছদের ফ্ল্যাপে জানানো ছিল :

> নবারুণ ঠিক প্রথাসিদ্ধ উপন্যাসের লেখক নন। বিপুলকায় নয় কিন্তু ওজনভারি নভেলেটাই তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র। হারবার্ট, খেলনানগর, লুব্ধক, যুদ্ধ পরিস্থিতি বা মসোলিয়ম-এর পর এমনই আরো দুটি লেখা ভোগী আর অটো। রচনাকালের হিসেবে ভোগী নবারুণের দ্বিতীয় এবং অটো সপ্তম উপন্যাস।
>
> ভোগী হারবার্টের অন্য এক মুখ ; নবারুণেরও। ভোগীও হতে পারে ব্যবসার মূলধন আবার গোলকায়নের অপরিচিত ভুবনে তার মতো বিপন্ন, লুপ্তপ্রায় এক জীবের ঘোরাফেরা যে বিস্ফোরকের মতো ভয়াবহও হতে পারে—সেই বিপদজনক সারল্য নিয়ে যে দাঁড়িয়ে। ভোগী কিংবা অটো—দুয়েরই মধ্যে যে নেমেসিসকে নবারুণ তুলে ধরেন—তা অস্তিত্বের এক অন্তর্মুখিন রাজনীতি! যে মৃত্যু উপত্যকার মধ্যে দিয়ে নবারুণের চরিত্ররা অনবরত ঘোরাফেরা করে সেখানে মানুষের দুটোই চেহারা—হয় নিঃশব্দ ঘাতকের, না হলে অসহায় আত্মহননকারী বা পরাজিতের। আর সেই উপত্যকা জুড়ে কেবল উন্নতির পারমাণবিক কুয়াশা। সময় আর সমাজের সঙ্গে একক মানুষের লড়াই আর সহাবস্থানের, অভিমান আর উদযাপনের যে যুদ্ধ পরিস্থিতি—তারই আরো দুটি চেহারা—ভোগী আর অটো।

'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় ১৯৯৪-এর মে-সংখ্যায় দেবেশ রায়ের 'নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথাবার্তা' শীর্ষক লেখাটিতে যে সাক্ষাৎকারটি ছিল তাতে 'ভোগী' উপন্যাসটি পুনর্লিখনের কথা নবারুণ জানিয়েছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষে পূর্বোক্ত 'হারবার্ট' উপন্যাসের সঙ্গেও তুলনা টেনে এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে তার বক্তব্য ছিল :

> 'হারবার্ট'-এ আমি এপিসোডিক ভাগ করে নিয়েছিলাম। 'ভোগী'তে তা করি নি। 'ভোগী'তে তিনটি ভাগ আছে। তবে গঠনের একটা মিল হয়তো আছে—শুরুতে ও শেষে। 'ভোগী'র মধ্যে যে অনেকটা সরল আখ্যান আছে—ভোগীর কলকাতায় আসা ও চলে যাওয়া, 'হারবার্ট'-এ আখ্যানের সে-রকম কোনো সরলতা আছে। কিন্তু 'ভোগী'র বর্তমান গঠনে আমি খুশি নই, সেটা আমি বদলাব।...
>
> ডকুমেনটেশনটাও আখ্যান রচনার একটি দায়। সে-রকম 'ভোগী'তেও একটা ডকুমেনটেশন আছে। 'ভোগী'র সঙ্গে 'হারবার্টে'র ডকুমেনটেশনের একটা এই তফাত আছে যে 'ভোগী'র

> একটা ধারাবাহিকতা আছে, আর হারবার্টের মধ্যে অনেক বিচ্ছিন্নতা আছে।...
>
> 'ভোগী' নিয়ে আমি কিছু বলব না, কারণ 'ভোগী' নিয়ে কাজ করছি। 'হারবার্ট' নিয়ে বলছি। আমার মনে হয়েছে উপন্যাস একটা ধারাবাহিকতায় পৌঁছে শেষ হয়। অর্থাৎ উপন্যাসে সব দরজা বন্ধ হয় না—খোলা থাকে, এরপরও জীবন চলবে, কাহিনি চলবে। আমি যা উপন্যাস পড়েছি—রুশ উপন্যাস, জার্মান-ফরাসি উপন্যাস, সোভিয়েত উপন্যাস—সে সবেই দেখেছি এই চলমানতার বোধটা এনে ছেদ টানা হচ্ছে। সেই চলমানতার বোধটা না আসা পর্যন্ত গল্প চলতে থাকে। আর সেখানে রিয়ালিজমের, বাস্তবতার কী অসামান্য শক্তি। একটা গল্প মনে পড়ছে, লিওনোভের লেখা। একটা আগুন লেগে বন পুড়ে গেছে। পরদিন পাশের নদী দিয়ে স্টিমারে যেতে যেতে যাত্রীরা দেখে একটা পোড়া পাখি যেন আকাশে উড়ছে। এটা কেউ না দেখলে বানাতে পারবে না। আবার বানানোরও একটা জায়গা আছে। আমার মনে হয়েছে 'ভোগী'তে সেই বানানোর দুর্বলতাই ঘটেছে। আজকের দিনে আমি এমন একটা আত্মবলিদানকে সত্যি বলতে পারি না। অথচ সেটা আমাকে কোনো এক ভাবে দেখাতে হবে। এই দেখা আর বানানো মিলেই উপন্যাসের বুনোটটা তৈরি হয়।

পত্রিকায় উপন্যাসটি লেখার ১৪ বছর পরে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও অবশ্য নবারুণ উপন্যাসটির কোনোই রদবদল ঘটাননি ; 'ভোগী' অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে।

যুদ্ধ পরিস্থিতি

pathagar.net

'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় ১৯৯৫-এর শারদ সংখ্যায় প্রথম 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' প্রকাশিত হয়েছিল।

পরের বছর জানুয়ারি ১৯৯৬-তে প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড থেকে গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন রবীন মণ্ডল। অন্যান্য ছবি ও অলংকরণ করেছিলেন যুধাজিৎ সেনগুপ্ত। উৎসর্গ : শ্রীমান তথাগত ভট্টাচার্য-কে। মূল্য : ২৫ টাকা। ১০৮ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৬। সপ্তর্ষি প্রকাশন। প্রচ্ছদ : রাজীব চক্রবর্তী। মূল্য : ৫০ টাকা। ৮৭ পৃষ্ঠা। এই সংস্করণে বইয়ের ভিতরকার ছবি ও অলংকারণগুলি বাদ গেছে। উৎসর্গ অপরিবর্তিতই রয়েছে।

২০০৯-এ 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' নাট্যদলটি 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' মঞ্চস্থ করে। এর নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়। তারই পরিচালনায় নাটকটি অভিনীত হয়।

১৯৯৮-তে 'তথ্যকেন্দ্র' পত্রিকাকে দেওয়া লেখকের 'উপার্জনের উদ্দেশ্যে আমি লিখি না' শীর্ষক সাক্ষাৎকারটিতে এই উপন্যাসটি লিখবার পিছনে যে আবেগ ও অনুভূতি সক্রিয় ছিল তার আঁচ পাওয়া সম্ভব। নবারুণ বলেছিলেন :

> সত্তরের আন্দোলন দ্বারা আমি যে প্রভাবিত হয়েছিলাম একথা তো সবাই জানে। আমার রেসপন্সটা ছিল কিন্তু লেখক হিসাবেই। আমার যেটা দায় সেটা আমি আমার লেখা দিয়েই পূরণ করে দিয়েছি। সত্তরের ত্যাগটা যদি আমাদের এখানে কেউ অস্বীকার করে বা ভুলে যায় তাহলে সে খুব অন্যায় কাজ করবে। কারণ অতবড় ঘটনা আমাদের জীবনকালে আর কখনও ঘটেনি, এক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া। সত্তরের তেজটা তো আমার মধ্যে আছে, তার যে মেজাজ এবং সেই সময় আমার যে ক্রোধ সেটা আমার কাছে একটা স্থায়ী সম্পদ।

এই বিষয়টাই নবারুণের সিরিয়াস চিন্তার বিষয় হয়ে ছিল। পরে আরো বিশদভাবে সেই সময়টাকে ভুলে যাওয়া বা ভুলিয়ে দেওয়ার রাজনীতিকে লেখার রাজনীতি দিয়েই প্রতিরোধ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা প্রথম উপন্যাস 'হারবার্ট'-এর মতো এক্ষেত্রেও সক্রিয়। হারবার্টের অভিযাত্রা আর রণজয়ের অভিযাত্রা এক জায়গায় সমার্থক—দুজনেরই বর্তমানের মধ্যে কালবিপর্যাস ঘটেছে 'ভূত'-এর, অর্থাৎ অতীত-এর। হারবার্টের বিনু আর রণজয়ের ক্ষেত্রে অতীতের রণজয় নিজেই। হারবার্টে বিস্ফোরণের তাৎপর্য কোথাও আতসবাজির পুনরাবৃত্তিময় শব্দে 'যুদ্ধ পরিস্থিতি'-র আবহ ধ্বনিকল্পই কেবলমাত্র হয়ে থাকেনি ; এখানেও রয়েছে বিপদজনক বিস্ফোরণের সম্ভাবনাময় এক অতীতকে নিয়ে বর্তমানে নাড়াচাড়া করার রিস্ক! আর অবশ্যই তার সঙ্গে এক হারিয়ে যাওয়া সময়কে বারবার ছেনে ছুঁয়ে হাতড়াবার মতো ট্র্যাজিক অসহায়তা! ২০০৭-এ 'কবিতীর্থ'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারটির বক্তব্যকেই যেন আরো বিশদভাবে, আরো বিশ্লেষণসহ গুছিয়ে নবারুণ বলেছিলেন :

> টেররিস্ট আন্দোলন বলো বা নকশালবাড়ি আন্দোলন—যে ঝুঁকি নেওয়ার কথাটা বলেছিলাম সেই ঝুঁকিটা নিয়েছিল। নিয়েছিল মূলত যৌবন। এখানে technically, chronologically কার কী বয়স সেটা বলতে পারব না। কিন্তু যৌবনের যে ধর্ম revolt সেই ঝুঁকিটা—তার মধ্যে কী ভুল কী ঠিক, তা পলিটিক্যাল আলোচনা, সে বিষয়ে যাচ্ছি না। তবে এ আন্দোলনটাকে ভুলে যাওয়া, ভুলিয়ে দেবার মধ্যেও একটা রাজনীতি আছে। কারণ এখন তো অন্য জিনিস হয়ে গেছে এখন তো একটা acquisitive society তৈরি হয়ে গেছে। সবকিছু হচ্ছে নিতে হবে, grab করতে হবে। আর তখন ছিল ছাড়ার ব্যাপার, দেশের জন্য ছাড়াই নয়, প্রাণটুকুও—পুরো একটা লাশ হয়ে পড়ে থাকা—এই এত বড় ব্যাপারটাকে আমার মনে হয় না যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হয়েছে। কারণ ওই সময়টা আমাকে haunt করে। ওটা ছিল আমার প্রজন্ম আমি প্রতক্ষ্যভাবে ওই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম, সেটা বলেছি অন্য জায়গাতে। সেই অর্থে আমাকেও কিন্তু ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। তারা অনেকেই আমার বন্ধু, ছেলেবেলার, এখন নেই, মরে গেছে। কাজেই এটা আমার মাথা থেকে কখনও যায় না। ওটা আমার প্রজন্ম। আমার প্রজন্ম শুধু বললে ভুল বলা হবে—বিশ্বজুড়ে এটা হয়েছিল—ফ্রান্স থেকে এটা শুরু করে, ওয়েস্ট জার্মানি থেকে শুরু করে, ভিয়েতনাম থেকে শুরু করে all over the world। এবং এখন এই যে পৃথিবী জুড়ে একটা ধাঁচা দাঁড়া করিয়ে দেওয়া হচ্ছে—এ ধাঁচা নেহি চলেগা।

খেলনা নগর

উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় শারদসংখ্যা 'প্রতিদিন' পত্রিকায় ১৪০৫ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ ১৯৯৮-তে। অলঙ্কারণ করেছিলেন শান্তনু দে। প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে উপন্যাসটির নাম-পৃষ্ঠার ছবি এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের শুরুতে কতগুলি ছোট ছোট লাইন ড্রয়িং ছিল। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার মাস কয়েক আগে 'তথ্যকেন্দ্র' পত্রিকাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে (জুন, ১৯৯৮) নবারুণ জানিয়েছিলেন :

> শারদীয়ার লেখালিখি নিয়ে আমি খুব একটা ব্যস্ত থাকি না। তবে আগামী পুজোতে 'প্রতিদিন'-এ একটা উপন্যাস লেখার কথা আছে।

এই উপন্যাসটাই 'খেলনা নগর'। পরে ২০০৪ সালের ৪ ডিসেম্বর উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'সপ্তর্ষি প্রকাশন' থেকে। বইটি উৎসর্গ করেছিলেন 'প্রমা'-র সম্পাদক, নবারুণের বন্ধু সুরজিৎ

ঘোষ-কে। প্রচ্ছদ : রাজীব চক্রবর্তী। মূল্য : ৫০ টাকা। ৬৪ পৃষ্ঠা। উপন্যাসটির রচনাকালে আর উপন্যাসটির ঘটনাকালে যে সময়ের ফারাক ছিল—গ্রন্থাকারে উপন্যাসটির প্রকাশকালের সঙ্গে তার সমীকরণটি এক অদ্ভুত সংযোগ! সে কথা বইটির পরিচিতিতে জানানো হয়েছিল এভাবে :

> 'খেলনানগর'—খেলনা আর পুতুল ঘিরে ৪৮৭ জন মানুষের এক উপনিবেশ। এখানে থাকে জিশা ও কুমারের মতো প্রেমিক প্রেমিকা, থাকে বামন, দুজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী '৮' আর '৯' কিংবা হাতকাটা আর তার দলবল। 'থাকে' না বরং 'ছিল' বলাটাই ঠিক।
>
> দেশ জুড়ে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন এই উপনিবেশের পশ্চিমদিকে পারমাণবিক বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয় ও রাসায়নিক আবর্জনা ফেলে কৃত্রিম পাহাড় বানানো হল। তারপর বর্ষাকালে সেই পাহাড় থেকে নেমে আসা বিষাক্ত জলে দেখা দিল অশনি সংকেত! খেলনানগরের ধ্বংস হয়তো অনিবার্যই ছিল কিন্তু মৃত্যু এল অপ্রত্যাশিত এক পথে।
>
> উইন্ডচিটার বলে এক বহিরাগত এসে হাজির খেলনানগরে, এক ঝলক আশার আলোর মতো। কিন্তু এক রহস্যময় মানুষ সে। তারপরই গড়াতে শুরু করল অনিশ্চয়তায় ভরা এক সময়ের চাকা। খেলনানগরের ওপর পরীক্ষা করে দেখা হল তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরক 'ক্যাপিটালিস্ট বম্ব'-এর কর্মক্ষমতার সাফল্য।
>
> ১৯৯৮-তে প্রথম প্রকাশিত এই উপন্যাসে খেলনানগরটির পত্তনকাল বলা হয়েছে ১৯৯০। আর খেলনানগরের যে ধ্বংস হয়ে যাওয়া কল্পকালটার মুখোমুখি পাঠকদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় আখ্যানের শুরুতেই, দিনটা দুহাজার চার সালের চৌঠা ডিসেম্বর! আখ্যানের এই অলৌকিক দিনটা যখন ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠায় সত্যি একটা দিন হয়ে দাঁড়ায়, সেই দিনেই এই উপন্যাসের সপ্তর্ষি-সংস্করণ পাঠক আর আখ্যানের সমীকরণটিতে একটা অভিনব মাত্রা যোগ করল।

বাংলায় উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগেই হিন্দিতে অনূদিত হয়ে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৩-এ 'খিলৌনা নগর' নামে। একই মলাটে 'লুব্ধক' উপন্যাসটিও এরই সঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে যায় বাংলায় উপন্যাসটি বই হয়ে বের হবার আগে। অনুবাদ করেছিলেন সুশীল গুপ্তা। প্রকাশক : বাণী প্রকাশন, নতুন দিল্লি। মূল্য : ১২৫। প্রচ্ছদটি সালভাদর দালি-র Premonition of Civil war (১৯৩৬) ছবিটি ব্যবহার করে তৈরি করা। এই বইটির মুখবন্ধ হিসেবে 'অপনি বাত...' অর্থাৎ নিজের কথা সূত্রে যে অংশটি ছিল, তার বঙ্গানুবাদ :

> আমার এই দুটো উপন্যাসিকারই বিষয়বস্তুকে যদি একটা শব্দে ধরতে চাই, তবে সেটা হল—নির্মমতা! যদি এই নির্মমতার অতীত সন্ধানে খনন শুরু করা যায়, তো গলগোথার হাড়গোড় বেছানো সেই পাহাড় পার হয়ে মোহেনজোদরো পর্যন্ত তা পৌঁছে যাবে—যেখানে মাটি খুঁড়ে একটা ছোট বাচ্চার খুলি পাওয়া গিয়েছিল যাতে ঘাতকের কুঠারের আঘাতের দাগ স্পষ্ট! অসউইৎজ-অসউইচেম মৃত্যু-শিবির, ট্রেবলিংকা, গুলাগ, ভিয়েৎনাম বা হিরোশিমার নিষ্ঠুরতা! যে ক্রুরতা গত শতাব্দীতে কোটি কোটি মানুষের প্রাণ নিয়েও তৃপ্ত হয়নি। সাম্রাজ্যবাদ আর তারই হাতে তৈরি সন্ত্রাসবাদ, ভবিষ্যতেও না জানি আরও কত কত এরকমই বীভৎসতা আর ত্রাসে ভরা দৃশ্য দেখাবে—এখনও এ বিষয়ে আমাদের সঠিক কোনো আন্দাজই নেই। তবে এখন পর্যন্ত যা ঘটে গেছে আর ভবিষ্যতে তা কতদূর পর্যন্ত ঘটবে, আমরা তার একটা অনুমান অবশ্য করতে পারি, আর তা পারলে শিউরে উঠতে হয়। সর্বগ্রাসী লোভ আর উন্মত্ত মতান্ধতা একদিকে বাণিজ্যিক গোলকায়ন আর অন্যদিকে বাড়তে থাকা নৃশংসতা, সমবেদনাহীনতা, জাতিবিদ্বেষ, জবাবদিহির দায় অস্বীকার করা। এই দুই দানবের নৃশংস তাণ্ডবে শুভবুদ্ধি দিশাহারা হয়ে পড়েছে। এর পরিণতি কিন্তু এক বিশাল ধ্বংস। ব্ল্যাকহোলের অতল অন্ধকার! চরম নাস্তি! যখন জীবন্ত প্রাণী আর তাদের জীবনই ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন কোথায়

pathagar.net

> বসবে বাজার? কে-ই বা মুনাফা লুটবে? ক্লাউনের পোশাক পরে হাসাবেটাই বা কে? এ তো সিনেমার টিকিট পকেটে রেখে ভুলে যাবার মতো ব্যাপার হয়ে গেল! সবারই ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত! তবে লেখকই বা এই অসম্পূর্ণতার বাইরে হতে পারেন কি? চারিদিকে হাজার হাজার রঙের সমারোহ—আনন্দ চলেছে ; উৎসব চলেছে ; হাজারো বিক্রিবাটাও চলেছে, আর অগুন্তি অহংকারী দাম্ভিকের সার্কাস। আসলে যারা ধ্বংস হয়ে যায়, সম্ভবত তারাই এই ধরনের নির্বোধ উৎসবে উন্মত্ত হয়ে ওঠে—আজকাল আমার তো এমনই মনে হয়।

এই অংশটির সঙ্গে দেবেশ রায়ের গ্রহণ করা সাক্ষাৎকারটির কিছু কিছু প্রসঙ্গের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

কাঙাল মালসাট

নবারুণের প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস। 'প্রমা' পত্রিকায় প্রায় দুবছর ধরে 'কাঙাল মালসাট' প্রকাশিত হয়েছিল। কলেবরের বিচারে লেখকের সব থেকে বড় উপন্যাস এটিই। পত্রিকায় উপন্যাসটির প্রথম ১৮টি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়।

প্রথম অধ্যায় :	প্রমা, ডিসেম্বর ১৯৯৯
দ্বিতীয় অধ্যায় :	প্রমা, জানুয়ারি ২০০০
তৃতীয় অধ্যায় :	প্রমা, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০০০
চতুর্থ অধ্যায় :	প্রমা, এপ্রিল ২০০০
পঞ্চম অধ্যায় :	প্রমা, মে ২০০০
ষষ্ঠ অধ্যায় :	প্রমা, জুন ২০০০
সপ্তম অধ্যায় :	প্রমা, জুলাই ২০০০
অষ্টম অধ্যায় :	প্রমা, অগাস্ট ২০০০
নবম অধ্যায় :	প্রমা, নভেম্বর ২০০০
দশম অধ্যায় :	প্রমা, ডিসেম্বর ২০০০
একাদশ অধ্যায় :	প্রমা, জানুয়ারি ২০০১
দ্বাদশ অধ্যায় :	প্রমা, ফেব্রুয়ারি ২০০১
ত্রয়োদশ অধ্যায় :	প্রমা, এপ্রিল ২০০১
চতুর্দশ অধ্যায় :	প্রমা, মে ২০০১
পঞ্চদশ অধ্যায় :	প্রমা, জুন ২০০১
ষোড়শ অধ্যায় :	প্রমা, জুলাই ২০০১
সপ্তদশ অধ্যায় :	প্রমা, অগাস্ট ২০০১
অষ্টাদশ অধ্যায় :	প্রমা, নভেম্বর ২০০১

উপন্যাসের শেষ তিনটি পরিচ্ছেদ ১৯,২০ এবং ২১—গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় সংযোজিত হয়। এই আকারে 'কাঙাল মালসাট' প্রথম পেপারব্যাক সংস্করণ হিসেবে প্রকাশিত হয় ২০০৩-এর জানুয়ারিতে। প্রকাশক : সপ্তর্ষি প্রকাশন। প্রচ্ছদের পরিকল্পনা করেছিলেন স্বাতী রায়চৌধুরী এবং তার রূপায়ণ করেছিলেন চম্পক নন্দী। মূল্য : ৫০ টাকা। ১৯৫ পৃষ্ঠা। বইটি কারোকে উৎসর্গ করা হয়নি, বরং গ্রন্থ উৎসগের পৃষ্ঠাটিতে ছিল : 'পাণ্ডুলিপি পুড়ে যায় না' মিখাইল বুলগাকভ;

(১৮৯১-১৯৪০)।

এই পৃষ্ঠাটিকে অবশ্য প্রথমে অন্যরকম ভাবে লেখার কথা ভেবেছিলেন নবারুণ। 'কাঙাল মালসাট'-এর পাণ্ডুলিপির খসড়া পৃষ্ঠাগুলির সঙ্গে বাতিল করে দেওয়া একটি পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন :

মিখাইল আফানাসিয়েভিচ বুলগাকভ
লেখক
(১৮৯১-১৯৪০)

মস্কোর নোভোদেভিচি কবরখানায় একটি সমাধির ফলকে এইটুকুই লেখা আছে। সেখানে কখনও আসার সুযোগ হলে 'কাঙাল মালসাট' চুপ করে বসে থাকবে। ভাববে 'পাণ্ডুলিপিরা পুড়ে যায় না'

নবারুণ ভট্টাচার্য
১.১.২০০৩

pathagar.net

বই আকারে 'কাঙাল মালসাট' প্রকাশের পর বইটির চতুর্থ প্রচ্ছদে লেখক এবং এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে যে পরিচিত দেওয়া ছিল, তাতে লেখা রয়েছে :

> এ এমনই জগৎ যেখানে চারপাশের সবকিছু, সমস্তই অচেনা, অথচ ভীষণ পরিচিত। ছকবন্দী কোনো ঘটনা নয়, সম্ভাব্য ও আপাত অবিশ্বাস্য কিন্তু বিশ্বাস্য কাহিনীর সঙ্গে ব্যঙ্গের মিশ্রণে নবারুণ ভট্টাচার্য-র এই উপন্যাস হয়ে ওঠে সৃজনীসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তারই সাথে সাথে বাংলা ভাষা ব্যবহারের এ এক নতুন প্রক্রিয়া।
>
> বাংলা সাহিত্যে ফ্যাতাড়ুদের আবির্ভাব এক মহা চমকপ্রদ ঘটনা। ইতিপূর্বে সুমহান এবং সুপ্রাচীন এই সাহিত্যের ধারায় হেসে খেলে, নেচে গেয়ে অবলীলায় যে সব পাহাড় প্রমাণ চরিত্ররা তাদের অস্তিত্ব সগৌরবে ঘোষণা করেছেন তাদের সঙ্গে ফ্যাতাড়ুদের আবির্ভাব গৌরবের নাকি ভয়ের, আনন্দের নাকি ডুকরে কেঁদে ওঠার এ বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আমরা এখনো উপনীত হতে পারিনি। কবিবর পুরন্দরের সঙ্গে ডি. এস এবং মদনের ত্রিমাত্রিক সম্পর্কের যে আঁচে পাঠককূল এতদিন ঝলসাচ্ছিলেন এই উপন্যাসে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চোক্তার ভদি, বেচামণি, বড়িলাল, বেগম জনসন, কমরেড আচার্য এবং অন্যান্যদের সঙ্গে এক বৃহৎ দণ্ডবায়স। কাহিনীর বিন্যাসে জড়িয়ে পড়তে পড়তে 'কাঙাল মালসাট' হয়ে উঠেছে এক অনবদ্য গোলমেলে অভিজ্ঞতা। যা আমাদের একপেশে বা কিছুটা একঘেয়ে হয়ে আসা বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন বিস্ফোরণ।

এই উপন্যাসটির চিন্তাগত এবং আখ্যানগত সূত্রপাত অবশ্য এর আগে প্রকাশিত ফ্যাতাড়ুদের নিয়ে লেখা গল্পগুলিতে। এর পরেও 'কাঙাল মালসাট'-এরই লিখন কৌশল, চরিত্রাবলী এবং ভাবনা নিয়ে 'মসোলিয়াম' নামে একটি উপন্যাস লেখেন এবং তারও পরে নবারুণের নিজের সম্পাদিত 'ভাষাবন্ধন' পত্রিকায় ২০১০-এর জানুয়ারি সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক আকারে প্রকাশ শুরু হয় 'মবলগে নভেল'-এর। কেন 'কাঙাল মালসাট' লিখেছিলেন, তার মধ্যে আখ্যান নির্মাণের যে সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল সে বিষয়ে নবারুণের মনোভাব সম্বন্ধে তার সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় :

> *কাঙাল মালসাট*-এ একটা মালটিলেয়ার টেক্সট্ আছে। ওর মধ্যে একটা Planned জগাখিচুড়ির চেষ্টা আছে। *কাঙাল মালসাটের* মধ্যে একটা artistic design নির্মাণের কৌশল অন্যরকম ভাবে ব্যবহার করেছি। যেমন ওই উপন্যাসের মধ্যে আমি কবিতা ব্যবহার করেছি আর একটা জিনিস যেটা হয়তো বাবার কাছ থেকে পাওয়া—ডায়ালগের ওপর খুব জোর দেবার চেষ্টা করেছি। এই সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো *কাঙাল মালসাটে* আছে। এই কাহিনির মধ্যে একটা ইতিহাসেরও ব্যাপার আছে আর ঘটেছে বহুমাত্রিক রাজনীতির সংমিশ্রণ। সমসাময়িক সমস্যাবলিও তুলে ধরা হয়েছে। *কাঙাল মালসাট* লেখার পরিকল্পনা কী করে আমার মাথায় এল তা বলতে পারব না। তবে এটা ঠিক normal realistic plan-এ হয়নি। আসলে আমি একটা নিয়ম ভাঙতে চেয়েছিলাম।...
>
> [নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথাবার্তা/কবিতীর্থ/আশ্বিন ১৪১৪, ২০০৭/পৃ.১৮৭]

শ্রীদেবেশ রায় এই বইটির বিষয়ে তার আলোচনায় পাঠক হিসেবে নভেল-টিতে একটি 'অচেতন স্থূলতা' লক্ষ করার মধ্যে বুড়ি-ছোঁয়া গোছের একটু বিরূপতার স্পর্শ রেখেই আবার তা সামলে নিয়ে লিখেছিলেন :

> 'কাঙাল মালসাট'-এ একটি প্রতিক্রিয়াবান স্বাধীন ঘটনা আছে—ভদির চাকি খোলা। (ভদির চাকতির ঘর খোলা হওয়া উচিত ছিল) সেই ঘটনাটিকে বুড়ি-ছোঁয়া রেখে সরকারের ও পার্টির নানা ঘটনা আছে। সেই দুইকে বুড়ি-ছোঁয়া রেখে ক্ষণে ক্ষণে ইতিহাস মনে করিয়ে দেওয়া আছে। সেই মনে-করিয়ে দেওয়াকে গল্পটির সঙ্গে গেঁথে ফেলতে ভাটের কবিতা আছে। অজস্র জায়গায়, অজস্র মন্তব্য ও ডায়ালগ আছে। এ-রকম 'আছে'-র লিস্টি বাড়ানো যায়। ফলে কি এমন নভেলের শানানো চেহারায় একটু অচেতন স্থূলতা লেগে যাচ্ছে? অথবা, আত্মসচেতনতাটি শিং তুলে খোঁচা দিচ্ছে। এটা আমার ইচ্ছের দোষও হতে পারে—যেন এমন নভেলে লেখককে একটু কম শেয়ানা বা একটু ধরা-পড়া বাস্তুঘুঘুর মতো দেখতে চাই। শুধু দেখলে হবে? খরচা আছে।
>
> [প্রতিক্রিয়াবান দুটি নভেলে নতুন নভেলের মেজাজ/আজকাল/১৮ জানুয়ারি ২০০৪]

শ্রীমৈনাক বিশ্বাস তার গ্রন্থসমালোচনায় নবারুণের সমস্ত লেখালিখির মধ্যে 'কাঙাল মালসাট'-এর বিশেষ এবং নির্বিশেষ দুটো অবস্থানকেই চিহ্নিত করে লিখেছিলেন 'A carnivalesque Exploration of A city' (December 2003)। তার পর্যালোচনার একটি টুকরো :

> The immobilized meanings of class are subjected to a dispersal to signal a new gathering of class identity. The infantile dimension of this activity is acknowledged in the novel ; it is full of adolescent gestures of disgust and lampoon. But the mobilization of the new agents of rebellion has its own grandeur in the way the action brings together the creatures of ressentiment and their targetsr into a common carnival. The rebels are led by the 'choktars', and they are joined by another species, the 'fyatarus', who first appeared in the collection, *Fyatarur Bombachak.* Their targets are almost everyone else, all who live above ground, all who have a stake in the sanctioned order of reality–policemen, museum curators, industrialists, politiclans.

শ্রীসুমন মুখোপাধ্যায় 'কাঙাল মালসাট'-এর নাট্যরূপ দেন এবং ঐ নামেই 'তৃতীয় সূত্র' নাট্যগোষ্ঠী নাটকটি মঞ্চায়িত করে ২০০৬-এ।

লুব্ধক

'দিশা সাহিত্য' পত্রিকার শারদীয় ১৪০৭ সংখ্যায় (২০০০) উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। অলঙ্করণ 'জনি' নামক শিল্পীর। পরে ২০০৬-এর জানুয়ারিতে অভিযান পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থাকারে 'লুব্ধক' প্রকাশ পায়। প্রচ্ছদ : রাজীব চক্রবর্তী। মূল্য : ৪০ টাকা। ৬৩ পৃষ্ঠা। বইতে উৎসর্গের পৃষ্ঠায় লেখকের মুখবন্ধটাই অনেকটা যেন উৎসর্গের মতো :

> একটি কুকুর উপকথা লেখার পরিকল্পনাটি আমার দীর্ঘদিনের, যার পরিণতি 'লুব্ধক'। কুকুর, বেড়াল, পাখি, মাছ —এদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছোটোবেলা থেকেই। তারা যেমন আনন্দ দিয়েছে আমাকে, তেমনই দুঃখ দিয়েছে চলে গিয়ে। শিখিয়েছে আমাকে অনেক কিছুই যা ঠিক বই পড়ে জানা যায় না। আমার ছোটোবেলার সঙ্গী জিপসির প্রতি আমার যে ঋণ থেকে গিয়েছে তা শোধ করার চেষ্টা হিসেবেও লেখাটিকে দেখা যেতে পারে। প্রাণমণ্ডলের অধিকার একা মানুষেরই নয়, সকলেরই। এই অধিকারের মধ্যেই নিহিত আছে প্রাণ ও মৃত্যুর নিয়ত ভারসাম্যের এক সমীকরণ যাকে বিঘ্নিত করলে মানুষের লাভের চেয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
>
> ১ ডিসেম্বর ২০০৫

গ্রন্থে মুদ্রণ প্রমাদের জন্য প্রথম অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অনেকটা অংশই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছাপা হয়েছে। পত্রিকায় উপন্যাস শুরুর আগে গাঢ় হরফে ছাপা একটি সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধের মতো অংশ ছিল। বইতে এই যে অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে, সেখানে নবারুণ লিখেছিলেন :

> জিপসি এবং ফ্রান ট্রাট-এর উদ্দেশে এই কুকুর-উপকথাটি উৎসর্গীকৃত হয়েছে। ১৯৮৮ সালে ইউ.এস সার্জিকাল কর্পোরেশন নামক চিকিৎসা-সরঞ্জাম নির্মাণকারী সংস্থাটির দপ্তরে বোমা রাখার সময় ফ্রান-ট্রাটকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সংস্থাটি শল্য-চিকিৎসার জন্য যে বিশেষ স্টেপলার বানাত তা কতটা কার্যকর সেটা দেখানোর জন্য জীবন্ত কুকুরদের ব্যবহার করা হত। জিপসির পরিচয় উপকথাটিতেই রয়েছে।

'কবিতীর্থ' পত্রিকার তরফ থেকে গ্রহণ করা সাক্ষাৎকারে 'লুব্ধক' রচনার প্রসঙ্গে নিজের পরিকল্পনা বা ভাবনার কথা জানাতে গিয়ে নবারুণ বলেছিলেন :

> এক অর্থে আমি প্রাণমণ্ডলের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। আমার যেমন অধিকার আছে, মশারও অধিকার আছে আমাকে কামড়াবার। আমি অনেকের থাকাতে বিশ্বাসী। লুব্ধকে সে চেষ্টাটা করেছিলাম। প্রাণ নিয়ে চৈতন্য নিয়ে যে বিরাট স্তর সেভাবে দেখি। একবারও মনে করি না যে জীবনের সব প্রবলেম সলভ্ড হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা মানুষ তার মতন করে পেরেনিয়াল কোশ্চেনগুলো তুলবে।
>
> [নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথাবার্তা/আশ্বিন ১৪১৪/পৃ.১৭৮]

২০০৩-এ উপন্যাসটির হিন্দি অনুবাদ প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে। 'খিলৌনা নগর' বইটিতে 'খেলনানগর' উপন্যাসটির পরে 'লুব্ধক'-এর এই অনুবাদটি সংযোজিত হয়েছিল। অনুবাদ করেছিলেন সুশীল গুপ্তা। প্রকাশক বাণী প্রকাশক, নতুন দিল্লি। মূল্য ১২৫ টাকা। প্রচ্ছদে সালভাদর দালি-র Premonition of Civil War (১৯৩৬) ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছিল।

অটো

'আজকাল' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৩-এ। সূচনায় এক পৃষ্ঠা জুড়ে এবং লেখার মাঝে মাঝে থাকা অলংকরণগুলি (মোট চারটি ছবি) করেছিলেন যুধাজিৎ সেনগুপ্ত।

'অটো ও ভোগী' নামে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভোগী' উপন্যাসটির সঙ্গে। প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং। প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩। উৎসর্গ করেছিলেন : অভিজিৎ মুখার্জি, শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়—দুজনকে। প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত। মূল্য : ৬০ টাকা। বইটিতে প্রথমে রয়েছে উপন্যাসটি (পৃ. ১১-৬৪)। বইটির মুখবন্ধে নবারুণ লিখেছিলেন :

> এই বইতে 'অটো' রয়েছে আগে, 'ভোগী' পরে। যদিও 'ভোগী'-ই অগ্রজ, সেই বিরানব্বই সালে লেখা। দুটি লেখাই আমার নিজের প্রিয়, অনেকের নয়। কেউ কেউ বলেছে যে লেখাদুটিকে বাড়ানো দরকার। একই সঙ্গে বইবন্দি করার সুবাদে ফিরে পড়তে গিয়ে মনে হল সেটা ঠিক হবে না। টেনে বাড়িয়ে দুর্বলতা ঢাকা যাবে না, খুব একটা সঙ্গত মনেও হচ্ছে না। ভাষার ব্যবহার, গড়নের আদল, ধরতাই, চিতা নেভানো—সবকিছু দিয়েই দুটি ভিন্ন কিসিমের লেখা। বোধহয় নিজের লেখা নিয়ে কিছু পরীক্ষাও আছে। তবে একই ধাঁচে লিখতে যে আমার ভালো লাগে না, ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির মুন্সিয়ানা যে আমার নেই সেটা বোধহয় আমার পাঠকেরা এতদিনে জেনে ফেলেছে। ফাঁস ও ফাঁসি অবধারিত জেনেও প্রাণমণ্ডলে বাঁচতে আসা মানুষ একই সঙ্গে মরে এবং মেরে একটা ট্র্যাজেডির পালায় নাম লিখিয়েই চলেছে। কিছু একটা চাহিদা তার আছেই যেটা মিটছে না বলেই। এই ব্যাপারটা আমাকে নিয়ত ভাবায়। সে বুঝতে পারছে কোনো ছকেই তার মুক্তি নেই। অথচ এই ভবিতব্য মানতেও সে নারাজ। উত্তর জানি না কিন্তু আমিও নারাজ। এই অস্থির কষ্টটা পাঠকের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চাই। ধন্যবাদ।

মসোলিয়ম

উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৪-এ 'ভাষাবন্ধন' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়। এই পত্রিকার সম্পাদকও নবারুণ। নিজের পত্রিকার গল্প, কবিতা প্রকাশিত হলেও উপন্যাস এই প্রথম। এই উপন্যাসে কতগুলি চিত্রিত বিজ্ঞাপন রয়েছে। সেগুলি এবং অন্যান্য অলঙ্করণ করেছিলেন পলাশ পাল।

২০০৬-এর জানুয়ারি, মাঘ ১৪১২-তে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত এই বইটির প্রচ্ছদ করেছিলেন অজয় গুপ্ত একটি পোলিশ পোস্টার অবলম্বনে। গ্রাফিক্স : চন্দন গুপ্ত। উৎসর্গ করা হয়েছিল রাজীব ও সুমিতা চৌধুরীকে। ৭৭ পৃষ্ঠা।

পত্রিকায় উপন্যাসটিতে ছোট ছোট ১৮টি পরিচ্ছেদ ছিল। বইতে নবারুণ ১৯ এবং ২০-এই দুটি নতুন পরিচ্ছেদ সংযোজন করেছেন। এবং মাঝেও গুরুত্বপূর্ণ পাঠ সংযোজিত হয়েছে। 'ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক' গল্পগ্রন্থে যে অন্য ধরনের চরিত্র আর আখ্যানের সূচনা হয়েছিল, সেই সূত্রেই 'কাঙাল মালসাট' উপন্যাসটি লেখা এবং 'মসোলিয়ম'-কে এর পরবর্তী খণ্ড ধরা যায়। এরই পরবর্তী ধাপ হিসেবে ২০১০-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যা থেকে 'ভাষাবন্ধন' পত্রিকায় শুরু হয়েছে নবারুণের নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস 'মবলগে নভেল'। এই জাতীয় লেখাগুলি কেন লেখেন, সে বিষয়ে নবারুণের কৈফিয়ৎ ছিল :

বাংলায় যাকে বলে আমোদগেঁড়ে আমি একটু আমোদগেঁড়ে আছি, কার্নিভাল ভালোবাসি। পুজোটুজো এলে আমার প্রচণ্ড আনন্দ হয়। এই যে এত লোক আনন্দ করছে আমি হয়তো তাদের মতো করে করতে পারি না কিন্তু আমার লোভ হয়। হিংসে হয়। এবং মানুষের সামান্যতম আনন্দে আমি খুবই আনন্দিত হই। রাস্তায় একটা ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে—আমি দাঁড়িয়ে দেখি। এই যে মানুষের হাজার দুঃখের মধ্যেও তার বেঁচে থাকা প্রাত্যহিক সেলিব্রেশন এইটা আমাকে অসম্ভব, মানে কী বলবে মোটিভেট করে। তার প্রাত্যহিক জীবনে সেরকম কিন্তু কোনও দুঃখ নেই সে যখন একটা বিড়ি ধরায় সে কিন্তু রাজা। তার এই রাজকীয় ভাবটুকু আমি তার কাছ থেকে গ্রহণ করি। এই celebration of life এইটা কিন্তু আমার কাছে খুব দরকারি একটা ব্যাপার। এইটাই মানে আমাকে অনেকদূর অবধি নিয়ে গেছে মানে *কাঙাল মালসাট* অবধি নিয়ে গেছে। বা *মসোলিয়ম* অবধি নিয়ে গেছে। এবং হাজার দুঃখ, হাজার কষ্টের মধ্যেও মানুষকে যেভাবে আনন্দের সন্ধান করতে দেখেছি সেটা থেকে আমার মনে হয় আরও বড় এক সেলিব্রেশনের অপেক্ষায় এই কার্নিভালগুলো অ্যারেঞ্জ করা দরকার। যে সেলিব্রেশনের কথা সম্ভবত লেনিন প্রথম বলেছিলেন।

[নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথাবার্তা/কবিতীর্থ/আশ্বিন ১৪১৪, পৃ-১৭৬]

ACCESSION NO 36712
CLASS NO
ADDITIC... DISTRICT LIBRARY
SM...
pathagar.net
SILIGURI ... LIBRARY